গহন আনন্দ চিন্তন

দ্বিতীয় ভাগ

স্মৃতি সঙ্কলন

সম্পাদক
স্বামী বিশ্বনাথানন্দ

সংকলন এবং পরিকল্পনা
স্বামী তৎপরানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
নরেন্দ্রপুর, কলকাতা - ৭০০১০৩
Phone : 033-24274537 / 528
email : rkmlpndp@gmail.com website : www.rkmlsp.org

প্রকাশক : স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
নরেন্দ্রপুর, কলকাতা - ৭০০১০৩
e-mail : rkmlpndp@gmail.com

ISBN : 978-93-5351-789-2

প্রথম সংস্করণ : ২৫ মার্চ ২০২৪

সহ-সম্পাদনায় : স্বামী নিষ্ঠানন্দ - বেলুড়মঠ, স্বামী বেদানুরাগানন্দ - রহড়া
স্বামী উর্জিতানন্দ, স্বামী ইষ্টেশানন্দ - নরেন্দ্রপুর
সমিত কুমার বাগ, সুদীপ্ত দে, অভিজিৎ সরকার - নরেন্দ্রপুর
অনমিতা ভট্টাচার্য্য - মুম্বাই, অলকানন্দা চক্রবর্তী - খোন্‌সা
ভাস্বতী ভট্টাচার্য্য, ঈপ্সিতা চক্রবর্তী - কলকাতা
রূপন দত্ত - বেলুড়, হিরক কুমার দাস - বালি এবং
অন্যান্য অনুরাগী ভক্তবৃন্দ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : সৌমেন দাস

মুদ্রণ : সৌমেন ট্রেডার্স সিন্ডিকেট
৯/৩ কে. পি. কুমার স্ট্রিট, বালি, হাওড়া - ৭১১২০১
e-mail : stsbally@gmail.com

সমর্পণ মূল্য : ₹ ৫০০.০০

উৎসর্গ

সূচিপত্র

ঔ স্মৃতিতর্পণে অন্যান্য সন্ন্যাসীবৃন্দ ৯

ঔ স্মৃতিতর্পণে মাতাজীরা ৯

❧ পরিশিষ্ট ❧

—●—

সম্পাদকের নিবেদন

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্দশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ কর্তৃক ভক্তমণ্ডলীর প্রেরিত পত্রাবলীতে তাঁদের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন ও নানাবিধ সমস্যার কথা, এই সঙ্গে বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী ও ভক্তদের স্মৃতি সংকলন — প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়েছে। এর পিছনে স্বামী তৎপরানন্দ ও রামকৃষ্ণ আশ্রম, বীকানের ভক্তমণ্ডলীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

এই পত্রসংকলনের আর একটি সংখ্যা স্বামী সর্বলোকানন্দজীর, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর—এঁর উদ্যোগে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হতে প্রকাশিত হয় ২৬ ডিসেম্বর, ১৯২১ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য জন্মতিথি দিবসে।

এবার তৃতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হল। এবারও রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুর হতে। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানানন্দজীর শ্রম ও সাধনার প্রকাশরূপে। দ্বিতীয় সংখ্যাটির প্রকাশনায় এঁর সাহায্য ও সহযোগিতা স্মরণীয়।

পরম পূজ্যপাদ গহনানন্দজী তাঁর লেখা চিঠি-পত্রের মাধ্যমে ভক্তমণ্ডলী বা অধ্যাত্ম পিপাসুদের বহু প্রশ্নের সমাধান করেছেন। প্রথম দিকে স্বামী তৎপরানন্দজীর ইন্টারনেটের মাধ্যমে গহন আনন্দ চিন্তন শীর্ষক পরিবেশনায় ছবি, চলচ্চিত্র সমেত কিছু পাওয়া গেছে। যেগুলির এক সঙ্কলন গ্রন্থ তৎপরানন্দজীর নির্দেশনায় ব্যাঙ্গালোর নিবাসী শ্রী সাত্ত্বিক জোগলেকর, শিবপুর নিবাসী (পঃ বঃ) শ্রীমতি ব্রজেশ্বরী দীপা দে—এঁদের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়েছে—যা বহু ভক্তকে আকৃষ্ট করেছে।

২০১৬ সালে, সেপ্টেম্বর মাসে, স্বামী তৎপরানন্দজীর লেখা একটি পুস্তিকা - 'হমারী সনাতন উপাসনা পদ্ধতি' বিকানের আশ্রমের স্বামী নিখিলাত্মানন্দজীর প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়। পরে বেলুড়মঠের তৎকালীন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূ: স্বামী সুহিতানন্দজী পাণ্ডুলিপি দেখে বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় এটি প্রকাশের অনুমতি দেন। রামকৃষ্ণ আশ্রম, বিকানের, সচিব অর্জুন সিং মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়।

২৬ আগস্ট, ২০১৭, হিন্দী ভাষায় ৩৬০ খানি পত্র প্রকাশিত হয় শ্রদ্ধেয় মোহন থানবীর ঐকান্তিক আগ্রহে। ইনি হিন্দী ভাষার স্বতন্ত্র পত্রাকার—হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি।

'গহন আনন্দ চিন্তন' - পত্র সঙ্কলন ইতিমধ্যে প্রথম ভাগ শিরোনামে দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সংস্করণ ১৮.৫.১৯ বুদ্ধ পূর্ণিমায় ও দ্বিতীয়টি ২৬.১২.২১, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, এই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সর্বলোকানন্দজী, প্রকাশক হিসেবে কর্মটি সুসম্পন্ন করেন। এই সংস্করণে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানানন্দজী।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সঙ্ঘগুরু পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর লেখা হতে গুরুশক্তি সম্বন্ধে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল। "প্রকৃত উন্নত গুরুর এক বিশেষ শক্তি থাকে। তাহা এই যে, তিনি শিষ্যের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি অতি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন। বুঝিয়া তাহাকে যে পথে পরিচালিত করিলে সহজে তাহার মোক্ষলাভ বা ঈশ্বর প্রাপ্তির সম্ভাবনা তাহা বলিয়া দেন। আর যদি সেই গুরুর সহিত শিষ্যের সাক্ষাতের সর্বদা সুযোগ থাকে, তবে এই সাধনকালীন নানাপ্রকার বিঘ্নের সময় শিষ্যকে বিঘ্ন দূর করিবার উপায় বলিয়া দিয়া এবং তাহার সাধনায় উন্নতি অনুযায়ী উচ্চশিক্ষা দিয়া তাহাকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করিতে পারেন। ...সদগুরুগণ মন্ত্রদানের সময় সেই মন্ত্রের সহিত এক বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন এবং সেই মন্ত্রও সাধকের প্রকৃতি অনুযায়ী দিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্প চেষ্টায় ও অল্প সাধনায় সাধক কৃতকার্য হইয়া থাকেন।" (শ্রীশ্রী গুরু গীতা - শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ লিখিত। উদ্বোধন ১৩০৯, পঞ্চম বর্ষ - ৫ম সংখ্যা, ১লা চৈত্র হইতে সংকলিত)।

'গহন আনন্দ চিন্তন'-এ পত্র সঙ্কলন, প্রথম ভাগ পর্যায়ে, পূজ্যপাদ মহারাজের 'কোন পথে যাওয়া যাবে, অনন্ত জীবন, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ' শীর্ষক লেখাটি আমাদের কাছে এক পরম সম্পদ, আবার এরপর রয়েছে—'দৈনন্দিন জীবনে মানসিক শান্তি' নামে এক আনন্দদায়ী রচনা। প্রবন্ধটির বিচার বিশ্লেষণ ও নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা - আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধীরে ধীরে এক শান্তির পথের ইঙ্গিত মেলে। 'গহন আনন্দ চিন্তন' দুটি খণ্ডই পূজ্যপাদ মহারাজের আশীর্বাদ। সদ্‌গুরুর আশীর্বাদে জন্ম জন্মান্তরের অসৎ সংস্কার মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। "সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বতাওয়ে" - সব মহাপুরুষের এই মত। পূ: স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলতেন, যদি কারও ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে ও সে সাধন ভজনের প্রয়োজন মনে করে তা হলে নিশ্চয়ই তিনি সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন, গুরুর জন্য

সাধকের চিন্তা করবার দরকার নাই। অতি ভাগ্যবান স্বপ্নে দীক্ষা পান।

হিন্দী সংস্করণের প্রথম প্রকাশক, বিকানের রামকৃষ্ণ আশ্রমের সচিব শ্রী অর্জুন সিং মহোদয় বাংলা সংস্করণের ভূমিকা হিসাবে 'গুরুশক্তির প্রবাহ' নামক একটি মূল্যবান রচনা পাঠিয়ে 'গহন আনন্দ চিন্তন'কে সমৃদ্ধ করেছেন—এর জন্য তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ।

২৬ আগস্ট, ২০১৭ হিন্দী ভাষায় ৩৬০ খানি পত্র প্রকাশিত হয়—এটির পিছনে শ্রদ্ধেয় মোহন থানবীর অবদান স্মরণীয়।

হিন্দী হতে বাংলার অনুবাদে অনেক ভক্ত সাহায্য করেছেন—এঁদের সাবলীল অনুবাদ লেখাগুলিকে মাধুর্য দান করেছে। মনে পড়ছে ভাস্বতী ভট্টাচার্যের কথা, ইনি দিল্লীর অধিবাসী, অনমিতা ভট্টাচার্য - বোম্বে, ঈপ্সিতা চক্রবর্তী - কলকাতা, নন্দিতা চক্রবর্তী, রুপন দত্ত - বেলুড়, সমিত কুমার বাগ, অভিজিৎ সরকার, সুদীপ্ত দে, সমীর সরকার—এরা প্রত্যেকেই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অনুগত সেবক। এছাড়া খোনসার অলকানন্দা দিদির আত্মিক সহযোগিতার কথা ভোলা যায় না। এই কাজে আরও বহু ভক্ত বিভিন্নভাবে বইখানির প্রকাশ্যে সাহায্য করেছেন—এঁদেরও গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বার বার স্মরণ করি এই বিরাট কর্মকাণ্ডটির Brain Child গুরুকৃপাধন্য প্রীতিভাজন স্বামী তৎপরানন্দজীকে। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে কীভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ভক্ত মণ্ডলীকে এক প্রেম সূত্রে গ্রথিত করে এর অভিনব সৃষ্টির প্রয়াসের জন্য। ধন্য তাঁর গুরুভক্তি — গুরুকৃপাহি কেবলম্।

প্রথম হতে যাঁরা এই কর্মকাণ্ডটির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের মধ্যে অন্যতম বেলুড় মঠের পূ: স্বামী দেবরাজানন্দজী, ড. রতিকান্ত ত্রিপাঠী মহাশয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সৌমেন ট্রেডার্স সিন্ডিকেটের সত্তাধিকারী ও কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য। এঁদের আন্তরিকতা অবশ্য স্বীকার্য।

এই বৃহৎ কর্মটির পিছনে বহুজনের শ্রম ও সহযোগিতা থাকা সত্ত্বেও কিছু ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

পরম পূজ্যপাদ গহনানন্দজীর দৈনন্দিন জীবনে কর্ম ও ধর্মের সমন্বয়, তাঁর জীবনে সেবা, স্বাধ্যায়, সাধন, সংযম ও সত্য আমাদের পাথেয় হোক — তাঁর কাছে আমরা প্রার্থনা করি।

স্বামী বিশ্বনাথানন্দ

02.04.24

প্রকাশকের নিবেদন

যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক ঠাকুরের নামে প্রতিষ্ঠিত সংঘ রূপ চারাগাছটিকে যাঁরা আগলে রেখেছেন, একটু একটু করে বড় করে তুলেছেন এবং বর্তমানেও সমান ধারায় সগৌরবে এই কার্যধারাকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে দিতে যে সমস্ত উজ্জ্বল মহাপ্রাণ নিজেদের আত্মোৎসর্গ করেছেন বা করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী অন্যতম। স্বামীজীর "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"-ডাকে সাড়া দিয়ে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে আসা সেদিনের সেই নরেশরঞ্জন রায়চৌধুরীর কর্ম সাধনা সঙ্ঘ জীবনে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাঁকে আমাদের চতুর্দশ সঙ্ঘ পরিচালক রূপে পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। আর বিস্ময়ে বারবার অভিভূত হয়েছি দ্যুতিমান, সংযত বাক্, স্থিতপ্রজ্ঞ এই মহান কর্মযোগীর নীরব সাধনায়। কেমন ছিল সেই সাধনা! এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। পূজনীয় মহারাজ তখন সেবা প্রতিষ্ঠানে। একদা এক ভক্ত মহারাজকে তাঁর কুশল সংবাদ জানতে চাইলে মহারাজ অবলীলায় জানান যে, তিনি ভালো নেই। ভক্তটি মহারাজের এরূপ প্রত্যুত্তরের কারণ জানতে চাইলে মহারাজ খুব শান্তভাবে তাঁকে বলেন, বাড়িতে কেউ অসুস্থ থাকলে কেউ কি ভালো থাকতে পারে মা? হাসপাতালের শয্যায় শায়িত প্রত্যেকেই যে আমার বড় আপন"। ছোট্ট ঘটনা কিন্তু কি গভীর তার দর্শন। প্রথম খণ্ডের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই মহাজীবনের মুক্তাসায়রে ডুব দিয়ে আমরা সামান্য দু-চারটি নুড়ি-পাথর সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি মাত্র। যতটুকু পেয়েছি তা দিয়েই আজকের এই পুণ্য দিনে প্রকাশিত হলো পূজনীয় মহারাজের স্মৃতিমালা "গহন আনন্দ চিন্তন" - এর দ্বিতীয় খণ্ড। দেশে-বিদেশে অবস্থানরত পূজনীয় সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী মহারাজগণ, শ্রীশ্রী সারদা মঠের পূজনীয়া মাতাজীগণ সহ অসংখ্য ভক্তেরা, যাঁরা পূজনীয় মহারাজের পুণ্য সান্নিধ্য পেয়েছেন সেই সকল কৃপাধন্য সাধু-ব্রহ্মচারীসহ একনিষ্ঠ ভক্তের স্মৃতি রূপ এক একটি পুথি দিয়ে গাঁথা আমাদের এই স্মৃতিহার। এ কথা আমরা সকলেই নত মস্তকে স্বীকার করতে বাধ্য যে, ক্ষণিকের হলেও প্রিয় সান্নিধ্য আমাদের মণিকোঠায় যতটা জাগরূক থাকে, তার সামান্যটুকুও হয়তো আমরা

কাগজে-কলমে প্রকাশ করতে সক্ষম হই না। তবুও আমাদের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রয়াস। সকল ত্রুটির উর্ধ্বে উঠে ছাপার প্রতিটি অক্ষর আমাদের প্রত্যেককেই সেই স্মৃতিমেদুর মুহূর্তগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং আমরা অস্ফুটেই বলে উঠব—

"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর সুন্দর হে সুন্দর।।"

-এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এবং আশা রাখি, সকলের পূর্ণ সহযোগিতা আগামীতেও এই আনন্দ ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবে।

আরো কয়েকটি কথা না বললেই নয়, পূজনীয় মহারাজের অতল অফুরন্ত স্মৃতি ভাণ্ডারের একটি একটি করে নুড়ি-পাথর সংগ্রহ না করলে আমরা এই পুণ্য স্মৃতিসুধা থেকে বঞ্চিত হতাম। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রীতিভাজন স্বামী তৎপরানন্দ মহারাজকে তাঁর এই উদ্যমের জন্য সাধুবাদ জানাই। সাথে সাথেই পূজ্যপাদ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজীকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও বিনম্র শ্রদ্ধা। তাঁর মতো কৃতবিদ্য সন্ন্যাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই মহৎ গ্রন্থটির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছেন এ আমাদের পরম প্রাপ্তি। একই সঙ্গে নমস্কার, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের, যাঁরা নিরলস সেবা দিয়ে এই স্মৃতি-সঞ্চয়নটিকে গ্রন্থরূপ দিতে সাহায্য করেছেন। মুদ্রণ কার্যে "সৌমেন ট্রেডার্স" যে পরিশ্রম স্বীকার করেছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এছাড়া পূজনীয় মহারাজের অগণিত ভক্তবৃন্দ, যাঁরা গ্রন্থটির আর্থিক ব্যয়ভার গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রত্যেককেই জানাই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মাননা। আসলে যাঁর কাজ তিনিই করিয়ে নেন, আমরা তো নিমিত্তমাত্র। ঠাকুর, মা, স্বামীজির কৃপাধন্য পূজনীয় মহারাজের আশীর্বাদ আমাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক, মহারাজের রাতুল চরণে এই আমার প্রার্থনা।

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, ৭০০১০৩

অক্ষয় তৃতীয়া, ১৪৩১
১০ই মে, ২০২৪

সংকলকের কলমে

যোগস্য প্রথমদ্বারং বাঙ্‌নিরোধোঽপরিগ্রহঃ।
নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যমেকাংতশীলতা।।
৩৬৭ (বিবেকচূড়ামনি)

যোগী পুরুষদের জীবন এক অনাড়ম্বর সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়। সেই সৌন্দর্যকে কখনই কথায় প্রকাশ করা যায় না। মানুষ তাঁর মনের মণিকোঠায় সেই সৌন্দর্যকে ধরে রাখে, সেই সৌন্দর্য তাঁর কাছে মধুর ও অপরূপ। তাই মাঝে মাঝে যখন মনের ভিতরটা ভারী হয়ে আসে, মনে হয় এই ভবসংসারে মাছধরা নৌকার মতো আমরা ভাসছি আর দুলছি। ঢেউয়ের আঘাতে আমাদের জীবন কখনো কম্পিত ও কখনো শঙ্কিত হয়ে উঠছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীবনও মোহনার দিকে এগিয়ে চলেছে আর পিছন পাড়ে ফিরে এসে কূলে ভিড়বে না। তখন স্মৃতিটুকুই হয় অনিশ্চিত যাত্রার একমাত্র সম্বল। আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ স্মৃতি মনের ভারকে লাঘব করে, এ প্রসঙ্গে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজীর একটি কথা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক—"প্রকৃত আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন মানুষ মরে না। তাঁরা তাঁদের পশ্চাতে রেখে যান তাঁদের মহৎ জীবনের জ্বলন্ত স্মৃতি। এই স্মৃতি দুর্বলকে শক্তি দিতে থাকে, হতাশাগ্রস্তকে আনন্দ দিতে থাকে, এবং ভগবদনুসন্ধানীদের অনুপ্রেরণা দেয়।" 'গহন আনন্দ চিন্তন' (দ্বিতীয় ভাগ) স্মৃতি সঞ্চয়ন হল তেমনি এক গ্রন্থ। এই গ্রন্থমালা রচিত হয়েছে তাঁদের লেখনীতে যাঁরা ত্যাগ ও তপস্যার মধ্যে দিয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সন্ন্যাস জীবন অতিবাহিত করছেন। তাঁরা তাঁদের সাধন পথে যা কিছু উপলব্ধি করেছেন এবং যেসব বাধার সম্মুখীন হয়েছেন সে সব কথা কখনো তাঁদের সঙ্ঘগুরু পূজনীয় স্বামী গহনানন্দ মহারাজের কাছে সাক্ষাতে কখনও বা পত্রলাপে ব্যক্ত করেছেন এবং মহারাজ তাঁদের বক্তব্য শুনে সেইমতো উপদেশ দিয়েছেন। পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা ও ভাব বিনিময়ে যে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ তাঁরা পেয়েছেন। তাঁদের সেই পরম আনন্দের কথাই

প্রবন্ধাকারে এই গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে। আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে মননে ও চিন্তনে এক সুগভীর প্রশান্তি ও আনন্দ বিরাজ করবে, যা সুস্থ ও সুন্দরভাবে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়। কেননা, সমাজ কতকগুলো তথ্য জ্ঞান ও কর্মকুশলতার উপর বেঁচে থাকতে পারে না। সমাজ তথা সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন বেঁচে থাকে তার নিঃস্বার্থপরতার শিক্ষা ও পবিত্রতার দীক্ষায়। সেই শিক্ষা ও দীক্ষার দায়িত্বভার বহন করেন শুদ্ধ ও পবিত্রচিত্তের অধিকারী ত্যাগী মহাপুরুষ ও মহাত্মারা। তাঁদের জীবনের প্রতিটি অঙ্কই সাধারণ মানুষের কাছে দেবোপম সৌন্দর্যরূপে প্রতিভাত হয়। সেই সৌন্দর্যকে দেখলে মন আনন্দে ভরে ওঠে আবার সেই সৌন্দর্যের কথা শুনলেও 'আনন্দ' মনে অনুরণিত হয়। পর্যায়ক্রমিকভাবে এই পুনরাবৃত্তি চলতেই থাকে। যাঁর সর্বোচ্চ পরিণতিতেই পরমানন্দের প্রাপ্ত। এই পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বন্দনানন্দজী এক জায়গায় বলছেন—"পুনরাবৃত্তি করা সবচেয়ে ভালো, কারণ পুনরাবৃত্তি স্মরণ করা, ধারণ করা ও জীবনব্যাপী সাধনা চালানোর একমাত্র পথ। সম্ভবতঃ, পুনরাবৃত্তিই (শুভ চিন্তা ও কর্ম সম্পর্কে) আধ্যাত্মিক স্থিতিশীলতাকে বজায় রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি।" কেমন ছিল সেই আধ্যাত্মিক স্থিতিশীলতা সে সম্পর্কে আমি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি—দিল্লিতে তখন প্রথম মেট্রো স্টেশন হয়েছে। তার নামকরণ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে। মহারাজও এই স্টেশনের নামকরণের ক্ষেত্রে সবিশেষ উদ্যোগী হন। শেষপর্যন্ত মহারাজের চেষ্টায় দিল্লি স্টেশনের নামকরণ হয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম মার্গ স্টেশন। উদ্বোধনের কিছুদিন পর মহারাজকে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সব কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হয়। মহারাজও সরল শিশুর মতোই সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন। স্টেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ই-শ্রীধরণ মহারাজের কাছে কাছেই ছিলেন। তিনি ভাবছিলেন মহারাজ তাঁর অনুভূতি বা ভালোলাগার কথা কিছু বলবেন কিন্তু মহারাজ কিছুই বললেন না। তাঁর সেই না বলা ভাবটি ছিল এক শান্ত-সমাহিত-চিত্ত যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ভালো। যা কিছু আনন্দের সবটাই তাঁর সেই মৃদু হাসিতে ভরা প্রশান্ত মনের গভীরে। বাইরে তার কোন প্রকাশ ছিল না। গোকুলানন্দজীর কথায় যেন এক দেবশিশু সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখছেন। এইরূপ নানা কথায় তা শুধু কথা নয় স্মৃতির মধুভান্ড। মহারাজদের

সেই অমৃতময় কথায় গড়ে উঠেছে এই গ্রন্থ স্মৃতি সঞ্চয়ন। এই গ্রন্থে সেইসব মহারাজদের কথাও আছে যাঁরা আজ আর স্থূল শরীরে নেই। এই গ্রন্থ তাঁদের প্রতি এক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এই গ্রন্থ সংকলনের ক্ষেত্রে আমাকে নানা বাধা বিপত্তির মুখে পড়তে হয়েছে। তখন কেবলই মনে হত মহারাজের সেই সাবধান বাণী—'লিখো না, লিখো না, ফল ভালো হবে না।' তাই যতদিন মহারাজের শরীর ছিল ততদিন এই কাজে কেউ ব্রতী হয়নি। মহারাজের শরীর চলে যাওয়ার পর আমি এই কাজে হাত দিই। পূজনীয় বরীষ্ঠ সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে জানতে পারি, শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদ যাঁরা ছিলেন শুধু তাঁদের জীবনকথাই নয়, মঠ-মিশনের যাঁরা বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী যাঁরা ত্যাগ ও তপস্যার মধ্যে দিয়ে পবিত্র জীবন অতিবাহিত করছেন তাঁদের সেই পবিত্র জীবনকথা যেন লেখা হয়। কারণ শুধু অতীতের কিছু কথা দিয়ে বর্তমানকে খুব বেশি দিন ধরে রাখা যাবে না। বর্তমানও একদিন অতীত হবে। এই অতীতকে যদি লেখা না হয় তাহলে অতীত সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠবে না। তাই প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন অন্যান্য সাধু মহাত্মাদের জীবন চরিত লেখার উপর তিনিই প্রথম আলোকপাত করেন। এসব কথা শোনার পর আমি মনে সাহস পাই এবং সংকলকের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

পূজনীয় মহারাজের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে যে ভক্ত সম্মেলন হয়েছিল সেখানে সাধুরা মহারাজের স্মৃতিচারণ করেন তখনই আমার মনে হয় এইরকম একশো স্মৃতিচারণ সংকলিত করে আমি একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করব। সেই থেকেই যাত্রা শুরু। এই প্রবন্ধের প্রথম 'পত্র সংকলন' প্রকাশ ছিল এক দুরূহ কাজ। কারণ গ্রন্থ প্রকাশনায় এক বিরাট জটিলতা ছিল। স্বামী সর্বলোকানন্দজী মহারাজের অক্লান্ত চেষ্টায় আমি সেই জটিলতা কাটিয়ে উঠি এবং তিনি স্ব-উদ্যোগে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের লোকশিক্ষা পরিষদের ছত্রছায়ায় বইটি প্রকাশ করেন। এরপর বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ স্মৃতি সঞ্চয়ন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজীর হাত ধরে আজ প্রকাশ পাচ্ছে। বইটির প্রকাশে ছাপানোর কাজটি বছরের পর বছর ধরে নীরবে করেছে সৌমেন ট্রেডার্স। তারা একটুও অধৈর্য হয়নি। তাঁদের এই নিরন্তর প্রয়াসকে আমি সাধুবাদ ও ধন্যবাদ জানাই। বইটির প্রকাশের কাজে সাহায্য করেছেন দেবরাজ

মিত্র, সমীর সরকার ও অভিজিৎ সরকার। সহ-সম্পাদনায় ও অনুলিখনে সাহায্য করেছেন রূপন দত্ত, অনামিতা ভট্টাচার্য, সমিত কুমার বাগ, ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী শংকর দাস। বইটির সম্পাদনায় ছিলেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ, স্বামী নিষ্ঠানন্দজী মহারাজ, স্বামী উর্জিতানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী ইষ্টেশানন্দজী মহারাজ, বইটির প্রকাশনায় ও মুখ্য ভূমিকায় আছেন পূজনীয় স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ। এঁদের প্রত্যেকের সাহায্য, ভালোবাসা, আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণায় বইটি আজ প্রকাশ পাচ্ছে। তাই তাঁদের প্রত্যেককে আমি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, নমস্কার ও প্রণাম জানাই।

শ্রীগুরু চরণাশ্রিত

স্বামী তৎপরানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর

ই-মেল : tatparananda@rkmm.org

Phone PBX :
(033) 2654-1144 / 1180
(033) 2654-9581 / 9681
FAX : (033) 2654-4346
Email : mail@rkmm.org
Website : www.belurmath.org

RAMAKRISHNA MATH
(The Headquarters)
P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711202
INDIA

শুভেচ্ছা

'গহন আনন্দ চিন্তন' গ্রন্থটির দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হবে জেনে সুখী হলাম।

ভক্তিশাস্ত্রে বলেছে, "মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোহগম্যোহমোঘশ্চ"। মহতের সঙ্গ – সাধুসঙ্গ দুর্লভ, অগম্য ও অমোঘ।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত সমস্যাগুলি দেখা দেয়, অনপেক্ষ ভাবে সেগুলির দিকে তাকালে তাদের সমাধানও খুব সহজ হয়ে আমাদের কাছে ধরা পড়ে। সাধুসঙ্গের ফলে আমাদের মনে এই অনপেক্ষভাব এবং অনাসক্তির ছাপ পড়ে। তাই মহৎসঙ্গের এত মহিমা। যখন স্থূলভাবে মহৎসঙ্গ করা সম্ভব হয় না, তখন মানস-সঙ্গ বা মহৎ ব্যক্তির কথা পড়া, আলোচনা করা, চিন্তা করাই হয়ে ওঠে সাধুসঙ্গ।

এখানেই এই বইটির উপযোগিতা। পরমপূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের পূতসঙ্গ এর মাধ্যমে লাভ করা যাবে, তাঁর স্মৃতিকথাগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে।

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা করি গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হোক।

স্বামী সুহিতানন্দ

৪ জানুয়ারি ২০২৪
শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিপূজা

(স্বামী সুহিতানন্দ)
সহাধ্যক্ষ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্দশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের জীবনস্মৃতির সংকলন গ্রন্থ গহন আনন্দ চিন্তন, ভাগ - ২, তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন এমন কতিপয় সন্ন্যাসীর স্মৃতির মণিকোঠা থেকে আহরণ করে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে প্রকাশিত হতে চলেছে জানতে পারলাম। পূজনীয় মহারাজ যতদিন আমাদের মধ্যে স্থূল শরীরে ছিলেন ততদিন তাঁর উপস্থিতি আমাদের মনকে আনন্দে ও উৎসাহে সদা পরিপূর্ণ রাখতো। তাঁর অধিনায়কত্বে শুরু হওয়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু জনহিতকর কাজ আজও সমানভাবে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে ব্যাপৃত আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর শরণাগত হয়ে জনকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার এক অনন্য নজির ছিল তাঁর জীবন। তিনি জীবনব্যাপী যে প্রবল আত্মত্যাগ করেছেন সেই তপোবহ্নিতে তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দীপ্তিমান হয়ে আছে। এই মহাজীবনের প্রতিটি ঘটনা মহত্বপূর্ণ। এই মহতী জীবনের স্মৃতিচারণ ত্যাগ ও সেবার যুগাদর্শ অবলম্বন করে সকলকে আপন আপন জীবন সার্থক করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সঙ্ঘের বিবিধ কাজে ব্যাপৃত থেকেও নিরলস অধ্যাবসায় ও পরিশ্রমের মাধ্যমে এই অমূল্য পুস্তকটি সংকলন করার জন্য স্বামী তৎপরানন্দজীকে বিশেষভাবে সাধুবাদ জানাই। এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দ

সচিব

রামকৃষ্ণ মিশন, খেতড়ী, রাজস্থান

স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান বিশ্বে তাঁর অবদান

স্বামী গহনানন্দ* 2

উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিগণ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির আবরণ উন্মোচন এবং নবনির্মিত সংযুক্ত- ভবনের দ্বারোদঘাটন উপলক্ষে আয়োজিত এই পবিত্র অনুষ্ঠানে আপনাদের মধ্যে আসতে পেরে আমি বিশেষ আনন্দিত। আপনারা সকলেই জানেন, এই অনুষ্ঠানটি গত সপ্তাহে ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর উপস্থিতিতে হওয়ার কথা ছিল। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, নতুন দিল্লিতে আকস্মিক কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যাবতীয় অনুষ্ঠানসূচি বাতিল করে দিয়ে সত্বর রাজধানীতে ফিরে যেতে বাধ্য হন। ২৯ অক্টোবর সঙ্ঘটিত সেই ভয়ঙ্কর ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে যেসব নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের আত্মার প্রতি আমরা অন্তরের গভীর শোক জ্ঞাপন করছি।

আদিম উগ্র প্রবৃত্তি এবং সাম্প্রদায়িক হিংসা আজ সমগ্র সমাজকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। সুতরাং আপাতভাবে পার্থক্য থাকলেও আজ এই হিংস্র আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আজ বিশ্বব্যাপী মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করলেও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রাথমিক নীতি এবং শক্তি সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

স্মরণাতীত কাল থেকেই সংহতি ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সুর। বিভিন্ন মতাদর্শের সমন্বয় সংক্রান্ত গঠনমূলক আলোচনা এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে ভারতীয় সংস্কৃতি। ভারতবর্ষ কোন ধর্ম, কোন জাতি এবং দেশের মধ্যে উদ্ভূত অথবা দেশের বাইরে থেকে আহৃত কোন চিন্তাধারাই প্রত্যাখ্যান করেনি; কিন্তু তার সবগুলির মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয়সাধন করে ভারতবর্ষ এক নতুন ভাবধারার

---

*চতুর্দশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। ৬ নভেম্বর, ২০০৫ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার সংলগ্ন গোলপার্কে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন এবং ইনস্টিটিউট-সংলগ্ন ভবনের দ্বারোদঘাটন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ইংরেজি বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

উদ্বোধন ১০৯তম বর্ষ—১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৪১৪ নভেম্বর ২০০৭

জন্ম দিয়েছে, যা ভারতীয় সভ্যতার এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র। এদেশে অবক্ষয়ের দিন পূর্বেও এসেছে; কিন্তু যথাসময়ে প্রফেট ও ঋষিবর্গের আবির্ভাব মানুষের ধর্মীয় শক্তি তথা উদ্দীপনাকে নব উদ্যম দান করে সমগ্র সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নিজ জীবনে এক অপূর্ব সংহতি এবং সমন্বয় সাধন করেছিলেন। নিজ ধর্ম ত্যাগ না করে অন্যান্য ধর্মের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি নিজ জীবনে গ্রহণ করার প্রথা স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তন করেছিলেন। সমগ্র মানবজাতির জন্য তিনি এক সার্বজনীন ধর্মের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন, যার গভীরে সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি সম্মিলিত হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, জগতে একটিমাত্র নিত্য-ধর্ম বর্তমান; অন্যান্য সকল ধর্মই তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। পরবর্তীকালে এমন এক সার্বজনীন ধর্ম সৃজনই হবে সমগ্র মানবসমাজের এক সুমহান কীর্তি এবং এ কাজে আমাদের সকলেরই একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। তাকে কিন্তু কোনভাবেই ‘ধর্ম’ নামে আখ্যায়িত করা হবে না। কিন্তু জীবনে সংহতিসাধন, শান্তি ও পূর্ণতা লাভের জন্য সমগ্র মানবসমাজের বেশ কিছু সাধারণ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকভাব তথা ভাবাদর্শের প্রয়োজন।

প্রাথমিকভাবে বেদান্তের প্রভাবে সাম্প্রতিককালে ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হয়েছে। আজ ধর্ম শুধু একটি বিশ্বাস, একটি মতবাদ, নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান অথবা গির্জার সদস্য হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একথা আজ সর্বজনবিদিত যে, তুরীয় এবং জীবন-রূপান্তরকারী এক চরম উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনে পরিপূর্ণতা ও শান্তি লাভ করাই ধর্মের মূল লক্ষ্য। এ জাতীয় বিশ্বাস থেকেই অন্য ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের বিরূপ মনোভাব আজ পরিবর্তিত হয়ে গ্রহণেচ্ছু এবং শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থানের ফলে ধর্মীয় সমন্বয়সাধনের লক্ষ্যে তার মর্ম এখনো গভীর এবং ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়নি।

প্রকৃত সত্য হলো যে, শুধু সামাজিক ও জাতীয় স্তরে আইন সত্তার মাধ্যমে অথবা সহিষ্ণুতা ও উদাসীনতার নীতি অনুসরণ করে সর্বধর্মসমন্বয় সাধন সম্ভব নয়; একমাত্র ধর্মের প্রকৃত অনুভূতি লাভের সাহায্যে অর্থাৎ ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ও সকল ধর্মের মধ্যে নিহিত সাধারণ ভাবগুলি উপলব্ধির মাধ্যমে তা সম্ভবপর। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বুঝিয়েছেন যে, সকলপ্রকার ধর্মীয় বিবাদের মূল কারণ হলো ধর্মের অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া, যেমন প্রতীক, আচল, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। ধর্মের মূল নির্যাসকে অপ্রয়োজনীয় অংশ থেকে পৃথক করা আমাদের আশু কর্তব্য।

যেকোন ধর্মের ঈশ্বরলাভের উপায় স্বরূপ। এটি হলো সকল ধর্মেরই মূল কথা। একমাত্র এই মূল ভাবটির ওপর প্রকৃত গুরুত্ব আরোপ করলেই যথার্থ ধর্মসমন্বয় সম্ভব হবে। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রচার করেছিলেন এবং তার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। কারণ, তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মানবসমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধন এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির এক অতি মূল্যবান ভূমিকা আছে । প্রার্থনা করি, ভারতবর্ষের মানুষ আরো অধিকসংখ্যায় তাঁদের সংস্কৃতির প্রকৃত মহিমা উপলব্ধি করতে এবং ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও সমন্বয় সাধনের প্রেক্ষিতে সেই সংস্কৃতির যথাযথ অনুশীলন করতে সক্ষম হবেন। ধন্যবাদ।

স্মৃতিতর্পণে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীবৃন্দ

চির কৃতজ্ঞ

স্বামী সিদ্ধিদানন্দ

পূজ্যপাদ বিরজানন্দজী মহারাজ তখন সঙ্ঘাধ্যক্ষরূপে বেলুড় মঠে স্বামীজির ঘরের পাশের ঘরটিতে থাকতেন। সেই সময় মহারাজজীর শরীর বেশ অসুস্থ। কিছুদিন তাঁর সেবা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পূজনীয় নরেশ মহারাজ (স্বামী গহনানন্দজী) তখন কলকাতায় অদ্বৈত আশ্রমে ছিলেন। যদিও তিনি পূজনীয় বিরজানন্দজী মহারাজের সেবার জন্য নির্দিষ্ট সেবক-দলের মধ্যে ছিলেন না, তবে তিনি পরোক্ষভাবে গুরুসেবা করতেন। পূজনীয় বিমল মহারাজের (স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী—পূজ্যপাদ বিরজানন্দজীর সচিব-সেবক) নির্দেশে নরেশ মহারাজ কলকাতার ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, ঔষধাদি জোগাড় করা ও পূজ্যপাদ বিরজানন্দজীর সেবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা ইত্যাদি করতেন। এ সব বিষয়ে বিমল মহারাজ নরেশ মহারাজের উপর পুরোপুরি নির্ভর করতেন। প্রথম থেকেই আমার নরেশ মহারাজকে খুব ভাল লাগত। তাঁর শান্ত ধীর স্থির স্বভাব আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি নীরবে নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুসেবা করেছেন।

অদ্বৈত আশ্রম রবিবার ও অন্যান্য সরকারী ছুটির দিন বন্ধ থাকে। পূজনীয় নরেশ মহারাজ সাধারণত শনিবার বিকালে বা অন্য কোন ছুটির দিনে কলকাতা থেকে আসতেন, একদিন বা দুই দিন বেলুড় মঠে রাত্রিবাস করে আবার অদ্বৈত আশ্রমে ফিরে যেতেন সোমবার সকালে। সেই সময় বেলুড় মঠে সাধুদের থাকার জন্য যথেষ্ট ঘর ছিল না। অন্যান্য শাখা-কেন্দ্র থেকে সাধুরা মঠে এসে রাত্রিবাস করতে হলে বেশ অসুবিধায় পড়তে হত। স্বামীজির ঘরের নীচে আমি থাকতাম। আমার থাকার জায়গার পাশেই আমি বিছানা প্রস্তুত করে মশারী টাঙ্গিয়ে দিতাম পূজনীয় নরেশ মহারাজের জন্য। এতে তিনি খুবই বিব্রত ও সংকোচবোধ করতেন। আমাকে তিনি বলতেন, "এ সব আবার করা কেন? আমি কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে দেব।" আমার এই সামান্য

সেবার কথা পূজনীয় নরেশ মহারাজ সারা জীবন মনে রেখেছেন। তাঁর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। তবে তাঁর আচরণে আমি সেটি মনে-প্রাণে অনুভব করেছি।

বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তিনি আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। আশ্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে যখনই কোন সমস্যায় পড়েছি, তিনি সুপরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। মনসাদ্বীপ আশ্রমের একটি জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আমাকে একবার ট্রাস্টি মিটিং-এ ডাকা হয়। নানা প্রশ্নের সম্মুখে পড়ে আমি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছি। পূজনীয় নরেশ মহারাজ মিটিং-এর মধ্যেই নিজের চেয়ার থেকে উঠে আমার পাশে এগিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী আমি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পূজনীয় বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজকে সব বুঝিয়ে বললাম। যাইহোক, সে যাত্রায় উদ্ধার পেলাম।

পূজনীয় নরেশ মহারাজের সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের প্রীতির সম্পর্ক। আমি তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করি। তাঁর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

আমার স্মৃতিতে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

স্বামী গোলোকানন্দ

পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীয় সন্ন্যাসী ছিলেন। সেবা প্রতিষ্ঠানে ওনার সহকারী হিসাবে ওনার সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেটি ছিল ১৯৭৮ সাল, আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। তিনি তখন ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট কলকাতার ঐ হাসপাতালের সেক্রেটারি ছিলেন। ঐ হাসপাতালটি স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজ ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন মূলত শিশু চিকিৎসার কেন্দ্র হিসাবে, যার নাম ছিল শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান। কিন্তু স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এই হাসপাতালের কার্যভার গ্রহণ করার পর প্রায় কুড়ি বৎসরের অধিক সময় তাঁর পরিচালনার এই হাসপাতালটি প্রায় সর্বপ্রকার চিকিৎসা সুবিধা-সহ এক সর্বাঙ্গসম্পন্ন সাধারণ হাসপাতালে পরিণত হয় যার নামকরণ হয়—সেবা প্রতিষ্ঠান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে এখানে মেডিকেল স্নাতকোত্তর স্তরের পঠন-পাঠনও প্রচলিত হয়। এর ফলস্বরূপ হাসপাতালে সর্বোচ্চগুণসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের প্রয়োজনও জরুরী হয়ে পড়ে। নার্সিং স্কুলেও প্রতি বছর প্রায় ৮০ জন মতো ছাত্রী ভর্তি হওয়ায় নার্সিং-এর গুণমানে উচ্চআদর্শসম্পন্নতা বজায় রাখার প্রয়োজন হয়। রোগীদের প্রতিদিনের খাদ্যসরবরাহের দায়িত্বও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হত।

সেবাপ্রতিষ্ঠান ছিল মূলত কলকাতার মানুষজনের চিকিৎসা পরিষেবার জন্যই। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মানুষই এখানে সমান সুযোগ-সুবিধা পেত। সম্ভ্রান্ত রোগীদের জন্য বিশেষ প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ছিল সেখানে সাধারণ রোগীদের জন্য ছিল সাধারণ ওয়ার্ল্ড। একজন সন্ন্যাসী মহারাজের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারটি পরিচালিত হত যিনি মানুষের আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে তাদের হাসপাতালের যাবতীয় ব্যয়াদি নিয়ন্ত্রিত করতেন।

স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ সেবা প্রতিষ্ঠানে আগত সমস্ত রোগীদের একাধারে বন্ধু ও অভিভাবকের মতো সাহচর্য দান করতেন। এই সুবাদে তিনি ব্যক্তিগতভাবে পর্যায়ক্রমে সব রোগীদের সঙ্গেই দেখাসাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁদের জীবনের ভালো-মন্দ, চিকিৎসাব্যবস্থা, সেবাযত্ন, তাদের পথ্যাদি এবং অন্যান্য সবকিছু সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতেন। তারাও মন প্রাণ খুলে সমব্যথী হিসেবে তাঁর সঙ্গে নিজেদের সুখ দুঃখ ভাগ করে নিত। স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ভালোবাসা প্রত্যেকের প্রতি, বিশেষ করে হাসপাতালের বিশাল সংখ্যক কর্মীসংস্থার প্রতিও ছিল এবং তারাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতো ও ভালোবাসতো। কিন্তু সেবাপ্রতিষ্ঠানে ইউনিয়নের কার্যকলাপ খুব প্রবলভাবেই ছিল শক্তিশালী। এর কারণ হয়তো এই ছিল যে তারা নিশ্চিত থাকতো এই ভেবে, যে যেহেতু মহারাজ সকলের প্রতি এত স্নেহপ্রবণ সেহেতু তিনি তাদের বিরুদ্ধে কখনও কোন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। সুতরাং তারা ধীরে ধীরে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে লাগলো এমনকি মাঝে মাঝে ছোটখাট ধর্মঘট ডাকতেও দ্বিধা করতো না। একদিন মহারাজজী যখন নিজের ঘর থেকে হাসপাতালের উঠোন পেরিয়ে অফিসঘরের দিকে আসছিলেন তখন তারা হঠাৎ এসে মহারাজজীকে ঘিরে রাখে এবং তাঁর চারিদিকে বসে পড়ে ছোট ছোট ব্যাপারের দাবী-দাওয়া নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকে। এ ব্যাপারে পূর্বে তারা কোন ইঙ্গিতও দেয়নি মহারাজকে। সুতরাং তিনি এতে অবাক হয়ে যান। তিনি তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন এবং আনন্দের সঙ্গেই সেখানে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে কর্মীগণের মধ্য থেকে একজন গিয়ে তাঁর বসার জন্য একটি চেয়ার এনে দেয়। তিনি তাদের সঙ্গে রোদের মধ্যে প্রায় আধঘন্টা বসে থাকেন, তারপর তারা তাঁকে অফিসে যেতে দেয়। এরকম বহু ঘটনা প্রায়ই ঘটতো শুধুমাত্র তাঁকে একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলা এবং রোগীদের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করাই ছিল যার উদ্দেশ্য। এসব কিছুই তিনি শান্তভাবে ও প্রসন্ন মনে সহ্য করতেন। একবার আমাদের একজন কর্মী যে নিকটবর্তী বস্তিসংলগ্ন এলাকায় বাস করে—একটি রোগীর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করে। একথা জানবার পর মহারাজ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং বস্তী এলাকায় গিয়ে সেই ছেলেটিকে ডেকে আনবার জন্য একজন নবীন সন্ন্যাসীকে পাঠান। যুবক সন্ন্যাসী স্বাস্থ্যবান ও অত্যন্ত সাহসী ছিল। সে তৎক্ষণাৎ বস্তী এলাকায় গিয়ে সবাইকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করে সেই ছেলেটিকে মহারাজের কাছে নিয়ে আসে। এরকমই স্নেহপরায়ণ ছিলেন তিনি হাসপাতালে ভর্ত্তিরত রোগীদের প্রতি। একটি সরকারী হাসপাতালের কর্মীরা যেসব সুযোগ-সুবিধা পায় মহারাজজী তাঁর হাসপাতালে নিয়োজিত কর্মীদেরও সেসব দিতেন।

তাদের মাসিক বেতন, ভাতা, ছুটি এসব ছাড়াও আরও অনেক বেশী কিছু সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ছিল তাদের জন্য। এসব সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কিছু কর্মী সর্বদাই কিছু না কিছু সমস্যার সৃষ্টি করতো। একদিন তারা এসে হাসপাতালের অফিসের পাশের একটি ঘর দখল করে বসলো এবং এটি তাদের ইউনিয়নের অফিসঘর বলে বোর্ডে লিখে টাঙিয়ে দিল। মহারাজজীকে তাদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে তারা কখনও কিছু বলেনি বা আলোচনা করেনি। বোর্ড লাগানোর পরে তারা অফিসে এসে মহারাজজীর সঙ্গে দেখা করে এবং এটা মেনে নিতে বলে। এর দু-একদিন পরে একজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে সরিয়ে ঘরটিতে তালা লাগিয়ে দেন। এই দুঃসাহসের কাজ কে করেছে জানতে চেয়ে তারা প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করতে থাকে। অবশেষে মহারাজজীর কাছ থেকে উত্তর পেয়ে ইউনিয়নের মানুষজন চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। একজন সন্ন্যাসী তো সর্বদা সত্য কথাই বলবেন—তার ওপর তিনি ছিলেন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ—অধ্যক্ষ মহারাজ, হাসপাতালের সর্বেসর্বা—যাঁর স্নেহময় সেবাযত্নে হাসপাতালটি তখন খুবই সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

হাসপাতালে আমার দায়িত্ব ছিল হিসাব-নিকাশের কাজে সহায়তা করা। সেসময় কেউই ঐ দপ্তরে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে সময়মতো কাজ না করায়, মঠের হেড অফিসে এমনকি সরকারি দপ্তরেও হিসাব জমা করায় অনেক বিলম্ব হয়ে যাচ্ছিল। সরকারি কর্মচারীদের জন্য এই হাসপাতালে চিকিৎসা-পরিষেবা দেবার একটি স্কীম প্রচলিত ছিল। সুতরাং যখন সরকারি কর্মচারীগণ আসতো তাদের সবরকম চিকিৎসা পরিষেবা, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি প্রদান করা হতো এবং তার যাবতীয় ব্যায়াদির বিল ইত্যাদি সরকারি অফিসে জমা করতে হতো, যার দায়িত্বে ছিল সরকারি অফিসের কর্মচারীগণ। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবার স্কীম প্রদান করা হতো। আমি সেই দপ্তরের দায়িত্বে ছিলাম। প্রতিদিনের হিসাব যাতে সেইদিনেই তৈরী হয়ে যায় এইজন্য আমি দুজন কর্মী নিয়োগ করি কারণ দপ্তরে বিল জমা করার কাজ এমনিতেই ছয়মাস দেরীতে চলছিল। কিন্তু যখনই এ ব্যাপারে খোঁজ নিতে যেতাম তখনই তারা বলতো যে এত ব্যস্ততার কি প্রয়োজন, তারা সময়মতো পাঠিয়ে দেবে। আমি তাদের প্রতিদিনের বিল প্রতিদিন জমা করার জন্য তাগাদা দিতাম, কিন্তু তারা আমার কথার কোন গুরুত্ব দিত না। তখন আমি স্বামী গহনানন্দজীকে বলি যে আমাকে একজন সহকারী কর্মী দিলে আমরাই এই কাজটি আপডেট করে দিতে পারব। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে একজন সহকারী হিসাবরক্ষকের নিয়োগের দায়িত্বও তিনি আমাকেই দিলেন। সুতরাং একজন

ভাল, কর্মে অভিজ্ঞ ও দায়িত্ববান যুবক নিয়োজিত হলো এবং আমরা একসঙ্গে খুবই সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে লাগলাম। যদিও মহারাজকে তার জন্য প্রতিবছর একটি ভাল রকমের বেতনের আয়োজন করতে হতো কিন্তু কাজের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও আন্তরিকতার জন্য আমরা সন্তুষ্টই ছিলাম।

সেসময় সেবাপ্রতিষ্ঠানে এক চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। ৫০০ শয্যাসম্পন্ন এই সুবৃহৎ হাসপাতালের ব্যয়ভার বহন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। রোগীদের নিকট থেকে যেটুকু অর্থ সংগৃহীত হত তা এই হাসপাতাল চালানোর পক্ষে নিতান্তই যৎসামান্য ছিল। সুতরাং একরকম অনন্যোপায় হয়েই মহারাজ স্থির করেন সমস্ত খবরের কাগজের প্রথম পাতাতেই বড় বড় হরফে একটি বিজ্ঞাপন দেবেন— ‘সেবাপ্রতিষ্ঠান আপনাদের সমর্থনের প্রত্যাশায়’—কথাটি লিখে এবং প্রভুর কৃপায় আশ্চর্যজনকভাবে একমাসের মধ্যে ছোট বড়, অঙ্ক মিলিয়ে প্রচুর অর্থের সমাগম হয়। এই অর্থ আমাদের আশাতিরিক্ত ছিল। সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি ভালবাসা এবং স্বামী গহনানন্দজীর প্রতি শ্রদ্ধায় সমস্ত কলকাতাবাসী সেবা প্রতিষ্ঠানের রক্ষার্থে তাঁদের সহযোগীতার হাতখানি বাড়িয়ে দেন। এই অর্থদান তাঁদের কাছে নিজেদের সৌভাগ্যস্বরূপ বলে মনে হয়। এমন কি রিকশাচালকগণও একযোগে তাদের তরফ থেকে অর্থসংগ্রহ করে হাসপাতালের অফিসে এসে দান করে। সেবাপ্রতিষ্ঠানের সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসীদের নিকট এটি ছিল এক পরম স্বস্তির বিষয়। এ ছিল মহারাজ এবং সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি কলকাতাবাসীদের ভালবাসার নিদর্শন।

সেবাপ্রতিষ্ঠানে ছয়মাস অতিক্রান্ত হবার পর ত্রিবান্দ্রাম রামকৃষ্ণ মিশন শাখার আশ্রমে অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে ত্রিবান্দ্রাম চলে যেতে হয়। সেই প্রথম কোন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ হিসেবে স্বাধীনভাবে সেই কেন্দ্রটি দেখাশোনা করার দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হলো। নতুবা, এতদিন আমার সৌভাগ্য ছিল তিনজন মহান সন্ন্যাসীর ছত্রছায়ায় থেকে তাঁদের সেবা করার। স্বামী কৈলাশানন্দজী ও স্বামী তপস্যানন্দজীর কাছে ১২ বছর করে যথাক্রমে মাদুরাই ও ত্রিবান্দ্রামে এবং স্বামী গহনানন্দজীর নিকট মাত্র ছয় মাস সেবাপ্রতিষ্ঠানে ছিলাম।

ত্রিবান্দ্রামে থাকাকালীন স্বামী গহনানন্দজী কৃপা করে আমাকে অনেক ব্যাপারে উপদেশাদি দান করে পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি দুবার ত্রিবান্দ্রামে এসেছিলেন এবং মাত্র দুদিন বাস করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই বিভিন্ন ঘটনায় আমি তাঁকে আমার একজন হিতৈষী অভিভাবকরূপেই অনুভব করতাম। আমার সৌভাগ্য যে আমি মঠ-

মিশনের এরকম তিনজন মহান সাধুর আশীর্বাদ পেয়েছি।

পরবর্তীকালে, রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সহ-সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণের প্রয়োজন হওয়ায় স্বামী গহনানন্দজীকে হাসপাতাল ছেড়ে মঠের প্রধান কার্যালয়ে চলে যেতে হয়। অবেশেষে স্বামী গহনানন্দজীকে ক্রমে সাধারণ সম্পাদক, সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষের সর্বোচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদটি গ্রহণ করতে হয়। স্বামী গহনানন্দজী মঠ-মিশনকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন এবং সর্বদা সব সাধুদের কল্যাণের কথা চিন্তা করতেন। এই মহাত্মা সর্বপ্রকারে ক্ষমাপরায়ণ এবং সকলের প্রশংসাভাজন ছিলেন। অন্যান্যদের জন্য এই যে এঁদের কল্যাণচিন্তা ও ভালবাসা, এ শুধুমাত্র এঁদের মহাপ্রাণতারই নিদর্শন। আমরা কতখানি যোগ্য বা অযোগ্য সেসবের ওপর এঁদের ভালবাসা নির্ভর করত না, এঁরা সকলের উন্নতি ও কল্যাণের জন্যই সকলকে ভালবাসতেন এবং সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে কোনপ্রকার কার্যের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন।

যখন আমি কালিকূটে ছিলাম স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ প্রায়ই সেখানে আসতেন। আমি সেসময়ের আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। যখন মঠ-মিশনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি কন্যাকুমারী এসেছিলেন সেসময় ত্রিবান্দ্রাম থেকে আমি তাঁর সান্নিধ্যে গিয়েছিলাম। তাঁকে সেখানে স্বামীজির স্মৃতিচারণায় নিমগ্ন দেখে আমার পুনরায় এক মহান অভিজ্ঞতা হলো। ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে বসে স্বামীজির ধ্যান ও চিন্তা সম্বলিত স্বামীজির জীবনীগ্রন্থটি মহারাজ তাঁর সঙ্গে করে এনেছিলেন। শিলাখণ্ডে বসে গ্রন্থের সেই অংশটুকু পাঠ করে তিনি সেখানে স্বামীজির উপস্থিতি অনুভব করতে চাইছিলেন এবং যখন তিনি তা করছিলেন তখন আমি লক্ষ্য করি যে, তিনি সম্পূর্ণরূপেই স্বামীজির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। এটিই ছিল তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। পরবর্তীকালে পরিণত বয়সে সেবাপ্রতিষ্ঠানে তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্মৃতিচারণ

স্বামী রঘুনাথানন্দ

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে শিলং আশ্রমে আমি নতুন ব্রহ্মচারীরূপে যোগদান করি। সেইসময় পূজনীয় নরেশ মহারাজ (স্বামী গহনানন্দজী) শিলং আশ্রমের সহ- সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। সাধুজীবনের শুরুতেই ওঁর কাছ থেকে জীবন গঠনের শিক্ষা ও নির্দেশ লাভ করি। তিনি আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীদের শাস্ত্রপাঠ করাতেন ও ভক্তদের জন্য ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন। তাঁকে সকলেই ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত। যদিও পূজনীয় সৌম্যানন্দজী আশ্রমের মোহন্ত ছিলেন, নরেশ মহারাজের তদারকীতেই আশ্রমের বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালিত হতো। তিনি হিসাবপত্র রাখা, নির্মাণকার্যে তদারকি ইত্যাদিরও দেখাশুনা করতেন। কখনও কখনও আমাদের বিভিন্ন জায়গায় রামনাম সংকীর্তন করতে যেতে হতো। পূজনীয় নরেশ মহারাজ ছিলেন আমাদের অভিভাবক। এ ছাড়াও তাঁকে সরকারী অনুদান জোগাড় করতে ও আশ্রমের জন্য অর্থসংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেতে দেখেছি। কখনও বাড়ি-বাড়ি গিয়েও অর্থসংগ্রহ করতে হতো তাঁকে।

সে সময়ে আমাদের আশ্রমগুলিতে আর্থিক অনটন ছিল। আশ্রমের আয় ছিল খুব কম ও সাধুদের বেশ কৃচ্ছ্রসাধন করতে হতো। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নরেশ মহারাজের পরিচালনায় আমরা আনন্দে ছিলাম।

মহারাজ শিলং, সোহরা, শেলা প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের খুব ভালবাসতেন। একবার ওঁর সঙ্গে আমি সোহরা থেকে শেলা পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম। সেই সময় শেলা যাওয়ার জন্য কোনো রাস্তা তৈরী হয়নি। কাজেই আমাদের পাহাড়ি রাস্তায় ট্রেকিং করে প্রায় ১২ কিলোমিটার যেতে হয়েছিল। পূজনীয় নরেশ মহারাজ ১৯৫২ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত শিলং আশ্রমে ছিলেন। তিনি সকলের অজান্তে বেশ কিছু দুস্থ ভক্ত ও গরীব মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করতেন—কখনও টাকা-পয়সা দিয়ে কখনও বা চাল-ডাল দিয়ে।

১৯৩৯সাল থেকে ভুবনেশ্বর মঠে থাকাকালীন তিনি কয়েকজন বরেণ্য সাধুদের সংস্পর্শ আসার সৌভাগ্য লাভ করেন। পূজ্যপাদ শংকরানন্দজী মহারাজ প্রভৃতি প্রাচীন সাধুদের কথা তিনি আমাদের প্রায়ই বলতেন।

নরেশ মহারাজকে সবসময় হাসিখুশী আর সব ব্যাপারে উৎসাহী দেখেছি। সঙ্ঘের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আনুগত্য। পরবর্তীকালে তাঁকে যখন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেখেছি, সেইসময়ও সমান উদ্যমী আর প্রগতিশীল।

সাধুজীবনের শুরুতে ওঁর কাছ থেকে যে প্রশিক্ষণ পেয়েছি তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। পূজনীয় নরেশ মহারাজের শ্রীচরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

পুরানো দিনের কথা

স্বামী উমানাথানন্দ

অদ্বৈত আশ্রম তখন মধ্য কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের সুবিধা ছিল। অফিস-কাছারি, স্টেশন সব কাছাকাছি ছিল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল ছিল। পূজনীয় নরেশ মহারাজ (স্বামী গহনানন্দজী) সেই সময় অদ্বৈত আশ্রমের ম্যানেজার—বড় দায়িত্ব। কলকাতা থেকে কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটি করতে হলে বা অফিসের কোন কাজের ব্যাপারে আমরা নরেশ মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ করতাম। তিনি আমাদের সব আবদার ও অনুরোধ রক্ষা করতেন। একটা ফোন করলেই হলো, তিনি সাহায্য করতে প্রস্তুত। পূজনীয় মাধবানন্দ স্বামী, পূজনীয় সূর্য্যি মহারাজ (স্বামী নির্বাণানন্দজী) প্রভৃতি প্রবীণ সাধুরাও বেলুড় মঠ থেকে নরেশ মহারাজকে ফোন করতেন কোন কিছুর প্রয়োজন হলে। একবার শীতকালে বেলুড় মঠে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। একদিন মাধবানন্দ স্বামী জপ করবার সময় বেশ শীত বোধ করেন। তখন তাঁর ইচ্ছা হলো বেলুড় মঠের সব সাধুদের তিনি একটা করে সোয়েটার দেবেন। পূজনীয় মাধবানন্দ স্বামী তখন মঠ-মিশনের সম্পাদক। দেখা গেল তাঁর প্রণামী রয়েছে মাত্র ৯২ টাকায়। তখন সস্তার যুগ। চার বা পাঁচ টাকায় একটা সোয়েটার পাওয়া যেত। যাইহোক, তিনি নরেশ মহারাজকে ফোনে বললেন যে, ঐ টাকার মধ্যে যে কটি সোয়েটার হয় মঠে কিনে পাঠাতে। পূজনীয় মাধবানন্দ স্বামীর ফোন পাওয়ার পর নরেশ মহারাজ তৎক্ষণাৎ কানপুরের এক সোয়েটার কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কলকাতার বড়বাজারে তাদের দোকান ছিল। মহারাজ সেদিন সন্ধ্যার মধ্যে অদ্বৈত আশ্রম থেকে বড়বাজারে লোক পাঠিয়ে সোয়েটারগুলি আনিয়ে নিলেন। পরের দিন সকালেই নরেশ মহারাজ কলকাতা থেকে প্রথম বাসে করে এসে বেলুড় মঠে অনেকগুলি সোয়েটার পৌঁছে দেন।

বিদেশে থেকে ফিরে পূজনীয় দয়ানন্দ স্বামী মায়েদের ও শিশুদের সংযোজনের

পর এই হাসপাতালটি 'সেবাপ্রতিষ্ঠান' নামে পরিচিত হয়। সেবাপ্রতিষ্ঠানে প্রথম কয়েক বছর নরেশ মহারাজ দয়ানন্দ স্বামীর সহকারীরূপে কাজ করেন। তারপর তিনি সেখানকার সেক্রেটারি হন। সেই সময় তাঁকে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একদিকে রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় কর্মীদের নিরন্তর বিক্ষোভ, ভাঙ্গচুর, অবরোধ, হরতাল অপরদিকে প্রবল আর্থিক সংকট—এইসব কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি অবিচলিত থেকে কাজ করে গেছেন। চারিদিকে এত সমস্যা, এত গণ্ডগোল, কিন্তু কোন বাহ্যিক প্রতিক্রিয়াই নেই। তাঁর কথাবার্তা বা আচার-আচরণে কোন কিছুই প্রকাশ পেতো না। নরেশ মহারাজের ছিল Terrible Tolerance (অপরিসীম সহ্যশক্তি)।

এদিকে সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় অচল অবস্থা। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের উন্নতিও হয়েছে তালে তালে। নরেশ মহারাজের নেতৃত্বে সেবাপ্রতিষ্ঠানের বিপুল সম্প্রসারণ হয়েছে। এই সময় বিভিন্ন বিভাগের সংযোজন, রোগীদের জন্য কেবিনের ব্যবস্থা, নার্সিং ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা ইত্যাদি গঠনমূলক কাজ হয়েছে। মহারাজের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হয়েছে।

প্রয়োজন পড়লে নরেশ মহারাজ খুব কঠোর হতেন ও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেন, কিন্তু তিনি কখনও নির্মম হননি। সেবাপ্রতিষ্ঠানে একবার বিক্ষোভকারী কয়েকজন কর্মীকে একসঙ্গে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু কর্মীদের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে কিছুদিন পর আবার তাদের তিনি কাজে নিযুক্ত করেন। এমনই ছিল তাঁর হৃদয়বত্তা। নরেশ মহারাজের কথাবার্তা ও লোকব্যবহারে কখনও কোন প্রকার অশালীনতা দেখা যায়নি। তাঁর সৌজন্যবোধ ও সংযত ব্যবহার সর্বজনবিদিত। বিভিন্ন মনোভাবের লোকের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা ছিল নরেশ মহারাজের। তিনি কম কথায় কাজ সারতেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দৃঢ়তা ও অসীম ধৈর্য্য সহকারে তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানের মতো এত বড় হাসপাতাল দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেছেন দীর্ঘকাল।

পূজনীয় দয়ানন্দ স্বামীকে নরেশ মহারাজ খুব শ্রদ্ধা করতেন। এমন কি যখন তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি, তখনও তিনি হাসপাতালের খুঁটিনাটি বিষয়ে দয়ানন্দ স্বামীকে জানাতেন ও তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। সেবাপ্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন নরেশ মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টি নিযুক্ত হন। সেবাপ্রতিষ্ঠানের গুরুদায়িত্ব পালনের সাথে সাথে তিনি মঠ-মিশনের কিছু প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতেন। সেইসময় পূজনীয় ভূতেশানন্দ স্বামী মঠ ও মিশনের ত্রাণকাজের দায়িত্বে ছিলেন। ত্রাণকাজের জন্য অনুদান জোগাড় করা, জিনিসপত্র কেনার ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন জায়গায় সেই সব

ত্রাণ-সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি কাজে নরেশ মহারাজ ভূতেশানন্দ স্বামীকে সাহায্য করতেন।

মঠ-কর্তৃপক্ষ ও প্রবীণ সাধুরা নরেশ মহারাজকে স্নেহ করতেন এবং তাঁর কথা ও মতামতের মূল্য দিতেন। পূজনীয় বীরেশ্বরানন্দ স্বামী, তেজসানন্দ স্বামী প্রভৃতি প্রবীণদের তিনি স্নেহভাজন ছিলেন। সূর্য্যি মহারাজও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন ও তাঁর উপর ভরসা করতেন। নরেশ মহারাজ যখন ভুবনেশ্বর মঠে যোগদান করেন তখন সূর্য্যি সেখানকার মোহন্ত। স্বাভাবিক কারণেই সূর্য্যি মহারাজের প্রতি নরেশ মহারাজের সহজাত আনুগত্য ছিল।

একটি ব্যক্তিগত স্মৃতি। গহনানন্দ স্বামী একবার আমাকে একটি বিশেষ কাজে কোচবিহারের একটি আশ্রমে পাঠান। তিনি তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক। কাজের বিষয়ে নির্দেশাদি দিয়ে বললেন, "এখন তোমার পুরো দায়িত্ব।" সেখানে গিয়ে দেখি তিনি আমার পৌঁছানোর আগেই ফোনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তখন তো আর আজকের মতো ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। তবুও তিনি বারে বারে ফোন করে সব খুঁটিনাটি বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন, যাতে আমি কোনপ্রকার অসুবিধায় না পড়ি।

জীবনে নানা ধরনের ঘাত-প্রতিঘাত, সফলতা-বিফলতা আসে। কিন্তু যিনি সর্বপ্রকার পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেন ও সর্বাবস্থায় অচঞ্চল ও অবিচল থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারেন, তিনিই মহান। পূজনীয় নরেশ মহারাজ ছিলেন এমনই এক মহান ব্যক্তিত্ব।

সংযত বাক্ দক্ষ পরিচালক

স্বামী মঙ্গলানন্দ

সংযত বাক্ দক্ষ পরিচালক স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ স্বামী দয়ানন্দজীর মতো অনেকের কথাবার্তা এবং কলহের মধ্যেও নির্বিঘ্নে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারতেন। টেবিলে ধীর স্থির মেজাজে যখন বসেন তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীরে যেন ফুটে উঠত একজন দুঁদে আই এ এস অফিসার। কারও সাহস ছিল না অপ্রয়োজনীয় বা অসংলগ্ন কথা উত্থাপন করে।

বেলুড় মঠের আরোগ্য ভবনে আমার কাজের মেয়াদ দীর্ঘ সাত বছর বাদে ফুরিয়ে এল। ১৯৮৩ সালের কোন এক সময়ে ঘণ্টা বেজে উঠল অন্যত্র বদলি হবার। মহারাজ তখন সেবাপ্রতিষ্ঠান এবং বেলুড় মঠ দুদিক সামলাচ্ছেন। আমার কর্মস্থল বদলের দায়িত্বে তাই সহকারী সম্পাদক, বেলুড় মঠ তৎপর হলেন। পূজ্যপাদ হিরণ্ময়ানন্দজীর নির্দেশে সেবাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেবার আয়োজন হতে লাগল। যে কোন কর্ম পরিচালনার দায়িত্বে কঠিন মনোভাবের মানুষ হওয়ায় এই দায়িত্ব পালনে বাধা হতে পারে বলে আমি কর্তৃপক্ষকে জানালাম। আরোগ্য ভবনেই হয়তো থাকতে পারব বলে মনে করছি। কিন্তু থাকা হলো না। কঠিন মনোভাবের লোকই নাকি সেবাপ্রতিষ্ঠানে দরকার। নিরুপায় হয়ে জানালাম সেবাপ্রতিষ্ঠানে একই ঘরে দুজন একসঙ্গে থাকা আমার খুবই অপছন্দ। পূজনীয় নরেশ মহারাজ একা থাকার জন্য একটা ঘরই মঞ্জুর করলেন। আমার জন্য হাসপাতালে স্থানাভাব সত্ত্বেও এই ব্যবস্থায় মহারাজের কৃপাধন্য হয়ে গেলাম। গুরুজনদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। মাতৃভাবে ভাবিত স্বামী গম্ভীরানন্দজী ও বিশুদ্ধানন্দজীর মতো গহনানন্দজীর জীবনচর্যাও একই আদলে গড়া। স্বামী গহনানন্দজী প্রায়ই বলতেন, মিষ্টি কথায় জগৎ জয় করা যায়। এই কথাটি শিক্ষামূলকভাবে পূজ্যপাদ বিশুদ্ধানন্দজীর কাছে পাওয়া। পূজ্যপাদ প্রভু মহারাজ (স্বামী বীরেশ্বরানন্দ), মাখন মহারাজ (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) এবং বিশুদ্ধানন্দজীর

ভাবধারায় গহনানন্দজীর আদর্শ জীবনবোধের মূলে আছে দৃঢ় পৌরুষ এবং কঠোর বাক্‌সংযম। ধৈর্য এবং তিতিক্ষা তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ। তাই এক অবিচল আত্মবিশ্বাসের ওপর গড়ে উঠেছে তাঁর সন্ন্যাসজীবন। কোন কথা রেখে ঢেকে অস্পষ্টভাবে তাঁকে বলার উপায় ছিল না। স্পষ্ট কথা খোলাখুলিভাবে উপস্থাপন করা তিনি বেশি পছন্দ করতেন। সশ্রদ্ধ প্রণিপাত সহকারে তাঁর সঙ্গে যতই যুক্তিতর্ক-প্রতিবাদ করি না কেন, তিনি কখনও বিরক্ত হননি। তাঁর বিখ্যাত উক্তি : "সাধু হবার জন্য আমরা এসেছি। সাধু হয়ে আসিনি।" এই কথার বিশেষ তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য।

মানুষের সেবার ভিতর দিয়ে ঠাকুরের সেবা হয়—এই মন্ত্রশিক্ষা মহারাজের কাছে পাওয়া। তা না হলে কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ব্রহ্মচারী অবস্থায় রোগীর মলমূত্র মাখানো মশারি কাপড় পরিষ্কার করার মতো নিত্যকর্ম করা দুঃসহ হয়ে উঠত। কনখল আশ্রমে প্রতি রাত্রে ৬০-৬৫ জন অসুস্থ রোগীর বিছানায় মশারি টাঙানো এবং প্রতিদিন ভোরবেলায় সেগুলি খুলে রাখার দায়িত্ব আমার ছিল। এদের মধ্যে ১৫-২০ জন রোগী প্রতি রাত্রে অসাড়ে বিছানা নোংরা করে ফেলত। অগত্যা প্রাতঃকালে এই শুভকর্ম দিয়ে আমার প্রতিদিনের কাজ শুরু হতো।

সামান্য সঙ্গীত চর্চা ঘরোয়াভাবে আমি নিত্য অভ্যাস করতাম। সুতরাং সন্ধ্যাবেলায় আরাত্রিক ভজন করবার অনুমতি হলো। এই সূত্র ধরে পরবর্তীকালে সেবাপ্রতিষ্ঠানের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে অকস্মাৎ স্বামী গহনানন্দজী গান গাইবার জন্য আমার নাম প্রস্তাব করলেন। উপায় নেই। গাইতে হলো। মহারাজের প্রিয় গান – 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ' এই বিখ্যাত গানটি শুরু করে স্বামীজির কৃপায় সে যাত্রা উতরে গেলাম। মানবতার জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি ব্যবহার করে বক্তৃতা মহারাজ খুব করতেন। সেইসব শ্রুতিমধুর উদ্দীপনামূলক মুহূর্ত আমার মনের গভীরে গাঁথা আছে।

কর্মস্থল যখন মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে স্থানান্তরিত হলো সেখানকার আদব-কায়দায় প্রথম থেকেই নতুনত্ব আনবার জন্য পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজীকে নিয়ে যাবার জন্য আবদার করলাম। প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। মালদহ আশ্রমে অনেকদিন বাদে দীক্ষার অনুষ্ঠান হবে। খুব ঘটা করে সব আয়োজন হতে লাগল। জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থেকে রঞ্জিত মহারাজ ভক্তদের নিয়ে দীক্ষার জন্য আসতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হলেন। মালদহে একটি স্থানীয় নার্সিংহোমে দ্রুত চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা হলো। আমাদেরই দুজন প্রাক্তন ছাত্র চিকিৎসা ব্যবস্থার সব দায়িত্ব নিয়ে Medical Board বসাল। উদ্বিগ্ন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজকে সব ঘটনা জানিয়ে

নিশ্চিন্ত করলাম। প্রাথমিক চিকিৎসা খুব ভালোভাবেই সম্পন্ন হলো। কিন্তু অস্থি বিভাগের ভালো ব্যবস্থার জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া দরকার ভেবে মহারাজ কলকাতায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে বললেন। ঠিক হলো গৌড় এক্সপ্রেসে করে কলকাতা যেতে হবে। স্টেশনের গেট দিয়ে যেখান থেকে ভি. আই. পি-রা ট্রেনের কামরা পর্যন্ত যায় সেই পথে গাড়ি প্রবেশ করার পৃথক অনুমতি এবং পাকা ব্যবস্থা রেল কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে করলেন। ট্রেন পৌঁছাতে অনেক সময় লাগবে এই কথা ভেবে নরেশ মহারাজ রোগীর সঙ্গে থাকলেন। এই স্মরণীয় ঘটনাটি শিক্ষামূলক।

স্বামী গহনানন্দজীকে মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে সাত-আট বারেরও বেশি কাছে পেয়েছি। শুধু দীক্ষার ব্যাপারে নয়, তাঁর উপস্থিতি এমন মহানুভবতার বাতাবরণ তৈরি করত যার ফলে স্থানীয় মানুষজনের বহুদিনের ক্ষোভ এবং অভিযোগ প্রশমিত হতো। এই কর্মকৌশল মহারাজের দৈবস্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। ঠাকুরের বিগ্রহমূর্তি নিয়ে এখানকার শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা তাঁরই হাতে সম্পন্ন হয়। বিগ্রহ নির্মাণে ভাস্কর-শিল্পী শ্রীকার্তিক পালের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য যথেষ্ট প্রশংসনীয়। ঠাকুর যেন এখানে জীবন্ত অবস্থায় বিরাজ করছেন। মন্দিরে ফল এবং পায়েস ভোগ নিয়মিত হয়। মহারাজের অশেষ দূরদর্শিতা এখানে অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। মন্দির নির্মাণের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়নির্বাহ, আশ্রমের স্থানিক পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে খুব সহজ কাজ ছিল না। অথচ মহারাজ অভয়দান করে বলেছিলেন, কাজ শুরু করে দাও পয়সার অভাব হবে না। সত্যই পয়সার কোন অভাব হয়নি। মন্দিরটি বেলুড় মঠের আদলে গড়ে তোলা হয়েছে। এই বিশাল মন্দিরের বিবরণ দিতে গিয়ে মহারাজ স্বামী ভূতেশানন্দজীকে যে সপ্রশংস উক্তি করেছিলেন, তাতে তিনি আনন্দে অভিভূত হয়ে সবাইকে ডেকে বলতে লাগলেন, কিগো বেলুড়ের মতো মন্দির গড়ে উঠল? তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। তাঁর সেই আনন্দে আমাদেরও মন ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় ভরে গিয়েছিল। তবে বেলুড় মঠের আদলে প্রস্তুত হলেও একথা ঠিক যে উচ্চতায় ও গঠনশৈলীতে বেলুড় মঠ অনন্য। শিল্পনৈপুণ্যে, ভাবদ্যোতনায় সর্বোপরি কারিগরি ঐশ্বর্যে বেলুড় মঠের মন্দিরের সমকক্ষ ভাবা যায় না। মন্দির নির্মাণের ইতিহাসে তাই বেলুড় মঠ অনবদ্য, যা আর একটা সম্ভব নয়।

একবার বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ প্রভু মহারাজের (স্বামী বীরেশ্বরানন্দ) শরীর ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। দীর্ঘকাল ক্যান্সার রোগে ভুগে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। সেবাপ্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাবার জন্য গহনানন্দজী নির্দেশ দিলেন। তার যথাযথ চিকিৎসার ব্যাপারে মহারাজ দারুণ উদ্বিগ্ন। সেসময় সেবা-শুশ্রূষার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা তিনি যেভাবে দায়িত্ব

এবং কর্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিলেন সেই নেটওয়ার্কের কথা জীবনে ভুলব না।

পূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজ প্রাতঃকালে নিয়মিত ভ্রমণে বের হতেন। আমি অনেকবার মহারাজের সঙ্গী হবার সৌভাগ্যলাভ করেছি। একবার বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের পরিচালনায় ধুবড়িতে মহারাজ দীক্ষাদানের অনুষ্ঠানে এসেছেন। খুব ভোরে মহারাজ যথারীতি ভ্রমণে বেরিয়ে আমার উপস্থিতিতে বিলম্ব দেখে ঘরে ডাকতে এলেন। ধুবড়ির প্রাইভেট আশ্রমে মহারাজের দীক্ষাদানের অনুষ্ঠান ছিল। আমি তো শেষ রাত থেকে diarrhoea (ডাইরিয়া)-য় আক্রান্ত হয়ে বিছানা আর টয়লেট, টয়লেট আর বিছানা করে চলেছি। খুব ক্লান্ত। সবে একটু শুয়েছি, মহারাজ ঘরে ডাকতে এসেছেন। সব দেখেশুনে বুঝলেন আমার অবস্থা ভালো নয়। ডাক্তার ডাকালেন। চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো। মহারাজ দাঁড়িয়ে থেকে হালকা ঝোলভাত খাবারের ব্যবস্থা করে তবে গেলেন। ভ্রমণ আর হলো না। কিন্তু তাঁর এই অন্তরের ছোঁয়াটুকু আমার মনের মণিকোঠায় অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল।

স্থিতপ্রজ্ঞ সন্ন্যাসী স্বামী গহনানন্দজী

স্বামী অমেয়ানন্দ

এমন একজন মানুষ যাঁকে দেখলে সদাই মনে হয় অতি আপনজন, যেন মনের কথা সব খুলে বলা যায়। ভালবাসায় ভরা স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। ধীর, স্থির, শান্ত সদা হাসি মুখ ও স্বল্পভাষী। ১৪দশ সঙঘগুরু ভিতরে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, বাইরে নিরলস কর্মযোগী। যাঁর সাথে সঙ্গ করলে মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু সুযোগ খুব কমই পেয়েছিলাম। কেবলমাত্র জয়রামবাটীতে থাকাকালীন কাজের খাতিরে যোগাযোগের সুযোগ হয়েছিল। খুবই অল্প সময়ের জন্য। সেই সময় বেলুড় মঠের নির্দেশনায় তিনি ছিলেন কামারপুকুর, জয়রামবাটী মঠের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান সদস্য। সাথে ছিলেন স্বামী গীতানন্দজী ও প্রিয়লাল মহারাজ। তাঁর মধ্যে ছিল না আরামপ্রিয়তা, বিলাসিতা, ক্রোধ ও লোভ। অপরপক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি থাকা ও দরদী ভাব তাঁর জীবনে স্বাভাবিক ছিল। আর ছিলেন মিতব্যয়ী, কর্মকুশল ও ব্যবহারকুশল। অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম তাঁর কাছে। ধন্য তাঁর তপস্যা, সার্থক তাঁর জীবন। কখনই তাঁর অবদান ভুলতে পারবো না। চির অমর হয়ে রইলেন ও থাকবেন।

জয়রামবাটী মঠের উন্নয়নকল্পে বেলুড় মঠের উদ্যোগে কয়েকটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। তখন জয়রামবাটীতে অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী প্রেমরূপানন্দজী মহারাজ। মাঝে মাঝে গহনানন্দজী মহারাজ এই সব প্রকল্পের জন্য জয়রামবাটীতে আসতেন। চারটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল—১. কার পার্কিং তৈরি করা, ২. মন্দিরের সামনে দিয়ে গ্রাম্য রাস্তার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া ৩. শ্রীশ্রীমায়ের জ্ঞাতিদের বাড়ি করে দিয়ে মঠের সংলগ্ন জমি অধিগ্রহণ করা, ৪. মন্দির সংস্কার করা। এই চারটি কাজ উন্নয়ন প্রকল্পে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। গহনানন্দজী ছিলেন পরামর্শ দাতা ও কর্মকর্তা সবই। তাঁর নির্দেশেই আমরা কাজ করতাম।

কার পার্কিং তৈরি : প্রথমেই কার পার্কিংটি তৈরি করার কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল। মাতৃ মন্দিরের একটি পুকুর ছিল। নাম গয়লা পুকুর। এই পুকুরটি ছিল গ্রামের মাঝামাঝি। গোয়ালপাড়ার সামনে মেইন রোডের উপরে। এইটি ভরাট করে তৈরি করা হয়েছিল বর্তমান কার পার্কিংটি। যাত্রীদের গাড়ি রাখার জায়গা ও বিশ্রাম করার শেড তৈরি করা হয়েছিল। পাশে পুরুষ-মহিলাদের টয়লেট, বাথরুম সবই তৈরি করা হয়েছিল। এটি হওয়াতে তীর্থযাত্রীদের খুব সুবিধা হয়েছিল।

রাস্তা সংস্কার : সে সময়ে সব চাইতে বড় কাজ ছিল মন্দিরের সামনে পল্লীগ্রামের রাস্তার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া। মঙ্গল আরতির সময় গরু, ছাগল, গরুর গাড়ী ও কৃষকরা লাঙ্গল কাঁধে মাঠে যেতো। দেখতে ভাল লাগত। ছাগলগুলি ম্যাঁ-ম্যাঁ করতো। বাছুরগুলি-হাম্বা হাম্বা করতো। শুনতে খুব ভালো লাগতো। কিন্তু সকাল বেলা বলে মনে বিরক্ত হতাম সাধু-ভক্তদের জপ-ধ্যানের খুব অসুবিধা হতো বলে। পুণ্য পুকুরের পূর্ব ও দক্ষিণ পাড় দিয়ে একটি নতুন রাস্তা করে দিয়ে উক্ত রাস্তাটির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

গহনানন্দজী মহারাজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার কারণেই কার পার্কিং ও রাস্তাটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি না থাকলে কোন প্রকারেই তা সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। সেই সময়ে ছিল সিপিএম সরকার। পি.ডব্লিউ. মিনিষ্টার ছিলেন শ্রী যতীন চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা ছিলেন। নেতাজীকে খুব মানতেন। স্বামীজিরও ভক্ত ছিলেন। মহারাজজী যতীনবাবুকে দিয়ে সরকারি দানে এই দুটি প্রকল্প সম্পন্ন করেছিলেন। এ দুটি কাজে তখনকার দিনে প্রায় ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ টাকা) খরচ হয়েছিল। স্থানীয় রাজনৈতিক দল অনেকভাবে বাধার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু মহারাজের পরামর্শের ফলে শত বাধা-বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল এই কাজ দুটি শেষ করা।

জ্ঞাতিদের বাড়ি স্থানান্তর : তৃতীয় প্রকল্পটি ছিল শ্রীশ্রীমায়ের জ্ঞাতিদের বাড়ি করে দিয়ে মঠের সংলগ্ন জমি অধিগ্রহণ করা। মায়ের পিতৃবংশের তিনটি পরিবার। জয়রামবাটী মঠের ভিতরে তাঁদের বাড়ি ছিল। মঠের ভিতরে তাঁদের বাড়িগুলি থাকায় মঠের খুব অসুবিধা হতো। তাঁদের স্থানান্তরিত করতে না পারলে মঠের প্রাচীর দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তাই স্থানান্তরিত করার জন্য দ্বিগুণ জমিতে তাঁদের চারকুঠুরি পাকা বাড়ি পৃথক পৃথক করে দিতে হয়েছিল। যতদূর মনে আছে, বেলুড় মঠ এক-তৃতীয়াংশ টাকা দিয়েছিল আর বাকিটা ভক্তদের দানে। মহারাজের বুদ্ধিমত্তা ও পরিশ্রমে সম্ভব

হয়েছিল তাঁদের সরিয়ে প্রাচীর দেওয়া ও মায়ের পুরনো বাড়িতে প্রবেশ পথ তৈরি করা। পূর্বে গেটের বাইরে দিয়ে মায়ের দর্শনে মায়ের পুরনো বাড়িতে যেতে হতো। অথচ তাঁদের মধ্যে কোন প্রকার বিদ্বেষ ভাব ছিল না। খুবই আনন্দে ছিল। মঠের সাথে তাঁদের খুব ভাব ছিল। মহারাজ তাঁদেরকে ভালবেসে আপনজনের মতো করে এই কাজ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বর্তমানে মায়ের পুরনো বাড়িতে মঠের ভিতর দিয়ে যাওয়ার পথ করা হয়েছে। বাইরে দিয়েও রাস্তা আছে। চারদিকে প্রাচীর দেওয়া হয়েছে।

মন্দির সংস্কার : শেষ প্রকল্পটি ছিল মন্দির সংস্কার। ষাট বছরের পুরাতন মন্দির। ছাদ ফেটে জল পড়ত, দেয়াল সব ফেটে গিয়েছিল। গহনানন্দজী মহারাজ বেলুড়ে মঠের প্রকল্পের মাধ্যমে মন্দিরটি সুন্দরভাবে সংস্কার করেছিলেন। মন্দিরের নতুন করে ছাদ ঢালাই দিয়ে জল পড়া বন্ধ হলো। আর ৪/৫ ফুট মেঝের মাটি তুলে ফেলে দিয়ে বালু দিয়ে ভরাট করা হয়েছিল। রড ঢালাই করে মেঝে পাথর দিয়ে বাঁধাই করা হয়েছিলো। তাতে ফাটল ধরা বন্ধ হলো। এ মহৎ কাজটি গহনানন্দজী মহারাজের নির্দেশে বেলুড় মঠের সাধু ইঞ্জিনিয়ার প্রকাশ মহারাজ যত্নসহকারে শেষ করেন। ইঞ্জিনিয়ার প্রকাশ মহারাজ পরবর্তীতে জয়পুর মঠের মোহন্ত হয়েছিলেন। গহনানন্দজী মহারাজের দৃষ্টিতে অশোভন লাগায় আরো একটু সংস্কার করলেন। জয়রামবাটীতে গর্ভ মন্দিরে শ্রীমায়ের মর্মর মূর্তির নীচে বেদীতে ডানদিকে ঠাকুরকে আর বা-দিকে স্বামীজিকে বসানো হয়েছিল। এর ঠিক নীচের দিকে বসানো হয়েছিল শরৎ মহারাজকে। দেখতে ভালো লাগতো না। গহনানন্দজী মহারাজ কলিকাতার মাননীয় দেবেশ মুখার্জী নামে অভিজ্ঞ প্রকৌশলকে এনে তাঁকে দিয়ে দেয়ালে কুলঙ্গী তৈরি করে ঠাকুর, স্বামীজি ও সারদানন্দজীর ফটো বসালেন।

এই কাজগুলি মহারাজের কৃপায় এত সুন্দরভাবে হয়েছিল, না দেখলে ধারণা হতো না। মহারাজের নিষ্ঠা, কর্মতৎপরতা, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা লক্ষ করার মতো। আমার সৌভাগ্য যে এই সব বিদ্যা পরে কাজে লাগানোর সুযোগ পেয়েছিলাম। তাই মহারাজের অবদান বলে শেষ করা যাবে না। তারপরেও মহারাজের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল।

দীক্ষা : মহারাজজী অনেকবার দীক্ষা দিতে জয়রামবাটী গিয়েছেন। মঠের মন্দিরেই দীক্ষা হতো। কোন এক ভক্ত বলে দিয়েছেন মন্দিরে দীক্ষা হলে ভক্তদের দর্শন ও প্রণামের অসুবিধা হয়। এই কথাগুলো মহারাজজী রাত্রি এগারোটার সময় আমায়

বললেন, “দেখ, অমেয়ানন্দ। ডাইনিং হলে দীক্ষার ব্যবস্থা করো। তা না হলে ভক্তদের মাকে প্রণামের অসুবিধা হচ্ছে।” আমি চুপ করে ছিলাম। বললেন, অসুবিধা কি? আমি উত্তরে বললাম, ডাইনিং হলে দীক্ষার ব্যবস্থা করলে দুপুরে খাবার দেরি হয়ে যাবে। তাই করা হয় নাই। মহারাজ বললেন, একটু দেরি হলে কিছু হবে না। এতো রাত্রিতে একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি বললেন, ‘এক্ষুনি ব্যবস্থা করো যাতে কাল সকালে দীক্ষা হতে পারে।’ আমার মনের ভাব বুঝে বললেন, “নিরলস কর্মী হবে। ঠাকুরের কাজ চেষ্টা করে যাও। সময়ে হবেই হবে।” ঠাকুরের কাজ আর কিছু বলতে পারলাম না। যে করেই হোক ব্যবস্থা করলাম। সকাল ৫টার মধ্যে ডাইনিং হলো সাজানো হয়ে গিয়েছিলো। দীক্ষা হওয়ার পরে হেসে বললেন, ‘হলো তো?’ আমি তখন হেসে ফেললাম। বুঝলাম নিরলসতা কি বস্তু। তাঁর জীবনে অলসতা কি বস্তু দেখি নাই। এ প্রসঙ্গে বলি। বর্ষাকাল। রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের জন্মস্থান। যতদূর মনে হয় ৫/৬ কিলোমিটার রাস্তা। রাস্তায় হাঁটু সমান কাদা জল। গহনানন্দজীসহ আমরা প্রায় দুই ঘন্টা ধরে হেঁটে মেইন রোডে পৌঁছাই। তারপর গাড়ি করে ফিরে আসি। তখন তাঁর বয়স হবে ৭০/৭৫ বছর। নিরলস কর্মীর আর এক দৃষ্টান্ত। কাজ যত কঠিন হতো তাঁর উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যেতো। সে সময় গ্রামে-গঞ্জে একেক বারে দীক্ষা হতো ২৫০/৩০০ দীক্ষার্থীর। সময় বিকাল তিনটা-সাড়ে তিনটা বেজে যেত। কোন ক্লান্তি নাই। আমাদের কষ্ট হচ্ছে কিছু বলতেও পারছি না। তিনি বৃদ্ধ বয়সে অসম্ভবকে সম্ভব করছেন আমরা কি বলবো! অফুরন্ত উদ্যম !

অসুস্থতা : একবার চিকিৎসার জন্য সেবা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে প্রণাম করলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কি খবর’? উত্তরে বললাম, আমার শরীরটা ভাল না। শরীরে ব্যথা, ঝিমুনি, ঘুম হয় না, শুধু শুয়ে থাকতে ইচ্ছা। কাজ-কর্ম করতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। সাথে সাথে তিনি বললেন, ‘যাও ডাঃ মাঝিকে দেখাও। ফোনে বলে দিচ্ছি। মনে হয় থাইরয়েডের সমস্যা।’ তিনি ছিলেন বাইরের ডাক্তার। তিনি সেইদিন আসেন নাই। মহারাজ আমাকে তাঁর চেম্বারে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর সবরকম ব্যবস্থা করলেন। ওষুধ পত্র দিয়ে দিলেন। আশ্চর্য যে, তিনি যা বলেছেন তাই হলো। এতদিনের অভিজ্ঞতায়, সব রোগ ধরতে পারতেন। অনেক বিষয়ে মহারাজের প্রখরতা খুব বেশি ছিল। যেমন জমি সংক্রান্ত, মামলা-মোকদ্দমা, বিল্ডিং, রোগ ও চিকিৎসা, লোক চেনা আরও অনেক বিষয়ে অনেক কিছু জানতেন।

ব্যক্তিগত : আমাকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। জয়রামবাটী আসলেই ছেলে মানুষের মতো হয়ে যেতেন। খুব আনন্দে থাকতেন। স্বভাব সুলভ ভাবে খুঁটিনাটি সব খবর

নিতেন। তখন শীতকাল। তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে ঘরে ঢুকে তাঁর পায়ের কাশ্মীরী শালটি আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। আমি কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না। তিনি কি যেন ভেবে শালখানা পরিয়ে দিলেন। মনে হয় আমার গায়ে চাদর ছিল না। আর এক সময় একটি ভালো ঘড়ি আমার হাতে পরিয়ে দিলেন। ঘড়ি আমি কোনদিন পরতাম না। ঘড়িটি জামার পকেটে রাখতাম। এরপর অসুবিধা হলে হাতেই পরতে শুরু করলাম। যা হোক ওনার মধ্যে মাতৃসুলভ মমতা ছিল। তাই ব্যবহারে মধুর স্বভাবের ছিলেন। একবার কার্য উপলক্ষে যোগোদ্যানে রাত্রি বাস করেছিলাম। পরদিন সকাল বেলা ঠাকুর প্রণাম করে মহারাজের সাথে প্রাতঃভ্রমণে আশ্রমে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। মহারাজ সকলকে চকলেট দিলেন। তিনিও একটি রাখলেন। কথাবার্তা চলছে আশ্রম সংলগ্ন একটি বড় জমি বিক্রি হবে। জমিটি ছিল একটি বন্ধ হয়ে যাওয়া তেল কলের। প্রসঙ্গ চলছিল জমিটি কেনার ব্যাপারে। এরই মাঝে টিফিনের বেল বেজে উঠল, আর প্রসঙ্গ বন্ধ। সকলে চলে এলাম। যতটুকু সময় ছিলাম আনন্দে ভরপুর ছিলাম। ভবিষ্যতে জমিটি নেওয়া হয়েছিল।

শেষবার : মহারাজজী যখন শেষবারের মতো জয়রামবাটীতে মায়ের দর্শনে আসেন, তখন এক অদ্ভুত দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছিলাম আমরা সকলে। ফেরার দিন মহারাজ মাকে প্রণাম করতে মন্দিরে গেছেন মায়ের-বেদী এমন জড়িয়ে ধরলেন কিছুতেই ছাড়লেন না। যেন মায়ের সাথে কথা বলছেন। বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে জয়রামবাটীতে আর আসা হবে না। মহারাজের মুখের দিকে দেখে মনে হয়েছিল শান্ত ধীর আনন্দময়। ধন্য মহারাজ।

অনুভূতি : কলিকাতা জয়রামবাটীতে যাতায়াতের সময় প্রায়ই আমাকে যেতে হতো মহারাজের সাথে। যখনই দেখতাম তাঁর মন নির্বিষয় হতো অমনি জপ করতে আরম্ভ করতেন। সাথেই থাকতো। জপ করাটা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। গাড়িতে প্রায়ই এমন করতে দেখেছি। তখন আমাদের মন জপ করতে চাইত। তিনি ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধ পুরুষ। কখনও তাঁর মধ্যে ক্রোধ, অভিমান, অহংকার দেখি নাই, দেখেছি সর্বদা ধীর-স্থির, বিচক্ষণ, কর্মকুশল, শান্ত ব্যবহার এবং সৎগুণের অধিকারী। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এমন একজন সন্ন্যাসীকে পেয়েছিলেন, যাঁর অভাব পূরণ হবে বলে মনে হয় না। ২০০৫ সালে ঢাকা মাঠে শ্রীমন্দির উদ্বোধনের সময় তিনি ঠাকুরের ফটো নিয়ে যখন পরিক্রমা করছিলেন তখন আনন্দে বিভোর ছিলেন। আহা! এমন অপূর্ব দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আমি লাভ করেছিলাম।

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে ১৪তম সঙ্ঘাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। তাঁর দায়িত্ব পরিচালনার শক্তি, দূরদর্শিতা সর্বোপরি উদ্দেশ্য সাধনে তৎপরতা ও ঠাকুরের সেবায় আত্মনিবেদন যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব লীলা বিলাস। এমন দরদী জীবন খুব কমই হয়। মহারাজের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন ও তাঁর পূর্বের জীবনের সাথে সঙ্ঘাধ্যক্ষ জীবনকালের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল। আগের জীবনে ছিলেন সদা কর্ম-চঞ্চল, গম্ভীর, দৃঢ় ও সিদ্ধান্তে অটল, ছিল অভিভাবক সুলভ ব্যবহার। আর সঙ্ঘাধ্যক্ষ থাকাকালীন ছিল মাতৃসুলভ ব্যবহার, শিশুসুলভ আচরণ; সদা আশীর্বাদ বর্ষিত হতো। সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তদের প্রাণ ছিলেন তিনি। তাঁকে আমার বারবার স্বতঃস্ফূর্ত কোটি কোটি প্রণাম জানাই। জয় মা।

মহাপুরুষকে চোখের দেখাটাও তো পুণ্যের

স্বামী লোকনাথানন্দ

অনুসরণ করার মতো দু একজন খাঁটি মানুষ পেলে খুব সাধারণ মানুষ ও অক্লেশে অনেক কাজ করতে পারে। আমাদের দেশে সাধারণ কর্মী পাওয়া যায় অনেক কিন্তু যথার্থ নেতার অভাবে কত Man power যে নষ্ট হয় তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আমার উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপা এই যে, স্বামী গহনানন্দজীর মাধ্যমে এমনই এক আদর্শ নেতার আগমন হয়েছিল, যিনি আমার সাধুজীবনের এক অন্যতম পথ প্রদর্শক। তাই এখন ভাবি, সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে এত সেবার কাজ কি করে করতে পেরেছিলাম। সেবা প্রতিষ্ঠানের সে সময়ে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বামী দয়ানন্দজীকে—"স্বামীজি" নামে এবং পূজ্য গহনানন্দজীকে সকল কর্মী নরেশ মহারাজ বলেই ডাকতেন ও সম্মান প্রদর্শন করতেন, এতে তিনি আনন্দিতই হতেন। অন্য কিছু মনে করতেন না । তাই আমার জীবনে এমন একজন নেতা ও পথ প্রদর্শক পেয়ে আমি ধন্যই হয়েছি এবং প্রবল আত্মবিশ্বাসও লাভ করতে পেরেছিলাম। আজ আমি যেখানে পৌঁছেছি ও শিখেছি এবং যতটুকু কাজ করার চেষ্টা করেছি। তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমি পূজনীয় নরেশ মহারাজকেই দিতে চাই।

আমার জীবনের ১৯৭০ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত একটি বিশেষ অংশ সেবা প্রতিষ্ঠানে পূজনীয় নরেশ মহারাজের অধীনে কেটেছে এবং আমার সাধুজীবনের প্রসার ও উন্নতি হয়েছে।

পূজ্য গহনানন্দজীর জীবনের একটি বড় অংশ ১৯৫৮ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত কেটেছে সেবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৯৬৩ থেকে সম্পাদকরূপে। আমরা যখন তাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে পাই সে সময়ে সেবাপ্রতিষ্ঠান ও নরেশ মহারাজ যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছিল কারণ এই জন্য নয় যে তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক, তার যথার্থতা হচ্ছে তাঁর কোমল মায়াময় চরিত্রের জন্য।

আগেই বলেছি, এগার (১১বছর) কেটেছে আমার সেবাপ্রতিষ্ঠানে এবং পূজনীয় নরেশ মহারাজ আমাকে প্রায় জোর করে তুলে এনেছিলেন বেলুড় মঠ থেকে। এও শ্রীশ্রীঠাকুরের অহৈতুকী করুণার নিদর্শন। কেননা খুব ছোট বয়স থেকেই সেবামূলক কাজ করতে চেয়েছিলাম। কি করে তা সম্ভব হলো তা বলি।

পূজনীয় নরেশ মহারাজ কে আমি প্রথম চাক্ষুষ করি ১৯৬৮ সালে শিলং আশ্রমে। চেরাপুঞ্জী যাওয়ার যাওয়া আসার পথে মহারাজ দু'একদিনের জন্য শিলং আশ্রমে ছিলেন। পূজনীয় নরেশ মহারাজ সেবাপ্রতিষ্ঠানে যাবার আগে তিনি শিলং আশ্রমের কর্মী ছিলেন। কার্য উপলক্ষ্যে তিনি যখন চেরাপুঞ্জির পথে শিলং-এ আসেন তখন তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি এবং রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টি ও রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডির মেম্বার। কিন্তু বয়ঃকনিষ্ঠদের সঙ্গে তার সংকোচহীন সহৃদয় ব্যবহার ও সহৃদয় মেলামেশা আমার মনে এক চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে। ঐ সময় থেকেই তাঁর প্রতি এক সুগভীর টান অনুভব করতাম আর চিন্তা করতাম তাঁর অধীনে যদি কোন কাজে লাগতে পারি আমার জীবন ধন্য হত।

আমি শিলং আশ্রমের ডিসপেনসারীতে কাজ করতাম। সেখান থেকে ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে বদলি হয়ে বেলুড়মঠে আসি। মনে তখন ইচ্ছা যদি আবার সেবার কাজ করার করতে পারি কোন আশ্রমে। ইচ্ছা হতে না হতেই ইচ্ছেপূরণের ব্যবস্থা করে রেখে দিয়েছিলেন আমার হৃদয় দেবতা বেলুড়মঠে যেদিন পৌঁছাই, তার পরদিনই পূজনীয় নরেশ মহারাজের ফোন সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে, বললেন : "গাড়ি পাঠাচ্ছি, এখনই সেবাপ্রতিষ্ঠান চলে এসো। তোমাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে খুব দরকার।" মনে মনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম।

এত বড় বিরাট হাসপাতাল। এসে প্রথম প্রথম খুব অসুবিধায় পরলাম। খালি মনে হতো, এই হাসপাতাল এমন সুশৃঙ্খলভাবে চলছে। আমি তার ছন্দপতনের কারণ হবো নাতো? দিনরাত ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতাম আর মনে বল পেতাম পূজনীয় নরেশ মহারাজকে দেখে। তাঁকে দেখে মনে হতো এক আশ্চর্য সর্বাধিনায়ক। যিনি তাঁর নিজের যোগ্যতায় তাঁর সঙ্গে যারা আছেন তাদেরও যোগ্য থেকে যোগ্যতর করে নিয়েছেন এবং মসৃণ গতিতে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

অনেক সময়ে হাসপাতালে নানা কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছি। বিশেষ করে রোগীর আত্মীয়স্বজনরা অধৈর্য্য হয়ে নানা কটু কথা বলতেন। ক্রোধ ও উষ্মার প্রকাশ নানাজন নানান ভঙ্গিতে প্রকাশ করতেন। কিন্তু এইসব সেই সময়ে দিব্যি মোকাবিলা করেছি

শুধু মাত্র এই বিশ্বাসে যে, আমার মাথার উপর এমন একজন আছেন, যিনি আমি অপারগ হলে ঠিক সামলে নেবেন। কখনও জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হলেই তা তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। অধঃস্তন যারা তাদের প্রয়োজনে তাঁর ভূমিকা ছিল পিতার মতো। বিপদের সময় যে কোন সাধু বা কর্মীর পিছনে তিনি ভয়ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন।

মহারাজকে আমরা কোনদিন রাগতে দেখিনি। কোনদিন একটা কটূ কথাও বলতে শুনিনি। তাঁর মাথা ও মেজাজ ছিল অত্যন্ত ঠান্ডা অথচ গভীর সংবেদনশীল। হাসপাতালের কোথায় কে কী কাজ করছে সব তাঁর নখদর্পনে থাকত। তিনি যদি কাউকে কোন কাজ দিতেন, সে কাজ কেমন হচ্ছে, সে যদি বা হলো সে-খবর যদি তাঁর কাছে না পৌঁছাত, তিনি নিজেই তার কাছে যেতেন ও সে সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতেন।

১৯৭০ থেকে **১৯৮১** আমার সেবাপ্রতিষ্ঠানে সেবাকর্ম। সুদীর্ঘ সময়টিতে আমার friend, philosopher এবং guide ছিলেন পূজনীয় নরেশ মহারাজ। মানুষের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয়, কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, সে রোগী হোক কিংবা তার বাড়ির লোক, সেবাকর্মীরা বা ডাক্তার বা নার্স—তা আমাকে যত্ন সহকারে শিখিয়েছিলেন পূজনীয় নরেশ মহারাজ। কাজের সময়ে সকলকে পূর্ণ স্বাধীনতা যেমন দিতেন, তেমনি প্রয়োজনে শাসনও করেছেন। তবে সে শাসনে ভালবাসার ভাগটাই বেশী থাকত।

তাঁর শেষ অসুখের সময় প্রায় রোজই বড়িশা মঠ থেকে তাঁকে দেখতে গেছি। তিনি কোমায় থাকলেও মনে হতো তিনি তো এখনো শরীরে আছেন। মহাপুরুষকে চোখের দেখাটাও তো পুণ্যের। তাঁর পুণ্যসঙ্গের মুহূর্তগুলি চোখের সামনে ভেসে উঠতো। প্রতিদিনই আশা করতাম আজ যদি একটু চোখখুলে তাকান, যদি একটু কথা বলেন। কিন্তু সে আশা কোনদিনই ফলবতী হয়নি বরং উল্টোটাই হয়েছে। এমন কর্মময় মানুষটির এমন পরিণতি দেখে বেদনাতুর হতো প্রত্যেকেই। তাঁর শারীরিক কষ্ট চাক্ষুষ করতে না পেরে কতদিন বেরিয়ে এসেছি ওখান থেকে।

ডাঃ S.N. Roy যিনি পূজনীয় নরেশ মহারাজের রেগুলার চিকিৎসক, বলছিলেন "আজ যদি নরেশ জীবিত থাকতেন, তিনি কখনই তাঁর এ অবস্থা পছন্দ করতেন না। তাই তিনি চলে যাওয়াতে ভালই হয়েছে।"

দীর্ঘদিন ধরে যখন এমন টানা পোড়েন চলছে, অনেক ভক্ত আমার কাছে আশঙ্কা করতেন যে-সামনেই পুজো, যদি সেই সময় কিছু ঘটে যায় ? আমি তাদের এই বলে

শান্ত করতাম যে, "ঠাকুরের পূজা, তিনিই যাতে কোন বিঘ্ন না হয় তা নিশ্চয়ই দেখবেন।" তাছাড়া স্বয়ং মহারাজ কখনো কাউকে অসুবিধা ফেলতেন না। মহাপুরুষের ইচ্ছাকে ফলবতী করে দেন স্বয়ং ভগবান। সেজন্য তাঁর যখন 'মহাসমাধি' হয়, তখন মঠ মিশনের দুর্গাপূজা, কনফারেন্স, সেবা প্রতিষ্ঠানের প্ল্যাটিনাম উৎসব অনুষ্ঠান সব সুষ্ঠভাবে উদযাপিত হয়েছে। যে ক্ষণটিতে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটলো তখন সকলেই বিশ্রামরত। দিনটি ছিল রবিবার।

পূজনীয় নরেশ মহারাজ আজ নশ্বর দেহে নেই।

ঠাকুরের কাজ সেরে গিয়েছেন রামকৃষ্ণলোকে, জাগতিক সকল দায়িত্ব তাঁর শেষ হয়েছে। এখন শুরু হয়েছে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের এক নতুন অঙ্ক। গুরু স্থূলশরীরে অপ্রকট হয়ে আরো বেশী করে বিরাজিত হন বা প্রকাশিত হন তাঁর শিষ্যদের অন্তরে আর চালিত করেন তাদের মুক্তির পথে। গুরুপ্রদর্শিত পথে এগিয়েই আমরা পৌঁছে যাবো নির্দিষ্ট স্থানে। আবার যারা পথহারা তারা পথ খুঁজে পাবেন সেই আনন্দধামে পৌঁছানোর।

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দ মহারাজের স্মৃতিচিন্তন

স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ

যখন কোন যুবক রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের সকল ক্ষেত্রেই যে ঈশ্বরলাভই জীবনের লক্ষ্য এমন ধারণা দেখা যায় না। মনে পড়ে, একটি যুবক বেলুড় মঠে যোগ দিতে এল তখন তার কাছে একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী জানতে চাইলেন—সে কি জন্য রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিতে চায়? উত্তর এল সে ভগবান লাভের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘে যোগ দিতে চায়। যখন প্রশ্ন হলো—ভগবান বলতে সে কী বোঝে? তখন উত্তর দিতে সে ফাঁপরে পড়ে গেল। সত্য বলতে কি, ভগবান সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ক'জনেরই বা আছে? যা হোক একটি উত্তর দিয়ে সে কিন্তু পার পেয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণই তার ভগবান, তাঁকে সাধনার মধ্য দিয়ে সে দর্শন পেতে চায়। অন্যদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় তাদের কাছে বর্তমান সমাজচিত্র ত্যাগ-বৈরাগ্যের অনুকূল নয়। ত্যাগ-বৈরাগ্যের সংস্কার নিয়ে যারা জন্মেছে তারা এই সমাজের পরিবেশকে ত্যাগ করতে চায়। তারা সংসার ত্যাগ করে, পারিবারিক জীবনের বন্ধন কাটিয়ে একটি আদর্শ-জীবনের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের জীবন দেখে বা তাঁদের সংস্পর্শে এসে দেখতে পায়, মানবসেবায় নিজেদের উজাড় করে দেওয়াতেই জীবনের সার্থকতা রূপায়িত হচ্ছে। ক্রমে দেখতে পায় ঐ মানুষের সেবাই ঈশ্বরলাভের নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। স্বামী গহনানন্দ মহারাজের জীবনধারা দর্শন করে ঐ ধারণা আমাদের পরিষ্কার হয়ে যায়।

ছাত্রাবস্থায় স্বামী গহনানন্দজী, অন্য নাম পূজনীয় নরেশ মহারাজ—তাঁর কথা শুনেছি স্বামী শান্তিময়ানন্দজী (আত্ম মহারাজ), স্বামী হিতানন্দজী প্রমুখ সন্ন্যাসীদের মুখে। দর্শনও পেয়েছি অনেকবার সঙ্ঘে যোগ দেওয়ার পর। কয়েক বছর পর ১৯৫৯ সালে যখন শিলং আশ্রমের কর্মী হয়ে স্বামী সৌম্যানন্দজী মহারাজের কাছে গিয়েছি, ঠিক ঐ

সময়ে পূজনীয় নরেশ মহারাজও শিলং ছেড়ে অন্যত্র বদলী হয়ে চলে গেলেন। শিলং এর ভক্ত মণ্ডলীর কাছে তাঁর সুন্দর জীবন, কর্মকুশলতা ও পাঠ-আলোচনাদিতে আকর্ষণীয়তা সম্বন্ধে অনেক শুনেছি। তিনি আমাকে আগেও অনেকবার দেখেছিলেন যখন আমি বেলুড় মঠে তখনকার প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের স্বল্প সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ক্রমে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের সঙ্গে ভাল পরিচয় হয়ে গেল। তাঁর জীবন কত সুন্দর তা লক্ষ্য করতাম যখন তিনি কলকাতা সেবা প্রতিষ্ঠানের পূজনীয় দয়ানন্দজী মহারাজের সহকারী ছিলেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে সেবার কাজে রত থাকতেন। ক্ষুদ্র "শিশুমঙ্গল" তাঁদেরই অদম্য প্রচেষ্টায় চিকিৎসায় নানা বিভাগ খুলে সর্বসাধারণের জন্য "সেবা প্রতিষ্ঠান"-এ রূপান্তরিত হলো। একদিকে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিনের জপধ্যান যেমন চলছিল, তেমনি নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন রোগীর সেবায় যাতে ত্রুটি না থাকে তার দিকে তীব্র নজর ছিল। নূতন যুবকেরা যখন সাধু হতে আসে, তখন ঐ রকম জীবন দেখেই নিজেরা অনুপ্রাণিত হয়। বইপত্র পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হলেও ঐ জাতীয় জীবনযাপন সাধু জীবনকে অনুপ্রাণিত করে এবং ঈশ্বরলাভই যে জীবনের লক্ষ্য তাও মনে ও প্রাণে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রিত শিষ্যদের বা শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত সাধুদের দর্শন করার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরা তাঁদের অনন্যসাধারণ জীবনযাপন দেখে ধন্য হয়েছেন। এর পরবর্তী প্রজন্মের সাধুদের মধ্যে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ছিলেন অন্যতম। অসীম ধৈর্য নিয়ে তিনি সকল অবস্থায় অবিচলিত থেকে যেভাবে বহুবিধ দায়িত্ব পালন করেছিলেন সে তো আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। ঠাকুর, মা তাঁর হাত ধরে এ সকল কর্ম সম্পন্ন করিয়েছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছে। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের বর্তমান উন্নতি তাঁরই দূরদর্শিতার পরিচায়ক। বাস্তববুদ্ধিও তাঁর ছিল সুতীক্ষ্ণ। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিজেও নানাভাবে উপকৃত হয়েছি এবং সঠিক পথে চলতে উৎসাহিত হয়েছি। তাঁর সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে অনেক তর্ক করেছি, আমার সব কথাই ধৈর্যের সাথে শুনেছেন, কখনও আমার কথায় যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন, সেটা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আজ আমি স্মরণ করছি।

যখন বেলুড় মঠের Training Centre এর আচার্য ছিলাম তখন কোন সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছি, তিনি আমার সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করেছেন এবং

কখনও একমত হতে না পারলেও খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আমার সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। রামহরিপুরের অধ্যক্ষ থাকাকালে আমার আমন্ত্রণে তিনি একবার রামহরিপুরে এসেছিলেন। তিনি তখন বেলুড়মঠের জেনারেল সেক্রেটারি। ক্ষুদ্র কেন্দ্রের ক্ষুদ্র আয়োজনকে তিনি এত সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছিলেন তাতে অভিমান বা পদাধিকারের কোন চিহ্নমাত্রও ছিল না। তাঁর অমায়িক আচরণ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার ছিল—দেখতে পেলাম শ্রীশ্রীমায়ের কথার প্রতিরূপ—যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। ছয় বছর আমি ছিলাম বেলুড় মঠের Working Committee-র একজন সদস্য। কর্তৃপক্ষের একজন হয়ে তিনিও Meeting গুলিতে থাকতেন। অনেকবার মতবিরোধ হয়েছে আমার সঙ্গে official সিদ্ধান্তের। প্রতিবারই দেখেছি তিনি ও অন্যেরা আমার মতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। একবার অন্য প্রসঙ্গে স্বামী গহনানন্দজী আমাকে বলেছিলেন—তুমি পূজনীয় স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের সেবা করেছ আর এটি জান না কিভাবে প্রাতঃরাশ পরিবেশন করতে হয়। সত্যি, তাঁর কাছে থাকলে জীবন গঠনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলির অনেক সংশোধন করা যায়।

তিনি যখন বেলুড় মঠের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন তখনই ১৯৯১ সালের ২৫ জুলাই আশ্রম খোলার দায়িত্ব পেয়ে মস্কোতে আসি। সেদিনের দায়িত্ব দেওয়ার কথাটি মনে পড়ছে। তিনি বললেন—তোমাকে সাগরপারে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। আমি হেসে বললাম—পাঠিয়ে দিন।—তুমি তো জিজ্ঞেসই করলে না কোথায় পাঠাবো তোমাকে। বললাম—তাই তো জিজ্ঞেস করিনি। বললেন—মস্কোতে পাঠাবো তোমাকে। অবশ্য সাগরপার নয় মস্কো, তাহলেও বড়দের কথায় ধৃষ্টতা দেখানো শোভা পায় না। শরীরে কোন গোলমাল থাকলে মেডিকেল টেস্ট করে নাও। অবশ্য কিছু গোলমালের কথা বলাতে সঙ্গে সঙ্গে সেবা প্রতিষ্ঠানে ফোন করে আমার পরীক্ষাদির ব্যবস্থা করে দিলেন। একটি হার্ণিয়া অপারেশন হলো, এরপর থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘদিন আর কোনও পেটের যন্ত্রণায় ভুগতে হয় নি। অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, ক্লান্তিহীন সেবা এবং সর্বোপরি সুষমামণ্ডিত আত্মিকজীবন—এই ছিল তাঁর মধ্যে অনুকরণীয় আমাদের সকলের জন্য।

১৯৯১ এর আগষ্ট মাসে লণ্ডন থেকে ফেরার পথে একবার মস্কো এসেছিলেন। মাত্র কিছুদিন আগে আমি এসেছি এদেশে। একটি একুশতলা বাড়ির উপর তলার একটি ফ্লাটে থাকি আমি। মস্কো সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিও না। ডাঃ রিবাকভ ব্যবস্থা

করেছেন মহারাজের থাকার জন্যে একটি হোটেলে যেখানে শিক্ষাবিদরা থাকেন। সেন্ট পিটার্সবুর্গেও একদিন ঘুরে এলেন। মস্কোতে সাংবাদিকরা রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর মতামত নিয়েছিলেন। তাঁকে মস্কো শহর ঘুরিয়ে দেখানো হলো, সংবাদপত্রে বড় করে তাঁর ছবি দিয়েছিল। কিছু রাশিয়ান বন্ধুরা দেখা-সাক্ষাৎ করে গেলেন।

২৮ বছর ধরে বিদেশে থাকায় তাঁর পূত সান্নিধ্য খুব বেশী পাওয়ার সৌভাগ্য হয় নি। পূজনীয় প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালনেও তিনি শরীরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কত দুর্গম স্থানে যেতেও তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের করুণা বিতরণে কোন কষ্টকেই তিনি কষ্ট বলে মনে করতেন না। তাঁর মহান জীবনের উদ্দেশ্যে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাই, আর প্রার্থনা করি, তাঁর মতো সঙ্ঘের সেবায় যেন শেষদিন পর্যন্ত নিরত থাকতে পারি।

তার কিছু মজার গল্প

স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ

স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী মহারাজের দেহ যাবার কিছুদিন আগে বেলুড়মঠ স্থিত অখণ্ডানন্দ ভবনে স্বামী তৎপরানন্দজী মহারাজ উনার একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সম্পর্কে কিছু বলার জন্য। সেই সাক্ষাৎকারের অংশটি video আকারে প্রকাশ করা হয়, যেটা এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো।

পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ বেশি কথা বলতেন না। খুব গম্ভীর মানুষ ছিলেন, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে কখনও কখনও তাঁর কিছু humour হঠাৎ হঠাৎ প্রকাশ হত। আমরা শুনে মজা পেতুম, দুটো একটা ঘটনা মনে পড়ছে।

একবার আমরা মেদিনীপুরে সুরাটপুর বলে একটা লোকশিক্ষা পরিষদের শাখা নরেন্দ্রপুরের দ্বারা পরিচালিত হয়, নরেন্দ্রপুর বিবেকানন্দ লোক পরিষদ ওটা (মেদিনীপুরে) তারই একটা শাখা, সুরাটপুর লোকশিক্ষা পরিষদ, সেখানে কোনো একটা উৎসবের সময় হবে, আমরা কয়েকজন যাচ্ছি, যতদূর মনে হচ্ছে ওদের যে স্কুল বিল্ডিংটা আছে, তার সেকেন্ডারি বিভাগের ভিত্তি স্থাপন হবে। শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, প্রণবেশ চক্রবর্তী, নন্দদুলাল চক্রবর্তী ছিলেন। আমরা সকলে একসঙ্গে যাচ্ছি। উনি তখন Asst. Secretary (সহ-সম্পাদক) ছিলেন। উনি সেবাপ্রতিষ্ঠান এবং বেলুড়মঠ দু জায়গায় যাওয়া আসা করতেন, ঠিক মনে নেই যে তিনি বেলুড়মঠ থেকে যাচ্ছিলেন, বা সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে যাচ্ছিলেন। আমার যতদূর মনে হয় সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে যাচ্ছিলেন। আমি তখন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ছিলাম, যাওয়ার পথে মেচেদা স্টেশনের পরে যে গাড়িটায় আমরা যাচ্ছিলাম তার একটা চাকা পাংচার হয়ে যায়। ওনাকে একটা ছায়া জায়গায় বসাবো বলে ভাবছি। ওনাকে বসিয়ে চাকাটাকে সারানো হবে। দেখা গেল, পাশেই একটা বাড়ি, সেখানে একটা বাগান মতো আছে। ওদের গিয়ে বললাম এখানে একটু ছায়ায় বসতে পারি, দুটো একটা নারকেল গাছ আছে। উনি বললেন, তোমরা তো বসবে বলছো গৃহকর্তার অনুমতি আছে কিন্তু যে গাছটার তলায় বসছ

তার অনুমতি নিয়েছ কি? নাহলে উপর থেকে মাথায় পড়বে। শিবু চক্রবর্তী বললেন, 'নারকেল'। মহারাজ বললেন, নারকেলই পড়বে। তবে নারকেলের নাকি ধর্মবোধ আছে, সে মানুষের মাথায় পড়ে না। তার চোখ আছে, খুব মজা করলাম হাসতে হাসতে, ইতিমধ্যে চাকা তো সারানো হয়ে গেল। এখান থেকে তো যাত্রা শুরু করলাম, গিয়ে সুরাটপুর অনুষ্ঠান শেষ করলাম। সঙ্গে তমলুকের মোহান্ত মহারাজ ছিলেন। ফিরতে ফিরতে ওখানে সন্ধে হয়ে গেছে।

আমরা লঞ্চঘাটে এসে পৌঁছলাম। তখন লঞ্চঘাটের নৌকা পেরতে হত, ওই নদীটা পেরবো নৌকাতে, ওপারে আমাদের গাড়ীটা রাখা ছিল। নৌকা পেরিয়ে ফিরে এসে দেখি গাড়িটার আর একটা চাকা পাংচার হয়ে গেছে। মহারাজ বলছেন, দেখ ভিতরে যে সেট্‌পনিটা আছে সেটাও দেহ রেখেছে কিনা। কথাগুলো এমনই ছিল। দেহ রেখেছে মানে সেটাও অযোগ্য হয়ে আছে কিনা। দেখা গেল যে সেটি ঠিক আছে। তারপর বলছেন এটিকে ঠিক করো। পাশে একটা সারাবার জায়গা ছিল। কিন্তু তখন Electricity-র সুবিধা ছিল না। স্টোভ জ্বেলে একটা প্লেট গরম করে তার উপরে তাপ্পি লাগানোর ব্যবস্থা করা হলো। মিস্ত্রী বলল যে, একটু সময় লাগবে আপনারা একটু বসুন। নারকেল দড়ি দিয়ে বানানো একটি খাটিয়া আমাদের এনে দিল সেখানে বসবার জন্য। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমরা দু-একজন বসে পড়লাম। আমরা বলছি মহারাজ আপনিও বসুন। নারকেল দড়ি দিয়ে বানানো একটি খাটিয়া আমাদের এনে দিল সেখানে বসবার জন্য। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমরা দু-একজন বসে পড়লাম। আমরা বলছি, মহারাজ আপনিও বসুন। উনি পায়চারী করছেন। উনি বলছেন, না না তোমরা আরাম করে বস, আমার বসার দরকার হবে না। আমি একটু বেড়াই, পায়চারী করি। বার বার অনুরোধ করা হচ্ছে উনি কিছুতেই বসছেন না। এর মধ্যে নন্দদুলাল চক্রবর্তী উঠে পড়ল। বলল, ইস্ কি একটা কামড়াচ্ছে মনে হলো, এই তোমার খাটে ছাড়পোকা আছে নাকি। মহারাজ বলছেন, আরে আমি তো এই জন্যই বসছিনা, আমি তো আগে থেকেই জানি, খাটটা সজীব, ওর মধ্যে জীব আছে, তোমরা আরাম করে বসো। খুব মজার মানুষ ছিলেন।

আমি তখন আঁটপুরে আছি তখন একটা ছোট অস্টিন গাড়ী ছিল। অনেক পুরানো। দেখতে ছোট্ট, মহারাজ বলতেন, তোমার ওই গুবরে পোকাটি কি চলে? আমি বললাম, হ্যাঁ মহারাজ ওটা চলে। আমি তো ওটা করেই মঠে যাওয়া আসা করি। ওটা নিয়ে আমি বাঁকুড়া পর্যন্ত গেছি। বললেন, বাহঃ! গুবরে পোকা ধীরে ধীরে চলে তো কিন্তু খুব শক্ত।

মহারাজ একবার গেছেন, দীক্ষা হয়েছে। Interest নিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, তোমার

নাকি একটা গাড়ী আছে হে, ছোট্ট গাড়ী। আমি বললাম, একজন দিয়েছে ওটা বললেন, সীটগুলো খুব শক্ত, আমি বললাম না নরম। বললেন তাহলে কাল সকালে ওই গাড়িটাতে চড়ে একটু বেড়াতে যাব, উনি বেড়াতে গেছেন, বেড়িয়ে ফিরে এসেছেন। এসে গহনানন্দজী বলছেন, তোমার গাড়ীটা চড়ে খুব খুশী। আমাকে মন্তব্য করেছিলেন, আমিও খুব খুশী, Enjoy করেছি। তুমিও শুনে রাখ অজিতের গাড়ীতে বেরিয়ে তো রাজপুরীর দিকে যাচ্ছিলাম। রাজা বলল, দেবীর দর্শন করব। গেলাম একটু ফিরে এলাম রাজা বল্লভীর দর্শন হলো না। তা ফিরে এসে এ গাড়িটা আমার কাজ দিয়েছিল, গাড়ির হর্ণ বাজাতে হয়নি। হর্ণ বাজালে যে মানুষের একটু অস্বস্তি হবে, চমকে উঠবে এসব করতে হয়নি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন মহারাজ? উনি বললেন, যে অনেক দূর থেকে একটা এমন শব্দ গাড়িটার হতো, যাতে লোকে বুঝতেই পারত যে একটা কি আসছে। অমনি রাস্তা ছেড়ে দিত। খুব মজার কথা গুবরে পোকাটার হর্ণ লাগবে না। দূর থেকে আসছে এমনি তার কাজেই লোকে বুঝতে পারবে।

মহারাজের অপূর্ব ধৈর্য্য। উনি ভাবপ্রচার পরিষদের সঙ্গে প্রথম থেকেই খুব যুক্ত ছিলেন। যেখানে যেখানে ভাবপ্রচার পরিষদের মিটিং হতো সেই মিটিং-এ উনি নিজেই যেতেন। স্বামী প্রভানন্দজী এনারা সব। একবার স্বামী প্রভানন্দজী আছেন, গহনানন্দজী মহারাজ আছেন, শিবশঙ্কর চক্রবর্তী আছেন, প্রণবেশ চক্রবর্তী ও সাংবাদিক হিসাবে যেতেন সঙ্গে। বহির পাই বলে একটি গ্রাম, দুদিক দিয়ে মুক্তেশ্বরী নদী গেছে, সে পশ্চিম প্রান্ত থেকে গ্রামটা। সেখানে নদী পেরিয়ে গ্রামে যাওয়া। ঐ গ্রামে সারাদিনই ছিলাম প্রায় পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। সেখানে একটা উৎসব চলে। দুপুরের খাওয়া দাওয়া বিশ্রাম সব ওখানে, রাত্রিতে নৌকা করে সন্ধ্যার পর প্রায় পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটা হবে তখন নৌকায় চাপলাম। ছ'টার সময় নৌকা পেরিয়ে এপাশে এলাম, গাড়ি নিয়ে আসছি। দুটো গাড়ি ছিল আমাদের। শেয়াগড় বলে একটা জায়গা আছে। শেয়াগড় থেকে আমরা বাম দিকে ঘুরে উদয়নারায়ণপুর হয়ে চলে আসব। মহারাজ চলে যাবেন বেলুড়মঠে, আমরা আঁটপুরে ফিরে যাব। হঠাৎ শেয়াগড় থেকে দু-এক কিলোমিটার আসার পর গাড়ির লাইটটা বন্ধ হয়ে গেল। মহারাজ বলছেন, 'কি হবে?' আমি বললাম 'মহারাজ আর একটি গাড়ি ভালো আছে। আপনি এটা করে চলে যান। আমরা এটা পরে সারিয়ে নিয়ে যাব। গাড়ি ফিরে যাবে পরে।' মহারাজ বলছেন, 'তা কি হয়, এক যাত্রায় পৃথক ফল। সেটা হবে না। এক সঙ্গেই যাব।' অনেকক্ষণ হয়েছে, আশেপাশে কোন বাড়িঘর নেই। একটা ফাঁকা মাঠ। কোন লোকজন নেই। কেউ যাচ্ছেও না, রাত্রি প্রায় দশটা হয়ে গেছে। মহারাজ অযথা এখানে দাঁড়িয়ে কোন উপায় তো দেখছি না। বলছেন দাঁড়াও দাঁড়াও উপায় দেখছি না তো কি, উপায় তো একটা হতেই পারে,

অযথা তোমরা ব্যস্ত হচ্ছ কেন? উনি ঘোরাফেরা করছেন, আমরা তো ব্যস্ত হচ্ছি। খবর দেব কাউকে। একবার মনে হলো এখানে একজন কংগ্রেসের নেতা সরোজ খাঁড়ার বাড়ি আছে। সেই ভদ্রলোককে একটু খবর দিলে সাহায্য করতে পারে কি না। এরকম ভাবছি, এমন সময় তখন প্রায় আধঘন্টা হয়ে গেছে সেই সময় একটা পাগলা মতো মানুষ সাইকেল করে গান গাইতে গাইতে আসছে, হাতে একটা ঠোঙা। এসেই দেখছে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সে মজা করে বলছে, কি হলো গাড়ি খারাপ। মহারাজ বলছেন, খারাপ তো বটেই, তুমি কিছু করতে পারবে। সে বলছে আমি তো কতই এরকম করি। এই রাস্তায় ঘুরে ফিরে বেড়াই কত গাড়ি খারাপ হয়ে যায়, কত গাড়িকে ভালো করে দিই। দেখোনা আমাদের এই গাড়িটা ভাল করতে পার কিনা? বলছে, কই যন্ত্রপাতি কোথায়? সাইকেলটা রেখে দিয়ে রাস্তার পাশে হাতের ঠোঙাটা রেখে দিয়ে সে ড্রাইভারের যে যন্ত্রপাতি ছিল সেগুলো নিয়ে খুটখাট এটা ওটা করতে করতে হঠাৎ আবার সেই আলো জ্বলে গেল। লোকটা নিজেই খুব আনন্দ করছে। মহারাজ বলছেন, বাহ্ তুমি তো আমাদের আলো জ্বালিয়ে দিলে। লোকটা বলছে জ্বালিয়ে দিলুম, ড্রাইভার কোথায়? ড্রাইভার বলছে এই আমি। তুমি খুব আস্তে আস্তে চালাবে কিন্তু গাড়ি বেশী জোরে চালালেই আবার বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর আমিও থাকবো না, তুমিও কিছু করতে পারবে না। মহারাজ বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। তোমাকে এখন কি দিতে হবে? লোকটি বলল কিছু দিতে হবে না। ইতিমধ্যে সাইকেলটার পাশে যে ঠোঙাটা রেখেছিল। সেই ঠোঙাটা নেই, বলছে যা আমার তেলেভাজাটা ছিল, ইঁদুর নিয়ে পালিয়ে গেল। মহারাজ বলছেন, যে আহারে ওকে কিছু টাকা দাও, ও কিছু খাবার কিনে খাবে। বলছে না, না, না এই আলো জ্বেলে দিয়েছি ওতেই সব ঠিক হয়ে গেছে। আমার আর খাওয়ার দরকার নেই, বলে পাগলা সাইকেল চালিয়ে চলে গেল। মহারাজ বললেন, দেখলে তো, বলেছিলাম দেখো না কি হয়, কেমন মজা হলো। ওই লোকটা কে, তাও জানিনা। কোথা থেকে এল, তাও জানি না, আলো জ্বেলে দিল, চলে গেল, চলো আমরা এখন যাই, এই যে মহারাজের ধৈর্য্য, তার সঙ্গে যে সহনশীলতা। ওই লোকটি সম্বন্ধে তাদের ধারণা, তার ব্যবহার তিনি বার বার বলছেন। সেই লোকটিকে বার বার মহারাজ অনুরোধ করলেন তাও তিনি টাকা পয়সা নিলেন না। মহারাজ বললেন, দেখলে তো, এরকম লোকও জগতে আছে।

মহারাজকে নিয়ে আমরা অনেক জায়গায় গেছি। অনেক রকম পরিস্থিতিতে। এর একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে। মহারাজ তখন সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ (Vice-President) হয়েছেন। উনি গৌহাটি থেকে ইটানগরে যাবেন। গিয়েছিলেন আবার ফিরে আসতে

হয়েছে গোলপার্কে, স্বামীজির মূর্তিটা ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হবে তার জন্য। এমন দিন ঠিক হয়েছে যে উনি এসেছেন বিকাল বেলার দিকে পৌঁছেছেন। পরের দিন সকালবেলা ওটা প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলেই আবার ফিরে যেতে হবে সকাল বেলা, বিকালের মধ্যে ওনাকে গৌহাটি পৌঁছাতে হবে। সেই দিনই গৌহাটি থেকে একটা হেলিকপ্টার যাবে ইটানগরে। পরের দিন গেলে হবে না। মহারাজের বিশ্রাম নেই। উনি এসেছেন, এসে আবার গোলপার্ক যাচ্ছেন সকালবেলা। ওখান থেকে ফিরে এসেই বেরিয়ে যাবেন Airport-এ। খুব ব্যস্ত। মুশকিল হলো Airport-এ যাওয়ার আগে সকালবেলা সব মাল (জিনিসপত্র) পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেদিন না গেলে বিকালের হেলিকপ্টারটা পাবে না। ইটানগরে যে উৎসব হবে ওনাকে সেই দ্বিতীয় দিনে পৌঁছাত হবে। কি করা যাবে। সন্ধ্যা ছটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত সেদিন মমতা ব্যানার্জী একটা বন্ধ ডেকেছে। আমরা জিনিসপত্র ভর্তি করে Airport-এ আগে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর মহারাজকে নিয়ে কোথাও যাওয়ার হলে উনি এত দেরী (Late) করতেন। মহারাজ সময় হয়ে গেছে। সময় হয়ে গেছে তাতে কি আছে। সময় ঠিক আমাকে অনুসরণ (follow) করবে। আমি সময়ের পিছনে দৌড়তে যাব কেন? এই ছিল তাঁর কথা। অদ্ভুত মানসিক শক্তি ছিল। সেদিন কিন্তু প্রায় ফেল করে গেছে। গাড়ি চলে গেছে আমরা যখন বেরিয়েছি তখন ছটা বেজে গেছে, তখন বন্ধ শুরু হয়ে গেছে। যোগোদ্যান থেকে উনি বেরিয়ে উল্টোডাঙা যেতেই দেখা গেল রাস্তা বন্ধ, আর যাওয়া হবে না। ভি.আই.পি রোড দিয়ে সমস্ত বন্ধ করে দিয়েছে। মহারাজ কি করবেন! ওখান থেকে দশটার সময় প্লেনটা ছাড়বে, মহারাজ সকাল সকাল চলে এসেছেন গোলপার্ক থেকে বেরোতে একটু দেরী হয়ে গেছে, কিন্তু তার মধ্যে এরা বন্ধ শুরু করে দিয়েছে। মহারাজ বলছেন, দেখ কি করা যায়। উল্টোদিকের রাস্তায় এদিকে মুখ করে কতকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। ট্যাক্সিওয়ালাকে গিয়ে ধরলাম। মহারাজের গাড়ি যোগদ্যানের গাড়ি। ভি.আই.পি গাড়ি এ.সি গাড়ি কত আরামে মহারাজকে নিয়ে বেরিয়েছি। মহারাজ বললেন, আরাম টারাম এখন রাখো। এখন কোনরকম করে পৌঁছতে হবে। গাড়ি দেখ কি করা যায়। একটা ট্যাক্সিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম ওহে ও অন্য কোন রাস্তা আছে, যে রাস্তা দিয়ে বন্ধকে এড়িয়ে মহারাজকে নিয়ে এয়ারপোর্ট পৌঁছাতে পারি। ট্যাক্সিওয়ালা বলছে হ্যাঁ রাস্তা আছে। তখন ওই নিউটাউনের পাশে হচ্ছে পরিকল্পনা আর রাস্তা তখনও পিচ হয় নি। বড়ো বড়ো খোয়ায় ভর্তি রাস্তাটা ট্যাক্সিওয়ালা বলছে ওই রাস্তা দিয়ে যেতে পারি সময় লেগে যাবে। সময় লাগবে মানে সাড়ে দশটার মধ্যে পৌঁছে দিতে পারবে তো? ট্যাক্সিওয়ালা বলছে আমি চেষ্টা করতে পারি। চেষ্টা করতে পারো বলো কত নেবে? বলল চারশ টাকা নেব। আচ্ছা ঠিক আছে। মহারাজকে

বললাম, সপ্তর্ষি মহারাজ ছিলেন। আমি আর সপ্তর্ষি। ট্যাক্সিওয়ালা নিয়ে সেক্টর ফাইভ দিয়ে ঘুরে গেল। আমরাই অস্থির হয়ে যাচ্ছি। মহারাজের তো কষ্ট হচ্ছে। মহারাজ মুখে কোন একটি কথা বলছে না। এতো Tension (উৎকণ্ঠা) আমরাও কিছু বলছি না। সপ্তর্ষি মহারাজ একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে, মহারাজকে প্লেনটা ধরাতে পারবে কিনা। বার বার ওখানে থেকে জয়তোষ বলে একজন অফিসার ফোন করছে। বলছে মহারাজ কোথায়? কতদূরে আছেন? আটকে রেখেছে। ওরা পাঁচ মিনিটের বেশী সময় দিতে চাইবে না, সপ্তর্ষি মহারাজ বুঝলেন, মহারাজের খুব Tension হচ্ছে। চুপ করে রইলাম। আমরা কিছু কথা বলছি। মহারাজ বলছেন, আহঃ তোমাদের বললাম চুপ করে থাকো। তোমরা কথা বলছো কেন? আমরা আবার চুপ করে গেলাম। গাড়ি ঘুরে ঘুরে যখন কেষ্টপুরের রাস্তায় উঠল ওদিকে গাড়ি যেতে পারছে কিন্তু এদিকে আসতে পারছে না। তখন মাত্র তিন-চার মিনিট বাকি আছে প্লেন ছাড়ার সময়। ওখান থেকে প্রায় চার কিলোমিটার বাকি আছে। তারপরে তো কোন রকম করে বলে পারবে তো পৌঁছাতে। ট্যাক্সিওয়ালা বলছে আমি তো বলেছি আপনাদের চেষ্টা করব আমি। আরে তুমি তো চেষ্টা করবে কিন্তু আমাদের ধরিয়ে দিতে পারবে কিনা। চেষ্টা তো তোমার সব ঠিক আছে। ট্যাক্সিওয়ালা বলছে, মহারাজ আপনি বসুন আমি দেখি কি করা যায়। মহারাজ বলছেন, কি দেখছো তুমি? এখান থেকে কিছু দেখতে পাচ্ছ প্লেনটা কত উপরে উঠে যাচ্ছে। আমি তো ভাবছি প্লেন এক্ষুনি উঠে চলে গেল। এসব বলতে বলতে যখন গিয়ে পৌঁছালাম ওরা তখন দাঁড়িয়ে আছে জয়তোষ এবং আরও দুজন অফিসার। ওরা বলছে, মহারাজ এই গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে। এটা Airport-এর গাড়ী। আপনি এটাতে উঠে পড়ুন। ওরা গাড়ীটা তৈরী করে রেখেছে। গাড়িটা মহারাজকে নিয়ে সোজা প্লেনের ওখানে চলে যাবে। সিকিউরিটি চেক আপ হলো না। মহারাজ গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, সপ্তর্ষি মহারাজ বলছেন খুচরো তো নেই সেই পাঁচশ টাকার একখানা নোট আছে। মহারাজ বলছেন, আরে ওইটাই দাও। একশ টাকা ওকে প্রাইজ দাও। ওটা ওর প্রাইজ হয়ে যাবে। ওটা আর ফেরত চেও না, তুমি চলো। সপ্তর্ষি মহারাজকে বলছেন, তুমি গাড়িতে ওঠো। মহারাজের এত উৎকণ্ঠা আগে কখনও দেখিনি। ট্যাক্সিওয়ালা বলছে মহারাজ আপনাদের খুব কষ্ট হলো। বললেন, চুপ করো কষ্ট হলো। প্রাণ রক্ষা হলো, মান রক্ষা হলো, আর বলে কষ্ট কষ্ট। এখানে কোনো মূল্য নেই। এইরকম ছোট খাটো কথা বলতেন, যেটা খুব ভালো লাগত।

বিশাল হৃদয়বান, তেজোময় এবং মহৎ কর্মযোগী

স্বামী চেতনানন্দ

আমি ১৯৫৮-৬০ সাল থেকে স্বামী গহনানন্দজীকে জানি, যখন তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সহায়ক সচিব ছিলেন এবং স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজ সচিব ছিলেন, আমি সেই সময় অদ্বৈত আশ্রমে মাত্র যোগদান করেছি।

একটি কথা এখনও আমার মনে পড়ে, আমার বগলে ফোড়া হয়েছিল, আমি সেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার জন্য যাই। সেই সময় সেখানে একটি সিমেন্টের চালাঘরে হাসপাতালের কাজকর্ম চলত, বর্তমানে যা বিশাল অট্টালিকায় পরিণত হয়েছে। আমাকে বগলের ফোড়ার সার্জারীর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

স্বামী গহনানন্দজী প্রায়ই অদ্বৈত আশ্রমে আসা যাওয়া করতেন। সুতরাং আমার ওনার সঙ্গে পরিচয় ছিল। তিনি একজন মহৎ সন্ন্যাসী, মহৎ কার্যকর্তা, প্রেমিক ও জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিশীল সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে যে সমস্ত মিশনের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীরা কাজ করেছেন, তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম।

১৯৭০ সালে হয়তো আগষ্ট কিংবা সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। কলকাতার চার দিক বন্যায় পরিণত হলো। রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণকার্য আরম্ভ করল এবং আমি অদ্বৈত আশ্রমের পক্ষ থেকে এই ত্রাণ কার্যের দায়িত্বে ছিলাম। এই সমস্ত জায়গায় কাজ করার জন্য নৌকোর প্রয়োজন হলো, তাই বেলুড় বিদ্যামন্দিরে নৌকোর ব্যবস্থা করার জন্য এসেছিলাম, সেখানে জনৈক এক ভক্ত খিচুড়ী বিতরণ করার জন্য একটি ট্রাকের ব্যবস্থাও করে দিলেন।

সেই নৌকো উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব কলকাতায় বন্যাগ্রস্ত অঞ্চলে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন ছিল। এই কাজের জন্য এখন আমাদের ত্রানের সামগ্রী হিসাবে খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন ছিল, সুতরাং আমি এই সম্পর্কে স্বামী গহনানন্দজীর সঙ্গে আলোচনা করি।

তিনি বললেন, “কতজন লোকের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে?” আমি বললাম, মহারাজ চারদিকে বন্যায় প্রায় প্রত্যেকটি বস্তি, কুঁড়েঘর, চালাঘর জলের তলায়, ঐ সকল লোকেরা হাই স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে। প্রায় ৪০০-৫০০ জন লোক সেখানে আছে, তারা ক্ষুধার্ত, তাদের খাদ্যের প্রয়োজন।” উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “ঐ সকল লোকের খাদ্যের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।” উনি হাসপাতালের ৩০ জন নার্সকে এই সেবাকাজে নিয়োজিত করলেন। খিচুড়ী রান্নার জন্য বেলুড় মঠ থেকে বিশাল বিশাল কন্টেনার আনা হলো। আমি কয়েকটি কন্টেনারকে অদ্বৈত আশ্রমে নিয়ে যাই, কারণ সেখানে এই ধরণের সুবিধা ছিল না। তারপর দুপুরবেলা প্রায় ২টো-৩ টের মধ্যে খিচুড়ী ভরা ড্রামগুলোকে সেই ট্রাকে চাপিয়ে দেওয়া হলো, আমিও সেই ট্রাকে চেপে সেই সমস্ত জায়গায় গেলাম, সাধারণতঃ দুর্ভিক্ষ বা বন্যাগ্রস্ত অঞ্চলে চুরি, ডাকাতির ঘটনা ঘটে থাকে, সেই সময় সেখানেও এই ধরণের উপদ্রবও হচ্ছিল। আমাকে দেখে এই সকল লোকেরা এমন কিছু উপদ্রব করেনি এবং খুবই শান্তিপূর্ণভাবে ত্রাণ-কার্য চলল, সকলে খুবই খুশী হলেন।

একবার আমি দেখলাম এক ব্যক্তি প্রায় মৃতপ্রায় এবং অন্য লোকেরা তার উপর কম্বল চাপিয়ে দিল কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাস নেওয়ার জন্য। আসলে ঘটনাটি ঘটেছিল দামোদর ঘাটি নিগমে, সেখানে কিছু পাম্প রাস্তার একদিক থেকে অন্যদিকে জল নিষ্কাশন করার জন্য লাগানো হচ্ছিল। সেই কাজে যে ব্যক্তিরা ছিলেন তার মধ্যে একজন বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে যান এবং প্রায় তার মরনাপন্ন অবস্থা হয়। তাকে বাঁচানোর চেষ্টা চলছিল। আমি সেখানে উপস্থিত এক সৈন্য অধিকারীকে বললাম, “স্যার এই ব্যক্তি প্রায় মৃতপ্রায়, তাকে এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।” সে আমাকে অর্থাৎ গেরুয়াধারীকে ভালো করে দেখল, আমি সেই সময় ১৯৭০ সালে মাত্র সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। উপস্থিত সমস্ত লোকের সাহায্য নিয়ে সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্বেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই হাসপাতালটি নীলরতন সরকার চিকিৎসালয়, শিয়ালদহের পাশে অবস্থিত। সেই ব্যক্তি প্রাণে বেঁচে যাওয়ায় আমি খুবই খুশী হই।

সেই সময়েরই কথা, এক ব্যক্তি ঘাবড়ে গিয়ে আমার কাছে আসে এবং বলে যে পাশের স্কুল ভবনে এক মহিলার প্রসব যন্ত্রণা হচ্ছে এবং সে খুবই কষ্ট পাচ্ছে। সে ব্যক্তি আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। সঙ্গে সঙ্গে আমি গহনানন্দজী মহারাজকে ফোন করি কিন্তু তিনি তখন কোন একটি অত্যাবশ্যক বৈঠকে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তার সঙ্গে কথা হলো না। আমি সেই সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিকে বললাম প্রসূতি যন্ত্রণা কারোর

জন্য অপেক্ষা করে না, সুতরাং কয়েকজন ব্যক্তির সাহায্যে ঐ মহিলাকে নীলরতন সরকার চিকিৎসালয়ে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর যখন স্বামী গহনানন্দজীকে আমি এই ঘটনা সম্পর্কে বললাম, তখন তিনি আমাকে বকুনি দিয়ে বললেন, "তুমি সেই রোগীকে সেবা প্রতিষ্ঠানে কেন পাঠালে না?" আমি বললাম, আমি তো জানিনা হাসপাতালে বিছানা খালি আছে কিনা?" তিনি আমায় পুনরায় বকুনির সুরে বললেন, "প্রসূতি যন্ত্রণা সময়ের অপেক্ষা করে না, সেই মহিলা যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল এবং তুমি তাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে পাঠালে না।" আমারও খুব খারাপ লাগছিল, তারপর সেই মহিলার খবর নেই এবং জানতে পারি সে সুস্থ্য আছে।

আমি কিছু ভক্তদেরকে সঙ্গে করে শু এনামেল ইন্ডাস্ট্রি থেকে অদ্বৈত আশ্রমে আসিলাম, ত্রাণ হিসাবে অভাবগ্রস্তদের জন্য আমরা দিনে মাত্র একবারই খাবার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম, তাই মনে কষ্টও হচ্ছিল। আমি তখন ভাবলাম কিছু সাহায্য যদি পূজ্য মহারাজ থেকে পাওয়া যায়, ওনার সঙ্গে কথা বললাম, উনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী চাইছ? কতজন লোকের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে?" আমি তখন বললাম, "১০০-২০০ জন লোকের জন্য পাঁউরুটির ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।" উনি বললেন, "ঠিক আছে হয়ে যাবে।" উনি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে বললেন, "তুমি ধর্মতলা স্ট্রীটে যে বড়ুয়া বেকারী আছে সেখানে চলে যাও, সেখানে একটি বড় জীপ ৫টার সময় আসবে, যে তোমাকে পাঁউরুটি দিয়ে দেবে।" আমি স্কুল ভবনে জীপের জন্য অপেক্ষা করছিলাম কারণ অভাবগ্রস্তদের খাবার সংগ্রহ করার আর কোন উপায় ছিল না যে ওরা কিছু খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করবে এবং তাদের সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দেবে। যখন আমি সেই গরিবদের চালা ঘরগুলো সার্ভে করার জন্য নৌকো আনলাম তো সেই সময় কিছু লোক আমার উপর পাগলের মতো রাগারাগি শুরু করল কারণ বন্যার জল তাদের ঘরের ভিতর ঢুকে যাচ্ছিল। জল এত বেশী ছিল যে মনে হচ্ছিল আমরা সকলে ডুবে যাব। রাস্তার অন্যদিকে বন্যার জলকে পাম্পের সাহায্যে বের করা হচ্ছিল। তারপর আমরা ৩-৪ দিন পর্যন্ত ঠিক এইভাবে ত্রাণকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলাম। স্থানীয় লোকেরা বললেন ত্রাণকার্যে তারাও সাহায্য করবেন, তাতে একটি সুবিধা হলো, গলি গলি ঘুরে চাল, ডাল অতি সহজে সংগ্রহ করা গেল। তাঁরা একটি জীপ নিয়ে আসলেন এবং গান গেয়ে অন্ন সংগ্রহ করতে লাগলেন, "অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা।" এবং আমরা সকলে মিলে গলি গলি থেকে কাপড়, চাল, ডাল ইত্যাদি একত্রিত করলাম যখন আমরা সী.আই.জে রোডের ডাক্তার শ্রী কে. কে. ঘোষের বাড়ি গেলাম যিনি স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের শিষ্য এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজে ই.এন.টি বিভাগের

বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। তিনি তখন বাড়ি ছিলেন না। সুতরাং ওনার স্ত্রী বললেন, "মহারাজ আপনি আপনার আশ্রমে ফিরে যান, সেখানে আমার স্বামী আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।" তিনি আসলেন এবং ত্রাণকার্যের জন্য প্রচুর অর্থসাহায্য করলেন কারণ আমরা যেন ত্রাণকার্য সুগমভাবে চালিয়ে যেতে পারি।

সেইসময় কয়েকজন নক্সালী যুবক একটি অলংকারের দোকানে ঢুকে এবং সেই দোকানের মালিককে টাকা দেওয়ার জন্য তাঁর উপর চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা কী চাইছে। তারা বলল যে ত্রাণকার্য করতে চায়। আমি বললাম আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমাদের চাল এবং ডাল দেব। সেই দোকানের মালিক নিশ্চিন্ত হলেন এবং তাঁর মনে হতে লাগল যে নক্সালীরা তাঁর উপর হামলা করার চেষ্টা করছিল এবং তিনি আমার জন্য বেঁচে গেলেন। এই প্রথমবার আমি ত্রাণকার্যের জন্য নিজে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরলাম। স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এই প্রকল্পে আমায় খুব সাহায্য করেছিলেন।

যখনই আমি আমেরিকা থেকে দেশে ফিরতাম, তিনি আমায় এক রাত্রি সেবাপ্রতিষ্ঠানে বাস করার জন্য আমন্ত্রণ করতেন। তিনি পুরো দিনই কাজ করতেন এবং দুপুরে একটু বিশ্রাম নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে যেতেন। উনি রাতে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই ওনার সঙ্গে রাতেই বিভিন্ন বিষয় এবং আশ্রমের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা হত।

একবার ভীষ্ম চেরেটি শো রবীন্দ্র সদনে হচ্ছিল, তিনি আমায় শো টি দেখার জন্য সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। যখন আমি ১৯৯৮ সালে ভারতে আসলাম তিনি তখন মহাসচিব পদে ছিলেন। তিনি আমায় বললেন যদি বাংলাদেশের কেন্দ্রগুলোকে সাহায্য করা যেত, তবে আমি খুব খুশী হতাম। তাই যখনই কেউ আমাকে অর্থ সাহায্য বা দান-সামগ্রী দিতেন, আমি ওটা বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম।

আমি ওনার সম্পর্কে বলতে পারি যে উনি বিশাল হৃদয়বান, তেজোময় এবং মহৎ কর্মযোগী ছিলেন।

পূজনীয় নরেশ মহারাজ সম্পর্কে কিছু কথা

স্বামী তৃপ্ত্যানন্দ

পূজনীয় গহনানন্দজীকে আমরা নরেশ মহারাজ নামেই জানতাম। তাঁর কথা প্রথম শুনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য পূজনীয় সাধনানন্দজীর কাছে, যিনি কাশীপুর উদ্যানবাটির প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। পূজনীয় সাধনানন্দজী চিকিৎসার জন্য কিছুদিন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। ডাক্তার তাঁকে বেশি করে হাঁটতে বলেন। সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি থাকাকালীন নরেশ মহারাজ সাধনানন্দজীর হাঁটার জন্য এক বিশেষ ব্যবস্থা করেন। রোজ বিকেলে গাড়ি করে সাধনানন্দজীকে হাসপাতালের নিকটবর্তী একটি পার্কে নিয়ে যাওয়া হতো খোলা-মেলা পরিবেশে হাঁটার জন্য। নরেশ মহারাজের আন্তরিকতায় সাধনানন্দজী অভিভূত হয়ে আমাদের বলেন, "নরেশ তো ভগবান।"

এরপর বিভিন্ন সময়ে নরেশ মহারাজের কাছে নানা কাজে গিয়েছি। তাঁর শান্ত স্বভাব আমার বেশ ভাল লাগত। আমি তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতাম। বিভিন্ন সময়ে তিনি আমার অনেক উপকার করেছেন। একবার আমাকে মালদা আশ্রমে কোন বিশেষ কাজে পাঠানোর কথা হয়। সেই কাজে আমার অভিজ্ঞতা না থাকায় নরেশ মহারাজকে আমার অসুবিধার কথা জানালাম। ফলে তিনি তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মহারাজের সঙ্গে আলোচনা করে আমাকে অন্য একটি আশ্রমে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি শিলং আশ্রমে থাকাকালীন সেখানকার মোহন্ত মহারাজ আমাকে ভক্তদের বাড়িতে কখনও কখনও পাঠাতেন। এতে আমার বেশ অস্বস্তি ও সংকোচ হতো। নরেশ মহারাজ কোন কার্যোপলক্ষে সেইসময় শিলং আশ্রমে আসেন। সুযোগ বুঝে আমি তাঁকে আমার অসুবিধার কথা জানালাম। তবে বিষয়টি মোহন্ত মহারাজের কর্ণগোচর হলে তিনি বেশ অসন্তুষ্ট হবেন। সব শুনে পূজনীয় নরেশ মহারাজ আমাকে অভয় দিয়ে বলেন, "সে তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও।" অনায়াসে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আমাকে আর সেখানে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। কিছুদিন পর তিনি

আমাকে শিলং থেকে জলপাইগুড়ি আশ্রমে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

আর একদিনের ঘটনা। আমি বেলুড় মঠে কোন কাজে এসেছি। স্বামীজির মন্দির ও সমাধি ঘাটের মাঝের রাস্তায় নরেশ মহারাজের সঙ্গে দেখা। তিনি তখন সব মন্দিরে প্রণাম করতে বেরিয়েছেন। দেখা হতেই আমি মহারাজকে প্রণাম করে আমার কিছু সমস্যার কথা বলে গেলাম। তিনি কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ না করে শান্তভাবে সব শুনলেন ও উপযুক্ত নির্দেশ দিলেন। পরে মনে হয়েছে ঐ সময়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার নিজের সমস্যার কথা মহারাজকে না বললেই ভাল হতো। অন্য কেউ হলে অফিসে দেখা করতে বলতেন।

আমি বোম্বে আশ্রমে থাকাকালীন একবার পূজনীয় নরেশ মহারাজ সেখানে এসেছিলেন একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তিনি তখন মঠ ও মিশনের সহকারী সম্পাদক। একদিন দুপুরবেলায় আমি ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড। পূজনীয় মহারাজ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সামনে দড়িতে মেলে দেওয়া আমার পরনের কাপড়ের দুই পাড় মিলিয়ে সমান করে মেলে দিচ্ছেন। আমি এগিয়ে এসে তাঁকে এ কাজ থেকে নিরস্ত করলাম। ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু এখনও সেই সব কথা মনে পড়লে অবাক হই।

সহ-সংঘাধ্যক্ষরূপে পূজনীয় নরেশ মহারাজ কাঁকুড়গাছি মঠে থাকাকালীন আমি কয়েকবার সেখানে গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়েছি। সেসময় তাঁকে প্রণাম করার ও তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। একদিন সাধুদের প্রণামের সময় আমার অপরিষ্কার কাপড় ও অগোছালো ভাব দেখে তিনি হেসে মন্তব্য করেন, "নির্মলকে দেখে মনে হয় যেন বাইরের সাধু।"

শেষের দিকে পূজনীয় মহারাজ জামতোড়া মঠে চিকিৎসার জন্য কিছুদিন ছিলেন। সঙ্ঘগুরুকে প্রণাম করার জন্য দেওঘর বিদ্যাপীঠ থেকে আমরা কয়েকজন সাধু জামতোড়ায় আসি। আমার শারীরিক অসুস্থতার কথা ভেবে পূজনীয় নরেশ মহারাজই আমাকে দেওঘর বিদ্যাপীঠে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। যাইহোক, সেই সময় পূজনীয় মহারাজের শরীর বেশ খারাপ ছিল, কথাও খুব কম বলছিলেন। আমাকে দূর থেকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, "ও নির্মল।" সেবার আর বেশী কথা বলার সুযোগ হয়নি। এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

স্বামী গহনানন্দ : এক স্থিতপ্রজ্ঞ সন্ন্যাসী

স্বামী ভজনানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—আমরা সেই ঈশ্বরের সেবক, যাঁকে অজ্ঞানীরা মানুষ বলে। ভারতবর্ষে 'ঈশ্বরের সেবা' এবং 'মানুষের সেবা' যুগ যুগ ধরে দুটি পরস্পরবিরোধী আদর্শরূপে বিচ্ছিন্ন থেকে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুটি আদর্শকে সম্মিলিত করেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-রূপ একটি অখণ্ড সামগ্রিক ভাবাদর্শের আকারে, যার মূল কথা মানুষকে ঈশ্বরবোধে সেবা। রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বপ্রকার সেবাকার্যের ভিত্তিস্বরূপ এই সামগ্রিক দর্শন। এর ফলে দৈনন্দিন জীবন হয়ে ওঠে দিব্যজীবন, কাজ হয়ে ওঠে পূজা এবং মানুষ ক্ষুদ্র অহংবোধ এবং স্বার্থান্ধতার থেকে মুক্ত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্দশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী, গত ২০০৭ সালের ৭ই নভেম্বর কলকাতায় যাঁর মহাপ্রয়াণ হয়, তিনি তাঁর ৭০ বছরের সন্ন্যাসজীবনের পুরোটাই উৎসর্গীকৃত করেন এই মহান সেবাদর্শের চরিতার্থতায়।

১৯১৬ সালে অধুনা বাংলাদেশের সিলেটে তাঁর জন্ম হয় এবং পূর্বাশ্রমে তিনি নরেশরঞ্জন রায়চৌধুরী নামে পরিচিত ছিলেন। ২৩ বছর বয়সে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৪৮ সালে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন। মিশনের তিন চারটি কেন্দ্রে কাজ করার পর তাঁকে শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেওয়া হয়, যা মা এবং শিশুর কল্যাণে নিবেদিত রামকৃষ্ণ মিশনের একটি পথপ্রদর্শনকারী প্রচেষ্টা। অক্লান্ত পরিশ্রমের সাহায্যে স্বামী গহনানন্দজী এই ছোট প্রসূতিসদন হাসপাতালটিকে সেবাপ্রতিষ্ঠান নামক একটি দ্বিতল, ৫৫০ শয্যার পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপান্তরিত করেন, যা কলকাতার দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য চিকিৎসালয়গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে সুপরিচিত।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদকরূপে তিন বছর কাজ করার পর স্বামী গহনানন্দজী ১৯৯২ সালে সহসঙ্ঘাধ্যক্ষ এবং ২০০৫ সালে সঙ্ঘাধ্যক্ষ পদে ব্রতী হন। এই দুই পদে আসীন থাকাকালীন ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত অঞ্চল এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি হাজার হাজার মানুষকে আধ্যাত্মিক দিশা দেখান। তাঁর কাছ থেকে

মন্ত্রদীক্ষাপ্রাপ্ত মানুষজনের মধ্যে রয়েছেন বহুসংখ্যক জনজাতি শ্রেণীর মানুষ, বিশেষ করে উত্তরপূর্ব ভারতের এবং বেশ কিছু মুসলমান ব্যক্তি।

তাঁর সেবাকাজ ছাড়াও স্বামী গহনানন্দ ছিলেন বহু মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর সাফল্যের রহস্য লুকিয়ে আছে তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতায়, নিজ জীবনের অনুশাসনে, সকলের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় এবং ঈশ্বরকেন্দ্রিক অন্তর্জীবনে। তবে তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় দিকটি হলো চারিপাশের জগতের সর্বপ্রকার দুঃসহ বাধা, বিপত্তি এবং কঠিন পরিস্থিতির মুখে তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন অবিচলিত ভাব এবং নিরহঙ্কার সাহস ও উদ্যম।

তিনি তাঁর জীবনে গীতার 'স্থিতপ্রজ্ঞ'-এর আদর্শটি মূর্ত করে তুলেছেন। প্রজ্ঞা সাধারণ ইন্দ্রিয়গোচর জ্ঞান নয় এবং তা বই পড়েও পাওয়া যায় না। প্রকৃত প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান যার সাহায্যে জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে অবিচলিত থাকা যায়, অপরের জন্য নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আসে, জীবনের প্রকৃত অর্থবোধ জাগে এবং সর্বোচ্চ শান্তি ও সার্থকতা লাভ করা যায়। যখন এই প্রজ্ঞাকে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করে নেওয়া হয় তখন তা আরো গভীর, দৃঢ় এবং চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে। স্বামী গহনানন্দজী এই চিরস্থায়ী আভ্যন্তরীণ প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

তাঁর এই চিরস্থায়ী প্রজ্ঞা তাঁকে সাহায্য করেছিল নিজের সমগ্র জীবনটিকে ঈশ্বরের চরণে নিরবিচ্ছিন্ন আত্মোৎসর্গে রূপায়িত করতে। তিনি একবার ব্যক্ত করেছিলেন, "কর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা এবং মানুষের সেবা সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা—এই দুটি আদর্শ আমি সারাজীবন অনুসরণ করেছি।"

চিকিৎসালয়ের শীর্ষে থেকে তিনি ছিলেন হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, সাধারণ কর্মচারী এমনকি রোগীদের কাছেও এক পিতৃপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। তাঁর কাছে সকলে অবাধে যেতে পারত এবং নিজের মনের কথা উজাড় করে দিয়ে আসতে পারত। তিনি প্রায় প্রতিদিন হাসপাতালের ward গুলিতে যেতেন এবং প্রতিটি রোগীর অবস্থা তাঁর জানা থাকত। একজন বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে একবার বলেন, 'এই মহাত্মা যিনি বাহ্যতঃ কঠোর এবং অনুশাসনপরায়ণ কিন্তু অন্তরে মধুরস্বভাব, প্রেমপূর্ণ এবং কর্মদক্ষ—তিনিই আমার জীবনের আদর্শ।'

এই প্রকৃতপক্ষে মহান পুরুষ যিনি তাঁর সমগ্র জীবন মানুষের সেবায় উৎসর্গ করেছেন, তাঁর মহাপ্রয়াণে আজকের জগতে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে যা পূরণ করা কঠিন হবে। এই মাসের ১৬ তারিখ (শুক্রবার) প্রয়াত মহারাজজীর উদ্দেশ্যে স্মরণসভা এবং ভান্ডারার আয়োজন করা হবে। এই সময়ে তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

আমার জ্ঞানালোকের প্রাণের প্রদীপ

স্বামী রাজীবানন্দ

আমি যখন সরিষা মিশনে ছিলাম ঐ সময় পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ সেখানকার ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাই পূজনীয় মহারাজজীর কাছে প্রায়ই আমাকে যেতে হতো কমিটি মিটিংয়ের তারিখ নেওয়ার জন্য। একবার আমি মিটিংয়ের তারিখ ঠিক করার জন্য পূজনীয় মহারাজজীর কাছে উপস্থিত হলোম। উনি আমায় দেখা মাত্র বললেন, "এখন বিশ্রাম করো, খাও দাও, দুপুরে যখন খাব তখন বলব।" এইবার আমি খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নিচ্ছি, পূজনীয় মহারাজজীকে লক্ষ্য করছি কখন আসবেন। উনি আসতে আমি ছুটে গেলাম ওনার কাছে। উনি খেতে বসেছেন, আমায় দেখে বললেন, "তুমি এখন বিশ্রাম করো, রাতে খাবার সময় তোমার সঙ্গে কথা হবে।" আবার রাতে আমি খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করছি, অপেক্ষা করছি উনার জন্য, যখন এলেন রাতের খাবারের সময় পূজনীয় মহারাজজীর কাছে গেলাম, উনি বললেন, "আজ ঘুমাও ভালো করে, কালকে বলব,"। এইভাবে একটা দিন পুরো আমাকে বিশ্রামের সুযোগ করে দিলেন। পর দিন আমায় মিটিংয়ের তারিখ জানালেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম কেন আমায় একদিন বিশ্রাম দিলেন কারণ আমি সবসময় ঘুরে বেড়াই, তিনি জানতেন। তাই পূজনীয় মহারাজজী আমাকে বিশ্রাম করার সুযোগ করে দিলেন।

আমি কানাই মহারাজের সঙ্গে প্রতি বুধবার পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে দেখা করার জন্য সেবা প্রতিষ্ঠানে যেতাম। পূজনীয় মহারাজজীর সঙ্গে দেখা করার পর উনি বলতেন, "তোমরা কলকাতার সব কাজ সেরে আবার যাওয়ার পথে দেখা করে যেও।" যে দিন কানাই মহারাজের (লোকেশ্বরানন্দজীর) শেষ দিনের সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়, সেই দিন কানাই মহারাজ আর আমি সকালবেলা সরিষা থেকে এসে পূজনীয় মহারাজজীর সঙ্গে দেখা করে, সমস্ত দিন কলকাতার সকল কাজ কর্ম সমাপ্ত করে বিকেলে যাওয়ার পথে ওনার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসি। অনেক দিন বিকেলে সরিষা যাওয়ার সময়ে ওনার সঙ্গে দেখা হতো না। সেই দিন কানাই মহারাজ উনার সঙ্গে দেখা না করে

ফিরবেনই না। সুতরাং আমরা অপেক্ষা করছিলাম, উনি এলেন কানাই মহারাজের সঙ্গে কথা হলো, তারপর যাওয়ার পথে সরিষার কাছাকাছি প্রায় এক কিলোমিটার দূরে কানাই মহারাজের সেরিব্রাল স্ট্রোক্ হয়, পর দিন বেলা ১১ টায় তাঁর শরীর চলে যায়।

একবার আমি আমার পূর্বাশ্রমের কোন এক আত্মীয়ের সমস্যা সম্পর্কে বলেছিলাম, উনি আমায় বললেন, "এই সব এখন আর তোমার চিন্তার মধ্যে রেখো না।" এই কথার মাধ্যমে উনি আমায় সাধুর প্রকৃত নীতি কি হওয়া উচিৎ তা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন।

আমি যখন সরিষা মিশনের সেক্রেটারি এবং পূজনীয় মহারাজ বেলুড় মঠের সহাধ্যক্ষ, ঐ সময় উনি কিছু জমি সংক্রান্ত মামলার বিষয় নিয়ে আমাকে সঙ্গে করে উকিলবাবুদের কাছে নিয়ে যেতেন। একবার একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল, যা ব্যক্ত না করে পারছি না। একবার এক উকিলবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে যখন ফিরছি তখন উনি আমায় বললেন, "চল আমার সঙ্গে বেলুড় মঠে, তারপর উনি মঠে ফোন করে বললেন, "আমি আর কালিপদ যাচ্ছি, খাবার দাবার রেখো।" মঠের এরা ভুল করে ভেবেছে স্বামী অক্ষয়ানন্দজী মহারাজ, তাই থাকা ও খাওয়ার দারুণ সব ব্যবস্থা করল। পরে যখন আমি পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে গাড়ী থেকে নামছি তারা তো সবাই অবাক আমায় দেখে, সে কি এ যে সরিষার কালিপদ মহারাজ। তারা সবাই ভেবেছিল বাংলাদেশ থেকে কালিপদ মহারাজ এসেছেন। আমি তা জেনে খুব হাসতে লাগলাম।

১৯৭৮ সালে খুব বন্যা হয় সরিষার কাছাকাছি অঞ্চল গুলোতে। ঐ সময় পূজনীয় মহারাজজী নন্দলাল তাঁতিয়ার কাছ থেকে ত্রাণের জন্য প্রচুর টাকা সংগ্রহ করে দেন।

একবার আর একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। আমার এক পরিচিত ভক্তের বাড়িতে আমি পূজনীয় মহারাজকে নিয়ে যাই। সেই ভক্ত তো পূজনীয় মহারাজজীকে দেখে অত্যন্ত আনন্দে বলে উঠলেন, "কি সর্বনাশ মহারাজ আমাদের বাড়ি এসেছেন।" তারপর সেখান থেকে যখন আমরা ফিরি তখন পূজনীয় মহারাজ একটু রসিকতা করে বলছেন, "তোমার কি ভক্তরে বাবা, আমায় দেখে সর্বনাশ বলছে।"

একবার আশ্রমের কাজের জন্য কিছু জমির প্রয়োজন হয়। আমি উনাকে এই বিষয়ে বললাম। উনি অতি সুন্দর একটি উপায় বললেন। উনি বললেন আশ্রমের পাশে যে জমি আছে সেইগুলো সরকার থেকে লীজে নিয়ে নাও। উনার বলার পর আমার বুদ্ধিতে আসল এবং সরকার বিনামূল্যে লীজে জমি দিয়ে দিল।

পূজনীয় মহারাজজী তখন বেলুড় মঠের উপাধ্যক্ষ উনি তখন কাঁকুড়গাছি থাকতেন। উনার সঙ্গে দেখা করে সরিষায় দীক্ষার ব্যবস্থা করি। যে দিন দীক্ষা দিতে যাবেন, ঠিক তার আগের দিন রাতে বাবরি মসজিদ ভাঙা হয় তাই চারদিকে খুব গোলমাল চলছে। আমি ভাবছি পূজনীয় মহারাজ আসতে পারবেন কি না। তারপর আমি খবর নিলাম এবং জানতে পারলাম যে সরিষার ঐ দিকে গোলমাল হলেও এখন আর কিছু নেই। উনি নিরাপদে আসতে পারবেন। পূজনীয় মহারাজ এলেন দীক্ষা হলো। দীক্ষার পর আমি বজবজের সেন্টারে দীক্ষার জন্য উনাকে অনুরোধ করি। উনি দীক্ষার জন্য অনুমতি দিলেন। বললেন, "ঠিক আছে আমি যাব।" পূজনীয় মহারাজজী দীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট একটি তারিখ নির্ধারণ করলেন। সেই নির্ধারিত তারিখে বজবজের সেন্টারে দীক্ষা হলো। আমি সেই দিন পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম।

পূজনীয় মহারাজজী একজন কর্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। একবার বর্ষার সময় বেলাড়ি যা নদীর ওপারে অবস্থিত, সেখানে দীক্ষার জন্য আমি উনাকে অনুরোধ করি, উনি তাতে রাজি হন। আমরা নৌকা করে সরিষা থেকে বিছানাপত্র, বাসনকোসন, হাঁড়িকুড়ি নিয়ে বেলাড়িতে যাই। সেই বর্ষাতেই পূজনীয় মহারাজ বেলাড়িতে গেলেন দীক্ষা দিলেন এবং মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন। আবারও যখন মন্দির নির্মিত হয় তখন মন্দির উদ্‌ঘাটন করে সেখানে পুনরায় দীক্ষা প্রদান করেন।

একবার একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। একটি বিবাহিতা ভদ্রমহিলা পূজনীয় মহারাজের কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্য আসে। কিন্তু তার স্বামী তাঁকে দীক্ষা নেওয়ার জন্য অনুমতি দিচ্ছিল না। পূজনীয় মহারাজ বললেন যে, দীক্ষা নেওয়ার জন্য আগে তুমি তোমার স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নাও এবং তাকেও দীক্ষা নিতে বলো। সে তার স্বামীকে দীক্ষা নিতে রাজি করিয়েছিল এবং দীক্ষা নেওয়ার নির্ধারিত দিনে স্বামী সহ উপস্থিত হলো। আমরা তার দীক্ষার জন্য সবকিছু ব্যবস্থা করি। তার স্বামী তার সঙ্গে আসল। দীক্ষা নেওয়ার জন্য বসল কিন্তু হঠাৎ আমরা দেখি সে ছুটে পালাচ্ছে এবং একটি চলন্ত বাসে উঠে পড়ে। আমরা তাকে ধরার জন্য হৈ হৈ করে ছুটি, কিন্তু সে চলন্ত বাসে ততক্ষণে উঠে পড়ে। পরে পূজনীয় মহারাজ সেই ভদ্রমহিলাকেই শুধু দীক্ষা দিলেন।

উনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন কিন্তু কখনও বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। আমি অবাক হয়ে যেতাম গভীর রাতে যখন কাজ সেরে শুতে যেতেন, তখনও ফোন আসত এবং উনি ফোনে কথা বলে যেতেন। কখন যে ঘুমাতেন বুঝতেই পারতাম না। বলতে

গেলে উনাকে আমি বিশ্রাম নিতেই দেখি নি। যখনই দেখতাম কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

পূজনীয় মহারাজ প্রচণ্ড দূরদর্শী ছিলেন। কাঁকুড়গাছি ও সেবাপ্রতিষ্ঠান হাসপাতাল উনারই অক্লান্ত পরিশ্রমের দরুণ বিস্তার লাভ করেছে। আশ্রমের জমির পরিধি বিস্তারের ক্ষেত্রে উনি সর্বদা তৎপর থাকতেন কারণ আশ্রমের জমির পরিধি যদি বিস্তৃত হয়, তবে ভবিষ্যতে সেই জমি আশ্রমের কাজে লাগবে।

একটি যুবককে ইংলণ্ডে ডাক্তারি পড়ার জন্য পূজনীয় মহারাজ পাঠিয়েছিলেন। সেই যুবকটি যখন ডাক্তার হয়ে ঐ হাসপাতালে ফিরে আসে তখন সে মজা করে বলেছিল যে, আপনাদের ব্যবসায় কোন ক্ষতি নেই। এর অর্থ হলো তাকে পূজনীয় মহারাজ পড়িয়েছেন তাই আজ সে সফল হয়েছে। এই রকম হাসিঠাট্টা আমাদের মাঝে মধ্যে হতো।

পূজনীয় মহারাজ যখন সরিষায় যেতেন তখন সকল শিক্ষক, শিক্ষিকারা ওনার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসতেন। উনি সকলের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতেন। আমি যখন প্রতি বুধবারে সেবা প্রতিষ্ঠান যেতাম, তখন উনি আমায় জিজ্ঞেস করতেন মেয়েরা কিভাবে কাজকর্ম করছে, কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না, সব খবরাখবর নিতেন।

একবার আমাদের চিকিৎসা বিভাগে হোমিওপ্যাথি বিভাগ চালু করা হয়। উনি একদিন তা দেখে অবাক হয়ে বললেন, "এ কি এলোপ্যাথির পাশে হোমিওপ্যাথি।" অর্থাৎ এ্যালোপ্যাথির পাশে যদি হোমিওপ্যাথি থাকে তবে গ্রামের লোকে কোথায় ডাক্তার দেখাবে তা ভেবে চিন্তায় পড়ে যাবে।

পূজনীয় মহারাজ সরিষায় নার্সিং ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছিলেন যা আজও চলছে। সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নার্সেরা সরিষায় গিয়ে ঐখানকার গ্রাম্য মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিতেন, সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে ঔষধপত্র সরবরাহ করা হতো। দুপুরে সকলে মিলে সরিষা আশ্রমে প্রসাদ পেতেন।

একবার আমিও পূজনীয় মহারাজ গঙ্গাসাগর মেলায় যাই। সঙ্গে আরও কয়েকজন মহারাজও ছিলেন। আমরা সকলে খুব আনন্দ করি।

মহারাজের সঙ্গে আমার ততো শাস্ত্রীয় আলোচনা হয়নি, যতো না কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। উনি একজন মহান কর্মযোগী ছিলেন। স্বামীজির নির্দেশিত কর্মযোগের পথে জীবনকে চালিয়ে গেছেন। একদিকে এক হাতে বেলুড় মঠের উপাধ্যক্ষের পদ সামলেছেন অন্য হাতে সেবাপ্রতিষ্ঠানের কাজ দক্ষতার সঙ্গে চালিয়ে গেছেন। এই মহৎ ব্যক্তিত্বের চরণে আমার শতকোটি প্রণাম।

এক কুসুম কোমল অন্তর্দীপনের সৌরভ

স্বামী শশাঙ্কানন্দ

বাল্যকাল থেকেই রাধু, মহাত্মা, সাধক, মন্ডলেশ্বর, যোগী, বৈরাগীদের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। প্রত্যেক মহাপুরুষদের জীবন ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকে এক একটি মহান উদাহরণ তৈরি করে গেছেন। এমনিই মনে হয় যেন বিভিন্ন রঙ-বেরঙের ফুলের দ্বারা সাজানো ফুলের বাগিচা। জীবনের এই অন্তিম সময়ে এবং ফুলের বাগিচা আমার মনে আনন্দের উদ্রেক করে। এই প্রবন্ধে সেই ফুলের বাগিচার একটি সুন্দর সুগন্ধিত ফুলের গন্ধ আপনাদের কাছে নিয়ে আসতে চেষ্টা করব।

এই অতি সুন্দর ফুল বাগিচার এক অতি সুগন্ধিত ফুলের নাম হচ্ছে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। সাধারণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তাঁর চেহারা পোষাক- পরিচ্ছদ এবং সাধারণ ব্যবহার দ্বারা বোঝা যায়, বিশেষ ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব তাঁদের মন এবং বুদ্ধি অর্থাৎ ওনাদের মনের ভাবনা—চিন্তার দ্বারা বোঝা যায় কিন্তু মহাপুরুষ এবং সাধুদের ব্যক্তিত্ব ওনাদের মন, বুদ্ধির উপরে যে অন্তর্জগৎ আছে, সেই অন্তর্জগতের অভিজ্ঞতার দ্বারা বোঝা যায়। আমি আমার অল্প বুদ্ধির দ্বারা যা বুঝতে পেরেছি, সেটাকেই পাঠকদের সম্মুখে রাখার চেষ্টা করব।

সেইসময় আমি রামকৃষ্ণ মিশন নতুন দিল্লীতে ব্রহ্মচারী ছিলাম। প্রায় দু'বছর আগে আশ্রমে প্রবেশ করেছিলাম। ১৯৬৫ খ্রীঃ দুর্গা পুজোর সময় ছিল, নতুন দিল্লীর আশ্রম সচিব স্বামী স্বাহানন্দজী মহারাজ একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি যখন ওঁনার সঙ্গে দেখা করি, তখন তিনি বললেন—তোমার গুরুদেব, (পূজ্য স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ)-এর মনে হচ্ছে আর শরীর থাকবে না, যদি তুমি দর্শন করতে চাও তবে পরের ট্রেনে কলকাতা চলে যাও, তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি আছেন। আমি পরের ট্রেনেই হাওড়া পৌঁছে যাই এবং সেবা প্রতিষ্ঠানের সচিব পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজীর সম্মুখে উপস্থিত হই। এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ পূজ্য স্বামী গহনানন্দজীর

সঙ্গে। ভয় এবং সংকোচ দুটোই ছিল—আমি একজন নবাগত ব্রহ্মচারী এবং পূজ্য মহারাজ এত বড় হাসপাতালের সচিব এবং রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের ট্রাস্টি সদস্য কিন্তু মহারাজজীর হাসি মুখ দেখে আমার সমস্ত ভয় এবং সংকোচ বিলীন হয়ে যায়। আমি পূজ্য স্বামী স্বাহানন্দ মহারাজের পত্র ওনার হাতে তুলে দিই, তাতে লেখা ছিল—"ব্রহ্মচারী মহেশ হঠাৎই পূজ্য প্রেসিডেন্ট মহারাজের দর্শনের জন্য যাচ্ছে।" পূজ্য মহারাজ স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে এবং হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠিক আছে তুমি পূজ্য মহারাজজীর দর্শন করো এবং হঠাৎই ফিরে যাও" আমি হঠাৎ' শব্দটি শুনে ঘাবড়ে যাই, কিন্তু সেখানে উপস্থিত সন্ন্যাসীরা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম মহারাজজী একজন রসিক পুরুষও বটে। গুরুদেবের শেষের চারদিন সেবা করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল।

স্বামী গহনানন্দজী ১৯৭৯খ্রীঃ থেকে ১৯৮৯খ্রীঃ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের সহ-সচিব ছিলেন। এই সময় তিনি ১৯৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত সেবাপ্রতিষ্ঠানের সচিবও ছিলেন। ১৯৮৫ খ্রীঃ তিনি বেলুড় মঠ মুখ্য কার্যালয়ে চলে আসেন। আমি সেই সময় বেলুড়মঠে পল্লীমঙ্গল প্রকল্পের দেখাশোনা করি।

সমুদ্র গভীর হলেও তার তরঙ্গের আলোড়ন আমরা দেখতে পাই। কিন্তু পূজ্য স্বামী গহনানন্দজী তো আকাশের মতো গহন ছিলেন। ওনার চলাফেরা বা কথাবার্তায় কোনরূপ অস্থিরতার লক্ষণ ছিল না। একদিন মহারাজজীকে নিয়ে আমার কামারপুকুর যাওয়ার ছিল। চাঁপাডাঙ্গা থেকে কিছুটা আগেই কোন একটি দুর্ঘটনার কারণে যানজটের সৃষ্টি হয়, এই দিকে অন্ধকারও হয়ে আসছিল। আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। তখন মহারাজ ধীর-স্থির ভাবে বললেন—"দেখো তো অন্য কোন রাস্তা আছে কি না?" তারপর জানা গেল আঁটপুর হয়ে যাওয়া যাবে। অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হলো। আমি সেই পথে যাওয়ার সময় চিন্তিত হচ্ছিলাম কিন্তু মহারাজজী একেবারে শান্ত অবচলিত ছিলেন।

প্রত্যেকটি আশ্রমে দুপুরের খাওয়ার পর সাধু ব্রহ্মচারীরা বিশ্রাম করেন। আশ্রমের দরজা সাধারণ লোকদের জন্য বন্ধ থাকে। কিছু প্রয়োজনীয় কাজের জন্য আমি মহারাজের কাছে যাই। দরজা আধভেজানো ছিল এবং আমি দেখলাম মহারাজজী জপ করছেন। তাই আমি ফিরে যাই। পরে যখন মহারাজজী এই কথাটি জানতে পারলেন তখন বললেন—"জপ করছিলাম তো কি হলো, ঠাকুরের কাজের জন্য তো ডাকাই যেতে পারে।"

ঠিক এইরূপ একবার পল্লীমঙ্গলের কার্যক্রমে তৎকালীন মহা-সচিব স্বামী

বন্দনানন্দজী, সহ-সচিব স্বামী আত্মস্থানন্দজী এবং স্বামী গহনানন্দজী মহারাজরা এসেছিলেন। দুপুরের খাওয়ার পর সকলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন কিন্তু স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ জপ ব্যস্ত ছিলেন।

একবার কোন কারণে কোন একজন বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী মহারাজ যিনি আমায় খুব স্নেহও করতেন, ওনার কঠোর ব্যবহারে আমি খুব কষ্ট পাই। তখন আমি মঠ ছেড়ে কোন তীর্থস্থানে তপস্যা করার কথা ভাবি। এই কথাটি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কানে যায় এবং তিনি আমাকে ডেকে পাঠান এবং অনেক বোঝান। যখন পূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাকে কাছে ডেকে মৃদু হেসে বললেন, "প্রতিটা দিন এক সমান থাকে না, ধৈর্য ধর, দুঃখ আর সুখ একের পর এক আসতে থাকবে। সহ্য করাই শ্রেষ্ঠ গুণ।" তারপর তিনি আবার বললেন—"নট বলে নটীকে তাল যেন না কাটে। নট নটীকে সাবধান করে বলছে—যে নাচে দক্ষ সে যতই সুরা পান করুক না কেন, তবেও তার তাল কাটবে না।" আমি তখন বুঝতে পারলাম উৎকৃষ্টমানের সাধক যতই বিপরীত পরিস্থিতিতে পড়ুক না কেন, তার মন কখনোই বেতাল হবে না।

রামকৃষ্ণ মিশন সমাজ সেবক মন্দির ১৮৮৬খ্রীঃ শুরু হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্নাতক যুবকদেরকে গ্রামীণ বিকাশ প্রবন্ধনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া। যাতে তারা স্বয়ং স্বনির্ভর হয় এবং অন্যদেরকেও স্বনির্ভর করতে সাহায্য করে। কিন্তু প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষিত যুবকরা স্বামী আত্মস্থানন্দজীর কার্যালয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে চাকরির জন্য ভীড় করত। পূজ্য আত্মস্থানন্দজী মহারাজ একদিন আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন ওদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করো। প্রথম দু'বছর আমি ওদের চাকরির ব্যবস্থা করে দিই কিন্তু আমার মন ঠিক মেনে উঠতে পারছিল না, বারবারই মন বিচলিত হয়ে পড়ছিল। তাই আমি সমাজ সেবক শিক্ষণ মন্দিরে যাওয়াই ছেড়ে দেই, সেখানে ক্লাস নেওয়া বন্ধ করে দেই। এই কথা পূজ্য স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ (রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ অর্থাৎ সমাজসেবক শিক্ষণ মন্দিরের তৎকালীন সচিব) এর কানে যায় এবং তারপর তৎকালীন মহাসচিব পূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের কানেও যায়। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন আমি ক্লাস নিচ্ছি না ? আমি বললাম—"মহারাজজী আমায় ক্ষমা করুন, কিন্তু যে লক্ষ্য নিয়ে সমাজসেবা শিক্ষণ মন্দিরের পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছিল, সেই লক্ষ্য এখন পূর্ণ হচ্ছে না। স্নাতক যুবকরা এখানে প্রশিক্ষণ নেয় এবং চাকরির জন্য ভীড় করে, কিন্তু ওদের তো চাকরি করার যোগ্যতা আগের থেকেই আছে, আমার চেষ্টা করা তো নিরর্থকই হচ্ছে। আমরা তো চাইছিলাম ওরা চাকরি

সন্ধানকারী না হয়ে চাকরি প্রদানকারী হোক।" পূজ্য মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে আমাকে প্রিন্সিপাল পদ গ্রহণ করার আদেশ দিলেন। আমি আমার স্থানপূরণের জন্য বিকল্প মহারাজ চাইলাম । তখন তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "আরে আমি যদি রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সচিব হওয়া সত্ত্বেও বেলুড় মঠের মুখ্য কার্যালয়ে সহ-সচিবের পদ বজায় রেখে দুটো জায়গার কাজ করতে পারি, তবে তুমি কেন পারবে না? যাও যাও দুটো পদই সামলাও।" আমি খুবই লজ্জিত হলোাম কিন্তু আমার মধ্যে আমি নতুন করে প্রাণশক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-শ্রদ্ধার ভাব খুঁজে পেলাম, যা এখন পর্যন্তও আমার মধ্যে সাহস এবং শক্তি প্রদান করে যাচ্ছে। আজ আমার বয়স ৮২বছর, চার বছর হলো মিশনের কাজ থেকে অবসরপ্রাপ্ত, কিন্তু আবারও নতুন কার্যভার নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করতে বেরিয়ে পড়লাম। সেবা করব কিনা দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে, শিরোধার্য করার সাহস ও শক্তি পেলাম।

আরও একটি ঘটনা আপনাদেরকে জানাতে চাইছি রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের সহ-অধ্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও সুন্দরবনের সুদূর গ্রামে দীক্ষা দেওয়ার জন্য কত কষ্ট হাসতে হাসতে সহ্য করে মহারাজজী শূলকুনী পৌঁছালেন এবং মাটির বাড়িতে থেকে মাটি দিয়ে তৈরী ছোট ঠাকুর ঘরে দীক্ষা দিলেন। আমি যখন প্রথমবার ঐ গ্রামে গেলাম তখন নৌকা থেকে দেখলাম হাঁটু পর্যন্ত কাদা এবং সেই কাদায় চলা খুবই মুশকিল। আশ্রমের যুবকভক্তরা পূজ্য মহারাজকে কিভাবে নিয়ে গেছেন আমি দেখিনি কিন্তু আমায় ঐ যুবকরা হাতে তুলে নিয়ে আসলেন, ওদের এই অবস্থা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে পড়লাম। মহারাজজীকেও সম্ভবতঃ এইভাবে নিয়ে এসেছেন, নদীর তীরে একটু উপরে উঠে একটি ভ্যান রিক্সায় গদী এবং বালিশ পেতে মহারাজজীকে বসানো হলো এবং ভ্যান কাঁচা রাস্তা দিয়ে টেনে ওনাকে আশ্রমে পৌঁছে দিল। ভক্তদের মুখে এই সমস্ত শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লাম। স্বামীজি এই সমস্ত গ্রামবাসীদের জনসাধারণ বলতেন এবং ওদের প্রতি ওনার হৃদয়ে অফুরন্ত প্রেম ছিল। স্বামীজির বাণী আমাকে মন্ত্র মুগ্ধ করে, জনসাধারণকে অবহেলা করাই সবচাইতে বড় পাপ। ওদের নিজস্ব অস্তিত্বে ফিরিয়ে আনাই আমাদের কাজ। এটাই এখন আমার জীবনের ধ্রুবতারা।

পূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ একবার সংকল্প করেছিলেন যে গয়াধামে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি মন্দির তৈরী করবেন। পাটনার স্বামী মঙ্গলানন্দজী মহারাজ এবং কাশীর মহারাজের মাধ্যমে চেষ্টাও করলেন কিন্তু নিষ্ফল হলেন। একদিন আমার কাছে পূজ্য স্বামী গহনানন্দজীর ফোন আসল, "ওহে! গয়া গয়া গয়া!" আমি বুঝতে পারলাম না কোন গয়া? কোথায় গয়া ? আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম,

"আরে কামারপুকুরে জন্ম নেওয়ার আগে তো তিনি ক্ষুদিরামকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। গয়াতে কিছু একটা করো। আমি বললাম "মহারাজ আমি কি করতে পারি।" কিন্তু পূজ্য মহারাজ দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "তুমি করতে পারবে।" তারপর ঘন ঘন মহারাজজীর ফোন আসতে লাগল। তখন আমি ভাবলাম হয়তো শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা, তাই আমি আর আমার ছোট ভাই স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ (বিপিন মহারাজ) পূজ্য মহারাজের স্বপ্নকে সফল করার জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়লাম। একটি অজানা জায়গায় যেখানে কোন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় নেই, সেখানে পূজ্য মহারাজজীর আগমন, নিবাস স্থান এবং দীক্ষার ব্যবস্থা করা অসম্ভব মনে হচ্ছিল, কিন্তু পূজ্য মহারাজের ইচ্ছা শক্তি আশীর্বাদ দ্বারা সব কিছু সম্ভব হলো। জনৈক ভক্তের নাম এবং ঠিকানা সংগ্রহ করে আমরা গয়াতে পৌঁছালাম। ওনার নাম ছিল শ্রী দেবব্রত চ্যাটার্জী। ভদ্রলোক একটি স্কুল চালাতেন। শুরুতে উনি খুব অনিচ্ছুক ছিলেন কিন্তু ধীরে ধীরে অনেক সাহায্য করলেন। আমি সেখানে দুর্গা মন্দিরে তিন দিন ব্যাপী রামচরিতমানস পাঠ করলাম। অনেক ভক্তের ভীড় হলো এবং ওনাদের সঙ্গে পরিচিত হলোাম এবং শেষ পর্যন্ত ভক্তরা দীক্ষা নেওয়ার জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন। তখন এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা শ্রীমতৌী অলকা চ্যাটার্জী পূজ্য মহারাজের থাকার জন্য নিজের ঘর দিলেন। আমরা রাঁচী মোরাবাদী থেকে মহারাজজীর জন্য পালঙ্ক, সোফা, টেবল, চেয়ার, গালিচা, রান্নার বাসনপত্র মিনি বাসে করে নিয়ে আসলাম। তারপর পূজ্য মহারাজজীর আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। যেমনিই মঙ্গল ধ্বনির মধ্যে পূজ্য মহারাজজী ভবনে প্রবেশ করলেন, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বলে উঠলেন, "শেষ পর্যন্ত হলো ! মনে হচ্ছে আমাদের একটি স্থায়ী আশ্রমে এসেছি।" প্রায় ৪৫ জন দীক্ষার্থীদের পূজ্য মহারাজ দীক্ষা দিলেন। পূজ্য মহারাজজী শ্রী বিষ্ণুপাদের দর্শনের জন্য মন্দিরে গেলেন এবং পুজো দিলেন। একদিন পূজ্য মহারাজজীকে নিয়ে আমরা বোধগয়ায় মন্দিরে যাই। সেখানকার মুখ্য স্বয়ং মহারাজজীকে সঙ্গে নিয়ে সম্পূর্ণ পরিসর ঘুরলেন। তারপর মহারাজজী বেলুড় মঠে ফিরে গেলেন। মঠ স্থাপন করার জন্য জমি, বিল্ডিং সবই পাওয়া যেত কিন্তু কিছু কিছু কারণের জন্য বেলুড় মঠ নিতে রাজি হলেন না।

এইরকম অনেক ঘটনা আমার হৃদয় মন্দিরে গ্রথিত আছে। মনের ইচ্ছা তো সব কিছু আপনাদের কাছে উজাড় করে দেই, কিন্তু সময়ের অভাবে এখানে ইতি টানতে হলো। পরবর্তীকালে যদি সময় সুযোগ হয় তবে নিশ্চয় আরও অনেক কিছু স্মৃতি আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করার ইচ্ছা রাখি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি আপনারা সকলে মঙ্গলে থাকুন। জয় মা।।

ভরা থাক স্মৃতিসুধায়

স্বামী অচ্যুতানন্দ

আলোক তুমি কিছুতেই termination Notice এ সই কোরো না। ওরা ঐ Notice নিয়ে গোলমাল করতে পারে, কোর্টেও যেতে পারে। তখন তোমাকে কোর্টে সাক্ষী দিতেই যেতে হতে পারে। তাই আমার মনে হয় ওতে সই না করাই ভাল।" ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের November-December এর কোন সময় সেবাপ্রতিষ্ঠানের অফিস ঘরে ব'সে পূজনীয় নরেশ মহারাজ আমাকে বোঝাচ্ছেন। সঙ্গে আছেন পূজনীয় অকুণ্ঠানন্দজী (শম্ভু মহারাজ)। তিনি নরেশ মহারাজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি কিন্তু মাঝে মাঝে বলছেন। "পূজনীয় চিন্তাহরণ মহারাজ নেই। তাই গোলপার্কের কর্মীদের উৎপাতের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে ঐ ৭/৮ জন কর্মীকে discharge করা ও তার আগে show cause খুবই দরকার, তার জন্য তাদের যে notice দিতে হবে তাতে সই তো তখনকার senior বা দায়িত্বশীল কোন কর্মীকেই করতে হবে।" তখন গোলপার্কের Institute of culture-এর অধ্যক্ষ পূজনীয় নিত্যস্বরূপানন্দজী (চিন্তাহরণ মহারাজ) হঠাৎ করে কিছু না বলে শরীরের চিকিৎসা করতে যাচ্ছি বলে দিল্লী চলে গিয়েছেন। Institute এ তখন ভীষণ গোলমাল চলছে, তারা পূজনীয় মহারাজকে কিছু অভদ্র ব্যবহার করায় তিনি খুবই ক্ষুণ্ন হয়ে হঠাৎ দিল্লী চলে যান। আমাকে বলে যান। "তুমি যা পারো সামাল দিও। নরেশদের সঙ্গে কথা বলো।" আমি তো মহা বিভ্রাটে পড়লাম। তবে আমার একটা সুবিধা ছিল ঐ আন্দোলনকারী কর্মীরা আমার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করেনি। শুধু অফিসে এসে চুপ চাপ সই করে নিচে গিয়ে Meeting করত। তখন ওখানে দুজন প্রাচীন সাধুও ছিলেন স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দজী (উপেন মহারাজ) ও স্বামী রসজ্ঞানন্দজী। কিন্তু পূজনীয় চিন্তাহরণ মহারাজ তাঁদের কোন কথা না বলে আমাকেই ঐ সকল বলে গেলেন। যাই হোক, বেলুড়মঠে তখন পূজ্যপাদ প্রভু মহারাজ President, পূজনীয় গম্ভীর মহারাজ জেনারেল সেক্রেটারি ও পূজনীয় ভূতেশানন্দজী ও চিদাত্মানন্দজী অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। তাঁরা আমাকেই মঠে ডাকেন, উকিল বাড়ি পাঠান আর

পূজনীয় নরেশ মহারাজের সঙ্গে সব সময় পরামর্শ করে সব চিঠিপত্র তৈরি করতে বলেন। আমি তখন গোলপার্কের School of Language এর Principal.এই Principal হওয়াটাও কিছুটা নরেশ মহারাজ ও পানু মহারাজ (স্বামী যুক্তানন্দজী) এর চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছিল।

একদিন গোলপার্কে পূজনীয় চিন্তাহরণ মহারাজের নিমন্ত্রণে পূজনীয় নরেশ মহারাজ সেখানে খেতে এসেছিলেন। তখনই সেখানে গোলমাল শুরু হচ্ছে। school of language principal Exmillitary Officer তিনি বড় একরোখা ছিলেন। চিন্তাহরণ মহারাজের সঙ্গে তাঁর মাঝে মাঝেই খিটিমিটি লেগে যেত। মহারাজ চেয়েছিলেন তাঁকে সরিয়ে অন্য কোন সাধুকে এখানে বসাবেন। কিন্তু মহারাজের পছন্দ অপছন্দ একটু বেশি ছিল, তাই মনের মতো কেউ জুটছিল না। তো সেইদিন আমাদের আশ্রমে যে চাকর কাজ করত সেও strike করার দলে থাকায় কাজে আসেনি। সেজন্য মহারাজদের খাওয়ার পরে, আমি পাশের ঘরে বাসনগুলি ধুচ্ছিলাম। পাশেই খাওয়ার ঘর, চিন্তাহরণ মহারাজ তার Principal না পাওয়ার কথা এঁদের দুজনকে বলছেন। হঠাৎ নরেশ মহারাজ ও পানু মহারাজ বলে উঠলেন "Principal তা আপনার ঘরেই আছে। মহারাজ বললেন, 'সে কি ! আমি তো জানিনা।' তখন পানু মহারাজ বললেন। ঐ তো পাশের ঘরে বাসন মাজছে। আর নরেশ মহারাজ বললেন। রত্নাকর জানেন না তাঁর গভীরে কত রত্ন লুকিয়ে আছে। তা সেবক তো duly Qualified তো তাকেই করুন না Principal, তাহলেই সব সমস্যা মিটে যায়।"

এই ভাবে সেদিন ঐ দুজন শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীর ইচ্ছামতোন আমাকে সেখানকার Principal মনোনীত করলেন পূজনীয় মহারাজ। আগুনে আর একটু ঘি পড়ল। Principal Resign দিলেন কিন্তু পান্ডাদের উসকে দিয়ে গেলেন। কিন্তু আমি ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিলাম, আর পূজনীয় নরেশ মহারাজ আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন ওদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করবে, দেখবে তোমার কাজের কোন অসুবিধা হবে না।

তখনই দেখলাম পূজনীয় নরেশ মহারাজের কি ঠান্ডা মাথা আর কত দূরদৃষ্টি। তাঁর কথা মতো কাজ করে আমি গোলমালের পান্ডাদের চোখে ভালই ছিলাম। পূজ্যপাদ চিন্তাহরণ মহারাজ খুব moody ছিলেন। তাঁকে এঁরা অপমান করায় তিনি কিছুটা অভিমান করেই দিল্লী চলে গেলেন। ফিরে আসতে চাইলেন না মঠ কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করলেও।

যাইহোক, পূজনীয় নরেশ মহারাজের কথা মতো আমি তাদের discharge বা

showcause notice এ সই করলাম না। একদিনের জন্য শ্রদ্ধেয় অমিয় মজুমদার মশায়কে সই করবার অধিকার দিয়ে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে সই করাতে রাজি করা গেল। সেসময় আমাদের গাড়ির driverও ঐ পথে ছিল। তাই তাকে নিয়ে মঠে যাওয়া যেত না। পূজনীয় নরেশ মহারাজ সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে গাড়ি পাঠাতেন তাতে করে তাঁর কাছে গিয়ে একসঙ্গে মঠে গিয়ে নানা কাজ করতে হতো। ফিরবার সময়ে একসঙ্গে ফিরতেন। তখন কার কথা কিছু সংক্ষেপে জানাচ্ছি—

গাড়িতে আসতে আসতে একদিন পূজনীয় মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আচ্ছা মহারাজ আপনার গুরুদেব পূজ্যপাদ বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে তো প্রথম দিকেই দীক্ষা হয়েছিল—আপনি তাঁর ব্যক্তিগত কোন সেবা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন? তিনি কিছুক্ষণ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপরে বেশ আস্তে আস্তে যেন মনের গভীরে ডুব দিয়ে আপন মনেই বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ কিছু তো করতে পেরেই ছিলাম। সেটা সম্ভবত **১৯৫০-৫১** হবে পূজ্যপাদ মহারাজের শরীর তখন ভাঙতে আরম্ভ করেছে। আমি তখন কলকাতায় অদ্বৈত আশ্রমের কর্মী। মহারাজের জন্য রোজ তাঁর প্রয়োজনীয় ওষুধ ও কিছু শাকসব্জী ফল নিয়ে যেতে হতো বেলুড় মঠে আমাকেই। অফিসের সারাদিনের কাজের পরে বিকেলে, তখন অদ্বৈত আশ্রম ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, সেখান থেকে ট্রামে কিছুটা এসে তারপরে পায়ে হেঁটে আহিরীটোলাতে গঙ্গা পেরিয়ে এপারে এসে সালকিয়া থেকে আবার হেঁটে মঠে পৌঁছাতাম প্রায় সন্ধ্যার সময়। মঠে ঠাকুর প্রণাম করে সোজা সেইসব নিয়ে মঠবাড়ির একতলায় বিমলদার সঙ্গে (শ্রদ্ধানন্দজী) দেখা করতাম। তাঁকে সব বুঝিয়ে দিয়ে দোতলায় গিয়ে পূজ্যপাদ মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করতাম। তাঁর এই সেবা গ্রীষ্ম-বর্ষা কিছুতেই বাদ দিইনি, নিত্য কাজের শেষে কলকাতায় বাজারটা আমি নিজেই করে ঐভাবে যেতাম। পূজ্যপাদ মহারাজ, রোজ প্রণামের সময় এমন করুণাভরা চোখে তাকাতেন তা মনে করে এখনও সেখানেই চলে যাই।" এই রকম নানা পুরানো স্মৃতির রোমন্থন তিনি করতেন খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে কখন মনে হয় এ আর এক নতুন নরেশ মহারাজ। সাধারণত সেই সময় তিনি তাঁর দীক্ষা বা গুরুর সম্পর্কে বিশেষ কোন কথা বলতে চাইতেন না। সেবা প্রতিষ্ঠানে থাকা কালে তাঁর ঘরে গুরুদেব পূজ্যপাদ বিরজানন্দজীর কোন ছবি দেখিনি। পূজ্যপাদ মাধবানন্দজীর একটা বড় ফটো মাত্র টাঙ্গানো দেখেছি। ঠাকুর, মা ও স্বামীজির ছবি ছাড়া। সেই সময় ঐ গাড়ীতে যাতায়াতের সময়েই একদিন তিনি হঠাৎ একটা প্রস্তাব করেন। "আলোক তুমি সেবা প্রতিষ্ঠানে আসবে কর্মী হয়ে?" আমি ঠিক এতটা ভাবিনি, কারণ তখনও গোলপার্কের আমার কাজ শেষ হয়নি। আমি সেকথা বললাম, আর

একটা ব্যক্তিগত অসুবিধার কথাও বললাম। তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "ওটা কোন ব্যাপারই নয়। অমুকের বাড়ি তো কাছেই, সে তো আছে। তোমার বাড়ি কাছে থাকলেই বা, তুমি রাজী থাকলে আমি চেষ্টা করতে পারি।" আমি রাজী হতে চাইনি। কথাটা আর বেশি এগোয়নি। একরাতে সেখানকার কর্মীদের আমাকেই showcause করা চিঠি issue করার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। আমার অফিসে তাদের এক এক করে ডেকে ঐ কাগজ ধরিয়ে দিতে হয়েছিল। পূজনীয় নরেশ মহারাজই সেদিন আমাকে অফিসে ঘিরে রাখবার জন্য মঠকে বলে বেশ কয়েকজন সাধুকে পাঠিয়েছিলেন। যাতে ঐ কর্মীরা আমার ওপর হঠাৎ কিছু করে না বসে। কি অসাধারণ কর্মদক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধি ও সেবাপরায়ণতা তাঁর ছিল তখন বুঝেছিলাম। কিন্তু আমি যে তাঁর কাছে যেতে চাইলাম না তার জন্য কোন বিরক্তির ভাবও দেখিনি।

তারপরে গোলপার্কের গোলমাল একটু সামলাতেই পূজনীয় লোকেশ্বরানন্দজী সেখানকার দায়িত্ব নিয়ে এলেন। আমি সাধ্যমতো তাঁকে সাহায্য করলাম। ঐ বছর december-এ তিনি এসেছিলেন। তারপরে আমার তখন সেখানে থাকতে ভাল লাগছিল না। আমি পূজনীয় ভূতেশানন্দজীকে বললাম, তিনি কেন জানিনা বললেন, "তুমি নরেশের সঙ্গে একটু কথা বলো।" পূজনীয় নরেশ মহারাজকে সেই কথা বলামাত্র তিনি বললেন, "বেশ তো তুমি একটু ঘুরে এসো। আসামের ধুবড়িতে দারুণ বন্যা হয়েছে। আমাদের মঠকে সেখানে রিলিফ রাখবার জন্য আসাম সরকার অনুরোধ করেছে। তুমি সেই রিলিফের ভার নিয়ে সেখানে যাও। গৌহাটিতে পূজনীয় পশুপতি মহারাজ আছেন । তিনি সবরকম সাহায্য করবেন। তাঁর নির্দেশমতো সেখানে গিয়েছিলাম। খুব ভাল কাজ হয়েছিল। আমি ফিরে আসার পরে তিনি আমাকে সে বিষয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। সেসব তিনি শুনেছিলেন সেখানকার তাঁর পূর্ব কলেজের অধ্যাপক বন্ধুর কাছ থেকে।

তারপরে বহু বছর কেটে গেছে সম্ভবত ১৯৮৫ তে তিনি তখন বেলুড় মঠের Assistant Secretary No. 1 পূজনীয় হিরন্ময়ানন্দজী জেনারেল সেক্রেটারি। সেইসময় একটা ঘটনায় আমাকে তিনি ডেকে পাঠান তাঁর অফিসে। আর একটু গম্ভীর ভাবে আমাকে একটি কথা বলেন। যেটা ঠিক ছিল না। 'আমিও হঠকারীর মতো সঙ্গে সঙ্গে তাতে React করে প্রত্যুত্তর দিই। কিন্তু আশ্চর্য্য! আমি তাঁর মুখেমুখে এবং বোধহয়, মুখের মতো জবাব দেওয়ায় তিনি একটু স্থির হয়ে আমার চোখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন। সম্ভবত আমার চোখে তখন জল এসেছিল। তারপরে তিনি গলার স্বর খুব নামিয়ে নিয়ে বললেন, "তুমি এতোটা কষ্ট পাবে বুঝিনি।

যাক্ ভাল থেকো।”

এরপরে একেবারে নতুন মানুষ দেখলাম। তাঁর সহ সংঘাধ্যক্ষ জীবনে। কাঁকুড়গাছি যাওয়ার পরে। আমি তাঁর ডাকে কয়েকবার সেখানে গিয়েছিলাম। বিকালে তাঁর সঙ্গে কখন বেড়িয়েছিও। কিছু প্রসঙ্গ হতো। সবচেয়ে বেশী তাঁর কাছে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম তিনি যখন দুর্গাপুর ও বর্ধমান আশ্রমে গিয়েছিলেন দীক্ষা দিতে। সে সময় প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা আমাকে করতে হতো। আশ্রমের ভক্তদের সমাবেশে তাঁর উপস্থিতিতেই। তিনি পেছনে চেয়ারে বসে শুনতেন তাঁর ভাষণে তিনি কখনও কখনও খুব আস্তে আস্তে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, “আলোক ঐ ঘটনাটা কোন সময়টা বলতো', শ্লোকটা বলতো?” একদিন বললেন—তুমি যখন ধুবড়িতে রিলিফ করতে গিয়েছিলে তখন সেখানে কথামৃত ক্লাস খুব ভাল করতে, সেখানকার ভক্তেরা আমায় জানিয়েছিল। এখন দেখলাম তা ঠিকই।” সেদিন লজ্জা পেয়েছিলাম। তারপরে বেলুড়মঠে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে তাঁকে প্রণাম করতে গেলেই তাঁর সেবক বিকাশ মহারাজ পাশ থেকে বলতো—“মহারাজ আপনার ছোট গুরুভাই এসেছে”। মহারাজ চোখে কথা বলতেন। একটু ইঙ্গিতে মিষ্টি হাসিতে তাকে সম্মতি জানাতেন।

শেষ করি একটি ছোট্ট ঘটনা দিয়ে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট মহারাজ পূজ্যপাদ আত্মস্থানন্দজী তখন মঠ মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি। এক স্নানযাত্রার দিন মিশন অফিসের নূতন বাড়িতে তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছি। তিনি তখন খাওয়ার টেবিলে বসেছেন সবে। তাঁকে প্রণাম করতেই দেখি তিনি তাঁর টেবিলের পাশে একটা ভেলভেটের বাক্সে রাখা একটা gold plated পকেট ঘড়ি হাতে তুলে নিয়ে বলছেন, “জানিস্ এটা কার? তোর গুরুদেবের আজ জন্মদিন, এই রকম এক জন্মদিনে তোর সিনিয়ার এক গুরুভাই এটা আমাকে দিয়েছিলেন। নরেশ মহারাজ ! আজ আবার সেই পূজ্যপাদ বিরজানন্দজীর জন্মদিন, তুই প্রণাম করতে এসেছিস্, তোর গুরুভাই এর দেওয়া সেই ঘড়িটা আজ তোকে দিলাম।' আমি আবার প্রণাম করে সেই বহুপুণ্যস্মৃতিধন্য ও পবিত্রস্পর্শ পূত পকেট ঘড়িটি চেন সমেত মাথায় তুলে নিলাম। আজও, ক্বচিৎ সেটা পকেট নিয়ে যাওয়ার সময় বুকের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্নেহস্পর্শটুকু পাই। স্মরণ করি তাঁদের, যাঁরা চিরকাল আমাদের সব ভুলত্রুটি ভুলে গিয়ে, স্নেহ ভালবাসায় তাঁদের করে নিয়েছেন। আজ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্মৃতি সুধার তরঙ্গে ভেসে যাই, পিছন ফিরে বার বার যেতে চাই তাঁদের চরণ তলে।

পূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজের পুণ্যস্মৃতি

স্বামী বরানন্দ

শ্রী ভগবানের অসীম কৃপায়, পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদে বর্তমানে সুস্থ বোধ করছি। অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত অবস্থায় রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুরে আছি। ১৯৯৯ সালের প্রথম আমার মুখে ভিতরে দাঁতের মাড়িতে ক্যানসার ধরা পরে। চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের পরামর্শ মতো রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে ভর্তি হই জুন মাসে। পূজ্যপাদ মহারাজ স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। সঞ্জীব মহারাজ, কাঁকুড়গাছি যোগদ্যান মঠ থেকে হাসপাতালে দেখতে আসেন। প্রেমানন্দ ওয়ার্ডে বৈকালবেলায় শুয়ে আছি। ব্রাদার এসে বলে গেল।

ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজ, পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ আপনাকে দেখতে আসছেন। কিছুক্ষণ পর মহারাজ আমার কাছে এলেন। মহারাজ কে প্রণাম করলাম। আমার সাথে অসুখ বিষয় কিছু কথা বললেন। তারপর মহারাজ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণর দিকে তাকিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করলেন, গোবিন্দ তুমি আবার ঠিক হয়ে যাবে। মহারাজকে পুনরায় প্রণাম করলাম। মহারাজ যোগদ্যান মঠের উদ্দেশ্যে ফিরে গেলেন। পূজ্যপাদ মহারাজের আশীর্বাদে আমার অপরাশ হলো। কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুরে ফিরে যাই।

কিছুদিন পর পূজ্যপাদ মহারাজকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্ম স্থান আঁটপুর মঠে নিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পূজ্যপাদ মহারাজ দীক্ষা দেবার জন্য আঁটপুরে আছেন। একদিন বৈকালে গুরুপ্রণাম নেবার পরে মহারাজকে নিয়ে নরেন্দ্র সরোবর দেখার জন্য বাহির হলোাম। মঠ থেকে ডান দিকে এসে লেবুতলায় মহারাজকে নিয়ে দাঁড়ালাম। পূজ্যপাদ মহারাজকে বললাম, মহারাজ আমাদের মন্দির প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মস্থানে আছে। মহারাজকে দেখিয়ে বললাম, ঐ পাকে অসুবিধা হয়। তাই প্রেমানন্দভবন থেকে মন্দির পর্যন্ত এই দিক দিয়ে রাস্তা

তৈরী করা যায় সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তদের যাতায়াত ভালো হবে। পূজ্যপাদ মহারাজ কিছুক্ষণ সমস্ত জমিটা ভালো করে দেখলেন। তারপর বললেন প্রেমানন্দ ভবন থেকে মন্দির পর্যন্ত রাস্তা হয়ে যাবে। পূজ্যপাদ মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। মহারাজের আশীর্বাদ নেওয়া পর রাস্তার জন্য জমি ক্রয় করতে শুরু করি। ধীরে ধীরে কয়েক বৎসরের মধ্যে জমি ক্রয় হয়ে গেল মন্দির পর্যন্ত। নীচুজমিতে মাটি দিয়ে উঁচু করে রাস্তা তৈরী হলো। তারপর পাকা রাস্তা হলো। পূজ্যপাদ মহারাজকে প্রেমানন্দ ভবন থেকে মন্দির পর্যন্ত নতুন রাস্তা দিয়ে মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কারণ, রাস্তা তৈরী হওয়ার আগে পূজ্যপাদ মহারাজ আমাদের ছেড়ে রামকৃষ্ণলোকে চলে গেছেন। আমার জীবনে দুঃখ রয়ে গেল। পূজ্যপাদ মহারাজের পুণ্যস্মৃতি আমার মনের মধ্যে সর্বদা উঁকি দেয়। পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করি।

স্বামী গহনানন্দ : এক প্রজ্বলিত জ্ঞানময় প্রদীপ

স্বামী নিত্যশুদ্ধানন্দ

১৯৬৯ সালে আমি একজন নবাগত Pre-probationer ব্রহ্মচারী হিসেবে কনখল সেবাশ্রম থেকে বেলুড় মঠে যাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগদান করতে। সেই সময় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতি। সেই কারণে মঠ কর্তৃপক্ষ আমাকে ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে সাময়িকভাবে সেইখানে পাঠান। সেই সময় পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ছিলেন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। অতএব সেই সঙ্কটের সময় আমার সুযোগ ঘটে পূজ্যপাদ মহারাজের নিকট সান্নিধ্যে আসার। যখন আমি তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি সেই সময় তাঁর চরিত্রের নিম্নলিখিত মহৎ গুণাবলী আমার চোখে পড়েছে :—

১) পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন অসীম ধৈর্যের অধিকারী। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, আধ্যাত্মিক জীবনে সফল হতে গেলে প্রয়োজন অনন্ত ধৈর্যের। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমাও আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যন্ত জরুরী ধৈর্যের গুনগান করেছেন। পূজ্যপাদ মহারাজের জীবনে এই গুণটির মূর্তরূপটি আমি দেখেছি।

২) বাহ্যতঃ তখনকার পরিস্থিতি ছিল উত্তাল, হতাশাজনক এবং বিক্ষুব্ধ। তা সত্ত্বেও পূজনীয় মহারাজ অসীম দৃঢ়তা এবং প্রশান্তির সাথে সমস্যার সম্মুখীন হতেন।

৩) কর্মীরা গালাগালি পর্যন্ত দিয়েছে তাঁকে এবং তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য তাঁকে দোষারোপ করেছে। শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা একদিন অন্তর তাঁর কাছে আসত এবং তাদের অন্যায় দাবী মানার জন্য তাঁকে চাপ দিত। তবে পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁর অমূল্য সময় এবং শক্তি ব্যয় করে তাদের কথা ধৈর্য ধরে শুনতেন কিন্তু যাই হোক না কেন মানসিক ভাবে বিচলিত হতেন না।

৪) যখন সমস্যাপূর্ণ সময়ের অবসান ঘটে এবং একটি সমাধান হয়, তখনও মহারাজ আগের মতোই সহানুভূতি এবং মহানুভবতা পোষণ করতেন সেইসব লোকেদের প্রতি যারা একদিন তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছে, গালি দিয়েছে এবং সেবাপ্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক

কার্যক্রম ব্যাহত করেছে। সাধারণত প্রতিশোধ নেওয়ার যে স্পৃহা দেখা যায়, তা পূজনীয় মহারাজের মধ্যে একেবারেই ছিল না।

আবার পরে, আমাকে ৫-৬ বছরের জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয় । যেহেতু বিভিন্ন বিভাগে তাঁর খুব কাছে থেকে কাজ করেছি, তাই আমি আরো অনেক গুণাবলী পূজ্যপাদ মহারাজের মধ্যে দেখেছি যা আমাদের অনুসরণীয়।

মহারাজ অন্যের মতোকে যথাযোগ্য সম্মান দিতেন এবং পরিচালন সমিতির সিদ্ধান্ত অথবা বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতে তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন। স্বামীজির সৈনিক হিসেবে তাঁর কাছে কাজ ছিল পূজা। তিনি তাঁর কাজে খুবই সুদক্ষ এবং নিপুণ ছিলেন। তিনি প্রত্যেকদিন হাসপাতালের ward-এ যেতেন এবং ধৈর্য ধরে প্রতিটি রোগীর খোঁজ নিতেন।

একদিকে দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদন এবং অপরদিকে অপরের জন্য বিশাল হৃদয়বত্তা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁরই সময় 'প্রেমানন্দ ward'-টি গড়ে ওঠে যা আমাদের সঙ্ঘের সাধুভাইদের প্রতি তাঁর খাঁটি ভালোবাসা পরিচায়ক। তিনি চাইতেন আমাদের সাধুরা যাতে সেবাপ্রতিষ্ঠানে সঠিক সেবা-যত্ন পায়। তিনি প্রেমানন্দ ward-এ ভর্তি সাধুদের খোঁজ নিতেন এবং তাদের শারীরিক এবং মানসিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকতেন। সাধুভাইদের জন্য তিনি যারপরনাই চেষ্টা করতেন।

অন্যের কষ্ট সর্বদা তাঁর মধ্যে এক গভীর সমবেদনা জাগ্রত করত। আর্ত মানুষের প্রতি তাঁর সমবেদনার প্রতিধ্বনিস্বরূপ তিনি প্রত্যন্ত এলাকায় ডাক্তার নার্সদের পাঠাতেন। সেই থেকে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র বা Mobile Dispensary শুরু হলো। তিনি নিজেকে শুধুমাত্র সেবাপ্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পেই সীমাবদ্ধ রাখতেন না। তিনি আমাদের অন্যান্য হাসপাতাল কেন্দ্রেও ডাক্তার এবং নার্সদের পাঠাতেন।

দরিদ্র মানুষের প্রতি তিনি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। আমরা যদি কোন গরীব মানুষকে তাঁর কাছে পাঠাতাম বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য তাহলে তিনি আমাদের উপর আস্থা রেখে তার জন্য আবশ্যক সব কিছু করে দিতেন। অনেকসময় তিনি সব নিয়মের বাইরে গিয়েও দরিদ্র এবং দুঃস্থ লোকেদের সাহায্য করতেন। এইসব দেখে আমার গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটি মনে পড়ত—

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।। (৬।৩২)

সেবা প্রতিষ্ঠানে সাধু ভাইদের সাথে কাজ করতে গিয়ে যদি কখনো মতোভেদ দেখা দিত তখন তিনি রাগও করতেন না বা বিচলিতও হতেন না বরং অন্যের মতামত মাথায় রেখে বিষয়টি সমাধান করতেন। এইসব ব্যাপারে তাঁর ব্যবহার ছিল

সহানুভূতিপূর্ণ এবং কোমল।

তিনি আমাদের সবসময় বলতেন :

১) সবসময় মনে রেখো "মা আছেন"।

২) আমরা যা করছি তা স্বামীজির কাজ।

৩) ঠাকুরের কৃপা ছাড়া কেউ এই সঙ্ঘে কাজ করতে পারবে না এবং তাঁর সেবা করতে পেরে আমাদের নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করা উচিৎ।

৪) স্বামীজির 'মঠের নিয়মাবলী' তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। স্বামীজি যেমন চাইতেন প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সদস্য যেন প্রতিষ্ঠানের কাজে নিজস্ব অবদান রাখে, তিনিও এইটি জোর দিতেন।

৫) মহারাজ স্বামীজির মঠের নিয়মাবলী থেকে যখন তখন উদ্ধৃতি দিতেন। তিনি সর্বদা জোর দিতেন যেন আমরা অন্য সাধুদের দোষ দেখে না বেড়াই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমায় বলেন, 'সাধুদের অনুপস্থিতিতে তাঁদের সমালোচনা এবং কুখ্যাতি করো না।

৬) তিনি আমাদের সবসময় মনে করিয়ে দিতেন, যদি তোমার কোন সাধুকে কিছু বলার থাকে তবে তার সাথে একান্তে সরাসরি কথা বলো।

সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজ অবসরগ্রহণের পর সেখানেই অবস্থান করতেন। পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ প্রত্যহ তাঁর কাছে যেতেন এবং সেবাপ্রতিষ্ঠানের বিষয়ে তাঁকে অবগত করতেন। স্বামী দয়ানন্দজীকে তাঁর উপযুক্ত সম্মান নিবেদনের নিদর্শনস্বরূপ তিনি এই কাজটি পরম আন্তরিকতার সাথে করে যেতেন। স্বামী দয়ানন্দজীর মতামত বিষয়ে মহারাজের পরম শ্রদ্ধা ছিল।

একবার সেবাপ্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হতে হয়। হাসপাতালটি বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেও চিন্তা করা হয়। এই পরিস্থিতিতেও মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের উপর বিশ্বাস হারাননি। তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি আবেদন প্রকাশ করেন যার প্রত্যুত্তরে বিপুল সাড়া মেলে এবং তার ফলে যথেষ্ট আর্থিক দান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এইভাবে সেবাপ্রতিষ্ঠান আর্থিক সঙ্কটের হাত থেকে নিস্তার পায়।

তাঁর ছিল বিরাট এবং সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টারূপে তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানের ভাবী সম্প্রসারণ দেখতে পান। যদিও তখন নিরন্তর আর্থিক অভাব তবুও তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের জন্য কঠিন পরিশ্রম করেন। আশেপাশের জায়গা জমি অধিগ্রহণের জন্য তিনি সেখানকার বস্তিবাসীদের জন্য আলাদা জমি কিনে তাদের সেখানে স্থানান্তরিত করেন। তিনি বহু নতুন বিভাগ শুরু করেন এবং সেবাপ্রতিষ্ঠানকে এমনভাবে তৈরী করেন যাতে তা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যভিত্তিক চাহিদা মেটাতে পারে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো 'Vivekananda Institute of Medical Sciences' যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি স্নাতকোত্তর বিভাগ। এইভাবে তিনি ডাক্তারের অভাব দূর করতে পেরেছিলেন। উপরন্তু তিনি কলকাতা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আনতে সফল হন। পূজনীয় মহারাজ নার্সদের প্রশিক্ষণ বিভাগও শুরু করেন। তিনি তাদের মধ্যে কাজকে মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবাজ্ঞানে করার ভাব সঞ্চারিত করেন। নিজের ব্যক্তিগত সুখ- সুবিধার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে তিনি সেবার আদর্শে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেন। এমনকি তাঁর খাওয়া এবং বিশ্রামের কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। কখনো তিনি তাঁর দুপুরের খাবার খেতেন বেলা ৩ টের সময় সন্ধ্যাবেলাতেও আমরা তাঁকে কাজ করতে দেখেছি এবং তিনি গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতেন যতক্ষণ না তিনি নিজের কর্তব্য সম্পাদন বিষয়ে সন্তুষ্ট হতেন। তাঁর কাছে কাজই ছিল পূজা।

এসব কিছুর সাথে, তিনি খুবই অন্তর্মুখ প্রকৃতির ছিলেন তাঁর সুদীর্ঘ আধ্যাত্মিক সাধন-ভজনের প্রভাবে। বাহ্যতঃ পরের সেবা এবং অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের উপর নির্ভরতা সহায়ে তিনি কঠিন পরিস্থিতিতেও অন্তরে প্রশান্তি বজায় রাখতে পারতেন। স্বরূপতঃ তিনি ছিলেন কৃচ্ছ্রসাধনা এবং সহজ সরল জীবনযাত্রার প্রতিমূর্তি। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন:

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্‌বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্‌।
ন জয়েন্দ্রসনং যাবজ্জিতং সর্বং জিতেরসে।। ১১.৮.২১।।

তাঁর রসনা সম্পূর্ণরূপে তাঁর বশে ছিল এবং তিনি ছিলেন সংযত আহারের জীবন্ত বিগ্রহ।

এরপর তিনি সঙ্ঘের সাধারণ-সম্পাদক এবং পরে সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ হন। যখন তিনি সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ, তখন তিনি কনখলে আসেন এবং আমরা কিছু সাধু ও ভক্তদের নিয়ে উত্তরাখন্ডের কেদারনাথ, বদ্রীনাথ এবং গঙ্গোত্রী তীর্থস্থানগুলি দর্শন করি। এই তীর্থযাত্রার সময় তিনি আমাদের সঙ্গে খুবই খোলামেলা ভাবে মেশেন। তিনি স্বামীজির বিষয়ে বলেন এবং আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, আমরা স্বামীজির সৈনিক এবং এই ভাব সর্বদা জাগ্রত রাখতে হবে। তাঁর সাথে তীর্থদর্শন আমাদের কাছে এক 'পরম সুযোগ" এবং উত্তম অভিজ্ঞতা।

পূজ্যপাদ মহারাজের চরিত্র সম্পর্কে বলতে গেলে গীতার এই শ্লোকটিই মনে পড়ে যায় :

দুঃখেষুনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমুনিরুচ্যতে।। (২।৫৬)

‘সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা’

স্বামী সর্বদেবানন্দ

এই বিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বর্তমান যুগে নব-আলোর পথে যাত্রার দিশারী। ‘আত্মনোমোক্ষার্থং জগৎ-হিতায় চ’-এর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এই সঙ্ঘ হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সহায়ক একটি অপূর্ব সংস্থা ! স্বামী প্রেমেশানন্দ মহারাজ এই সঙ্ঘকে ‘ব্রহ্মবিদ্যা রিসার্চ ইন্সটিটিউট’ নামে অভিহিত করেছেন। নিরন্তর স্বার্থহীন-অনলস সেবা-কর্মের দ্বারা সর্বভূতশায়ী ভগবানকে পূজা করে; অথবা তত্ত্ববিচারের পথ ধরে চলতে চলতে; বা মনোনিরোধের সাধনায় নিরত হয়ে; অথবা ভক্তি-ভালোবাসার পথ অনুসরণ এই চার সাধনপথে একটি, দুটি, তিনটি বা সব ক’টির দ্বারা জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা স্বীকৃত। সঙ্ঘের সাধুদের মধ্যে তাই দেখা যায় কারও মধ্যে একটির প্রবণতা অপরগুলির থেকে বেশী, কেউ বা দু’টি ভাবে নিজেকে পুষ্ট করেছেন। আবার কেউ বা তিনটি, অপরে জ্ঞান-কর্ম-যোগ-ভক্তি সব ক’টি ভাব নিয়েই এই ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বর লাভের সাধনায় রত থেকে অতীতে সিদ্ধি লাভ করেছেন এবং বর্তমানেও করে চলেছেন। এটা গৌরবের বিষয় যে এই মহান সঙ্ঘের মধ্যে থেকে কত নীরব জীবন এই অধ্যাত্ম-জ্ঞানের আলোতে আলোকিত হয়ে সঙ্ঘের উদ্দেশ্যকে জগতের সামনে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত করেছেন। কত ত্যাগব্রতী সাধু তাঁদের জীবন ব্যাপী সাধনার দ্বারা জ্ঞান-ভক্তি লাভ করে, নিজেরা ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছেন এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত বিশ্বে বহু মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছেন সেকথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ধর্মের বাহ্যাড়ম্বর নেই আছে শুধু ত্যাগ ও সেবার আদর্শে জীবন গঠন, আছে ব্রহ্মবিদ্যা রিসার্চ করে বা স্ব-স্বরূপের সাধনায় নিরত থেকে পরাবিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

স্বামী গহনানন্দ মহারাজের জীবন আমাদের কাছে বহুবিধ অনুপ্রেরণার সাক্ষী হয়ে আছে। আমরা শুনেছি যে নিরলস সেবা-কর্ম দেহবোধকে তুচ্ছ করতে শক্তি দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্ঘকে গভীরভাবে ভালোবেসে তাঁর সেবাতে নিজেকে সম্পূর্ণ

সঁপে দিতে পারলে জীবন মধুময় হয়। মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত আহার-নিদ্রা ও অন্যান্য প্রয়োজনগুলি তখন অনায়াসে যেন তুচ্ছ হয়ে যায়। এই ভাবগুলির পূর্তির দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে যখনই আমরা মহারাজের জীবনের দিকে তাকাই। তিনি ছিলেন আদর্শে স্থির, সেই সঙ্গে তাঁর অটুট পবিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁকে ধীর, স্থির এবং মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলেছিল।

মহারাজকে দূর থেকে দেখেছি সেই সঙ্ঘে যোগদানের সময়, ১৯৬৫ সাল থেকে। প্রণাম করার সময় মিষ্টি হাসিতে তাঁর ভালবাসার প্রকাশ দেখেছি। কিন্তু একটু কাছ থেকে তাঁকে দেখার সুযোগ হয় ১৯৮৮-তে। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক তিনি তখন। সমস্যা সঙ্কুল পরিবেশ, সদাই কর্মব্যস্ত তিনি। তাঁর থাকার ঘরের একদিকে থাকতেন স্বামী দয়ানন্দ, শিশুমঙ্গলের প্রতিষ্ঠাতা—অপরদিকের ঘরটি স্বামী অকুণ্ঠানন্দের ব্যবহারের জন্য। সাধুরা খেতে আসতেন তাঁদের ঘরের সামনের খাবার টেবিলে। ব্রেকফাস্টে সাধুরা একত্রিত হয়ে উচ্চস্বরে কথা বলছেন, হাসছেন। মহারাজ হয়ত তখনও ঘরে জপধ্যানাদি করছেন। কিন্তু কখনও বিরক্ত হতেন না। বরং সাধুরা আনন্দে আছে, দেখে খুশী হতেন। শান্তভাবেই সবাইকে এই আনন্দ উপভোগ করতে উৎসাহ দিতেন, আপত্তি করা তো দূরের কথা। অথচ সব দিকে তাঁর তীক্ষ্মদৃষ্টি। সাধু-ভাবের বিরোধী কোনও আচরণের স্থান ছিল না তাঁর সামনে।

ধ্যান-ভজন ইত্যাদির পর ঘর থেকে বেরিয়ে খাবার টেবিলে বসলেন। তখনই নিউজপেপারের হেডলাইনগুলো দেখে নিতে নিতে ব্রেকফাস্ট সেরে সেই যে বেরুলেন ফেরা সেই ২টা/২.৩০টা পর, যখন সব সাধুদের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে প্রায়। খেতে আসার পথে চলতে চলতেই কতজনকে কত কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন। আবার তারই মধ্যে সেবা প্রতিষ্ঠানের অফিসের মুখ্য-প্রাধানিক ফণীবাবুর সাথে কাজের কথাও বলছেন। দেখেছি, পথে চলার সময়টাও ঠাকুরের আশ্রমের মঙ্গলচিন্তা করছেন। খেতে খেতেও তাই। তারপর অল্প বিশ্রাম। আবার বিশ্রামের মধ্যেও ফোন আসত, কতো জরুরী কাজের কথা চলত। সন্ধ্যার আগে চা খেয়ে অফিসে গেলেন। ফিরছেন তখন সবার খাওয়া হয়ে গেছে, রাত ১০টা/১১টা। আবার খেতে বসে ফণীবাবুর সঙ্গে হাসপাতালের অসংখ্য সমস্যাবলীর আলোচনা ও সেসবের সমাধান প্রদান করতেন। শুতে শুতে মধ্যরাত পার হয়ে যেত! কিন্তু এতো পরিশ্রম, এতো সমস্যার মধ্যেও মুখের অম্লান হাসিটি অপরিবর্তিতই থাকত। এতো বড় হাসপাতালের কত কিছু সমস্যা অর্থনৈতিক সঙ্কট, লেবার প্রবলেম, ডক্টর-স্টাফ-নার্স থেকে ঝাড়ুদার পর্যন্ত সকলের দাবীদাওয়া এবং তারও উপরে তখন সিপিএমের নব-আবির্ভাবে সমাজে ভাংচুর চলছে।

এতো কিছু ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও মুখের দিকে তাকালে বোঝা যেত না যে, তাঁর কোনও উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা আছে বলে। বরং খুবই শান্ত-ধীর এবং গম্ভীর ভাবটাই ফুটে উঠত। দেখে মনে হত যেন কেবল নিজের বুদ্ধিমতো কর্তব্যকর্মই করে চলেছেন ফলাফলের চিন্তা শূন্য হয়ে। গোটা হাসপাতালের সব কিছুর ভার মাথায় নিয়ে, তার সর্ববিধ মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে জড়িত হয়ে, সব কিছু অশুভ শক্তি ও অর্থনৈতিক অসাচ্ছল্যের বিরুদ্ধে নির্ভীক ও দৃঢ় মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলার এই দৃষ্টান্ত দেখে বিস্মিত হতে হয়। তখন কিন্তু ভালো বুঝিনি আজ মনে হয়, সম্ভবতঃ তিনি ঠাকুরকে ভালোবেসে, তাঁর হয়ে গিয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁর মধ্যে এত শক্তির প্রকাশ ঘটেছিল!

যে কোনও কাজই হোক, সেটি ঠাকুরের। তাঁর যন্ত্রমাত্র হয়ে কাজ করা এটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তবে তা করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু মহারাজের জীবনে এই ভাবটা যেন সহজাত হয়ে ফুটে উঠেছিলো। 'সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা" – এটি তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যত ভয়ানক, ভয়াবহ, গুরুতর বাধাই আসুক না কেন, তিনি নির্ভয়, অটল থেকেছেন সেই সব পরিস্থিতিতে।

গীতার শিক্ষাকে তিনি যেন বাস্তবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর জীবনে। গীতা বলেছেন যে, হে অর্জুন কর্মকাণ্ডের অন্তরূপ সাংখ্যে (বেদান্তে) সর্ববিধ কর্মের সিদ্ধি বা সাফল্য লাভের জন্যে এই পাঁচটি কারণ উল্লিখিত হয়েছে। এগুলি আমার কাছে অবগত হও।

পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাঙ্খ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্।। ১৮-১৩।।
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথকচেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্।। ১৮-১৪।।

অর্থাৎ,

১) অধিষ্ঠান, সুস্থসবল শরীর

২) কর্তা বা আমি করব এই অহংকার। কিভাবে করব? ঠাকুরের দাস হয়ে আমি তাঁর কাজ করব।

৩) করণং চ পৃথক-বিধম্ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি এবং দশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট করণ। তীক্ষ্ম এবং খোলা—চোখ, নাক, মুখ, ইত্যাদি সব যন্ত্রগুলিকে সজাগ রেখে কাজ করা।

৪) বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা অর্থাৎ নানারকম পৃথক পৃথক চেষ্টা বা প্রাণাদির বিভিন্ন কার্য। সাফল্য লাভের জন্যে একভাবে চেষ্টা করে অসফল হলে নূতন, নূতন পথে ও পন্থায়

প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

৫) দৈবং চ এব অত্র পঞ্চমম্ বা সর্ব কর্মফল ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সমর্পণ। পূর্বোক্ত চারটি পন্থায় এতো প্রচেষ্টা করেও সফল হওয়া বা না হওয়া কারও হাতে নেই বুঝে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে নির্ভরতা নিষ্কাম কর্মযোগী তাই সর্বপ্রচেষ্টার অন্তে এই পঞ্চম সাধনারই অভ্যাস করেন ফলে সর্বসময়ে তিনি মনের আনন্দে থাকতে পারেন। সাফল্য বা অসাফল্য কোনও কিছুই তাঁকে উল্লসিত বা অশান্ত করতে পারে না।

কোনও কাজে সিদ্ধি লাভের জন্য সাধারণ মানুষও অক্লান্ত পরিশ্রম করে। আর তার সঙ্গে নিরন্তর দুর্ভাবনা এবং অশান্তিতেও ভুগে মরে 'আমি যা চাই, তাই-ই হতে হবে'—এই চিন্তাই মানুষকে দুঃখ-ভীতি ও মানসিক অশান্তিতে ভরিয়ে রাখে। কিন্তু সর্ববিধ আন্তরিক প্রচেষ্টার পরে সম্পূর্ণ ষোল আনা মন দিয়ে সকল কর্মকে সার্থক এবং পরিপূর্ণ করার চেষ্টার পর সব কিছুর ফল, তা ভালো বা মন্দ যেরকমই হোক না কেন, শ্রীভগবানের পায়ে সমর্পণ করা দরকার। কর্ম করেও অলিপ্ত থাকা বা নির্বিকার থাকাই কর্মযোগের আদর্শ! এর ফলে দেহে ক্লান্তি আসলেও মন কখনও অবসন্ন হয় না। অসীম শক্তি পশ্চাতে থেকে তাঁকে নব নব কাজে প্রেরণা দান করে। পূজনীয় মহারাজের জীবনেও যে নিরন্তর ক্লান্তি ও বিরামহীন কর্মানুষ্ঠান আমরা লক্ষ্য করেছি, তা দেখে মনে হয়েছে যে গীতার এই শিক্ষা ও ভাব তাঁর জীবনে যেন ফুটে উঠেছে।

অনেক পরের কথা। তখন তিনি মঠের সাধারণ সম্পাদক। শিকড়া আশ্রমের কিছু সমস্যা নিয়ে তাঁর উপদেশ-নির্দেশের জন্য মঠে এসেছি। পৌঁছেই দেখছি মহারাজ গাড়ীতে উঠছেন কলকাতায় যাবেন বলে। প্রণাম করতেই বললেন, কী ব্যাপার? আমার উত্তর পেয়ে বললেন, চলে এসো আমার গাড়ীতে। ভাবলাম সামান্য কথা গাড়ীতে যেতে যেতেই হবে। কিন্তু অন্যান্য প্রসঙ্গেই সময়টা কেটে গেল। সারাদিনের পর মিশন অফিসের সব কাজ কর্মের শেষে চলেছেন কলকাতায় উকিলের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে দেখি পূজনীয় অকুণ্ঠানন্দজীও তাঁর সেবকসহ অপেক্ষা করছেন ঐ উকিলবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে। অনেকক্ষণ ঐসব কাজের কথা হলো তারপর মহারাজ এলেন সেবা প্রতিষ্ঠানে। সেখানেরও বহুবিধ সমস্যা। তাঁদের পরামর্শাদি দিতে গেলেন অফিসে। সব কাজ কর্ম শেষ করে সেবা প্রতিষ্ঠানে গাড়ীতে উঠছেন তখন প্রায় রাত্রি ১০টা। তারপর মঠে ফিরলেন রাত ১১টা নাগাদ। পুরাতন মিশন অফিসের সামনে গাড়ী থেকে নেমে গাড়িটাকে ছেড়ে দিলেন। নিস্তব্ধ ধ্যানমগ্ন বেলুড় মঠ সব মন্দিরই বন্ধ। উনি

শান্তভাবে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে গেলেন। মহারাজ সিঁড়ি দিয়ে উঠে বন্ধ দরজার সামনেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন মাকে। মনে হলো মহারাজ যেন সারাদিনের সব কাজকর্ম করে এসে, জগজ্জননী সারদামায়ের পায়ে সব নিবেদন করে নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর ধীরে ধীরে পুরাতন মিশন অফিসের দোতলায় নিজের ঘরের দিকে রওনা হলেন। আমিও পিছু পিছু গেলাম। তারপর মুখ -হাত ধুয়ে, একটু বসে তিনি আমার প্রশ্ন শুনলেন ও সেগুলির উত্তর দিলেন।

আমি বিদায় নিয়ে মঙ্কস্ কোয়ার্টারের দিকে রওনা হলোাম রাত্রিবাসের জন্য। উনি তখন খেতে বসলেন। মনে মনে ভাবলাম যে তাঁর এই বয়েসে সকাল ৯টা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নিরলসভাবে এতো কাজকর্ম করা কীভাবে সম্ভব হচ্ছে? আমরা বয়েসে তাঁর থেকে অনেক ছোট, কিন্তু সামান্য একটু কাজ করেই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ি। আর মহারাজ দিনের পর দিন সমস্যার পর সমস্যার সমাধানরূপ মঠ-মিশনের বিশাল পরিচালনা-কর্ম কীভাবে করতে সক্ষম হচ্ছেন? বিশেষতঃ মুখে বিরক্তি, অশান্তি বা অতৃপ্তির কোনও ভাব দেখলাম না এটাই আশ্চর্য! এই কর্মযজ্ঞের সাধনার পশ্চাতে একটা কিছু রহস্য আছে। আমার মনে হয় ঐ গীতার আদর্শ, যা এ-যুগে স্বামিজী আবার নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করে বলে গেছেন সেই শিক্ষাই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর জীবনে। এই আদর্শ যে বাস্তবে আজও ফলানো যায় তারই ইঙ্গিত পাই যেন এইসব ছোটখাটো ঘটনায়। আমি তো একদিনের ঘটনা বললাম। তাঁর জীবনটাই ছিল যেন অনলস কর্মের সুরে বাঁধা। সমস্ত কর্ম করেও মুখের শান্তি ও তৃপ্তি অমলিন! আমাদের ভাববিহীন কাজ যা কর্মভোগে নিয়ে যায় – ভাবযুক্ত কর্মযোগ মুক্তির পথে নিয়ে যায়, এটাই শিক্ষণীয়।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা জগতে এক বিরাট নাম! ১৯৩২ সালে একটা ছোট্ট টিনশেডে শিশুমঙ্গল নামে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল পূজণীয় দয়ানন্দজী মহারাজে র প্রাণান্ত ত্যাগ ও সেবায়। ১৯৫৮-১৯৬৩ দয়ানন্দজীর সুযোগ্য সহকারী হয়ে মা ও শিশুদের সেবার আদর্শে মহারাজ নিজেকে তৈরী করেছিলেন। দয়ানন্দজী এই বিশাল কর্মভার সুযোগ্য সহকারীর উপর ন্যস্ত করে নিজে অবসর গ্রহণ করেন। তারপরে সম্পাদক হিসাবে সুদীর্ঘ ২২ বছর ধরে অপরিসীম ও অনলস প্রচেষ্টায় শিশুমঙ্গলকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালরূপে গড়ে তোলেন মহারাজ। আমরা জানি, যে-কোনো সংস্থাকে গড়ে তোলার জন্য অনেক ত্যাগ ও তপস্যার প্রয়োজন হয়। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা, ডাক্তার- নার্স-সেবক থেকে ঝাড়ুদার পর্যন্ত সকলকে এই সেবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করা, আশ্রম প্রসারণের জন্য জমি সংগ্রহ করা, নূতন নূতন ব্লক

সংযোজনের জন্যে গৃহনির্মাণ থেকে শুরু করে হাসপাতালের উপযোগী মেডিকেল ইন্সট্রুমেন্টস ইত্যাদি সংগ্রহ করারূপ অন্তহীন কাজ, অন্তহীন সমস্যা। প্রভুর সেবাবুদ্ধিতে না করতে পারলে এতসব কাজ করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে ১৯৬৫ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি পরিষদের সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। ফলে আরও কাজের ভার বাড়তে থাকে। এমনিভাবে চলতে চলতে ১৯৭৯ সালে সঙ্ঘের সহকারী সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হবার পরে তাঁকে মঠের কাজের দিকে বেশী নজর দিতে হয়—ক্রমে মঠে চলে আসেন।

ইতিমধ্যে বড় রাজনৈতিক বিপর্যয় সেবা প্রতিষ্ঠানকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলো। অর্থনৈতিক অনটনের মধ্যে দিয়ে চালাতে হয় সেবা প্রতিষ্ঠানকে। রাজনীতিক নেতারা শ্রমিক-ইউনিয়ন ইত্যাদি করে (সামান্য কিছু ডাক্তার-নার্স-সেবক ছাড়া) সবাইকে খেপিয়ে দেন সুযোগ-সুবিধা ও মাইনে বাড়ানোর দাবীতে বন্ধ ডাকা এবং ঘেরাও-এর জন্য। শুরু হয় কাজ না করা আর 'আমাদের দাবী মানতে হবে' ইত্যাদি শ্লোগানে হাসপাতাল চত্বর মুখরিত!! অবশেষে এমন অবস্থা যে হাসপাতাল বন্ধ করে দিতে হলো। ঝাড়ুদার থেকে সব কর্মীরা, যারা অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হয়ে চাকরীতে প্রবেশ করে ধন্য হয়েছিল তারাই মারমুখী হয়ে উঠলেন। অবশেষে সর্বস্তরে বন্ধ!! মহারাজ কিন্তু নিজ-জীবনের জন্য শঙ্কিত না হয়ে অতুলনীয় সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন। এক এক করে হাসপাতালে আউটডোর বন্ধ হলো, রোগী ভর্তি বন্ধ হলো হাসপাতালের রোগীদের অন্য হাসপাতালে পাঠানো শুরু হলো। শেষে প্রায় সব বন্ধ। আমরা তখন ট্রেনিং সেন্টারে। ডাক পড়ল ব্রহ্মচারীদের ঐ অবস্থার মোকাবিলা করতে। পূতিগন্ধময় পরিবেশ ঝাড়ুদাররা কাজ তো বন্ধ করেছিলই, তারও উপরে ড্রেনের মুখ সব বন্ধ করে দেয়। ফলে হেঁটে যাওয়া দুষ্কর – দূষিত আবর্জনা ভরা এক-দেড় হাত জলের উপর দিয়ে হেঁটে তবে হাসপাতাল থেকে বাইরে বা সাধুনিবাস যেতে হবে। সাধুরাই নেমে পড়লেন ঐ ড্রেনের মুখ খুঁজে তার আবর্জনা সরিয়ে জল নিকাশের কাজে। এসবের পরিচালনা করছেন মহারাজ, শান্তভাবে। হাসপাতালের প্রবেশের মুখে ইউনিয়নের লাল ঝান্ডা লাগানো পতাকা ব্যঙ্গ ভরা মুখ নিয়ে সাধুদের দিকে তাকায় আমাদেরই কর্মীরা!! সাধুদের সম্বন্ধে অপমানসূচক মন্তব্যও শোনা যায় যাতায়াতের পথে।

এমন অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে মহারাজ কিন্তু শান্ত ও অচঞ্চল! প্রতিদিনই উৎপাত – মাইক লাগিয়ে চিৎকার দাবী মানার মাঝে মাঝে ঘেরাও!! এসবের মধ্যে একদিন নামকরা এক রাজনৈতিক নেতা মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চান। উদ্দেশ্য চাপ সৃষ্টি করে দাবীদাওয়া আদায়। মহারাজ শান্ত ভাবে আলোচনার জন্য বসলেন ও

বুঝিয়ে বলতে চাইলেন যে এটি সেবামূলক সংস্থা; রোগীদের বিনামূল্যে অথবা স্বল্প মূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। তাতে আমাদের প্রচুর ডেফিসিট থাকে এবং অর্থভিক্ষা করে হাসপাতাল চালাতে হয়। আপনাদের সরকারী অনুদানও অতি অল্প। তাই ইচ্ছা থাকলেও আমাদের সঙ্গতি বা সামর্থ্য নেই মাইনে বাড়াবার। মন্ত্রীমশাই নাছোড়বান্দা শেষে হুমকি দিয়ে বললেন, 'জানেন? দাবী না মানলে আমরা এই হাসপাতাল ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবো"। শান্ত ও গম্ভীর থেকে মহারাজ উত্তর দিলেন, 'আপনারা ভাঙতে জানেন, ভাঙুন। আমরা কিন্তু গড়তে জানি, নতুন করে গড়ে নেব'। এই বলে তিনি ধীর পদে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন। মন্ত্রীমশাই এমন ভয়হীন, দৃঢ়, সংকল্পে অটুট ব্যক্তিত্ব জীবনে বোধহয় বেশী দেখেননি! তাই হুমকি দিয়েই বিদায় নিলেন।

এত বছর পরে বর্তমান পরিস্থিতি দেখে বুঝা বা বুঝানো সম্ভব নয় যে কি অসম্ভব ধরনের মানসিক চাপের মধ্যে মহারাজকে প্রতিদিন থাকতে হত! তথাপি এই দৃঢ়তা ও অনমনীয় মনের ভাবকে দিনের পর দিন ধরে রেখে, কর্মীদের নিজ নিজ কাজে যোগদান করিয়ে, ঐ হাসপাতাল আবার চালু করলেন। মহারাজের অসীম ধৈর্য, দক্ষতা এবং পরিচালন ক্ষমতাই শুধু নয়, তাঁর অসীম ভগবৎ-নির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস তখন বহু সাধু ও ভক্তকে সেবা ও ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও অনুপ্রেরণা দিতে থাকবে।

মঠের এক পুরনো সাধু এক অপূর্ব ঘটনা শুনিয়েছিলেন। গহনানন্দজী তখন শিলং রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মাধ্যক্ষ আর তিনি সদ্য যোগদান করা ব্রহ্মচারী। খাবার সময় না দেখতে পেয়ে, নিজেই ব্রহ্মচারীর ঘরে গিয়ে জানলেন যে তার একটু জ্বর হয়েছে। মহারাজের প্রশ্ন, 'ডাক্তার দেখিয়েছ? ওষুধ খাচ্ছ?' 'না, মহারাজ, সামান্য জ্বর হয়েছে ও আপনিই সেরে যাবে। এই উত্তর শুনে মহারাজ বললেন : দেখ, শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে স্থান পাবার আগে এই শরীরটা তোমার ছিল, এখন এটি শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পত্তি। তাই তাঁর কাজের জন্যে এটির যত্ন নিতে হবে। কি সুন্দর শিক্ষাদান পদ্ধতি! কত বড় আদর্শ এবং উচ্চভাবকে চিরকালের জন্য ঐ সাধুর মনে গেঁথে দিয়েছিলেন সেদিন, যা সেই সাধুর সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করেছে। আমরাও এক শিক্ষা পেলাম শারীরিক আধি-ব্যাধিকে একটা নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার। শরীরকে উপেক্ষা করে নিজের এবং অপরের কষ্টের কারণ হওয়া এবং অপরের সেবা নেওয়া ঠিক নয়। প্রভুর সঙ্ঘের সেবা করতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে থেকে তথাকথিত কৃচ্ছ্রতা ও বৈরাগ্য দেখানোর চেয়ে শরীরের যত্ন নেওয়া অনেক ভালো। আমার দ্বারা প্রভুর কাজ বা সেবায় ত্রুটি

না হয় এই ভাবটিকে বাস্তবায়িত করা অনেক বড় আধ্যাত্মিক সাধনা। শরীরকে উপেক্ষা না করা মানে এটাকে প্যাম্পার করাও না। মহারাজজীর সারা জীবনটা ছিল প্রভুর কাজে, তাঁর সেবায় সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন। সেই জন্য প্রতিদিন নিয়মিত এক্সারসাইজ, সে সময়াভাবে সামান্য হলেও ব্যতিক্রম করতেন না। তাই অত কাজ করতে পারতেন সারাদিন!! 'যা আছে আমার লহ উপহার সঁপিনু জীবন তব সেবায়' পুজ্যপাদ প্রেমেশানন্দজীর এই ভাবটিকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে আমাদেরও। আমার নিজের বলতে কিছু নেই। 'যা আছে আমার দেহ-মন-বুদ্ধি-অহংকারে সব কিছুই তাঁর। 'আমি' বুদ্ধি ত্যাগ করতে পারলেই 'তিনি' এসে হাজির হবেন। এই আমি বুদ্ধি ও আমার বুদ্ধিকে জয় করে সচেতন ভাবে জীবনপথে এগিয়ে যাওয়া এটা এক অতি সহজ পন্থা হলেও জীবনে পালন করা অত্যন্ত কঠিন। গহনানন্দজীর ঐ সামান্য উপদেশ ধরে জীবন পথে চলতে শুরু করলে, 'আমি'-র মৃত্যু হবে আবির্ভাব হবে তাঁর যিনি শাশ্বত সনাতন শ্রীরামকৃষ্ণ !!

মহারাজের নিজস্ব বা ব্যক্তিগত বলে কিছু ছিল না। সবই সঙ্ঘের সেবা। আর সঙ্ঘের সেবা মানে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা। সঙ্ঘ তাঁর স্থূল শরীর এই ভাব! তাই মহারাজের জীবনে রিল্যাক্সেশন টাইম্ বা এন্টারটেনইমেন্ট টাইম্ বলেও কিছু ছিল না। আমরা কিছুদিন কাজ করে ছুটি প্রার্থনা করি হৃষীকেশ উত্তরকাশীতে যাবার অনুরোধ নিয়ে হাজির হই ! কিন্তু মহারাজের জীবনে ঠাকুরের কাজই ছিল তপস্যা, সাধন-ভজন, মুক্তিলাভের পন্থা !!

একটা ঘটনা : শিকড়া মঠ অধিগ্রহণের কাজে অকুণ্ঠানন্দজীকে সাহায্য করার জন্য মঠ আমাকে তাঁর কাছে পাঠান। আমার জীবনে এটি একটি মহা শিক্ষালাভের ও সাধুসঙ্গের সুযোগ এনে দিয়েছিলো। বাহ্যতঃ অকুণ্ঠানন্দজীর কর্মপন্থা অনেক সময় আমাদের মতো নবীন সাধুদের মনোমতো হত না। মনে হত যে উনি অতিরিক্ত পারফেকশনিস্ট তাই কাজ এগোয় না। আমি কখনও মহারাজকে অকুণ্ঠানন্দজী সম্বন্ধে সে-কথা বলতে গেছি। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হয়েছি যে কি অগাধ শ্রদ্ধা ভালোবাসা গহনানন্দজী, আত্মস্থানন্দজী বহন করতেন অকুণ্ঠানন্দজীর প্রতি!! আমার মনে হত আমি অর্বাচীন তাই বুঝিনা বলেই অমন ধারণা পোষণ করছি। এমনকি অনেক সময় অকুণ্ঠানন্দজী বকাবকি করছেন মহারাজকে আমাদের মতো ছোটদের সামনে 'তুমি খালি কাজ বাড়াতে চাও, এক্সপ্যানশনিস্ট' ইত্যাদি বলে!! মহারাজ কিন্তু গায়েই মাখলেন না, মিষ্টি হাসি দিয়ে অন্য কথায় চলে গেলেন। তাঁদের পরস্পরের শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা কতো গভীর, সেটা বুঝিয়ে দিলেন আমাদের সামনে। একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, এতো

শ্রদ্ধা করার কারণ কী? উত্তরে মহারাজ বলেছিলেন, ‘সাধে কি আর শ্রদ্ধা করি? কতো বড় শিক্ষিত মানুষ, কি বিপুল ধন ঐশ্বর্য বৈভবের মালিক!! তুচ্ছ বুদ্ধিতে সব ত্যাগ করে এই সাধু জীবনে এসেছেন কি ত্যাগ, কি বৈরাগ্য এর তুলনা কি আছে? আর কি কৃচ্ছ্রতার জীবন, দেখেছ? ঠাকুরের জন্য নিবেদিত প্রাণ! শ্রদ্ধায় আপনিই মাথা নত হয়!” এই তো আমাদের সঙ্ঘ যা আদিকাল থেকে এই ধরনের ভালোবাসা-শ্রদ্ধার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এটিই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের গৌরব! এই শিক্ষাকেই গহনানন্দজীর মতো ধারক- বাহকরা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, এই আদর্শকে বুঝতে সাহায্য করেছেন!

যে কথা বলছিলাম – ছুটি চাওয়ার ব্যাপার। আমি তখন বেলুড় পলিটেকনিকের দেখাশোনা করি। সে-সময়ে দীর্ঘ ৬৮ দিন ধরে শিক্ষকরা আন্দোলন চালাচ্ছিলেন বন্ধ ডেকে। তার উপর আবার ঐ শিক্ষকরাই ছাত্রদের উস্কানি দিয়ে তাদেরকে ঘেরাও-এর পথে ঠেলে দিলেন। ফলে কয়েকবার ঘেরাও হতে হলো। এসবের ফলে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই ছুটি চাইছিলাম। কিন্তু তার বিনিময়ে মঠ অকুণ্ঠানন্দজীর কাছে আমাকে পাঠালেন তাঁর সহকারী হিসাবে। তখনই জানিয়েছিলাম শিকড়ার অধিগ্রহণ হয়ে গেলেই যেন আমার ছুটি মঞ্জুর হয়। কোনও উত্তর না দিয়ে আমাকে পাঠানো হলো ঐ অধিগ্রহণের কাজে! বেশ সময় লাগলো ঐ ‘ব্রহ্মানন্দ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-কে মূল ‘রামকৃষ্ণ মঠ ট্রাস্ট’-এ ফিরিয়ে আনতে। এখন সব কাজ শেষ। সেদিন আলিপুর কোর্টে জাজের সামনে হস্তান্তরের ডীড সই করতে হবে। তাই বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের প্রতিনিধি হিসাবে গহনানন্দজী এসেছেন। আর, অকুণ্ঠানন্দজীর সঙ্গে আমিও হাজির হয়েছি কোর্টে! উভয় পক্ষের সব সইসাবুদ জজসাহেবের সামনে হয়ে গেল। আমি তখন কোর্টে দাঁড়িয়েই মহারাজজীকে বললাম, ‘মহারাজ, আজ তো অধিগ্রহণের কাজ শেষ হলো দয়া করে আমার ছুটির ব্যবস্থা করুন’। উনি সুন্দর একটু হাসি হেসে পকেট থেকে একটা খাম বার করে হাতে দিয়ে বললেন, ‘খুলে পড়ে দেখ। আমি তো কিছু না বুঝতে পেরে চিঠিটা খুলে দেখলাম এবং হকচকিয়ে গেলাম। পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ ভূতেশানন্দজীর সই-করা বেলুড় মঠের ট্রাস্টি বোর্ডের রেসল্যুশন :

‘অন বিহাফ অফ দ্য ট্রাস্টিস অফ বেলুড় মঠ, ইউ আর অ্যাপয়েন্টড অ্যাস দ্য হেড অফ দ্য ব্রহ্মানন্দ ট্রাস্ট, শিকড়া, উইথ এফেক্ট ফ্রম দ্য ডেট দিস ট্রান্সফার ...

আমি একটু হতাশই হলোম। আমি আবার ছুটির জন্য অনুনয় করাতে মহারাজ

বললেন, 'এটা সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত। সঙ্ঘের আদেশ, ঠাকুরের আদেশ। এখন শিকড়া আশ্রমের সেবায় লাগো। ঐটাই তো ছুটি। ঠাকুরের কাজে নিজেকে সঁপে দেওয়া কি তপস্যা নয়? কেবল হৃষীকেশ-উত্তরকাশীতে ভিক্ষার রুটি খেলেই তপস্যা? জীবন ধন্য হবে প্রভুর সেবা করলে! যাও, প্রভুর কাজে লেগে যাও।' মহারাজের মুখ থেকে শোনা ঐ কথাগুলি তত্ত্বতঃ বুঝতে পারলেও মন মেনে নেয় নি তখন। কিন্তু আজ পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর কথা কত সত্য! শিকড়ার কয়টি বছর আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। ধন্য আমি। এর কারণ ঐ কথাগুলি যিনি বলেছিলেন, তা তাঁর মুখের কথা নয়। তাঁর জীবন তো ঐ 'ছুটিহীন ছুটি'রূপ কর্মযজ্ঞে আত্মসমর্পণের ইতিহাস।

সাধারণ মানুষকে সম্মান দেওয়া – এটাও তাঁর এক বৈশিষ্ট্য! মহারাজ সেবার শিকড়া আশ্রমে এসেছেন। তিনি তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক। তাঁর আগমনে আমরা ব্যস্ত তাঁকে নিয়ে। তিনি শিকড়া আশ্রম থেকে পরিচালিত বাচ্চাদের জন্য চারটি স্কুল দেখতে গেলেন। মুন্ডাদের গ্রামগুলিতে (হারাণেঘেড়ি, গোবেরিয়া, ইত্যাদি) হতদরিদ্র, অশিক্ষিত ও দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের ছেলে মেয়েগুলো শিক্ষার আলো পাচ্ছে দেখে খুবই খুশী হলেন। এদের বাবা -মা কেউই জীবনে কখনও নিজেদের নাম সই পর্যন্ত করতে জানত না। বাবা-দাদারা মাছের ভেড়িতে কাজ করত। রোজগারের টাকায় মদ খেয়ে দিনান্তে বাড়ি ফিরত। ফিরে খাবার কিছু নেই দেখে নেশার ঘোরে ঐ অভুক্ত স্ত্রী ও অন্যদের মারধোর করত। এমন পরিবেশে এই স্কুলগুলি চালিত হচ্ছিল। স্থানীয় শিক্ষিত যুবক যুবতী অথবা অন্যস্কুলের শিক্ষক সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে শিক্ষকতা করে চলছেন সাধুদের প্রেরণায় সামান্য কিছু হাত খরচার বিনিময়ে! এই সেবাযজ্ঞ আদিবাসী ছেলেমেয়েদের জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলে এবং বাচ্চারা ও মায়েরা শিক্ষার স্পর্শে আসার ফলে বাড়ির পুরুষদের জীবনেও ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসে। মদ খাওয়া এবং অত্যাচার করাও কমে যায়। বিদ্যালয় শুরুর ২-৩ বছরের মধ্যে আমূল পরিবর্তনের কাহিনী আদিবাসী মায়েদের ও বাচ্চাগুলোর মুখ থেকে শুনে মহারাজ খুবই অভিভূত হন। চার জায়গায় চারটি স্কুল চলছিল। মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনির মধ্যে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত এই নন্-ফর্মাল স্কুলগুলি চলছে শিকড়া মঠের সামান্য অর্থনৈতিক সহায়তায়। না আছে বেঞ্চ-হাইবেঞ্চ, না কার্পেট, না আছে ক্লাসের মধ্যে পার্টিশন। মাটির মেঝেতে সামান্য চাটাই বিছানো, একটা করে ব্ল্যাকবোর্ড, সামান্য চক-পেন্সিল সম্বলে বিনা পারিশ্রমিকে অবহেলিত সমাজের এতগুলি ছেলেমেয়ে ও তাদের মায়েদের শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা তাঁর ভালো

লাগে। এটিকে মডেল করে কী করে মিশনের অন্যান্য গ্রামীন-শাখাতে এই ধরনের প্রকল্প নেওয়া যায়, তার জন্যে একটা প্ল্যান বা ছক বানাতে বললেন আমাকে। আমি তখন ভেবে আশ্চর্য হয়েছিলাম, যে, যিনি এতো বড় সেবা প্রতিষ্ঠানের মতো হাসপাতালের প্ল্যানার এবং পরিচালক ছিলেন, তিনি এই সামান্য ছোট্ট প্রকল্পকে এতো গভীর মর্যাদা দিতে পারলেন কীভাবে?

যাক্, এইভাবে সকাল থেকে শুরু করে দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গেল। তবু নিজের আহার বিশ্রামের কথা ভুলে গিয়ে, ঐ আদিবাসীদের সুখ দুঃখের কথা শুনতে গিয়ে তিনি বিহ্বল হয়ে গেছিলেন। আদিবাসীরা মাটির দাওয়াতে চাটাইতে বসতে দিয়েছে। একটা ডাব কেটে দিয়েছে, এই আপ্যায়নে তিনি মুগ্ধ। ঐ দরিদ্র মানুষগুলির প্রতি তাঁর সমান সমান আচরণ দেখে এতটুকুও মনে করতে দেননি যে তিনি ওদের থেকে বিশেষ কিছু বড়। তিনি বিশ্বজোড়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক। বাইরের গাম্ভীর্যের মধ্যে ঐ মাধুর্যকে দেখতে পেয়ে তাঁর এক স্নেহময় রূপ আমাদের চোখে ধরা পড়ে গেছিল সেদিন।

মহারাজ স্কুল পরিদর্শনের পরে ফিরে এলেন শিকড়া আশ্রমে। সেখানে গণেশ নামে এক যুবক উত্তর চব্বিশ পরগণার শুলকুনি গ্রাম থেকে এসে হাজির। মহারাজকে নিয়ে যেতে চায় তাদের গ্রামের একটা যুব-সংস্থায়! সেখানে বক্তৃতাও দিতে হবে গ্রামের মানুষদের কাছে। গণেশ বলল যে, তাদের ওখানে নিয়ে যাওয়া, দুপুরে খাওয়া, বিশ্রাম, ইত্যাদি সবের ব্যবস্থা সে করবে। এমন কি বিকালে বলাবলির পর সে টাকী আশ্রমে মহারাজকে ফিরিয়ে দেবে ঠিক সময় মতো। তার অদম্য উৎসাহ দেখে মহারাজ সহজেই রাজী হয়ে গেলেন। তখন আমরা বুঝতে পারিনি স্থানটা কত দুর্গম। এবং প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষদের হালচালের সঙ্গে তাল দেওয়াটা কতটা কঠিন হবে। যাই হোক, গণেশ অনুমতি আদায় করে চলে গেলো—টাকী আশ্রম থেকে দু'দিন পরে নিয়ে যাবার জন্য আসবে বলে।

মহারাজ রাত্রিটা শিকড়ায় কাটিয়ে, পরের দিন টাকী আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, আমরাও সাথে চললাম। ওখানে অধ্যক্ষ বিনয় মহারাজ (যতীন্দ্রানন্দজী) তো মহারাজকে পেয়ে খুশী। দুপুরের প্রসাদ-বিশ্রামাদির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। বিকালে এক অনুষ্ঠানে মহারাজ বক্তৃতাদি দিয়ে রাত্রিতে আশ্রমে রইলেন। পরের দিন গণেশ এসে হাজির সকালে। আমাদের দলে যতীন্দ্রানন্দজী, মহারাজ, গণেশ, তার বন্ধু, ও আমি। ইছামতীর তীরে হাসনাবাদ খেয়াঘাট, টাকী আশ্রমের খুবই কাছে। সেখানে

দেশী একটা নৌকা অপেক্ষা করছিলো। তাতে উঠলেন দুই প্রাচীন সাধু। বৈঠা বেয়ে ইছামতীর উপর দিয়ে নৌকা চলল। অবশেষে শুলকুনিতে নৌকা পৌঁছাল। তখন ভাটার সময়। পাড় নৌকা থেকে অনেকটা দূরে। নামার কী হবে? কোনও ব্যবস্থা নেই। নৌকা থেকে কারও সাহায্যে নামলেও, আমরা হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যেতাম পাঁকে!! আমি তো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। ভাবছি গণেশ একি ব্যবস্থা করল! যতীন্দ্রানন্দজীও বিরক্ত হচ্ছেন, গণেশের কাজকর্ম ও ব্যবস্থাপনা দেখে। মহারাজ কিন্তু ধীরস্থির ও শান্ত। শেষে গণেশ দু'জন লোক যোগাড় করল, তারা দু'জনের দুই-দুই হাত একত্রিত করে মহারাজকে তাদের হাতের উপর চ্যাংদোলা করে হাঁটু সমান পাঁক দিয়ে অতি কষ্টে তীরে নিয়ে এসে হাজির করল! একই পদ্ধতিতে যতীন্দ্রানন্দজী ও আমাকে পাড়ে নিয়ে এল ঐ শক্ত সমর্থ মানুষ দু'জন! এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার শুরু এখানে। তারপর তো একটা স্কুলে নিয়ে হাজির করল। সেখানেই দুপুরের খাওয়া-বিশ্রাম-বক্তৃতার ব্যবস্থা! এদিকে দুপুর অতিক্রান্ত, ১টা বাজে, ২টা বাজে তখনও রান্না হচ্ছে তো হচ্ছেই!! যতীন্দ্রানন্দজীর ডায়াবেটিস তাই তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। আমরা গণেশকে বকাবকি করছি। মহারাজ কিন্তু শান্তভাবে ওদের সঙ্গে আপন লোকের মতো কথা বলে যাচ্ছেন। কি অ্যাডজাস্টমেন্ট করার ক্ষমতা। আড়াইটে নাগাদ খাবার ব্যবস্থা হলো। খেয়ে উঠতে উঠতে তিনটে-সওয়া তিনটা! কথা ছিল ধর্ম-সভা হবে চারটায়। কিন্তু দেখা গেলো চারটের সময় স্টেজ বাঁধাবাঁধি চলছে তখনও। জন-মনুষ্য নেই; শুধু গণেশ ও তার দু'চার জন বন্ধু উদ্যোক্তা ছাড়া!! মহারাজ কিন্তু এতো সব অব্যবস্থা দেখে খুশীই আছেন –এতটুকু বিরক্তি নেই!!

সন্ধ্যা ৭টা তখন লোকজন জুটতে লাগল। তারও পরে সভা শুরু হলো। মহারাজ সুন্দর উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়ে যথারীতি বললেন প্রায় ৪৫ মিনিট। যতীন্দ্রানন্দজী অল্প কিছু বলেই শেষ করলেন, আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। তারপর রাত্রির খাবার খাওয়ানো র জন্য পীড়াপীড়ি। এসব পর্ব সেরে, নৌকা ইত্যাদি করে টাকী আশ্রমে ফিরতে গিয়ে মধ্যরাত্র অতিক্রান্ত! আমরা ক্লান্ত, মনে মনে অসন্তুষ্ট। মহারাজ কিন্তু গণেশের গুণগান করে বলছেন : 'ছেলেটার কি উৎসাহ দেখেছ? এইরকম অজগাঁয়ে সবাইকে একত্রিত করতে চাইছে ঠাকুরের নামে। গণেশকে তোমরা সাপোর্ট দিও যাতে ঐ শুলকুনিতে ওদের আশ্রমটার মাধ্যমে ঠাকুরের ভাব প্রচারিত হয়'।

একটা বিশাল শিক্ষা হলো আমার। কি সহনশীলতা! কেমন ভাবে অতি সাধারণ একজন যুবককেও ভালো কাজ করার জন্য প্রেরণা দেওয়া উচিৎ এবং ভালোবাসা ও সম্মান করা কর্তব্য; নিজের খাওয়া-বিশ্রাম-অনিয়মের সব কিছুকে উপেক্ষা করে

ঠাকুরের কাজ করা যায় এ-সবের দৃষ্টান্ত চোখের সামনে পরিস্ফুট হলো তাঁর সঙ্গে শুলকুনি যাত্রায়। মহান যাঁরা হন, তাঁদের মহত্ব ছোটোখাটো কাজের মধ্যে, আচরণের মধ্যে ফুটে উঠে। গণেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা স্নেহ, গণেশকে তার জীবনে বড় হতে অনেক প্রেরণা দিয়েছে। এই সাধুসঙ্গ একটা চিরস্থায়ী ইম্প্রেশন সৃষ্টি করেছিল তার মনে।

পরের দিনটাও টাকী আশ্রমে আছেন। আমাকে ডাকলেন একান্তে। বললেন, আমরা তোমাকে হলিউডে পাঠানোর কথা ভাবছি। আমি তো শুনেই আমার অসামর্থ্যতা জানিয়ে আমাকে রেহাই দেবার অনুরোধ জানালাম। ইতিমধ্যে অন্য একজন এসে পড়ায় ঐ আলোচনা আর এগুলো না। আমি ভাবলাম যে আমার অনুরোধ গৃহীত হবে। যাই হোক, রাত্রিটা টাকী আশ্রমে থেকে মহারাজ পরদিন মঠের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। আমি পথে শিকড়ায় নেমে গেলাম।

ইতিমধ্যে বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। আমিও শিকড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিছুদিন পরে একদিন মঠে এসেছি কিছু কাজে। ততদিনে আত্মস্থানন্দজী সাধারণ সম্পাদক এবং মহারাজ সহ- সঙ্ঘাধ্যক্ষ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে বৃত হয়েছেন। এবং সেই একই ট্রাস্টি বোর্ডের মিটিং-এ আমাকে হলিউডের সহকারী হিসাবে পাঠানোর রেসল্যুশন হয়ে গেছে। গেছি পূজনীয় আত্মস্থানন্দজীর কাছে। প্রণাম করতেই বলছেন, অবাক। কিসের পাসপোর্ট, এমন প্রতিপ্রশ্ন করাতে মিষ্টি কথায় বললেন, 'তুমি হলিউডে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। রেজোল্যুশন হয়ে গেছে আমার কিছু করার নেই। তুমি গহনানন্দজীর কাছে যাও, তাঁকে ধর। আমেরিকার কাজের জন্য নিজেকে উপযুক্ত বলে কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। তাই মহারাজের কাছে গেলাম। উনি হাঁটতে হাঁটতে আমাকে বলতে লাগলেন, 'ঠাকুর দেখেছিলেন সাদা সাদা মুখ মানুষদের। ওরাও তো তাঁর ভক্ত। তাদের সেবার জন্যে মঠ কর্তৃপক্ষ তোমাকে নির্বাচন করেছেন। তুমি নিজেকে অযোগ্য মনে করছ কেন? তুমি কি আর নিজের অহঙ্কারের জন্য কাজ করবে? তিনি তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেবেন যদি তোমার অহঙ্কারটাকে সরিয়ে রাখতে পারো। তাঁর হাতের যন্ত্র হবার সাধন করতে পারবে বেশী করে। তাঁর প্রতি শরণাগতি বাড়বে, তাতে তোমার আধ্যাত্মিক কল্যাণই হবে'। এ-সব শোনার পর আমি আবার বললাম, 'আমি তো ইংরেজীতে কখনও বক্তৃতা দিইনি। আমেরিকানদের সামনে ওদের ভাষায় নিজের ভাবকে ভালোভাবে ব্যক্ত করতে পারব না। তাই দয়া করে অন্য কাউকে পাঠান।

আমি ঐ গ্রামের কাজে আনন্দ পাচ্ছি, ওখানে কাজ করা আমার সহজ হবে। তখন তিনি বললেন, তুমি ভেবো না। প্রভুকে প্রার্থনা করো—তিনিই শক্তি দেবেন। কাউকে না কাউকে তো যেতে হবে ওখানে। মঠের ট্রাস্টিরা তোমাকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সঙ্ঘের এই আদেশ অনুসরণ করাতেই তোমার সার্বিক মঙ্গল হবে। দ্বিধা করোনা—এগিয়ে যাও। প্রভু সহায় হবেন তোমার এই নূতন সাধন পথে। অনেক উৎসাহ ও সাহস দিয়ে আমাকে সে-রাত্রে বিদায় দিলেন। আজ পিছন ফিরে দেখি তাঁর কথা কতো সত্য! যেখানে আমি সেখানেই গণ্ডগোল—যখন সামান্য মাত্র শরণাগতির ভাব আসে তখন সবই সোজা হয়ে যায়।

'তুমি যত ভার দিয়েছ বন্ধু সকলই হয়েছে সোজা
আমি যত ভার কুড়ায়ে লয়েছি, সকলই হয়েছে বোঝা'।

আমার মনে হয়, মহারাজ তাঁর জীবনে সব কাজের পিছনে যে ভাব নিয়ে সারা জীবন চলে উপকৃত হয়েছেন, সেই শিক্ষাই আমাকে দিলেন। তাই সেই উপদেশ সেদিন আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল।

মহারাজের দিকে তাকালে মনে হয়, বুঝি তিনি কেবল কর্মকেই যোগে রূপান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু তা নয়। সকল কর্মের আড়ালে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের—তাঁর প্রার্থনা, ধ্যানাভ্যাস, শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদি নিভৃত সাধনা কম ছিল না। আমি এদেশে আসার পর মহারাজ হলিউডে এসে কিছুদিন ছিলেন। তখনও প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতে দেখেছি তাঁকে। হয় ধর্ম প্রসঙ্গ করছেন, নয় আশ্রমের খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে উৎসাহী হচ্ছেন, অথবা নিজের জপ-ধ্যান-প্রার্থনায় রত থাকতেন। আমাদের সৌভাগ্য যে চোখের সামনে এমন রামকৃষ্ণগত জীবন দেখার সুযোগ পেয়েছি। আমার আভূমি প্রণতি জানাই।

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু

পূণ্য স্মৃতি কথা

স্বামী গিরিশানন্দ

সে আজ অনেক দিনের কথা। আমি পূজনীয় মহারাজকে দেখি সেবাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হিসাবে। সেটা ছিল ১৯৭১-৭২ সাল। আমার চিকিৎসার জন্য আমি সেবাপ্রতিষ্ঠান হাসপাতালে ভর্তি হই। তখন অপারেশান-এর পর হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ কয়েকজন সন্ন্যাসীরা প্রত্যেকদিন পরিদর্শনে আসতেন। এই রকম একদিন পূজ্যপাদ স্বামী দয়ানন্দজী (শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য) মহারাজও সেই সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এসেছিলেন। গহনানন্দজী মহারাজও একই সঙ্গে ছিলেন। অপারেশান এর পর শরীরের যে উপসর্গগুলো প্রথম কষ্ট দেয় সেই সম্পর্কে অন্য একদিন গহনানন্দজী মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এরপরে আমি যথারীতি বেলুড় মঠে ফিরে যাই। তখন ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ চলছিল। আমরা কয়েকজন ব্রহ্মচারী রিলিফ করতে গিয়েছিলাম। আমি ছিলাম বনগাঁর গাইঘাটা অঞ্চলে। নরেন্দ্রপুর থেকে রিলিফ কণ্ডাক্ট করা হচ্ছিল। ১৯৭২ সালে রিলিফের পরে আমি ট্রেনিং সেন্টার থেকে চেরাপুঞ্জিতে পোষ্টেড হই। তারপরে সেখান থেকে ১৯৭৪ সালে অরুণাচল প্রদেশের আলং-এ আমি ট্রান্সফার হয়ে যাই। এই সময়ে গহনানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী সাধারণ সম্পাদক হয়ে আসেন। পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজী মহারাজ সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ হয়ে কাঁকুড়গাছি চলে যান। এবং অন্যতম সহকারী সাধারণ সম্পাদক রূপে আসেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ও স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। তখন সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। আলং খুব দুর্গম জায়গা, আলং আমি প্রায় ৯ বছর ছিলাম।

আশ্রম পরিদর্শন করার জন্য পূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজ সেখানে আসেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সেসময় কলকাতায় গিয়েছিলাম, তাই দেখা হয়নি। উনি তখন দু'টি কাজের আংশিক ভার বহণ করতেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল সেবাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষতা পূর্ণরূপে এবং রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সহ-সাধারণ সম্পাদকের কাজ আংশিকরূপে। আমাকে তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘মনে কর আমরা

গৌতমানন্দজীকে অন্য জায়গায় ছুটিতে পাঠাবো, তুমি সেই সময় কাজটা চালিয়ে নিতে পারবে ?” আমি শুনে একটু ঘাবড়ালাম, এই ভেবে যে, উনার একটা কৌশল ছিল। সেটি হচ্ছে কোন একজন সন্ন্যাসীকে, যেকোন একটা সেন্টারকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কয়েকবছর কাজ চালিয়েছে বা কাজ চালাবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তাকে জিজ্ঞাসা করে বুঝে নেওয়া যে, সে ঐ সেন্টার এ বা অন্য কোন সেন্টার এর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রয়োজনে চালাবার সৎ সাহস রাখে কিনা। এরপরে কয়েক মাসের মধ্যে আলং এ প্রায় ৪ মাস থাকার পর আমাকে ট্রান্সফার করে মালদায় পাঠিয়ে দেয়া হয় ১৯৮৪ সালে। মালদার পূর্বতন অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী সুমেধানন্দজী মহারাজ, সেটা ছিল ১৯৮২-৮৪। এই সময় বন্যা হত, এবং আশ্রম জলে পূর্ণ হয়ে থাকতো প্রায় প্রতিবছর বন্যার জন্য। মালদায় নূতন যাওয়ার পরে আমি নূতন একটি কাজের সূচনা দেখতে পাই। সেটি ছিল রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ। সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী যেসমস্ত প্রাইভেট সেন্টার ছিল সেইগুলিকে একটি নূতন সংস্থারূপে গঠিতকরা হয়েছিল এবং এই সংস্থাগুলির কার্যব্যবস্থা সরাসরি মঠ মিশন কর্তৃপক্ষ নিজের হাতে না রেখে, পরোক্ষভাবে সেই সংস্থাগুলির কর্মকর্তাদের দিয়ে পরিচালনা করার জন্য মঠ মিশনের শাখাগুলির সঙ্গে একটি বিধিবহির্ভূত যোগসুত্র রচনা করা হয়েছিল। মঠ মিশনের অনুমোদিত শাখাগুলির নিকটবর্তী এইসব অননুমোদিত আশ্রমগুলির সঙ্গে ৬ মাস পরপর একটি করে সভা পরিচালনা করা হতো। সেই সভাতে উপস্থিত থাকতেন সমস্ত ভাবপ্রচার পরিষদের বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের তরফে একজন কনভেনর সন্ন্যাসী এবং সেইপদে অভিসিক্ত ছিলেন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এবং তিনি ও স্বামী প্রভানন্দজী পশ্চিমবঙ্গের সেইসমস্ত সভাগুলিতে উপস্থিত থাকতেন। আমার মনে পড়ে মালদা, জলপাইগুড়ি, কাটিহার এই ৩টি শাখাকে নিয়ে এবং ঐ অঞ্চলের অননুমোদিত আশ্রমগুলিকে নিয়ে সভা আহ্বান করা হতো। একবার অননুমোদিত শাখার মধ্যে আলিপুরদুয়ারে এ এরকম একটিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে আমরা উপস্থিত ছিলাম এবং স্বামী গহনানন্দজীর পরিচালনায় সেখানকার অনুষ্ঠান চলছিল। আলিপুরদুয়ার এ প্রাইভেট সেন্টার একটি মন্দির নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন। তখন সেখানে পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন এবং দীক্ষাদান করেছিলেন। যেখানে সভা হবে সেইস্থানেই ভীত তৈরীকরে এবং কতগুলি শালবল্লি স্তম্ভরূপে প্রোথিতকরে তারউপর একটা পেণ্ডেল হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার ঝড় বৃষ্টির জায়গা। আমরা সকালের ফার্স্ট সেশানে সেখানে বসে সভা করলাম এবং দুপুরবেলা দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে সেইমঞ্চ থেকে আশ্রমের ভোজনালয়ে গিয়েছিলাম। ঘন আকাশ, গভীর কাল মেঘে সেই স্থানটিকে ভরিয়ে দিয়েছে। তুমুল ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হলো, মঞ্চটিকে একেবারে ভেঙ্গে ফেলে দিলো। গহনানন্দজী মহারাজ সেই সময় আমাদের

সকল সন্ন্যাসী ভক্তদের নিয়ে একটু আগেই মঞ্চে বসেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য মঞ্চ ত্যাগ করার ঠিক পরেই এই মহাদুর্যোগ হয়েছিল। এবং আমরা সকলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম। গহনানন্দজী মহারাজ এতবড় একটি কাণ্ড দেখেও সম্পূর্ণ অবিচলিত ছিলেন। এবং যথারীতি অন্যস্থানে সভা হয়েছিল। এই থেকেই বুঝতে পারলাম তার স্নায়ু ভয়াবহ অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য কত দৃঢ় ছিল। সেবাপ্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনায় ও একের পর এক কর্মী আন্দোলন, বিভিন্ন দাবী দাওয়া এবং রাজনৈতিক দলের সমর্থন ঐ কর্মীদের পক্ষে পরোক্ষভাবে থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজ অটুট শক্তিতে মোকাবিলা করেছিলেন। সেখানে আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল এবং সেবাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে হয়েছিল।

আমি শুনেছি উনার কাছে জপধ্যানের সময় কমথাকা সত্ত্বেও তিনি গাড়ীতে করে সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেলুড় মঠে জপ করতে করতে আসতেন, প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়। এবং এত ক্লান্তি সত্ত্বেও তিনি আলোচনা করতেন এবং আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের কার্যব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং যথারীতি পরের দিনেই সেবাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সেদিনকার কাজ কর্ম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা।

পূজ্যপাদ আত্মস্থানন্দজী মহারাজ মালদায় বন্যা পরিদর্শনে এাণ কার্যে আসেন এবং পূজ্যপাদ বাগীশানন্দজীকে এাণকার্য দেখার জন্য পাঠান। আত্মস্থানন্দজী মহারাজ সে সময় ছিলেন ত্রাণকার্যের জন্য অন্যতম সচিব, রিলিফ সেক্রেটারী।

এর আগে পরে কোন একসময়ে স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে বদলী হয়ে সঙ্ঘের সহাধ্যক্ষ রূপে আসেন। এই সময়ের কিছু পরে অন্যতম এসিসটেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী হয়ে এসেছিলেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ। পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ সে সময়ে সঙ্ঘাধ্যক্ষ ছিলেন এবং পরে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দকে বদলী করে দিল্লী পাঠিয়ে দেন। এরপর আমাকে মালদা থেকে বদলী করে আসানসোলের সেক্রেটারী করে পাঠানো হয়। ১৯৮৯ সালে আসানসোলে যাই। ১৯৮৮ সালে পূজনীয় গম্ভীরানন্দজী মহারাজ এর শরীর যাবার পর পূজনীয় ভূতেশানন্দজী মহারাজ কাকুড়গাছি থেকে প্রেসিডেন্ট হয়ে বেলুড় মঠে আসেন এবং অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজ ছিলেন রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ।

এইসময় তিনি (গহনানন্দজী মহারাজ) ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে কাকুড়গাছিতে চলে যান। আসানসোল আশ্রমের নূতন জমি সম্পর্কে কথাবার্তা আলোচনা হয়। তদানীন্তন জেনারেল সেক্রেটারী আত্মস্থানন্দজী এবং পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ খুব উৎসাহিত ছিলেন আসানসোলের নূতন জমি পাওয়ার বিষয়ে। এরপরে আমাদের আসানসোল

আশ্রমের নূতন স্থানান্তরিত অস্থায়ী ভবনগুলোর উদ্ঘাটন উপলক্ষে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ এসেছিলেন খুব অল্পসময়ের জন্য এবং অস্থায়ী ঠাকুরঘরে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করে কাকুড়গাছি চলেযান। এই সময়কার একটা উল্লেখনীয় ঘটনা আমার মনে পড়ে। পূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজ তখন দীক্ষা দানাদি কার্য আরম্ভ করেছেন। তার সঙ্গে ছিলেন ব্রহ্মচারী সপ্তর্ষি মহারাজ এবং সম্পাদক নৃসিংহ (স্বামী মুক্তিকামানন্দ) মহারাজ। মহারাজ আমাকে ফোন করে বলেছেন দেখ, আমি দীক্ষাদানের জন্য দেওঘর যাচ্ছি। তারপর সেখান থেকে জামতারা যাবো। জামতারা থেকে আমার ইচ্ছা আসানসোলে যাওয়া ও দীক্ষার ব্যবস্থা করা। আসানসোলে সূবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ভূতেশানন্দজী মহারাজ এসেছিলেন। তখন তাকে নূতন প্রশস্ত জায়গায় আশ্রম থেকে স্থানান্তরিত করার কথা বলেছিলাম। কিন্তু সেই সময়ে কাজ আরম্ভ করা যায়নি। তাই আমি সচেষ্ট ছিলাম কি করে ঐ কাজটির জন্য যথাবিধি প্রচেষ্টা করা যায়। ভূতেশানন্দজী মহারাজ সেই সময়ে আত্মস্থানন্দজী মহারাজ এর তত্ত্বাবধানে তখনকার পশ্চিম বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অশোক সামন্ত, এবং ডিস্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট অসীম বর্মণ এর সহায়তায় আমরা নূতন জায়গা পাওয়ার পরে অস্থায়ী ভবন নির্মানের আয়োজন করেছিলাম। তখন আমি গহনানন্দজী মহারাজকে বলি, 'মহারাজ আপনি কৃপা করে এই অস্থায়ী ভবনটি উদ্ঘাটন করে, আশ্রমটি পরিচালনা করার অনুমতি করেন তাহলে আমাদের এ বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে।' তখন উনি খুব আনন্দের সঙ্গে সেটার অনুমতি দিলেন এবং দেওঘর থেকে আসানসোলে আসবার প্রস্তাবটিতে স্বীকৃত হলেন। এটি নির্ধারিত ছিল স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ এর জন্মতিথি ১৯৯৭। ইতিমধ্যে আসানসোল আশ্রমের ম্যানেজিং কমিটিতেও এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়। পুরাতন আশ্রমের ভক্তদের কাছ থেকে কানাঘুষা শুনতে পেলাম, আমাদের এই স্থানান্তরিতকরনের বিপক্ষে কোটে ইনজাংগশান করবেন। স্বামী গহনানন্দজী মহারাজকে আমি এ কথা জানানোর পর উনি বললেন, দেখো আমি পুরীতে আছি। পুরী থেকে আমি কাঁকুড়গাছি ফিরবো। সেই ফেরার পথে তুমি আমাকে খড়গপুর থেকে গাড়ীতে তুলে নেবে। আমিও যথারীতি ভক্তদের ৩ খানা গাড়ীর ব্যবস্থা করে খড়গপুর হয়ে, বাঁকুড়া হয়ে আসানসোলে আসলাম সঙ্গে শুধু সেবক সপ্তর্ষি মহারাজ রইলো। রাত্রি ৩টা থেকে প্রায় ১২ ঘন্টার যাত্রা। আর গাড়ীতে চলাকালীন উনি জিজ্ঞাসা করছেন, যে সময় পৌঁছাবো তার থেকে সেদিনের মাহেন্দ্রক্ষণ কতটা বাকী আছে। আরও বলেছিলেন আমাদের পৌঁছাতে দেরী হচ্ছে, ভাণ্ডার ঘরেই যেন ঠাকুরকে পায়েস ভোগ দেওয়া হয়। নয়তো ঠাকুর উপবাস থাকছেন। যাই হোক উনি গাড়ী থেকে নেমেই মাথায় গঙ্গাজল স্পর্শ করে নবনির্মিত অস্থায়ী মন্দিরে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আলোকচিত্র বসিয়ে দিলেন। নূতন আলোকচিত্র আগের থেকেই তৈরী ছিল।

আর পূর্বের আলোকচিত্র পাশের ঠাকুর ভাণ্ডার ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা হলো। সব সাধু ব্রহ্মচারীরা মহারাজের উপস্থিতিতে কয়েক মিনিট বৈদিক মন্ত্রপাঠ করলেন, এবং উনি ঠাকুর মা স্বামীজীর পাদদেশে অর্ঘ্য দান করলেন। এবং গহনানন্দজী মহারাজ এ সময়ে মাঙ্গলিক আরতি সম্পন্ন করলেন। এই ঠাকুর ঘরটি নির্মিত হয়েছিল টিনের চালা দিয়ে এবং দুপাশের বারান্দা ও পিছন দিকে ভাণ্ডার ঘর ছিল। পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের সেই দিনেই ফিরে যাবার জন্য টিকিট পরিবর্তন করে কলকাতা ফিরে গেলেন। এবং কিছু ভক্তরা আমরা নুতন মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনটিকে কেন এগিয়ে নিয়ে এলাম সে কথাটি খুলে বলা হলো না। শুধু এটুকু জানালাম, যে পূজনীয় মহারাজের সময় কম। তাই আগেই এ কাজটি করে নেওয়া হলো। এরপরে যথারীতি এক সপ্তাহের মধ্যে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ পূনরায় নূতন মন্দিরে নির্ধারিত দিনে ঠাকুরের ষোড়শোপচার পূজা অনুষ্ঠানের জন্য এসেছিলেন। এবং তার অনুমতি ছাড়া মঠ মিশন কর্তৃপক্ষ এ কাজটিকে অনুমোদন করতেন না। যাই হোক তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে এ কাজের সহায়তা করেছিলেন। এবং তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজকে জানিয়ে দিতে আমাকে বলেছিলেন, ঐ আশ্রম স্থানান্তরণের কাজটি হয়ে গেছে যা পরবর্তী সময়ে ঘোষিত হলো।

নূতন আশ্রমে সাধু ব্রহ্মচারীরা থাকেন পুরাতন জমি বিক্রয় না হওয়ার জন্য নূতন ভবন নির্মাণ শুরু হয়নি। আমি এবং হেড মাষ্টার কৃপাময়ানন্দ পুরাতন আশ্রমে থাকি। সেই মধ্যবর্তী কয়েক বছরের জন্য। যতদিন না আমাদের স্থায়ী ভবনগুলো নির্মিত হয়। এ সময়ের আগে পরে আমার কাছে পূর্বে যোগদান করা বিশ্বজিত (স্বামী গণধীশানন্দ) মহারাজ মেদিনীপুর থেকে বদলী হয়ে আসে। গৌতম ব্রহ্মচারী হিসেবে পুরনো আশ্রমে যোগদান করে। সে এবং ব্রহ্মচারী অনিমেশ যোগদান করে। ঐ সময়ের পূর্বে ধুর্জ্জটি ব্রহ্মচারী রূপে যোগদান করে, নূতন আশ্রমে। এর পরে সৌনক এবং শ্রীকান্তও যোগদান করে। সুভাষ নামে আরেকজন যোগদান করেছিল। বাড়ীর টানাটানিতে সে থাকতে না পেরে বাড়ীর ঝামেলা কেটে গেলে যোগদান করেছিল। তার পক্ষে বিধিবদ্ধভাবে যোগদান করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে আরও যোগদান করেছিল, ব্রঃ অনিমেশ এবং ভূতেশ। গহনানন্দজী মহারাজ এরপরে যখন আসেন কয়েক বছর পরে, তখন অস্থায়ী মন্দিরে তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং অস্থায়ী সাধুনিবাসের যে বাড়ীটি ছিল তা নবনির্মিত স্থায়ী নিবাসে স্থানান্তরিত করা হলো। সেই সাধু নিবাসে প্রবেশের মুখে একটি বৈঠকখানায় ঠাকুরের ১৬ জন সন্তানের পরষ্পরের দাড়িয়ে থাকা ফটোটির উদ্ঘাটন করে সেই বাড়ীতেই অবস্থান করলেন। পূর্বে ২০০২ সালে পূজনীয় স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ জেনারেল সেক্রেটারী থাকাকালীন উদ্বোধন করেছিলেন স্কুল এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার। এরপরে কোন একটা বিশেষ

দিনে গহনানন্দজী মহারাজকে আমি ডেকেছিলাম নূতন প্রেসিডেন্ট হয়ে ২০০৫ সালে আমাদের নবনির্মিত স্থায়ী ভবনগুলির উদ্বোধন করে দেবার জন্য। তাই প্রথমে সাধু নিবাস, ছাত্রাবাস, ছাত্রদের ও সাধুদের খাবার ঘর ও লাইব্রেরী উদ্বোধন করে দেন।

পূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজ এর বৈশিষ্ট্য তিনি কোনদিন কোন কাজে শত বাধা সত্ত্বেও পরান্মুখ হতেন না। সেই সময়ে বেলুড় যুব সমিতির সঙ্গে আমাদের নিজস্ব জায়গা, যা তারা অন্যায় ভাবে অধিকার করেছিল, সেটি পুনরায় পাবার জন্য প্রচেষ্টা হয়েছিল। এবং সেইসময়ে পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর নির্দেশে শত রাজনৈতিক বাধা উনি মোকাবিলা করেন, গঙ্গার তীরের নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ী এবং ঐ সংলগ্ন জায়গা আমরা রাখতে পেরেছিলাম। তার একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মঠ ও মিশনের এবং প্রয়োজনে সুপরিসর স্থানের ব্যবস্থার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করা। তিনি কর্মে ও সাধনভজনে খুবই সমতা রক্ষা করতেন। এবং প্রচণ্ড পরিশ্রম, মানসিক উদ্বেগ নিয়েও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি ভালবাসা ও নিষ্ঠা এবং ধৈর্য্য অটুট রেখে এগিয়ে যাওয়া ছিল তার ব্রত। তার বিশ্বাস, যে নূতন স্থান পাওয়া গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা অনুযায়ী স্বামীজীর আদর্শকে গ্রহণ করে মঠ ও মিশনের কাজকে শক্তিশালী ও উন্নত করা যাবে। একটি দৃষ্টান্ত থেকে বুঝতে পারি যে, কাঁকুড়গাছি যোগদ্যানেও অপরিসর স্থানের সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছিলেন পাশ্ববর্তী হিন্দুস্থান লিভার থেকে পাওয়া বেশকিছু জায়গা, তার ফলস্বরূপ আজ কাঁকুড়গাছি যোগদ্যান একটি নূতন রূপ লাভ করেছে। এর জন্য তাকে তার সহকর্মীদের সঙ্গে এবং সরকারী ও বেসরকারী রাজনৈতিক এবং আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের সুপরামর্শ এবং সুচিন্তিত মতামত নেওয়া তার বৈশিষ্ট ছিল। তার কার্যকুশলীত্ব এবং আশ্রমের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন মূলক ভাব ছিল অতীব লক্ষ্যণীয়। এমন কোন গুরুতর সমস্যা ছিলনা যা সঙ্ঘের সাধু ব্রহ্মচারীরা নিঃসঙ্কাচে তার কাছে আলোচনা ও পরামর্শ করতে পারতেন না। এর দ্বারা প্রমানিত হতো যে তিনি এ সংঘকে কত নিজের করে ভালবাসতেন।

মঠ মিশন পরিচালনায় খুব গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহনের যখন প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত তখন তিনি সর্বাগ্রে সেইভাব ও চিন্তাকে ঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সঙ্ঘের অন্যান্য প্রাচীন সন্ন্যাসী এবং কর্মকর্তাগণ তার কার্য্য পরিচালনা এবং চিন্তাধারা দেখে খুবই আনন্দিত হতেন। তিনি ছিলেন স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্র দীক্ষিত। শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানদের মধ্যে তিনি স্বামী অভেদানন্দজীকে দর্শন করেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত এবং শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও দূরে দূরে গ্রামে গঞ্জে ভারত ও বাংলাদেশে বিধি নির্দ্দিষ্ট সীমার বহিঃভূত ভক্তদের শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম বিতরণের জন্য আন্তরিক সচেষ্ট ছিলেন। ভক্তদের সাথে অনেক সময় দিয়ে তাদের

মনের জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত করতেন।

একটা ঘটনার কথা এখন স্মরণ হয়, তিনি কাটিহারে গিয়েছেন। মন্ত্র দীক্ষার পর যখন ফিরবেন বেলুড় মঠে, তখন তাঁর ট্রেন টিকিটটি সঙ্গে নেওয়া হয়নি। টিকিটটি ভাগবতানন্দজী (কাটিহারের অধ্যক্ষ) খুব যত্নের সঙ্গে রেখেছিলেন। কিন্তু গাড়ীতে উঠবার সময় ভক্তদের সাথে কথাবার্তা বলবার সময় তারা ভুলে গিয়েছিলেন ! আমার কাছে সংবাদ যাওয়ায় মালদা থেকে আমি ঐ ট্রেনে সে কম্পার্টমেন্টে গিয়ে যাতে টিকিট চেকার উঠলে কোন অসুবিধা যেন না হয়, সে জন্য মালদা ষ্টেশনে গিয়েছিলাম। তিনি এ সব শুনে অবিচলিত ছিলেন, এবং হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেন পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি জানানো হয়েছিল। যাই হোক এ রকম বিপদে তিনি এবং সেবকদের কাউকে তিরষ্কার না করে নিশ্চিত মনে ক্ষমা করেছিলেন।

গহনানন্দজীর বৈশিষ্ট্য ছিল, যে সব প্রাচীন সন্ন্যাসীরা শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের কাছে মন্ত্র লাভ করেছেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন বা ঐরূপ কারনে বিযুক্ত হয়ে পরবর্তীকালে মঠ ত্যাগ করার পর স্বেচ্ছায় নূতন জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম নির্মাণ করেছেন, এবং ভক্ত সমাগম সেখানে হওয়াতে তিনি তাদের আগ্রহে দীক্ষাদান করেছেন, এবং অনেক ভক্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায় মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। যেমন – বর্ধমান, কুচবিহার, পূর্ণিয়া, গাদিয়াড়া, আরাড়িয়া, দীনহাটা, মাথাভাঙ্গা, কটক, ইত্যাদি আশ্রম।

তিনি অনুভব করতেন যে রামকৃষ্ণ সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জগৎ আলোড়নকারী আদর্শের বীজ যেখানে পড়েছে সেই স্থানটিকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের দ্বারা উদ্দীপিত করা। এইভাবে আরও যুক্ত হয়েছিল আসামের ডিগবয়, ডিব্রুগড়, মার্গারিটা, নঁওগা, লামডিং, হোজাই ও নিউ বনগাইগাঁ ইত্যাদি।

এইভাবে যদিও বা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ঐ সব কেন্দ্রগুলিকে গ্রহণ করার মত লোকবল বা অন্যান্য অসুবিধা ছিল, তবু সেখানকার ভক্তদের আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছেন। এবং বহু মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে উদ্দীপিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশে চট্টগ্রামের আনোয়ারা, ফতেয়াবাদ, সিলেটের পাহাড়পুর ভাবপ্রচার পরিষদের সাথে যুক্ত হয়ে নুতন আশ্রম হয়েছে। এ ছাড়া তিনি সুনামগঞ্জ (চণ্ডিকানন্দজীর স্মৃতিপূত) ও মায়ানমার এর পূর্বতন সেন্টারে গিয়েছিলেন।

এরপরে আমি তখন সারদাপীঠে আছি। আমরা খবর পেলাম মহারাজ গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছেন। আমরা তখন সকলে তাকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম ২০০৭ সালে। এর কিছুদিন পরেই বেলুড় মঠে দুর্গোৎসব এবং শাখা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মহারাজদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ধীরে ধীরে

সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেখা গেল মহারাজ এর শরীরের দ্রুত অবনতি ঘটছে। চিকিৎসকগণ মহারাজ এর শরীরের চরম সঙ্কট উপস্থিত একথা জানিয়ে দিলেন। ৪-১১-২০০৭ বেলুড় মঠ থেকে আনীত একটু চরণামৃত মহারাজ এর মুখে দিলেন এবং মহারাজ এর কপালে ও বুকে ঠাকুরকে নিবেদিত নির্মাল্য স্পর্শ করালেন। তার চোখের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর আলোকচিত্র ত্রয় ধরা হলো এবং মহারাজ বিস্ফারিত নয়নে দেখতে লাগলেন। এর পর সকলে সমস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র নাম হরি ওঁ রামকৃষ্ণ শুনাতে লাগলেন। এভাবে ১৫ মিঃ অতিক্রান্ত হল, এর পর মহারাজ নিজেই ধীরে ধীরে চোখ দুটি মুদ্রিত করলেন। এবং ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করলেন। তখন সন্ধ্যা ৫.৩৫ মিঃ বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে সন্ধ্যারতি চলছে এর পরবর্তী কালে মহারাজ এর শরীর বেলুড় মঠের সাংস্কৃতিক ভবনের হলঘরে আনা হলো। অগনিত ভক্তরা তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাসপাতালে ও বেলুড় মঠে আসেন। এবং যথারীতি পরদিন মধ্যাহ্নে তার শেষকৃত্যের জন্য সাধু ব্রহ্মচারীরা মহারাজজীর শরীর বহন করে নিয়ে আসেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির এর সম্মুখে স্নান ঘাটে। পূজনীয় মহারাজকে গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করানো হয়। তারপর, তাঁকে আরতি করা হয় অগনিত ভক্তদের কণ্ঠে জয়ধ্বনি মুহুর্মুহু হতে থাকে "জয় শ্রীগুরু মহারাজজী কী জয়।" তারপর পূজনীয় মহারাজের শরীর সজ্জিত চিতায় রাখা হয় ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। তখন সময় দুপুর ১টা। পবিত্র গঙ্গাতীরে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ও সাধু-ব্রঃ দের সমবেত কণ্ঠে ভজনগানের মধ্য দিয়ে মহারাজের পার্থিব শরীর ভস্মীভূত হল। সমাধিস্থল ফুল ও মালা দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হল। সব শেষ! সকলের মিলিত কণ্ঠে বৈদিক শান্তিমন্ত্র ও জয়ধ্বনি উচ্চারিত হল -

জয় শ্রীগুরু মহারাজজী কী জয়।
জয় মহামাঈ কী জয়।
জয় স্বামীজী মহারাজজী কী জয়।
জয় গঙ্গামাঈ কী জয়।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

“মহারাজ এখানে আছেন”

স্বামী কেদারেশ্বরানন্দ

পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ যখন মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন সেই সময়কার একটি ঘটনা মনে পড়ছে। মহারাজ তখন পুরানো মিশন অফিসে থাকতেন। প্রতিদিন সকালে সাধারণতঃ একটু বেলার দিকে তিনি সব মন্দিরগুলিতে প্রণাম করতে আসতেন। হাতে থাকত একটা বড় ছাতা। একদিন তিনি যথারীতি শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের মন্দিরে প্রণাম করতে এসেছেন। আমি তখন সবে নিত্যপূজা সেরে বেদীতে ফুল সাজাচ্ছিলাম। ঐ সময় এক ভক্তমহিলা সেখানে এসে উপস্থিত। ভক্তটি প্রায়শঃ শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ ও শ্রীশ্রীগোপালের জন্য নাড়ু তৈরী করে নিয়ে আসতেন। যাই হোক, তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে লাগলেন। এদিকে আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম যে পূজনীয় গহনানন্দজী পিছনে দাঁড়িয়েই প্রণাম করছেন। এ অবস্থায় আমি ভক্তটির কথার কোন উত্তর দিচ্ছিলাম না। আর ভক্তটি তো মন্দিরের গ্রীল ঘরে কথা বলেই চলেছেন। কোন ভ্রুক্ষেপই নেই! শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের মন্দিরে প্রণাম করে পূজনীয় গহনানন্দজী নীচে নেমে এলেন। তারপর তিনি শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের মন্দির ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের মাঝে একটি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। মনে হলো তিনি যেন কারোর জন্য অপেক্ষা করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ভক্তটিও শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের মন্দিরে প্রণাম করে সিড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। পূজনীয় গহনানন্দজী ভক্তটিকে তখন ডেকে বুঝিয়ে বললেন, “দেখুন, মহারাজ (শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ) এখানে আছেন তা ছাড়া পূজারী যখন মন্দিরে থাকেন সেসময় তাঁর সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়।” এই বলে মহারাজ ধীর পদক্ষেপে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি তো যথারীতি মন্দিরে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। পরে ঐ ভদ্রমহিলা আমাকে সব কথা জানিয়েছিলেন। সেদিন তিনি এই শিক্ষা পেলেন যে মন্দির-দর্শনের সময় কথা বলা উচিত নয়। বিশেষ করে পূজারী যখন ঠাকুর-সেবায় নিরত সেসময় তাঁর সঙ্গে কথা বলা চলে না। সর্বোপরি “মহারাজ এখানে আছেন”—

কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মন্দিরে শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের জাগ্রত উপস্থিতি যেন পূজনীয় গহনানন্দজী উপলব্ধি করতেন। মন্দির-দর্শনের সময় আমাদেরও এই ভাব অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে—এই শিক্ষা। সেদিনের কথাটি শোনার পর থেকে পূজনীয় গহনানন্দজীর মহারাজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে অনেক উচ্চ আসনে বসাবেন। বাস্তবিক হলোও তাই। পূজনীয় মহারাজ সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন যতদিন তাঁর শরীর সুস্থ ছিল তিনি নিত্য শ্রীশ্রীরাজা মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম নিবেদন করতে মন্দিরে আসতেন। বিশেষ দিনগুলিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করতেন।

স্মৃতির কোঠায় গহনানন্দজী

স্বামী অমরানন্দ

আমি পূজনীয় গহনানন্দজীকে যখন প্রথম দেখি, সেটা ১৯৬৫ সাল। পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজী তখন অসুস্থ হয়ে সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে ছিলেন। পূজনীয় গহনানন্দজীকে মনে হতো বিরাট মাপের কর্মী বলে।

কর্মযোগের লক্ষণ হচ্ছে ফলাকাঙ্খা না করে কাজ করা। কাজের ফল ঈশ্বরকে অর্পণ করা এবং অনুদ্বিগ্নচিত্তে কাজ করে যাওয়া। ১৯৭০ এর দশকে আমরা কয়েকজন ব্রহ্মচারী বেলুড়মঠ থেকে যাই সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে, উদ্দেশ্য ছিল ধর্মঘটের কবলে পড়া হাসপাতালটিকে কর্মী হিসাবে মদত দেওয়া। দিনরাত কর্মীরা তথা সিপিএম পার্টির সদস্যরা নানা স্লোগানে হাসপাতালের পরিবেশ মুখরিত রাখতো। গহনানন্দজী অতি শান্তভাবে সমস্ত কিছু শব্দদূষণ উপেক্ষা করে কাজ করে যেতেন। ফণীকর, যিনি হাসপাতালের অফিসে বড়বাবুর কাজ করতেন, তাঁকেও তিনি শিখিয়েছিলেন অতি অনুচ্চ স্বরে কথা বলতে (ভারতীয় স্বভাবের বিপরীত)। লক্ষ্য করতাম দুপুরে খাওয়ার পরে গহনানন্দজী বিশ্রাম করতেন। বিশ্রাম মানে চিৎ হয়ে শুয়ে চোখের উপরে তোয়ালে বিছিয়ে বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে একের পর এক ফোনের নম্বর ডায়াল করতেন, আর কথা বলতেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন অনলস কর্মী।

১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আমি মঠে আসি মঠের কর্মী হিসাবে। একটানা ২৭ মাস এইকাজে আমি জড়িত ছিলাম। সেই সময়ে আমি লক্ষ্য করেছি যে তিনি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন পূজনীয় স্বামী নির্মলানন্দজী সম্পর্কে। নির্মলানন্দজীর প্রয়াণের দিনে আমি বেলুড় মঠে উপস্থিত ছিলাম তাঁর ব্যবহৃত ঘরটিতে। সেদিনও দেখেছি গহনানন্দজী পূজনীয় নির্মলানন্দজীর পাশে এসে বসেছেন তাঁর শেষ সময়ে।

১৯৭১ সালে অক্টোবর মাসে গহনানন্দজী, হিরন্ময়ানন্দজী এবং আমি বিমানে রওনা হলোম কলকাতা থেকে আগরতলা। বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের জন্যে ত্রাণের কাজ চলছিল ত্রিপুরাতে। আমরা মঠের পরিচিত গুপ্ত পরিবারের বাড়িতে অতিথি হয়ে

উঠলাম। ত্রিপুরার বিশিষ্ট নেতা শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত একদিন সন্ধ্যায় পূজনীয় স্বামীজিদের সঙ্গে কথা বলতে এলেন গুপ্তদের বৈঠকখানায়। আমি ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে এসেছি, ভেতরে বৈরাগ্য গজগজ করছে, ভাবলাম রাজনৈতিক নেতার সংলাপ শুনে হবে কি? আমি বৈঠকমালায় বাইরে বারান্দায় চলে এলাম।

সহসা একটি যুবক সেই বারান্দায় এসে বললে—“আমি গহনানন্দজীর ভাই রমেশ বাবুর ছেলে। আমাদের বাড়ির পাঁচজন লোককে পাকিস্তানীরা খুন করেছে। আমি আমার ছেলেপুলেকে নিয়ে কুমিল্লা থেকে আগরতলায় পালিয়ে এসেছি। নিদারুণ কষ্টের মধ্যে কাটাচ্ছি। আমায় কিছু সাহায্য করুন।” আমি আবার বৈঠকখানার ঘরে ফিরে গেলাম এবং ত্রিপুরায় কর্মরত ত্রাণকর্মঠ সুজিত মহারাজকে ইঙ্গিতে বারান্দায় আসতে বললাম। সুজিত মহারাজ বারান্দায় এসে সব বিবরণ শুনলেন এবং আমাকে বললেন একশ টাকা ওই যুবকটিকে দিতে, আর কথা দিলেন যে ওই টাকা তিনি শীঘ্র শোধ করে দেবেন। সুজিত মহারাজ আবার বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে গহনানন্দজীকে কানে কানে যুবকটির সংবাদ দিলেন। গহনানন্দজী বারান্দায় এলেন এবং যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—“তুমি এখানে কি করছো?” এইকথা বলেই তিনি আবার বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে গেলেন। গীতায় বহু জায়গায় সঙ্গত্যাগের কথা বলা হয়েছে। পারিবারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ একটি গোষ্ঠীর স্বাভাবিক সঙ্গের যে বিপুলতা থাকে সেটি গহনানন্দজীর মধ্যে কত শিথিল হয়ে গেছে, সেটা প্রত্যক্ষ করে আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

এর এগারো বছর পরের ঘটনা। পুরুলিয়ার বিদ্যাপীঠে রজত জয়ন্তী উৎসবের পরে পরেই শুরু হলো অশিক্ষক কর্মীদের ধর্মঘট। অশিক্ষক কর্মীর সংখ্যা ১১৫ জন। পরিস্থিতি সামাল দিতে গহনানন্দজী ঘন ঘন পুরুলিয়া আসতে লাগলেন। বিদ্যাপীঠের তদানীন্তন সম্পাদক ইতিমধ্যে ছয়জন কর্মীকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গহনানন্দজী বারম্বার অনুরোধ করলেন সম্পাদক মহারাজকে দুজনের বেশী কর্মীকে বরখাস্ত না করতে এবং বললেন—“ঠাকুরের কাছে নিত্য প্রার্থনা করি আমাদের কোন কাজে যেন গরীবের উপর কোন অত্যাচার না হয়। সঙ্ঘের একটি কেন্দ্রকে বিপদে সাহায্য করতে গিয়ে সাধুর করণীয় গুণ গুলিকে তিনি ভুলে যাননি।

এইকালে লক্ষ্য করেছি অতি ব্যস্ততার মধ্যেও গহনানন্দজীর জপের সময় মালা নিয়ে বসতেন, ট্রেনে চলাকালীন ও সকালবেলা ফিজিওথেরাপির বিভিন্ন মুদ্রা নিয়মিতভাবে তিনি অভ্যাস করতেন। অর্থাৎ জীবনটা ছিল তাঁর নিয়মানুবর্তিতা দিয়ে ঘেরা।

১৯৯১ সালের জুলাই-আগস্ট মাস। গহনানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ইউরোপের সমস্ত কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনে এলেন। আমি এই সময়ে

তাঁকে ইংল্যান্ডের কেন্দ্র এবং জেনিভা কেন্দ্রে দেখি। জেনিভা কেন্দ্র তথা আমষ্টলভীন কেন্দ্র, এই দুটি আর্থিক টানাটানি লক্ষ্য করে তিনি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। এই সময় একদিন ওকে মোটরগাড়িতে চাপিয়ে জেনিভা থেকে এক সুইস ভক্তের বাড়িতে জুরিখে নিয়ে আসি। তিনি সে বাড়িতে বাস করার সময় লক্ষ্য করেছি সে অনভ্যস্ত নতুন পরিবেশের সঙ্গে তিনি খাপ খাইয়ে নেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। যেহেতু উনি বহুদেশে যাবেন যার ভিসা করা ছিল না, সেই জন্যে তিনি আমার অনুরোধে জীবনে সর্বপ্রথম কোট-প্যান্ট ব্যবহার করতে শুরু করলেন। কারণ একজন গেরুয়াধারীর পক্ষে দেশে সীমান্তে কাস্টমস তথা সীমান্ত প্রহরীদের ভিসাবিহীন অবস্থায় ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। মনে রাখতে হবে তখনও 'মোঙ্গেন চুক্তি' কার্যকর হয়নি।

তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল যেন বেদান্তের কেন্দ্র ইওরোপের নানা দেশে স্থাপিত হয়। আমাকে পরামর্শ দিতেন যে শ্রী দেবেন্দ্র যোশী তার অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবহার করতে দেবে। অতএব আমি যেন এই বদান্যতার সুযোগে জার্মানীতে কাজ করতে শুরু করি।

এর তেরো বছর পরের ঘটনা। ওনার ৬৮ বছর বয়স। উনি প্রময়ানন্দজী এবং সেবক সপ্তর্ষী মহারাজকে নিয়ে জেনিভা আশ্রমে থাকতে এলেন। সপ্তর্ষির বিশেষ ইচ্ছাতে আমরা একরাত্রি লুজার্নের এক হোটেলে বাস করে 'সুরেনের' এক হোটেলে রাত কাটালাম এবং সেখান থেকে গেলাম শীলথর্নের 'পিজগেরিয়া' রেস্টুরেন্টে, যে রেস্টুরেন্ট বিশাল উচ্চতায় ৩৬০ ডিগ্রি আবর্তমান চতুর্দিকে অভূতপূর্ব দৃষ্টাবলীর মধ্যে। আমরা সেখান থেকে ফিরে এলাম জেনিভাতে এবং পরদিনই গেলাম ফ্রান্সে। প্যারিসে বিশেষ বিশেষ জায়গা দেখে আমরা রওনা দিলাম জার্মানীর কোলন শহরের দিকে। সেখান থেকে আমরা 'রিও-ওয়াইড' রিট্রিটে। সেখানে একরাত্রি বাস করে আমরা গেলাম আমস্টারডামে। সেখান থেকে আমি জুনিয়র অধ্যক্ষের হাতে অতিথিদের ভার দিয়ে ফিরে এলাম জেনিভাতে। এই উপলক্ষ্যে বেশ কয়েকদিন ধরে গহনানন্দজীকে লক্ষ্য করলাম যে জরাগ্রস্ত শরীর সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতি এবং পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করছেন।

আমি জানি যে ১৯৯৩ সালে কানাডার জ্ঞানকুভারে বেদান্ত সোসাইটিকে উৎসাহ দেবার জন্য উনি বেশ কয়েকজন সাধুর সঙ্গে সানকুভারে আসেন। ভারতে ভাবপ্রচার আন্দোলন এখন যথেষ্ট সম্প্রচারিত। এই আন্দোলনের আদিপর্বে গহনানন্দজীর এক বিপুল ভূমিকা ছিল। তাঁর কর্মযোগের এটি একটি বিশিষ্ট দিক।

২০০৮ সালে ইওরোপ ছাড়ার আগে তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তাঁর শরীর থাকাকালীন অবস্থায় আমি ভারতে আসি। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সে অনুরোধ রক্ষা করার।

স্বামী গহনানন্দ মহারাজের স্মৃতিচারণ কথামৃত ভবনে বিজয়াসম্মেলন উপলক্ষে

স্বামী পূর্ণানন্দ

"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে।।"

সকলকে আমার শুভ বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ, নমস্কার প্রীতি শুভেচ্ছাদি জানাই। শুভ বিজয়ার ঠিক পরেই এমন একটি অনুষ্ঠানে এসে নিজেরই খুব ভালো লাগছে। আর বিশেষ করে এই "কথামৃত ভবন" যার নাম,—সেখানে ; ঠিক যেন এক ঋষির আশ্রম। কথামৃত সম্বন্ধে কবি নজরুল তাঁর গানে বলেছেন 'তব কথামৃত কলির নব বেদ' অর্থাৎ তোমার কথামৃত কলির নতুন বেদ এই কথামৃত সংগ্রহ করে পুস্তকরূপ দান করেছেন শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যিনি 'মাস্টারমশাই'-এই নামে বিখ্যাত হয়েছেন। এ এক অনন্য সাধারণ সৃষ্টি। এই কথামৃত স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী। যা তাঁর বাছা বাছা কয়েকজন ভক্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রভু তো তাঁর মর্ত্যলীলাবিলাসের পর স্বধামে চলে গেছেন। কিন্তু আমরা যারা পরবর্তী প্রজন্ম, তাদের জন্য কী রেখে গেছেন! তা হলো তাঁর সেই অমৃত কথা? তাঁকেই লেখনীর মাধ্যমে সুসজ্জিত করে আমাদের সকলের সামনে তুলে ধরেছেন শ্রীম। এই বাণীই তাঁর মূর্তি—বাণী মূর্তি।

মাষ্টারমশাই যথেষ্ট পড়াশুনা করেছেন। ঠাকুর বলতেন 'সাড়ে তিনটে পাশের মাষ্টার'। কিন্তু তাঁর মধ্যে অহংকারের লেশমাত্র ছিল না, নিরহংকারী। এই এক বড় গুণ, যা তাঁকে এত বড় কাজে ব্রতী করিয়েছে। মাষ্টারমশাই বলতেন, আমি গঙ্গার তীরে এক জালা গঙ্গার জল নিয়ে বসে আছি, যারা নীচে নেমে গঙ্গায় অবগাহন স্নান করতে পারবে—তাদের জন্য নয়, যারা পারবে না তাদেরই ওই গঙ্গারই জল এক আঁজলা দেবো। এও সেই একই গঙ্গা, আমি সেই গঙ্গা থেকেই সঞ্চয় করে রেখেছি।

অর্থাৎ মাস্টারমশায়ের সংকলিত "কথামৃত" হলো তাঁরই জগৎপাবনী কথা—যা তাপিত জীবনের শীতল বারিস্বরূপ, শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিদায়িনী সেই কথা।

আরও একটি বিষয়, কারোর মনে এমন ধারণা উদয় হতেই পারে, "কথামৃত" তো কত শুনলাম, পুরানো হয়ে গেছে। কিন্তু ভগবানের কথা কখনও পুরানো হয়ে যায় না। ভগবানও কখনও পুরানো হন না। "কবিং পুরাণমনুশাসিতারম" অর্থাৎ তিনিই ঈশ্বর, তিনিই পুরাণপুরুষ। তিনি কবি। এখানে 'কবি' অর্থে যিনি কবিতা লেখেন সেই কবির কথা বলা হয়নি। এখানে কবি অর্থে সমস্ত কিছুর দ্রষ্টা। তিনি জীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ থেকে আরম্ভ করে তাদের কর্মফলভোগাদি এবং বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, অজ্ঞান অর্থাৎ অনাদি অবিদ্যা আদি সবকিছুর। জ্ঞাতা তিনিই কবি—ঈশ্বর। আবার, 'পুরাণ' হলো আদি পুরুষ কিন্তু এখনও নূতন—অর্থাৎ অক্ষয় পুরুষ— পুরা অপি নবঃ সেই জন্যই তাঁকে 'পুরাণ পুরুষ' বলা হয়। ভগবান 'গীতা' তে তাঁর সম্পর্কে বলছেন 'কবিং পুরাণাম্ অনুশাসিতারম' এবং তিনিই হলেন সকলের শাসক। শাসক অর্থে কী রকম শাসক? পশুপালক যেমন তার পশুগুলোকে লাঠির দ্বারা শাসন করে তেমন নয়। ভগবান যাকে শাসন করেন, তাকে শুভ বুদ্ধি দান করেন, এই হলো তাঁর শাসন। "গীতা"তে তিনি বলেছেন "দদামি বুদ্ধিযোগং তম্/যেন মাম্ উপযান্তি তে", যার অর্থ হলো আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত—যারা আমাকে প্রীতিপূর্বক হয়ে ভালোবাসে, তাদেরই আমি সেই বুদ্ধি দান করি, যে বুদ্ধির দ্বারা তারা আমাকে লাভ করবে। এই বুদ্ধি বা চাতুরি লোক ঠকাবার চাতুরি নয়, যে বুদ্ধি প্রাপ্ত হলে মানুষ ভগবান লাভ করতে সমর্থ হয়—সেই চাতুরী। ভগবান জগৎ শাসন করে তাঁর প্রতি ভক্তিযুক্ত মানুষকে শুভ বুদ্ধি দান করছেন। ঋষিরা অবিরাম প্রার্থনা করে চলেছেন—তিনি তাঁদের শুভ বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত করুন—'বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত'।

এই ভগবানকে আমরা নানা রূপে, নানা নামে পূজা করি। মানুষ তাঁকে পুরুষরূপে, নারী বা প্রকৃতিরূপে অথবা পুরুষ প্রকৃতির উর্দ্ধে সেই সচ্চিদানন্দরূপে পূজা করে, তাঁর দর্শনলাভ করে জীবনধন্য করে, তিনি পুরুষও বটে, আবার প্রকৃতিও বটে। এই প্রসঙ্গে এই গানের পংক্তিখানি খুবই সুন্দর। 'তুমি পুরুষ কি নারী'। অর্থাৎ কখনও কখনও তিনি পুরুষ, কখনও প্রকৃতি। আবার কখনও বা তিনি দুটোই।

ঠাকুর বলতেন জগৎটা শক্তির এলাকা। সেই শক্তির পূজোই আমরা করলাম। যেদিন মহালয়া, তার দুদিন আগের থেকে উত্তরায়ণ শুরু হয়েছে। সেই মহালয়াতে সূর্যের উত্তরায়ণের সূচনা দিয়েই দেবী পক্ষের সূচনা হয়। আর এই দেবীপক্ষ চলে

লক্ষ্মীপূজো পর্যন্ত। সেই দিক থেকে এই কটা দিন অতিশয় শুভ। এই দেবীপক্ষ পুরো মায়ের পক্ষ। কেউ কেউ বলে থাকেন মা চলে গেছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো—এই তিনি যান না। মা কোথায় যাবেন ?

জানবাজারে রাণীমার বাড়িতে দুর্গাপূজা হয়েছে। বিসর্জনের সময়কাল এগিয়ে এলে মথুরবাবু মাকে বিসর্জন দিতে আপত্তি জানান। সকলের কাছে এই সিদ্ধান্ত ঘোর অশাস্ত্রীয় ঠেকল। পূজা শেষে বিসর্জন হলো শাস্ত্রীয় বিধি তাই সেই অনুযায়ী প্রতিমা বিসর্জন আবশ্যক। তা সত্ত্বেও মথুর বিশ্বাসের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে কে মতো প্রকাশ করবে। কার ঘাড়ে সেই দশটা মাথা আছে! কিন্তু, আছে একজনের। তিনি বাবা। বাবাকে বলা হলো, বাবাও তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন—কি গো মথুর, তোমার কী হলো? মথুর উত্তর করলেন, দেখো বাবা, মাকে বিসর্জন দেবো না। ঠাকুরও তাঁহার সঙ্গে সহমতো প্রকাশ করে জানালেন—না না! মাকে কেন বিসর্জন দেবে? তবে, তিনি এতদিন তোমার দালানে পুজো নিয়েছেন। এখন এইখানে (অন্তরে) নেবেন। সেই মুহুর্তেই তাঁর অনুভূতি হলো, সত্যিই মা ওই মূর্তিতেই কেবল নেই, তিনি এখানে অর্থাৎ আমার অন্তরেও আছেন। পরক্ষণেই এই মনে হওয়ায় মতো দিলেন—তবে নিয়ে যাও।—এই যে ঘটনা, কত সুন্দর, কী মধুর অনুভূতি। মথুরবাবু সাক্ষাৎ তাঁকে দর্শন করলেন হৃদয়ে। এখন থেকে মা সেখানে উপস্থিত থেকেই পুজো গ্রহণ করবেন—শ্রীশ্রীঠাকুরের স্পর্শে মথুরবাবুর এই অনুভূতি হলো। আমাদের এই যে পুজো, এই পূজার পদ্ধতিও তাই। এইখান (অন্তর) থেকে মাকে নিয়ে গিয়ে মূর্তিতে প্রতিষ্ঠা করা, আবার বিসর্জনের সময় মাকে মূর্তি থেকে নিয়ে এসে পুনরায় অন্তরে স্থাপন করে মূর্তি বিসর্জন দেওয়া। তাই 'মাকে বিসর্জন দেবো না' ঠিক কথা। মায়ের বিসর্জন হয় না। এই দিনটিকে "বিজয়ী দশমী" বলা হয় এবং এই বিজয়া অনুষ্ঠান বেশ কিছুদিন ধরেই চলতে থাকে।

কী সুন্দর নাম এই "বিজয়া"। কেন হলো এই নাম "বিজয়া"? এই নামকরণ নিয়ে এই বিষয়ে পুরাণে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে দেবতারা মায়ের নামকরণ করেছিল "জয়া", অসুররাজ পদ্মকে যুদ্ধে জয় করে তাঁর নাম হয় "বিজয়া"। সেই থেকেই তিনি "বিজয়া" নামে খ্যাত হয়েছেন। তাঁকেই লোকে অপরাজিতা নামেও অভিহিত করে অর্থাৎ যিনি কখনও পরাজিত হননি। এই হলো বিজয়া কথার তাৎপর্য।

যখন মাকে বিসর্জন দেওয়া হয়, সেই বিসর্জনের পরে যে জলে মাকে বিসর্জন

দেওয়া হলো, সেই জল তুলে এনে শান্তি জল হিসেবে সবাইকে দেওয়া হয়। এই প্রথা এক বিশেষ অর্থ বহন করে। এই যে মাতৃমূর্তি—মাটি দ্বারা মায়ের যে দিব্য মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল। সেই মূর্তিতে মায়ের অধিষ্ঠান চিন্তা করে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তা পূজা শেষে জলে বিসর্জনের পরে জলে গুলে গেল, আর যেন সেই স্থানের সমস্ত জল মাতৃময় হয়ে গেল। সেই মাতৃময় জল এই ভক্তসকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। মা তো আর মাটির প্রতিমা নয়, মা যে চৈতন্য স্বরূপিনী। অতএব ঐ জলেও যেন মাতৃচৈতন্যের প্রকাশ হলো, আর তাকেই আমরা শ্রদ্ধা ভরে মাথায় ধারণ করলাম।

আজকের এই যে অনুষ্ঠান, এটা নিছকই একটি অনুষ্ঠান মাত্র নয়। এর তাৎপর্য গভীর। মায়েরও এরূপ এক দর্শন হয়েছিল। মা দেখলেন গঙ্গার জলে ঠাকুর নেমে গিয়ে মিলিয়ে গেলেন। তারপরে স্বামীজি সেই পবিত্র জল সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন, সকলে মুক্ত হবে। এও হলো সেই শান্তি জল স্বয়ং মহালয়া—যিনি সকলের আলয় অর্থাৎ আশ্রয়, যার পুজো আমরা ক'দিন করলাম, তাকে জলে বিসর্জন দেওয়াতে এই জল মাতৃময় হলো, অতি পবিত্র হলো। সেই পবিত্র জল আমরা শরীরে ছিটিয়ে শরীর-মন পবিত্র করি—এই তাৎপর্য।

এই যে সব শাস্ত্রীয় বিষয়বস্তু যাঁরা এর তাৎপর্য অনুভব করেছেন এবং তা লিখে গেছেন বা বলে গেছেন—তাঁরা অনেক গুণী ব্যক্তি, তাঁরা ঋষি-সত্যদ্রষ্টা। অনেকেই এই সকল বিষয়গুলো গাজাখুরি বলে অবজ্ঞা করে থাকে। আসলে আমাদের নিজেদের অজ্ঞতাই এই অবজ্ঞার দ্বারা প্রকাশ করি। আসলে, আমরা নিজেদের যতটা বুদ্ধিমান বলে জ্ঞান করি মোটেই তা নই। ঠাকুর বলতেন, কাক সকলের চেয়ে নিজেদের বেশী বুদ্ধিমান বলে মনে করে, আর বিষ্ঠা খেয়ে মরে। আমরাও হলোাম সেই কাকের মতোই। বোকারাই সর্বদা নিজেকে বেশী বুদ্ধিমান বলে মনে করে থাকে। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁরা কখনও একথা বলেন না।

“বিজয়া” এক শুভ মুহুর্ত। এই ক্ষণগুলি আসে, আবার চলেও যায়, ধীরে ধীরে। কোনও একটি বিশেষ সময়—যেমন ধরুন, ভগবান যখন জগতে অবতীর্ণ হচ্ছেন—তা একটি বিশেষ মুহূর্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি জগতের ঈশ্বর, যাঁর অঙ্গুলি হেলনে সমগ্র জগৎ চলে। তাঁর জন্ম সময়ে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র শুভ ও সর্বশ্রেষ্ঠ থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে এই নক্ষত্র ও গ্রহ সকল, তারা ঠিক জায়গায় অবস্থিত থেকে শুভ মুহূর্ত তৈরী করবে। কারণ ভগবান হলেন এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পিতা, বিধাতা। তাই তাঁর আগমন

কালের সেই মুহূর্তটি শুভই হবে। প্রকৃতি স্বয়ং শ্রীভগবানের জগতে অবতরণ মুহূর্তটিকে শুভতম অবস্থানে সাজিয়ে দেন। ঠিক তেমনই এরূপ শুভ মুহূর্তে মাও আগমন করবেন আর শুভ মুহূর্তেই প্রত্যাগমন করবেন। এই মা সমগ্র জগতের প্রসবিত্রী। তাই 'মা' সম্পর্কিত মুহূর্তগুলি বিশেষ বিশেষ তিথি ও নক্ষত্র দ্বারা গর্বিত। সেজন্য এসব আমাদের মান্য করা উচিত, উড়িয়ে দেওয়াটা নির্বুদ্ধিতার কাজ।

আজ বিজয়া উপলক্ষেই এখানে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের স্মারক বক্তৃতা। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর সংস্পর্শে প্রায় পনেরোটি বছর কাটানোর। এই পনেরোটি বছরের মধ্যে সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রায় সাড়ে চার-পাঁচ বছর, আর যোগদ্যান মঠে বছর দশেক। এই পনেরোটি বছর একদম নিকট সান্নিধ্যে তাঁকে পেয়েছিলাম। আমার শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করার পর তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে মনে হয়েছিল, তিনি খুব গম্ভীর ব্যক্তি, একটু দাম্ভিকও বটে, বিশেষ কথাবার্তা বলেন না। যদিও সেই ধারণা পরে সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল—যখন মনসাদ্বীপ থেকে কলকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠানে কর্মী হয়ে এলাম, তিনি তখন সেখানকার সেক্রেটারি। আপনারা নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন গঙ্গাসাগরের নাম। সেই সাগরদ্বীপের একটি অংশ মনসাদ্বীপ নামে পরিচিত। সেখান থেকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে বদলী হয়ে প্রথম ভাবনা হলো এমন একজন গম্ভীর, রাসভারী মানুষের সঙ্গে কাটাবো কেমন করে? তবু আমায় বেলুড় মঠের নির্দেশে সেবা প্রতিষ্ঠানে চলে আসতে হলো। সেই সময় উনি মঠের বোর্ড অব ট্রাস্টির একজন অন্যতম ট্রাস্টি ও মিশনের পরিচালন সমিতির সভ্য। তিনি তখন "নরেশ মহারাজ" বলেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। আমরাও সকলে তাঁকে "নরেশ মহারাজ" বলেই ডাকতাম। পরে যখন তিনি সহসংঘাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন, তখন "নরেশ মহারাজ" না বলে সকলে 'গহনানন্দজী মহারাজ' বলেই বলতেন, আর সাক্ষাতে "মহারাজ" বলে সম্বোধন করতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যতই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে থাকলাম, তখন আমার মনে অনুভব হলো—তিনি খুবই আপনজন, আত্মীয়ের মতো। এবং কোন কিছু যা অন্যের কাছে বলা যায় না—সেই মনের কথা তাঁর কাছে বলা যায়। তাঁর একটি মহৎ গুণ হলো—সবার অন্তরের সব কথা শুনে গোপন রাখেন, কারো কাছে প্রকাশ করেন না। স্বামীজিও বলতেন, নিজের দুর্বলতার কথা কারোর সম্মুখে প্রকাশ করবে না, একমাত্র ভগবানের কাছে ছাড়া। তিনি অন্তর্যামী। তাই আমাদের দুর্বলতা, সরলতা—সবকিছু তিনিই জানেন। একমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করবে এগুলো দূর করার জন্য। স্বামী গহনানন্দজী এরকম এক ব্যক্তি যাঁর কাছে মনের সব কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তিনি কাউকে বলবেন না এবং শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে পরিস্থিতি অনুযায়ী

সদুপদেশ দিয়ে সাহায্যও করবেন। সেই থেকেই স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সঙ্গে শ্রদ্ধামিশ্রিত আমার একটা নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হলো।

সে সময়ে সেবা প্রতিষ্ঠানে একটা বিরাট কনস্ট্রাকশানের কাজ শুরু হতে যাচ্ছিল, আর তার দেখাশুনা করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হলো। এই বাড়িটার নাম ছিল ভি.আই.এম.এস—বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট্ অফ্ মেডিকেল সায়েন্স। সেই টাকাটা এসেছিল নন্দলাল তাঁতিয়া মশায়ের অনুদান থেকে। তখনকার দিনে অর্থাৎ (১৯৭৭ খ্রীঃ) তিনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দান করলেন তাঁর বাবার নামে। সেই টাকাতেই এই কনস্ট্রাকশানের কাজ শুরু করা হয়েছিল। আর কনস্ট্রাকশানের কাজ মানে—তার তিথি, বার নক্ষত্র নেই—সেকাজে সময় নেই, অসময় নেই, খাওয়ারও অবকাশ নেই। তিনিও প্রায়ই হাসপাতালের সমস্ত কাজ ও অন্যান্য কাজ সামলে সেখানে উপস্থিত হতেন। খেতে যেতে বেলা দুটো বেজে যেতো। তাঁর আর এক মহত্ত্ব দেখতাম—নিজে খেতে বসে জিজ্ঞাসা করতেন "সকলে খেয়ে গেছে তো?" যদি জানতেন কারু খেতে বাকি আছে তাঁকে ডেকে পাঠাতেন এবং একসঙ্গে নিয়ে খেতে বসতেন। এমনি মাতৃভাব তাঁর এক বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল। গহনানন্দজী মহারাজ ছিলেন দেখতে গম্ভীর, সহজে কেউ ধারে ঘেঁষার সাহস করত না। অথচ সেই গাম্ভীর্যের অন্তরতম প্রদেশে এক মাতৃহৃদয় প্রচ্ছন্ন ছিল, চরিত্রগত দিক থেকে তিনি ছিলেন মিতভাষী। কিন্তু একজন প্রকৃত কর্মবীর, আমি যখন কনস্ট্রাকশান স্থলে থাকতাম—তখন সর্বদা সময় মতো খেতে যেতে পারতাম না, কিন্তু মহারাজ এসে ডেকে নিয়ে যেতেন—"চলো খেতে যাবে"। যেখানেই যত ব্যস্ত থাকুন না কেন, তিনি কাজ চলাকালীন কোন না কোন সময় এসে একবার দেখে যেতেন। কোন কোন দিন গাড়ি সাধু নিবাসের গেটের কাছে এলে, সেখান থেকে অতটা হেঁটে হলেও এসে ডেকে নিয়ে যেতেন। তাঁর সঙ্গে মান-অভিমান প্রীতি-ভালোবাসা সব কিছুই করা চলত। এমনই একটা ছোট্ট ঘটনা বলা যেতে পারে— সে দিনটা হলো শিবরাত্রির দিন, ঠাকুরের তিথি পূজার আগে শিবরাত্রি পড়ে। শিবরাত্রির পর একদিন সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে একটা শোভাযাত্রা বের করা হতো। গোলপার্কের কালচারের থেকেও একটা শোভাযাত্রা বের হবে। এই দুই শোভাযাত্রা এসে দেশপ্রিয় পার্কে মিলিত হবে, সেখানে বক্তৃতাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো, সেখানে কালচার থেকে লোকেশানন্দজী মহারাজ ও অন্যান্য সাধু ব্রহ্মচারীরা আর গহনানন্দজী সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে সাধুদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। গহনানন্দজী মহারাজ বিশেষ বক্তৃতা দিতেন না। কালচারের প্রসেশনে অনেক আয়োজন, আড়ম্বর, সাজ-সরঞ্জাম, কিন্তু সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রসেশনে অতসব কিছুই নেই সাদাসিধে-

সংক্ষিপ্ত। কারণ হাসপাতাল কিনা—অত সব করার সুযোগই বা কোথায়—যেখানে সর্বদা মরণ-বাঁচন সমস্যা। কিন্তু দেখা যেত জনসংখ্যার দিক দিয়ে সেবা প্রতিষ্ঠানের ভিড়ই অনেক বেশি হতো। কারণ আমাদের সব কর্মী মিলে শোভাযাত্রাটি বিশাল আকার ধারণ করত, আর কর্মীদের অধিকাংশই এই সেবা প্রতিষ্ঠানের মিছিলেই সামিল হতেন। আর সারা রাত ধরে ঠাকুরকে সাজানো চলত। আর শোভাযাত্রা দুটো পার্কে পৌঁছলে বক্তৃতা। বক্তৃতার পর যে যার মতো ফিরে আসত। এই উপলক্ষে সেবা প্রতিষ্ঠানে ঠাকুরের ফটো ট্রাকে করে সাজানো হবে। যেসব কাপড় ও সাজসজ্জা দিয়ে ঠাকুরকে সাজানো হবে সেসব নিয়ে মহারাজকে দেখাতে গেলাম। এইসময়ে তিনি কোনও বিশেষ কাজ বেশ মনোযোগ দিয়ে করছিলেন। সেই সময়ে উপস্থিত হয়ে ঐ সব দেখাতে তিনি বলে উঠলেন—"এসব দেখে আমি কী করব? আর কোনো কথা নেই। তা শুনে আমিও অভিমান ভরে ঘরে চলে এলাম। সেদিন শিবরাত্রি উপলক্ষে সকলে বেলুড়মঠে যাবে। জানতে চাওয়া হয়েছিল কে কে যাবে? আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিলাম—আমি যাব না। এরপর নিজের ঘরে চলে এলাম। সাধুরা একটা গাড়ী করে মঠে চলে গেলেন। গহনানন্দজীও পরে একটা গাড়ীতে যাবেন, আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি বললাম—আমি যাব না বলে দাও। উনি আবার ডেকে পাঠালেন। তখন তার কাছে যেতেই তিনি বললেন—ঠাকুর ঘরে কে, কলা খাইনি। আমি কী তোমাকে বেলুড়মঠ যাওয়ার কথা বলেছি? বলেছি ওকে ডাকো।

আমিও জিজ্ঞাসা করলাম—বেশ, তবে কী জন্যে ডেকেছিলেন বলুন এখন। তার উত্তরে জানতে চাইলেন, 'কেন যাবে না?' তখন একটা অজুহাতের মতো করে বললাম—'আমার মাথা ধরেছে।' সারাদিন ঐ শোভাযাত্রা সংক্রান্ত কাজকর্ম, এদিকে কনস্ট্রাকশনের ব্যস্ততা, হৈচৈ এর ফলে যদিও এটা অবশ্য অনেকটা সত্যিই ছিল। সব শুনে উনি একটা ট্যাবলেট দিয়ে বললেন—এটা খেয়ে নাও, মাথা ধরা সেরে যাবে', তো আমি আর উপায় না দেখে ট্যাবলেটটা সেই সময়ে পকেটে রেখে ঘরে গিয়ে মঠে যাবার জন্য এলাম। মঠে প্রথম প্রহরের পুজো হয়ে যেতে তিনি সঙ্গে করে নিয়েও এলেন। এমন এক স্নেহ ভালবাসা তাঁর মধ্যে ছিল, কিন্তু তার বাহ্যিক প্রকাশ বা উচ্ছ্বাস ছিল না। এক্ষেত্রে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে আমি তাঁর রূঢ়কথায় আঘাত পেয়েছি, সেটা মুখে প্রকাশ না করেও স্নেহ ভালোবাসা পূর্ণ ব্যবহারে তা দূর করে দিতেন, কিন্তু মুখে একবারও বলতেন না, 'আমি এমন বলেছি, কিছু মনে কোরো না।' তাঁর খাওয়া-দাওয়াও খুবই সাধারণ—সকালের টিফিনে হরলিক্সের সাথে অর্ধেক জল আর অর্ধেক দুধ দিয়ে চিনি গুলে খেতেন। আর তার সঙ্গে একটা কলা ও দুটুকরো

পাউরুটি, দুপুরে একটু ভাত আর ডাল সব্জি সবই একটা বাটিতে নিয়ে একসঙ্গে মিশিয়ে চামচ দিয়ে খেয়ে নিতেন। তার কী স্বাদ বা বিস্বাদ তার প্রতি কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। রাত্রিতে দুটো হাতে করা রুটি আর তরি-তরকারী, সঙ্গে এক কাপ দুধ। বিকেলে একটু মুড়ি ও চা বা হরলিক্স।

সেবা প্রতিষ্ঠানে তখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের আন্দোলন চলছে। তার মধ্যেই তখন ধীর স্থিরভাবে সব কিছু সামলেছেন। তাঁর মুখ চোখ দেখলেও কোনো ভাবে কিছু বোঝা যাবে না। মুখে একটা নিরুদ্বেগ ভাব। আমাদের কখনো কখনো বলতেন—আমরা তাঁর যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রের তো ভাল-মন্দ দেখার কাজ নয়। সে কাজটি হলো যন্ত্রীর। তিনি ঠাকুর। তা সে সময় আন্দোলনকারীরা দিনের বেলায় দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে লিখে দিয়ে যেত 'নরেশ মহারাজের কালো হাত ভেঙে দাও—গুঁড়িয়ে দাও' আর আমাদের কাজ ছিল রাতে দেওয়ালে চুন দিয়ে সে সমস্তকে মুছে দেওয়া। পরে অবশ্য সে সব মিটলো, সেবা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা স্বাভাবিক হলো। এই একটা সময়ে ও তিনি ধীর-স্থির ভাবেই তাঁর কর্তব্য-কর্ম করে গিয়েছেন, কর্ম থেকে তাঁর কোনোরূপ বিচ্যুতি ঘটেনি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনের সর্বস্ব। সেই স্থির ধ্রুবতারাকে দেখেই তাঁর জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হতো। তাঁর সেবাদর্শই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—আর কিছু নয়।

আমরা যেখানে এতজন একটা বিরাট জায়গায় একই সঙ্গে রয়েছি। আমরা সাধারণ কথাতেই বলি একই জায়গায় অনেকগুলো হাঁড়ি একসঙ্গে থাকলে ঠোকাঠুকি লাগেই। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়। কথায় আছে আবাদ করে বিবাদ করে সুবাদ করে তারা।—আমরা আবাদও করি, বিবাদও করি । আবার সুবাদও করি। তাই এই সব কিছুই প্রতিনিয়ত ঘটতেই থাকবে। কিন্তু ধীর ব্যক্তি তাতে ধৈর্যচ্যুত হন না, ধৈর্যের সঙ্গেই পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ করেন। স্বামী গহনানন্দজী এই শ্রেণীর ব্যক্তি।

কোনো ব্রহ্মচারী বা সাধু সকলের প্রতিই তাঁর সমান ভালোবাসা, স্নেহ সবসময় কাজ করত। উনি গাড়িতে যাতায়াত করার সময় যদি দেখতে পেতেন, কোনও সাধু বা ব্রহ্মচারী বাস ধরার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, তখনি দেখতে পেয়েই ড্রাইভারকে বলতেন—গাড়িটা থামাও। তাঁদের গন্তব্যস্থল জেনে নিয়েই বলতেন উঠে আসার জন্য। তারপর ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতেন তাঁর ওই জায়গা বা সুবিধামতো কাছাকাছি কোথাও নামিয়ে দেওয়ার জন্য। তারপর নিজের জায়গায় পৌঁছতেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেও তাঁর এই স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি।

তাঁর আরও একটি মজার রেকর্ড ছিল। কতবার যে ট্রেন ফেল করেছেন, আর কতবার যে প্লেন ফেল করেছেন তার ঠিক নেই। এই বিষয়ে একটি ঘটনা বলি। সুধাংশু (স্বামী ভবহরানন্দজী) মহারাজের উপরই দায়িত্ব পড়ত মহারাজকে ছেড়ে আসার জন্য। সুধাংশু মহারাজ তাড়া দিতেন—চলুন চলুন, গাড়ি ছেড়ে যাবে। এতে গহনানন্দজী হেসে বলতেন—"ছেড়ে কোথায় যাবে?" আর সুধাংশু মহারাজের উদ্বেগের পারদ চড়ছে। কিন্তু তিনি নির্বিকার। একবার তো সুধাংশু মহারাজ গাড়ি থেকে নেমেই প্রায় ছুটতে ছুটতে ট্রেনে উঠে ট্রেনের চেন টেনেছেন। গাড়ি ততক্ষণে চলতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। আর তখনও মহারাজের গাড়ি এসে পৌঁছয়নি। তিনি টিটিকে অনুরোধ করলেন—আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজ যাবেন, কর্মব্যস্ত মানুষ, রাস্তায় খুব জ্যাম, প্লীজ একটু অপেক্ষা করুন। ততক্ষণে সকলে ছুটে এসেছে আর মহারাজও ধীরে সুস্থে এসে পড়েছেন প্রায়। এরপর মহারাজকে তুলে দিয়ে গাড়িতে বসিয়ে প্রণাম করে চলে এলেন। ভিতরে ভিতরে প্রচন্ড রাগে ফুঁসছেন। এরপর মহারাজ ফিরলেন। ফিরে বললেন—সুধাংশু সেই দিন তুমি যদি গিয়ে গাড়িটা না থামাতে আমরা খুব বিপদে পড়তাম। আর সেই মুহুর্তেই সুধাংশু মহারাজের জমে থাকা সব রাগ তুবড়ির মতো বেরোতে থাকল। তিনিও কিন্তু চুপচাপ বসে খেয়ে চলেছেন, একটুও বিচলিত হলেন না। অথচ সুধাংশু মহারাজ তাঁর থেকে কত বয়ঃকনিষ্ঠ। এই তাঁর আর একটি মহৎ গুণ।

আরও দেখা গেছে যদি কখনও কোনো সাধু খুব অন্যায় করে, তাকে অনেক সময়ই তপস্যাদি করতে বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। তিনি বুঝিয়ে বা যুক্তি দিয়ে তার সপক্ষে কর্তৃপক্ষকে বলতেন যে—এই ছেলেটা হয়তো ভুল করেছে, একটা সুযোগ দেওয়া হোক। সে ক্ষমা চাইবে। তিনি ওই মিটিং থেকে নেমে বেরিয়ে এসে ওই সাধুকে সকলের সামনে ক্ষমা চেয়ে নিতে বলতেন। এইভাবে সাহায্য করতেন। তিনি তার হয়ে বলতেন—দেখুন এই ছেলেটাকে সরিয়ে দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই। কারণ, একে আমরা আনিনি, ঠাকুর এনেছেন। তিনি রাখলে রাখবেন, আর সরালে সরাবেন। আমাদের কী অধিকার আছে? আমাদের শুধু এইটুকু অধিকার আছে ও আমাদের একটা ছোট্ট ভাই, ও যদি কিছু ভুল করে সেটা শুধরে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। অতএব, আমরা সেই অধিকারটুকু এখানে প্রয়োগ করতে পারি, এর বেশী নয়। সে সাধু সন্ন্যাসী হোক বা ব্রহ্মচারী হোক কেউ দোষ করে থাকলে স্বামী গহনানন্দজী তাঁকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে বলতেন, ওকে শুধরাবার একটা সুযোগ দাও।

যোগদ্যান মঠে থাকাকালীন প্রায়ই ভক্তরা আসতেন ও দুপুরে প্রসাদ পেতেন।

কিন্তু কতজন লোক প্রসাদ পাবেন তা আগে থেকে বলা সম্ভব হ'তো না। মহারাজের নির্দেশ ছিল সকলে ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যাবে। তাতে ভাণ্ডারীর অসুবিধা তো হবারই কথা। কারণ এর ঝক্কি তো তাকেই পোহাতে হবে। তাই সে বিরক্ত হয়ে মহারাজের কাছে এসে বলছে—আমি আর পারব না, আমাকে ছেড়ে দিন, অন্য লোক নিয়ে ব্যবস্থা করে নিন। উনি শান্ত ভাবে বললেন—আমি কী লোক ডেকে এনেছি বাড়ি বাড়ি গিয়ে? যিনি এদের এনেছেন তাঁর কাছে যাও, গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, কেন তিনি এতো লোক আনছেন। বলে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির দেখিয়ে দিতেন। বলতেন, আমি তো ডেকে আনিনি, সব কিছু ওইখানে জানাও, আমার কিচ্ছু করার নেই। তিনি যখন ডেকে এনেছেন, আমার কাউকে বলবার অধিকার নেই যে, তুমি প্রসাদ না পেয়ে ফেরত যাও। এই ছোট্ট ঘটনাগুলোই আমাদের সামনে তাঁর বিরাট হৃদয়বত্তার পরিচয় দেয়। শুধু তাই নয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাঁর নির্ভরতার পরিচয়ও পাই।

গুরু পূর্ণিমা। দিনটা ব্যাসদেবের জন্মদিন ছাড়াও নিজের নিজের গুরুদেরও স্মরণ করা হয়। প্রত্যেক ভক্তরাই চান নিজের নিজের গুরুকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ পেতে। সে সময় যোগদ্যানে তাঁর থাকাকালীন সব ভক্তদের ভিড় হতো। একবার গুরু পূর্ণিমায় তিনি ছিলেন না। সেবার গিয়েছিলেন কাশ্মীরে অমরনাথ দর্শনে। তিনি চেয়েছিলেন গুরু পূর্ণিমার আগের দিন দর্শন করে ওই দিন ভক্তদের জন্য যোগদ্যান ফিরে আসতে। মহারাজ কাশ্মীরের গভর্ণরের অতিথি হয়ে ছিলেন। তিনি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন অমরনাথ দর্শনের জন্য। তিনি একটা হেলিকাপ্টারে করে অমরনাথ যাওয়া ও পুনরায় রাজভবনে ফিরে আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সেই হেলিকাপ্টার সেখানে নামতে পারল না। তাই দর্শনও হলো না। মহারাজ বললেন—আগামী কাল গুরুপূর্ণিমা, আমাকে ফিরে যেতেই হবে। কত ভক্ত আসবে, তারা অপেক্ষা করবে আমার জন্য। কিন্তু গভর্ণর বেঁকে বসেছেন। তাঁর কাছে সেটা ছিল একটা চ্যালেঞ্জ — আমি রামকৃষ্ণ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্টকে এখানে নিয়ে এসে অমরনাথ দর্শন করাতে পারলাম না! এটা হবে না। একদিকে গভর্ণর, আর আরেক দিকে স্বামী গহনানন্দজী। গভর্ণর হার মানবার লোক নন, তিনি বলছেন আপনাকে থাকতেই হবে। এতবার বলবার পর গভর্ণরকেও প্রত্যাখ্যান করে চলে আসা যায় না। সবাই চিন্তিত। তাহলে কী করা যায়? তখন তাদের মনে হলো ভক্তরা মহারাজের কথাটা শুনতে পেলেও যথেষ্ট। তখন স্পিকার-ফোন অন করে মহারাজের কথা মাইকে লাগিয়ে দেওয়া হলো। সেইসময় সপ্তর্ষি মহারাজ ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সচিব। উনি ঘোষণা করলেন—মহারাজ ভক্তদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলবেন, মহারাজ

প্রায় পাঁচ মিনিট ভক্তদের উদ্দেশ্যে কথা বললেন। শুনে সব ভক্তরা অতিশয় খুশী ও তৃপ্ত হলেন।

তারপর আসি দীক্ষার প্রসঙ্গে। আপনারা জেনে থাকবেন হয়তো, যোগদ্যান মঠটি যেখানে অবস্থিত সে জায়গাটির আরেকটি নাম আছে 'কাদাপাড়া'। নীচু জায়গা, বৃষ্টি হলেই সেখানে জল জমে থাকে। একবার দীক্ষার দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে ওই অঞ্চলে রাস্তাগুলো জলে ডুবে গেছে। যোগদ্যানে আসার রাস্তায় হাঁটুর উপর জল। সব দীক্ষার্থীরা তার মধ্যেই এসে জমায়েত হয়েছে। সবাই ভিজে গেছে। তাঁর সেবকরা, এমনকি দীক্ষার্থীরাও সকলে মহারাজকে বলল—আজকের দীক্ষা বন্ধ থাক। মহারাজ বললেন—তোমরা সবাই এত কষ্ট করে ভিজে এখানে আসতে পার আর আমি এখানে ঘরে থেকে তোমাদের দীক্ষা দিতে পারি না? দীক্ষা বন্ধ হবে না। দীক্ষা হবে। তখন সকলে ভিজে, কী হবে? এই সমস্যা দূর করতে মহারাজ বললেন—ধুতি শাড়ি যা আছে—ওদের দিয়ে দাও। এই ঘটনাগুলো হয়তো ছোট ছোট। কিন্তু একটা গভীর হৃদয়বত্তা ও অন্যের জন্য অনুভবের পরিচয়ই পাওয়া যায়। নতুন কাপড় বের করে তারপর সেইদিন সকলের দীক্ষা হয়েছিল। সকলের জন্য যে এত ভাবনা এটা গহনানন্দজীর জীবনেই আমরা প্রায়ই দেখে এসেছি।

সেবা প্রতিষ্ঠানে পূজাদির বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। একমাত্র যেটুকু আছে মেয়েদের নার্সিং হোস্টেলে। সেখানে আমরা যাই না। তাদের পূজা, আরতী সব হয় । এছাড়া আর কিছুই নয়। সেখানে প্রসাদেরও ব্যবস্থা নেই। কোনও হোস্টেলের ঠাকুর ঘরে প্রার্থনাদি হয় যেমন। আর বিশেষ বিশেষ দিনে যদি বিশেষ পূজো হয় তাহলে, সেক্ষেত্রে সামান্য প্রসাদের ব্যবস্থা থাকে। এক ভক্ত এসে বলছেন—মহারাজ, এরকম বিচিত্র ঠাকুরের আশ্রম কোনোদিন দেখিনি। মহারাজ বললেন—কে বলেছে এটা আশ্রম? এটা "রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান" এখানে সেবা করা হয়। এখানে সেবাই হচ্ছে পূজা। আপনার কী অসুবিধে? উনি বললেন—অসুবিধা কিছুই নয়, সব জায়গাতেই একটু হাত ধোয়ার ব্যবস্থা মানে একটু প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা আছে। এখানে তো সেসব কিছুই নেই। মহারাজ হেসে বলছেন—তা বটে। কিন্তু দেখুন আমাদের বসিয়ে কোনো ব্যবস্থা নেই। আপনি শুয়ে পড়ুন। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এটা সেবা প্রতিষ্ঠান শুয়ে পড়লেই ব্যবস্থা হয়। এরকম সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মজার উত্তর দিয়ে দিতেন।

আরও একটি ঘটনার বিবরণ দেওয়া যায়। সেবাপ্রতিষ্ঠানে আরও একজন ব্যক্তিরও খুব যাতায়াত ছিল, তিনি হলেন কিশোরীবাবু। কিশোরীবাবু ছিলেন আমাদের পরম

পূজনীয় দশম প্রেসিডেন্ট মহারাজের আশ্রিত। উনি আশ্রমের সমস্ত ইলেকট্রিকের কন্ট্রাক্টর। তিনি সবার আগে তাঁর কোম্পানীর যে ক্যালেন্ডার বেরোত এসে টাঙিয়ে দিতেন মহারাজের অফিসে। এদিকে ক্যালেন্ডার ঝোলাবার জন্য একটাই পেরেক থাকত। উনি কিছুদিন পরে এসে দেখলেন তাঁর ক্যালেন্ডারের উপর আরও অনেকে এসে অনেকগুলো ক্যালেন্ডার ঝুলিয়ে গেছে। তা দেখে কিশোরীবাবু মহারাজকে বললেন, মহারাজ আমার ক্যালেন্ডার তো সবার নীচে পড়ে গেল। মহারাজ হেসে উত্তর দিলেন—ওইটাই তো ফাউন্ডেসন, ওর উপরই বাকি সবগুলো রয়েছে।

মহারাজের কর্মময় জীবনে যতই কঠিন পরিস্থিতি এসেছে কোনদিন তাঁকে আমরা বিচলিত হতে দেখিনি। সেবা প্রতিষ্ঠানে স্ট্রাইকের সময়কার ঘটনার আলোচনা আগেই করলাম। আর একটি ঘটনা মনে পড়ে যায়। একদিন ওনার অফিসে একটি লোক এসেছে। তার কোন প্রিয় জন মারা গেছে। খুব সম্ভবতঃ তার স্ত্রী মারা গেছে। মহারাজ অফিসে বসে আছেন। ওনার টেবিলের উপর একটা টেবিল গ্লাস পাতা আছে। সেখানে হঠাৎ ঘুসি মেরে ওই ব্যক্তি বলছেন—আমার স্ত্রী মারা গেল কেন—তার জবাব চাই। তার প্রিয়জন বিয়োগে তার অবস্থার কথা ভেবে মহারাজ চুপ করেই বসে আছেন। কিন্তু তাঁর টেবিলে আঘাতের চোটে গ্লাসটাও টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সেই সময় হঠাৎ উপস্থিত হলেন কলকাতা পুলিশের একজন খুব বড় অফিসার। তিনিও ভক্ত ছিলেন। মাঝে মাঝে সিভিল ড্রেসে আবার মাঝে মাঝে ইউনিফর্ম পরে মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। ঢুকে প্রশ্ন করলেন—মহারাজ কেমন আছেন? মহারাজ বললেন ভালো আছি, এরপর ভাঙা গ্লাস লক্ষ্য করে জানতে চাইলেন—গ্লাসটা ভাঙা কেন? মহারাজ বললেন—মহা দুঃখের অভিব্যক্তি, সহ্য করতে পারেনি। উনি কিছুই বুঝতে পারছেন না—দুঃখের অভিব্যক্তি কেন গ্লাস সহ্য করতে পারবে না! তখন মহারাজ খুলে বললেন সব। পুলিশ অফিসারটি শুনে বলছেন—শুনুন মশাই, আপনাকে এক্ষুনি লালবাজার লকাপে আমি নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু মহারাজ সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে বাধা দেবেন। আপনি এই জায়গা বলেই রক্ষা পেয়ে গেলেন। কিন্তু সাবধান। সেই পুলিশি ভাষা, মেজাজ দেখে লোকটি ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। এই অবস্থায় তার ঐ রাগ সব জল লোকটি মহারাজের পায়ে পড়ে কাঁদছে—মহারাজ ক্ষমা করুন। মহারাজ তখন বলছেন— আপনার জায়গায় যদি আমি থাকতাম, হয়তো আমিও এমন একটা কান্ড করে বসতাম। কিছু মনে করার দরকার নেই। বরাবরই এমন সহনশীলতার পরিচয় পাই।

আরও একটি ঘটনা, একটি ছোট্ট ছেলে। তার বছর সাত আটেক বয়স হবে। তার

মা মারা গেছেন। তার বাবা তার মায়ের মৃতদেহ নিয়ে যেতে এসেছেন। গহনানন্দজীর কাছে। ছেলেটা ঢুকেই কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে পড়েছে মহারাজের কোলে। 'আমার মা কোথায়?' মহারাজের নিজের চোখ দুটো জলে ভরে গেল। এই ছেলেটাকে কী জবাব দেবেন। তার মা কোথায় গেছে? কী উত্তর দেবেন তিনি! কিছু উত্তর দিতে পারছিলেন না। একটু পরে পিঠ চাপড়ে চাপড়ে খুব স্নেহমাখা কথায় বললেন—শোন, তোমার মা ঠাকুরের কাছে গেছেন। সেখানে গেলে আর কারো মৃত্যু হয় না। কোনও কষ্ট হয় না—সব সময়ই আনন্দে থাকে। সেখানে তোমার মা খুব আনন্দে আছেন।

ছেলেটা কতটা কী বুঝল জানি না। এই কথাটা প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ছে। একদিন এক দীক্ষিত ভক্ত এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। তিনি মহারাজের কাছে এসেছেন দেখা করতে। সেখানে এসে প্রণাম করতে গিয়ে অঝোরে কেঁদে চলেছেন। মহারাজ প্রথমতোঃ কিছু বলছিলেন না। তারপর একটু শান্ত হতে মহারাজ বললেন—শান্ত হোন। যে গেছে, সে তো হাজার কান্নাকাটি করলেও ফিরে আসবে না। তার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করুন, আর নিজের মনকে বাস্তবকে স্বীকার করার জন্য শক্ত করুন। একটা ছোট্ট কথার পর লোকটি শান্ত হয়ে গেল। এই কথা অন্যের কাছ থেকে শুনে থাকলেও, এই একজন সাধু পুরুষের কাছ থেকে এমন কথা শুনে তিনি শান্ত হয়ে গেলেন।

আরও একটি কথা বলে শেষ করব। ঠাকুর, মা ও স্বামীজির মধ্যে আমাদের সাধুদের সকলেরই মায়ের প্রতি একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে। শিশুদের কাছে বাবার থেকে মা বেশি কাছের হন। আমরা সকলেই জানি ও সেটা অনুভব করি। ঠাকুর তো ঠাকুরই। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি সবারই আছে। কিন্তু "মা" একটি বিশেষ স্নেহ-ভালবাসার জায়গা। যোগদ্যানের বেদীতে উপরে ছিল ঠাকুরের বেদী, মা আর স্বামীজির সিংহাসন বেদীর নীচে রাখা তিনি বললেন—না, মা এবং স্বামীজিকেও উপরে তুলতে হবে। ঠাকুর যেমন বসে আছেন। তার পাশে মা-স্বামীজিকে তোলা হবে, তখন মা ও স্বামীজির বেদীকে উঁচু করা হলো। তার উপরে মা ও স্বামীজিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন।

তিনি যখন ঠাকুরঘরে প্রণাম করতেন, মাকে প্রণামের সময় মায়ের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকতেন যেন ছোট্ট একটি অসহায় শিশু, মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এত বয়সেও এই শরণাগতির ভাব আমরা দেখেছি। মঞ্চে থাকাকালীন ও মাকে যখন প্রণাম করতেন সেখানেও তাকিয়ে থাকতেন ঐরকম এক দৃষ্টিতে।

তিনি বলতেন—দেখো, আমাদের জীবনের ঠিক কেন্দ্রস্থলে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আমাদের জীবন হবে ঈশ্বরকেন্দ্রিক এবং সেই ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি এসেছিলেন মানুষের জন্য। বিশেষ করে যারা দুঃখী, ব্যথিত, তাদের জন্য। ঠাকুরের এই ভাব—চোর, ডাকাত, বদমাস—তাদের মধ্যেও আমার নারায়ণ। তাঁর সেই বিখ্যাত হাতি নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণ গল্পের মাধ্যমে এই তত্ত্বটি শিক্ষা দিচ্ছেন। ঠাকুর, মা—তাঁরা এসেছিলেন পাপী, তাপী তাদের উদ্ধার করার জন্যে। এই ভাব শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব, সনাতন ভাব, শাশ্বত ভাব, ঈশ্বরীয় ভাব, এই ভাবটুকু আমরা যদি ভুলে যাই—তাহলে আমাদের সমূহ বিপদ। বাইরের কত জিনিস আসবে যাবে, কিন্তু এই ভাবটুকু ভুলে গেলে চলবে না। এটুকু আমাদের আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। সেটাই হবে খুঁটি ধরে থাকা। এককথায় বলা চলে—স্বামী গহনানন্দজীর জীবন-শ্রীরামকৃষ্ণকেন্দ্রিক—তাঁর এই পবিত্র সংঘ তার প্রাণকেন্দ্র।

কর্মযোগী স্বামী গহনানন্দ

স্বামী দীননাথানন্দ

ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত শিশু ও জন্মদাত্রী মায়েদের সেবার সুব্যবস্থা ছিল না। ফলে উভয়েই মারা যেত। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রখ্যাত সন্ন্যাসী মাধবানন্দ ও দয়ানন্দ আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। তিন বৎসর থাকেন। স্বামী দয়ানন্দজী ওদের দেশে শিশু ও মায়েদের ডাক্তার ও নার্স কর্তৃক উৎকৃষ্ট সেবা যত্ন দেখে সঙ্কল্প করেন, তিনি পশ্চিমবঙ্গে ফিরে গিয়ে অনুরূপ শিশু ও মাতৃমঙ্গল হাসপাতাল তৈরি করবেন। অভিজ্ঞ ডাক্তার ও নার্স দিয়ে উক্ত সেবা কাজ পরিচালনার জন্য ডাক্তারী পড়ার নার্সিং স্কুল খোলার ব্যবস্থা করেন।

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের ট্রাস্টিগণ প্রথমে সর্বসম্মতি ক্রমে রাজি হচ্ছিলেন না। কারণ সন্ন্যাসীদের এধরণের সেবা কাজ করা উচিৎ নয়।

অবশেষে অনুমতি দেন ও শর্ত দিলেন, এই দায়িত্ব ভার তিনি আজীবন পালন করবেন। তিনি রাজি হয়ে প্রথমে শিশু মঙ্গল নাম দিয়ে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন; উক্ত সেবার কাজ শুরু করার জন্য দয়ানন্দজীকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন কর্মযোগী স্বামী গহনানন্দ পরবর্তীকালে মাধবানন্দজী মঠ মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি ও পরে সংঘাধ্যক্ষ হন।

সম্ভবত ১৯৩৬ সালে দয়ানন্দজী সেবাকাজ শুরু করেন। ফলে শিশুমঙ্গল হাসপাতালটি সবশ্রেণীর মানুষের উপকারে আসে।

স্বামী গহনানন্দজী তাঁর দক্ষিণ হস্ত হয়ে এই ক্ষুদ্র হাসপাতাল সরকারী অনুমতি নিয়ে জেনারেল হাসপাতালে পরিণত করেন। উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিমে পাঁচ তলা হতে ছয়তলা বাড়ি তৈরি হয়। তাতে আউটডোর, ইনডোর চালু হয় এবং সুচিকিৎসক ও নার্সের স্কুলের ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মীরা ডাক্তারদের সহযোগিতা করেন। প্রতিদিন বর্তমানে শত শত রোগী outdoor এ ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসায় সুস্থ হয়। নাম মাত্র দুই টাকা

জমা দিয়ে তিন মাস চিকিৎসার সুযোগ পান। আউটডোরে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট খোলা হয় যথা : Medicine Cordiology, Orthapadic Skin, eye X-ray প্রভৃতির দ্বারা চিকিৎসা হয়। কিছু বিনামূল্যে ঔষধের ব্যবস্থাও হয়ে থাকে।

ইনডোরে প্রায় ৫০০ শত রোগী মাত্র দশটাকা বেড়ভাড়া দিয়ে চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। উক্ত দশটাকার মধ্যেই তাদের দুইবেলায় ভাল টিফিন দুপুরে মাছভাত, রাত্রিতেও অনুরূপ খাবার ব্যবস্থা রয়েছে। সপ্তাহে একদিন মাংস হয়। আউটডোরের ডাক্তারদের অধীনে ভর্তি রোগীকে ১টার পর ও সন্ধ্যা ৭টার সময় রোগীদের পরিস্থিতিতে ডাক্তারগণ দেখে যান। ১১টা Operation Theatar এ বিভিন্ন রোগের খ্যাতনামা ডাক্তারগণ জুনিয়র ডাক্তারদের সহায়তার জন্য Operation করেন।

উক্ত ডাক্তারগণ জুনিয়র ডাক্তারদের হাসপাতালের মধ্যে কলেজে পড়ান, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কর্তৃপক্ষ D.N.B. কোর্স চালু করেন। অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতিতে বেড ভাড়া কিছুটা বাড়ানো হয়।

সাধুদের চিকিৎসার জন্য প্রেমানন্দ ওয়ার্ড খোলা হয়। গহনানন্দজী মহারাজ কয়েকজন ডাক্তার নিয়ে সপ্তাহে দুই তিন দিন রোগীদের অবস্থা পরিদর্শন করেন এবং পরে ডাক্তারদের সাথে আলোচনা করেন। পরবর্ত্তীকালে হার্টের রোগীদের জন্য ICU (Intensive care unit) খোলা হয় প্রয়োজনে Vantilation এতে রাখা হয়, E.C.G. ব্যবস্থা রয়েছে। রোগীদের ডায়ালেসীসও হয়। কোন কোন রোগী মারা যাওয়ায় তাদের আত্মীয়গণ স্বভাবত নানারূপ অভিযোগ নিয়ে সেক্রেটারি গহনানন্দজীর নিকট আসে। তিনি শান্ত মনে শুনে ধীরস্থিরভাবে তাদের সান্ত্বনা দেন। তারা ফিরে যায়। একবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু পরিদর্শনে এসে পরিষ্কার হাসপাতাল ও রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা দেখে খুশি হন। প্রধান ইন্দিরাগান্ধীও এসেছিলেন এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদিও এসেছেন। ৫০০ বেডের প্রাইভেট হাসপাতাল ভারতে কম আছে। তাছাড়া আমাদের অন্যান্য হাসপাতাল বা সেবাশ্রমগুলি ২৫০-৩০০ বেডের। এই সেবাযজ্ঞে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ নিরলস পরিশ্রম করেন। এসবের পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ। প্রথম স্বামী বিবেকানন্দ আরম্ভ করেন।

কনখল ও কাশী সেবাশ্রম তাঁর প্রেরণায় শুরু হয়। এখন কনখল সেবাশ্রমে শত শত ঋষিকেশ উত্তরকাশী প্রভৃতি স্থানের সন্ন্যাসীগন বিনা পয়সায় সুচিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ফিরে যান। তৎকালিন সংঘ্যাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরিদর্শনে এসে সেখানে কিছুদিন থাকেন।

শ্রীমা সারদাদেবী কাশী সেবাশ্রমের সন্ন্যাসী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা গরীবদের জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সাধু ও ব্রহ্মচারীদের নিরলস সেবা দেখে মুগ্ধ হন, বলেন, যে এখানে ঠাকুর স্বশরীরে বিদ্যমান হয়ে সেবা দেখছেন, খুশি হয়ে শ্রীমা সেবার উদ্দেশ্যে ১০ টাকা দিয়েছিলেন।

গহনানন্দজী ছিলেন খুব স্নেহপ্রবণ ব্যক্তি। চিরকুমার ফণীন্দ্রবাবু সাহায্য করেছিলেন। ১৯৭০-৭১ সালে প্রবল বৃষ্টিতে কলিকাতায় নীচু স্থানগুলি জল মগ্ন হওয়ায় নিরাশ্রয় ব্যক্তিরা একটি বিদ্যালয়ে আশ্রয় নেন। গহনানন্দজী তাদের হাসপাতালের রান্নাঘরে নার্সিং স্টুডেন্টদের নিয়ে খেচুড়ি বানিয়ে ট্রাকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। নেতৃত্ব দেন স্বামী চেতনানন্দ। বিকেলে সুর কোম্পানীর মাধ্যমে গরম পাউরুটিরও ব্যবস্থা করেন। টাকার অভাব হলেও এক ঠাকুরের ভক্ত টাকা দিতেন। মঠ কর্তৃপক্ষও অর্থ সাহায্য করতেন এই বিশাল হাসপাতাল পরিচালনার জন্য। উক্ত কর্মযোগী ও মানবপ্রেমী পরবর্তীকালে মঠ ও মিশনের ট্রাস্টি হন ও পরবর্তীকালে সংঘাধ্যক্ষ (ধর্মগুরু) হন।

শত শত দীক্ষিত ব্যক্তি আজ তাঁকে শরণ করেন।

নিশ্চিন্ততার মূর্ত বিগ্রহ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

স্বামী নাগেশ্বরানন্দ

"আমি অকৃতি অধম বলেও তো তুমি কম করে মনে দাওনি
যা কিছু দিয়েছ তারই অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাওনি।

রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের চতুর্দশ সংঘগুরু স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ছিলেন আমার বর্তমান আমির রূপকার। তাঁর সান্নিধ্যে আমি সাত বছর ছিলাম। সেই সাত বছরে তিনি তাঁর গভীর স্নেহ ও ভালোবাসায় আমাকে যেভাবে গড়ে তোলেন, তা একপ্রকার মা তার সন্তানকে যেভাবে মানুষ করেন (গভীর স্নেহ ও পালনের বেড়াজালে) অনেকটা, অনেকটা কেন, পুরোটাই তার অভিভাবকত্বে সেভাবেই আমার গড়ে ওঠা। আমার খুব মনে পড়ছে সেই দিনটির কথা যেদিন ওনার মুখের উপর ওনার নির্দেশ অমান্য করে বলেছিলাম পারব না। আর উনি বলেছিলেন, 'এক থাপ্পড় মারব।' এই থাপ্পড় আমি এখনও খাই। খেতে ভালোবাসি। শ্রদ্ধার সাথে বিনম্রচিত্তে। তাই এখনও কোন কাজের নির্দেশে 'পারবো না' কথাটি মুখের কাছে এলেও মুখ থেকে কথাটি বের হতে পারে না। কারণ সেদিনের সেই পারব না কথাটির প্রত্যুত্তরে 'এক থাপ্পড় মারব'—কথাটি মনে পড়ে যায়। সেদিনের সেই শাসন আর আমার ঐশ্বর্য, আজ আমার অহংকার।

'মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে।।'

মহারাজকে নিয়ে আমাদের ভাবনা চিন্তার অন্ত থাকত না। বিশেষ করে যখন দূরে কোথাও যাওয়ার কথা থাকত। বের হবার অন্তত ১৫ মিনিট আগে সবাই রেডি। কিন্তু মহারাজ! রেডি হয়েও রেডি হননি। তাঁর জিনিসপত্র সব গোছানো হয়ে আছে। যারা তা নিয়ে যাওয়ার তারা সব নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। সবাই অপেক্ষায় এবার মহারাজ বের হবেন, বের হবেন। কিন্তু বের হবেন কী তিনি নতুন করে ঢুকলেন। ঠিক বের

হবার মুহূর্তে বাথরুমে ঢুকলেন। কারণ ওনার একটা অ্যালার্জি ছিল, ঠিক কোথাও বেরোনোর মুহূর্তে ওনার পায়খানা যাওয়ার একটা ইরিটেশন হতো। সকলের চিন্তাকে দুশ্চিন্তায় পরিণত করে সকলকে অস্থির করে তুললেন। আর যখন দেরী করে বের হচ্ছেন, তখন তিনি স্থিরচিত্ত। মুখে প্রসন্ন হাসি, কোন তাড়া নেই। যেন কিছুই হয়নি। এরকম ঘটনা এক দুবার নয়, বহুবার। এক কথায় প্রতিবার বললেও অত্যুক্তি হবে না। এরকম দুটি ঘটনার কথা আমার খুব বলতে ইচ্ছা করছে।

একবার কালকা মেল ধরে মহারাজ কানপুরে যাবেন, সেইমতো সপ্তর্ষি মহারাজ, মহারাজের কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন, হয়তো স্টেশনে পৌঁছেও গেছেন। মহারাজ সবেমাত্র বাথরুম থেকে বের হলেন। সবাই ভেবে অস্থির। কী করে সময়ের মধ্যে যাবেন মহারাজ! তখন লালবাজারে ফোন গেল, পাইলট কার পাঠাও। সেইমতো ব্যবস্থাও হল এবং মহারাজ স্টেশনে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু এসে দেখেন সপ্তর্ষি মহারাজ তখনও আসেননি। রাস্তার জ্যামে আটকে পড়েছেন। এদিকে সপ্তর্ষি মহারাজ যখন এসে উপস্থিত হলেন কালকা মেল তখন ছেড়ে দিয়েছে। এখন উপায় কী! এত ঝামেলা পুইয়ে এলেও কী শেষ পর্যন্ত আজ যাওয়া হবে না—এই ভেবে যখন আমরা অস্থির হচ্ছি তখন মহারাজ বললেন, স্টেশন মাস্টারকে বলো রামকৃষ্ণ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজ যাবেন। এই কথা স্টেশন মাস্টারের কানে যেতেই তিনি তৎক্ষণাৎ তড়িঘড়ি করে ছুটে এলেন এবং পরের ট্রেনে মহারাজের যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এত যে সব কাণ্ড ঘটছে এ নিয়ে আমাদের জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। কিন্তু মহারাজ! যেন কিছুই হয়নি। ট্রেনে উঠে স্থির চিত্তে জপ ধ্যান করে চলেছেন।

আর একবার এরকম প্লেন ধরার টাইম ঘনিয়ে এসেছে অথচ মহারাজ বের হচ্ছেন না। এই অবস্থা দেখে আমি কাল............ না করে Airport-এ preliminary কাজগুলো করে রাখছি। যাতে মহারাজের কোনো অসুবিধা না হয়। যাইহোক সেইমতো প্রাথমিক কাজগুলো সারা ছিল বলেই মহারাজ একেবারে কাঁটায় কাঁটায় Airport-এ পৌঁছে প্লেন ধরলেন। এতসব ঘটনা ঘটে গেল। এ ব্যাপারে মহারাজের কোন উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা নেই বরং আছে এক অদ্ভুত নিশ্চিন্ততা। ভাবলে অবাক লাগে! তাই একদিন অবাক বিস্ময়ে মহারাজের কাছে জানতে চাইলাম। মহারাজ, এইরূপ স্থিরচিত্ত ও অদ্ভুত নিশ্চিন্ততার অধিকারী আপনি হলেন কীভাবে? মহারাজ আমার কথা শুনে বললেন, সিদ্ধান্তটা নেয় কে? আমি বললাম—আপনি। মহারাজ বললেন, সেটা কাঁচা আমিতে।

পাকা আমিতে নয়। পাকা আমিতে সিদ্ধান্ত নেন মা, আমি মায়ের কাজের জন্য যাচ্ছি এইটুকু আমি জানি বাকি সব মা। মায়ের কোলের সন্তান যেমন মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে নিশ্চিন্তে মায়ের কোলে খেলা করে। মায়ের .... মহারাজও তেমনি জগন্মাতা শ্রীশ্রী সারদা মায়ের পায়ে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তে জপধ্যান করেন। এবং এই কারণেই এক অদ্ভুত প্রসন্নতায় সকল স্থানে সর্বাবস্থায় হেসে খেলে বিরাজ করেন।

তোমারই করুণায় মা সকলি হইতে পারে।
অলঙ্ঘ্য পর্বতসম বিঘ্ন-বাধা যায় দূরে।।

মহারাজ ছিল জগৎজননী শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে সমর্পিত এক প্রাণ। আমি দেখেছি মহারাজ যখন মঠ থেকে কোথাও বের হতেন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা করে যেতেন। আবার যখন বাইরে থেকে মঠে ফিরতেন আগে মায়ের মন্দিরে এসে মায়ের কাছে সব নিবেদন করতেন, তাদের ঠাকুরের কাছে যেতেন। এর কারণ জানতে চাইলে মহারাজ বলতেন, ঠাকুর আছেন, স্বামীজী ও রাজা মহারাজ আছেন। আর যখন জানি আমার একজন মা আছেন তখন আমার আর কোন চিন্তা থাকে না। মায়ের পায়ে সব কিছু সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

মহারাজের এই নিশ্চিন্ততার ভারকে আশ্রয় করে যারা পথ চলেন। তাদের চলার পথের সকল বাধা বিপত্তি দূর হয়ে যায়।

এখন আমার বয়স সত্তরোর্ধ। ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড় শুকিয়ে গেছে। হাঁটতে চলতে জীবন অসুবিধা—এই অসুবিধায় আজও যখন শারীরিক সক্ষমতার অভাবে কোন কিছু 'পারব না'—এই কথাটি আমার মনে উদয় হয়। 'পারবি না, এক থাপ্পড় মারব।'—মহারাজের এই শাসন আজ এই সবই শরীরে আমাকে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নেয়।

আমায় রাখিতে চাও গো বাঁধনে আঁটিয়া
শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া।
সবি ছেড়ে গেছ ফিরে চেয়ে দেখি
এক পাও ছেড়ে যাওনি।

একান্ত বাক্যালাপে স্বামী নাগেশ্বরানন্দজী মহারাজ যে কথাগুলি বলেন, তারই সংক্ষিপ্তসার এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। অনুলিখন—সমিত কুমার বাগ।

গহন আনন্দ চিন্তন

হে মহান ! তুমি এসেছিলে ধরায়
করিতে জীবন ব্রত সাধনা,
দিব্য জীবন আর পুত-সঙ্গে
জাগিল সবার আধ্যাত্ম চেতনা।

ধৈর্য তব জীবন সঙ্গীত
দয়া ক্ষমা ছন্দলহরী,
মাধুর্যে ভরা চিরহাস্য বদন
পূরায় সকল মনস্কামনা। ।

প্রেম তব জীবন কবিতা
শান্ত গভীর তব আচরণ,
গহনে গোপনে ছিল আনন্দ,
উৎসাহে দিলে সবারে প্রেরণা।।

আজ তুমি নাই ধরাতলে
আছে কেবল মধুর জীবন স্মৃতি,
মননে মন্থনে যেন থাকি আনন্দে
এই কেবল আকুল প্রার্থনা।

যোগস্থ স্বামী গহনানন্দ

স্বামী গিরিধরানন্দ

১৯৬৯-৭০ সাল থেকেই মহারাজকে লক্ষ্য করার সুযোগ হয়েছে—বিশেষ করে যখন তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হিসাবে ছিলেন। তখন তাঁকে অত্যন্ত ধীর, স্থির, গম্ভীর, সংযত চরিত্রের মানুষ হিসাবে মনে হয়েছে। কাজকর্মে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান—খুব হিসাব করে কম কথা বলায় কাজ কর্ম শেষ করা — যথাসময়ে সংঘের কাজে নৈপুণ্য-একাগ্রতা সহায়ে দ্রুত সম্পন্ন করা তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। এবং তিনি চাইতেন নবাগতরা তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজকর্ম করছেন তাঁরাও যেন সঙ্ঘের আদর্শের প্রতি খুবই গুরুত্ব সহকারে ঠাকুরের কাজে অংশগ্রহণ করেন যাতে নিজের (ব্যক্তিগত) চরিত্র সন্ন্যাসের উচ্চ আদর্শের দিকে অগ্রসর হতে পারে। কর্মকে তিনি ঠিক উপাসনা হিসাবে প্রয়োগ করে জীবনের আদর্শ লক্ষ্যের দিকে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। ঐ সময়ে তিনি অছি পরিষদের সদস্য ছিলেন। সুতরাং তাঁর গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁকে সর্বদা সচেতন মনে হত।

তিনি চাইতেন—ব্রহ্মচারীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে সংঘের সেবায় তৎপর হবে। চলাফেরায় কথাবার্তায় সংযত হবে। যদি কোন ত্রুটি দেখতেন তিনি গম্ভীরভাবে তা নির্দেশ করতেন। মনে হত এসব ব্যাপারে সঙ্ঘে থাকতে গেলে কোন শিথিলতা চাইতেন না বরং প্রয়োজনে কঠোর হতেন। তাঁর নিজের জীবনেও তিনি ঐসব গুণাবলী আয়ত্ত্ব করেছিলেন এবং তাঁর কঠোর আপত্তি আচরণও অযৌক্তিক মনে হত না। বহু ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োজনও রয়েছে—তা আমরা বুঝতে পারি।

একটি ব্যক্তিগত কথা লিখছি—তখনকার দিনে আমি তখন পুরুলিয়া থেকে চিকিৎসার জন্য আমায় সেবা প্রতিষ্ঠানে আসতে হয় এবং Chest X-ray করাতে হয়। জীবনে সর্বপ্রথম তা করাই এবং Plate-এ এক জায়গায় সামান্য ত্রুটি পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য কোন উপসর্গ না থাকায় সেটি Natural বলেই ধরা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের

একজন খুবই অভিজ্ঞ ডাক্তার তা দেখে এবং রিপোর্টগুলি দেখে ওটিকে স্বাভাবিক বলেই মতামত দেন বা ignore করা যায় মনে করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যদেরও মতামত চাইলেন। কিন্তু তাঁর ওই মতামতের পর তাঁর চেয়ে কম অভিজ্ঞতাসম্পন্নরাও ঐটিকে Valid না করার মত কথা নয় সেটি তখনকার সময় সকলেই মনে করতেন। সুতরাং আমি মন্তব্য করলাম—তাহলে কি তাঁর নিজের উপর Confidence নেই। পূজনীয় মহারাজ তখন M.R ও খাবার জায়গায় বসেছেন। টেবিলে একটু হালকা কথাবার্তা চলছিল। তাই আমি একটু সাহস সঞ্চয় করে ঐ মন্তব্য করেছি। কিন্তু তিনি চুপ করে গেলেন এবং আমার মনোভাব বুঝে বললেন—তোমার তো তাঁর ভালো দিকটা লক্ষ্য করা উচিত। তিনি এত বড় ডাক্তার কিন্তু তিনি কত অমায়িক এবং অহংকারের অভাব।

সাধুদের জীবন যাতে আদর্শ অনুযায়ী গড়ে ওঠে - কোন ত্রুটি না থাকে - কোন বেচাল না হয় সে সম্পর্কে সদা সতর্ক। সে সম্পর্কে তিনি নিজেও যেমন সতর্ক থাকতেন। অন্যেরাও থাকতে চাইতেন।

একদা তিনি বলেছিলেন যে, নিজের আদর্শকে এতই গভীরতার সঙ্গে চিন্তন-মনন এবং ধ্যানের বিষয় করে তোল যে ওটাই তোমার সর্বাঙ্গে প্রকাশিত হয়ে উঠবে, দেখবে ক্রমশ তোমার মন সত্য স্বরূপের দর্শন করবে।

ওনার দৈনন্দিন কার্যকলাপ, ধ্যানের সময়, ব্যায়াম এবং সমস্ত কার্যে ওনার পারদর্শিতাদির মধ্যে একজন আদর্শ সন্ন্যাসীর স্বরূপ লক্ষ্য করা যায়।

সেবা প্রতিষ্ঠানের কার্যে বিভিন্ন অবসরে ওনার সংযত বাণী, সজাগতা এবং ভারসাম্য মানসিক অবস্থা দেখে মনে হতো এক অপূর্ব শান্তির ছটা প্রতিফলিত হচ্ছে। ওনাকে কখনও উত্তেজিত হতে দেখিনি। সকলের পরামর্শ ও দৃষ্টিকোণকে সঙ্গে নিয়ে চলাই ওনার প্রশাসনিক গুণের সর্বপ্রথম পর্যায়। নিজের ব্যস্ততম কার্যের মধ্যে কখনও অনাবশ্যক বার্তালাপ বা হাসি তামাশা অথবা সময় নষ্ট করার মতো ব্যবহার ওনার জীবনে কখনই স্থান পায়নি।

উনি আমাকে অনেকবার ওনার সহায়ক হিসাবে মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন, তখন দেখতাম যে, ওনার হাতে অফুরন্ত কার্য যখনই একটু বিশ্রাম নিতেন কোন না কোন কার্য ওনার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যেত। আমি ওনাকে চিঠি পত্র লেখালেখিতে সাহায্য করতাম। ধ্যানের প্রতি ওনার প্রচণ্ড অভিরুচি ছিল, ধ্যানের সময় কেউ বিরক্ত করুক তা উনি পছন্দ করতেন না। একজন যোগীর মতো ছিল ওনার

দিব্য কান্তি। তাই ওনার দ্বারা অফুরন্ত কার্য করা সম্ভব হয়েছে। এক জীবনে একজন ব্যক্তির দ্বারা এত কার্য করা অসম্ভব। কর্মই পূজা যা ওনার জীবন থেকে শিক্ষণীয়। কিছুকালের জন্য নয় সমগ্র জীবন জুড়েই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সেবা করাই ওনার সাধনার অভিন্ন স্বরূপ।

গম্ভীর বিষয়ের উপর ওনার পারদর্শিতা এবং ওনার পবিত্র জীবন আমায় আজও রোমাঞ্চিত করে। প্রশাসনিক কার্যের মধ্যে মতোভেদের সম্মুখীন ওনাকে অনেকবার হতে হয়েছে ও তার দ্বারাই ওনার দৃঢ় চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক গুণের পরিচয় সকলে পেয়েছেন। সংঘে সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা-অসুবিধা থাকত, সেই সমস্ত অসুবিধার দিনগুলোতে আমি ওনার কাছে থাকার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি, সেই সুযোগে আমি ওনাকে অনেক কাছ থেকে দেখতে পেয়েছি। সুতরাং এই অসুবিধার দিনগুলোতে উনি যে আমাকে উনার কাছে থাকতে অনুমতি দিয়েছেন, তার জন্য আমি ওনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে এক সমর্পিত প্রাণ – স্বামী গহনানন্দ

স্বামী মুক্তিকামানন্দ

'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'

সময়কাল ১৯৬৮। চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ রব। কী যে হবে তা কেউই বুঝে উঠতে পারছে না। বাইরে থেকে অনেকেই অনেক কিছু আঁচ করছে। তাদের সেসব কথাবার্তা এ কান সে কান হয়ে আমার কানেও এসে পৌঁছাচ্ছে। আমি তখন অদ্বৈত আশ্রমে সবে মাত্র জয়েন করেছি। আমার প্রতি নির্দেশ এল রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে কাজের জন্য যেতে হবে। সেইমতো আমি গেলাম। কাজ ছিল রুগীদের পায়খানা, বাথরুম পরিষ্কার করা। আমাদের কাছে কাজ হলো ঠাকুরের পূজা। তাই নিষ্ঠাসহকারে কাজ করছি। আমাদের কাজ দেখে সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ খুব খুশী। কাজ শেষে আমি আবার অদ্বৈত আশ্রমে ফিরেও আসছি। আমার এই আসা যাওয়ায় আমাকে তেমন কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি কিন্তু খুব কাছ থেকে দেখেছি পাহাড় প্রমাণ বাধা ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে কর্মাধ্যক্ষ মহারাজ নীরবে নিভৃতে কাজ করে চলেছেন। বাইরে কর্মীরা বিক্ষোভ করছে, আমাদের দাবী মানতে হবে। তা না হলে আমরা কোন কথা শুনছি না, শুনবো না। তবে এই বিক্ষোভ বা আন্দোলনে সবাই সামিল নয়। ডাক্তার নার্সরা যেমন কাজ করার তেমন কাজ করছেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী কেবল আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছে এবং তাদের এই জোটবদ্ধ আন্দোলনে সেবা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কাজে এক অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে দেখতাম মহারাজ, ৩টের সময় অদ্বৈত আশ্রমে এসে উপস্থিত। আমরা তড়িঘড়ি করে তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতাম। আসলে সেই সময় মহারাজের খাওয়া-দাওয়ার কোন ঠিক ছিল না। সেবা প্রতিষ্ঠানের সামনে কর্মীরা সব ভাঙচুর করছে। এমতাবস্থায় তিনি চলে আসতেন

অদ্বৈত আশ্রমে। এখানে এসে তিনি বলরাম বসু মহাশয়ের প্রপৌত্র শম্ভু মহারাজের কাছে আইনি পরামর্শ নিয়ে কিঞ্চিত আহার করেই আবার বেরিয়ে পড়তেন। দেখতাম অতি ধীর পদক্ষেপে অবিচলিত থেকে তিনি কাজ করছেন। এর জন্য কর্মীদের কাছে তাকে নানা অকথা-কুকথা শুনতে হচ্ছে কিন্তু তিনি নির্বিকার। তিনি যে তাঁর এই কাজের মধ্য দিয়ে একমনে ঠাকুরের পূজা করে চলেছেন। তাঁর ছিল এই দৈবী ভাব। তাঁর এই ভাবের কাছে শেষ পর্যন্ত আসুরিক শক্তির পরাজয় হয়েছিল। আমি ছিলাম সেই জয়-পরাজয়ের সাক্ষী। দেখলাম দৈবীভাবের মধ্যে যে বীরত্ব প্রকাশ পাচ্ছে তা হলো এক নির্ভীক হৃদয়। তা হলো সার্বজনীন কল্যাণ কামনায় এক নির্দিষ্ট চিত্ত।

প্রসঙ্গক্রমে তাঁর এই দৈবীভাবের কথা বলতে গিয়ে যে কথা বলতেই হয় তা হলো তাঁর ভুবনেশ্বর মঠ জীবনের কথা। এই মঠ সম্পর্কে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, এই মঠ হলো একটি তপোবন। এখানে জঙ্গলের মধ্যে জপধ্যান করার জন্য আলাদা করে একটা কুঠিয়া আছে। তখন ভুবনেশ্বর মঠের মঠাধ্যক্ষ সূয্যি মহারাজ। ওখানে থাকাকালীন স্বামী নির্বানানন্দজী প্রায় প্রতিদিনই রাতে লণ্ঠন নিয়ে সেই কুঠিয়ায় প্রায় সারারাত ধরে জপধ্যান করতেন। তিনি চাইতেন, তার সাথে কেউ থাকুক। কিন্তু সারারাত থাকার সাহস সেভাবে কারও ছিল না। যেমনটি ছিল স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের। তিনি তাঁর সেই মঠ জীবনের প্রথম অবস্থায় স্বামী নির্বানানন্দজীর সাথে গভীর ধ্যানে এক অপার্থিব আনন্দে ডুবে যেতেন।

‘ডুব ডুব ডুব ডুব সাগরে আমার মন
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে তুই রত্ন ধন।’

ধ্যানের আনন্দ সাগরে অবগাহন করে মহারাজ যে সকল রতনরাজি পেয়েছিলেন তা হলো এক অদ্ভুত তীতীক্ষা, অহৈতুকী প্রেম ও ভালবাসা এবং শিব জ্ঞানে জীব সেবার মহান আদর্শ। আমার সৌভাগ্য হলো এই যে, আমি আমার সন্ন্যাস জীবনে তার সেবক হয়ে তার সান্নিধ্য লাভ করেছি।

তিনি তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট। রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা সংঘ ও প্রাইভেট সেন্টারগুলিতে মহারাজ দীক্ষা দিতে ভীষণ ব্যস্ত। সেই ব্যস্ততার সময় তিনি একটা কথা আমায় মনে করিয়ে দিতেন—যারা যেমন ব্যবস্থা করবে সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক, প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই করবে না। আমি এমনও দেখেছি মহারাজ দীক্ষা দিতে গেছেন এমনও জায়গায় বেড়ার ঘর, টিনের চাল, কোন রকমে একটা লাইট লাগানো আছে। আবার জ্বালাতে গিয়ে দেখা গেল তার সুইচ নেই। এইসব নেই

দেখেও মহারাজের প্রসন্নচিত্ত, তার অদ্ভুত তীতীক্ষার ভাব দেখে আমি অবাক হতাম।

আমি দেখেছি মহারাজ যখন ভক্তদের সাথে কথা বলতেন, তখন ভক্তদের বাড়ির সবাই না এলেও তিনি মনে করে সবার খোঁজ খবর নিতেন। একদিন এক ভক্ত জানাল তার বাবা শয্যাশায়ী। বেডসোল হয়ে গেছে, সাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছে। বাড়ির সকলেই চাইছে বাবা চলে গেলেই ভালো হয়। বাবাকে দেখে তাদের কেবলই মনে হচ্ছে বাবার জীবাত্মা তাঁর ঐ দেহ পিঞ্জরের মধ্যে .... খাচ্ছে। জীবাত্মার সেই কষ্ট দেখে তারা তার মুক্তির দিন গুনছেন। অতি প্রিয়জনের দুঃখে কাতর হয়ে তারা যেভাবে কথাগুলো বলছেন তা শুনে মহারাজ আর থাকতে পারলেন না। বললেন, চলুন আপনার বাবাকে দেখে আসি। তারা মুখ ফুটে একথা মহারাজকে বলতে পারছিল না কিন্তু তাদের মন চাইছিল মহারাজ একবার গেলেই বাবার মুক্তি হবে। মহারাজ তাদের অন্তরের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের বাড়ি গেলেন। তাদের বাবার মাথায় হাত বোলালেন কয়েকদিন পরেই এক অপার্থিব শান্তিতে চিরবিদায় নিলেন তাদের বাবা।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি। ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ, দুঃখ জ্বালা সেই পাশরে
প্রভু দুঃখ জ্বালা সেই পাশরে

কাঁকুড়গাছিতে বহু অত্যাশ্চর্য ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটত। সেসব ঘটনাকে ঠিক ঘটনা নয়, দুর্ঘটনা বলাই শ্রেয়। তবু ঘটনা বলছি কারণ মহারাজের সান্নিধ্যে জীবনের বড় বড় বিপর্যয়ের বাধা কাটিয়ে বহু মানুষ আনন্দ সাগরে ডুব দিয়ে তাদের জীবন বৈতরনী পার হয়েছেন। এমন দুটি ঘটনার কথা আমি আজও ভুলতে পারি না। তা হলো কাঁকুড়গাছি আশ্রমের খুব কাছেই এক পরিবার বাস করত। তাদের একমাত্র সন্তান পড়ত সাউথ পয়েন্ট স্কুলে। মা প্রতিদিন ছেলেকে স্কুলের গাড়িতে তুলে দিত। আবার স্কুল ছুটি হলে বাস থেকে নেমে ছেলেটি বাস রাস্তার ওপার থেকে এপারে মায়ের হাত ধরে বাড়ি ফিরত কিন্তু একদিন সেই হাত ধরা তার আর হলো না। ওপার থেকে এপারে আসতে গিয়ে ট্রাকের ধাক্কায় একেবারে পিষে গেল। সে দৃশ্য দেখার নয়। কেউ একজন তৎক্ষণাৎ কোথা থেকে একটা চাদর নিয়ে এসে ঢাকা দিয়ে দিল। কিন্তু মা ! তাকে সামলাবে কে? তার চোখের সামনে যা ঘটল তা দেখে মা সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে গেল। সে অস্বাভাবিক আচরণ করতে লাগল। তাকে স্থির রাখা গেল না। অস্থিরচিত্তে পাগলিনীর ন্যায় সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। তবে বিশেষ কোথাও যেত না। কাঁকুড়গাছি আশ্রমের ধারে কাছেই ঘোরাফেরা করত। তাঁকে

দেখে আমাদেরও খুব কষ্ট হতো ভাবতাম কী ছিল আর কি হয়ে গেল। এ কি কোনদিনও তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে? আশ্রমের কাছাকাছি এলে তাকে বলতাম, একটু পরেই মহারাজ এসে এই বড় ঘরটায় বসবেন, আসুন না, এখানে বসুন, আপনার ভালো লাগবে। কোন ভালোলাগার কথাই যেন তার ভালো লাগে না। সব ভালো লাগাই সেদিন তার জীবন থেকে দূরে সরে গেছে। তাই ভালোলাগার কথা বললেই সে ছুটে পালাত আর ভীষণ চীৎকার করে বলত, না না, আমি যাব না। আমি বসব না। কিন্তু মহারাজের স্নেহ ও ভালোবাসায় তার সেই না একদিন এমন হ্যাঁ-এ পরিণত হলো যে মহারাজের কথা শোনার জন্যই সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। ভীষণ ব্যস্ততার মাঝে যখন কোথাও যাওয়ার থাকত। কিন্তু খাবার ঠিক থাকত না। তখন ঐ মহিলা ভোর রাতে উঠে রান্না করে, সেই রান্না করা খাবার নিয়ে সাত সকালে মহারাজের সামনে হাজির হতেন। শুধু সকালেই নয়, কখনও বিকাল কখনো রাত একটু খবর পেলেই হলো। মহারাজকে খাইয়ে তিনি যে কী আনন্দ পেতেন তা ঠিক বলে বা লিখে প্রকাশ করা যায় না। পথ দুর্ঘটনায় ছেলেকে হারিয়ে যার জীবন থেকে সব আনন্দ দূরে সরে গেছিল। এখন মহারাজের সংস্পর্শে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দে তার জীবন নদী বয়ে চলেছে।

আর একটি ঘটনা, বেলতলার এক সম্ভ্রান্ত বনেদি পরিবার জমিদার বললেও নেহাত ভুল হবে না। এখনও তাদের বসত বাটীতে আম, কাঁঠালের বাগান রয়েছে। তাদের একমাত্র মেয়ে জামাইয়ের সাথে বাইরে বিদেশে থাকে। জামাই ইঞ্জিনিয়ার কাজে ব্যস্ত, তাই মেয়েকে নিয়ে আসতে বাবা গেলেন। কিন্তু ফেরার পথে ট্রেনে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের কবলে তারা দুজনেই প্রাণ হারালেন। দুর্ঘটনা এতটাই মর্মান্তিক ছিল তাদের দেহের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না। এই সংবাদ যখন পরিবারের কানে এসে পৌঁছাল তখন তিনি একা, ভীষণ একা। এই একটু আগেই তার সব ছিল এখন তার কেউ নেই। স্বামী নেই, কন্যা নেই। আছে শুধু বুক ভাঙা কান্না আর হাহুতাশ। এই একাকীত্ব ভদ্রমহিলার জীবনকে এতটাই গ্রাস করল যে, জীবনে বেঁচে থাকাটাই তার কাছে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তখন তাঁর এক আত্মীয় তাকে এক সহজ পথের সন্ধান দিলেন। বললেন, তুমি একবার কাঁকুড়গাছি আশ্রমে যাও, ভালো লাগবে। ভদ্রমহিলা তাঁর আত্মীয়ার কথামতো মাঝে মাঝে আসতেন। মনে আনন্দ নেই, নিজস্ব গাড়ি ছিল তা বিক্রি করে দিয়েছেন। তাই নিত্যনতুন গাড়ি ভাড়া করে আসতেন। এই আসা-যাওয়া, মন্দিরে বসা ও মহারাজের সান্নিধ্যে আসা—এসব কিছুর মধ্যে দিয়ে তিনি এক অদ্ভুত ভালোলাগার স্বাদ পেলেন। তিনি স্বইচ্ছায় দীক্ষা নিতে চাইলেন। দীক্ষার পর তার

জীবনে তিনি এক নতুন ছন্দ খুঁজে পেলেন। সেই ছন্দে মঠ-মিশনের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করে তার দুঃখের ভার লাঘব হলো। অতীন্দ্রিয় আনন্দানুভূতিতে তিনি হলেন আত্মহারা।

'বাণী চরণারবৃন্দে মজো মজো মজো মজো রে মন
জ্বালা জুড়াইবে অমৃতত্ত্ব পাবে হইবে সমূহ বাসনা পূরণ
মজো মজো মজো মজোরে মন।'

কার মন যে কোথায় কীভাবে মজে থাকে, তা একমাত্র যে জানার সেই-ই জানে আলিপুর দুয়ারে এক মাস্টার মশায়ের মন মজে ছিল তার এক অদ্ভুত প্রতীজ্ঞায় তিনি সংকল্প করেছিলেন, মহারাজ তার বাড়িতে এসে দীক্ষা দেবেন। আর সত্যি হলোও তাই। মঠ নির্মিত হলো একেবারে তার বাড়ির গা ঘেঁষে। একটি কমন প্রাচীরেই তার বাড়ি ও মঠের দেওয়াল গড়ে উঠল। তার বাড়ির বোন ও দিদিরা সেই প্রাচীরের গেট খুলে মন্দিরের ঠাকুর সেবার কাজ করত। তাঁর মনের সাধ পূরণ হতে চলেছে। এখন মঠ বাড়িই তার বাড়ি, তাই তার দীক্ষার শুভক্ষণ আজ উপস্থিত। এ কথা যখন মহারাজ তার মুখে শুনলেন তখন সানন্দে তার দীক্ষার ব্যবস্থা করে তাকে পরিতৃপ্ত করলেন।

মহারাজের কাছে যখন যারা দীক্ষা নিতেন এক অপার্থিব পরিতৃপ্তির আনন্দে তারা বিভোর হতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা আমার খুব মনে পড়েছে। মহারাজের এক পরম ভক্ত, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, তিনি আমেরিকায় থাকেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই মহারাজের কাছে অনেকদিন আগেই দীক্ষা নিয়েছেন। তাঁরা তাদের দুই ছেলেকে নিয়ে কাঁকুড়গাছিতে এসেছেন। লব, কুশের মতো তাদের চেহারা, দীক্ষা হয়ে গেলেই তারা আবার আমেরিকায় ফিরে যাবে। কিন্তু কাঁকুড়গাছিতে দীক্ষার যে দিনক্ষণ বাঁধা আছে! অবশ্য গুরুকৃপায় এই বাঁধা সেদিন কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ঠাকুর ঘরের উপরেই যে মায়ের ঘর আছে মহারাজ সেখানেই তাদের দীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। দীক্ষান্তে যখন তাদের দুই পুত্র মহারাজকে তাদের গুরুপূজা নিবেদন করছে। তখন সেই ভদ্রমহিলা (তাদের মা) আনন্দে পুলকিত। তার দুচোখের কোন দিয়ে আনন্দাশ্রুর ধারা বইছে। তিনি কেবলই বলে চলেছেন, 'I am save, I am save'। আমি সুরক্ষিত, আমার আর কোন চিন্তা নেই। গুরুর পায়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেওয়ার যে দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি ও কর্মশুদ্ধির যে লক্ষণ সেদিন তার মধ্যে ফুটে উঠেছিল তা ছিল এক অনিন্দ্যসুন্দর অনুভূতি।

সকল সময়ে সব অবস্থায় সকল স্থানে মহারাজের অনুভূতি ছিল। শিব জ্ঞানে জীব

সেবা একেবারে সূচনালগ্ন থেকেই। যখন স্বামী দয়ানন্দজী মায়েদের সেবা করার জন্য শিশুমঙ্গল বা মাতৃসদন গড়ে তোলেন। তখন স্বামী গহনানন্দজী ছিলেন তাঁর একান্ত আত্মবাহী অনুগত সেবক, তার একটা বিশেষ গুণ ছিল তা হলো সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি প্রবীণ সন্ন্যাসীদের খোঁজ খবর নেওয়া। সে যত রাতই হোক। সারাদিনের সকল কাজের ফাঁকে তিনি এক এক করে তাদের কাছে গিয়ে সুগভীর শ্রদ্ধা ও পরম আন্তরিকতায় তাঁদের খোঁজ খবর নিতেন। তাঁরাও মহারাজকে তাদের গভীর স্নেহ ও প্রাণ ঢালা আশীর্বাদে পরিপুষ্ট করতেন।

এসব কথাই হলো রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেবায় উৎসর্গীকৃত এক প্রাণের কথা।

প্রাণারাম ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ যখন দেহ রাখেন তখন স্বামীজি তাঁর দেহকে সযত্নে ধরে রাখতে অর্থাৎ ভাবীকালের জন্য সংরক্ষণ করতে চেয়েছিলেন, যা দেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বুঝতে পারবে কেমন দেহে ভগবানের আবির্ভাব হয়। কিন্তু স্বামীজির সেই ইচ্ছাকে মান্যতা না দিয়ে হিন্দু শাস্ত্র মতে দেহ সৎকারের নির্দেশ আসে। দেহ সৎকারের পর স্বামীজি গঙ্গার কাছাকাছি একটা জায়গা খুঁজছিলেন। যেখানে ঠাকুরকে স্থাপন করে তাঁর ভাবকে আশ্রয় করে তারা থাকবেন এবং সেই ভাবপ্রবাহের মধ্যেই ঠাকুর যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবেন। এই ইচ্ছা শুধু স্বামীজির একার নয়। তাঁর অন্যান্য সকল গুরুভ্রাতা এবং সর্বোপরি জগজ্জননী শ্রীশ্রীমায়ের সাধনা। মা যখন যেখানে গেছেন, যেখানেই কোন সিঁদুরমাখা নুড়ি দেখেছেন সেখানেই মাথা ঠুকে মা বলেছেন, ঠাকুর তুমি এলে, আর চলে গেলে এর জন্যই তো তোমার আশা নয়। তোমার ভাবকে আশ্রয় করে জগতের কল্যান সাধিত হবে, জগদ্বাসীর মঙ্গল হবে তার ব্যবস্থা তুমি করো।' মা যখন বুদ্ধগয়ায় যান বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সংঘ দেখে মায়ের মনে সেইরূপ সন্ন্যাসী সংঘ গঠনের অভিলাষ জেগে ওঠে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন হলো মায়ের সেই চির আকাঙ্ক্ষিত প্রার্থনার জাগ্রত রূপ, যেখানে ঠাকুর সূক্ষ্ম শরীরে বিরাজ করছেন। আর তাঁর ভাবকে আশ্রয় করে ঠাকুরের সন্তানেরা তাঁর চরণে মন প্রাণ সঁপে দিয়ে ঠাকুরের সেবা করছেন।

'আনন্দলোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ, সত্যসুন্দর।
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে
বিশ্বজগত মনিভূষণ বেষ্টিত চরণে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে সমর্পিত প্রাণ স্বামী গহনানন্দ—এই বিষয়ের উপর অদ্বৈত আশ্রমে স্বামী মুক্তিকামানন্দ যে বক্তৃতা দেন বা আলোচনা করেন তারই সংক্ষিপ্তসার এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হলো। অনুলিখন—সমিত কুমার বাগ

পরম পূজ্যপাদ গহনানন্দজীর স্মৃতি

স্বামী বিশ্বনাথানন্দ

সাধারণ মানুষের স্মৃতি দুর্বল—কালপ্রবাহ স্মৃতিকে বিস্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে দেয়। তবুও বিস্মৃতির অতল থেকে উঠে আসে স্মৃতি। সে স্মৃতি যতই পুরানো হোক যেন মনে হয় এই তো সেদিনের সকাল।

অনেক বছর হয়ে গেল পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজীর প্রথম দর্শনের দিন। না, দিন নয় রাত, বড় দুর্যোগের রাত। স্থান—রামকৃষ্ণ মিশন বরানগর, কলকাতা। কাল ১৯৭০ সালের শেষের দিক—সময় রাত দশটা নাগাদ। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে দুর্যোগের ঘনঘটা একটা ভয়, ত্রাস, একটা কী জানি কখন কী হয়, এইভাব সর্বত্র। আমার কর্মক্ষেত্র বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়। পূজনীয় রমানন্দ মহারাজের সহকারী। বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস নিয়ে সমস্যা-সমাধানে এগিয়ে এলেন পূজনীয় গহনানন্দজী, সঙ্গে পূজনীয় অকুণ্ঠানন্দজী। বরানগর আশ্রমের অধ্যক্ষ তখন পূজনীয় স্বামী নির্জরানন্দজী। উল্লিখিত তিন সন্ন্যাসী একে অপরের একান্ত সুহৃদ্। রাতে আলোচনা সভা বসল—আলোচনায় আশ্রমের সন্ন্যাসীরা উপস্থিত। আমি ঘরের বাইরে অপেক্ষায় আছি—যদি কোন প্রয়োজনে লাগি। ঘর হতে বাইরে আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল। আমার প্রসঙ্গে উপস্থিত সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কিছু কথাও বললেন মহারাজ—দু-চারটি আমার শ্রুতিগোচরও হলো। শুনলাম—ব্রহ্মচারীকে এখানে ডাক'—অর্থাৎ পূজনীয় মহারাজ আমাকে আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকার অনুমতি দিলেন। আলোচনা চলল, অনেক রাতে ওঁরা দুজন সেবা প্রতিষ্ঠানে ফিরে গেলেন। শুনলাম মহারাজের শান্ত সংযত, বলিষ্ঠ ভাষা ও ভাবনার প্রকাশ। এরপর প্রায়ই আসেন রাতের দিকে সঙ্গে পূজনীয় অকুণ্ঠানন্দজী। ওই সময় রাত ৯ টায় বরানগরের রাস্তা জনমানবহীন। ভয়টা কেমন ছিল, তার একটা উদাহরণ দিই। ১৯৯১ সালে রাত দশটা নাগাদ একজন বাঙালী ট্যাক্সি ড্রাইভার বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলকাতা) হতে বরানগরের গোপালাল ঠাকুর রোডে আসতে রাজি হলেন না। সম্ভবতঃ তিনি ভুক্তভোগী—বিশ বছর পরেও সেই ত্রাসের দিনগুলি তিনি ভুলতে পারেননি। আর ওই

ত্রাসের সময় রাত দশটায় নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শুধু ঠাকুরের আশ্রমের ভাবনায় ইতিকর্তব্য ও সেবার জন্য অকুতোভয়ে বরানগরে পূজনীয় গহনানন্দজীর প্রায় নিত্য যাতায়াত। ওইসময় সেবা প্রতিষ্ঠানেও নানা সমস্যা ছিল—এমন কি বিক্ষুব্ধ কিছু কর্মীর অসহযোগিতা ও রাজনৈতিক মদতে প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করতে ধারাবাহিক আন্দোলন চলছিল। বরানগর আশ্রমটির জন্য তাঁর ঐকান্তিকতা বলে বোঝানো যাবে না। এদিকে সারা পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে যেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে—সেসব প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে বন্ধ হওয়ার উপক্রম। অগ্নিগর্ভ বরানগরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপাতত পরিচালনা করার কোনও সুষ্ঠু পরিবেশ নেই জেনে, ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি বরানগর হতে সবাই সেবা প্রতিষ্ঠানে চলে আসি। তাঁদের মধ্যে পূজনীয় রমানন্দ মহারাজও ছিলেন। এদিকে সেবা প্রতিষ্ঠানেও চলছে এক শ্রেণীর কর্মীর বিক্ষোভ। ওই অশান্তির আঁচ আমরা ভিতরে যারা আছি—তারা পেতাম না। সেবা প্রতিষ্ঠানে আছি—নার্সিং পরীক্ষার খাতা দেখছি আমি ও পূজনীয় রমানন্দজী। একদিন বোধ হয় জানুয়ারির মাঝামাঝি বেলা প্রায় নটা নাগাদ পূজনীয় গহনানন্দজী আমাকে বললেন : "বাইরের লোকজন দোতলায় উঠতে চাইলে তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরত পাঠাবে"–দোতলায় উঠতে সাত-আটটি সিঁড়ির নিচের ধাপে অপেক্ষা করতে বললেন। সারাদিন আমি ওই সিঁড়ির কাছে ঘোরাঘুরি করছি, যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়াও করেছি। প্রায় সন্ধ্যার আগে তিনি পূজনীয় দয়ানন্দজীর সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখলেন আমি তাঁর নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির আছি। আমাকে দেখে বললেন : "ও তুমি এখনও রয়েছো—যাও আর দরকার হবে না।" পরের দিন সকালে চা খাওয়া হচ্ছে, ধীরে ধীরে প্রাতরাশ শেষ করে প্রায় সবাই উঠে গেছেন, আমি ও দু-তিনজন আছি। পূজনীয় মহারাজ ওঁদের সঙ্গে কথা বলছেন; অতি সাধারণ কথা। হঠাৎ আমাকে সম্বোধন করে বললেন: "সুভাষ, তুমি ক্যাসাবিয়াঙ্কার গল্প জান?" বললাম : "বাবার নির্দেশে ছেলেটি জাহাজের ডেকে অপেক্ষা করছে—আগুন লেগেছে জাহাজে, তবু ছেলেটি জাহাজ ছেড়ে পালাচ্ছে না। কিন্তু বারবার ছেলেটি চিৎকার করে বলছে, 'বাবা, আমি কি এখনও এখানে থাকব? " মহারাজ শুনে মৃদু হাসলেন। বললেন : "স্বামীজি আজ্ঞাবহতা, সহিষ্ণুতার ওপর খুব গুরুত্ব দিতেন। 'আজ্ঞাবহতাই কার্যকারিতার প্রধান সহায়। অতএব প্রাণভয় পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞা পালন করিতে হইবে।" পূজনীয় মহারাজের এই কয়েকটি কথা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল যা আমার সঙ্ঘজীবনে আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। সেদিন আমি খুব আনন্দও পেয়েছিলাম যথাশক্তি পূজনীয় মহারাজের নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি বলে।

পূজনীয় গহনানন্দজী ইতিমধ্যে পুরুলিয়ায় কয়েকবার এসেছেন উৎসবে, অনুষ্ঠানে। এবার এলেন আবার সঙ্কটমোচনে—ত্রাতার ভূমিকায়। একটি রাজনৈতিক দলের

মদতপুষ্ট কিছু কর্মীর আচার-আচরণে প্রতিষ্ঠানটির ওষ্ঠাগত প্রাণ। পূজনীয় মহারাজ এলেন সমস্যার নিরসনে শান্তির দূত হয়ে। না, এই আন্দোলন প্রসঙ্গ নয়—এই স্বল্পভাষী মানুষটির গভীর রসবোধ ছিল—ছিল অনুভূতি প্রবণ মন। সকালে জলখাবার খাচ্ছেন—আমি উপস্থিত সেখানে। সঙ্গে আরও দু- একজন সাধু। খেতে খেতে অন্য একজন সাধুকে বললেন : "সুভাষকে দুটো আঙুর দাও।" আমি দাঁড়িয়ে আঙুর খাচ্ছি—জিজ্ঞেস করলেন : "কেমন ?" বলা বাহুল্য এতই টক যে মুখে দেওয়া যায় না। খেতে খেতেই প্রসঙ্গ করলেন—শবরীর প্রতীক্ষার। শবরী বালিকা বয়স হতে প্রতীক্ষা করছেন প্রভু রামচন্দ্র আসবেন। দেখতে দেখতে যৌবন অতিক্রান্ত হলো, প্রৌঢ়ত্ব পার হয়ে বার্ধক্যে পৌঁছালেন শবরী। প্রভু এসেছেন—সেবা করছেন সযত্নে আহরণ করা ফল দিয়ে। সব ফল নিজে একটু করে খেয়ে স্বাদু কী না দেখে নিয়ে সেই উচ্ছিষ্ট ফল প্রভু রামচন্দ্রকে দিচ্ছেন খেতে। আর ভক্তি মিশ্রিত উচ্ছিষ্ট ফল প্রভু রামচন্দ্র ভক্ষণ করছেন পরমানন্দে।

অনেক স্মৃতি-বিস্মৃতির গর্ভে বিলীয়মান–তবু বিগত পনের ষোল বছরের কিছু ঘটনা যখন তিনি সঙ্ঘের প্রধান পরিচালক, পরবর্তীতে সহাধ্যক্ষ ও মঠাধ্যক্ষ।

১৯৯০-এর সম্ভবতঃ মাঝামাঝি আবার বরানগরে প্রত্যাবর্তন—প্রায় কুড়ি বছর পর। "জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই ভুবনের ঘাটে ঘাটে—এক ঘাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য ঘাটে।" মালদার মহানন্দাতীর হতে বরানগর-গঙ্গাতীরে। ঠাকুরের প্রথম মঠ বরানগর। পূজনীয় গহনানন্দজী সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন—তাঁর ইচ্ছায় বরানগরে হলো আমার তপস্যার স্থান। আগেকার বরানগরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা ভেবে ভীত সন্ত্রস্ত মনে বরানগরে এলাম। পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম করতে গেছি একদিন প্রাক্‌সন্ধ্যায়। পূজনীয় মহারাজ প্রথমেই বললেন : "এই বরানগর—সেই বরানগর।" স্বল্প ও মৃদুভাষী মানুষটি চারটি শব্দে কতই না না-বলা কথা বললেন। পূজনীয় মহারাজের আশীর্বাদে বরানগরে আমার জীবনের নতুন অধ্যায় সূচিত হলো। 'বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি' নামে আদি বরানগর মঠের পুনরুজ্জীবন হলো, এই ভাবনার উন্মেষ হয় প্রথমে পূজনীয় স্বামী রমানন্দ মহারাজের চিন্তায়। বরানগরের শ্রীযুক্ত রাহা, বরানগর স্কুলের বিশ্বনাথ মানী, কলকাতা কর্পোরেশনের তপন সিনহার আগ্রহ ও উদ্যমে পূজনীয় স্বামী নিত্যরূপানন্দজীর সহযোগিতায় বরানগর মঠের দোতলায়, ঠাকুর, মা ও স্বামীজির প্রতিকৃতি স্থাপন করলেন পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ ১৯৯২-এর ১২ জানুয়ারি। বহু সাধু-ভক্তের উপস্থিতিতে বরানগর মঠের ঠাকুরঘর উদ্বোধিত হলো। স্থানীয় বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থাকা সত্ত্বেও এই পুণ্যস্থানটির মাহাত্ম্য ভক্তের হৃদয়ে নতুন মাত্রা নিয়ে এল। এই মঠের পূর্ণতার পরিণতি এল যখন পূজনীয় মহারাজ এখানে কৃপা করে

স্থানীয় ভক্তদের দীক্ষাদান করলেন—১৯৯৩-এর এপ্রিল মাসে। আরও কয়েকবার দীক্ষা হলো ওই মঠে।

"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—ধুলায় তাহার যত হোক অবহেলা—পূর্ণের পদ পরশ তাদের 'পরে!'—পূজনীয় মহারাজ ডেকেছেন, কাঁকুড়গাছিতে দর্শন করতে গেছি—সারগাছি হতে। পূজনীয় মহারাজ বোলপুর যাবেন—দীক্ষা হবে। ইতিপূর্বে দুবার গেছেন বোলপুরে—থেকেছেন অন্যত্র। এবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বোলপুর, বীরভূমের আশ্রম অধ্যক্ষ মহারাজের কৃপাধন্য ধীরেন ঘোষের ঐকান্তিক আবেদনে সাড়া দিয়ে আশ্রমে থেকে দীক্ষা দিতে আগ্রহী। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল আশ্রমে গিয়ে আশ্রমে থাকার উপযোগী পরিবেশ কেমন দেখে আসা। এই প্রসঙ্গে জানাই সুন্দরবনের স্যাণ্ডেলবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে পূজনীয় মহারাজ গেছেন ১৯৯৬-এ, যেখানে থাকার ঘর হতে স্নানের ঘর বেশ কিছুটা দূরে। অস্থায়ী স্নানের ঘর বানিয়েছেন ভক্তেরা। সদা প্রফুল্ল মহারাজ ওই আশ্রমে থেকেছেন, দীক্ষাদান করেছেন কোন অসুবিধার কথা তিনি মুখ ফুটে বলেননি। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অপূর্ব ক্ষমতাে ছিল তাঁর। ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে বরাবরই উদাসীন ছিলেন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ—এই সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের জন্যেই তাঁর উদার হৃদয় উজাড় করে দিয়েছেন। সম্ভবতঃ ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ ১৯৯৮ এবং পরবর্তিকালে আরও দু-তিনবার পূজনীয় মহারাজ বোলপুরের আশ্রমে গেছেন—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত কৃতি অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণ এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ মহারাজকে দর্শন প্রণাম করতে এসেছেন। মাননীয় মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পীযূষবাবুও একাধিকবার এসেছেন। ধীরেনবাবু, অরিজিৎ রায় সহ ভক্তগণ আমাকেও পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমায়ের বা স্বামীজির নামে যে-কোন প্রতিষ্ঠানে পূজনীয় মহারাজ আমন্ত্রণ পেয়েছেন সেখানেই তিনি কৃপা করে উপস্থিত হয়েছেন। বোলপুরের পাশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা সমিতি, খোসকদম্বপুরের ভক্তেরা সপ্তর্ষি মহারাজকে ও আমাকে আবেদন জানালেন ওই নবনির্মিত আশ্রমে পূজনীয় মহারাজের পুণ্য পদার্পণের জন্য। সপ্তর্ষি মহারাজ ভক্তদের আবেদনটি মহারাজের কাছে রাখায় মহারাজ স্মিত হাস্যে সম্মতি দিলেন—সম্ভবতঃ জানুয়ারি ২০০৪ সাল। পূজনীয় মহারাজ ওইসময় বোলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে অবস্থান করেছিলেন।

২০০১ সালের অক্টোবর মাস। ইছাপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। বরানগরে থাকায় ওই আশ্রমে যাতায়াত ছিল। ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজ। সমীরবাবু, অমিয়বাবু প্রভৃতির বিনীত প্রার্থনা ও আবেদনে

সাড়া দিয়ে সপ্তর্ষি মহারাজ পূজনীয় মহারাজকে দিয়ে ওই আশ্রমের মন্দির উদ্বোধন করিয়ে দিলেন—বেলঘরিয়া, বরানগর, কাঁকুড়গাছি, রহড়ার অনেক সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ইছাপুরের মেটাল স্টিলের জেনারেল ম্যানেজার আর. কে. সিং ও ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরির জেনারেল ম্যানেজার এম.কে.রায়।

রামকৃষ্ণ মঠ, বরানগর ও রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বরানগরের প্রতি পূজনীয় মহারাজের যে কতটা ভালোবাসা ছিল—তা প্রমাণ হয় যখন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন-ছাত্র সংসদের সম্পাদক শ্রীমান শ্যামল ভট্টাচার্যের আমন্ত্রণে তাঁর গৃহদেবতা শ্রীশ্রীবগলাদেবী দেবীর নব কলেবরের আবরণ উন্মোচনে পূজনীয় মহারাজের উপস্থিতি ঘটে। বরানগরে বহু পরিচিত ছিলেন পূজনীয় মহারাজ, অনেক ভক্ত সেদিন শ্যামলের বাড়ি উপস্থিত হয়েছিলেন পূজনীয় মহারাজকে দর্শনের জন্য—আমরা বেশ কয়েকজন সাধুও ছিলাম। যতদূর মনে আছে মাননীয় বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ ব্যানার্জী, মাননীয় বিচারপতি সুধাংশুশেখর গাঙ্গুলী, মাননীয় বিচারপতি বড়ুয়া ও অনেক সুধীজন পূজনীয় মহারাজের আকর্ষণে সেদিন পুণ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষুদিরাম রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, (দ্বারিয়াপুর) বর্তমানে দেরেগ্রাম, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃভিটা। ৮ সেপ্টেম্বর ২০০২ সাল, পূজনীয় মহারাজ নব নির্মিত মন্দির, শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মর মূর্তির প্রতিষ্ঠা করলেন কয়েক সহস্র ভক্তের উপস্থিতিতে। আশ্রম অধ্যক্ষ শ্রী সত্যনারায়ণ মাজির ঐকান্তিক প্রার্থনায় এই শুভকর্ম অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে পূজনীয় মহারাজের শ্রীহস্তে সম্পাদিত হলো। জয়রামবাটির পূজনীয় অমেয়ানন্দজী ও অন্যান্য সন্ন্যাসীরা সহ কামারপুকুরের আমরা ওই শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। কামারপুকুর হতে পূজনীয় মহারাজ, পূজনীয় অমেয়ানন্দজী, সপ্তর্ষি মহারাজ ঠাকুর-মা-স্বামীজির প্রতিকৃতি নিয়ে একই গাড়িতে দেরেগ্রাম যাত্রা করেন। ঠাকুরের মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন, প্রতিকৃতির প্রতিষ্ঠা ও মঞ্চে দীর্ঘক্ষণ উপস্থিত থেকে পূজনীয় মহারাজ সকল ভক্তকে আশীর্বাদ করেন। ২০০৪ সালের ২৩ এপ্রিল পুনরায় তিনি দেরেগ্রামে উক্ত আশ্রমে দাতব্য চিকিৎসালয়, সাধু নিবাস, অতিথি ভবনসহ নব নির্মিত বাড়িটির উদ্বোধন করেন।

কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, খরার, মেদিনীপুরের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন পূজনীয় মহারাজ—তখন তিনি সহাধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন কাঁথি রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ পূজনীয় আপ্তকামানন্দজীসহ আরও অনেক সাধু সন্ন্যাসী। ওই মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করেন মে মাসের ৪ তারিখে, ২০০৪ সালে। মেদিনীপুর জেলার রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সব শাখাকেন্দ্র হতে সাধু সন্ন্যাসীদের উপস্থিতি, শিলচর আশ্রম হতে পূঃ দেবদেবানন্দজীর উপস্থিতি ও বহু ভক্তের উপস্থিতিতে পূজনীয় মহারাজ শুভকর্ম

সম্পাদন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে কেন্দ্র করে যেখানেই কোন সংগঠন বা সংস্থার পক্ষ হতে পূজনীয় মহারাজকে আমন্ত্রণ জানানো হোক না কেন মহারাজ সানন্দে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন ভক্তদের কল্যাণের জন্য। কৃষ্ণপুরের পাশেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম। খরার নামে পরিচিত ওই গ্রামে রয়েছে উক্ত আশ্রম। আশ্রমের পক্ষ হতে অলকবাবু, সপ্তর্ষি মহারাজের কাছে আবেদন জানালেন পাঁচ মিনিটের জন্যও যদি কৃপা করে মহারাজ ওই আশ্রমে পদধূলি দেন। কোন পূর্ব পরিকল্পনা নেই, পূর্ব আমন্ত্রণ নেই তা সত্ত্বেও মহারাজ খরার আশ্রমে গেলেন, ঠাকুর-মা-স্বামীজিকে ছোট্ট মন্দিরে অর্ঘ্যদান করলেন, সমবেত সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান ভক্তের বিনম্র প্রণাম গ্রহণ করলেন। তাঁর উদার হস্ত উত্তোলন করে সমবেত ভক্তদের আশীর্বাদ প্রদান করলেন। এই দিনই আমরা পূজনীয় মহারাজকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটালে পৌঁছে দিয়ে কামারপুকুর ফিরে আসি—সঙ্গে সস্ত্রীক শ্রী সত্যনারায়ণ মাঝি।

আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে আরও ২/১ টি আশ্রমে পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে থাকার। পূজনীয় মহারাজের চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গমন, চেরাপুঞ্জি আশ্রমের শাখাকেন্দ্র শেলা আশ্রমে দীক্ষাদান, মেঘালয়ের নাটিয়াং নামক আমাদের বিদ্যালয়ে স্থানীয় পার্বত্য উপজাতিদের দীক্ষা-দান—মনে হয় সেদিনের কথা। এই পার্বত্য উপজাতি তথা শেলা, সোবার পুঞ্জি, চেরাপুঞ্জি, আশ্রমের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ ছিল। এই দরিদ্র, অসহায়, তন্ত্রে-মন্ত্রে, তুক-তাকে বিশ্বাসী উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার আলোক নিয়ে আসেন পূজনীয় মহারাজের পূর্বাশ্রমের দুই দাদা। এঁদের মধ্যে পূজনীয় কেতকী মহারাজ (তৎকালীন স্বামী প্রভানন্দজী) ছিলেন অগ্রণী। পূজনীয় মহারাজ, পূজনীয় কেতকী মহারাজের কিছুদিন সেবা করেছিলেন তাঁর পূর্বাশ্রমের বাড়ি পাহাড়পুর-এ—এখন বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলায়। চেরাপুঞ্জিতে এক বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় এই মৃদু ও স্বল্পভাষী মানুষটি খুব সংক্ষেপে আমাকেও বলেছিলেন কেমন করে কেতকী মহারাজের সেবার আদর্শ পূজনীয় মহারাজকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে ও স্বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্মে আত্মনিয়োগ করার প্রবল ইচ্ছা জাগায়। কিছুদিন পরেই গৃহত্যাগ। তাই খাসিয়া জয়ন্তিয়ার পাহাড়ীদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল। শিলং-এ দেখেছি কত বয়স্ক খাসিয়া নারী-পুরুষ এসে তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছেন 'খুবলন শিবুন' 'খুবলই শিবুন' ধ্বনিতে। প্রিয়জনদের দেখে পূজনীয় মহারাজের মুখে তৃপ্তির হাসি। শিলং-এর একটি স্মৃতির মুহূর্ত তাঁর মুখে : "সেখানে ওই কদিন খুব আনন্দ হলো। ফিরে আসবার দিন মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় যেমন কান্নকাটি করে থাকে, তেমন করে তারা কাঁদতে লাগল।"

চেরাপুঞ্জিতে থাকাকালে তাঁকে নিয়ে গেছি গারো পাহাড়ের কুড়ালভাঙা আশ্রমে।

পূজনীয় মহারাজ ও আমি পিছনের সিটে—সপ্তর্ষি মহারাজ সামনের সিটে। পাহাড়ী রাস্তা, সর্পিল ভঙ্গিতে গাড়ি চলছে। পূজনীয় মহারাজ ও আমার মাঝে পূজনীয় মহারাজের কমলা রং-এর ব্যাগটি। একটু ঘুমের রেশ এসেছে। ধীরে ধীরে আমার ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন—মাত্র কয়েক মিনিট আমি খুব সাবধানে বসে আছি—সারা শরীরে আমার শিহরণ ও পুলক। আবার সোজা হয়ে বসলেন—বললেন একটু ঘুম পেয়েছিল। কুড়ালভাঙা আশ্রমের নব নির্মিত মন্দির উদ্বোধন হলো। গারো, হাজং সম্প্রদায়ের কিছু ভক্তি দীক্ষিত হলো—৪০ কিমি দূরে তুরা, সেখান হতে বাঙালী ভক্তেরা এসে দীক্ষা নিলেন।

বরানগরে থাকাকালে পূজনীয় মহারাজ বললেন, কাঁকুড়গাছিতে একদিন 'কথামৃত' পাঠ করার জন্য। নির্দিষ্ট সময়ে আমি গিয়ে 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করে এসেছি। তিনি সেদিন কাঁকুড়াগাছিতে অনুপস্থিত ছিলেন। অপর একজন কৃতবিদ্য সন্ন্যাসীকেও একদিন 'কথামৃত' পাঠ করতে বলেন—তিনিও করেন। বেশ কয়েকদিন পর পূজনীয় মহারাজ ফোনে নির্দেশ দিলেন : "ওহে, তুমি এখন হতে প্রতি রবিবার কাঁকুড়গাছিতে 'কথামৃত' পাঠ করবে।" আমি ইতস্তত করে বললাম: "কাঁকুড়গাছিতে পণ্ডিত সাধুরাই পাঠ প্রবচন করেছেন...।" পূঃ মহারাজ তার উত্তরে বললেন : "তোমাকে কে পণ্ডিত হতে নিষেধ করেছে!" দুজনেই নীরব, ফোনও নীরব। তারপর দুবছরেরও বেশি সময় ওখানে 'কথামৃত' পাঠ করেছি—ওখানে বহু শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন নারী-পুরুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বধর্ম মহাসভায় অভিযাত্রার শতবর্ষপূর্তি উৎসব—১৯৯৩-এ ৩১ মে হতে ২জুন কাঁকুড়গাছি মঠে পালিত হয় বেশ ঝাঁকজমক ও আড়ম্বরসহ। উক্ত অনুষ্ঠানের একদিন আগে পূজনীয় মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠালেন কাঁকুড়াগাছিতে। তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়াতে বললেন এর শরীর খারাপ, ওর দায়িত্ব ছিল অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করা। তুমিই করবে।" মঞ্চে বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্ব। ঐতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায়, ডাঃ ত্রিগুণা সেন, পূজনীয় লোকেশ্বরানন্দজীর মতো সব বক্তা। মঠ মিশনের পূজ্য বহু সন্ন্যাসী। মঞ্চ পরিচালনা তথা সঞ্চালনা তাঁর নির্দেশে করতে হলো এবং পরবর্তী অধ্যায়—স্বামীজির বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদানের শতবার্ষিকী-পূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আমি ও স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজ যুগ্মভাবে ওই দায়িত্ব পালন করেছিলাম, সঙ্গে ছিলেন ডঃ কমল নন্দী।

ডাঃ এস. কে. চৌধুরী, সেবা প্রতিষ্ঠানের নাম করা চিকিৎসক। আমার একটি ছোট অপারেশন করেছিলেন। অনেকদিন পর তাঁর সঙ্গে দেখা কাঁকুড়গাছিতে। পূজনীয় মহারাজকে তিনি প্রণাম করতে এসেছেন। তখন আর তিনি সেবা প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক নন। পূজনীয় মহারাজের অধীনে তিনি কাজ করেছেন বেশ কয়েক বছর। সেইসব

স্মৃতিচারণ করতে করতে বললেন : "ভগবান আমাদের কাছে সত্যিই মানুষ হয়ে আসেন—আমার কাছে এসেছেন ইনি।" অর্থাৎ পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। তাঁর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় গভীর বিশ্বাস পূজনীয় মহারাজের ওপর। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

৭ সেপ্টেম্বর ২০০২-এ কামারপুকুরে তাঁর শুভ পদার্পণ। বিশুদ্ধানন্দধামে নিচের তলায় ছোটঘরে তাঁর আবাস। বললেন : "এবারে তো কিছু কাজকর্ম করতে হবে?" চুপ করে আছি। আবার ওই একই কথা বলায় বললাম : "হ্যাঁ মহারাজ।" বললেন : "প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট মহারাজদের জন্য একটা আলাদা বাড়ি দরকার।" তাঁর আশীর্বাদে বড় ধরনের দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রামের মেয়েদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ, পল্লীমঙ্গলের বহুবিধ কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে—হয়েছে আরও অনেক কিছু। কিন্তু প্রেসিডেন্ট মহারাজদের জন্য আলাদা গৃহনির্মাণ হয়নি। যখন পুনরায় কামারপুকুর এলেন ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে তখন তাঁর থাকার সামান্য সুব্যবস্থা করা হয়েছিল—অবশ্য কোনদিনই তাঁর নিজস্ব কোন চাহিদা ছিল না। সঙ্ঘের কল্যাণ ও সম্প্রসারণের জন্য তিনি সদা উন্মুখ ছিলেন। এবার কামারপুকুর হতে জয়রামবাটি যাত্রা। ৩১ জানুয়ারি ২০০৭। মঠে ফিরছেন সম্ভবতঃ ৪ ফেব্রুয়ারি। দীর্ঘক্ষণ প্রণাম করছেন মাকে মাতৃমন্দিরে। প্রণাম আর শেষ হয় না। যেন স্থূলশরীরে শেষ প্রণাম। পূজনীয় মহারাজ, সপ্তর্ষি মহারাজ ও আমি গাড়িতে। শিশুর মতো বারবার জিজ্ঞাসা করছেন ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি তো? রাত ৮ টায় পৌঁছালাম বেলুড়মঠে।

শেষ দর্শন নভেম্বরের ১লা তারিখ। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের শাখাকেন্দ্রের প্রধানদের সম্মেলনের আগের সন্ধ্যায়। এক মহান পুরুষ শায়িত রয়েছেন। জাগতিক সম্পর্ক হতে দূরে বহুদুরে। বারাণ্ডা হতে দর্শন প্রণাম করে মঠে ফিরে এলাম। এখন একান্ত নির্জনতায় স্মৃতি ভেসে ওঠে। তাঁকে কী ভোলা যায়? "ভুলে থাকা, নয় সে তো ভোলা; বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা। নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই; আজি তাই শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।" সাধু ভক্তদের উদ্দেশে বলি—"আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম; রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম।"

তথ্যসূত্র :

স্বামী গহনানন্দ—এক উৎসর্গীক জীবন

এক করুণাময় কৃপাপুরুষ : স্বামী গহনানন্দ

স্বামী সত্যরূপানন্দ

অনেক বছর পূর্বে যখন আমি বেলুড় মঠে কার্যরত ছিলাম তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ কৃপায় পরম পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সংস্পর্শে আসার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। প্রায়ই পূজ্য মহারাজজীকে আমি সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে বেলুড় মঠ, মুখ্য কার্যালয়ে আসতে দেখতাম। সেই সময় আমি মিশন মুখ্য কার্যালয়ে কোন একটি বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম। পূজ্য মহারাজজী মঠ এবং মিশনের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিভাগে যে সমস্ত কাজকর্ম হত সে বিষয়ে আমার থেকে রিপোর্ট জিজ্ঞেস করতেন।

যখনই উনি বেলুড় মঠ আসতেন তখনই কার্যালয়ের কাজ এবং সাধু ও ভক্তদের সঙ্গে ব্যস্ত থাকতেন। ওনার ব্যস্ততম কার্যক্রম সত্ত্বেও আমি ওনাকে আমার সমস্ত কাজের রিপোর্ট দিতাম, প্রথমে আমি ভাবতাম যে মহারাজ কেবলমাত্র আমার কথাগুলো শোনেন এবং পরে সমস্ত ভুলে যান। কিন্তু আমি একদিন আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাই, একবার উনি ৩-৪মাস পর আমার পুরানো কাজ সম্পর্কে কিছু কথা খুব গভীরতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, তারপর থেকে আমি আমার কাজে আরও সজাগ হই এবং ওনাকে কাজের সম্পূর্ণ খবরাখবর দিতে থাকি।

পূজ্য মহারাজের মধ্যে দৃঢ় ধৈর্যের এক অদ্ভুত গুণ ছিল। যখন উনি মঠের সহায়ক মহাসচিব ছিলেন এবং সঙ্গে সেবা প্রতিষ্ঠানের সচিবের কার্যভারও দেখতেন ঐ সময় তিনি প্রায় রাত্রি ৮টায় বেলুড় মঠে আসতেন এবং সিঁড়ির উপর তৈরী কার্যালয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বসে কাজ করলে, সেই সময় তিনি বিভিন্ন কাজ-কর্ম সম্পর্কে মঠ এবং মিশনের সাধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।

কখনও কখনও উনি সকালবেলা সেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য বেরিয়ে যাওয়ার সময় খুবই ধৈর্য সহকারে মৃদু হেসে বলতেন, "তোমার কি অসুবিধা যদি তুমি ১১-৩০ টায় আসো?" সেখানে আমি তিন ঘন্টা মহারাজের জন্য অপেক্ষা করতাম কারণ আমি

জানতাম না, সেই সময়টা রাতের না দিনের বেলার।

তিনি দিনে ১৩-১৪ ঘন্টা কাজ করার ক্ষমতো রাখতেন। ওনাকে কখনও ক্লান্ত হতেও দেখিনি। এমন কি মঠ বা সেবা প্রতিষ্ঠানের কোন জায়গাই পূজ্য মহারাজজীকে কখনও কারো উপর উত্তেজিত বা অধৈর্য্যপূর্ণ ব্যবহার করতে দেখিনি। পরবর্তীকালে যখন তিনি মহাসচিব হলেন তখন সেবা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে বেলুড় মঠে পাকাপাকি ভাবে চলে আসলেন। এক মহান সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁর কাঁধের উপর থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সর্বদা শান্ত দেখেছি। মহাসচিব হওয়ার পরও ওনাকে দেখেছি বিভিন্ন সাধুদের এবং তাঁদের কেন্দ্রে ঘটিত হওয়া সমস্যাগুলো যেমন অনেকের সমস্যা হতো সংস্থার প্রধানকে নিয়ে বা তাঁর ব্যবহারের প্রতি পূজ্য মহারাজজী সমস্ত কিছু ধৈর্য সহকারে শুনতেন। অনেক সময় পীড়িত সাধুদের কষ্ট শুনে নিজে সমাধান করে দিতেন। উনি অত্যন্ত স্নেহ সহকারে বলতেন, "আমি তোমার সমস্যা শুনে নিয়েছি এখন আমার ব্যক্তিগত সমাধান এটাই যে তুমি আরও কিছু দিন ধৈর্য সহকারে সেখানে থাকো, আর যদি খুবই থাকতে কষ্ট হয় তবে তোমার সাহায্য করার জন্য আমি সর্বদা তৎপর আছি।' যখন উনি সেবা প্রতিষ্ঠানের মুখ্য ছিলেন এবং বেলুড় মঠেরও সহায়ক মহাসচিব ছিলেন, সেখানে সমস্যা উৎপন্নকারী কিছু সন্ন্যাসী যাঁরা কোথাও সমন্বয় করে থাকতে পারতেন না, মহারাজজী তাঁদের আচরণ সংশোধিত করার জন্য খুবই চেষ্টা করে গেছেন এবং উনি বলছেন যে, আমি যদি তাঁদের আশ্রয় না দিই তবে তাঁরা সংঘ চ্যুত হয়ে যেতে পারে ও তাঁদের জীবন দুঃখপূর্ণ হয়ে যাবে। সংঘে এখনও এমন সাধুরা আছেন যাঁরা পরবর্তীকালে আধ্যাত্মিক জীবনে খুব উন্নত হয়েছেন।

পরবর্তীকালে উনি যখন উপাধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষ হলেন এবং উনি দীক্ষা দেওয়া শুরু করলেন সেই সময় ওনার সঙ্গে আমারও থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। উনি উদাহরণপূর্বক ভক্তদের দীক্ষা প্রদান করতেন। এখনও আমার কোন এক কেন্দ্রে ওনার দীক্ষা দেওয়ার কথা মনে পড়ে। এক অল্প বয়স্ক ভদ্রমহিলা যিনি কোন এক কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন, তাঁর পূজ্য মহারাজ থেকে দীক্ষা হয়। সেই ভদ্রমহিলার ৭-৮ বছরের একটি কন্যা সন্তান ছিল, যখন তিনি দীক্ষা নেওয়ার জন্য মন্দিরের সভাগৃহে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর সেই শিশু কন্যাটি তারস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগল, "আমার মা দীক্ষা নিচ্ছে তাই আমিও দীক্ষা নেব।" এই অবস্থায় শিশুটির দিদা এবং অন্যান্য সাধুদের তাকে সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ল। যতক্ষণ পর্যন্ত তার মা দীক্ষা নিচ্ছিলেন, সেই ৩-৪ ঘন্টা খুবই মুশকিল সহকারে তাকে বুঝিয়ে রাখা হচ্ছিল। দীক্ষার পর যখন তার মা বেরিয়ে আসেন তখন সে তার মাকে জড়িয়ে ধরে বলতে

লাগল, সেও দীক্ষা নিতে চায় এবং আবার কান্নাকাটি শুরু করে দিল। সেই শিশুটির সম্পূর্ণ পরিবারই শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত। শিশুটির মা তাকে এক বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে গেলেন এবং সেই শিশুটি সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করল। তখন সেই বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী শিশুটিকে সান্ত্বনা দিয়ে তার মাকে বললেন তুমি আমার সঙ্গে পূজ্য মহারাজজীর কাছে চলো এবং তিনি পূজ্য মহারাজজীকে সম্পূর্ণ ঘটনা বললেন। তখন সেই শিশুটি চিৎকার করা তো বন্ধ করল কিন্তু কাঁদতে থাকল। পূজ্য মহারাজজী তাকে একটি কাজুর প্যাকেট দিলেন কিন্তু সে ওটা নিল না। পূজ্য মহারাজ যখন তার মাথায় হাত রাখলেন তখন সে আবারও দীক্ষা নেওয়ার জন্য বায়না ধরল। তারপর পূজ্য মহারাজজী তাকে স্নেহপূর্বক প্রশ্ন করলেন, কেন সে দীক্ষা নিতে চায় ? শিশুটি বলল যদি আপনি আমাকে দীক্ষা দেন তবে আমি ভগবান (ভগবৎ সাক্ষাৎকার) কে দেখতে পারব এবং ভগবান আমার সামনে আসবেন, পূজ্য মহারাজজী আবার নিজের হাত সেই শিশুটির মাথায় রাখলেন এবং তার মাকে ডেকে পাঠালেন। শিশুটির মা যখন পূজ্য মহারাজজীর সঙ্গে দেখা করলেন তখন পূজ্য মহারাজজী বললেন, আমি তোমার কন্যাটিকে একটি শর্তে দীক্ষা দিতে পারি যদি তুমি রাজি হও। পূজ্য মহারাজজী বললেন যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুটি দীক্ষা মন্ত্র ভালো করে উচ্চারণ না করে এবং সে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে ভালোভাবে না জানে ততক্ষণ পর্যন্ত তার হয়ে তোমায় জপ করতে হবে। শিশুটির মা পূজ্য মহারাজজীর শর্তে রাজি হলেন এবং শিশুটির দীক্ষা হয়ে গেল। তার মা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধান এবং শিশুটি এখন যুবতী সে তার গুরুদেবকে অশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করে ও নিয়মিত জপধ্যান ও পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে।

একবার পূজ্য মহারাজজীর উড়িষ্যায় দীক্ষার কার্যক্রম ছিল, তাতে আমিও ওনার সঙ্গে ছিলাম। এক নব দম্পতি যাঁরা গত বছর পূজ্য মহারাজ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁরা কোন কারণে কষ্টে ছিলেন। তাঁরা দুজনে পূজ্য মহারাজের সঙ্গে দেখা করলেন এবং ওনাকে নিজেদের সমস্যাগুলো অতি বিনম্রতার সঙ্গে বললেন। পূজ্য মহারাজ তাঁদের সমস্ত সমস্যাগুলোকে শান্তিপূর্বক শুনলেন এবং তাঁদের যে নির্দেশ দিলেন তা আমিও শুনতে পেলাম, “জপ করো এবং রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়ো। এটার দ্বারাই তোমাদের সকল সমস্যার সমাধান হবে।” তাঁদের মুখমণ্ডল দেখে মনে হচ্ছিল সত্যিই তাঁরা অনেকটা শান্তি পেলেন।

একবার পূজ্য মহারাজজী পঞ্জাজুর (এক বাঙ্গালী শরণার্থী শিবির) যা সেই সময় ছত্তিশগড়ের বস্তর জেলায় ছিল, সেখানে কয়েক শত ভক্ত দীক্ষা নিয়েছিলেন, আমিও

পূজ্য মহারাজের দলে ছিলাম। সেখানে আমরা চারদিন ছিলাম। এক একান্নবর্তী পরিবারের বৃদ্ধা মা এবং তাঁর ১০-১২ জন ঘরের সদস্যরা দীক্ষা নিলেন। বৃদ্ধা মা পূজ্য মহারাজকে প্রার্থনা করলেন যেন মহারাজজী পাশের গ্রামে তাঁর বাড়িতে যান এবং পদধূলি দিয়ে তাঁকে ধন্য করেন। তিনি খুব গরীব ছিলেন, কিন্তু পূজ্য মহারাজকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুবই চেষ্টা করছিলেন। পরের দিন দীক্ষা ছিল না, সুতরাং পূজ্য মহারাজজী বললেন, সেই বৃদ্ধা মা এত করে বলছেন তবে তো আমাদের একবার তাঁর বাড়ি যাওয়া উচিৎ। প্রায় ৪-৫ জন সন্ন্যাসী এবং ২-৩ জন স্থানীয় ভক্তদের নিয়ে পূজ্য মহারাজ বিকালবেলা তাঁর বাড়ি গেলেন। বাড়িটি কুঁড়েঘর এবং খুবই দৈন্য অবস্থায় ছিল। সেখানে আমাদের বসার কোন জায়গাই ছিল না। সম্পূর্ণ পরিবারের সদস্যরা আমাদের দেখে প্রসন্ন হলেন কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তারপর সেই বৃদ্ধা মা পূজ্য মহারাজজীর হাত ধরে বললেন, "বাবা কৃপা করে ঘরের ভিতর প্রবেশ করুন এবং আপনার চরণধূলি দিয়ে আমাদের ঘরটিকে পবিত্র করুন।" তিনি পূজ্য মহারাজজীকে একটি পুরানো চেয়ারে বসালেন। পরিবারের সকলে এবং আশেপাশের প্রতিবেশীরা পূজ্য মহারাজকে প্রণাম করলেন এবং একে একে সকলে বাইরে চলে আসলেন। সেই মুহূর্তে আরও কিছু প্রতিবেশী ও সেই পরিবারের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবরা আসলেন, বারান্দায় মাদুর পেতে দেওয়া হলো এবং তারা ওটার উপর বসে পড়লেন। পূজ্য মহারাজজী সেই পুরানো চেয়ারে বসেছিলেন। বৃদ্ধা মা এবং তাঁর কন্যা ও পুত্রবধূ পূজ্য মহারাজজীর জন্য মুড়ি, চিড়ে, শশা এবং নুন আনলেন। মুড়ি ও চিড়ে দুটোই তাজা ছিল। বৃদ্ধা মা ঠিক ঠাকুরমার মতো সকলকে খাওয়ালেন এবং পূজ্য মহারাজকে আরও একটু খেতে বললেন। পূজ্য মহারাজজী খুবই প্রসন্ন চিত্তে বৃদ্ধা মায়ের থেকে একটু মুড়ি নিলেন। সেই মুহুর্তে বৃদ্ধা মায়ের চোখে আনন্দের অশ্রু ভরে উঠল।

আমাদের নারায়ণপুর আশ্রমে অনেক আদিবাসী ছেলেমেয়েরা মন্ত্র দীক্ষা নিল। পূজ্য মহারাজজী আদিবাসীদের কল্যাণের চিন্তায় চিন্তিত থাকতেন। উনি নারায়ণপুরের সকল গৃহীভক্ত এবং সন্ন্যাসীদের উৎসাহিত করতেন। পঞ্জাজুরে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে ছিল, একজন বৃদ্ধা মহিলা প্রায় শতাধিক ভক্তের সঙ্গে দীক্ষা নিচ্ছিলেন। যখন তাঁর পালা এল তখন তাকে ডাকা হলো। স্বাভাবিকভাবে দীক্ষার সময় পূজ্য মহারাজজী জিজ্ঞেস করেন, "কি তুমি পড়তে পারো ?" সে বলল সে নিরক্ষর। পূজ্য মহারাজ তাঁকে আবারও বললেন, "যা আমি বলছি ওটা খুব সাবধানে শোন।" কিন্তু তার মুখমণ্ডলে কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। অন্য এক বৃদ্ধা মহিলা তার পাশে বসে ছিল, সে

পূজ্য মহারাজকে বলল সেই মহিলা প্রায় বধির, কানে শুনতে পায় না। তাঁকে কিছু শুনানোর জন্য তাঁর কানের কাছে খুব জোরে চিৎকার করতে হয়। পূজ্য মহারাজজী আয়োজকদের খুব বকুনি দিলেন," তোমরা কি ধরনের সাক্ষাৎকার নাও? আবেদন পত্রের কি ভাবে পর্যবেক্ষণ করো? এখানে একজন মহিলা যে সম্পূর্ণ নিরক্ষর এবং পাথরের সমান বধির তাঁকে কে এখানে নিয়ে আসল?" এই পরিস্থিতিতে আয়োজন কর্ত্তা এবং পূজ্য মহারাজজীর সেবক অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। শেষে পূজ্য মহারাজজী বললেন ঐ বৃদ্ধা মহিলার তাঁর থেকে কম বয়স্ক মহিলা তাঁকে বসাও। পূজ্য মহারাজ ঐ বৃদ্ধা মহিলার কানে ৩-৪ বার খুব জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন এবং তাঁকে আবার পুনরায় মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে বললেন। ভগবানের কৃপায় শেষ পর্যন্ত সব কিছু সঠিকভাবে হলো।

পূজ্য মহারাজজী নির্ভীক, সাহসী, শক্তিশালী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যখন তিনি সেবা প্রতিষ্ঠানে সচিবের পদে পদস্থিত ছিলেন, সেই সময় শ্রমিকরা অনুচিত দাবি করেছিল। পূজ্য মহারাজজী শ্রমিকদের অনেক বার বোঝালেন যে তাদের দাবি অনুচিত। কিন্তু তারা ওনার কথায় কর্ণপাত করল না। পূজ্য মহারাজজী দৃঢ়তা এবং সাহসের সঙ্গে বললেন, "আমি তোমাদের অনুচিত দাবি মঞ্জুর করার জায়গায় হাসপাতাল বন্ধ রাখাই শ্রেয় মনে করি।" সেবা প্রতিষ্ঠান কয়েক মাস বন্ধ ছিল এবং পূজ্য মহারাজজী নিজের দৃঢ় নির্ণয়ে অটুট ছিলেন। অবশেষে বিরোধীদের হার মানতে হলো এবং তারা তাদের অনুচিত দাবিগুলো পরিত্যাগ করল। এটা ওনার মহান ব্যক্তিত্বের অনেক বড় উদাহরণ।

ব্রহ্মলীন পূজ্য মহারাজের চরণ কমলে আমার শতকোটি প্রণাম।

আমার স্মৃতিতে মহাত্মা

স্বামী বিমোক্ষানন্দ

উৎসাহী পর্যবেক্ষণ

সাল ১৯৭৯, আমি ইটানগরে পোস্টেড ছিলাম। যেখানে একটা আধুনিক হাসপাতাল তৈরি হচ্ছিল। উক্ত কার্য সমাপ্ত করে সেই সময় আমি বেলুড় মঠে ছিলাম তখন শ্রীমতো স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ আমাকে নিজের গাড়ি করে বেলুড় মঠ থেকে সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে গেলেন। উনি সেই দিন রাউন্ডে ছিলেন এবং আমাকে ওনার সাথে ভেতরের ওয়ার্ডে নিয়ে গেলেন। সেই সময় প্রথমবার আমি পূজনীয় মহারাজের সম্মুখীন হলোাম। উনি রুগিদের দেখছিলেন। ওনার রুগিদের প্রতি ভালবাসা, রোগের সম্বন্ধে পুরো খোঁজ নেওয়া এবং প্রতিটি রুগিকে মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করার সাক্ষী হলোাম। সঙ্গে থাকা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ওনার গভীর প্রেক্ষণ দেখে অবাক হলেন।

স্নেহপূর্ণ মনোভাব

ইটানগর থেকে মাঝে মাঝে আমি মিশনের কাজের উপলক্ষে কলকাতায় যেতাম। বেশিরভাগ আমি সেবা প্রতিষ্ঠানে থাকতাম। কাজের সুবিধার থেকে বেশি ওনার আমার প্রতি ভালবাসা আমাকে প্রতি মুহূর্তে আকর্ষিত করেছে। যদি দিনে একবার আমি ওনার এক ঝলক দর্শন পেতাম তো ভাবতাম আমি ওনার আশির্বাদ পেয়েছি। ১৯৮২ সালে পরম পূজনীয় কৃষ্ণকৃপানন্দজী মহারাজের (বর্তমানে মরিশাস কেন্দ্রের প্রধান) সাথে আমার কলকাতা থেকে ইটানগর যাওয়ার ছিলো। আমরা দুজনেই সেবা প্রতিষ্ঠানে ছিলাম। আমাদের ফ্লাইট ভোরবেলা ছিলো। রাত্রিতে আমি পরম পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজকে ভোরবেলা বিরক্ত করবো না বলে ওনার থেকে বিদায় নিলাম। উনি আমার প্রোগ্রাম জিজ্ঞেস করলেন আর বললেন সকালে রান্না ঘরে গিয়ে দুধ গরম করে কফি বানিয়ে খেয়ে যেও। সকাল ৩.৩০টায় আমি নিচের ছোটো দরজা খোলার জন্য চাবি নিলাম তখন মহারাজের স্পষ্ট গলা শুনতে পেলাম কে- কে ওখানে? সেই সময় আমি

ওনাকে বিরক্ত করতে চাইনি "তবুও আমি উত্তর দিলাম আমি সুন্দর, মহারাজ"। ওনার ঘর থেকে ওনার স্পষ্ট আদেশ পেলাম—"তুমি কি কফি খেয়েছো?" আমি উত্তর দিলাম—"না মহারাজ এখন প্রয়োজন নেই" এবং আমি আমার জিনিসপত্র আনতে আমার ঘরে গেলাম। দরজায় পৌঁছিয়ে যা দেখলাম সেটা আমাকে অবাক করলো। পূজনীয় মহারাজ নিজের বিছানার থেকে উঠে রান্নাঘরে গিয়ে গরম কফি বানিয়ে হাসি মুখে আমাকে কাপ ধরালেন। আমি লজ্জিত হলোম। সম্মানিত মহারাজের স্নেহময়ী মুখটি আমার চোখের সামনে এখন ভাসছে।

সবার জন্য প্রবেশযোগ্য

১৯৮৮ জুন মাসে আমার অরুণাচল প্রদেশের কাজ শেষ হওয়ার পর মহারাজ আমাকে সেবা প্রতিষ্ঠানে কাজ দিলেন। পরের বছর পূজনীয় মহারাজ মহাসচিব হলেন। উনি প্রায় সেবা প্রতিষ্ঠানে আসেন যেহেতু আমি ওই সময় প্রেমানন্দ ওয়ার্ডের প্রভারি হলোম যেখানে সাধুরা ভর্তি হতেন। আমি ওনাকে সদর দরজায় স্বাগত করতাম। উনি ওয়ার্ডের প্রতিটি সাধুর খোঁজ খবর ভাল করে নিতেন, সেইজন্য উত্তর দেওয়ার আগে আমি ভাল করে তাঁদের সম্বন্ধে সব খবর নিয়ে রাখতাম। উনি রুগী সাধুদের সম্বন্ধে কখন কখন আমার থেকে বেশী জানতেন উনি যখন প্রতিষ্ঠানে আসতেন সাধুদের সাথে ভক্ত রুগিদের ও দেখতেন। সবাই (সাধু ও ভক্ত) যারা ওনার ছোঁওয়া পেতেন ওনারা নিজেদের কে সৌভাগ্যবান মনে করতেন।

উদারতা

একবার এক সাধু গত হলেন। ওনার শবদেহ বেলুড় মঠে দাহর জন্য তৈরি ছিল। বেলুড় মঠের নির্দেশ ছিল শবদাহার জন্য দেহ সন্ধ্যা ৭টার আগে পৌঁছাতে হবে, না হলে শবদাহ পরের দিন হবে। সেই সময় মহারাজ সেবা প্রতিষ্ঠানে এসেছিলেন। যখন উনি শবদাহর বিষয়ে জানতে চাইলেন, আমি বললাম বেলুড় মঠে শবদেহকে পাঠাবার জন্য আমাদের কোনো গাড়ি নেই সেই জন্য আজকে দেহটা সমাধিসংক্রান্তে থাকবে, কালকে পাঠিয়ে দেব। আমার কথা শোনার পর বললেন ওনার এম্বেসেডর গাড়ির পেছনের সীটে দেহটা রেখে দাও, আমি সন্ধ্যা ৭টার আগে বেলুড় মঠে পৌঁছে যাব। আমরা শুনে অবাক হলোম, রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের মহাসচিব নিজের গাড়িতে, নিজের সঙ্গে মৃতদেহ নিয়ে যাবে। উনি এবং আত্মনিষ্ঠানন্দ (ওনার সচিব), দুজনে একসঙ্গে সামনের সীটে বসে, কোনো অসুবিধে না বুঝতে দিয়ে দেহকে নিয়ে চলে গেলেন। আমরা ওনার এই উদারতাকে কোনোদিন ভুলতে পারবো না।

গুণাবলী যে অনুকরণীয়

প্রতিটি সংগঠনের একটা উন্নতি এবং প্রত্যাগতির চক্র চলে। ছয় বছর আমার সেবা প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন একটা আবেগপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। সেটা কর্মীদের আন্দোলন ছিল। আমি কিন্তু মহারাজের মুখ থেকে কোনোদিন কর্মীদের প্রতি কোনো খারাপ কথা বলতে শুনিনি। উনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং ঝাড়ুদার সবাইকে প্রচুর সময় দিতেন, ওনার জন্য কেও অপ্রয়োজনীয় ছিল না। উনি রামকৃষ্ণ পরিবারকে বিস্তারিত করেছেন এবং সবাইকে ভক্ত করেছেন। প্রতিটি সাধুকে ওনার জ্ঞান ভরা পরামর্শ দেওয়া, ওনার খেয়াল রাখা, শ্রদ্ধাশীল কথা বলা, মনোযোগ দিয়ে শোনা-এই ওনার গুণ আমার কাছে একটা আদর্শ হয়ে উঠেছে। অনেক সময় মানসিক চাপ সহ্য না করতে পেরে আমি ওনার কাছে আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা নিতে যেতাম। প্রতিবার আমি ওনার চমৎকার কাউন্সেলিং এর জন্য আরো জ্ঞানী হয়ে ফিরতাম।

পরীক্ষা এবং সময়

অনেক ভক্তরা আধ্যাত্মিক নির্দেশ ই-মেল থেকে নিত। কিছু জটিল সমস্যার উপযুক্ত সমাধান ছিল না। অনেক সময় গুরুর নির্দেশ না বুঝতে পারার জন্য সমস্যা তৈরি হতো। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত, শ্রীমা এবং স্বামীজির উপর লেখা বই পড়ার একটা অভ্যাস থাকলে আমাদের মনের সব সন্দেহ দূর হবে এবং মন কে নবীনতর উদ্যমের সঙ্গে শক্ত হয়ে উঠবে এই বাণী তিনি প্রদান করতেন।

এক ভদ্রমহিলা ভক্ত আমাকে লিখেছিলেন যে, তার শ্বশুর-শাশুড়ি এবং স্বামী রামকৃষ্ণ সঙ্গ সাথে যা কিছু সংযুক্ত আছে ওই সব থেকে দূরে থাকে। ওনাদের এই আচরণে উনি খুব দুঃখিত এবং সেইজন্য বেলুড় মঠে আসতে পারে না। তিনি বললেন ওনারা যা আছে সেটা নিয়ে তার কোন সমস্যা নেই। প্রায় চার বছর আগে আমি স্বামী গহনানন্দ মহারাজ থেকে মন্ত্র নিয়েছি। শিশু হওয়ার আগে আমি জপ ও ধ্যান করার জন্য সময় বের করে নিতাম, এখন আমি দুই শিশুর মা, একজনের সাড়ে তিন বছর আর আরেকজনের দেড় বছর বয়স।

অনেক চেষ্টা করেও আমি জপ ধ্যান করার জন্য সময় বের করতে পারছি না। শুধু রাত্রিতে শোওয়ার আগে সকালে ঘুম থেকে উঠার পরে আমি নিয়মিত জপ করি এবং দিনের বেলা আমি মনে মনে জপ করি। জানি না আমি কেন এত অস্থির বোধ করছি এবং আমাকে অপরাধী মনে হচ্ছে যে আমি আমার গুরুর বলা পথ অনুসরণ করছি না। আপনি দয়া করে বলতে পারবেন আমি কী করি? একদিকে সাহায্য না করা পরিবার এবং আরেকদিকে পরিবারকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব, সময় না পাওয়া,

তার সাথে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের বিরুদ্ধে সমালোচনা। যে ভক্তরা এই পরিস্থিতিতে থাকে তারা ভেতরে ভেতরে কষ্ট পায়। আমি সেই ভক্তকে উত্তর দিই—

।। শ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্।।

যদিও এটা দুঃখের বিষয় ঠাকুর, মা ও স্বামীজির জন্য তোমার এবং শ্বশুর বাড়ির সাথে মানসিক সমতো এক হচ্ছে না, আমি ভাবি না এটা তোমার আধ্যাত্মিক জীবনকে বাধা দিচ্ছে। এটা দুই উপায় শেখার প্রক্রিয়া তোমার ওদের আপত্তি থাকার সত্যেও আধ্যাত্মিক দিকে বেড়ে যাওয়া এবং ওদের তোমার ভক্তির প্রতি সচেতন হওয়া, আমি খুশী হয়েছি, তুমি তোমার পরিস্থিতি থেকে বিরক্তি না হয়ে পুরো বিশ্বাসের সাথে সাধনা করে যাচ্ছো। ঠাকুরের কৃপায় তুমি একজন উচ্চ কোটি গুরু শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ কে পেয়েছো। তুমি হয়ত আমার ব্লগ পরেছো আমার স্মৃতি ওনার থেকে যে পথ নির্দেশন পেয়েছি তাই আমি তোমাকে ঋদ্ধ ভাবি।

নিজেকে দোষী ভাবছো কারণ তুমি তোমার গুরুর নির্দেশ পালন করতে পারছো না, আমার এই বলার আছে তোমার অনুভূতি ভুল। পরম পূজনীয় মহারাজ নিজের সব ভক্তদের বলছেন সবসময় হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কে রাখবে এবং যতদূর সম্ভব হয় কাজের মধ্যে মনে মনে মন্ত্র জপ করবে। অনেক সময় মহারাজ বলতেন, ভোরে তাড়াতাড়ি উঠে, দিনের কাজ শুরু হওয়ার আগে জপ করতে। যখন পুজোর আলাদা জায়গা থাকে না, বিছানায় একটা পরিষ্কার চাদর বিছিয়ে জপ করা যায়। অনেক লোকেরা বিকেলে সময় পায় না, তাদের জন্য মহারাজ বলেছেন সব কাজ সেরে শোওয়ার আগে জপ করতে।

আমি ভাবছি...তুমি গুরুর নির্দেশ অজান্তে মানছো। শেষ পর্যন্ত এটা বলা হয়েছে গুরু নিজের দীক্ষিত ভক্তদের শারীরিক ভাবে অনুপস্থিত থাকলেও, কল্যাণ এবং পথ নির্দেশ করেন। আমার বিশ্বাস এখন তোমার সব ভুল ভ্রান্তি গুরুর আশীর্বাদে মিটে যাবে। তুমি শোওয়ার এবং সকালে উঠার পরে জপ করতে থাকো, হ্যাঁ, রোজ করবে এবং দিনে কাজের সময় মনে মনে জপ করতে থেকো। আমার প্রার্থনা তোমার সাথে আছে। আমার কোনো সন্দেহ নেই শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার হাত ধরে তোমাকে আধ্যাত্মিক পথে নিয়ে যাবেন।

এক প্রশান্ত নির্মল কালজয়ী ব্যক্তিত্ব—স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

স্বামী কমলানন্দ

১৯৭৪ সালে যখন আমি ট্রেনিং সেন্টারে ছিলাম তখন পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সঙ্গে সেবা প্রতিষ্ঠানে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় কারণ সেখানে তখন আমি একটা অপারেশনের জন্য ভর্তি ছিলাম। তিনি প্রতিদিনই সমস্ত ওয়ার্ডে পরিদর্শনে আসতেন এবং একদিন তিনি সানফ্রান্সিসকো আশ্রমের মিনিস্টার-ইন-চার্জ পরমপূজ্য স্বামী প্রবুদ্ধানন্দজী মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে পরিদর্শনে আসেন। স্বামী প্রবুদ্ধানন্দজী আমার জন্য একটি বই এনেছিলেন। যাইহোক, আমি এখনও বুঝে উঠতে পারি না, কেন আমি সেদিন তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে অভ্যর্থনা করতে ভুলে গেলাম। তবে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ সেদিন তৎক্ষণাৎ আমার এই ত্রুটিকে খুব শান্তভাবে সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে, ১৯৮১-৯০ সাল পর্যন্ত যখন আমি কলকাতা অদ্বৈত আশ্রমে ছিলাম, তখন আমার তাঁর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ ঘটে। যদিও বিশেষ কোন অন্তরঙ্গতা নয়, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই সেসময় আমি তাঁর সাহচর্য লাভ করি। ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসের কোন সময়ে তিনি অদ্বৈত আশ্রমে আসেন এবং ফিরে যাওয়ার সময় আমাকে বলেন যে, আমাকে ঐ আশ্রমের ম্যানেজারের দায়িত্ব নিতে হবে। এটিই আমাকে তাঁর নিকটতম সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ এনে দেয়।

কোন এক সময়ে অদ্বৈত আশ্রমে সহকারী সাধুর সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য হয়ে যায়। তাঁর পরিদর্শনকালে কোন সময়ে তাঁকে আমি এ বিষয়ে জানাই এবং এব্যাপারে তাঁর সহায়তা চাই। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অন্যতম সাধারণ সহ-সেক্রেটারি হিসেবে পূজ্য মহারাজজী তখন সাধুদের বিভিন্ন জায়গায় পোস্টিং-এর ব্যাপারে খোঁজখবর করতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে শান্তভাবে আমার সব বক্তব্যগুলি শোনেন, কিন্তু কোন কথা বলেন না। আমি আনন্দে, বিস্মিত হয়ে যাই যখন দেখি তিনি বলরাম মন্দিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহারাজকে বলছেন, একজন ব্রহ্মচারীকে নিয়ে পরের দিনই

অদ্বৈত আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে। প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি তাঁর আন্তরিক মনোযোগ ও আমার প্রতি তাঁর ভালবাসার এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে থাকলো ব্যাপারটি।

অন্য একদিন যখন আমি তাঁর সঙ্গে একই গাড়ীতে ভ্রমণ করছিলাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি একজন ভাল সাধু চাই না একজন ভাল কর্মী চাই। এবং যখন আমি জানাই যে একজন ভাল সাধুরই প্রয়োজন, তখন তিনি খুব খুশী হন।

একবার বেলুড়মঠের প্রাঙ্গণে আমি যখন পরমপূজ্য মহারাজজীর সঙ্গে পদচারণা করছিলাম তখন একজন ব্রহ্মচারীকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মহারাজজী আমাকে জানালেন যে এই ব্রহ্মচারীটিকে নিয়ে একটু সমস্যা আছে এবং তা সত্ত্বেও আমি তাকে অদ্বৈত আশ্রমে রাখতে পারবো কিনা; অবশ্য একথা বললেন যে, যদি সে সেখানে ঠিকমতো থাকতে না পারে আমি তাকে যে কোন সময়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে পারি। এ থেকে বোঝা যায় আমার ওপর তাঁর কতখানি অগাধ বিশ্বাস ছিল। ব্রহ্মচারীটি খুব আনন্দের সঙ্গে সেখানে থাকে ও সন্ন্যাস প্রাপ্ত হয় এবং এখন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে সন্ন্যাস জীবন যাপন করছে।

অন্য একটি ঘটনায় যখন আশ্রমের একজন সাধুর জীবনে কিছু সমস্যা দেখা দেয় তখন আমার মনে হয় স্থানান্তরে গেলে হয়তো এর কিছু সুরাহা হতে পারে। একথা শুনে পরমপূজ্য মহারাজজী অন্য কোন শাখা আশ্রমে তার প্রয়োজন জানিয়ে তাকে আশ্রমের বাইরে নিয়ে যান এবং আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, স্থানান্তরে গেলে তার সম্বন্ধে আর কেউ কোন বিরূপ মন্তব্য করতে পারবে না।

একবার মাদ্রাজ মঠ থেকে প্রকাশিত একই ধরনের কিছু প্রকাশনা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি খুব প্রচণ্ডভাবে তর্কে জড়িয়ে পড়ি। সেসময় একইসঙ্গে বেলুড়মঠের সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ ও মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন পরমপূজ্য স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ। তিনি আমার প্রতি এজন্য ক্রোধান্বিত হন, বেলুড়মঠে ট্রাস্টি মিটিং-এর পর সবাই যখন এদিক-ওদিক চলে গেছেন, পরম পূজ্য স্বামী গহনানন্দজী দাঁড়িয়ে আমাকে মাঝখানে বসিয়ে রাখেন যাতে স্বামী তপস্যানন্দজী আমাকে দেখতে না পায়। পরের দিন যথারীতি আমি যখন স্বামী তপস্যানন্দজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তখন তিনি সব ভুলে যান। বলেন,— ‘সাধুদের রাগ জলের উপরের দাগ।'

কলকাতা অদ্বৈত আশ্রমে আমার থাকাকালীন বিশেষত ১৯৮৫-৯০- এর মধ্যকালীন সময়ে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ আমার প্রতিটি কাজকর্ম নিয়ে খুবই আগ্রহী থাকতেন এবং সর্ববিষয়ে প্রয়োজন মতো আমাকে সহায়তা করতেন। তাঁর যে বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাকে সর্বাধিক আকর্ষণ করতো তাহলো তাঁর ধীর শান্ত স্বভাব। তিনি কখনো

কোন ব্যাপারেই চঞ্চলতা বা অস্থিরতা প্রকাশ করতেন না। সমস্ত সময় সীমার ঊর্ধ্বে তিনি ছিলেন যেন এক 'কালাতীত' সত্তা।

১৯৯০ সালে যখন পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি তখন আমার অদ্বৈত আশ্রম থেকে অন্য স্থানান্তর হয় এবং তখন দেড়মাসের ছুটি পাই। ছুটিতে কোথাও যাওয়ার আগে মহারাজজী আমাকে বলেন যে, যাওয়ার আগে আমি যেন আমার একটা ভ্রমণসূচী ওনাকে দিয়ে যাই, তাহলে প্রয়োজন মতো উনি তৎক্ষণাৎ আমাকে ডেকে নিতে পারবেন। যাইহোক, ছুটির শেষে ফেরার পর তিনি আমাকে বলেন যে ছুটির মধ্যে তিনি আমাকে ব্যস্ত করতে চাননি, তাই আর ডাকেননি। পরে আমাকে কলম্বো আশ্রমে যেতে হতে পারে সেকথা জানান। কিন্তু অবস্থার কিছু পরিবর্তন হওয়ায় কলম্বোর পরিবর্তে রাঁচী মোরাবাদী আশ্রমে আমার পোস্টিং হয়। মহারাজগণ ভেবেছিলেন যে আমি হয়তো রাঁচী যেতে রাজী হবো না এবং তাঁরা এ ব্যাপারে আমাকে আশ্বস্ত করবেন ও উৎসাহ দেবেন। কিন্তু যখন আমি খুব সহজেই তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন মহারাজজী তাঁর আসন ত্যাগ করে প্রায় একরকম লাফিয়ে উঠে সিঁড়ির নীচে অপেক্ষারত স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজকে এই প্রস্তাবে আমার রাজী হওয়ার কথা জানান।

২০০০ সালের প্রথম দিকে কোন সময়ে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রূপে যখন চেন্নাই মিশন পরিদর্শনে আসেন সেসময় আমি টি.নগরে ছিলাম। চেন্নাই মঠে ফেরার পর মহারাজজী জানান যে মন্দির উৎসর্গ অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি টি. নগর আশ্রমে থাকবেন। সৌভাগ্যবশত আমি সেসময় তাঁর সান্নিধ্য এবং সেবা করার সুযোগ লাভ করেছিলাম কারণ সাধারণত আমি যে ঘরে থাকতাম সেখানেই তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন তিনি মঠ মিশনের অধ্যক্ষ হন, যদিও কয়েকবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আমার সুযোগ ঘটে কিন্তু তাঁর একান্ত নিকট সান্নিধ্যে আসবার আর সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

যে কোন রকম সমস্যার প্রতি তাঁর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমস্যাক্লিষ্ট মানুষদের সমস্যা সমাধানে তাঁর সহায়তা করার মানসিকতা আজও আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁর শান্ত, সৌম্য উপস্থিতি এখনও আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে।

তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমি আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করি।

হরি ওম্ তৎসৎ

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ

আমার স্বচক্ষে দেখা পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

স্বামী আত্মঘনানন্দ

সাল ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮, এই সময়ে আমি বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছিলাম। সেই সময় পূজনীয় স্বামী গহনানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠের কোন এক সভায় যোগদান করতে এসেছিলেন, তখন ওনাকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তখন তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি ছিলেন। সেই সময়ে উনার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার কোন সুযোগ আমার হয় নি, কিন্তু দূর থেকে আমি দেখছিলাম তিনি খুব প্রফুল্ল হৃদয়ে ছিলেন। সাল ১৯৮৩, আমি যখন ব্যাঙ্গালোর থেকে আসি ট্রান্সফারের জন্য তখন তিনি সহকারী সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আমি অপেক্ষারত, কখন সেক্রেটারি মহারাজ আমার Posting Order দেবেন। একদিন পূজনীয় মহারাজ আমায় প্রশ্ন করেছিলেন যে কখনও কি আমি সেবা প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সেটাই ছিল প্রথম সাক্ষাৎ আমার মহারাজের সাথে। তিনি ছিলেন সহৃদয়, হাস্যরসিক এবং সেটার জন্যই আমি উনার খুব কাছের মানুষ হতে পেরেছিলাম। আমি উনাকে বলেছিলাম যে, ট্রেনিং সেন্টারে যখন ছিলাম তখন অনেকবারই চিকিৎসার জন্য যেতে হয়েছিল। তখন তিনি বললেন যে, আমি যখন দেখেছিলাম সেই জায়গাটি, তখন থেকে এখন অনেক উন্নত হয়েছে। তাই উনার সাথে একই গাড়ীতে করে যেতে বললেন সেবাপ্রতিষ্ঠানে। তিনি মুখ্য কার্য্যালয়ের সহকারী সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পরেও সেই প্রতিষ্ঠানের কাজও তিনিই দেখতেন। যখন গাড়ীতে করে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমার সাথে স্বচ্ছন্দে কথা বলছিলেন। আমায় ভুলিয়েই দিলেন উনি একজন বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, যে এত বড়ো গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট-এ তিনি অধিষ্ঠিত। এটা ছিল সন্ধ্যাকাল। হাওড়া ব্রিজ-এ অনেক ট্রাফিক ছিল, আমাদের গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। তৎক্ষণাৎ একটা ট্রাম আমাদের গাড়ীকে ঠেলে বেরিয়ে গেল। আমি চমকে উঠলাম এবং ট্রাম ড্রাইভার-এর ধৃষ্টতা দেখে ড্রাইভার ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু মহারাজ হাসিতে থাকিলেন এবং অবিচলিত হয়ে ড্রাইভারকে বললেন, শান্ত হও এগিয়ে চলো। সেই সময় নির্বিকার মহারাজকে দেখে আমি বিস্মিত এবং মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। এই দৃশ্য আজও আমার মনে নির্মলভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে।

সাল ১৯৯১ কলম্বো (শ্রীলঙ্কা) তে আমার স্থানান্তরণ হয়েছিল। ১৯৯২ সালের শুরুতে পূজনীয় মহারাজ কলম্বো গিয়েছিলেন এবং প্রায় দশ দিনের মতো সেখানে থেকেছিলেন, সেই সময় আরও কাছ থেকে জানার সুযোগ পাই। সেই সময় মহারাজ ভীষণ অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন এবং সক্রিয় ছিলেন। আমি কখনও ওনাকে নিস্তেজ এবং চাপে থাকতে দেখিনি। সেটা ছিল তাঁর চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। একদিন আমাদের সেন্টারেরই উপকেন্দ্রে ওনাকে নিয়ে গিয়েছিলাম একটা অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে আমরা আমাদের সেন্টারের মধ্যাহ্নভোজনের জন্য ফিরছিলাম, সেটা ছিল গরম দিন। আমি সমেত আমাদের দলের সবাই খুব ক্লান্ত ছিলাম এবং সবাই সময়মতো মধ্যাহ্নভোজনের জন্য অধীর আগ্রহে ছিলাম। আমরা সবাই সময়ের পশ্চাৎ-এ ছিলাম এবং আমরা আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর জন্য ভ্রমণ করছিলাম। সেই জায়গাতেও একটা মজার ঘটনা হলো। পূজনীয় মহারাজ অবিশ্বাস্য শক্তি এবং প্রবল আগ্রহে বললেন, আমাদের ফেরার পথে, একটা স্থানে একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের জন্য থামতে হবে এবং সেখানে স্কুল পরিদর্শন করতে হবে বাচ্চাদের আশীর্বাদ করতে হবে। আমি তীব্রভাবে আপত্তি জানালাম প্রধান শিক্ষককে, এবং বললাম যে পূজনীয় মহারাজের এমনি সময়সীমা পশ্চাৎগামী হয়ে গেছে এবং তিনি ক্লান্ত হয়ে আছেন। কিন্তু পূজনীয় মহারাজ, স্বাভাবিকভাবে হাসলেন এবং প্রধান শিক্ষককে তার স্কুল পরিচালনা করতে বললেন। আমি সত্যিই স্পন্দনহীন হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু মাত্র কয়েকটা শব্দ দিয়ে মহারাজ প্রধান শিক্ষককে আশীর্বাদবচন বললেন এবং দ্রুত প্রস্থান করতে বললেন। যেটা আমার চিন্তাধারার বাইরে ছিল। যখন আমরা সমাবেশ কক্ষে প্রবেশ করছিলাম তখন শিশুরা ভিড় করছিল। আমরা তখন বসার জায়গায় আসন গ্রহণ করছিলাম। প্রধান শিক্ষক তখন পূজনীয় মহারাজকে মাল্যদান করে সংক্ষিপ্ত স্বাগত ভাষণ প্রদান করলেন। তারপর পূজনীয় মহারাজকে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। আমি ভাবছিলাম তিনি কিছু শব্দ বলে হয়তো সেখান থেকে চলে যাবেন। কিন্তু পূজনীয় মহারাজ যা কিছু বলার লোক নন। তিনি খুব আনন্দচিত্তে শিশুদেরকে ইংরেজীতে গল্প বলা শুরু করলেন এবং আমায় আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদিত করতে বললেন। যখন মহারাজের বক্তব্য শেষ হলো, তখন শিশুরা আনন্দচিত্তে করতালি দিল। আমাদের সেন্টারে ফিরে আসতে অনেক দেরী হলো। মহারাজের মধ্যাহ্নভোজন শেষ হলো প্রায় ৩টার সময়। তারপর আমি ভাবলাম মহারাজ হয়তো মধ্যাহ্নের বিশ্রাম করছেন। কিন্তু আমি সেখানেও পরাজিত হলোম। তিনি শান্তভাবে আমায় ডেকে পরবর্তী কর্মসূচী জানতে চাইলেন। তাঁর মুখে কোন অবসাদের ছায়া ছিল না। আমি নির্বাক তাঁর রহস্যপূর্ণ শক্তি দেখে। মিশনের প্রতি সেবামূলক উদ্দেশ্য তার মূল ভাব। এটাই আমি বলতে পারি। আর তিনিই সেটার মূর্ত্তিমান দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন।

জামতোড়া মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চতুর্দশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী

স্বামী সনকানন্দ

কয়েকটি ছোট ঘটনা :

জামতোড়া মঠে রওনা দেওয়ার (১১ই মে, ২০০৭) আগে একদিন বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে গিয়ে প্রণাম করে জামতোড়ায় পূর্ব নির্ধারিত দিবসে শুভ পদার্পণ করবার জন্য মহারাজের সেবকদের সামনেই শেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছি, তারপরেই মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "সনকানন্দ তুমি কি আমায় জামতোড়ায় নিয়ে যেতে চাও?" আমরা বললাম, "তা তো জানি না মহারাজ ! তবে আপনি আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্ঘগুরু, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিনিধি। তাঁর শক্তিতেই হয়তো জামতোড়ায় আপনাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি।" শুনেই মহারাজ বেশ আনন্দিত হলেন দেখে নিশ্চিন্তে হলোম।

পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরেই ঐদিন বললাম, "মহারাজ ১১ই মে আপনি ও সপ্তর্ষি বেলুড় মঠ থেকে রওনা দিয়ে হাওড়া নিউদিল্লী পূর্বা এক্সপ্রেসে চিত্তরঞ্জন স্টেশনে নেমে পড়বেন। আমরা চিত্তরঞ্জন স্টেশন থেকে আমাদের গাড়ীতে আপনাকে জামতোড়া মঠে নিয়ে আসব।" সেই অনুযায়ী ঐদিনই প্রায় ১২-৩০ টায় জামতোড়া মঠের গেটের সামনে থেকে পূজ্যপাদ মহারাজকে সারিবদ্ধভাবে অগণিত ভক্ত ও সাধু ব্রহ্মচারী শুভ শঙ্খধ্বনির সহিত মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ধীরে ধীরে পূজ্যপাদ মহারাজকে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে নিয়ে গেলাম। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজির শ্রীচরণে অর্ঘ্য নিবেদন করে নীচে নেমে এলেন। তাঁর ঘরে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ পরে বারান্দায় সাধুভক্তদের দর্শন ও প্রণাম গ্রহণের জন্য চেয়ারে বসলেন। আমরা জামতোড়া মঠের পক্ষ থেকে তাঁকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করলাম। ভক্তরাও প্রণাম সেরে চলে গেলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজ জামতোড়া মঠে ১১ মে, ২০০৭ শুভ পদার্পণ করে ১৭ই জুন সকাল ৭টা পর্যন্ত ১মাস ৭দিনের মতো অবস্থান করেন। তার মধ্যে ১৩ দিনে মোট ৬০৫ জন ভক্ত দীক্ষা পেয়েছেন। শুধু তাই নয় বহু সাধু ব্রহ্মচারীও ভক্তদের সমাগমও বেশ ভালই হয়েছিল। জামতোড়া মঠ উক্ত কয়েকদিন সত্যিকারে মহা উৎসবে পরিণত হয়েছিল।

জামতোড়া মঠে শুভ পদার্পনের কয়েকদিন পরে তিনি একদিন আমাদের বলে বসলেন, "সনকানন্দ ! আমি সাধুদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেতে চাই। আমরা বললাম, "মহারাজ! আমরা যেখানে বসে প্রসাদ পাই তা অতি ছোট জায়গা। ওখানে আপনার প্রসাদ পাওয়া অনেক অসুবিধা হবে। তাই মহারাজ, অনুগ্রহ করে আপনি এখানেই প্রসাদ পান মহারাজ।"

পূজনীয় মহারাজের ইচ্ছানুসারে গরমের সময় বিকেলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভাল আইসক্রীম ভোগ দিয়ে তাঁরই ঘরে পূজনীয় মহারাজসহ আমরা বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আগত ২৫/৩০ জন সাধু ও ডাঃ শক্তিপদ ভট্টাচার্যসহ এই প্রসাদ গ্রহণ করলাম। তিনি বারে বারে বলে চলেছেন, "মুক্তি মহারাজকে আরও দাও, ডাক্তারবাবুকে আরো দাও" ইত্যাদি বলে চলেছেন। শুধু তাই নয় বেশ আনন্দে সাধুদের সঙ্গে পূজ্যপাদ মহারাজ একসঙ্গেই আইসক্রীম গ্রহণ করলেন। আমরাও খুশি হলোম।

রোজ মহারাজকে আমরা জামতোড়া মঠের পাশেই এক মাঠে বেড়াতে নিয়ে যেতাম। তার আগে মঠের মেন গেট পেরিয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর স্মৃতিশক্তি সঠিক রাখার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, "মহারাজ ! এটা কি?" তিনি ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে পড়ে চলেছেন, "চে-রি-টে-বু-ল- নিঃশুল্ক-ক-চি-কিৎ-শা-লয়।" খুশী হয়ে বললাম, "বাঃ মহারাজ! আপনি ১০০ এর মধ্যে ১০০ পেয়ে গেলেন।" এইভাবে রোজ চলত। মঠে কত বালকরা রোজ মহারাজের কাছে আসত, মহারাজের সঙ্গে চলত। মহারাজও প্রত্যেককে ভাল লজেন্স দিতেন। মাঠের পাশেই দিল্লী যাওয়ার জন্য মেন ট্রেন লাইন, ট্রেনের যাত্রীদের উদ্দেশ্যে পূজ্যপাদ মহারাজ ডান হাত তুলে হাত নেড়ে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছাদি জানাতেন।

মাঠের পাশেই রাস্তা। তার পাশেই উক্ত ট্রেন লাইন। এদিকে পূজনীয় মহারাজকে ভ্রমণের জন্য তৈরি করে দিয়ে রোজ মহারাজের সেবক অরবিন্দ মহারাজ মাঠের পাশেই রাস্তায় ভ্রমণে যেতেন। মহারাজ মাঝমাঠ থেকেই অরবিন্দ মহারাজকে দূর থেকে দেখেই সজোরে ডাকতেন, "এই অ-র-বিন-দ কোথায় যাচ্ছ? এধার সে আ-ও।" এইভাবে রোজ বেশ আনন্দের সহিত ভ্রমণ চলত।

পূজনীয় মহারাজ জামতোড়া মঠে আমের সময় অবস্থান করেছিলেন। একদিন বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য আম পাঠাব কিনা, পূজ্যপাদ মহারাজকে আমরা তাঁর ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কারণ স্বয়ং সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ এখানে উপস্থিত আছেন। তাঁর অনুমতি নিয়েই ঠাকুরের সেবা করাই বিধেয়। পূজনীয় মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "অতি অবশ্যই পাঠাবে। কার কাছে পাঠাবে? রামগোপাল মহারাজ (স্বামী প্রমেয়ানন্দ)-এর কাছে পাঠিয়ে দাও।" আমরা ঐ আদেশ পালন করলাম। সেই আনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে পূজনীয় রামগোপাল মহারাজকে ফোনে জানিয়ে দিলাম যে মঠের ড্রাইভারের মাধ্যমে পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ মঠে ঠাকুরের জন্য জামতোড়া মঠের আম পাঠিয়েছেন। আপনার কাছে পাঠাতে বলেছেন। তাই আপনাকে জানালাম। পূজনীয় রামগোপাল মহারাজ আমাদের জানালেন আম পেলে বিকেলে আমি জানিয়ে দেব। তাই হলো। রামগোপাল মহারাজ ফোনে আমাদের জানালেন যে ঠাকুরের জন্য পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ যে আম পাঠিয়েছেন তা পেয়েছি। পূজনীয় মহারাজকে জানিয়ে দিও। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের ঘরে গিয়ে এই সুখবর দেওয়াতে মহারাজ খুবই খুশী হলেন। বললেন, "Thank you".

জামতোড়া মঠে পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজের অবস্থানের মধ্যে কোন এক একাদশীর দিনে ভুলবশত শ্রীরামচন্দ্রের মহাবীরের পূজো ও রামনাম হয় নাই। কিন্তু তারপরের দিনও একাদশী তিথি ১১টা পর্যন্ত ছিল। পাঁজি হাতে করে পূজ্যপাদ মহারাজকে ঠাকুরের এই সেবা অপরাধের কথা অবহিত করলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানালেন, "এক্ষুনি পুজো ও রামনাম করে দাও।" সেই অনুযায়ী আমরা ভক্তদের সহিত বেলা ১১টার মধ্যে রামনাম শেষ করে পূজ্যপাদ মহারাজকে জানিয়ে দিলাম। মহারাজ খুশী হলেন।

মহারাজ রোজ মঠের মধ্যে ভ্রমণের সময় যখন পিপীলিকার সারি যেত তিনি পিপীলিকাদের গায়ে পা না দিয়ে ডিঙিয়ে পেরোতেন। এই ঘটনা থেকে তিনি সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করে চলতেন এটি আমরা লক্ষ্য করলাম।

পূজ্যপাদ মহারাজকে ১৬ই জুন, ২০০৭ সকালে পূর্ববৎ মাঠে ভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার জন্য উনার ঘরে গিয়ে নিবেদন রাখলাম, "মহারাজ! চলুন ভ্রমণ করে আসি।" মহারাজ তখন চেয়ারে বসেছিলেন। কয়েকবার বলা সত্ত্বেও মহারাজ কোন উত্তর দিলেন না। শুধু মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। কোন জবাব দিলেন না। তখন সপ্তর্ষি মহারাজকে Intercom ফোনে ডেকে পাঠালাম। আমরা দুজনেই মহারাজকে বারে বারে অনুরোধ করার পর মহারাজ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে আমাদের

সঙ্গে ভ্রমণে যাওয়ার জন্য রওনা দিলেন। ডিসপেনসারি বিল্ডিং পেরিয়ে রাস্তার উপর দিয়ে গিয়ে মাঠে পৌঁছালাম। সঙ্গে বিকাশ মহারাজও ছিল। মাঝমাঠে হঠাৎ উনি বলে বসলেন, "আমার কাজ শেষ।" আমরা চমকে উঠলাম, আমরা বললাম, "না মহারাজ; ঠাকুরের কাজ অনেক বাকী আছে। আপনাকে করতে হবে।" এইভাবে কয়েকবার বলার পর হঠাৎ উনি বলে বসলেন, "সে তোমরা বুঝবে না।" তারপরেই ডানহাতের লাঠিটা আকাশের দিকে সোজা করে তুলে আমাদের বললেন, "মিলিয়ে নিও"। তারপরেই আমরা মাঠ থেকে মঠে ফিরে এলাম। আর কোনও কথা হয়নি। গাড়ি থেকে নামতে চাইলেন না। শুধু বলে চলেছেন "চল, চল, নিয়ে চলে আস।" তখন সপ্তর্ষি ও আমরা দুজনেই মহারাজকে দেবশিশুর মতো বোঝাতে লাগলাম। চলুন মহারাজ অনুগ্রহ করে টিফিনটা আগে করে নিই। তারপরে ধীরে পূজ্যপাদ মহারাজকে ঘরে নিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরেই তিনি স্বাভাবিক হয়ে টিফিনও করলেন।

১৭ই জুনের ২/১ দিন আগে পূজ্যপাদ মহারাজকে রাত্রে খাওয়ালেন সনকানন্দ। ১৪/০১/২০১৯। পূর্বে বললাম, মহারাজ। আপনি ইদানিংকালে World record করলেন। মহারাজ বললেন, "কেন?" আমরা বললাম রাজা মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠে থাকতেন, মাঝে মাঝে মঠে আসতেন। অখণ্ডানন্দজী মহারাজ সারাগাছিতে থাকতেন, মাঝে মাঝে মঠে আসতেন, বিজ্ঞান মহারাজও এলাহাবাদ থাকতেন। মাঝে মাঝে মঠে আসতেন। বিরজানন্দজী মহারাজও থাকতেন, তিনিও মাঝে মাঝে মঠে আসতেন। তারপর কোন সঙ্ঘগুরু মহারাজ একাদিক্রমে একমাস সাত দিন কোথাও অবস্থান করেন নি। শুনে মহারাজ বললেন, "তাই?" আমরা বললাম হাঁ মহারাজ।

১৭ই জুন পূজ্যপাদ মহারাজের বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তনের দিন। তার আগের রাত্রে মহারাজকে বললাম, মহারাজ! কাল সকাল সকাল উঠে পড়বেন। কেন!!? কেন কি কালতো আপনার বেলুড় মঠে ফিরে যাওয়ার কথা। উত্তরে মহারাজ বললেন, "আমি যদি না যাই" কি মজা, কি মজা তাহলে আপনাকে নিয়ে আমরা তো বেশ আনন্দেই থাকব। কিন্তু মহারাজ তা তো হবে না। আপনি আমাদের সঙ্ঘগুরু, আপনার অনেক programme আছে, তাই আপনাকে আপাতত মঠে যেতেই হবে। পরে আপনি আপনার জামতোড়া মঠে আসবেন। পূজ্যপাদ মহারাজ বললেন, "সঙ্গে কে যাবে?" আমরা বললাম, আমি আর সপ্তর্ষী আপনারই গাড়ীতে করে বেলুড় মঠে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব। সেই অনুযায়ী ১৭ই জুন সকাল ৭টায় জামতোড়া মঠ থেকে রওনা দিয়ে যথাসময়ে বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ মহারাজকে নিয়ে পৌঁছে গেলাম। এদিকে পূজনীয় প্রভানন্দজী মহারাজ অপেক্ষা করছিলেন। মহারাজকে তিনি গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়ে

স্মৃতির আলোয় দ্যুতিমান পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

স্বামী মুক্তিনাথানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বেলুড় মঠে দীর্ঘকাল পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজীর সান্নিধ্যে কাজ করার সময় তাঁকে অনেক কাছ থেকে দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল।

অবশ্য তার অনেক আগে সত্তরের দশকে যখন আমি মঠে যোগদান করি তখনই তার সঙ্গে আমার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে সাক্ষাৎকার হয়। প্রথম দর্শনেই মনে হয়েছিল ইনি একজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী, যিনি একসঙ্গে প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান । যিনি আমাকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তার কাছে পরে জেনেছিলাম উনি তখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অছি-পরিষদের কনিষ্ঠতম ট্রাস্টি ও পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য এবং সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানেরও সচিব।

তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর সমচিত্ততা। পরিস্থিতি যতই উত্তেজনাপূর্ণ হোক না কেন, তাঁকে কখনও উত্তেজিত হতে দেখা যেত না। নিজের চোখে দেখা একটি ঘটনা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করছি।

যখন তিনি মঠ-মিশনের সহ-সম্পাদক রূপে সাধু-সন্ন্যাসীদের ট্রান্সফার- পোষ্টিং এর দায়িত্বে বৃত ছিলেন ঐ সময় এক সন্ধ্যায় তাঁর পুরী রওনা হবার কথা ছিল। ঐ সময় উনি মিশন অফিসের দোতলায় পশ্চিমদিকের ঘরটিতে থাকতেন। পূজনীয় স্বামী আত্মস্থানন্দজী সহ আমরা মিশন অফিসের একতলার বারান্দায় অপেক্ষা করছি তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর জন্য। এদিকে ট্রেন ছাড়ার আর বেশি দেরি নেই। আমরা পূজনীয় মহারাজের স্নেহের পাত্র একজন সন্ন্যাসী কর্মীকে বার বার ওপরে পাঠাচ্ছি জানবার জন্য কতদূর কী হলো ? কিন্তু প্রতিবারই ফিরে এসে উনি জানাচ্ছেন পূজনীয় মহারাজ নির্বিকারচিত্তে ওনার মালপত্র গোছগাছ করছেন এবং যাত্রার জন্য তৈরি

হচ্ছেন। অবশেষে সন্ন্যাসী কর্মীটি আর থাকতে না পেরে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে যখন মহারাজকে বলেন যে আর দেরী করলে ট্রেন ফেল হয়ে যাবে। তখন মহারাজ শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "আমি যাব, না তুমি যাবে?" কর্মীটি হতাশ হয়ে তখন নীচে এসে ঐ কথাটি আমাদের বললেন। আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম।

পূজনীয় মহারাজের বর্ণময় ব্যক্তিত্বের যে দ্বিতীয় ঘটনা উল্লেখ করছি তা হলো তাঁর পরিপূর্ণ আত্ম নিবেশ। সব সময়েই কোন না কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা।

এ বিষয়ে উদাহরণস্বরূপ একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করছি।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৮ এর ভয়ঙ্কর বন্যার পরে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ব্যাপক ত্রাণকার্যের পর হুগলী জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জে একটি দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসন প্রকল্প চলাকালীন পূজনীয় মহারাজ পুনর্বাসন কার্য্যটি তদারকি করার জন্য আমাদের ক্যাম্পে পদার্পণ করেন। প্রচণ্ড ব্যস্ততার পরে দ্বিপ্রাহারিক আহারান্তে পূজনীয় মহারাজ যখন স্বল্পকালীন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন ব্রহ্মচারী সেবকরূপে আমি আস্তে আস্তে ওনার ঘরে উঁকি মেরে দেখতে গিয়েছিলাম যে ওনার বিশ্রামের কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে খাটে বসে উনি একান্তমনে কি লেখাপড়া করছেন। আমি বিনীতভাবে যখন বললাম, 'মহারাজ একটু বিশ্রাম নেবেন না?' মহারাজ মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন যে সেবাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিক রিপোর্টের পাণ্ডুলিপি অবিলম্বে সংশোধন করে প্রেসে পাঠাতে হবে তাই উনি এই অবসরে ঐ জরুরী কাজটি করে নিতে চাইছেন। আমি সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে নীরবে প্রস্থান করলাম।

পূজনীয় মহারাজ ছিলেন এক আদর্শ কর্মযোগী। আমাদের মধ্যে যাঁদের ওনাকে অত্যন্ত কাছ থেকে দিনে-রাতে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁরা আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করেছেন কিভাবে তিনি একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচী শান্ত সমাহিত চিত্তে দক্ষতার সাথে সমাপন করতেন আবার তার মাঝে হাসি- তামাসাও করতেন। ঐ সময়ে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সচিবের কাজে বেলুড় মঠে সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন। আবার একই সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক থাকার জন্য প্রতিদিন বিকালে সেবাপ্রতিষ্ঠানে চলে যেতেন এবং ওখানের কাজ শেষে প্রায়ই বিভিন্ন উকিল বাবুদের সাথে পরামর্শ করে রাতে মঠে ফিরতেন। অনেক সময় দেখা যেত বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে কোন জরুরী কাজ নিয়ে আগত সাধুকর্মীরা বেশী রাতেও তার ঘরের সামনে অপেক্ষা করে থাকতেন। পূজনীয় মহারাজ কাউকে ফেরাতেন না। নৈশাহারের পরেও একে একে সকলকে ডেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের

সমস্যার যথচিত সমাধান করে দিতেন। আবার আমরা লক্ষ্য করতাম প্রতিদিন প্রাতে যথাসময়ে সব মন্দিরাদি প্রণামে বেরিয়ে পড়তেন।

ঐ সময়ে সুপ্রীম কোর্টে মঠ-মিশনের একটি জরুরী মামলা চলছিল বলে পূজনীয় মহারাজকে প্রায়ই দিল্লী যেতে হত। আমি সাধারণত ওনাকে দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতাম। গাড়িতে উনি পারতপক্ষে বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না। বরং লক্ষ্য করতাম কোলের উপর রাখা একটি চাদরের নীচে ওনার আঙ্গুলগুলি সচল থাকত। বুঝতে পারতাম, উনি ঐ সময়টুকু জপ ও স্মরণ-মননে সদব্যবহার করে নিতেন। কর্ম ও উপাসনার ওই নিদর্শন দেখে আমরাও অনুপ্রাণিত হতাম।

আগেই বলেছি কাজে কর্মে ওনার বিশেষ প্রশাসনিক দক্ষতা পরিলক্ষিত হত। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। সত্তরের দশকে উনি যখন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সচিব পদে ব্রত ছিলেন, তখন ওখানে একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মী ধর্মঘট হয়। এমনও শঙ্কা করা হয় যে সেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসাধীন অসুস্থ রোগীদের হয়ত অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দিতে হবে এবং অনন্যোপায় হয়ে প্রতিষ্ঠানটি আপাতত বন্ধ করে দিতে হবে। কিন্তু পরে পূজনীয় মহারাজের কাছে শুনেছিলাম হাসপাতালের ভেতরের ও বাইরের প্রচণ্ড চাপ থাকা স্বত্ত্বেও পূজনীয় মহারাজ কিছুতেই অন্যায়ের সাথে সমঝোতা করেন নি এবং অনমনীয় দৃঢ়তায় অচল থেকে শান্ত চিত্তে সকল প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে হাসপাতালের কাজ সচল রেখেছিলেন এবং অবশেষে ধর্মঘটী কর্মীরা নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বিশেষ দৃষ্টি রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৯৮০ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠে আয়োজিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় মহাসম্মেলনের পর পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রসার কল্পে দুটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, একটি পল্লীমঙ্গল ও অন্যটি ভাবপ্রচার। পরবর্ত্তীকালে দুটি ক্ষেত্রেই পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গ্রামীণ কার্য প্রণালীর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব প্রচার পরিষদ গঠনের মাধ্যমে পূজনীয় মহারাজ ভক্তগোষ্ঠীকে একত্র করেছিলেন এবং তার ফলশ্রুতিরূপে পরবর্তীকালে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনেক স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং অনেক প্রতিভাবান যুবক রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেছেন।

কিন্তু এরজন্য পূজনীয় মহারাজ যে কত কষ্ট স্বীকার করেছেন ও কত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন তার ইতিকথা ক'জন জানেন বা মনে রাখেন? উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

পূজনীয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর পবিত্র জন্মস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত ময়াল-ইছাপুর গ্রামে পৌঁছানোর জন্য তখনও কোন পাকা সড়কের যোগাযোগ ছিল না। আরামবাগ থেকে বন্দর যাবার পাকা রাস্তা থেকে প্রায় ৪/৫ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পার হয়ে ময়ালে পৌঁছাতে হত। পূজনীয় মহারাজের অনুপ্রেরণায় ওখানকার স্থানীয় ভক্তরা একটি সংগঠন তৈরী করে প্রতিবছর পূজনীয় শশী মহারাজের জন্মোৎসব পালন করতেন এবং অবধারিতরূপে পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজীকে উৎসবে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন। পূজনীয় মহারাজও শত অসুবিধাসত্ত্বেও পূজনীয় শশী মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ঐ সব সভায় উপস্থিত থাকতেন। পূজনীয় শশী মহারাজের জন্মতিথি বর্ষাকালে হওয়ার জন্য প্রতিবারই বাদলজনিত দুর্যোগের সম্ভাবনা থাকত। একবার পূজনীয় মহারাজকে একটি জীপে চড়িয়ে ময়ালের উৎসবে হাজির করা হয়েছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং সভার প্রারম্ভে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হওয়ায় ড্রাইভার সবিনয়ে নিবেদন করল যে আর দেরী হলে এই এঁটেল মাটির কাদা পার করে জীপে যেতে পারবে না, কাজেই পূজনীয় মহারাজ যেন অবিলম্বে রওনা হয়ে পড়েন। ভগ্নমনোরথ কর্মকর্তাদের নিরাশ না করে পূজনীয় মহারাজ ড্রাইভারকে তখনই রওনা করে দিয়ে পাকা রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করতে বললেন। এরপর যথারীতি প্রচার কাজ শুরু হলো এবং এদিকে মুষলধারে বর্ষাও শুরু হয়ে গেল। সন্ধ্যায় দেখা গেল কর্দমাক্ত রাস্তায় যাওয়া সম্ভব নয়। তখন পূজনীয় মহারাজের জন্য একটি পাল্কীর ব্যবস্থা করা হলো এবং ভক্তরা সকলে মিলে নিজেরাই কাঁধে করে পূজনীয় মহারাজকে ঐ রাস্তা পার করে জীপে তুলে দিলেন। কালীপুরের সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত ডঃ কমল সরকার যখন এই প্রত্যক্ষ ঘটনাটি আমাকে বলেছিলেন তখন তাঁর চোখদুটি ভাবোচ্ছ্বাসে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে ময়াল ইছাপুরে রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক বন্যাত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ হয়েছিল এবং ক্রমে ওখানে একটি স্থায়ী কেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছিল।

পূজনীয় মহারাজ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের বেশভুষা সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে বলতেন। সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতিও তাঁর নজর এড়াতো না। এমনকি শার্টের সবগুলি বোতামও যদি না লাগানো থাকত তাহলে ওনাকে প্রণামের সময় ইঙ্গিত করে উনি সঙ্গে সঙ্গে বোতামগুলি লাগিয়ে নেবার জন্য নির্দেশ দিতেন। উনি চাইতেন সাধুদের

জীবন যেন সর্বদা সতর্ক থাকে এবং তাদের দৈনন্দিন আচরণে যেন সেই সতর্কতা ফুটে ওঠে। একবার আমি মন্দিরে প্রবেশ করার সময় আমার জুতাগুলি অবিন্যস্ত রেখেই তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেছিলাম। আমি লক্ষ করিনি আমার পেছনেই পূজনীয় মহারাজজী ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করছেন। পেছন ফিরে ওঁনাকে দেখে চোখাচোখি হতেই উনি বললেন জুতাজোড়া রাখা দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি এ জুতা কার। ততক্ষণে আমার মুখ লাল হয়ে গেছে এবং আমি ছুটে গিয়ে জুতা ঠিক করে রেখে আসি। তারপর সারা জীবন আর কখনও আমি এইভাবে জুতা রাখিনি। এই হ'ল পূজনীয় মহারাজের অনবদ্যভাবে শিক্ষাদানের কৌশল যাতে আমরা বরাবরের জন্য নিজেদের সংশোধন করে নিতে পারি।

অনেক পরে মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষরূপে পূজনীয় মহারাজ আমাদের লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রে দীক্ষাদানের জন্য পদার্পণ করেছিলেন, তখন আমি লক্ষ্ণৌ আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে কর্মরত। আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা চিকিৎসাশাস্ত্রে না হওয়ায় অনেক সময় হাসপাতালের ডাক্তারদের সঙ্গে প্রশাসনিক কর্মক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হোত। আমার কৌতূহলো নিবৃত্তির জন্য পূজনীয় মহারাজ নিজে ডাক্তার না হয়েও কীভাবে সেবাপ্রতিষ্ঠানের মতো রামকৃষ্ণ মিশনের বৃহত্তম চিকিৎসাকেন্দ্রটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন। কাজেই আমি এই সময়ে মহারাজকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'মহারাজ সেবাপ্রতিষ্ঠানের জন্য আপনি কি কোন চিকিৎসা অধিক্ষক (মেডিক্যাল সুপারইনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত করেছিলেন। পূজনীয় মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, 'কেন? আমিই তো নন মেডিক্যাল সুপারিন্টেডেন্ট ছিলাম।' আমি তৎক্ষণাৎ এই কথাটি ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। অনেক পরে আমি পূজনীয় মহারাজের এই কথাটির গভীর অর্থ অনুধাবন করতে পেরেছিলাম এবং পরবর্তীকালে হাসপাতালের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে আমার আর কখনও কোন সমস্যা বা অসুবিধা হয় নি। আমার এই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দেবার জন্য আমি পূজনীয় মহারাজের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

পূজনীয় মহারাজ খুব আমোদপ্রিয়ও ছিলেন। ছোট ছোট কথায়/রঙ্গরসে মাঝে মাঝেই পরিবেশকে হাস্যমুখর করে দিতে পারতেন।

একবার হরিদ্বার কুম্ভ মেলায় আমরা কয়েকজন সন্ন্যাসী মঠ থেকে যাবার জন্য শেষ সময়ে ছুটির জন্য আবেদন করেছিলাম। ট্রেনে টিকিট পাওয়ার অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের জানাশোনা কর্মকর্তাদের সাহায্যে টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পূজনীয়

মহারাজ ভেবেছিলেন, আমরা টিকিট পাব না, কাজেই ছুটি নিয়েও যেতে পারব না। আমরা সকলেই টিকিটের বন্দোবস্ত করে ফেলায় মহারাজ অনন্যোপায় হয়ে আমাদের যাওয়া মঞ্জুর করে দিলেন। এরপর আবার আর একজন সাধুকর্মী হঠাৎ আমাদের ধরে বলল, সেও যেতে চায়। আমরা তারও টিকিটের যোগাড় করে দিলাম। যখন সে পূজনীয় মহারাজের কাছে ছুটি চাইতে গেছে এবং তারও টিকিট হয়ে গেছে বলে নিবেদন করেছে তখন পূজনীয় মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার, ট্রেনগুলো কী খালি যাচ্ছে, কোন যাত্রী পাচ্ছে না?' আমরা সবাই মুখ টিপে হাসছি এবং পূজনীয় মহারাজও তা উপভোগ করছেন। পূজনীয় মহারাজ এই সাধু কর্মীটিরও ছুটি মঞ্জুর করে দিয়েছিলেন।

আর একবার আমরা উত্তর ২৪-পরগণার ত্রাণশিবির পরিদর্শনের জন্য শিকড়া কুলিনগ্রাম কেন্দ্রে রাত্রিবাসের জন্য পৌঁছেছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আশ্রমে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের ভক্তরা পূজনীয় মহারাজ সহ আমাদের আপ্যায়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রণামাদির পর্বও শেষ হলো। তখন কয়েকজন উৎসাহী ভক্ত পূজনীয় মহারাজকে বললেন, "মহারাজ আপনি এবারে বিশ্রাম নিন, আমরা এবার আসছি।' কিন্তু পূজনীয় মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, এখনও তো পরিশ্রমই করা হলো না, বিশ্রামের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে ?' আমরা কেউ এই কথার মর্মার্থ বুঝতে না পেরে পূজনীয় মহারাজের দিকে চাইতেই উনি মুচকি হেসে বললেন, "আরে দক্ষিণ হস্তের কাজ করে আগে আমরা পরিশ্রান্ত হই (অর্থাৎ আগে আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কর), তারপর তো বিশ্রামের পর্ব আসবে।' আমরা সবাই হাস্যরসে ফেটে পড়লাম। ভক্তরাও সকলে অবিলম্বে আমাদের খাওয়া দাওয়ার যথোচিত ব্যবস্থা করলেন।

বস্তুত পূজনীয় মহারাজ তাঁর অন্তর্নিহিত গভীর আনন্দের উৎসের সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত থেকে জীবনের যে কোন পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে পেরেছেন এবং আক্ষরিক অর্থে তাঁর জীবনে গুরুদত্ত স্বামী গহনানন্দজী নামটি সার্থক হয়ে উঠেছিল।

"স্মৃতি মন্থন"

স্বামী বিবেকাত্মানন্দ

গত ৯/১১/২০১৮ তারিখে অসুস্থতার জন্য Taxi করে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার্থে বেলুড় মঠের গেটের অনতিদূরে লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রের তরুণ সন্ন্যাসী হঠাৎ আমার Taxi কে দাঁড় করিয়ে আমাকে বলেন যে লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রের পক্ষ হইতে পরম পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দের স্মৃতি স্মারক গ্রন্থের জন্য কিছু স্মৃতি লিখে পাঠাতে। আমি সেই তরুণ ও দীর্ঘ দেহ সন্ন্যাসী, ভাইকে বলেছিলাম আমার হাতে কোন লেখা ভাল হয় না। তাঁহাকে বলেছিলাম চেষ্টা করবো। বর্ত্তমান রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে আমার বার বার মনে হচ্ছে কিছু লিখি। যদি সেই তরুণ সন্ন্যাসী ভুল ত্রুটি সংশোধন করে প্রকাশের জন্য মনোনীত হয় তবে সেটি সঙ্ঘের ঠাকুর, মায়ের ও স্বামীজির আশীর্বাদে। তিথি, মাস প্রভৃতি স্মরণ রাখা আমার জীবনে প্রচণ্ড অভাব। ফলে তা উল্লেখ করা সম্ভব হবে না।

প্রথম জীবনে আমি শিলচর কেন্দ্রের সংঘের কাজের জন্য **১৯৭১** সালে যোগদান করি। **১৯৭৭** সনে বেলুড় মঠে Training Centre -এ আসি, তৎপরবর্ত্তীকালে **১৯৭৯** সন থেকে ২০১০ সন বাঁকুড়াতে দীর্ঘদিন অবস্থান করি। সম্ভবত **১৯৯৭** সনে উক্ত বাঁকুড়া কেন্দ্রে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বাধ্য হই। পরম পূজ্যপাদ সেবা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রে গুরু দায়িত্বে অবস্থানকালিন, বাঁকুড়া কেন্দ্রের পরমপূজ্যপাদ স্বামী শ্রেয়শানন্দ সহ রামহরিপুর কেন্দ্রের প্রাচীন জনৈক সন্ন্যাসী, এই দুজন কে সেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার্থে ভর্তি করাবার জন্য বাঁকুড়া থেকে Train এ সকালে রওনা হয়ে How. Rly. Station এ পৌঁছাই। পরম পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দ Telephone-এ বলেছিলেন যে Howrah Rly. Station-এ সেবা প্রতিষ্ঠানের Ambulance থাকবে তোমাদের সেবা প্রতিষ্ঠানে আসার জন্য। আমরা খোঁজ খবর নিয়ে অবশেষে জানা গেল যে সেবাপ্রতিষ্ঠানে কোন নির্দেশ লিখিত নেই। ফলে এখন Ambulance পাঠানো সম্ভব হবে না। এই পরিস্থিতিতে বেলুড় মঠে পৌঁছাই। বেলুড় মঠে প্রাচীন Governing

Body-র অনেকে এসে বলেন যে—সম্ভবতঃ মহারাজ নির্দেশ দানে ভুলে গিয়েছেন। Delhi তে জরুরি কাজ থাকায় সমস্ত রাত কাজ করে ভোর ভোর plain এ রওনা হয়ে গেছেন। Delhi থেকে ফিরে প্রাচীন সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ স্বামী শ্রেয়শানন্দ মহরাজকে পরমপূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দ হাতজোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। উক্ত কথোপকথনের মধ্যে পূজ্যপাদ স্বামী শ্রেয়শানন্দজী হাত জোড় করে গহনানন্দজীকে প্রার্থনা করলেন—তুমি সঙ্ঘের সেবা কার্য্যে নিজেকে যে ভাবে নিযুক্ত রেখেছো তাহাতে, ছোট একটি কাজ স্মরণে থাকে না। তার জন্য আমাকে হাত জোড় করে কেন ত্রুটির মার্জনা করছো? সঙ্ঘের সেবা "ঠাকুরের সেবা" এ কথা স্বামীজি কি সকলের জন্য বলে যান নাই! এই দুই প্রাচীন সন্ন্যাসীর কথোপকথোন থেকে সঙ্ঘের পক্ষে কতখানি প্রযোজ্য আজও মনে পড়ে।

দ্বিতীয়বার বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রথম দায়িত্ব গ্রহন করে পরম পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ কাঁকুড় গাছিতে Vice President পদে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় বাঁকুড়া কেন্দ্রে দীক্ষা দানের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করেছিলাম। তাঁর উত্তরে আমাকে কাঁকুড়গাছিতে সাক্ষাতে কথা বলার জন্য ডেকেছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি আমার জীবনে উক্ত কেন্দ্রে উপস্থিত হই। আমার জামাকাপড় খুব একটা দামি ছিল না। এটি দেখে তিনি জনৈক সন্ন্যাসীকে বলে—আমার ব্যবহারের জন্য ভাল মানের ধুতি ও জামার কাপড় দেওয়া হয়।

ঐদিন পরে সময় করে কাঁকুড়গাছিতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এক সঙ্গে অধিক ভক্ত দীক্ষা পেতে পারে তার জন্য নাটমন্দিরটি ছোট। তাই খোলা স্থানে Pandel এ দীক্ষার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাই আমি করেছিলাম।

মন্দিরের সামনের খোলা স্থানে পশ্চিমদিকে ১০০ জনের অধিক ভক্তের দীক্ষা হওয়ার মতো করেছিলাম। দীক্ষার পূর্ব দিন আমাকে উনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন—সেইমতো সাক্ষাৎ করি। জনৈক ভক্ত মা দীক্ষা গ্রহণ করবেন কিন্তু তাঁর স্বামী দীক্ষা গ্রহণ করবেন না অথচ নিজ সহধর্ম্মিনীকে অনুমতি প্রদানের পত্র দিয়েছেন। এর কারণ কি? তুমি নিজে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছ? আমি বললাম, না। সেই কারণে আমাকে নির্দেশ দিলেন—উক্ত ভদ্র মহাশয় কে উনার সঙ্গে (স্বামী গহনানন্দ মহারাজের সঙ্গে) সাক্ষাতের কথা বলেন। আমি সেই ভদ্রমহোদয়কে Phone-এ মঠে আসার জন্য অনুরোধ করি ও তিনি পরম পূজ্যপাদ মহারাজের সঙ্গে একান্তে দেখা করেন। তাঁহার ফলসূত্রে ভদ্রলোক দীক্ষা গ্রহণের আবেদন করেন। পরে আমাকে মহারাজ বললেন, দেখলে—আমার সঙ্গে কথা বলে এক বাক্যে দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব

করলেন।

দ্বিতীয় বার যখন বাঁকুড়াতে দীক্ষা দানের জন্য আমন্ত্রণ জানাই তখন তিনি সম্মতি প্রদান ও বাঁকুড়া আসেন। সেই সময় দীক্ষা অন্তে তিনি জয়রামবাটী হয়ে ময়াল ইছাপুরে যান তৎপরে কাঁকুড়গাছির ফেরার কথা ছিল। ময়লা ইছাপুর, হুগলী, কেন্দ্রে গিয়ে কাঁকুড়গাছি ফেরার সময় এক সঙ্গে বেশ কয়েকখানি taxi ছিল। হঠাৎ জয়রামবাটীর অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দ মহারাজ আমাকে বললেন, আচ্ছা মহারাজের গাড়ী তো আমাদের আগে থাকার কথা কই তাঁর গাড়ী অনেক সময় থেকে দেখছি না। Wait কর। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও পরম পূজ্যপাদ মহারাজ-স্বামী গহনানন্দ মহারাজের গাড়ীর কোন চিহ্ন দেখা গেল না, ফিরে গিয়ে দেখি গাড়ীর কি অবস্থা। সত্যই ফিরে গিয়ে দেখি যে, গাড়ী বিকল হয়ে গেছে Driver ও সপ্তর্ষি মহারাজ অনেক চেষ্টা করেও কোন ফল হচ্ছে না। সেইসময় গাড়ী চালক বলে, বায়ু ভরার জন্য যে যন্ত্র (string) ব্যবহার করা হয় তা পেলে বায়ু নিষ্কারণ করলে পর গাড়ী চলবে। Torch Light জ্বেলে গ্রামে গিয়ে এক বাড়িতে বলে বায়ু ভরার যন্ত্র পাওয়া গেল কিন্তু কোন সুফল হলো না। তখন পূজ্যপাদ স্বামী অমেয়ানন্দ পরমপূজ্যপাদ মহারাজের চালক কে নিজ গাড়ীতে তুলে সামনের দিকে রওনা হলে এক স্থান থেকে গাড়ী মেরামতির একজনকে তুলে এনে গাড়ী মেরামতো করে কাঁকুড়গাছি পৌঁছাই। ঐ সময় আমি খুব ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম যে মহারাজ চক্ষু মুদ্রিত করে জপ করেই চলছেন। কোন উদ্বেগ উদবিঘ্নতা নেই। শান্ত ধীর সমাধিস্থ।

দ্বিতীয় কথা পূর্বে উল্লেখ করতে ভুল হয়েছে সে ঘটনাটি হলো তিনি বলেছিলেন এই কেন্দ্রের স্থানীয় দেব বা দেবীর প্রাচীন কোনটি? আমি এবং সমস্ত বাঁকুড়াবাসী বলেন "একেশ্বর শিব" মন্দির আছে। উনি বললেন সকাল সকাল ওখানে গিয়ে শিবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে বিকালে বাঁকুড়ায় দীক্ষায় যাবেন। উক্ত "একেশ্বর শিব মন্দিরে" শিব লিঙ্গ বা প্রতীক মন্দির গর্ভের নিচে। অনেকগুলি সিঁড়ী বেয়ে নিচে নামতে হয়। তাই ভয় হয়েছিল ঐ পরিস্থিতিতে বৃদ্ধ দীক্ষা দানের জন্য এখানে এসেছেন; কি ভাবে উনার নিচে নামা ও ওঠা সম্ভব। তাই নানাভাবে সুন্দর পরিবেশে নামা ও উঠে আসার ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন করেছিলাম তেমনি খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় রাত অতিবাহিত হয়েছিল। মন্দিরে রওনা হওয়ার সময় মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনার মনের কোন উদ্বেগ কি ছিল না? উত্তরে বলেন যে—একটুও ছিল না। এ এক চির স্মরণীয় স্মৃতিচারণা। বহু স্মৃতি আসছে আবার বিলিন হয়ে যাচ্ছে। জলে তরঙ্গায়িতের ন্যায়। উত্থান পতন নিয়ত।

একবার পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দ মহারাজ পুরুলিয়া মিশনে এসেছিলেন তখন তাঁহাকে প্রণামের জন্য পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ কেন্দ্রে যাই। ঐ দিন Prayer Hall এ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ও সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দের অনেকে উপস্থিত ছিল। তাঁর ভাষণে একটি সুন্দর মনোজ্ঞ কাহিনি উল্লেখ করেছিলেন। উক্ত কাহিনী আমি পূর্বে কোথাও শুনি নাই বা পড়ি নাই। তা নিম্নরূপঃ

মানুষ সবচেয়ে লোভী ও ইন্দ্রিয় ভোগাকাঙ্খী, সেই কারণে মানব জীবনে দুঃখ, দুঃখ, দুঃখ। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, মুহুর্তে মানুষ নির্বাসনা হবে সেই সময় আত্মজ্ঞান। ইন্দ্রিয় ভোগ কমে না উত্তরোত্তর বেড়েই চলে কারণ “অগ্নিতে ঘৃতাহুতি” প্রদানে বাসনা নিবৃত্ত কোন কালে হবে না একথা যযাতি মানব সমাজকে প্রদান করেছেন—

“ন জাতুঃকাম কামেন উপভোগেন সাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণ বার্ত্তন ভূয় এব অধীবর্ত্ততে।।”

ভগবান সৃষ্টিকর্তা চারটি প্রাণী প্রথমে সৃষ্টি করেন (১) মানুষ (২) বলদ (৩) কুকুর (৪) পেঁচা। সকলের জীবনের আয়ু সমান করে ৪০ বৎসর দান করেন। (১) বলদ গিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে অনুরোধ করেন আমার বয়স ২০ হয়ে গেছে অবশিষ্ট ২০ বৎসর বাঁচতে চাই না, সৃষ্টিকর্তা বললেন, তোমার অবশিষ্ট ২০ বৎসর যদি অন্য তিন জনে গ্রহণ করে তবে তোমার বর্ত্তমান জীবন ছুটি। মানুষের নিকট একে একে নিবেদন করায় মানুষ অন্য তিন প্রাণীর বয়স ২০ করে গ্রহণ করে ৪০+(২০ x ৩) = ১০০ বৎসর ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য বেঁচে থাকতে সম্মতো হলেন। ৪০ বৎসরের পর মানুষ বলদ, কুকুর ও পেঁচার ন্যায় শেষ ৬০ বৎসর দুঃখ ভোগ করে সেই সেই প্রাণীর সংস্কার প্রাপ্ত হয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করে থাকে।

এক মাত্র মানব শরীর ভোগ, যোগ দু’ই করতে সক্ষম। অন্য প্রাণী বা উদ্ভিদের ভোগায়ত শরীর। ঈশ্বরের সঙ্গে অর্থাৎ ভূমার সঙ্গে একীভূত হওয়ার পথ নিঃবৃত্তি মার্গ।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলেছেন “বিবেক চূড়ামণি” গ্রন্থে, এক একটি প্রাণীতে একটি ইন্দ্রিয় প্রবল তাই সে বদ্ধ হয়। মনুষ্য শরীরে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রবল সুতরাং—মানব জীবনের উদ্দেশ্যের জন্য কত সতর্কতা প্রযোজ্য তা বলেছিলেন—(১) হাতি স্পর্শ সুখে বদ্ধ (২) মৃগ-শব্দে বদ্ধ (৩) পতঙ্গ রূপে মুগ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয় (৪) মীন গন্ধে বদ্ধ (৫) ভ্রমর পদ্ম ফুলের মধুতে মৃত্যু হয়।

পরম পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দ মহারাজ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে মানুষের কত সতর্কতা প্রয়োজন তা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন ছোট্ট কাহিনির মধ্যে। স্বামীজি বলেছিলেন—বেদের যেটুকু যুক্তি, অনুভব ও ব্যবহারিক প্রয়োগ তাই পুরাণ ও ইতিহাসের

স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী নটরাজানন্দ

পূজনীয় গহনানন্দ মহারাজকে আমি প্রথম ১৯৭০ সালে দর্শন করি। আমি সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছিলাম। সেইসময় উনি ওখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন। আমার ভর্ত্তি হবার কিছুদিন পরে স্বামী সৌম্যানন্দজী সেখানে ভর্ত্তি হয়েছিলেন। পূজনীয় নরেশ মহারাজের আদেশে আমি পূজনীয় সৌম্যানন্দজীর escort হিসেবে উনাকে বেলুড় মঠ নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটাই আমার প্রথম বেলুড় মঠ দর্শন।

পূজনীয় নির্বাণানন্দজী মহারাজের আমি সেবক ছিলাম বলে পূজনীয় নরেশ মহারাজের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলাম। পূজনীয় নরেশ মহারাজের সাথে কয়েক জায়গায় যাবার সুযোগ এবং উনাকে সেবা করবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

পূজনীয় মহারাজ খুব approachable ছিলেন। সব সাধুরাই উনার কাছে কোন সমস্যার কথা জানালে তিনি খুব মন দিয়ে শুনতেন এবং সেটা solve করার চেষ্টা করতেন। উনার কাজ খুবই নিখুঁত ছিল। স্নানের বাসি কাপড়গুলো এমন ভাবে সুন্দর করে ভাজ করে রাখতেন মনে হত যেন নূতন কাচা কাপড়। আমার ব্যক্তিগত কোন সমস্যা হলে পূজনীয় মহারাজকে বললে তিনি আগ্রহ করে শুনতেন। পূজনীয় মহারাজের মধুর ব্যবহার ছিল। আমাকে সবসময় উমা উমা বলে ডাকতেন।

উনার ঠাকুর মা স্বামীজির প্রতি অগাধ ভালবাসা ছিল এবং প্রতিবার মঠে এলে পূজনীয় মহারাজ স্বামীজির ঘরে আসতেন এবং পূজনীয় সূর্য্য মহারাজকেও প্রণাম করতে আসতেন। একদিন এমন একটি ঘটনার কথা মনে হচ্ছে—

স্বামীজির ঘরের পাশেই একটা pantry ছিল। একদিন এক সাধু ওখানে বসে transistor'এ খবর শুনছিলেন। পূজনীয় নরেশ মহারাজ সে সময় স্বামীজির ঘরে দর্শনে এলে ওই আওয়াজ শুনতে পান এবং বলেন—"এটা স্বামীজির বাড়ি, এখানে তিনি সর্বদাই বিরাজ করেন। এসব এখানে বাজানো চলবে না।" বলতে বলতে পূজনীয় মহারাজ গম্ভীর হয়ে যান এবং উনার চোখ মুখ লাল হয়ে যায়। আমরা যে সাধুরা

ওখানে সে সময় উপস্থিত ছিলাম সবাই স্তম্ভিত হয়ে যাই পূজনীয় মহারাজের স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি দেখে।

পূজনীয় গহনানন্দজীর পূঃ নির্বানানন্দজী মহারাজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। তেমনি পূজনীয় সূর্য্য মহারাজের ও পূজনীয় নরেশ মহারাজের প্রতি অগাধ প্রীতি ও বিশ্বাস ছিল। উনার ব্যক্তিগত দরকার হলে পূজনীয় নরেশ মহারাজকে জানাতেন। পূজনীয় নরেশ মহারাজ যা বলতেন তিনি শুনতেন। পূজনীয় গহনানন্দজীর presence of mind (উপস্থিত বুদ্ধি) প্রখর ছিল।

ফুল তুলতে গিয়ে একবার আমার হাতে allergy হয়। সেই সময় দিন কয়েক আমার মহারাজের সেবাকাজ বন্ধ ছিল। পরে ভাল হয়ে গেলেও তখনও পুরোপুরি সুস্থ হয় নি ভেবে পূজনীয় মহারাজ আমাকে সেবার কাজ পুনরায় শুরু করতে দেননি। পূজনীয় নরেশ মহারাজ সেসময় একদিন প্রণাম করতে এসে আমাকে সেবার কাজে অনুপস্থিত দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করে সব বুঝতে পারলেন। তাপর পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম করে তিনি আমায় ডাকলেন এবং উনার সামনে আমায় বললেন—"তোমার হাতের allergy এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তুমি মহারাজের সেবার কাজ করছা না কেন?" এটা শুনে আস্বস্থ হয়ে পূজনীয় সূর্য্য মহারাজ পুনরায় আমায় সেবার সুযোগ দিলেন।

পূজনীয় গহনানন্দজী উপস্থিত বুদ্ধির আর একটি নিদর্শন। পূজনীয় সূর্য্য মহারাজ অনেকদিন সেবা প্রতিষ্ঠানে checkup'এ যান নি। তিনি হাসপাতালে যেতে চাইছিলেন না। তখন পূজনীয় নরেশ মহারাজ একটা বুদ্ধি করলেন। সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় দয়ানন্দজীর এবং পূজনীয় সূর্য্য মহারাজের মধ্যে বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা ছিল। দয়ানন্দ স্বামীর একটা স্মৃতি সভার আয়োজন হয়েছে সেবাপ্রতিষ্ঠানে। এটা পূজনীয় সূর্য্য মহারাজকে জানিয়ে পূজনীয় নরেশ মহারাজ বললেন—"মহারাজ, দয়ানন্দ মহারাজের স্মৃতিতে সেবাপ্রতিষ্ঠানে সভা হচ্ছে। আপনি উনার বন্ধু। আপনি না আসলে কি করে হয়। আপনাকে অনুষ্ঠানে যেতে হবে।" এটা শুনে সূর্য্য মহারাজ বললেন—"নরেশ ঠিক বলেছে, আমি যাব"। ওখানে গেলে পূজনীয় সূর্য্য মহারাজকে নরেশ মহারাজ বললেন—"আপনি সেবাপ্রতিষ্ঠানে এসেছেন। তাই Dr. Sen চাইছেন যে আপনার একটু medical checkup হয়ে যাক। শুনে পূজনীয় সূর্য্য মহারাজ check up করাতে রাজী হয়ে গেলেন।

এরকম আরো অনেক স্মৃতি মনে আসছে। পূজনীয় মহারাজের সেবায় আমার জীবন ধন্য হয়েছে। আজ অবধি মহারাজের কৃপা ও আশীর্বাদ অনুভব করি। জীবনের শেষ অবধি প্রার্থনা করি তা যেন আমার পাথেয় হয়ে থাকে।

গুরুভক্তি ও গুরুসেবা

স্বামী সর্বলোকানন্দ

যে কোন বিষয়ে জাগতিক জ্ঞান লাভ করতে গেলে যেমন শিক্ষকের প্রয়োজন হয় তেমনই আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য গুরু অত্যন্ত আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে রাজা মহারাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলছেন যে, চুরি করতে হলেও একজন বড় চোরের প্রয়োজন হয়, যার কাছ থেকে অন্য চোরেরা জানতে পারে বা শিক্ষা লাভ করতে পারে কীভাবে চুরি করতে হয় এবং এই আধ্যাত্মিক বিষয় এত গভীর এত দুর্বোধ্য যে তাকে জানতে হলে বা আয়ত্ত করতে হলে গুরুর প্রয়োজন অনিবার্য। গুরু ছাড়া আধ্যাত্মিক জগতে এগিয়ে যাওয়া যায় না। এই গুরুকৃপা যদি লাভ করতে হয় তবে গুরুভক্তির অত্যন্ত প্রয়োজন। অনেক সময় মনে হয় যে গুরু বা ভগবান তাঁদের স্থান কোথায়? সাধক কবি খুব সুন্দরভাবে বলছেন—'গুরু গোবিন্দ দোনো খড়ে, কাকো লাগো পায় বলিহারি গুরুকে যো গোবিন্দ দিয়ে বাতায়' অর্থাৎ গুরু এবং গোবিন্দ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন, কাকে আগে প্রণাম করব গুরুকে না গোবিন্দকে? কিন্তু সাধক কবি বলছেন যে গুরুকেই প্রথম প্রণাম করা উচিত এবং তারপর গোবিন্দকে, কারণ গুরুই কিন্তু গোবিন্দের কাছে ভক্তকে নিয়ে যান, সেইজন্য গুরুকেই প্রথম প্রণাম করা উচিত, গোবিন্দকে পরে করলেও চলবে। সুতরাং গুরুকৃপা লাভ করতে হলে ভক্তির প্রয়োজন। ভক্তি অর্থাৎ গুরুবাক্যে বিশ্বাস রাখতে হবে। গুরুবাক্যে যদি বিশ্বাস না থাকে তবে কিন্তু গুরুভক্তি হতে পারে না। সেই জন্য গুরু যা বলেন তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। শুধু তাঁর কথাতে নয়, তাঁর উপদেশে নয়, তাঁকেই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে হবে, তাহলেই কিন্তু ঠিক ঠিক গুরুভক্তি হয়। এইখানে গুরুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি কাহিনীর অবতারণা করা যেতে পারে। তার মধ্যে অনবদ্য হলো শিষ্য একলব্যের গুরুভক্তি। একলব্য ক্ষত্রিয় ছিলেন না, তিনি দ্রোণাচার্যের কাছে যান ধনুর্বিদ্যা শেখার জন্য। যখন একলব্য দ্রোণাচার্যের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন যে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা আয়ত্ত করবেন তখন দ্রোণাচার্য একলব্যকে শিক্ষা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। কারণ দ্রোণাচার্য

জানতেন যে একলব্য ক্ষত্রিয় নন এবং যে ক্ষত্রিয় নয় তাকে অস্ত্রশিক্ষা দেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি অস্ত্র শিক্ষা দিতে বিরত থাকলেন। তিনি বললেন যে, আমি তোমাকে অস্ত্রশাস্ত্রের শিক্ষা দিতে পারব না কারণ তুমি ক্ষত্রিয় নও। এই শুনে একলব্য বাড়ি ফিরে এলেন কিন্তু গুরুর প্রতি তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল। তিনি স্থির করেছিলেন, যে ভাবেই হোক তাঁকে দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করতে হবে। একলব্য বাড়ি ফিরে এসে দ্রোণাচার্যের একটি সুন্দর মূর্তি তৈরী করেন এবং দ্রোণাচার্যের মূর্তিকে সামনে রেখে তিনি ধনুর্বান শিক্ষা আরম্ভ করেন। যখন একলব্যের ধনুর্বান শিক্ষা সমাপ্ত হলো এবং তিনি ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন ও সেই কথা চারদিকে আলোচনা হতে লাগল। দেখা গেল একলব্য দ্রোণাচার্যের প্রিয় শিষ্য অর্জুনের থেকেও, বড় ধনুর্ধর হয়ে উঠছেন। তখন খোঁজ হতে লাগল কে সে অর্জুন থেকেও বড় ধনুর্ধর। দেখা গেল যে একলব্য অর্জুনকেও ছাড়িয়ে গেছে। সে শুধু গুরুর মূর্তি তৈরী করে তা সম্ভব করেছে—গুরুর প্রতি গভীর বিশ্বাস, ভক্তি এবং শরণাগত ভাব ছিল বলেই এই কার্য সম্ভবপর হয়েছে। তাই গুরুভক্তির অত্যন্ত প্রয়োজন এবং গুরুকৃপা লাভ করতে গেলে গুরুর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকা একান্তই আবশ্যক।

এই গুরুভক্তি প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথাও বেশ প্রণিধানযোগ্য। স্বামীজি বলছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ যদি ইচ্ছা করেন তবে তিনি এক মুঠো ধুলো থেকেও হাজার হাজার বিবেকানন্দ তৈরী করতে পারেন। গুরুর প্রতি অগাধ আস্থা বা বিশ্বাস থাকলেই এইরকম কথা বলা যেতে পারে। আবার স্বামীজি বলছেন যে, "আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাসস্য দাসঃ, servant of servants"—গুরুর প্রতি অশেষ ভক্তি থাকলেই এইরকম 'দাসস্য দাসঃ' ভাব শিষ্যের মনে আসে। স্বামীজি আবারও বলছেন যে আমরা ত্রিভুবন উৎপাটিত করতে পারি, আকাশ বা তারকাকে চর্বণ করতে পারি এবং আমাদের সেই সামর্থ্য আছে কারণ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের দাস। স্বামীজির, তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ গভীর আস্থা ও বিশ্বাস ছিল।

প্রকৃত গুরু কে? অনেক সময় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে প্রকৃত গুরু কে? প্রকৃত গুরু হলেন তিনি যিনি কিনা সবসময় শিষ্যের আধ্যাত্মিক কল্যাণ চিন্তা করেন। এইরকম প্রকৃত গুরুর অনেক ব্যাখ্যা শাস্ত্রে আছে। আমাদের একটা কথা সবসময় মনে রাখতে হবে যে, যাকেই আমরা গুরু বলে বরণ করি না কেন তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি যেন অটুট থাকে, যাকে বলা হয় অচলা ভক্তি। অনেক সময় দেখা যায় এইরকম ভক্তি নানা কারণবশতঃ অটুট থাকে না। তবে শাস্ত্রে বলা হয়েছে যেকোন কারণই হোক না কেন গুরুর প্রতি সর্বদা অচল ভক্তি থাকা চাই। তবেই কিন্তু শিষ্য আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

গুরু প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে। আমরা জানি যে আগে বলা হত উপমা কালিদাসস্য, উপমা সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখেছি কথামৃত পড়ে যে উপমা পাই তা কালিদাসস্য নয়। কালিদাসকে তা ছাপিয়ে গেছে সেই উপমা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উপমার সাহায্যে জটিল আধ্যাত্মিক তথ্যকে এত সহজ সরলভাবে আমাদের সকলের সামনে, মনুষ্য জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন তা তুলনারহিত। তিনি গুরু প্রসঙ্গে বলছেন—গুরু হচ্ছেন ঘটক। ঘটকের কাজ কি, পাত্রপক্ষ এবং কন্যাপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া। সেইরূপ গুরু হচ্ছেন ঘটকের ন্যায়। ভক্ত এবং ভগবানের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করিয়ে দেন বা যোগসূত্র স্থাপন করেন। এটাই হচ্ছে গুরুর কাজ এবং এটাই গুরুরা করে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন সচ্চিদানন্দই হচ্ছেন গুরু। শুদ্ধ মনই হচ্ছে গুরু। যখন আমাদের মন শুদ্ধ হবে অত্যন্ত পবিত্র হবে তখনই কিন্তু শুদ্ধ মন গুরুর মতো কাজ করতে থাকে। কিন্তু এই মন শুদ্ধ হওয়ার আগে বা শরীর শুদ্ধ হওয়ার আগে গুরুকরণের প্রয়োজন, উপদেশের প্রয়োজন এবং আদেশের প্রয়োজন। তবেই কিন্তু আমাদের উপর গুরু কৃপা বর্ষিত হতে পারে এবং যদি গুরু কৃপা বর্ষিত হয় তবেই আমরা আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যেতে পারি।

গুরুভক্তি এবং গুরুসেবা দুটোই হচ্ছে মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। যদি গুরুভক্তি না থাকে তবে কখনই গুরুসেবা সম্ভব নয়। সাধারণ ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যার প্রতি ভালবাসা নেই, শ্রদ্ধা নেই তাকে আমরা ঠিকমতো সেবা করতে পারি না। সুতরাং গুরুভক্তি হলেই গুরুসেবা সম্ভব।

গুরুসেবা অনেক প্রকারের আছে। গুরুকে আমরা অনেকভাবে সেবা করতে পারি। গুরুসেবার অনন্য উদাহরণ হচ্ছেন শিষ্য আরুণি। আরুণি গেছেন গুরুগৃহে শিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্যে। একদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে এবং গুরু আরুণিকে বললেন যে, দেখ গিয়ে ধান জমিতে আল ভেঙে গেছে এবং তুমি সেখানে যাও আল মেরামতো করে জমিতে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করো। বালক শিষ্য আরুণি জমিতে গিয়ে দেখেন যে জমির আল ভেঙে গেছে এবং জল জমি থেকে হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আরুণি মনে মনে চিন্তা করলেন যে, গুরু আমাকে যে আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং গুরুর সেই আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে। যে করেই হোক জমিতে জল ধরে রাখতেই হবে। কিন্তু আল এমনভাবে ভেঙে গেছিল তা মেরামতের কোন উপায় ছিল না। যেখানে আল ভেঙে গেছিল সেখানে তিনি নিজেই জমির আল হয়ে শুয়ে পড়লেন এবং তাঁর গোটা শরীরটা দিয়ে জমিতে জল ধরে রাখার চেষ্টা করলেন। এইদিকে গুরুদেব চিন্তা করছেন সকালে গেছে আরুণি এবং বিকাল হয়ে গেছে সে ফিরছে না কেন? সুতরাং

গুরু নিজে আরুণির খোঁজে যাচ্ছেন এবং গিয়ে দেখেন যে শিষ্য আরুণি আল স্বরূপ হয়ে সেই জমির উপর শুয়ে আছে এবং জল যাতে বেরিয়ে না আসতে পারে তার চেষ্টা করছেন। এই দেখে গুরু অত্যন্ত প্রীত হলেন কারণ গুরুবাক্যের প্রতি এত নিষ্ঠা যে গুরুর আদেশ পালন করতে গিয়ে আরুণি তাঁর নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ মনে করেছেন। তাঁর কাছে গুরুর আদেশ পালনই ছিল সব থেকে বড় কাজ।

দীক্ষিত ভক্তরা অনেকেই অভিযোগ বা আক্ষেপ করেন যে দীক্ষা নেওয়ার পর আর গুরুদর্শন পাওয়া যায় না বা গুরু দর্শন সম্ভব হয় না। কারণ গুরু অনেক দূরে থাকেন বা ভক্তরা দূরে থাকেন। এ প্রসঙ্গে দশম সংঘাধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের একটি কথা খুব মনে পড়ছে। তিনি সময় করে প্রতি বছর মুম্বাই যেতেন দীক্ষা দিতে। একবার বেশ কয়েকজন ভক্ত এসে আক্ষেপ করে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, মহারাজ আপনি তো বছরে একবার আসেন, আবার কোন কোন সময় প্রত্যেক বছর আসতেও পারেন না এবং আমরা আপনার দর্শন পাইনা ও গুরু সেবা করার সুযোগ পাইনা। তিনি তা শুনে বললেন যে ব্যক্তিগত সেবা বা গুরুর জন্য প্রণামী বা মিষ্টি নিয়ে আসাই সেবা নয়। গুরুর প্রকৃত সেবা হচ্ছে গুরুর আদেশ পালন করা এবং তাতেই গুরু প্রকৃত সন্তুষ্ট হন। ব্যক্তিগত সেবাতে গুরু খুশী হন ঠিকই কিন্তু আসল সেবা হলো গুরুর আদেশ পালন। পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বলছেন যে, “আমি দীক্ষার সময় যেসব নির্দেশ দিয়েছি এবং উপাসনা পদ্ধতিতে যে সব নির্দেশ আছে সেগুলো যদি ঠিক ঠিক পালন করতে পার তবেই সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুসেবা হবে।” গুরুকে যদি কাছে পেতে হয় বা প্রকৃত গুরুসেবা করতেই হয়; তবে তিনি যে আদেশ দিয়েছেন সেই আদেশ পালনই হবে যথার্থ গুরুসেবা।

‘গুরুগীতা’তে গুরুর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করা আছে। গুরু শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তা হলো—গু শব্দের অর্থ অন্ধকার এবং রু শব্দের অর্থ নিরোধক। অর্থাৎ যে অন্ধকারকে দূর করে, যে অজ্ঞানকে দূর করে। সুতরাং গুরুই একমাত্র আমাদের অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের আলোকে নিয়ে যান। আমাদের উপনিষদে আছে—

অসতো মা সদ্ গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাহমৃতং গময় ! ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তিঃ ! ওঁ শান্তিঃ !

হে প্রভু, আমাকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে চল, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে চল, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে নিয়ে চল। এই প্রার্থনা গুরু সর্বদা করে থাকেন ভক্তকে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। সুতরাং গুরুর যে নির্দেশ বা আদেশ সেটা আমাদের পালন করা উচিত এবং সেটাই হবে সর্বোত্তম গুরুসেবা।

এবার বলি যাকে কেন্দ্র করে এই গহন আনন্দ চিন্তন গ্রন্থ সেই চতুর্দশ সঙ্গগুরু

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজীর সান্নিধ্যে থাকাকালীন দু-একটা ঘটনার কথা এবং আমার উপলব্ধির কথা।

গুরু হিসাবে তিনি যে কত উঁচু মাপের সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তাঁর যে কতটা ভক্ত-অন্ত প্রাণ ছিল তা একটা ঘটনা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি।

প্রায়ই দেখতাম ভক্তদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ এবং কথা বলতে বলতে মহারাজের বিশ্রামের সময় পার হয়ে যেতো। সেবক সন্ন্যাসীগণ তাঁকে বিশ্রামে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে তিনি বলতেন, "বহুদূর থেকে এঁরা এসেছে। এঁদের সঙ্গে দেখা না করে আমি বিশ্রামে যাই কী করে?"

মহারাজকে দেখতাম তিনি কোনো ঘটনার আবর্তে কখনোই বিচলিত হতেন না। তাঁকে কখনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাতর হতে এবং অনুকূল ঘটনায় উল্লসিত হতে দেখিনি। "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"—গীতোক্ত শ্লোকটির মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন পূজনীয় মহারাজ। মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনচর্যাই ছিল আধ্যাত্মিকতার এক প্রতিমূর্তি।

সবসময় দেখা গেছে কাজের ব্যাপারে তিনি যেকোন প্রকার পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এত পরিশ্রম ও ব্যস্ততার মধ্যেও আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁর প্রাত্যহিক জীবনচর্চায় কোনো ক্লান্তি ছিল না।

মহারাজ শুধু ভক্তদের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা উন্মেষের কাজে ব্যস্ত থাকতেন না, তিনি তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকেও নজর রাখতেন।

সঙ্ঘগুরু হওয়ার পরে মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার জাগরণ ও তার বিস্তারকল্পে মহারাজ তাঁর মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন।

আধ্যাত্মিক জীবন কেমন হতে পারে তা তাঁকে যারা একবার দেখেছেন তাদের মধ্যে সেই অনুভূতি গড়ে উঠেছে।

Plain living and High Thinking—এই ছিল তাঁর মহতী জীবনচর্যার মূল কথা।

তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, সর্বদাই তাঁর মুখে লেগে থাকতো একটা মিষ্টি হাসি। সদাহাস্যময় এমন মহান সংঘগুরুর সান্নিধ্যে কিছুদিন থাকতে পারার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আর সেই কারণেই সেই পবিত্র জীবনের সংস্পর্শ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

কর্মযোগী স্বামী গহনানন্দজীর সঙ্গে কিছুক্ষণ

স্বামী দেবেশ্বরানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে আছি। নাম—ব্রঃ কৃষ্ণচৈতন্য। Agitation আরম্ভ হলো ১৯৮১-৮২ তে। চতুর্থ শ্রেণীর staff বেতন বৃদ্ধির দাবি নিয়ে Agitation করল। এদের সঙ্গে আছে ডেয়ারী, রান্নাঘরের কর্মী ইত্যাদি। বেশ কিছুদিন ধরে চলল, মঠ থেকেও সন্ন্যাসীরা কিছু এলেন। গহনানন্দজী এলেন প্রায় শেষের দিকে। একদিন সকালে ট্রেনে এসে পৌঁছালেন আশ্রমে। খুব কম সময় নিয়ে।

এসেই Meeting ডাকলেন সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিয়ে। সব জিনিসটা বুঝে নিলেন। টাকা-পয়সা কি আছে জানলেন। কত মাইনে বাড়ানো যাবে আলোচনা হলো। পুরুলিয়ার DM-এর সঙ্গেও কথা বললেন।

দুপুরে বসলেন সকলকে নিয়ে। Agitation যারা করেছে ১৬ জন। Leader, মনোরঞ্জন মাহাতো, শিক্ষকরা, আশ্রম কর্মী ও সাধু-ব্রহ্মচারী।

প্রথমেই মনোরঞ্জনকে, হালকা বকুনির সুরে বললেন—ভুল পথে চলেছো। যদি ভাল চাও তো ঐ পথ থেকে সরে এস। অন্যদেরও বললেন—এখনও ভুল শোধরাবার উপায় আছে। পরে কিন্তু আমাদেরও কিছু করার থাকবে না। আমাদের লিখে দাও ভুল করেছি আর হবে না। আমরা দেখছি কতটা মাইনে তোমাদের বাড়ানো যায়।

১৬ জনের মধ্যে ৬ জন বিকেলে লিখে দিল। ১০ জনকে ডেকে বোঝালেন। বললেন—আমি রাত্রে থাকবো। তোমরা সকলে তার আগে লিখে দিবে। সকালে চলে যাব। কেউ কেউ বলল আমরা ওদেরকে লিখে দিয়েছি। বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না।

তাঁর কথায় সন্ধ্যে বেলায় আরও ২ জন লিখে দিল। এবং রাত্রে আরও ২ জন লিখে দিল। বাকি ৬ জনকে ভোর বেলায় পুলিশ তুলে নিয়ে আশ্রমের বাইরে করে দিল। মাইকে ঘোষণা করে বলে দিল ঐ ৬ জন আশ্রমে আর ঢুকতে পারবে না।

মহারাজ ভোরবেলায় মঠের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন আসানসোল হয়ে ট্রেনে। পুরুলিয়ার আন্দোলন বন্ধ হলো। আর কিছু হয়নি পূজনীয় মহারাজের কর্মদক্ষতায়।

১৯৮৪ এপ্রিল মাসে পুরুলিয়া আশ্রম থেকে এসে বেলুড় মঠে আছি Posting এর জন্য। Posting এর দায়িত্বে তখন ছিলেন—স্বামী গহনানন্দজী। ৩/৪ দিন ফেরার পর দেখা হলো রাত্রি ১০ টার পর। তখনও ব্যস্ত আছেন কাজে। প্রণাম করে নাম বলতেই বললেন তোমার Posting হয়েছে নরেন্দ্রপুরে। কিন্তু যাওয়ার আগে Health Check-up করতে হবে। তুমি আগামীকাল সেবাপ্রতিষ্ঠানে যাবে, আমি থাকবো।

Health Check-up হয়ে গেল। সব ঠিক আছে। স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ (বিভূতি মহারাজ) আমাকে নিয়ে গেলেন মহারাজের কাছে দুপুর ৩টার সময়। তখন তিনি দুপুরের আহার করছেন। প্রণাম করতেই বললেন—আমি বিষ্ণুকে (স্বামী অসক্তানন্দ) বলেছি। ১০ এপ্রিল গাড়ী আসবে তোমাকে নেওয়ার জন্য। তৈরী হয়ে থাকবে। ১০ এপ্রিল ছিল রামনবমী। সেদিন নরেন্দ্রপুরে এলাম মহারাজের কৃপায়।

২০০৫-এ স্বামী গহনানন্দজী এলেন নরেন্দ্রপুরে। দীক্ষা মন্ত্র দানের জন্য। ১৯৮৫ তে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়, তখন দীক্ষা দিয়েছিলেন স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ। এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী দীক্ষা দেন ২০০০-এ। তারপর আসেন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। দীক্ষা মন্ত্র দান করেন।

ছোট ছোট দুটি ঘটনা মনে আছে। মহারাজ সাধারণতঃ মন্দিরে আসতেন সকালে। প্রণাম করতেন এবং অর্ঘ্য দিতেন। সে সময় দীক্ষা, মন্দিরেই হত। আমি মন্দিরের কাছে ছিলাম তাই আমাকে থাকতে হত সে সময়।

পূর্ব দিকে মন্দিরে ওঠার কোন সিঁড়ি ছিল না। কিন্তু মহারাজের গাড়ী মন্দিরের কাছাকাছি যাওয়া প্রয়োজন এবং মন্দিরে ওঠার জন্য একটি সিঁড়ি প্রয়োজন ছিল।

বলরাম ভবনের Hostel-এর সামনে একটি গোলাপ বাগান ছিল। সেটি তুলে রাস্তা তৈরী করা হলো এবং একটি সিঁড়িও তৈরী করা হলো যাতে মহারাজের মন্দিরে উঠতে কোন অসুবিধা না হয় এবং গাড়ীতে মন্দির পর্যন্ত চলে যায়।

একদিন মন্দিরে প্রণাম করার সময় মায়ের ছবিটি দেখিয়ে বললেন side এ ছোপ ছোপ দাগ আছে। খুব ভালো করে না দেখলে বোঝা যাবে না। তিনি কোন জায়গায় গেলে দেখতেন মন্দির পরিষ্কার আছে কিনা এবং ছবিও ভাল করে দেখতেন কোন খুঁত আছে কিনা।

সে সময় কিন্তু ছবি পরিবর্তনের কথা মহারাজ বলেন নি। দীক্ষা দেওয়ার আগের দিন রাত্রে মন্দির বন্ধ হলে পরীক্ষা করে দেখা হত A.C ঠিক মতো চলছে কিনা। মন্দির পরিষ্কার আছে কিনা। Spray করা হত যাতে কোন মশা না থাকে। কয়েকটি Fan রাখা হত যদি কোন প্রয়োজন হয়।

একটি ছোট Table তৈরী করা হলো যেটি সামনে cover দেওয়া এবং ভিতরে পা রাখা যায়। Table ছোট হলেও উপরে মহারাজের প্রয়োজনীয় খাতা বই রাখা হত।*

---

*মহারাজ এলোমেলো ভাব একদম পছন্দ করতেন না। তার চাল-চলন, কথাবার্তা, কাজকর্ম সবটাই ছিল পরিপাটি, সুন্দর ও শৌখিন।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের স্মৃতিচারণ

স্বামী চৈতন্যানন্দ

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে আমি রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুরে সাধু হতে আসি। ওখানে তখন সম্পাদক ছিলেন পূজনীয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ। কিছুদিন পর তিনি নরেন্দ্রপুর থেকে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক হয়ে আসেন। আসার সময় তিনি আমাকে গোলপার্কে নিয়ে আসেন। এখানে কিছুদিন থাকার পর পূজনীয় মহারাজ আমাকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে মেডিকেল টেস্ট করার জন্য পাঠান। আমি পূজনীয় গহনানন্দজীর (তখন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক) কাছে গিয়ে বলি, পূজনীয় লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ আপনার কাছে পাঠিয়েছেন মেডিকেল টেস্ট করার জন্য। পূজনীয় মহারাজ ওখানে উপস্থিত একজন ডাক্তারকে বললেন আমার মেডিকেল টেস্ট করার জন্য। তিনি আমার মেডিকেল টেস্ট করার পর বললেন, "সব কিছু ভাল, কিন্তু ভবিষ্যতে এর হার্টের সমস্যা হতে পারে।" পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ বললেন, "ভবিষ্যতে কি হতে পারে নিশ্চিত নয়। যখন নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না, তখন বেচারী কষ্ট করে এসেছে সাধু হতে, তাকে ফিরিয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে?" ডাক্তারবাবু বললেন, "নিশ্চিত করে বলা যায় না।" তিনি তখন একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট লিখে আমার হাতে দিলেন। সেটি নিয়ে আমি গোলপার্ক মিশনে দিয়ে দিলাম। তখন আমার মনে হল, মা যেমন সন্তানকে আগলে রাখেন, ঠিক তেমনিভাবে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ আমাকে আগলে রাখলেন। তিনি যদি আগলে না রাখতেন তা হলে আমার আর সাধু হওয়া হতো না। এখন এই সব কথা স্মরণ করলে মনে হয়ে পূজ্যপাদ মহারাজের কী অপার করুণা। আমার মতো এক অতি সাধারণ ছেলেকে যদি না কৃপা করতেন, তাহলে আমার সাধু হওয়া হতো না। তাঁকে বার বার প্রণাম জানাই, তিনি আমাকে মায়ের মত সেদিন আগলে রেখেছিলেন।

আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমি তখন বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে

উদ্বোধন পত্রিকার কাজ করছি। পূজ্যপাদ মহারাজ মাকে প্রণাম করতে এসেছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আমাকে বললেন, "তুমি ঠাকুর-স্বামীজীর কথাগুলি সঙ্কলন করে একটি স্মৃতি-শাস্ত্র লেখ।" আমি সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে বলি, "মহারাজ, আমি এর উপযুক্ত নই।" মহারাজ বললেন, "তুমি চেষ্টা কর, আমরা দেখে দেব।" আমি আজ ভাবতে পারি না, একজন সাধারণ সাধুর উপর তাঁর কি আস্থা! কি বিশ্বাস!

আরও একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমি তখন রহড়া আশ্রমের ছোট ছেলেদের হোস্টেলের ওয়ার্ডেন হিসাবে ছিলাম। সেখানে অনাথ ছেলেদের রাখা হয়। আমি একটু কড়া ছিলাম। আমি নজর রাখতাম, ছাত্রদের যাতে অনাথ বলে না মনে করে হোস্টেলের শিক্ষকরা। তাদেরকে চাকরের মতো কাজ না করায় বা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করে। শিক্ষকরা আমাকে ওখান থেকে সরানোর জন্য বেলুড় মঠে চিঠি লেখে। রহড়া আশ্রমের তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন স্বামী রমানন্দজী মহারাজ। বেলুড় মঠ থেকে তাঁর কাছে চিঠি আসে। তিনি খোঁজখবর নিয়ে বেলুড় মঠকে জানান যে সব অভিযোগগুলি বানানো ঘটনা—ভিত্তিহীন। যাই হোক, এর কিছুদিন পর পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ আমাকে কামারপুকুরে পাঠান। সেখানেও কিছুদিন থাকার পর আমাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমি তখন ঋষিকেশে চলে যাই তপস্যা করার জন্য। কিছুদিন পর বেলুড় মঠ থেকে চিঠি আসে আমাকে মঠে ফিরে যাওয়ার জন্য। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে আমি বেলুড় মঠে ফিরে আসি। পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ তখন প্রধানকার্যালয় ছিলেন। তিনি আমাকে স্নেহভরে বললেন, "খুব রোগা হয়ে গেছ। খেয়েদেয়ে মোটা হও, তারপর কথা হবে।" এরপর তিনি আমাকে বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। আজও মহারাজের আমার প্রতি স্নেহের কথা মনে পড়ে।

যে মহান তাপসের সংস্পর্শে...

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

যে মহান তাপসের সংস্পর্শে এসে তাঁকে কাছ থেকে এবং দূরের থেকে দেখে ও নৈতিক শিক্ষালাভ করে আমি আমার আধ্যাত্মিক জীবনে লাভবান হয়েছি, সেই পরম পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হয়। তখন আমাদের মধ্যে আর সময় জ্ঞান থাকে না। অফুরন্ত তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এবং জীবন-চরিত। এসব শুনলে অপরের ও কল্যাণ হতে পারে এই ভেবে আমাদের স্নেহভাজন এবং পূজনীয় মহারাজের অন্যতম সেবক অরবিন্দ (ব্যোমাত্মানন্দ) মহারাজের অনুরোধ ক্রমে সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা এবং উপদেশ এই নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করা হলো।

৪২ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৬৮ সালে চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশনে প্রথমবার যখন গিয়েছিলাম তখনই পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের জনৈক পূর্ব আশ্রমের আত্মীয় থেকে জানতে পেরেছিলাম ঐ নামে বেলুড় মঠে একজন মহারাজ আছেন এবং জন্মস্থান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেশে অর্থাৎ সিলোটে ইত্যাদি। তার দশ বছর পরে গৌহাটি থেকে (১৯৭৮ সালে) বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারীদের ট্রেনিং সেন্টারে যাবার পরে প্রথম তাঁর শ্রীপদ দর্শন করেছিলাম। তাও একটি বিশেষ ঘটনা ক্রমে।

সেই সময় (১৯৭৮ সালে) আমি সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রেমানন্দ ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলাম চোখের চিকিৎসার জন্য। ১৩ দিন ছিলাম। পরপর দু'দিন তারিখ-সময় ঘোষণা করেও চোখের অপারেশন হচ্ছিল না। ঐ দু'দিন সকাল থেকে অন্য উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। সেই সময় একদিন সকালবেলা Ward round-এ এসে স্মিত হাস্যে পূজনীয় মহারাজ বলেছিলেন—ট্রেনিং সেন্টারের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে এখানে পড়ে রয়েছি। সেই সঙ্গে তাঁর পাশের ডাক্তারকে বলছেন 'ওকে ২/৪টি ট্যাবলেট দিয়ে ছুটি দিয়ে দাও।" পরে তাঁর সামান্য কথাটি অসামান্যরূপে দেখা দিল। অর্থাৎ আমার চোখ ভাল হয়ে গেল।

শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ অনুযায়ী সবসময় একটি কাজ নিয়ে থাকতে গিয়ে সঙ্গীত রচনার দিকে আমার ঝোঁক এল। সময় সুযোগ পেলেই এই কাজে হাত দিতাম। সেই সঙ্গে সেই সময় সঙ্গীত জগতের বেরসিকদের সুললিত কণ্ঠের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের ধারাবাহিক শুনছিলাম। তার মধ্যেই একদিন সাহস করে সটান পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের কাছে গিয়ে এর প্রতিকার চাইছিলাম। তিনি তখন সস্নেহে অভয় দান করে বলেছিলেন, এটি ঈশ্বর সাধনার অঙ্গ। সঙ্গীত রচনা ও সঙ্গীত চর্চা দুটিরই প্রয়োজন। অপরের কথা না শুনে এই ধারা অক্ষুন্ন রাখতে হবে। এতে মন ঠিক থাকবে। মন বে চালে পড়বে না।—ইত্যাদি।

অন্য একদিন সহাস্যে বলছেন—কই, তোমার সঙ্গীত তো দেখালে না। তার ২/৪ দিন পরে ভাগ্যক্রমে নিম্নোক্ত দুটি সঙ্গীত কবিতা আকারে শুনিয়াছিলাম। যদিও সঙ্গীত দুটি একাধিক "রাগ ও তাল"-এর উপর নিবদ্ধ হয়েছিল। সেদিনের সকালবেলা তিনি যখন সঙ্গীত দুটি কবিতা আকারে শুনছিলেন, তখন তিনি চোখ বন্ধ অবস্থায় খাটের উপর আসন করে বসেছিলেন। মুখে সেই চির পরিচিত বিজয়ের প্রসন্নতার হাসি, ভাবস্থ্ বলে মনে হলো। তাই তাঁর ধ্যানে বিঘ্ন না ঘটিয়ে পাঞ্চমাঙ্গ প্রণাম করে নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে চলে এলাম। তাঁর সেই ধ্যান গম্ভীর চিত্রটি এখনো আমার মনে জীবন্ত। সঙ্গীত দুটি হলো :-

(১)

(হায়!) ও মন পাগল কেন ধরায় এয়েছিস বল?
(ওরে) ভব-সিন্ধু পার হবি তো মাতৃনামে বল
বারেক মাতৃনামে বলরে মন, মাতৃনামে বল।।
ঐ একটি নামেই পার পেল যে যত ভক্তজন,
মায়ের নামে চলছে ধেয়ে দেব গ্রহগান
(ওরে) দেখ না চেয়ে কী যাদু ঐ নামেতে কেবল।।
(শুধু মাতৃনামে চলারে মন, মাতৃনামে চল।)
নয়ন থামতে দেখনা চেয়ে কে তোর আপন,
নিজের আপন ছেড়ে বেড়াস কন্টক-কানন।
ওরে হেথা সেথা ঘুরিস যা তোর জীবন হবে বিফল।।
(শুধু মাতৃনামে বলরে মন, মাতৃনামে চল)
ভজন-সাধন ছেড়ে রে মন, পাবি না ঐ রত্ন ধন।

ঘুমের ঘোরে থাকলে রে মন, হারাবি ঐ পরম জন।।
(ওরে) সাঙ্গ হলে ভব-বিলাস দেখবি মায়ের চরণ তল।।
(শুধু মাতৃনামে চল রে মন, মাতৃনামে চল।)

(২)

বঙ্গে যেদিন করুণাপ্লাবনে ভাসালে দেবী সারদামণি।
গাইলা সবে সেকি আনন্দে, আনন্দময়ীর প্রেম আগমনী।
ঘোষিল জগতে নবীন আলোতে সারদারূপে বেদমূরতি।
তাপদগ্ধ অভয়চিত্তে, লাভিলা শরণ শকতি ভকতি।।
মুছে গেল যত হিংসার বাণী, মুছে গেল মানব গরিমা গ্লানি
প্রণাম লহ রামকৃষ্ণ-পূজিনী, দাও হে স্মরণে মরম বাণী।।
পঞ্চতপায় বিজয়িনী তুমি, সুপ্ত মনে দিলে নব শিক্ষা
শিথিল মানবে করিয়া কৃপা, দিয়াছ জগতে ত্যাগের দীক্ষা।।
তোমার জ্যোতির ধারায়, মলিন যত গ্রহ-তারা-শশী।
বিশ্বজননী শ্যামানন্দিনী, প্রচারিলে মাতৃভাব দিবানিশি।।
মুছে গেল যত হিংসার বাণী, মুছে গেল মনের গরিমা গ্লানি।
প্রণাম লহ রামকৃষ্ণ-পূজিনী, দাও হে স্মরণে মরণ বাণী।।

১৯৮৭ সালে গুজরাটের রাজকোটে বদলি হয়েছিলাম বাগবাজার মায়ের বাড়ি থেকে। মঠ থেকে যাত্রা শুরুর আগে তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। তখন তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—"যখন যেখানে থাকবে, সেখানের ভাষা শিখবে। কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানবে। এতে তোমার কাজের পক্ষে ভাল হবে।" উল্লেখ্য, তিনি নিজেও অনেকগুলো ভাষা জানতেন। আপনি আচরি জীবেরে ধর্ম শিখায়।" তাই তিনি আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন।

একবার গৌহাটিতে তাঁর অবস্থান কালে প্রাতঃ প্রণামের সময় হঠাৎ প্রশ্ন করছেন—"হঙ্কর দেবের" (শঙ্করদেব আসামের যুগ পুরুষ, ধর্মস্থাপক জীবনী পড়েছি কিনা। না পড়ে থাকলে পড়ে নিতে ইত্যাদি। অন্যদিন কথা প্রসঙ্গে বলছেন—"বক্তৃতা দিতে গেলে প্রথমে স্থানীয় দেব-দেবী, ধর্মীয় আচার্য্য, গুণীজনের কথা বলবে। ঐ বক্তৃতার শেষাংশে ঠাকুর, মা ও স্বামীজির প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলে এটি মনোগ্রাহী হবে। তখন ১৯৯০ সাল।

শিকড়া কুলীন মঠে থাকাকালে তিনি একটি অভিনব শিক্ষা দিয়েছিলেন। বিষয়টি অতি ছোট কিন্তু অত্যন্ত সংবেদনশীল। এক গ্লাস খাবার জল দিতে গিয়ে আমাদের ভুল হয়েছিল। সচরাচর যেভাবে দেওয়া হয়, সেই ভাবেই দেওয়া হচ্ছিল। পূজনীয় মহারাজের মতে জলের গ্লাসে (কাঁচের) হাতের আঙ্গুলের দাগ থাকবে না। পরিশ্রুত জল। গ্লাসে ঢাকনা থাকবে। সেটি ছোট ছোট প্লেট হবে। আবার গ্লাসের নীচেও অপেক্ষাকৃত সামান্য বড় প্লেট হবে। তারপর সেটি বসাতে হবে ছোট ট্রের উপর। পরিস্কৃত ঐ ট্রের উপরে জলের গ্লাসের কিনারে ছোট একখানা তোয়ালে থাকবে। যাতে জল খাবার পর মুখ মুছা যায়। ইত্যাদি।

অন্যদিন আরো একটি বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। একবার পূজনীয় মহারাজের হাতে মুখশুদ্ধি দিয়েছিলাম। আমার এই সামান্য ভুলের জন্য তিনি বিরক্ত প্রকাশ না করে বলছেন "এটি আগে থেকে ছোট প্লেটে সাজিয়ে রাখতে হয়।" অবশ্য এরূপ ভুল আর হয় নি। ২০০৩ সালের ঘটনা এটি। সবসময় সেবার ভাব নিয়ে কাজ করতে হয়। এতে চিত্তশুদ্ধি হয়। অরুণাচল প্রদেশের নরোত্তম নগর মিশনে কোন এক ঘটনার জন্য এই কথাটি আমাদের বলেছিলেন। ঐখানেই প্রঃ মঃকে বলছেন— "তুমি তো কর্মীদের প্রাপ্য টাকা মঠ ও মিশনের পক্ষ থেকে দিচ্ছ। তা দিতে গিয়ে বারে বারে মেঝেতে ফেলে দিচ্ছ। এতে বয়স্ক কর্মীরা তা কুড়োতে গিয়ে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েন। তাঁদের কোমরে চোটও লাগতে পারে। অনাদরে দেবে কেন? কর্মীরা ভাববেন—এটা মঠ ও মিশনের ট্র্যাডিশন। এরূপ যাতে না হয়, তার জন্য আগে থেকে গুছিয়ে রেখে হাতে হাতে দেবে সেবার ভাব নিয়ে। যাতে তাঁদের মতে এ নিয়ে কোন ক্ষোভ না থাকে। ঠাকুর, মা ও স্বামীজি আমাদের অনেক দেবেন। আমাদের দেখে সাধারণ মানুষের মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া, যাতে সৃষ্টি না হয় তা আমাদের দেখতে হবে। এসব, আমাদের মনে রাখা উচিৎ। ইত্যাদি। ১৯৮৮ সালের এটি একটি ঘটনা।

পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ বিশৃঙ্খল জীবন পছন্দ করতেন না। রাজস্থানের জয়পুর মিশনে প্রণামের সময় এটা দেখে বিধান দিলেন according to seniority-প্রণাম হবে। ২০০২ সালের ঘটনা এটি।

প্রণাম বা নমস্কার পর্ব সর্বত্রই দেখা যায়। লক্ষ লক্ষ লোক প্রণাম করছেন। একমাত্র পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের প্রণামের পদ্ধতি সঠিক। শাস্ত্র সম্মতো। এ স্থলে তাঁর সাষ্টাঙ্গ প্রণামের কথা বলা হচ্ছে। এটি সর্বোত্তম প্রণাম। শাস্ত্রে আছে-

"পড্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চৈব প্রণামোহষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ।।"

—তন্ত্রসার। পুরোহিত-দর্শন, পৃঃ ৪৫

—অর্থাৎ হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক চক্ষুদ্বয়, বাক্য ও মন সহযোগে যে ভক্তিপূর্ণ ভূলুণ্ঠিত (দণ্ডবৎ) প্রণাম তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।

সূত্রঃ—অর্থ প্রণাম পর্ব। পৃঃ **১১-১২**, প্রকাশক **:** নরেন্দ্রপুর।

১৯১১ সালে ত্রিপুরার ধর্মনগরে মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে আমি পূজনীয় মহারাজের কাছে ছিলাম। অপরের আনন্দ দানের জন্য আমার অপরিসীম খাবার কথা জানতে পেরে তিনি আমাকে বলছেন—এভাবে খেলে একদিন না একদিন শরীর খারাপ করবে। তখন সাধন-ভজন কিছুই পারব না। আরো বলছেন যে, ক্যালোরি ঠিক রেখে খেলে শরীর ও মন দুটিই ঠিক থাকবে। এতে জপ-ধ্যানের কোন বিঘ্ন ঘটবে না। চেষ্টা কর। ইত্যাদি।

পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের কর্ম বহুল জীবনে এরূপ বহু ঘটনা আছে, যা আমাদের সহজে আকৃষ্ট করে থাকে এবং প্রভূত আনন্দ দিয়ে থাকে। তাঁকে যথাযোগ্য প্রণামাদি জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

হরি ওম্ তৎসাৎ

গহন গভীরে গহনানন্দ

স্বামী সুপর্ণানন্দ

বাইরে থেকে দেখেও তাঁকে কখনও গভীর, গহন বলে মনে হোত না সবসময় মুখে হাসি নিয়ে কথা বলছেন। স্নিগ্ধ, শান্ত, উজ্জ্বলগৌরবর্ণ গহনানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন; স্বামীজি প্রবর্তিত কর্মকে সেবাযোগে পরিণত করার ব্রতে তন্নিষ্ঠ ছিলেন। তিনি পান্ডিত্যের চর্চা করতেন না; জ্ঞানের চর্চা করতেন আর ভক্তিভাবনা এবং শরণাগতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। সেই ভাবটিই সর্বত্র প্রচার করতেন : 'কর্ম কর স্বামীজির আর ঠাকুর-মায়ের শরণাগত হয়ে থাক'। অন্য কোন জ্ঞানগর্ভ উপদেশ তিনি খুব একটা দিতেন না, বিশ্লেষণাত্মক বা বিতর্কবিজড়িত দুরূহ তত্ত্বকথার অবতারণা করতে দেখতাম না। সহজ কথায় সবার মনে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় কথা গেঁথে দিতেন; আধ্যাত্মিক জীবনগঠনের জন্য যেগুলি বড় প্রয়োজন সেই ভক্তি, জপ, ধ্যান, আত্মনিবেদনের কথা বলতেন। এগুলিই তাঁর অন্তর জুড়ে মনের গভীরে বাস করতো। বাইরে গুরুগম্ভীর আলোচনা তাঁকে করতে হয়নি; প্রয়োজনও হয়নি। কিন্তু তিনি সহমর্মিতা (empathy) নিয়ে, শরণাগতির ভাব নিয়ে মানুষের দুঃখ দুর্দশার লাঘব করে গিয়েছেন। সবাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন এসব ক্ষেত্রেও তিনি লেগে থাকতেন। ধৈর্য ধরে থাকতে বলতেন। দেখাও যেত, সুন্দর সমাধান ও হয়ে গেছে। অনেক ভক্ত, সাধু তাঁর এই সনাতন কৃপা ধারায় স্নাত হয়েছেন, স্নিগ্ধ হয়েছেন। দিশেহারা অনেক যুবক তাঁর কৃপায় দিশা খুঁজে পেয়েছেন। বলা যায়, দিশা তিনিই খুঁজে দিয়েছেন। গভীর, গহন হলেও তাঁর মনটি, মানুষের অসুবিধার, দুঃখের প্রতি অসীম সহানুভূতিশীল ছিল। সেজন্য তিনি হয়তো অপ্রিয় ছিলেন; কিন্তু তাতে তাঁর কোনো দুঃখ ছিল না। মানুষের কল্যাণ করতে পেরে তিনি আনন্দিত হতেন। নিজে যেমন ধৈর্য ধারণ করতেন, তেমনি অন্যদেরও ধৈর্য ধরে পড়ে থাকতে বলতেন। ফলে, শুভফল পাওয়া যেত। এ পথ প্রাচীন পন্থীদের এবং তিনি এ পথের নির্ভিক, হয়তো বা একাকী পথিক ছিলেন। সাধুতার সঙ্গে তাঁর জীবন ভালবাসা এবং ধৈর্যযুক্ত হয়ে তাঁকে অমরতা দান করেছে। ছোট ছোট অনেক

ঘটনা মনে পড়ে। সবঘটনাই তাঁর ঠাকুর- মা-স্বামীজির উপর নির্ভরতার ঘটনা। সব মিলিয়েই তিনি মহান শেষে সর্বোচ্চ পদে মাধুর্যস্বরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারার দু-চারটে প্রসঙ্গ তুলে ধরব।

১৯৮০ সালের অক্ষয় তৃতীয়া তিথি পড়েছে ১৭ই এপ্রিল। স্বামী মুমুক্ষানন্দজী সে সময় Brahmachari Training Cenrtre এর Principal। এই দিনে TC এর প্রতিষ্ঠা হয়। সেজন্য তিনি স্বামী বন্দনানন্দজীকে, গহনানন্দজীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বক্তৃতা দেবার জন্য। সঙ্গে ছিলেন বেদান্তানন্দজী। এঁরা সবাই বলেছিলেন। আমরা শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারী-শ্রোতা। গহনানন্দজী তাঁর ধ্রুপদী বক্তৃতা পরিবেশন করলেন। এখনও ৩৮ বছরের ব্যবধানে উজ্জ্বল হয়ে ভাসছে সে ছবি—চোখের সামনে। কী বলেছিলেন সেদিন? বলেছিলেন :

১। দুবছরের জন্য সবরকম কাজ থেকে ছাড়িয়ে এনে তোমাদের জীবন গঠনের জন্য আনা হয়েছে এখানে। এ এক মহা সুযোগ। এর সদ্ব্যবহার করতে হবে। জপ, ধ্যান, কাজকর্ম যা এখানে মাসে মাসে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে তা করবে। শুধ খাওয়ার জন্য সময় নষ্ট করো না। মা ঠাকরুণকে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ছেলেদের বেশি খাবার (রাত্রে) দেওয়া অনুযোগ করেন। এ কথাটি মনে রেখ। আর মনে রেখ, মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সাধুচিন্তা বিগর্হিত আলোচনা শুনে মাস্টারকে তিরস্কার করেছিলেন। প্রত্যেকটি মুহূর্ত সৎ ব্যবহার, সৎ চিন্তায় কাটবে।

২। সাবধান থাকবে মন কি চায় সত্যি সত্যি সে বিষয়ে। অনেকে ভাবছ—এখানে এসে আমাদের মন খুব উঁচুতে উঠে গেছে, আর নিচুতে নামতেই চায় না। আর কাজকর্ম ভালোই লাগে না। এরকম ভাবনা বিপজ্জনক। ঠিক ঠিক জীবন তৈরী হলে, এখন যা করছ তার দশগুন কাজ বেশি করতে পারবে অথচ মহা আনন্দে থাকবে সর্বক্ষণ। এর বিপরীত হলে তোমাদের জীবন রামকৃষ্ণ মুষায় দ্রুত হয়নি। পূজনীয় নির্মল মহারাজ (মাধবানন্দজী) চাইতেন- আমরা ব্রহ্মচারীরা যেন তাঁর সঙ্গে কথা বলি, মিশি। স্বামীজি খুশি হবেন—কেউ যদি কাজ করতে করতে মরে যায়। কিন্তু সত্যই কি তাই! জপধ্যান না হলে কাজতো ঠিক হবে না। মহাপুরুষের কথা এটি। এসব কথা আমরা তোমাদের বলে না গেলে তোমরা জানবে কী করে? সুতরাং বহির্মুখী না হয়ে এ দুবছর আবৃতচক্ষু হয়ে থাক। মনে রেখ—মা-বাবাকে কাঁদিয়ে এসেছ। তাঁদের খুশি কর। কল্যাণ কর। তাঁরা তোমাদের সাধুজীবনের কথা স্মরণ করে আনন্দ পাবেন। তোমরা যে ভগবানের চিন্তা করছ! কারুর কাছে হাত পাতবে না। এ শিক্ষা শ্রীমার কাছ থেকে পাই। শতদুঃখের মধ্যে পড়েও কারুর কাছে হাত পাতেন নি। মনটাকে

ঠিক কর। মঠবাসের সুযোগ আমাদের হয়নি। তোমাদের সৌভাগ্য, বড় সৌভাগ্য। মা, ঠাকুর, স্বামীজি এরা প্রত্যক্ষ এখানে বাস করছেন। বাবুরাম মহারাজ চলে যাচ্ছিলেন। ঠাকুর গলায় গামছা দিয়ে টেনে এনে বলেছিলেন, কোথায় যাচ্ছ, চাঁদ? যেখানে রাখব, সেখানে থাকবে। এই কথা। আর আড্ডা ভয়ানক সর্বনেশে। ভক্তদের দেওয়া ভিক্ষান্ন থেকে সাধুদের অন্নবস্ত্র জোটে, তাঁরা এসব দেন পুণ্যের জন্য। তোমরা অজান্তেই ঋণে জড়িয়ে পড়েছ। তাদের ঋণশোধ করার জন্য ভাগবদজীবনকে উন্নত কর, বেশি উন্নত কর যাতে ঋণশোধের পর কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। কত সম্মান পাই দেখেছ তো ! আর ভাবছো না কেন—কী গুণ আছে আমাদের? ব্যক্তিজীবন গড়ে তোল। এই দুবছর খবরের কাগজের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখবে না। ঠাকুর একে পুতিগন্ধময় বলে ত্যাগ করেছিলেন। যেখানে খবরের কাগজ থাকত সেখানটিকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পবিত্র করতেন। correspondance বাদ দাও।

৪। কেদারবাবু (অচলানন্দ) বলতেন, গুরু নির্দেশ দিতেন—যা ফুল নিয়ে আয়, গুরু পুজো কর, অধ্যক্ষকে পুজো কর। অধ্যক্ষের আদেশ মেনে চলিস। আজ আমাদের অধ্যক্ষ ডাকলে বলি, জপধ্যান হয় না। কিন্তু ভাববে জপ-ধ্যান আজ হলো না তেমন। তাতে কী? মনে মনে জপ চলবে। এইবোধটা থাকলেই হবে।

দেখা হলেই বলতেন 'ভাই, মনে আছে তো? তোমাদের মুখ দেখে যেন বুঝতে পারি—আলোর আভাস এসেছে। আজ সত্যযুগের উৎপত্তি। তোমাদেরও উৎপত্তি। তোমাদেরও জন্ম আজ। কী মনে হয় জান ? আন্তরিক বলছি। মনে হয়, ডেকে বলি, ওহে সব ঠিক চলছে না। ভুবনেশ্বরে দেখেছি—সূর্য মহারাজ খুব Early Riser। মঙ্গলারতি সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা গড়ে উঠেনি। একজন বলল, মহারাজ মঙ্গলারতির জন্য উঠে কী করব? সে থাকতে পারল না। আগ্রহ নিয়ে এসেছ—অবহেলা করে সময় নষ্ট করো না। আন্তরিক হও। তোমরা শুভ সংস্কার নিয়ে এসেছ, স্থূল জাগতিক অসুবিধা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আসল লক্ষ্যের দিকে মন দাও। সংকল্প নাও। আগে দুঃখ ছিল, কষ্ট ছিল, নানান্ অসুবিধা ছিল। কিন্তু আনন্দ ছিল। আমরা তো তার মানুষের প্রতিলিপি! একি কম কথা! আমাদের জীবনে তিনিই তো প্রতিফলিত হবেন। পবিত্রতার মূর্তি। এভাবেই জীবন গঠন করতে হবে আমাদের।

আর একটি বক্তৃতা করেছিলেন **১৯৯২** সালে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহেই দেওঘরে। Apex Bady of the Alumni of Ramakrishna Mission অর্থাৎ সর্বভারতীয় রামকৃষ্ণ মিশন প্রাক্তন ছাত্র সংঘ নামে একটি Central Organisation এর উদ্বোধন উপলক্ষে অনেক বিখ্যাত সাধু এসেছিলেন। যেখানে যেখানে রামকৃষ্ণ

মিশনের স্কুল, কলেজ, ছাত্রাবাস আছে সেখান থেকে প্রতিনিধিরা (সাধু সহ) এসেছিলেন। স্বামী সুহিতানন্দজী তখন দেওঘরের সচিব। তাঁরই আহ্বানে সবাই গিয়েছি। আমি তখন নরেন্দ্রপুরে। সে এক সাধুর মেলা। দেওঘর আমাদের মিশনের প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলে Apex Body এখান থেকেই শুরু হবে। পূজ্য গহনানন্দজীও এসেছিলেন এবং ছেলেদের উপযোগী এক সুন্দর ভাষণ দিয়েছিলেন। সে ভাষণটি আমরা সবাই রুদ্ধশ্বাসে শুনেছিলাম। ছাত্রভাইরাও শেষটি জানবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। আর মহারাজও suspense create করে করে বলছিলেন। বক্তৃতাটি একটি গল্পের মোড়কে ঢাকা ছিল। ট্রেন যাত্রায় একই reserved কামরায় দুজন যাত্রী—একজন ব্যবসায়ী কিন্তু প্রচণ্ড বুদ্ধিমান; অন্যজন একজন বিখ্যাত চোর। সে জানে ব্যবসায়ীর কাছে প্রচুর টাকা আছে। সেগুলি হাতিয়ে নিতে হবে মাঝরাত্রিতে। দুজনেই রাত ৯টা নাগাদ খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়বে বলে ভাবছে; কিন্তু পারছে না। এরকম একটি জায়গায় দুজন যাত্রীকে রেখে পূজনীয় মহারাজ ছেলেদের উদ্দেশ্য করে বললেন—ট্রেন চলছে। এদিকে ১৮৬৩ সালে সিমলায় নরেন্দ্রনাথের জন্ম হলো। বড় দুষ্টু ছেলে। তাকে সামলানো দায়। ধরতে গেলে আস্তাকুড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; চাঁপা গাছে দোল খায়। ব্রহ্মদত্যির কথা শুনে হাসে; আরও দোল খায়। এদিকে ট্রেন চলছে। একসময় ব্যবসায়ী তার সহযাত্রীর চোখের সামনে নোটের তাড়াগুলি বের করে গুনতে লাগল। গুনছে তো গুনছেই। শেষে গোনা শেষ হয়ে গেলে সেগুলিকে বিছানার তলায় রেখে দিল। চোর যাত্রী সব দেখছে। কিন্তু ব্যবসায়ী জেগে আছে বলে কিছু করতে পারছে না। অনেকক্ষণ পর চোর Bathroom গেল—বিরক্ত হয়েই। সে ফিরে আসতেই ব্যবসায়ীও টয়লেটে গেল। একেবারে খালি গেঞ্জি গায়ে। ট্রেন চলছে। চোর শিহরিত, কাঁপছে উত্তেজনায়। ওদিকে বিলে, বীরেশ্বর বড় হয়েছে; কলেজে গিয়ে শিক্ষকের কাছে শুনেছে দক্ষিণেশ্বরের পাগল ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। তাঁর নাকি মুহুর্তে মুহুর্তে সমাধি হয়। তিনি গেলেন দেখতে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখেই তো থ। এ কাকে দেখছি? সপ্তর্ষির ঋষির স্তব করছেন, হে নরঋষি নারায়ণ, তুমি জীবের দুঃখ ভার দূর করার জন্য এসেছে...ট্রেন চলছে। ব্যবসায়ী toilet সেরে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল এবং ঘুমিয়ে পড়ল। নাক ডাকছে তার। কিন্তু চোর তো ঘুমুতে পারছে না। সে ভাবছে—একি রকম লোক। এতগুলো টাকা নিয়ে যাচ্ছে, অথচ নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। লোকটি কি বুঝতে পারছে না যে সে একজন বুদ্ধিমান, ধূর্ত চোর।

ট্রেন চলছে। স্বামীজির জীবনও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন নরেন্দ্রনাথ, কিন্তু মা কালীকে মানেন না। ব্রাহ্মসমাজের সদস্য কিনা! সেখানে যে মূর্তিপূজা নেই। ঠাকুরের গভীর চিন্তা। নরেন্দ্র রামকৃষ্ণকে মানছে; কিন্তু রামকৃষ্ণের মা অর্থাৎ স্বয়ং কালীকে সে ঘৃণা করে! কিভাবে করে নরেন কালী মানবে, মা? সুযোগ

এসে গেল। নরেনের বাবা বিশ্বনাথ দত্ত মারা গেছেন—সংসারে দারিদ্র্য। অসহনীয় অবস্থা। আধপেটা খেয়ে, না খেয়ে নরেনের দিন কাটত। শেষে ঠাকুরের কৃপায় নরেন কালী মানলেন। দারিদ্র্যও দূর হলো। ট্রেন চলছে। কলকাতা থেকে মুম্বাই। একরাত্রি গেল। সকাল হোল। ব্যবসায়ী toilet-এ গেল, ফিরে এল। টাকা তো নিয়ে যায় নি। চোর সহযাত্রী হতবাক্। দিন গেল রাত এল। আজ চোর একটা হেস্ত নেস্ত করে ছাড়বে। ঘুমুতে যাবার আগে ব্যবসায়ী আজও রাত্রে টাকা বের করে গুণে দেখেছে। এবং সে তা করেছে তারই সামনে। লুব্ধদৃষ্টিতে দেখে যাওয়া ছাড়া সে আর কি করতে পাবে ?

এদিকে ট্রেন আপন গতিতে ছুটছে। স্বামীজির জীবনে ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটল পুরোমাত্রায়। কিন্তু তারপরেই ঠাকুরের গলায় Cancer ধরা পড়ল। নরেন্দ্রনাথ সেবা করছেন অনন্যমনে। এমনই তাঁর ভক্তি ঠাকুরের ওপর যে, তিনি ঠাকুরের গলার ক্ষতের পুঁজ রক্ত মিশ্রিত কফের বাটি সবার সামনে গলায় ঢেলে দিলেন। কী জ্বলন্ত বিশ্বাস, আত্মনিবেদন ! ! ! সবাই অবাক, বিহ্বল। নরেনের গুরুভক্তি এযুগের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। ঠাকুরের শরীর চলে গেল কাশীপুরে। স্বামীজি গুরুভাইদের সবাইকে বরানগর মঠে এনে সন্ন্যাস নিলেন। শ্রীমায়ের কৃপা পেলেন। নূতন সন্ন্যাসী সংঘ তৈরী হলো—যার উদ্দেশ্য আত্মমোক্ষ এবং জগৎহিত। কল্যাণকর্মে সন্ন্যাসীরা নিযুক্ত থেকে আত্মমুক্তি বা ভগবান লাভ করবেন তাঁরা। ...ট্রেনও প্রায় গন্তব্যস্থলে চলে এসেছে। ব্যবসায়ী টাকাগুলি নিজের বালিশের নিচ থেকে বের করে গুণে ব্যাগে রাখল। চোর এই সব দেখছে সতৃষ্ণ নয়নে। ব্যাপারটা তার কাছে কিছুতেই বোধগম্য হলো না। ট্রেন স্টেশনে ঢুকছে। এবার চোর জোড় হাত করে ব্যবসায়ীকে বলল, মশাই, আমাকে একটা রহস্যের সমাধান করে দেবেন? বল কি তোমার রহস্য ?—আপনি কি Magician?—না, আমি সাধারণ—অতি সাধারণ মানুষ। তবে ধর্মভীরু, দেবদ্বিজে ভক্তি করি। সৎ জীবনযাপন করি। তোমার কি হয়েছে বলতো ? পরিতৃপ্তির হাসি হেসে তিনি বললেন

—দেখুন, আমি একজন বিখ্যাত চোর। আপনি বহু টাকা নিয়ে যাবেন বলেই এই কামরায় অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে উঠলাম। দেখলাম টাকা তো অনেকই আছে। কিন্তু আপনি Bath রুমে তো গেলেন খালি হাতে। টাকাগুলো তো আপনার বিছানায় ছিল না; বালিশের নিচেও ছিল না। Magician-এর মতো টাকা গুলোকে কি উড়িয়ে দিয়েছেন?

—না, না, তা কেন? আমি সব তোমায় খুলে বলছি। তুমি যখন Bath রুমে যাও আমি সেই ফাঁকে তোমার বিছানার তলায় আমার টাকার থলিটা রেখে আসি। আমার টাকা তো চোর স্বয়ং পাহারা দেয়। তাই আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাই। শেষবার তুমি Bath-

room গেলে আর আমি টাকার বান্ডিল আমার কাছে নিয়ে এলাম।

ওহে যুবক, তুমি সর্বত্র সম্পদ খুঁজে বেড়াও তো! সব সম্পদ তো তোমার কাছেই আছে তা তো জান না। তাই ঘুরে মর। নিজের কাছে কী আছে, দেখবে এরপর থেকে।' চোরকে বিহ্বল অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে ব্যবসায়ী নেমে গেলেন। এরপর মহারাজের উপদেশ ছাত্রদের জন্য।

ছাত্রদের বলি, তোমরা জগতকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছ। কেমন করে ধনী হবে? শ্রেষ্ঠ ধন তোমার আত্মা। অন্যসব জানতে ব্যস্ত বড়ই; আত্মাকে ভুলে আছো। আত্মানংবিদ্ধি। অনুসন্ধান কর পরম বস্তুর জন্য—নিজের গভীরে।

আর একটি ছোট গল্পের মধ্য দিয়ে পূজনীয় মহারাজ ছোট-বড় সবাইকে উপদেশ দিতেন। সবাই মজা পেতেন। কোথায় এই বক্তৃতা দিয়েছেন, কবে মনে নেই, তবে আমি তাঁকে দ্বিতীয়বার এই বক্তৃতা দিতে শুনিনি।' গল্পটা এরকমঃ

সমদর্শী বিধাতা মানুষ গাধা, কুকুর, শকুন সবাইকে ৪০ বছর করে আয়ু দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। মানুষ খুব বুদ্ধিমান। সে ভাবল মাত্র চল্লিশ বছরে কী হবে আমার। আমার আয়ু অন্তত ১০০ বছর হতে হবে। সে গাধাকে বলল—তুমি নির্বোধ, গাধা। সারাজীবন বোঝা বইবে। তোমার অর্দ্ধেক আয়ু আমাকে দাও। তোমার কুড়ি থাক; আমার কুড়ি থাক। এরপর কুকুরকে গিয়ে বলল—তুমি বাপু করুণার উচ্ছিষ্ট খেয়ে, দিনরাত পাহারা দিয়ে ৪০ বছর ধরে যন্ত্রনা পাবে। আমি তোমাকে যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাব। কুড়ি বছর তুমি নাও, আমাকে কুড়ি দাও। দিল। শকুনকে বলল—পচা মড়া খেয়ে ঘৃণিত জীবনযাপন করে কত কষ্ট পাও। কী হবে তোমার ৪০ বছর এভাবে বেঁচে। উপকারী বন্ধু। দাও তোমার থেকে ২০ বছর আমাকে দাও। এভাবে মানুষ নিজের চল্লিশের সঙ্গে অন্যের ৬০ বছর আয়ু পেল।

দেখছিও তাই। মানুষের মতো বাঁচা ঐ ৪০ বছর পর্যন্ত। ৪০-৬০ ধুঁকতে ধুঁকতে নীরবে সংসারের বোঝা বহন করা গাধার মনেই। ৬০ বছরের পর দুটো খাওয়া আর ছেলের বাড়ি পাহারা দেওয়া, ছেলের ছেলে-মেয়েদের পাহারা দেওয়া। ওরা office গেছে, সিনেমায় গেছে, বেড়াতে গেছে। তারপর ৮০ বছরের পরে শকুনের জীবন। কিন্তু সবটাই মহাজীবন হয়ে উঠতে পারে যদি ৪০ বছর পর্যন্ত সচেতন থাকি। সে জন্য কিশোর বয়েস থেকেই ত্যাগ, সেবা, ভালবাসার ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। নিজের ভিতরের অন্তরাত্মার সাক্ষাৎকারই তো ভগবান লাভ। আর ভক্তিভাব নিয়ে ব্যাকুলতা, প্রার্থনা সহ তাঁকে ডাকলে তিনি রামরূপে, কৃষ্ণরূপে, দুর্গারূপে, কালীরূপে, রামকৃষ্ণরূপে, সারদারূপেও দেখা দেবেন'।

“স্বামী গহনানন্দজীর কিছু স্মৃতি”

স্বামী সত্যদেবানন্দ

পরম পূজনীয় মহারাজকে প্রথম দেখি রাঁচি মোরাবাদী আশ্রমে। খুব সম্ভব ১৯৭৪ অথবা ৭৫ সাল হবে। তখন সবে বছর খানেক হলো সংঘে যোগ দিয়েছি। ওনার কাছে যাওয়ার সাহস ছিল না, অন্য মহারাজের কাছে পূজনীয় মহারাজের কথা শুনলাম—‘উনি রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের একটি ট্রাস্টি এবং রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি।

১৯৮০ সালে ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে আসি। ‘দু’বছর পর যখন ট্রেনিং শেষ হলো—Posting-এর জন্য অপেক্ষা করছি, একদিন আমাকে বলা হলো—“তুমি Head Qtr. অফিসে পূজনীয় গহনানন্দজীর সঙ্গে দেখা কর। “পূজনীয় মহারাজ তখন সাধুদের “Posting” দেখতেন। ওনার Office-এ গিয়ে দেখা করতেই বললেন—“আজ বিকেলে তোমার তল্পি তল্পা নিয়ে আমার গাড়ীতে উঠবে।” পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম করে ট্রেনিং সেন্টার এ জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যথাসময়ে ওনার গাড়ীতে উঠে সেবা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছলুম। ওখানে সে সময় যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই আমার থেকে বয়সে বড় এবং সকলেই সন্ন্যাসী। আমার অবস্থা “জলের মাছ ডাঙ্গায় এসে পরার” মতো।

পূজনীয় মহারাজ রাতে খাওয়ার পরে আমাকে ডেকে বললেন—“ওহে, আমি প্রথম সেবাপ্রতিষ্ঠানে আসি পূজনীয় দয়ানন্দজী আমাকে বলেছিলেন—“Monks Qtr.-এর পিছন দিকে দেখিয়ে—“ঐ দিকে বেশী Attention দিও না” আমি তোমাকেও ঐ একই কথা বলছি—ওদিকে Attention দিওনা।” যাঁরা সেবা প্রতিষ্ঠানে থেকেছেন তাঁরা সকলেই জানেন—প্রায় প্রতিদিন রাতে ঐ দিকটায় কি সাংঘাতিক সব ঘটনা ঘটে থাকে। তিন মাসের ওপর সেবা প্রতিষ্ঠানে ছিলাম পুজনীয় মহারাজকে কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল মুগ্ধ হয়ে ওনাকে দেখতাম। ওনাকে কখনই রাগতে দেখিনি, খুব ধৈর্য্য সহকারে সকলের কথা শুনতেন, সহজে কোন মন্তব্য করতেন না,

খুব চিন্তা ভাবনা করে সময় নিয়ে নিজের মতামত জানাতেন, কথা খুব কম বলতেন।

পূজনীয় মহারাজ আমাকে একদিন ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি হাসপাতালের Laboratory Super Vision করতে পারবে?" আমি দু'হাত জুড়ে (প্রার্থনার ভঙ্গিতে) বললুম "মহারাজ, আপনি দয়া করে অন্য কোন আশ্রমে আমাকে Posting দিলে খুব ভাল হয়। এখানে আমার কোন বন্ধু নেই সকলেই আমার থেকে Senior। উনি কোন উত্তর দিলেন না কিন্তু খুব মনযোগ দিয়ে সব কিছু শুনে আমাকে যেতে বললেন। বিকেল ৪টা (চারটা নাগাদ আমাকে ডেকে বললেন "ওহে, তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমার গাড়ীতে উঠে পর। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ সারদাপীঠের Gate এর সামনে গাড়ী থামাতে বললেন এবং আমাকে বললেন—"এখানে নেমে পর, জয়রাম মহারাজকে বলবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি।" আমার সারদাপীঠের জীবন আরম্ভ হ'ল।

এরপর প্রায় ১২ বছর কেটে গেছে আমি ত্রিপুরা রাজ্যে আমতোলী আশ্রমে আছি। পূজনীয় মহারাজ তখন সংঘের Vice President আমতোলী আশ্রমে দীক্ষার আয়োজন হয়েছে; পূজনীয় মহারাজ দীক্ষা দেওয়ার জন্য আমতোলীতে এসেছেন-পরদিন থেকে দীক্ষানুষ্ঠান আরম্ভ হবে। আমাকে দীক্ষানুষ্ঠানে যারা জোগার যন্ত্র করেন তাদেরকে সাহায্য করতে বললে আমিও মহানন্দে তাদের সঙ্গে লেগে পরলুম।

পূজনীয় মহারাজের দীক্ষাদান পদ্ধতি বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। তিনি যতবেশী সময় পারতেন দীক্ষার্থীদের সঙ্গে থাকতে চাইতেন। অনেকক্ষণ ধরে তাঁদের নানারকম প্রশ্নের উত্তর দিতেন। একই প্রশ্ন বারবার করলেও কখনই বিরক্ত হতেন না। আমরা যারা কাছাকাছি থাকতাম আমাদের একই প্রশ্ন বার বার শুনে বিরক্তি হত কিন্তু পূজনীয় মহারাজ নির্বিকার হাসি মুখে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন।

পরে অন্যদের কাছে শুনেছিলাম পূজনীয় মহারাজের বন্ধুস্থানীয় কোন মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে তিনি নাকি বলেছিলেন—"আমি দীক্ষার্থীদের সঙ্গে যত বেশী সময় পারি থাকার চেষ্টা করি—কারণ জীবনে আর কখনও ওরা আমায় দেখতে পাবে কি না কে জানে-আমার সঙ্গে সঙ্গ করার স্মৃতি ওদেরকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। পূজনীয় মহারাজ দূর দূরান্তরে প্রত্যন্ত প্রদেশে—যে সব জায়গা যাওয়া খুবই কঠিন সেখানে গিয়েও দীক্ষা দিয়েছেন। আর একথাও ঠিক ওনার অনেক শিষ্য আছেন যাঁরা দীক্ষা নেওয়ার পর আর কখনও তাঁর দর্শন পাননি।

পরম পূজনীয় মহারাজের শ্রীপদপাদ্মে এই স্মৃতিটুকু পুষ্পাঞ্জলী রূপে অর্পণ করলাম।

এক মহান কর্মযোগীর মধুর স্মৃতি

স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দ

পূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তিনি নিজের জীবনে স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজ দ্বারা নির্দেশিত চারটে যোগের অভ্যাস করতেন, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তিনি একজন মহান কর্মযোগী ছিলেন। ওনাকে দেখে যা শেখার ছিল তা হলো এত কাজের চাপে থেকেও তিনি একজন শান্ত ও সৌম্য স্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন।

ওনার সঙ্গে যখন আমার প্রথম সম্পর্ক হয় তখন উনি রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের সহ সচিবের কার্যভারের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সচিব পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময় আমি রাঁচি কেন্দ্র থেকে বেলুড় মঠে এসেছি এবং আমি ওনার অধীনস্থ সম্পত্তি এবং আইন-সংক্রান্ত বিভাগের অন্তর্গত বিভাগগুলোতে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করি। ওনার সঙ্গে আমি অনেকবার বেলুড় মঠ থেকে কলকাতা পরিভ্রমণ করেছি। উনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয়ে প্রাতঃকালীন অধিবেশনে নিজের কাজ সমাপ্ত করে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান হাসপাতালে যেতেন এবং মধ্যাহ্নকালীন ভোজন সেরে আবারও হাসপাতালের কার্যালয়ে গিয়ে পুনরায় কাজ করতেন আর আমি অন্যান্য কাজ নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তাম। উনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। সন্ধ্যাবেলায় অনেক সময় আইন সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য উকিলবাবুদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। রাত ১০ টা কিংবা ১০-৩০ টায় আমরা ফিরতাম। উনি সর্বপ্রথম মায়ের মন্দিরে প্রণাম করতেন এবং তারপর প্রায় ১১ টায় আমাদের সান্ধ্যভোজন হত। উনি অল্পাহারী ছিলেন। নিজের চোখে দেখেছি উনি অল্প ভোজন করতেন এবং তারপর কার্যালয়ে আবারও ওনার কাজের রাত্রিকালীন অধিবেশন আরম্ভ হত। বিভিন্ন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীরা যাঁরা ওনার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষারত থাকতেন ওনাদের সঙ্গে

তখন তিনি দেখা - সমস্যাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতেন। দিনের বেলা থেকেই আগন্তুকেরা ওনার সঙ্গে দেখা করার জন্য সারিবদ্ধহয়ে থাকতেন। সুতরাং রাতেই উনি দেখা করতেন কারণ – দিনেরবেলাই এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সম্ভবপর ছিল না। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা এখানে বললে নিশ্চয়ই কোন অতিশয়োক্তি হবে না, একবার কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ওনার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক হয়ে পড়ল, উনিও আমায় সম্মতি দিলেন দেখা করবেন বলে, কিন্তু বললেন যে তুমি ঐ সময় এসো যখন আমি অবসর থাকি। আমিও ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম কোন সময় আসলে দেখা হবে, তখন উনি রাত ১২.৩০ টায় সময় দেখা করতে বললেন। আমি তা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলোাম। আমার ধারণা হতে লাগল, কি জানি আমি ওনার বিশ্রামের সময়টুকুতে বাধা উৎপন্ন করছি না তো! সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তিনি কাজে ব্যস্ত থাকেন এবং এটা কোন ধরনের ভুল আমার দ্বারা হয়ে গেল না তো, আমি যে ওনার সঙ্গে দেখা করার জন্য আলাদা করে সময় চেয়ে নিয়েছি। আমি বিচলিত হয়ে পড়লাম কিন্তু উনি যখন সময় দিয়েছেন তখন তো আমায় যেতেই হবে। আমি যখন ওনার কার্যালয়ে উপস্থিত হই, তখন যা দেখি তা দেখে আশ্চর্য হয়ে পড়ি, দেখি যে অনেকজন সন্ন্যাসী কে সেখানে ১২.৩০ টায় রাতে দেখা করার জন্য বলে রেখেছেন। ওনার সঙ্গে দেখা করার জন্য সন্ন্যাসীরা সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষারত ছিলেন এবং আমিও সেই সারির অংশীদার হয়ে গেলাম। আর যখন ওনার সঙ্গে আমার দেখা করার সময় এ তখন ঘড়ীতে রাত ১:৩০ টা। ওনার কার্যালয়ে ওনার সঙ্গে সমস্ত আইন সংক্রান্ত সমস্যাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু ওনার মুখমন্ডলে কোন রকম ভ্রুক্ষেপ বা ক্লান্তি কিছুই ছিল না। আমি ওনার কার্যালয় থেকে রাত ২টায় ফিরি। পরদিন যখন আমি মন্দির থেকে জপ ধ্যানাদি সেরে ফিরছিলাম তখন দেখি ওনার ঘরের দরজা খুলা। জানি না কখন যে উনি নিদ্রা-বিশ্রামাদি করতেন। এটা ভেবেও খুব আশ্চর্য হতাম। ওনার সাধনায় কর্মযোগের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এত রকম কাজের ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও ওনার মুখমন্ডল থেকে প্রকাশিত ঐ শান্তি বিতরিত করা মৃদু হাসি কখনও ম্লান হতে দেখিনি। ওনার এই গুণ আমায় স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ মনে করিয়ে দেয়, স্বামীজি বলতেন যে আমরা যত শান্ত ভাবে কাজ করি তাতে আমাদের স্নায়ু-ক্ষয় কম হয় এবং আমরা কম বিচলিত হই এবং যত আমরা কাজকে প্রেমাস্পদকে সমর্পণের ভাব নিয়ে করি ততই কাজটি ক্রমশঃ উত্তোমত্ত হতে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের এই উপদেশের উনি জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন। উনি সবরকম পরিস্থিতিতে

শান্তি থাকতেন, কখনও ওনাকে রাগ বা চিৎকার চেঁচামেচি করতে দেখি নি। উনি যদিও বা বিরক্ত হতেন তবে ওনার অপ্রসন্ন দৃষ্টি দেখে সম্মুখের ব্যক্তি সহজে উপলব্ধি করে নিতেন এবং ওনার এই অনুশাসন আমাদের সকলের জন্য পর্যাপ্ত ছিল। কখনও কখনও আমাদের প্রস্তাবের উপর উনি সম্মতি দিতেন না, এইরকম পরিস্থিতিতেও উনি চিৎকার চেঁচামেচি বা রাগ করার মতো কোন ধরনের ভাব ধারণ করতেন না বরং নিজের সঞ্চিত শক্তিগুলোকে সৃজনকারী করে নিতেন এবং এই জন্য উনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধিকাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বভার নিতে পারতেন এবং সবসময় সৌম্যমূর্তিতে নিজের সাধনায় অগ্রসর হতেন।

যখন উনি উপাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হলেন তখনও আমার সঙ্গে ওনার সম্পর্ক ছিল। তিনি এটা জেনে খুবই আনন্দিত হলেন যে আমি যুবকদের নিয়ে কাজ করছি এবং স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ অনুযায়ী তাঁদের নানা ধরনের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করছি, তাঁদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়াস করছি ইত্যাদি। তিনি আরও বেশী আনন্দিত হলেন যখন তিনি জানতে পারলেন যে আমি যুব সম্মেলনগুলো নিয়মিত আয়োজন করছি এবং নিরন্তর যুবকদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করছি।

একবার যখন আমরা গাড়ী করে এক সঙ্গে যাচ্ছিলাম তখন তিনি এই সম্পর্কে আমার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। যুবকদের সমস্যাগুলোর উপর আমার বক্তব্যগুলো শুনলেন এবং আমায় পরামর্শ দিলেন যে যুবকদের কঠোর অনুশাসনের স্থানে যদি তাঁদের সঙ্গে বন্ধু হয়ে সাহায্য করা যায় তবে তাঁরা অধিক লাভবান হবে। যুবকদেরকে এইভাবে সাহায্য করলে তাঁদের অধিক উপকার হবে। তিনি আমার কাজের উপর বিশেষ কৃপা করলেন এবং আমার খুব অনুপ্রাণিত করলেন, যার দ্বারা আমার মনের অনেক সংশয় দূরিভূত হয়। তখন আমিও বুঝতে পারলাম যে যুবকদের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করা এবং তাঁদের সম্পর্কে থেকে তাঁদের সাহায্য করাই আমার সাধনার একটি অঙ্গ। আমার এই কাজের উপর অনেকেই অসম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু ওনার আশীর্বাদ থাকার দরুণ আমি সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে কাজ করতে সক্ষম হই। ওনার উৎসাহ এবং প্রেরণার ফলে কাজে তীব্রতা আসে এবং অনেকগুলো যুব-সম্মেলনের উপর কাজ আরম্ভ হয়। বেলুড়মঠে উপস্থিত হয়ে যখন আমি ওনার সঙ্গে দেখা করি তখন ওনার দূর-দৃষ্টি দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। উনি আমায় এই সমস্ত কার্যক্রমের রিপোর্ট তৈরী করতে বললেন যার মধ্যে কতজন এই ধরনের সম্মেলন থেকে লাভান্বিত হয়েছেন, তাঁদের নাম, ঠিকানা আমায় নথীভুক্ত

করতে বললেন। প্রত্যেকটি কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ আমায় ওনাকে পাঠাতে হত, যার দরুণ আমার কাজটি নতুন মাত্রা পায় । এইভাবে কাজ করার ধারণাটি একপ্রকার ভালোই হলো কারণ আমার সমস্ত ধরনের তথ্য জানা ছিল কিন্তু এইভাবে বিস্তারিত একটি রিপোর্টের রূপে প্রস্তুত করার ফলে তা একটি সুব্যবস্থিত পদ্ধতি অনুযায়ী রূপান্তরিত হলো। আমার বক্তৃতাগুলো এবং সম্মেলনের বিবরণ যখন ওনার কাছে সুবিন্যস্ত করে পাঠানো হলো তখন উনি আমায় আশীর্বাদ স্বরূপ প্রশংসা পত্র প্রেরণ করলেন এবং বললেন যে এই কাজটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়, তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, মা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দজীর কাছে এই কাজের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করেন, ওনার শুভাশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে সর্বদা আছে। এই ভাবে ওনার আশীর্বাদ লাভ করে আমি নিশ্চিন্ত হলোাম এবং আমার পরবর্তী জীবনের অনেক উপলক্ষ্যে আমি ওনার সান্নিধ্য লাভ করেছি।

'একবার আমি কোন একটি কাজের জন্য রায়পুর যাই, হঠাৎ মন্দির থেকে আমায় ডেকে পাঠানো হয় জানতে পারলাম উনি মন্ত্র দীক্ষার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন। সুতরাং দীক্ষার পর ওনাকে প্রণাম করার সুযোগ পাই। যখন আমি প্রণাম করলাম তখন উনি শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন আমার মাথায় স্পর্শ করলেন, আমি বিশেষ কৃপায় ধন্য হলোাম। সেইদিন আমি কোন আগ্রহ করিনি কিন্তু উনি স্বয়ং আমায় ডেকে কৃতার্থ করলেন।

আমার এখনও মনে আছে, হয়তো সেই সালটি হবে ১৯৮৯ ইং আমি তখন মহাসচিবের পদে রাজকোট আশ্রমে ছিলাম। সেই সময় খুবই সমস্যার ভিতর দিয়ে আমায় চলতে হচ্ছিল। একদিকে আমায় গুজরাটী মাসিক পত্রিকার শুভারম্ভ করার ছিল এবং অন্যদিকে সেটার সম্পাদন প্রচার এবং আবশ্যক ধন সামগ্রী সংগ্রহ করার দায়িত্বও ছিল। সেই সময় সন্ন্যাসী সহায়কতো দূরের কথা কোন অন্য কর্মচারীও ছিল না, যে আমায় এই কাজে সাহায্য করবে। এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমার উপর ম্যানেজারের কাজের দায়িত্বও ছিল। কোন সন্ন্যাসী সেই সময় সেখানে নিযুক্ত ছিলেন না। আমায় দুটো ভূমিকা কার্যনির্বাহ করতে হচ্ছিল। একদিন আমার মনে হতে লাগল যে, আমি আর কাজ করতে পারব না, দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরও আমি সমস্ত কাজগুলো সঠিকভাবে করে উঠতে পারছিলাম না। আমি ওনাকে ফোন করলাম এবং আমার সমস্যাগুলো জানালাম। আমি বললাম উনি যেন কিছু একটা করেন, কোন এক সন্ন্যাসী ভাইকে আমার কাজে সাহায্যের জন্য পাঠান। উনি অত্যন্ত শান্ত এবং নিচু স্বরে বললেন—'প্রবুদ্ধ'-উনি আমায় স্নেহপূর্বক 'প্রবোধ'

এর জায়গায় 'প্রবুদ্ধ' বলে ডাকতেন। "স্বামীজির দিকে তাকাও, ওনাকে সর্বদা স্মরণ করে কাজ করো।" এই বলে ফোনের রিসিবার রেখে দিলেন এবং এর দ্বারা উনি সমস্যার সমাধান করে দিলেন। এই শুনে আমি একটি নতুন উদ্যমের অনুভব করলাম এবং একাকী কোন সাহায্য ছাড়াই কাজ করা শুরু করলাম, হয়তো ওনার এই শব্দের দ্বারা শক্তি সঞ্চার হয়েছিল অথবা ওনার আশীর্বাদই ছিল যা আমাকে এই সমস্ত কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করল।

উনি সংঘাধ্যক্ষ হওয়ার পরও আমার উপর ওনার শুভাশীর্বাদ ছিল। উনি একজন মহান কর্মযোগী ছিলেন, যিনি গহন কর্মেও শান্ত, ধীর এবং সৌম্য স্বরূপে লীন থাকতেন। ওনার এই মহৎ জীবনের স্মৃতি আমায় সর্বক্ষণ মার্গদর্শন করে দিয়ে যাচ্ছে। উনি ওনার শুভাশীর্বাদ দ্বারা আমায় আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর করে নিয়ে যাবেন।

এই প্রার্থনার সঙ্গে,

ওঁ শান্তি

স্মৃতি তর্পণ

স্বামী সুপ্রকাশানন্দ

সোমেশ মহারাজ আমাকে অনুরোধ করেছেন পরমপূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ সম্বন্ধে কিছু স্মৃতি কথা লিখতে, যদিও আমি মহারাজের সঙ্গ খুব কমই পেয়েছি, তৎসত্ত্বেও কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলাম, পরম পূজনীয় মহারাজকে আমি প্রথম দেখি ১৯৭৯ তে সেবা প্রতিষ্ঠানে, তখন তিনি একাধারে সেবা প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা এবং whole বেলুড়মঠ রামকৃষ্ণ মিশনে অর্থাৎ বেলুড় মঠের Asstt. Secretary.

আমি সেবাপ্রতিষ্ঠানে যাই জামশেদপুরের পূজনীয় বড় মহারাজের নির্দেশে। তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন একজনকে দেখতে যাকে আমরা ভর্তি করেছিলাম। তিনি হলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর ভাইপো। তার cancer হয়েছিল, তাকে আমরা ভর্তি করেছিলাম। তাঁর অন্তিম সময়ে মহারাজ আমাকে বললেন একবার দেখে যাওয়ার জন্য, তাই গিয়েছিলাম। ওখানে যাওয়ার পর দেখাটেকা হওয়ার পরে মিহির মহারাজ যিনি ওখানকার Asstt. Secretary ছিলেন তিনি আমাদের বললেন যে তুমি তো বেলুড় মঠে যাবে, তো মহারাজ বলছেন সন্ধ্যেবেলা তিনিও যাবেন, এত বড়ো মাপের একজন মানুষের সহযাত্রী হয়ে বেলুড় মঠে যাব একথা ভেবেই আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। এক ঝলক দেখলাম। সন্ধ্যেবেলা যাবার কথা, সন্ধ্যে পার হয়ে গেল মহারাজ office ছেড়ে আসছেন না। কয়েকবার মহারাজের office-এ ঢুঁ মারলাম, দেখি কাজ করে যাচ্ছেন। যাইহোক ৮টার সময় office থেকে এসে মহারাজ তৈরী হয়েই বেলুড়মঠের দিকে যাত্রা করলাম আমরা মহারাজের সঙ্গে। ১০টা নাগাদ পৌঁছালাম, এই হলো আমার প্রথম মহারাজকে সামনাসামনি দর্শন ও তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভ। এরপর অবশ্য Training Centre-এ থাকতে মহারাজকে অনেক দেখেছি, অনেকবার প্রণাম করতে গেছি সবাই মিলে কাঁকুড়গাছিতে ও একবার দেখেছি, এরপর

মহারাজ একবার জামশেদপুরে আসেন, মনে হয় ১৯৮২ কী ১৯৮৩ সাল হবে ওখানকার একটা গুরুতর সমস্যা মেটাবার জন্য। দু-তিন দিন থেকে সমস্যা মিটিয়ে মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যান। সেই সময় মহারাজদের সবাইকে বিশেষ করে Guest মহারাজদের খাওয়া দাওয়া ও দেখাশোনা করার পুরো কাজটাই করতাম। ফলে সেইসময়ও মহারাজকে দেখেছি খুব কাছ থেকে।

তারপরে আমি Deoghar-এ posted হই। সেইসময় মহারাজ Vice President হিসাবে আসেন। সেই সময়ের একটি মজার ঘটনা আছে।

মহারাজের অনেক ভক্ত টক্ত এসেছে মহারাজকে দর্শন করতে। এর মধ্যে মহারাজের দীক্ষা ছিল, কিন্তু উনার Photo আনা হয়নি, আনেননি উনার Secretary মহারাজ, সেটা মহারাজকে বলাতে উনি সানন্দে অনুমতি দিলেন উনার photo তোলার, আমি একজন ফটোগ্রাফারকে নিয়ে এলাম। মহারাজকে সাজিয়ে গুছিয়ে বসানো হলো। মহারাজ খুব হাসি খুশি ছিলেন। মহারাজের photo তোলা হলো এবং রাতারাতি print করে সেটা পরের দিন সকালে দীক্ষার্থীদের ও আমাদের মধ্যে বিতরণ করা হলো।

এরপরে মহারাজের যাবার দিন, এক অদ্ভুত ও বিরল অভিজ্ঞতার সাক্ষী ছিলাম আমি এবং experience ও হলো, সেটা হলো Train এর সময় হয়ে এসেছে, এদিকে মহারাজ বের হতে দেরি করছেন। কিছুতেই বের হচ্ছেন না। সবাই ছটফট করছে। গাড়ি, ভক্ত ছাত্র সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাত জোড় করে মহারাজকে বিদায় জানাবে বলে সবাই শশব্যস্ত।। অনেক কষ্টে অনেক দেরি করে মহারাজ বেরোলেন। আমাদের তো খুব চিন্তা যে Train fail না হয়ে যায়। এমতোবস্থায় আমরা সবাই চললাম মহারাজকে যসিধি station এ তুলে দিতে। মহারাজ যে ট্রেন-এ যাবেন সেই ট্রেনে-এ একটি সার্টেন মাইলেজ-এর আগে চড়া যেত না। সেই মাইলেজ টা জাসিধি থেকে হাওড়া হচ্ছে না বলে মহারাজের টিকিট করা হয়েছিল পাটনা থেকে। পাটনা থেকে টিকিট করা হয়েছিল কিন্তু মহারাজ উঠবেন যসিধি থেকে। সেই মতো ব্যবস্থা করতে একজন স্বামীজিকে পাঠানো হয়েছিল পাটনা স্টেশন-এ এবং সেখান থেকে একজন পুলিশ অফিসার ভলান্টিয়ার, তিনি এবং ওই মহারাজ ট্রেন-এ Seat book করে যসিধি Station-এ আসার পর মহারাজকে ওই seat-এ তুলে দিয়ে ফিরে আসছি। যসিধি ও দেওঘর আসার মাঝপথে আমার গাড়িতেই ছিলেন ওই স্বামীজি। দেখা গেল উনার পকেটে মহারাজের টিকিট, অর্থাৎ মহারাজ বিনা টিকিটেই কলকাতা যাচ্ছেন।

এমতোবস্থায় সব গাড়িগুলোকে থামানো হলো রাস্তার উপরে। পূজনীয় সুহিতানন্দজী মহারাজ তখন Secretary, অনেক আলোচনা করে আমি এবং অপর একজন দুজনে মিলে স্বামীজিকে নিয়ে ছুটলাম জসিধি station-এ তখন station এর মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে কথা হলো। তিনি অবশ্য অভয় দিলেন যে ও কিছুই হবে না। মহারাজের তো টিকিট চেকিং হয়েই গেছে পাটনা স্টেশন-এ। পাটনা ছাড়ার পরে একবার আর মহারাজ তো ভি.আই.পি লোক, ওনাকে মাঝপথে কেউ ডিসটার্ব করবে না। শুধু আপনারা হাওড়া স্টেশন থেকে উনাকে বেরোনোর ব্যবস্থা করুন। Accordingly আমরা বিভিন্ন জায়গায় আসানসোলে জানিয়ে দিলাম। মহারাজ তখন কাঁকুড়গাছিতে থাকেন। কাঁকুড়গাছিতেও জানিয়ে দিলাম। বেলুড় মঠেও জানিয়ে দিলাম, পরে খবর পেলাম ওরা এসে ওখান থেকে ওনাকে নিয়ে গেছেন। মহারাজ নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেছেন। এই নিয়ে আমরা অনেকদিন মজা করেছি, এবং মহারাজও পরে মজা করে বলতেন বিনা টিকিটে আমি এসেছি যসিধি থেকে হাওড়া স্টেশন-এ।

একবার বেলুড় মঠে আমরা ছিলাম। বেশ কয়েকজনকে মহারাজ ডেকেছিলেন ঘরে। তখন তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন, কোন উপলক্ষে গিয়েছিলাম। বেলুড়মঠে আমাদের কয়েকজনকে আসতে বললেন, তিনি জপ করার সঙ্গে সঙ্গে জপ সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন এবং মালা নিয়ে আসতে বলেছিলেন এবং মালা বের করে কি করে মালা জপ করতে হবে সেটা নিজে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে প্রবর্তিত হয়ে উনি দেখিয়েছিলেন। এটা পরে আমার খুব কাজে লেগেছিল। যেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কিভাবে মালা নিয়ে জপ করতে হয়, মালা জপের ভুল ত্রুটি না হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরপর মহারাজ দিল্লী আশ্রমে আসার পরে, আমি তখন বৃন্দাবনে আছি। আমরা যথারীতি প্রণাম করতে গেছি মহারাজকে তার ঘরে। মহারাজ আমাকে পরে Personaly ডেকে পাঠালেন, বললেন একটু কথা আছে, আমি তো ভয়ে ভয়ে পৌঁছালাম যে মহারাজ আমাকে ডেকে কি কথা বললেন। তা আমি যেতে বললেন, বস, সামনে একটা চেয়ার ছিল, বসে কালাবাবু কুঞ্জ সম্বন্ধে অনেক গল্প করলেন তার ইতিহাস, তার স্মৃতি, মা ছিলেন, বিরজানন্দজী মহারাজ ছিলেন, রাজা মহারাজ অনেক আগের থেকে ছিলেন। বিভিন্ন গল্প করে বললেন দেখ আমরা বেশ কয়েকজন সাধু আমাদের সঙ্গে চেষ্টা করেছেন কালাবাবুকুঞ্জ নেওয়ার জন্য, কিন্তু কোন কারণেই হোক সম্ভব হয়নি। তুমি একটু চেষ্টা কর কালাবাবুকুঞ্জ নেওয়ার জন্য। Actually তার আগে কালাবাবু কুঞ্জ সম্বন্ধে আমার কোন Interest ছিল না। কারণ কালাবাবুকুঞ্জে আমরা কয়েকবার গেছি প্রণাম করতে। যারা পূজারী, Caretaker, যারা দখলে ছিল তারা

আমাদের সাধু বলে ঢুকতে দিয়েছে কিন্তু ভক্তদের ঢুকতে দিত না এবং পছন্দ করত না যাতে আমরা কেউ যাই। সেইজন্য আমি মাত্র দু একবারই গেছি। Anyway মহারাজ ওই বলাতে আমি বললাম মহারাজ ওখানে তো আমাদের ঢুকতেই দেয় না, কি করে কিভাবে ঢুকব, কে যে জমির মালিক, দখল করে আছে জানি না। মহারাজ ওইসব কোন কথাই বললেন না। মহারাজ বললেন যে দেখ দেখ চেষ্টা কর হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। আমি তোমাকে প্রথম ডোনেশন দেব এর জন্য। এই কথাটা খুব জোর দিয়ে বললেন, Ultimately মহারাজের, ঠাকুরের মায়ের ইচ্ছায় মহারাজের শুভ আশীর্বাদে আমরা কালাবাবুকুঞ্জ পেয়েছি এবং মায়ের একটি স্মৃতি সারদাকুটীর নামে তৈরি করা হয়েছে এবং মানুষ খুবই উপভোগ করেন মায়ের ঘরে বসে জপ ধ্যান করার জন্য এবং এটা মহারাজের আশীর্বাদেই সম্ভব হয়েছে।

মনে হয়, প্রথম মহারাজ Inspired করেন তারপর আরো অনেকে আস্তে আস্তে করেন এবং আমরাও চেষ্টা করে করে সফল হয়েছি।

স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

স্বামী ভবরূপানন্দ

পবিত্র ত্রয়ীর শ্রীচরণে আমার বিনম্র প্রণাম নিবেদন করে খুবই দ্বিধা ও সঙ্কোচের সঙ্গে আমি একটি দুঃসাহসিক কাজে হস্তক্ষেপ করলাম—তা হলো মঠ-মিশনের চতুর্দশ অধ্যক্ষ পরমপূজ্য শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ সম্বন্ধে আমার যৎসামান্য কিছু স্মৃতিকথার লেখনী মাধ্যমে উন্মোচন।

তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা মহান সন্ন্যাসী এবং তাঁর নামের সঙ্গেই সমার্থক—বোধগম্য হওয়ার জন্য গভীর এবং সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন এক মহান ব্যক্তিত্ব। পরমপূজ্য মহারাজজীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় কনখল সেবাশ্রমে ১৯৭৫ সালে এবং তারপরে পুনরায় ১৯৭৭ সালে।

আমি একটি সমস্যা নিয়ে জর্জরিত ছিলাম। আমাদের মোহন্ত মহারাজ পূজনীয় স্বামী বরেশানন্দজী আমার সমস্ত কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের পরেও আমাকে প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন, হয় কোন শ্রুতিলিখন বা কোন অতিথি আপ্যায়নের জন্য অথবা কোন সংবাদ আমাকে জ্ঞাত করানোর জন্য—এমনকি আমি যখন মন্দিরে আরতি দর্শন বা ধ্যান-ভজনে নিরত, সে সময়েও। যথাসময়ে জপ-ধ্যানে মনোনিবেশ করতে না পারার জন্য আমি খুবই বিচলিত ছিলাম। এসময় একবার পূজনীয় নরেশ মহারাজের কনখল আশ্রম পরিদর্শনকালে আমি আমার এই সংকটাবস্থার কথা পূজনীয় নরেশ মহারাজকে (এই নামেই তিনি অধিক সুপরিচিত ছিলেন) জানাই। তিনি আমার সমস্যার কথা শুনে একটি দীর্ঘস্থায়ী উপায়ের কথাও বলে দিলেন। তিনি আমাকে বললেন যে, যেকোন প্রকার সেবাকর্ম ও জপধ্যানের মধ্যে কোন পার্থক্য না করতে। তিনি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে আমাকে নিশ্চিত করলেন এই বলে যে নিষ্কাম কর্ম ও জপধ্যানের মতোই সমান ফল প্রদান করে। পরমপূজ্য মহারাজজী আমার মনের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বরাবরের মতো দূর করে দিলেন। তাঁর এই মূল্যবান উপদেশ আমি আজও অনুসরণ করে চলেছি।

পূজনীয় মহারাজজী ছিলেন স্বল্পভাষী, কিন্তু তাঁর কাজের পরিমাপ ছিল বিশাল।

একজন ব্রহ্মচারী এবং আমি বেলুড়মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদানের জন্য ১৯৭৯ সালের ৩০ শে মার্চ বেলুড়মঠে পৌঁছাই। প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার দিন স্থির ছিল সেই বৎসরের ১লা এপ্রিল থেকে। সৌভাগ্যবশতঃ শ্রদ্ধেয় স্বামী লোকনাথানন্দজী মহারাজের সঙ্গে (সুজিত মহারাজ) আমাদের সাক্ষাৎ হলো যিনি কনখলে থাকাকালীনই আমার সুপরিচিত ছিলেন কারণ তিনিও কনখল আশ্রমেই যোগদান করেন যদিও অনেক আগে ১৯৫৮ সালে। স্বভাবত, যোগদান কেন্দ্রেই আমাদের হৃদ্যতা ঘটে। শ্রদ্ধেয় সুজিত মহারাজ আমাদের প্রস্তাব দিলেন যে তিনি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আচার্যের (প্রিন্সিপাল) অনুমতিক্রমে আমাদের নিয়ে কলকাতার অন্যতম খ্যাতনামা হাসপাতাল সেবা প্রতিষ্ঠানে যাবেন স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য শ্রদ্ধেয় স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদ গ্রহণ করার জন্য। স্বামী দয়ানন্দজীর প্রচেষ্টাতেই এই সেবাপ্রতিষ্ঠান প্রথম নির্মিত হয় মাতৃজাতি ও শিশুস্বাস্থ্যের যত্ন নেবার উদ্দেশ্যে। পরমপূজ্য প্রিন্সিপাল মহারাজের অনুমতিক্রমে আমরা সেবাপ্রতিষ্ঠানে যাই এবং পরমপূজ্য স্বামী দয়ানন্দজীর শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি এবং পরে পরমপূজ্য নরেশ মহারাজকেও। শ্রদ্ধেয় সুজিত মহারাজের সঙ্গে আমাদের দেখে পূজনীয় নরেশ মহারাজ সহাস্যে মন্তব্য করলেন, ও, কনখল এবং কনখল একসাথে। তাঁর বলার উদ্দেশ্য ছিল যে একজন প্রবীণ সাধু যিনি মিশনের কনখল কেন্দ্রে বহু আগে ১৯৫৮ সালে যোগদান করেন, সঙ্গে দুই নবীন ব্রহ্মচারীকে নিয়ে এসেছেন যারা কনখল কেন্দ্রেই যোগদান করেছেন কিন্তু অনেক পরে ১৯৭৪ সালে। তাছাড়া, তারা বয়সে অনেক ছোট কিন্তু বয়সের এই বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও তাদের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল উল্লেখনীয়।

পরমপূজ্য নরেশ মহারাজ তাঁর কাজের প্রতি সর্বদা উৎসাহী ও নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন। তিনি প্রতিদিন ভোর ৪ টের সময় শয্যাত্যাগ করে জপ-ধ্যান করতেন এবং তারপর নিত্যকর্মে মনোনিবেশ করতেন। এসবের পর হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানদের প্রয়োজনানুযায়ী নির্দেশাদি দিয়ে সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ অফিসে যেতেন। অফিসে বসে তিনি রোগীদের বাড়ির লোকজন, ভিজিটার্স ইত্যাদিদের সঙ্গে জরুরী কথাবার্তা বলতেন এবং তারপর কর্তব্যরত ডাক্তার ও নার্সদের সঙ্গে হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে সমস্ত ওয়ার্ডে রোগীদের সম্বন্ধে প্রাথমিক অনুসন্ধান, তাদের অসুখ-বিসুখ, চিকিৎসাদি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতেন এবং রোগীদের আরও ভালো চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাদি-উপদেশাদি দিতেন। রোগীগণ তাঁর কাছে খুবই আদরণীয় ছিল। যারা চিকিৎসার ব্যয়াদি বহন করতে পারবে এবং যারা তা পারবে

না—এই উভয়ের জন্যই তিনি যতদূর সম্ভব সুচিকিৎসার ব্যবস্থাদি করতেন। মহারাজজীর এই মহানুভবতার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান প্রায় সর্বদাই আর্থিক অপ্রতুলতার সম্মুখীন হত। যাইহোক, পূজনীয় নরেশ মহারাজ তাতে বিচলিত হতেন না, বরং এই সমস্যার মোকাবিলা করবার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য সর্বদা উৎসাহী থাকতেন।

পূজনীয় নরেশ মহারাজ প্রায় ২৭ বছর ধরে সেবাপ্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দান করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের অনেক উত্থান-পতন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এসব সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে সেবাপ্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে অবস্থান করছে। কি বহির্বিভাগ কি অন্তর্বিভাগ কাতারে কাতারে রোগীদের জমায়েত হয়েছে সেবাপ্রতিষ্ঠানের দরজায়। অনেক প্রবীণ ডাক্তার, নার্সিং স্টাফ এবং অনুন্নত শ্রেণীর কর্মচারী—সকলেই পরম শ্রদ্ধেয় নরেশ মহারাজকে পিতার মতো মান্য করতেন এবং যেকোন সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁরই পরামর্শ গ্রহণ করতেন। শ্রদ্ধেয় মহারাজজী তাদের প্রত্যেকের নাম ও নাড়ীনক্ষত্রের খবরাখবর রাখতেন।

ভারতের মেডিকেল কাউন্সিল থেকে সেবা-প্রতিষ্ঠানকে মেডিকেলের পোস্ট গ্যাজুয়েট ডিগ্রি করার অনুমতি প্রদান করা হয়। স্বভাবতই হাসপাতালের বহির্বিভাগের অপ্রতুল স্থানকে বর্দ্ধিত করার প্রয়োজন হয় এবং সেই সুবাদে অনেক বড় অঙ্কের অর্থেরও প্রয়োজন হয়। ধীরে ধীরে অনুদান আসতেও থাকে কিন্তু এতবড় নির্মাণকার্যের জন্য তা যথেষ্ট না হওয়ায় নির্মাণকার্য শুরু করা সম্ভব হচ্ছিল না। এইসময় একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। হাসপাতালের শুভাকাঙ্ক্ষী এক ব্যক্তি শ্রদ্ধেয় নরেশ মহারাজের কাছে আসে এবং তাঁকে চল্লিশ হাজার (৪০,০০০/-) টাকা দান করে তার এক প্রিয় ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার্থে হাসপাতালের বহির্বিভাগে একটি ঘর নির্মাণের জন্য। শ্রদ্ধেয় মহারাজ সেই দান গ্রহণ করেন এবং তাকে বলেন যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি এই ঘরের নির্মাণকার্য সম্পন্ন করবেন। সেই অর্থদাতা এক বছর পরে এসে মহারাজজীর সঙ্গে দেখা করে এবং ঘর নির্মাণের কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মহারাজজী তাকে বলতে বাধ্য হন যে তার অনেক বড় একটি পরিকল্পনা আছে এই বাড়ি নির্মাণ ব্যাপারে। সেখানে শুধুমাত্র একটি ঘর নির্মাণ করা সম্ভবপর হয় নি। প্রয়োজনীয় আরও অর্থের সমাগম হলে তবেই তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী একসঙ্গে অনেকগুলি তল-বিশিষ্ট গৃহ নির্মাণকার্য আরম্ভ করতে পারবেন। একথা শুনে সেই অর্থদাতা অখুশী হয় এবং আরও কিছুদিন অপেক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তখনকার মতো ফিরে যায়। পুনরায় ছয়মাস পরে এসে তখনও কোন নির্মাণকার্য শুরু হয়নি

দেখে মহারাজজীর সামনেই তার ক্রোধ প্রকাশ করে। শ্রদ্ধেয় মহারাজজী তৎক্ষণাৎ তাঁর হিসাবরক্ষককে ডেকে সেই ব্যক্তির টাকার চেক্, সুদসমেত ফেরৎ দিয়ে দিতে বলেন। সে-ও নিঃশব্দে চেকটি গ্রহণ করে নেয়। এরকমই ছিলেন, আমাদের পরমপূজ্য নরেশ মহারাজজী।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বামীজির পৈতৃক ভিটাটি অধিগ্রহণ করে স্বামীজির পবিত্র জন্মস্থানে তাঁর একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু পূজনীয় নরেশ মহারাজ তাঁর অসীম ধৈর্য্য ও একরোখা জিদ নিয়ে অবিচলিত থাকেন। স্বামীজির পবিত্র জন্মভিটাকে বেলুড়মঠের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসার জন্য। ১৯৬৩ সালের পর থেকে কয়েক দশক পার হয়ে গেছে, কিন্তু শ্রদ্ধেয় নরেশ মহারাজের প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে সরকার ১৯৯০ সাল থেকে একটু একটু করে সমস্ত সম্পত্তিটি রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠকে হস্তান্তর করতে শুরু করে। অবশেষে স্বামীজির এক সুবৃহৎ মূর্ত্তি (যেটি আমরা আজকাল দেখি) স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটে।

শ্রদ্ধেয় নরেশ মহারাজ তাঁর প্রবল চরিত্রবল এবং অপরের মনে প্রেরণা সঞ্চারের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠান সংলগ্ন সরকারি জমিগুলি অধিগ্রহণ করেছিলেন বৃহত্তর জনতার সেবার্থে তাদের যথাযথ চিকিৎসা-পরিষেবা দান করবেন বলে। তিনি বাগমারিতে অবস্থিত জমিটি গ্রহণের জন্যও অনেক পরিশ্রম করেন যেখানে এখন বি.এস.সি. ও এম.এস.সি. নার্সিং ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল গড়ে উঠেছে। এই ছাত্রীরা এখন সেখানেই থাকেন এবং সেবাপ্রতিষ্ঠানের রোগীদের সেবাকার্যে নিজেদের নিযুক্ত রাখেন।

যখন শ্রদ্ধেয় নরেশ মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন এবং যোগোদ্যান মঠে থাকতে শুরু করেন তখন দেখেন যে কাশীপুর যোগোদ্যান মঠের জন্য চতুর্দিকে কোন ফাঁকা জমি নেই, একদিকে বস্তিবাসীদের গৃহাদি অপরদিকে টাটা অয়েল মিলের প্রায় ৪ (চার) একর জমি হিন্দুস্থান লিভারকে লীজ দেওয়া আছে এবং সেই লীজের মেয়াদও ৫-৬ বৎসরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। এই জমিটি শ্রদ্ধেয় মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি আমাকে ডেকে পাঠান এবং হিন্দুস্থান লিভারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি আমাকে দেন। আমাদের সৌভাগ্যবশত মঠ-মিশনের একজন বড় ভক্ত, শ্রীমদ্ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য শ্রী এস.এম.দত্ত এ ব্যাপারে আমাদের সহায়তা করতে এগিয়ে

আসেন। তিনি হিন্দুস্থান লিভার কোম্পানী থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। শ্রী এস. এম.দত্তের সহায়তায় মুম্বাই-নিবাসী হিন্দুস্থান লিভারের তৎকালীন চেয়ারম্যানের সঙ্গে মুম্বাইতে বেশ কয়েকবার আমাদের আলোচনায় বসার সুযোগ হয়। সৌভাগ্যবশত হিন্দুস্থান লিভার কর্তৃপক্ষ রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের জনকল্যাণমূলক সেবাকর্মের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং আমাদের অনুরোধকে স্বীকার করে বিনা বিতর্কে উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে তেরোজন জমির মালিকের কাছ থেকে প্রায় চার একরের ঐ বিশাল জমিটি খরিদ করার জন্য আমাদের অনুমতি দেন। আজ ঐ জমিতে যোগোদ্যান মঠের কেন্দ্র থেকে মানব-কল্যানমূলক নানারকম কর্মপ্রকল্প পরিচালিত হয়ে থাকে।

পরমপূজ্য মহারাজজী যখন সে কেন্দ্রের অধ্যক্ষ হয়ে থাকতেন শুধু সেই কেন্দ্রই নয়, কিন্তু সারা ভারতবর্ষে মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রেই তিনি এই জমি-বাড়ি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন এবং সেই সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মও করতেন। বৃহত্তর জনতার মঙ্গলের স্বার্থে মঠ-মিশনের কার্যক্রমের সফলতার উদ্দেশ্যে মহারাজজী সর্বদাই সমস্ত শাখা-আশ্রমের প্রধানের সঙ্গে সেই আশ্রম-সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধান ও অধিগ্রহণ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত ও সহযোগিতা করতেন।

শ্রী শুভেন্দু চৌধুরী যিনি ফণীবাবু নামেই সমধিক পরিচিত এবং যাঁকে শ্রদ্ধেয় মহারাজজী সেবা প্রতিষ্ঠানে আনেন, তাঁর কথা না বললে আমার প্রতি কর্তব্য অবহেলার দায় বর্তাবে। ফণীবাবু ১৯৬২ সালে শিলং-এ তাঁর এম.কম. ডিগ্রি সম্পন্ন করেন এবং একেবারে কলকাতায় এসে একজন কর্মী হিসাবে সেবা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। পূজনীয় নরেশ মহারাজ তাঁর পূর্ব পরিচিত ছিলেন। তাঁর শান্ত স্বভাব ও মধুর ব্যবহার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। হাসপাতালের খ্যাতনামা প্রবীণ ও নবীন ডাক্তারগণ, নার্সিং শিক্ষিকাগণ এবং সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৭৫০ কর্মী—সকলেই আজও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব পোষন করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের সব কিছু বিশদে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতেন। তিনি বছরের মধ্যে মাত্র দুদিন সেবা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে বাইরে বেরোতেন—কল্পতরু দিবস ও বিজয়া দশমীতে বেলুড় মঠে শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ ও অন্যান্য প্রাচীন সাধুদের প্রণাম করার উদ্দেশ্যে। ফণীবাবু খুবই সামান্য অর্থের বিনিময়ে সেবা প্রতিষ্ঠানে সাম্মানিক কার্যে যুক্ত ছিলেন। প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত অর্থটুকুও তিনি দান করে দিতেন। তিনি এত সৎ ব্যক্তি ছিলেন যে, যদি ব্যক্তিগত কাজে কখনও হাসপাতালের টেলিফোন ব্যবহার করতেন, সঙ্গে সঙ্গে রসিদের বিনিময়ে সেই টেলিফোন বিল মিটিয়ে দিতেন—এই সমস্ত ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখা। সেবা প্রতিষ্ঠান এক সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান যেখানে মেডিকেলের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি-ও করানো

হয়। বহু মহারাজ এখানে আসতেন আবার বদলি হয়ে অন্য শাখা আশ্রমেও চলে যেতেন। কিন্তু ফণীবাবু একটা শক্ত খুঁটির মতো, প্রতিষ্ঠানের স্তম্ভস্বরূপ সমগ্র প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করতেন। তিনি সর্বদা সাদা খাদির কুর্তা ও সাদা ধুতি পরিধান করতেন—তাঁর 'শুভেন্দু' নামের সঙ্গে যা ছিল সমার্থক—শারীরিক ও মানসিক উভয় ভাবেই। পরমপূজ্য স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর দীক্ষিত শিষ্য হিসাবে ফণীবাবু তাঁর গুরুর পরেই পূজনীয় নরেশ মহারাজকে মান্যতা দিতেন। সেবা প্রতিষ্ঠানে আমার সাড়ে নয় বৎসর অবস্থানকালে আমি তাঁর কাছ থেকে অনেক জিনিস শেখবার সুযোগ লাভ করেছি। ফণীবাবুকে সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করার পশ্চাতে পূজনীয় নরেশ মহারাজের দূরদৃষ্টি সত্যই প্রশংসনীয়।

পরমপূজ্য নরেশ মহারাজ বহু খ্যাতনামা ডাক্তার, টেকনিশিয়ান, নার্সিং স্টাফ ও নিম্নশ্রেণীর কর্মী নিয়োগ করেছেন যাঁরা রোগীদের জন্য তাঁদের সারাজীবনের কর্মক্ষমতা দান করেছেন। পূজনীয় মহারাজজী সর্বদা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত রোগীদের মধ্যাতীতভাবে সাহায্য করতেন। সেবা প্রতিষ্ঠানের সাধুকর্মী হিসাবে আমরা তাঁর স্নেহ, ভালবাসা, উপদেশ ও তাঁর জীবন-দর্শন—তাঁর কথা ও কার্যের মধ্য দিয়ে অনুভব করতাম।

যখন আমি বাংলার বাইরের শাখাকেন্দ্রে স্থানান্তরিত হলোাম এবং যখন কোন কর্মোপলক্ষ্যে আমাকে কলকাতায় আসতে হতো তখন আমার আসবার কথা জেনে পূজনীয় মহারাজজী আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য খবর পাঠাতেন। এটা আমার কাছে অবশ্যই একটি সুবিধাসূচক ব্যাপার হতো। এইরকমই কোনো এক সময়ে আমরা দুজনেই যখন বসে কথা বলছি, তখন একজন প্রবীণ সাধু পূজনীয় নরেশ মহারাজের কাছে ছুটির দরখাস্ত করার জন্য ঘরে প্রবেশ করেন। পূজনীয় মহারাজ সেই সাধুকে তিরস্কার করেন এই বলে যে সঙ্ঘের সেবা না করে তিনি কেবলমাত্র তাঁর উদ্যমের অসদ্ব্যবহার করছেন। আমার মতো একজন নবীন সাধুর সামনে একজন প্রবীণ সাধুকে তিরস্কার করায় আমি একটু অপ্রস্তুতে পড়ে যাই। তবে এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এই সঙ্ঘের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং আমাদে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজির কার্যে ব্যয় করতে পারি তার প্রতি তাঁর আগ্রহ।

আমার পূর্বাশ্রমের পরিবার থেকে আমি কিছু টাকা পয়সা উত্তরাধিকার সূত্রে পাই। এটি আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে জমা ছিল। কিন্তু সঙ্ঘে যতখানি টাকা রাখার

অনুমতি আছে, এটা তার চেয়ে বেশী ছিল। পূজনীয় মহারাজজী বললেন আমাদের যেসব আশ্রমে টাকার প্রয়োজন এরকম চারটি আশ্রমকে এই অতিরিক্ত ৬৪,০০০ টাকা দান করে দিতে এবং আমি তাতে সম্মত হলোম। ১৯৮৭ সালে তিনি এই টাকাটি চারভাগে সমান ভাগ করে চারটি আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। সেই শাখা-আশ্রমগুলি হলো—পশ্চিমবঙ্গের 'মনসাদ্বীপ' ও 'রামহরিপুর' এবং দক্ষিণ ভারতে কেরালার 'পালাই' ও তামিলনাড়ুর 'নট্টরামপল্লী'। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, মহারাজজীর মনের সততা ও সমভাবাপন্নতা এবং অপরের অযথা মন্তব্যকে প্রশ্রয় না দেওয়ার মানসিকতা।

পূজনীয় নরেশ মহারাজ সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রবল আর্থিক সংকট দূর করা এবং আশ্রম পরিধি সম্প্রসারণের জন্য জমি সংগ্রহ—এই দুটি ব্যাপারে প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছেন। সর্বোপরি তার সাহস ও তেজস্বিতার চরম প্রকাশ দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের আন্দোলন ও ধর্মঘটের অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার সময়। সব থেকে বড় ধর্মঘট হয় ১৯৯১ সালে। ধর্মঘট শুরু হয় ১৯৯১ সালের ৫ই মে এবং শেষ হয় ১৯৯২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী—লাগাতার দশমাস ধরে।

পরমপূজ্য নরেশ মহারাজ সে সময় সেবা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম এ্যাসিস্টান্ট জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। এই ধর্মঘটের সময় আমরা আইন-সংক্রান্ত আলোচনার জন্য খ্যাতনামা ব্যারিস্টার স্বর্গীয় ডা: তাপস ব্যানার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতাম। এই আলোচনায় প্রায় সময়েই পূজনীয় নরেশ মহারাজ উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মূল্যবান উপদেশ-নির্দেশাদি দিতেন। এই সাক্ষাৎকার শুরু হতো প্রায় রাত ৮-টার সময় এবং শেষ হতে কখনও রাত্রি বারোটাও বাজতো। কোনরকম বিরক্তি প্রকাশ ছাড়াই মহারাজজী সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকতেন এবং প্রায় মধ্য রাত্রে বেলুড়মঠে পৌঁছাতেন। সেবা প্রতিষ্ঠান তার কাছে এতই প্রিয় ছিল যে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অন্যতম এ্যাসিস্টান্ট জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে তাঁর সমস্ত দায়িত্ব সম্পন্ন করেও তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানের কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটিকে লালন করেছেন সুতরাং এর প্রতিটি ব্যাপারই ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক প্রবীণ ডাক্তাররাই তাদের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বেলুড়মঠে পূজনীয় নরেশ মহারাজের কাছে এসে সব সমস্যা নিবেদন করতেন ও তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করতেন।

পরমপূজ্য নরেশ মহারাজ সর্বদাই খুব শান্ত, ধীর থাকতেন এবং তাঁর কথায় ও আচরণে সর্বদাই এক মনোরম সহাস্যময় সদাশীলতা প্রকাশিত হতো। তিনি সমস্ত

ব্যথা-বেদনাকে অন্তরের গভীরে সমাহিত করে রাখতেন। এরকম একজন মহান ব্যক্তিত্বের অত্যন্ত নিকটে থাকা সত্ত্বেও এই শান্ত-সদাশয়তার অন্তরালে এঁদের অন্তর্জগতের প্রবল আলোড়নের পরিমাপ করা ছিল খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

পরমপূজ্য নরেশ মহারাজ একজন প্রবীণ সাধুকে—স্বামী অকুণ্ঠানন্দজী মহারাজ—খুবই পছন্দ করতেন। তিনি স্বর্গীয় বলরাম বোসের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন এবং প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজে তাঁর আন্তরিক যত্নশীলতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। এই দুই সন্ন্যাসীর মধ্যে প্রায়ই আইসক্রিম খাওয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা হতো। আমাদের কাছে এটা খুবই মজার ব্যাপার ছিল যখন দেখতাম দুজনে দুজনের কাছে শর্ত রাখছেন আর পূজনীয় নরেশ মহারাজ সেই প্রতিযোগিতায় পরাজিত হচ্ছেন স্বামী অকুণ্ঠানন্দজীর কাছে। স্বামী অকুণ্ঠানন্দজীর সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য এই লেখকের হয়েছিল।

১৯৮৫ সালের ১৩ই মার্চ, মঠ-মিশনের দশম প্রেসিডেন্ট মহারাজ পরমপূজ্য স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বেলুড়মঠে দুপুর ৩.১৩ মিনিটে পূর্ণ সজ্ঞানে তাঁর মরদেহ ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স তখন ৯২, গলায় ক্যানসার রোগে আক্রান্ত। দুপুর প্রায় তিনটে নাগাদ উনি তাঁর সেবককে পূজনীয় নরেশ মহারাজকে তাঁর কাছে ডেকে আনার কথা বলেন। পবিত্র ত্রয়ীর ফটো তাঁর সামনে আনা হলে তিনি তাঁদের শ্রীচরণে অর্ঘ্য নিবেদন করে প্রণাম করেন। তারপর একটি ছোট কৌটো বের করেন যার মধ্যে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র অস্থি রেখে দিতেন এবং সর্বদা নিজের কাছে রাখতেন। পূজনীয় মহারাজ সেই পবিত্র অস্থিকে প্রণাম করে তার চিরবিশ্বস্ত পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের হস্তে তা অর্পণ করেন। এই বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছিলেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর কাছে। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী পুনরায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন পবিত্র ত্রয়ীর শ্রীচরণে এবং তাদের পবিত্র নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করেন। সাধু-মহাত্মাদের মরদেহ ত্যাগ করার এ এক উজ্জ্বল মহান দৃষ্টান্ত।

পরমপূজ্য নরেশ মহারাজের মতো এমন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করে তাকে লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে তাঁর স্মৃতিকথা যতদূর আনয়ন করতে পেরেছি, ততটাই কলমবন্দী করেছি। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের চতুর্দশ প্রেসিডেন্ট মহারাজ পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজীর শ্রীচরণে আমার ভক্তিপূর্ণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই।

মহামানবের পুণ্যস্মৃতি

স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ

মহামানবের পুণ্যস্মৃতি ও তার অনুধ্যান সুখকর ও আনন্দের কারণ অতীতদিনের বহু ঘটনার কথা মনে করিয়ে যা ধ্যানের কাজ করে। বহু বৎসর বেলুড় মঠ মিশন অফিসে কাজ করার সুবাদে পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের পুত সঙ্গ ও কাজ করার সুযোগ হয়েছিল সেই সুবাদে আমাকে বলা হয়েছে ওনার সম্পর্কে কিছু স্মৃতি কথা লেখার এবং যে আদেশ অমান্য করার উপায় নেই।

১৯৭৮ সাল নাগাদ আর্য ব্রহ্মচারী অদ্বৈত আশ্রম কলকাতার কর্মী ছিলাম। এই বৎসর লাগাতার কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ায় সারা কলকাতা জলপ্লাবিত হয়ে যায়। ফলস্বরূপ জনজীবন স্তব্ধ ও অচল হয়ে পড়ে কোথাও হাঁটুসমান কোথাও বুক সমান জল শহরের জলনিকাশী ব্যবস্থা ভাল না থাকায় আটকে পড়া বৃষ্টির জল কমছিল না, শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন অনুন্নত জায়গা থেকে খবর আসছে মানুষের দুর্দশার কথা। আমরা এই সংবাদ পেয়ে পূর্ব কলকাতার ট্যাংরা অঞ্চলে কয়েকজন গেলাম ও দেখলাম এক এক জায়গায় কোথাও মানুষ সমান, জল, কোথায় বুক বা হাঁটু সমান জল। মানুষের ঘরের ভিতরে জল। খুবই অসহায় অবস্থার মধ্যে মানুষে কাটাচ্ছে। এই সংবাদ আশ্রম থেকে জানান হলে সেবাপ্রতিষ্ঠানে গহনানন্দজী মহারাজের কাছে উনি সত্ত্বর বিধান দিলেন এই সমস্ত দুর্গত মানুষের আহারের জন্য খিচুড়ি, সকাল বিকাল দুবেলা রান্নার ব্যবস্থা করলেন এবং খিচুড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য লড়ির ব্যবস্থা করলেন। আমরা এই খিচুড়ি দুবেলা সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ে দুর্গত অঞ্চলের মানুষদের বিতরণ করতাম। এইভাবে কয়েকদিন চলার পর জমা জল কমে গেল খিচুড়ি বিতরণ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। এমতো পরিস্থিতিতে সংক্রামক ব্যাধীর ও অন্য উপসর্গের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। এই অবস্থায় পূঃ মহারাজজী মেডিকেল টিম-ডাক্তার সহ পাঠান ও চিকিৎসা করেন, এ সমস্ত সেবাকাজ নিজে সক্রিয়ভাবে থেকে পরিচালনা করেন।

সেবাপ্রতিষ্ঠানে সাধুনিবাসের ২য় তলে পূজনীয় দয়ানন্দজী ডানদিকের ঘরে মাঝের

ঘরে গহনানন্দজী ও বাঁদিকের ঘরে অকুণ্ঠানন্দজী (শম্ভু মহারাজ) থাকতেন। শম্ভু মহারাজ আইন বিষয়ক কাজ করতেন। শম্ভু মহারাজের সঙ্গে গহনানন্দজীর বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। দুজন একসঙ্গে দুপুরের আহার করতেন ২টা-২-৩০ নাগাদ সামনা-সামনি বসে। সেবাপ্রতিষ্ঠানের পিছনে বিরাট বস্তির বাজার দিন-রাত সর্বদাই হল্‌লা হতো শুধুমাত্র রাত্রি ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত শান্ত থাকতো। এর মধ্যেই মহারাজরা দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন কোন বিকার ছিল না। তাঁর নেতৃত্বেই সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রভূত উন্নতি হয় Nursing Training School, Institute of Medical Science (Post Graduate Studing) এর সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সমস্ত সাধুদের কোথাও Adjust করার অসুবিধা হত উনি যাদের রেখে কর্মে নিয়োগ করতেন।

এরপর ১৯৮১ সাল নাগাদ গহনানন্দজী মঠে সহকারী সম্পাদক হিসাবে চলে আসেন। তবে সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করতে থাকেন। মঠে চারদিন এবং সেবাপ্রতিষ্ঠানে তিনদিন থাকতেন। মঠে সাধুদের Posting-Transfer দেখতেন। তাঁর সিক্ত স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে সকলের কথা শুনতেন ও যথোচিত ব্যবস্থা নিতেন। ১৯৮৩ সালে Training Centre এরপর উনি আমাদের Belur Math H.Q. এ Posting করেন। তাঁর ছিল অসীম ধৈর্য্য, স্থায়িত্ব ও সহনশীলতা, কখনও কাউকে ক্রোধ দেখান বা রুঢ় কথা বলেননি। ওনার সঙ্গে বহু জায়গায় যেতে হয়েছে কাজে-কর্মে, সভা- সমিতিতে। উনি স্বামীজির পৈতৃক বাড়ি উদ্ধারে প্রস্তুতি নেন। স্বামীজির বাড়ির সন্নিকটের বড় রাস্তার উপরে একটি বাড়ি কেনার কথা শুরু করেন—বাড়িটি পুরো ভাড়াটে ভর্ত্তি ছিল বাড়ির মালিক গুজরাতি। এক রবিবার উনি রঘুনাথ সঃ (আইন বিভাগে কাজ দেখতেন ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ বাড়ির মালিকের বাড়ি দেখা করতে যাওয়া হলো এবং বাড়ি ক্রয়ের ব্যাপারে কথা সমাধা করতে দুপুর হয়ে গেল। ফেরার পথে হাওড়া-সালকিয়া অঞ্চলে আমাদের জন্য Taxi ধরার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন Taxi পাওয়া গেল না, অগত্যা উনি বললেন বাসে করেই যাওয়া যাক বলে বাসে উঠলেন আমরাও উঠলাম এবং ঝুলে ঝুলে বেলুড় মঠে পৌঁছলেন। ওনার সঙ্গে একবার ময়াল ইছাপুরে গিয়েছি। গাড়ী থেকে নেমে মাটির আল ধরে পূঃ শশী মহারাজের জন্মস্থানে যাওয়া। উৎসব হচ্ছে দুপুরে প্রসাদ পাওয়া হলো। বিশ্রাম টিন সেডের একটি ঘরে। তখনও বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিল না—গরমকাল ঐ অবস্থায় মহারাজ বিশ্রাম নিলেন। বিকালে ধর্মসভা শেষ করে মঠে ফেরা তখনও মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়নি ভক্তরাই আশ্রম চালাতেন।

একবার মহারাজ মঠে মিটিং শেষ করে বেরুবেন। আমাকে বললেন ওহে চলো আমার সঙ্গে। যাওয়া হচ্ছে তেলোভেলোর মাঠে। ওখানে শ্রীশ্রীমার মন্দির হয়েছে।

উৎসব, লোকের ভিড়। দুপুরে খাওয়া দাওয়া হলো। বিশ্রামের ব্যবস্থা খোলা জায়গায়। খড়ের ছাওনা নিচে গরু থাকে। মহারাজজী ওখানেই বিশ্রাম নিলেন। বিকালে ধর্মসভা শেষ করে মঠে ফেরা হলো প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কোন বিকার নেই।

সাল ১৯৮৯ নাগাদ মহারাজজী সাধারণ সম্পাদকের পদে ব্রতি হন। এই সময় কয়েকটি জটিল মামলা মঠে চলতে থাকে। কিন্তু মহারাজ ঠান্ডা মাথায় ধৈর্যের সহিত ঐ সব সমস্যার মোকাবিলা করেন। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব সে সঙ্গে সেবাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কাজও ওনাকে দেখতে হত। দিনে প্রচন্ড কাজ এর চাপে থাকতে হতো বিকালে প্রায় প্রত্যহ কলকাতা যেতেন উকিল ব্যারিস্টারদের আইন সংক্রান্ত কাজে। যাওয়ার পথে প্রত্যহের ডাক সঙ্গে নিতেন ও গাড়িতেই ওগুলি দেখে নিতেন মঠে ফিরতে রাত্রি হয়ে যেত। ফিরে জামা কাপড় ছেড়ে দৈহিক ব্যায়াম সেরে স্নান করে জপধ্যান করে নৈশ আহার করতেন। এরপর চলতো ওনার অফিসের কাজ রাত্রি ২-২.৩০ টে পর্যন্ত। এরপর তিনি শয়নে যেতেন। আমি প্রায়ই প্রচুর চিঠি ও সিকিওরিটি শত শত ওনার টেবিলে রেখে দিতাম। উনি ওগুলি সাক্ষর করে রাখতেন রাত্রেই।

এরপর মহারাজজী ১৯৯২ সাল নাগাদ সংঘের সহ অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়ে কাঁকুড়গাছি চলে যান। মঠে Trustee মিটিং হলে আসতেন ও দুপুরে মঠে বিশ্রাম নিতেন। এই সময় কখনও কখনও আমাকে বিভিন্ন কাজ-এর জন্য ডেকে পাঠাতেন। কাজগুলি থাকত বিশেষত অসহায় মহিলাদের আর্থিক সমস্যা সংক্রান্ত। ওনার ছিল মানুষের প্রতি করুণায় ভরা মন। সহাধ্যক্ষ হয়ে উনি গ্রাম ও প্রত্যন্ত এলাকায় হাঁটা পথ জল-কাদা পেরিয়ে গিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষজনদের দীক্ষাদান করে কৃপা করেছেন।

এরপর পূঃ রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের মহাসমাধির লাভের পর পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ মঠাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন এবং কাঁকুড়গাছি থেকে মঠে চলে আসেন এবং যথারীতি মঠে অবস্থানকালে দীক্ষার্থীদের দীক্ষাদান এবং বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রে ভ্রমণকালে দীক্ষাপ্রার্থীদের দীক্ষাদানে কৃপা করেছেন। এইভাবে তিনি প্রায় ১.৫ লক্ষ প্রার্থীদের দীক্ষা দান করেছিলেন। ক্রমে ক্রমে বয়সজনিত বার্ধক্য ও বিভিন্ন রোগের সূত্রপাত দেখা। ওনার শরীর স্বাস্থ্য বরাবরই ভাল নিয়ম শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিল কিন্তু কালের নিয়মে নিয়তির হাত থেকে কারোই রেহাই নেই।

পূজনীয় গহনানন্দ মহারাজের পূতসঙ্গ ও সাহচর্য পেয়েছি সেসব মধুর স্মৃতি লেখার সময় মনে ভেসে আসে যা ধ্যানের কাজ করে ও মন আনন্দিত। বহু বৎসরই ওনাকে কাছ থেকে দেখেছি ও পূত সঙ্গ করেছি যেটা বহুভাগ্যে হয়ে থাকে। পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে লেখা শেষ করছি। শ্রীরামকৃষ্ণার্পনমস্তু।

মধুর স্মৃতি

স্বামী অনঘানন্দ

প্রাককথন ঃ

গীতামুখে শ্রীভগবান বললেন 'জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্খতি...' (৫/৩) অর্থাৎ তিনি-ই আদর্শ যতি যাঁর কোনো দ্বেষ ভাব নেই, কোনো আকাঙ্খা নেই...। তিনি সদা সাম্যে প্রতিষ্ঠিত (সমত্বোং যোগ উচ্যতে-২/৪৮)। ব্যবহারিক বেদান্ত গীতায় উল্লিখিত সন্ন্যাসের আদর্শের একটি ফলিত মানবীয় রূপ হলো স্বামী গহনানন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজির কাজ করার মধ্য দিয়েই তিনি তপস্যা করে গিয়েছেন। কাজই ছিল তাঁর কাছে পূজা। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সচিব থেকে চতুর্দশ সংঘাধ্যক্ষ এই সুদীর্ঘ সময় ধরে সংঘমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে পরিক্রমার এক মহিমময় জীবন স্বামী গহনানন্দ। রামকৃষ্ণ সংঘে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

পূজনীয় গহনানন্দজী এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিকতা ইয়ত্তা করা অসম্ভবও। তবে তিনি দয়া করে আমার মতো অর্বাচীন ও কমবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে দিয়েও অনেক কাজ করিয়েছেন। সেই সব ঘটনার কয়েকটি লিখছি। আমি ১৯৭৫ সালে সারগাছি আশ্রমে ব্রহ্মচারী হিসেবে যোগ দিই। তখন সুখদানন্দজী মহারাজ সারগাছি আশ্রমের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নিয়ে সারগাছি আশ্রমেই আছেন। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন অযোগ্য হলেও প্রথমে তাঁর নিকটই গহনানন্দজী মহারাজের কথা শুনি। তখন হতেই অজান্তে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই। ১৯৭৭ সালে কয়েক মাস মঠে থাকবার পর মনসাদ্বীপ আশ্রমের কর্মী হিসেবে প্রেরিত হই। পূজনীয় মহারাজের মনসাদ্বীপ আশ্রমের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও স্নেহ ছিল। মনসাদ্বীপ আশ্রমে যাওয়ার সময় পূজনীয় বন্দনানন্দজী বলেছিলেন পূজনীয় গহনানন্দজী অর্থাৎ নরেশ মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য এবং কোনো সমস্যা হলে তাঁকে জানাবার জন্য। ১৯৭৬ সালের ২৬শে এপ্রিল হতে ১৯৭৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব

পালিত হয়। পূজনীয় মহারাজ পশ্চিমবঙ্গের পূর্তমন্ত্রী শ্রীযুক্ত যতীন চক্রবর্তীকে নিয়ে যান আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে। তখন সাগরদ্বীপ যাতায়াত বর্তমানের মতো এত সহজ ছিল না। থাকার ব্যবস্থাও ছিল অপ্রতুল। এসব সত্ত্বেও সবকিছু মানিয়ে নিয়ে উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন মন্ত্রীমহোদয়কে সঙ্গে নিয়ে। পরবর্তীকালে আমাকে বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হতে বলায় প্রথমে রাজী হইনি কারণ যথাযথ যোগ্যতা না থাকার জন্য। মঠে ডাক পড়ে এবং বলা হয় সাময়িকভাবে কাজ চালাবার জন্য। পূজনীয় সাধারণ সম্পাদক বন্দনানন্দজী আলাদা করে বলেন তুমি সেবা প্রতিষ্ঠানে নরেশ মহারাজের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করো। সেই মতো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সেবা প্রতিষ্ঠানে গেলাম। তিনি আমার সমস্যার কথা শুনে বুঝিয়ে বললেন। কিছুদিনের জন্য এই কাজ করার পর উপযুক্ত লোক পাঠাবেন। আমি তখন অ-চৈতন্য ব্রহ্মচারী মাত্র।

পূজনীয় গহনানন্দজী খুবই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিকতার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। তবে তিনি দয়া করে আমার মতো অর্বাচীন ও কমবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে দিয়েও অনেক কাজ করিয়েছেন। সেই সব ঘটনার কয়েকটি লিখছি। আমি ১৯৭৫ সালে সারগাছি আশ্রমে ব্রহ্মচারী হিসেবে যোগ দিই। তখন পূজনীয় শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য সুখদানন্দজী মহারাজ সারগাছি আশ্রমের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে সারগাছি আশ্রমেই আছেন। অযোগ্য হলে তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। প্রথম তার নিকট গহনানন্দজী মহারাজের কথা শুনি। তখন হতেই অজান্তেই তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই। ১৯৭৭ সালে কয়েকমাস মঠে থাকার পর মনসাদ্বীপ আশ্রমে প্রেরিত হই। পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ মনসাদ্বীপ আশ্রমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। মনসাদ্বীপ আশ্রমে যাওয়ার সময় পূজনীয় বন্দনানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন নরেশ মহারাজের (গহনানন্দজী) সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য এবং কোন সমস্যা হলে তাঁকে জানানোর জন্য। ১৯৭৮ সালের ২৬ শে এপ্রিল হতে আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। ঐ উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী মহাশয়কে নিয়ে যান মনসাদ্বীপ আশ্রমে। সেই সময়ে সাগরদ্বীপে যাওয়া আসা এই সময়ের মতো সহজ ছিল না। কিন্তু গহনানন্দজী মহারাজ এসব অবস্থাকে মানিয়ে নিয়ে মন্ত্রী মহাশয়কে সঙ্গে এনে উৎসব সফল করেছিলেন।

পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়ের (মনসাদ্বীপ) প্রধান শিক্ষক পদত্যাগ করায় আমাকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিতে বলেন পূজনীয় গহনানন্দজী। কিন্তু প্রধান শিক্ষক হওয়ার তখনকার দিনে যে মানদন্ড ছিল আমার তা না থাকায় আমি রাজি হয়নি। এজন্য আমাকে বেলুড়মঠে ডাকা হয়। এসময় পূজনীয় বন্দনানন্দজী মহারাজ ও গহনানন্দজী

মহারাজ সাময়িকভাবে মনসাদ্বীপ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেবার কথা বলেন। বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য সেবা প্রতিষ্ঠানে গহনানন্দজীর কাছে যেতে হয়। মহারাজ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে উনি কিছুদিনের মধ্যে যোগ্য প্রধান শিক্ষক পাঠাবেন বললেন। আমি তখন নবীন ব্রহ্মচারী মাত্র, কিন্তু আমার সঙ্গে উনি যেভাবে আলোচনা করলেন তাতে আমি অভিভূত হয়ে কার্যগ্রহণে রাজি হই।

একবার স্কুলের জন্য কিছু সরকারী সাহায্য পাওয়ার কথা জানা গেল। কিন্তু এর জন্য আবেদন করতে হবে। তখন সেক্রেটারী মহারাজ আশ্রমে ছিলেন না। সমস্যার কথা পূজনীয় গহনানন্দজীকে জানালাম। তিনি আইন কানন বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রখর প্রশাসনিক বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন আবেদন করতে ও টাকা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে, কারণ হিসেবে বললেন তুমি তো পদাধিকার বলে সহ সম্পাদক সুতরাং সেই হিসাবে আবেদন কর। আমার তখনও ভয় সেক্রেটারী মহারাজ বিষয়টিকে কিভাবে নেবেন এই ভেবে। উনি বললেন যে তুমি সেক্রেটারী মহারাজকে বলবে যে আমার (গহনানন্দজী) কথামতো এই কাজ করেছ। কতখানি আস্থা এই নবীন ব্রহ্মচারীর উপর রেখেছিলেন। মনসাদ্বীপ স্কুলে শুরু হতেই প্রধান শিক্ষক হিসেবে কোন সাধু বা ব্রহ্মচারী ছিলেন না। স্কুলের পঠন পাঠনের মানও ভাল ছিল না। ফলে ছাত্র সংখ্যাও কম ছিল। পূজনীয় মহারাজ একথা জানতেন। তিনি বললেন স্কুলটির উন্নতি করার চেষ্টা কর। তাঁর নির্দেশ মতো সে চেষ্টা করি। নিয়ম মতো আমার ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমার সময় হলো। কিন্তু উনি বললেন এক বছর চালাও আমরা লোক দেখছি। T.C. হতে একজনকে পাঠানো হবে। একবছর তো পার হলো, কিছু মনসাদ্বীপে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিতে কেউ রাজী না হওয়ায় আরও একবছর থাকার কথা বললেন। এ সঙ্গে আশ্বাস দিলেন ভাবছো কেন? সন্ন্যাস তোমার ঠিক সময়েই হবে। সেই মতো আবার এক বছর দায়িত্ব পালন। তৃতীয় বছর আবার দেখা করলাম পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে উনি তখন মঠে আছেন। মজা করে বললেন তুমিই একজনকে ধরো যে যেতে ইচ্ছুক। আমি সবিনয়ে বললাম আমার কথায় যাবে কেন ? তখন বললেন আমরা তো আছি। পরে একজন অবাঙ্গালী ব্রহ্মচারীর নাম বললেন ও তাকে ডেকে আনতে বললেন। তাকে নিয়ে এলাম পূজনীয় মহারাজের কাছে। মহারাজ তাকে মনসাদ্বীপ স্কুলে যাওয়ার কথা বলামাত্র ব্রহ্মচারী বললেন—আমি তো বাংলা জানি না। মহারাজ হেসে বললেন—যা ফসকে গেল। পরে পূজনীয় মহারাজেরই উদ্যোগে নরেন্দ্রপুর হতে সুপ্রভানন্দজীকে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। আমাকে নির্দেশ দেন সুপ্রভানন্দকে কাজ বুঝিয়ে কলকাতার অফিসগুলিতে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং প্রধান শিক্ষক হিসেবে

সরকারী Approval করিয়ে দেওয়ার জন্য। সে জন্য যে কয়দিন লাগে কাজ গুছিয়ে T.C তে আসবে। দেরী হলেও অসুবিধা হবে না। মহারাজের নির্দেশ যথাযথ পালন করে ৬ এপ্রিল T.C. তে আসি, সুপ্রভানন্দজী সঙ্গে আসেন। ট্রেনিং সেন্টারে দ্বিতীয় বর্ষে ম্যানেজার হতে হয় পূজনীয় আচার্য মহারাজের নির্দেশে। তারপর পবিত্র ব্রহ্মচর্যব্রত অনুষ্ঠানের পরবর্তী posting এর দিন অন্যদের posting হলেও আমার আটকে রইলো।

পূজনীয় মহারাজ বললেন তোমার পরে হবে। পূজনীয় মহারাজ তখন সংঘের সহ সাধারণ সম্পাদক এবং posting এর দায়িত্ব ওনার। কয়েকদিন পর ডাকলেন মহারাজ, এবং বললেন তুমি যা করছিলে তাই কর। আমি বুঝতে না পারায় মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন ২য় বর্ষে তুমি কি কাজ করতে T.C. তে? আমি বললাম, মহারাজ আমাকে ম্যানেজার এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। মহারাজ বললেন এখন হতে এ কাজ সহ T.C. প্রিন্সিপাল মুমুক্ষানন্দের সহকারী হিসাবে কাজ করবে। শুনে সমবয়সী সাধুরা মজা করে বলতে শুরু করলেন ভাইস প্রিন্সিপাল।

এক বছরের মধ্যেই মহারাজের পরামর্শে আমাকে রহড়া আশ্রমে পাঠানো হলো কলেজের মামলার দেখাশোনা করার জন্য। এসব কাজে পূর্ব কোন প্রকার অভিজ্ঞতা নাই। আইনের ছাত্রও ছিলাম না। মহারাজ কিন্তু এ কাজের জন্য আমাকেই বেছে নিলেন। উনি অক্ষমকে সক্ষম করতে পারতেন। মহারাজের স্নেহের বন্ধনে অদৃশ্য ভাবে বাঁধা পরে গেলাম। রহড়া কলেজের হাইকোর্টের মামলার পর ১৯৮৫ তে নিয়ে এলেন মঠ মিশনের এস্টেট দেবার জন্য। সত্যরূপানন্দজী তখন সমাজসেবক শিক্ষণমন্দিরের অধ্যক্ষ হিসেবে মনোনীত হয়ে হয়েছিলেন। তখন সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ। ওনাদের দুজনের সম্পর্ক খুব মধুর ছিল, দাদাভাইয়ের সম্পর্কের মতো। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব প্রচার পূজনীয় মহারাজের অত্যন্ত প্রিয় কর্মের মধ্যে একটি। নানান অসুবিধার মধ্যেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামে পাহাড়ে এবং জঙ্গলে গিয়েছেন আনন্দের সঙ্গে।

১৯৮৬ সালে নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ৫০০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ওখানকার রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি হতে ধর্ম-সভায় বক্তব্য রাখার জন্য সাধু বক্তা হিসেবে চিঠি এসেছে পূজনীয় সাধারণ সম্পাদক মহারাজের নিকট। সেই কথা পূজনীয় বিমলাত্মানন্দজী তাঁর স্মৃতি কথায় উল্লেখ করেছেন সংক্ষিপ্তাকারে। পূজনীয় মহারাজ একজন বিশিষ্ট সংগঠক ও ভাবপ্রচারে নিবেদিত প্রাণ। চিঠিটি হিরন্ময়ানন্দজীর নিকট পেয়েই ওনার মনে এই সুযোগে নবদ্বীপাগত লক্ষ লক্ষ ভক্তদের মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ

ভাব প্রচার করার ইচ্ছা হলো। উনি পূজনীয় বিমলাত্মানন্দজীর নিকট খোঁজ নিলেন, নবদ্বীপ সম্পর্কে জানে এমন সাধুর। পূজনীয় বিমলাত্মানন্দজী তখন আমার নাম বলেন। কারণ নবদ্বীপ হতে কয়েকজন যারা মনসাদ্বীপে পড়াশোনা করেছে এবং নবদ্বীপবাসী একজন শিক্ষকও দেখা করতে আসতো সেইজন্য।

একদিন এস্টেটের কাজে কলকাতায় গিয়েছিলাম, সন্ধ্যায় ফেরার পর পূজনীয় গহনানন্দজীর ডাক। মহারাজের সঙ্গে দেখা করলাম, উনি চিঠি দেখালেন ও পরিকল্পনার কথা বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন কাজের জন্য কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাবে কিনা, এবং তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে কিনা ইত্যাদি। ১৫-২০ জনের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তবে আশ্রমের কিরকম অবস্থা তা আমার জানা নেই। পূজনীয় মহারাজ আশ্রমের সম্পাদক রামনারায়ণ ঘোষ ও অখিল সাহাকে ডাকলেন, কথাবার্তা হলো তাঁরাও সাগ্রহে রাজী হলেন। আমি দেখে এসে পূজনীয় মহারাজকে রিপোর্ট দিলাম এবং অনুরোধ করলাম উনিও যদি একবার দেখে ব্যবস্থাদি কিরূপ হবে বলে দেন। উনি রাজি হলেন। মূল পরিকল্পনাটি কেবল ধর্ম সভা নয় সেবা প্রতিষ্ঠান হতে মেডিক্যাল টিম, ডাক্তার, মেল নার্স, ঔষধ পত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম সহ। উদ্বোধন হতে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য বিক্রয়কেন্দ্র। নরেন্দ্রপুর হতে ফিল্ম শো ও প্রদর্শনী এবং আলোচনা সভা প্রভৃতিও থাকবে। পূজনীয় মহারাজ তখন সেবাপ্রতিষ্ঠান হতে সুভাষ মহারাজের দায়িত্বে মেডিক্যাল টীম, উদ্বোধনে যোগাযোগ করে প্রশান্ত মহারাজের দায়িত্বে বুকস্টল, নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদ হতে ফিল্ম শো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এবং ওনার একান্ত আগ্রহ পরিশ্রমে কাজগুলি সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপে মহাপ্রভু ও শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় পরিচালিত হয়। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যায় ওনার সাহচর্যে এসে অখিল সাহা রামনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রায় ১ লক্ষ টাকা খরচ করেন একজন সাধু ও বক্তাদের যাতায়াত খরচ, খাওয়া থাকার ব্যবস্থা। আলো-প্যাণ্ডেল মাইক প্রভতিতে। এখন যে ভাবধারার সৃষ্টি হয় তার ফলে পূজনীয় গম্ভীরানন্দ মহারাজের মন্ত্র দীক্ষাদানের আজও স্বতঃ প্রবাহিত। পূঃ গহনানন্দজী প্রচেষ্টাতেই এ কাজ সম্ভব হয়েছিল।

পূজ্যপাদ গহনানন্দজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

স্বামী বলভদ্রানন্দ

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চতুর্দশ প্রেসিডেন্ট পূজ্যপাদ গহনানন্দজীর নাম প্রথম শুনি ১৯৭৬ সালে যখন আমি ইনস্টিটিউট অব কালচারে ব্রহ্মচারী হিসেবে যোগদান করেছিলাম। কমলাকান্তের গানে আছেঃ 'না দেখে নাম শুনে কানে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হলো।' এই কলিটির অনুসরণে যদি বলি, তাহলে আমার তাঁর সম্বন্ধে প্রথম অভিজ্ঞতা হলো : 'না দেখে নাম শুনে কানে মনটি আমার ভীত হলো।' একটু ব্যাখ্যা না করলে কথাটা মোটেই বোঝা যাবে না। ইনস্টিটিউট অব কালচারেরই কোন মহারাজ ভর্তি আছেন সেবাপ্রতিষ্ঠানে, যে সেবাপ্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি তখন পূজ্যপাদ গহনানন্দজী। ঐ অসুস্থ মহারাজকে দেখতে যাচ্ছি আরেকজন সিনিয়র মহারাজের সঙ্গে। যাত্রা শুরু থেকেই উনি বলছেন : চুপি চুপি গিয়ে দেখা করেই চলে আসতে হবে। নরেশ মহারাজ (গহনানন্দজীকে ঐ নামেই সাধুরা তখন আড়ালে উল্লেখ করতেন) দেখে ফেললে মুশকিল।' তারপর সেবাপ্রতিষ্ঠানে গিয়েও উনি ঐরকম উক্তি কয়েকবার করলেন : 'নরেশ মহারাজ একদম চাননা, ব্রহ্মচারী ও অল্পবয়স্ক সাধুরা নিজেদের অসুখ- বিসুখ ছাড়া সেবাপ্রতিষ্ঠানে আসেন—অসুস্থ সাধুদের দেখবার জন্যও নয়। কাজেই এখানে বেশিক্ষণ থাকা চলবে না।' সেবাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে আমাদের অসুস্থ মহারাজকে দেখলাম, দু-একটা কথাবার্তা বলে, অন্য দু-একজন সাধুকে দেখে চটপট বেরিয়ে চলে এলাম। কিন্তু ঐ সিনিয়র মহারাজের এদিক-ওদিক সভয় চাউনি, ক্রমাগত গহনানন্দজীর 'নরেশ মহারাজ' নামের সশঙ্ক উল্লেখ এবং শশব্যস্তে সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্থান—'গহনানন্দজী' এবং 'নরেশ মহারাজ' নামদুটিকে চিরকালের জন্য আমার মনে ভয়-জড়িত রূপে মুদ্রিত করে দিল। সেই 'ভয়' পরবর্তীকালে শ্রদ্ধা মিশ্রিত হয়ে 'সমীহ' হয়ে উঠেছে—কিন্তু 'একেবারে ভয়শূন্য' কখনো হয়নি। এবং যা ঘটতে পারে ভেবে প্রথমদিন ভয় পেয়েছিলাম, সেই ভয়প্রদ ঘটনাটি এর পরে একদিন সত্যিসত্যিই ঘটেছিল। আবারও একদিন সন্ধ্যের পরে অসুস্থ কোন মহারাজকে দেখতে গিয়ে একেবারে ওঁর মুখোমুখি!

আমরা ঘাবড়ে গেলেও আমাদের সেই মুহূর্তে যা করণীয় সেটি করেছি অর্থাৎ পা ছুঁয়ে ওঁনাকে প্রণাম করেছি। উনি গম্ভীর ভাবে বললেন : 'কি ব্যাপার! ব্রহ্মচারীরা এইসময় এখানে কেন?" আমরা বললাম : মহারাজকে দেখতে এসেছিলাম, এখন চলে যাচ্ছি।' ঘটনাটি ঐখানেই শেষ। কিন্তু 'কানে শুনে' ওনাকে যতটা ভীতিপ্রদ মনে হয়েছিল, চোখে দেখে ততটা মনে হলো না।

এরপর মহারাজজীকে বহুবার দেখেছি—সেবাপ্রতিষ্ঠানে, বেলুড়মঠে, ইনস্টিটিউট অব কালচারে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। তাঁর সম্বন্ধে বহুকথা অন্যদের মুখেও শুনেছি।

তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের সেবক পূজ্যপাদ নির্বাণানন্দজীর কাছে ভুবনেশ্বর আশ্রমে ব্রহ্মচারী রূপে যোগদান করেছিলেন। রাজা মহারাজ নির্বাণানন্দজীকে ব্রহ্মজ্ঞানের আশীর্বাদ দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে নির্বাণানন্দজী যখন মঠ ও মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, তখন নিজ মুখেও বলেছেন যে, রাজা মহারাজের ঐ আশীর্বাদ তাঁর জীবনে বাস্তব হয়েছে এবং তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন।

নির্বাণানন্দজী ভাইস-প্রেসিডেন্ট রূপে যখন বেলুড় মঠে আছেন, সেই সময়ের, অর্থাৎ তাঁর জীবনের শেষের দিকের ঘটনা এটি। একদিন কোন একটি কাজে কয়েকবার গহনানন্দজীকে নির্বাণানন্দজীর কাছে যেতে হয়েছে। যতবার গহনানন্দজী ঢুকছেন, ততবার নির্বাণানন্দজী দাঁড়িয়ে উঠছেন। সেবকরা মহারাজকে বসিয়ে দিচ্ছেন, পূজনীয় গহনানন্দজীও তাঁকে বসতে বলছেন, তারপর দু-জনের কথোপকথন হচ্ছে। পূজ্যপাদ নির্বাণানন্দজী সেইসময় এমন অনেক আচরণ করতেন, যা তখন বালকোচিত বলে মনে হত। গহনানন্দজী কথা বলে বেরিয়ে যাবার পর সেই সেবকরা ছোট্ট শিশুকে যেভাবে বোঝায় সেইভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বলছেন—মহারাজ—উনি তো গহনানন্দজী—নরেশ মহারাজ । আপনার কাছে join করেছিলেন। আপনার থেকে অনেক junior। আপনি কেন উনি আসতেই উঠে উঠে দাঁড়াচ্ছেন? ওনারও খারাপ লাগছে, আমাদেরও দেখতে কেমন কেমন লাগছে। মহারাজ উত্তর দিলেন : 'তোরা কিচ্ছু বুঝিস না। আমি ওর মধ্যে গুরুশক্তি দেখতে পাচ্ছি, তাই উঠে দাঁড়িয়েছি।' ঘটনাটি নিশ্চয়ই ১৯৮৪ সালে বা তার আগে ঘটেছে, কারণ পূজ্যপাদ নির্বাণানন্দজী ১৯৮৪ সালে দেহত্যাগ করেছেন। তার আট বছর পরে ১৯৯২ সাল থেকে সঙ্ঘের নির্দেশে গহনানন্দজী দীক্ষা দিতে শুরু করেছেন।

গহনানন্দজীর কথা ভাবলেই আমাদের মনে এক শৃঙ্খলাপরায়ণ, সংযতবাক, প্রসন্ন-মুখ, দৃঢ়মনা ব্যক্তিত্বের ছবি ভেসে ওঠে। বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে

যখন আমরা ছিলাম, তখন কয়েকবার তিনি সমবেতভাবে আমাদের উপদেশ দিয়েছেন। তাতে আধ্যাত্মিক উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিয়মিত শরীরচর্চার উপদেশও দিতেন। শুনেছি, তিনি নিজে প্রতিদিন এত কাজের মধ্যেও শরীরচর্চা করতেন সঙ্ঘের কাজে শরীরটিকে মজবুত রাখতে এবং মজবুত শরীর তাঁর ছিল। যখন তিনি সাধারণ সম্পাদক তখনও দেখা যেত, সারাদিন এবং দীর্ঘ রাত পর্যন্ত সঙ্ঘের কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, পরদিন সকালে যখন তাঁর নির্দিষ্ট সময়ে ঘর থেকে বেরিয়েছেন, তখন তাঁর স্নান হয়ে গেছে, মুণ্ডিত মস্তক, পরিধানের পোশাক ফিট-ফাট; একেবারে প্রস্তুত সারাদিনের জন্য ঠাকুরের কাজ করতে—যা কখন শেষ হবে তিনি জানেন না, জানতে আগ্রহীও নন তিনি। যতক্ষণ প্রয়োজন হবে—কাজ করে চলবেন। তাঁর সেই অফুরন্ত এনার্জির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে অন্যেরা অনেক সময় হিমশিম খেয়ে যেত।

সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ দয়ানন্দজীর কাছ থেকে তিনি সেখানকার দায়িত্বভার নিয়েছিলেন এবং সুচারুভাবে দীর্ঘদিন তা পালন করেছেন। আর্থিক সমস্যা, প্রশাসনিক সমস্যা, প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক আন্দোলন—সব ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও সন্ন্যাসী- জনোচিত আদর্শকে আঁকড়ে ধরে অবিচল ছিলেন। আর্থিক সমস্যার কালের একটি পরীক্ষার কথা প্রভানন্দজী সূত্রে জানা যায়। প্রভানন্দজী তখন সেবা প্রতিষ্ঠানের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি—গহনানন্দজী সেক্রেটারি। প্রতিষ্ঠান সেইসময় খুব আর্থিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলছে। একমাসে সেবাপ্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ হয়েছে যে, কয়েকদিন পর কর্মীদের বেতন দিতে হবে, অথচ প্রতিষ্ঠানের ভান্ডারে কোন টাকা নেই। সবাই মিলে চিন্তা করছেন, কোথা থেকে টাকা আসবে। এই সময় একদিন পূজনীয় প্রভানন্দজীর কাছে একজন ভদ্রলোক কিছু অনুদান দেবেন বলে এলেন। যে পরিমাণ অর্থ তিনি দেবেন বলে এসেছেন তা ভালো অঙ্কের—অন্ততঃ কর্মীদের সেই মাসের বেতন দেবার সুরাহা হয়ে যাবে। কিন্তু ভদ্রলোক বললেন তিনি টাকাটা ক্যাশ-এ দেবেন এবং তার জন্য কোন রসিদ যেন কাটা না হয়। প্রভানন্দজী বললেন, সেটা সম্ভব না। ভদ্রলোক আরও অনুরোধ করলেন, কিন্তু প্রভানন্দজী রাজী হলেন না। ভদ্রলোক রুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। প্রভানন্দজীর মনে এবার চিন্তা এল, আমি কি ঠিক করলাম টাকাটা প্রত্যাখ্যান করে? ঠাকুরই আমাদের সঙ্কট দেখে টাকাটা পাঠিয়ে দিয়ে থাকেননি তো? গহনানন্দজী ফিরে এসে যখন জানবেন, তখন আমার উপর রুষ্ট হবেন না তো? এসব ভেবে সারাদিন তিনি খুব অশান্তিতে কাটালেন। গহনানন্দজী ফিরলেন বেশ রাত করে। ফিরতেই প্রভানন্দজী দুরু-দুরু বক্ষে ঘটনাটি জানালেন গহনানন্দজীকে। শুনেই গহনানন্দজী তাঁকে বললেন:

“ঠিক করেছ।’ প্রভানন্দজীর বুক থেকে পাহাড় নেমে গেল। ঠাকুরের এই কঠিন পরীক্ষায় (এবং নিশ্চয়ই আরও অনেক পরীক্ষায়) অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বলেই কি ঠাকুর এই দুজনকে পরবর্তীকালে দীক্ষাগুরু করেছেন ?

গহনানন্দজী তাঁর নিখাদ সন্ন্যাস জীবন, অধ্যবসায়, ধৈর্য্য, হৃদয়বত্তা এবং প্রশাসনিক বিচক্ষণতার জন্য আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। যখন কোন রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট হয়ে সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্মীদের একটি অংশ দিনের পর দিন তাঁকে উত্যক্ত করে চলেছে, অপমানও করেছে, তখনও তিনি ধৈর্য্য হারাননি। তাঁর মুখাবয়বে কোন অপমানিত হওয়ার অসন্তোষ কিংবা বিপন্ন হবার উদ্বেগ প্রকাশ পায়নি। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মহারাজরা তো কখনো তাঁদের অন্তর্জগতের প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন মুখ খোলেন না—বিশেষতঃ গহনানন্দজীর মতো সংযতবাক মানুষদের কাছ থেকে তো আশাই করা যায় না। কিন্তু সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের সম্পাদক রূপে, বিশেষত রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসেবে এবং পরবর্তীকালে সমগ্র সঙ্ঘের সহ-সম্পাদক এবং সর্বময় সাধারণ সম্পাদক রূপে তিনি যে গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন এবং সেই দায়িত্বের অ-বিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে জানা-অজানা অজস্র মানসিক চাপ অনায়াসে সামলেছেন—অন্তর্জগতের শক্তিতে শক্তিমান না হলে তা সম্ভব ছিল না।

অসীম ধৈর্য্য-মন্ডিত তাঁর অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি একজন সিনিয়র ট্রাস্টি মহারাজ (বর্তমানেও যিনি আমাদের মধ্যে রয়েছেন) আমাদের কাছে একদিন কথাচ্ছলে এইভাবে তুলে ধরেছিলেন : ধরো, একটা প্যাকেট খুলতে গিয়ে দড়িটায় গিঁট লেগে গেছে। অন্য কেউ হলে কিছুক্ষণ চেষ্টা করবেন গিঁটটা খোলার, তারপর একটা কাঁচি এনে গিঁটটা কেটে ফেলবেন। গহনানন্দজী কিন্তু কাঁচি আনবেন না, হাল ছেড়ে চলেও যাবেন না—গিঁটটা একসময় খুলে ছাড়বেন।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলি। পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্ম ও বেদান্তের জয়ধ্বজা উড্ডীন করে স্বামীজি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ১৮৯৭-র জানুয়ারি মাসে। কলকাতায় শিয়ালদা স্টেশনে পদার্পণ করেছিলেন ১৮৯৭-র ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে। সেই ঘটনায় শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে। অদ্বৈতআশ্রম, ইনস্টিটিউট অব কালচার ও উদ্বোধনের উপর দায়িত্ব এই অনুষ্ঠান পালনের। রেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে এবং তাঁরা রাজিও হয়েছেন যাতে একটি স্পেশ্যাল ট্রেন সুসজ্জিত হয়ে বজবজ থেকে শিয়ালদহে আসে স্বামীজির প্রতিকৃতিসহ—যেন স্বামীজিই পুনর্বার পাশ্চাত্য জয় করে ফিরছেন শতবর্ষ পরে। সব আয়োজন সম্পূর্ণ। মাত্র বোধহয় ৪-৫ দিন আছে। এমন

সময় গহনানন্দজীর মনে হলো, শিয়ালদহ স্টেশনের সিঁড়ির কাছে যদি স্বামীজির একটা মূর্তি থাকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে—তাই Ground Level-এ যারা কাজ করছেন তারা বিপন্ন বোধ করলেন। বিশেষ উৎসাহিত হলেন না ওঁর প্রস্তাবে। উনি সেটা বুঝলেন এবং ওনার স্বামীজির মূর্তিই চাই, ছবি নয়—সেটাও উনি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কেউই এই মুহূর্তে আরও অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে চাইছে না দেখে উনি আর কাউকে ঘাঁটালেন না। আমরা যেহেতু এই সময় কাজের সূত্রে প্রায় প্রতিদিনই শিয়ালদহ স্টেশনে যাতায়াত করছিলাম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ বিকেলে শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে দেখি, ঢাকুরিয়া-বালিগঞ্জ-শিয়ালদহ লাইনের যাত্রীরা প্ল্যাটফর্ম থেকে যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে, সেখানে দু-তিনজন কারিগর স্বামীজির একটি life size মাটির মূর্তি তৈরি করতে লেগেছে। পরদিন অনুষ্ঠান, সকালের আগেই স্বামীজির পূর্ণাবয়ব মূর্তি রঙ-টঙ সহ রেডি হয়ে গেল। অনুষ্ঠানটির সঙ্গে আরেকটি ভিন্ন মাত্রা যোগ হলো মূর্তিটির কারণে। ঐ জায়গায় ঐ মূর্তিটি থাকায় শিয়ালদহ স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করা হাজার হাজার যাত্রী সেদিন জান্তে অজান্তে বা ভ্রান্তে স্বামীজিকে একবারের জন্য হলেও স্মরণ করেছিল।

সঙ্ঘের নির্দেশে গুরুপদে বৃত হবার পর (প্রথমে সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষরূপে এবং শেষে সঙ্ঘ্যাধক্ষ-রূপে) তাঁর কৃপা-বিতরণের নির্বিচার রূপটি সকলেই দেখেছেন। যে-সব প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর বয়সের যে কোন মানুষ যেতে স্বভাবতঃই ইতস্ততঃ করবেন, সেখানেও তিনি অনেক কষ্ট সহকারে গিয়ে কৃপা বিতরণ করে এসেছেন। মহাপুরুষ মহারাজ শেষকালে নিজের অপার কৃপা-বিতরণ সম্বন্ধে বলতেন : ‘আমি এখন মা-গঙ্গা হয়ে গেছি।' গুরুরূপে গহনানন্দজী এঁদের সার্থক উত্তরসূরি রূপে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। এখনও পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অমোঘ মহামন্ত্র আর কারও মাধ্যমে এত অধিক মানুষের কাছে পৌঁছয়নি।

পূজ্যপাদ গহনানন্দজীকে সর্বদা শ্রদ্ধা ও সমীহ করেছি, সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তাঁর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অবশ্যই আমি যে-কেন্দ্রে ছিলাম সেই কেন্দ্রকে এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনকেও প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য আমি এমন কিছু লাভ করতে পারিনি, যার ভিত্তিতে একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা লেখা যায়। তবুও যে এই রচনাটি লিখলাম, তা এই বইটির উদ্যোক্তা স্বামী তৎপরানন্দের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে।

স্মৃতির আলোয় পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

স্বামী শান্তাত্মানন্দ

পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের একান্ত সান্নিধ্য লাভের পবিত্র সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল প্রায় তিন দশক ধরে অর্থাৎ ১৯৭৭ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বহু ব্যাপারে তিনি ছিলেন অসাধারণ। শান্ত স্বভাব, ধীর স্থির ও স্বল্পকথার মানুষ ছিলেন তিনি। বহু বছর ধরে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের মতো ৫৫০ শয্যাবিশিষ্ট বিবিধ বিশেষজ্ঞ সমন্বিত সুবৃহৎ এক হসপিটালের সেক্রেটারি ছিলেন, এমনকি তিনি যখন মঠ-মিশনের হেড কোয়ার্টারে প্রবীণ সহ-সম্পাদক ছিলেন তখনও কোন বিরক্তিকর ঘটনায় অথবা উত্তেজিত পরিবেশেও তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যেত না। প্রতিদিন বিকেলে তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানের জন্য রওনা হতেন এবং অধিক রাত্রে ফিরে এসে প্রথমেই স্নান সেরে নিত্যদিনের জপ-ধ্যান সাধনা সমাপ্ত করে আহারাদি করতেন। তারপর বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র থেকে আসা অপেক্ষারত সাধুদের সঙ্গে তাঁদের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। অবশ্যই, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার জন্য অনেক সাধুরা একটু অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন; কারণ তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করার ফলে তাঁদের রাত্রে ঘুমের জন্য বরাদ্দ সময় কম হয়ে যেত। কিন্তু চিন্তা করা যায়, এই পরিণত বয়সে সারাদিন ধরে সমস্ত দায়িত্ব পালনের পর প্রতিদিন বিকেলে কলকাতা যাওয়া ও সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে সেখানকার অফিস সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম সম্পন্ন করা এবং পুনরায় ফিরে এসে বেলুড়মঠের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা! কেবলমাত্র তাঁর মতো ব্যতিক্রমী কোন উচ্চমার্গের কর্মযোগীর পক্ষেই এভাবে কাজ করা সম্ভব।

তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বয়োজ্যেষ্ঠ সাধুদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ। তিনি তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ যে কোন সাধুর প্রতি তা তিনি যে কোন পদাধিকারীই হোন না কেন, এক বা দুই বৎসরের জ্যেষ্ঠ হলেও তাঁর প্রতি উচ্চ সম্মান

প্রদর্শন করতেন। এমন কি অন্যান্য সাধুদেরও এই রীতি অনুসরণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। একটি সন্ন্যাসী সঙ্ঘে এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে সাধুদের মধ্যে দায়িত্ববন্টন হয় তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করে নয়, সেখানে তাদের সাধুজনোচিত গুণাবলীই একমাত্র মাপকাঠি। হৃদয়ের দিক থেকে তিনি খুবই পরদুঃখকাতর ছিলেন। তাঁর অধীনে সেবাপ্রতিষ্ঠানে বহুদিন কাজ করেন এমন একজন সাধুর কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে, এক রাত্রে তিনি কিভাবে কলকাতার রাস্তায় অসহায়ভাবে শায়িত এক অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে তুলে এনে সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে তার চিকিৎসা করে তাকে রোগমুক্ত করে তোলেন। যদিও তাঁর সঙ্গে আমার খুব বেশি মাত্রায় কাজের আদানপ্রদান ছিল না, কিন্তু তাঁর সন্নিকটে থেকে এবং তাঁর জীবনশৈলী অনুধাবন করে এটাই মনে হয়েছে যে তাঁর জীবনই ছিল এক শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার।

আমার অনুভূতি

স্বামী পদ্মনাভানন্দ

দিল্লী আশ্রমে আমি যখন যুবা ব্রহ্মচারী ছিলাম, পূজনীয় মহারাজ সেখানে অফিসের কাজে বেলুড় মঠ থেকে আসতেন। পূজনীয় মহারাজ তখন রামকৃষ্ণ মঠের সহকারী সচিব ছিলেন (এখন এই পদের নুতন নামকরণ হয়েছে সহকারী সাধারণ সম্পাদক)। তিনি কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানেরও সম্পাদক ছিলেন।

আমি যখন যুব ব্রহ্মচারী সংঘে যোগদানের জন্য দিল্লি আশ্রমে গিয়েছিলাম, পূজনীয় মহারাজ খুব স্নেহপূর্ণভাবে আমায় খবরের কাগজ না পড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। আমি ওনার উপদেশ অনেক দিন পর্যন্ত পালন করেছিলাম। যা আমায় আধ্যাত্মিক জীবনে নিশ্চিতভাবে সাহায্য করেছে। আমি ওনার শান্ত ও নম্র আচরণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গিয়েছিলাম এবং এটা আমার কাছে একটা অনুভূতি।

কিছু বৎসর পরে যখন আমি বেলুড় মঠের প্রবেশনার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে চর্মরোগ চিকিৎসার জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠানে গেলাম, আমি বেলুড় মঠ এবং সেবাপ্রতিষ্ঠান উভয় স্থানেই উনার সঙ্গী হয়েছে। একদিন পূজনীয় মহারাজ, হঠাৎ একদিন শুভ সন্ধ্যাকালে ডাক পাঠালেন। বললেন, আমায় মালপত্র তুলতে এবং তাহার সঙ্গে যেতে। পূজনীয় মহারাজ তখন উচ্চপদস্থ সহকারী সচিব ছিলেন (পূজনীয় স্বামী বন্দনানন্দজী সেই সময় সাধারণ সম্পাদক ছিলেন) এবং ছিলাম সাধারণ ব্রহ্মচারী। তিনি খুব সরলভাবে আমায় বলরাম মন্দিরে যেতে বললেন। পূজনীয় মহারাজ আমায় উনার সঙ্গে গাড়ীতে করে বলরাম মন্দির নিয়ে গেলেন এবং পূজনীয় মহারাজ স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ মহারাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন (সেই সময় উনি দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার ছিলেন বলরাম মন্দিরের)। দুই ব্রহ্মচারী এবং পূজনীয় স্বতন্ত্রানন্দ সেই সময় চিকেন পক্স-এ ভুগছিলেন। অতঃপর আমি পূজনীয় মহারাজের থেকে বলরাম মন্দিরের পূজার দায়িত্ব নিলাম। পরে যখন বলরাম মন্দির ছেড়ে যাই, পূজনীয় মহারাজ সেবাপ্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিলেন। আমি মোহিত পূজনীয় মহারাজের নম্রতা, সরলতা, ভালোবাসা এবং সততার প্রতি সহানুভূতির দ্বারা। এই সমস্ত উপদেশ আমরা মহারাজের নিকট থেকে পেয়েছি।

কয়েকটি টুকরো ঘটনা

স্বামী বাণেশানন্দ

এটা ১৯৭৪ সালের কথা। আমি তখন কলেজে পড়ি। কোন এক উপলক্ষে আমরা বেলুড় মঠে গেছি। স্বামী গহনানন্দজী মহারাজকে প্রথম বার দেখি সেখানে। তিনি একা আমাদের সামনে শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের মন্দিরের কাছে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সৌম্য-সুন্দর চেহারা। মনে রাখার মতো। আমার সঙ্গী, আর এক ছাত্র, ওনাকে দেখিয়ে বলল যে, উনি স্বামী গহনানন্দজী, বর্তমানে কলকাতার শিশুমঙ্গল হাসপাতালের কর্ণধার এবং রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টি ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালক সমিতির সদস্য। সেদিন আর তাঁর সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করার সুযোগ ছিল না। তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে।

তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার ও জানার সৌভাগ্য হলো কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠে। ১৯৭৫ সালে আমি ব্রহ্মচারী হিসেবে মঠে যোগদান করে সেখানে ছিলাম। পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ—তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহসভাপতি—সেখানে থাকতেন। পুঃ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এসেছিলেন পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে। পূজনীয় মহারাজের নির্দেশে আমি রামবাবুর মন্দিরের সামনে অপেক্ষা করছিলাম। পূঃ গহনানন্দজীর গাড়ি এসে থামলে আমি এগিয়ে গেলাম তাঁকে স্বাগত জানাতে। তাঁর স্বভাবসুলভ সহাস্য মুখে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মহারাজ কোথায়?" বললাম, "তাঁর ঘরে। আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।" তিনি অনেকটা স্বগতোক্তির মতো করলেন, "কে কার জন্য অপেক্ষা করে, এটা বুঝলে হলো!" কথাটা আমার তো তৎক্ষণাৎ বোধগম্য হলো না! হওয়ার কথাও নয়। এই ঘটনার অনেক পরে বুঝেছিলাম তিনি কতটা শ্রদ্ধা করতেন পূঃ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজকে। সেই পূঃ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন এই কথা শোনার পর তাঁর ওই মন্তব্য। তারপর অতি আন্তরিকতার

সঙ্গে তিনি আমার নাম, কবে যোগদান করেছি, বয়স কত, ইত্যাদি জানতে চাইলেন। তাঁকে একটুও অপরিচিত বলে মনে হলো না তিনিও খুব সহজ-সরলভাবে ব্যবহার করলেন।

প্রথমে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে ও পরে পূঃ রামবাবুর মন্দিরে প্রণাম করে পূঃ মহারাজের ঘরে গেলেন। প্রণাম, সামান্য জলযোগ ও কথাবার্তার পরে তিনি ফিরে যাওয়ার জন্য বেরোলেন। গাড়িতে বসে আমাকে নাম-ধরে ডাকলেন ! বললেন, "ওহে, এই বয়স থেকে খুব জপ করবে। তবে 'নামে- রুচি' হবে।" আমি মাথা হেঁট করে তাঁর কথাটা বোঝার চেষ্টা করছি দেখে আবার বললেন, "তাঁদের কৃপায় সব হয়ে যায়।"

এরপরে যখনি দেখা হয়েছে আমাকে দ্বিতীয় বার তাঁকে আমার নাম বলতে হয়নি। এই গুণটি আমি আমার জীবনে খুব কম লোকের মধ্যে দেখেছি। সেজন্য এর পরে যতবার উনি আমাকে দেখেছেন, আমার নাম ধরে এবং তাঁর স্বভাবসুলভ সহাস্য মুখে সম্বোধন করেছেন। উনি সাধারণতঃ "কি-হে" বলে সম্বোধন করতেন, যা বাংলাদেশে সুপ্রচলিত।

তিনি ও পুঃ শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজ প্রায় প্রতি মাসে গাড়ি করে বেলুড় মঠের অছি-পরিষদের মিটিং-এ যেতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত, ঝামাপুকুর লেন-এর শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার তাঁর গাড়িতে করে, পূঃ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজকে শিয়ালদার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের সামনে পৌঁছে দিতেন। সেখান থেকে তিনি ওঁদের গাড়িতে করে মঠে যেতেন। এই রুটিন চলেছিল বেশ কয়েক বছর ধরে। বেশির ভাগ সময়ে যোগোদ্যানের সঙ্গে যুক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকালিদাস দে মহাশয়ের গাড়িতে পূঃ মহারাজ কাঁকুড়গাছিতে ফিরে আসতেন। কখনো-কখনো পূঃ দয়ানন্দজীর গাড়ি তাঁকে নামিয়ে দিয়ে যেত। তখন সাধারণতঃ ওঁরা গাড়ি থেকে নামতেন না। একবার আমি আর শিখরেশ মহারাজ পূঃ মহারাজকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নেওয়ার পরে, শিখরেশ মহারাজ পূঃ মহারাজকে নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। সেদিন পূঃ গহনানন্দজী একাই গাড়িতে ছিলেন। আমাকে কাছে ডেকে বললেন, "দেখলে শিখরেশ কিভাবে যত্ন করে পূঃ মহারাজকে নামিয়ে নিল। একেই বলে সেবা।"

লক্ষ করেছি, যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তিনি প্রথম কথা জিজ্ঞেস করতেন, "কিহে, কি জন্য এসেছো তা মনে আছে ত?" আমার একটু আশ্চর্য লাগত! ভাবতাম,

এটা আবার জিজ্ঞেস করার দরকার আছে! এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এখন দেখছি সবার নিজেকে এ প্রশ্নটি সর্বদা করা খুব দরকার ! ! ছোট একটি প্রশ্ন। কিন্তু এর অভ্যাস মহা-মহা বিপদ থেকে বাঁচতে এক বড় উপায়। নাহলে আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা অনেক মনোহারি ও মনোরঞ্জক উপকরণ। তার উপর রয়েছে ক্ষমতা-পদাধিকার, নাম-যশ, ইত্যাদির জ্বালাতন। তাদের অমোঘ ক্ষমতা আছে পথিককে সহজে লক্ষভ্রষ্ট করার। শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীচরণ সদা-সর্বদা স্মরণে না থাকলে সমূহ বিপদ। সন্ন্যাস জীবন, শাস্ত্র বলছেন, "ক্ষুরস্য ধারা, নিশিতা, দুরত্যয়া দুর্গম-পথঃ তৎ, কবয়ো বদন্তি !" অর্থাৎ জ্ঞানীরা বলেন যে এই পথটি শাণিত ক্ষুরের ধারার উপর দিয়ে হাঁটার মতো দুরতিক্রম্য। অতি খাঁটি কথা। কারণ এটি মৃত্যুরাজ বা ধর্মরাজ যমরাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ উক্তি। তিনি জীবন-এর দ্বারপ্রান্তের দুদিকের সত্য জানেন।

সেবাপ্রতিষ্ঠানে নিজের বা অন্যের চিকিৎসা সম্পর্কিত ব্যাপারে আমাকে যেতে হয়েছে অনেক বার। সেইসূত্রে তাঁর সঙ্গেও অনেক বার দেখা করতে হয়েছে। জানতাম তিনি খুব ব্যস্ত মানুষ। তবুও তিনি সময় দিয়ে আমার মতো ছোটদের কথা মন দিয়ে শুনতেন। প্রথমেই জিজ্ঞেস করতেন, "মহারাজ (পূঃ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী) কেমন আছেন?" দেরি হয়ে গেলে সাধু-নিবাসে গিয়ে খেয়ে যেতে বলতেন। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের এই দিকগুলি ধীরে ধীরে আজ হারিয়ে যেতে চলেছে। আজ কারও সময় নেই অন্যের জন্য, তা সে ব্যস্ত হোক বা কর্মহীন হোক। কী নিয়ে যে সব্বাই ব্যস্ত তা বোঝা যায় না। একবার আমি উপোস করে সকাল সকাল গেছি রক্ত দিতে। কাজ হয়ে যেতে অফিস থেকে পূঃ সুজিত মহারাজ (স্বামী লোকনাথান্দজী-ইনি আর এক অতি স্নিগ্ধ, সহানুভূতিশীল মহাপ্রাণ।) আমাকে সাধু-নিবাসে পাঠালেন প্রাতঃরাশের জন্য। আমি খাচ্ছি তখন উনি ঘর থেকে বেরোলেন ও টেবিলে খেতে বসলেন। রান্নাঘরের ছেলেটি বলল যে আমি রক্ত পরীক্ষার জন্য এসেছি। পূঃ মহারাজ আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "রক্ত দেওয়া হয়েছে?" আমি সম্মতি-সূচক মাথা নাড়াতে উনি ছেলেটিকে বললেন, "ওকে ডিম দাও। এখন পেট ভরে খেতে বাধা নেই।" একটু থেমে বললেন, "তুমি ত নিরামিষ আশ্রমের লোক। আর কিছু খাবে? এখানে মাছের চপ আছে। গতকাল কোন ভক্ত এনেছিলেন।" আমি সেটাও খেলাম।

সন ১৯৮৩ সালে আমরা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে দীক্ষিত হই। সেই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে আমরা তাঁর কাছে যাই কিছু উপদেশ নেওয়ার জন্য। তাঁর একটি কথা আমার মনে গেঁথে যায়। তিনি বলেছিলেন, "দেখ তোমরা যে জুনিয়াররা, সিনিয়রদের সমালোচনা করো। এটা একটা চিরন্তন প্রথা। তাহলে যারা এখন সমালোচনা করছে তারাই কদিন

পরে সমালোচিত হবে। উপায় কি? উপায় হচ্ছে, তোমরা সমালোচনার বদলে বোঝার চেষ্টা করো। ব্যস, এটাই প্রথা হয়ে যাবে।" আমি আর এই কথার উপর কোনো টিপ্পনি দিয়ে এই মহাবাণীর গুরুত্ব লাঘব করব না। "বোঝে প্রাণ বোঝে যার!"

তারপর আমার শিলং-এ বদলি হয়। পূঃ গহনানন্দজী মহারাজ একবার শিলং ও চেরাপুঞ্জি পরিদর্শনে এলেন। মাঝরাস্তায় নংপো বলে এক জায়গা আছে. নংপোর পরে আমাদের গাড়ি, যাতে করে তাঁকে নিয়ে আসা হচ্ছিল, খারাপ হয়ে যায়। বিকেল গরিয়ে সন্ধ্যে, সন্ধ্যে গরিয়ে রাত্রি হয়ে গেল। পাহাড়ের ওই ঠান্ডার মধ্যে সবার হয়রাণির একশেষ। অন্যরা ভাবছিলেন তিনি কি মনে করছেন। আশ্চর্যের কথা, তিনি কিন্তু খুবই শান্ত হয়ে একটা পাথরের উপর বসে, কোন বই বা কিছু পড়ছিলেন। তখনকার দিনে মোবাইল ফোন-টোন ছিল না। শুধুমাত্র খবর এসেছিল যে গাড়ি খারাপ হয়েছে। যাইহোক, অবশেষে দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা পরে এক শেয়ারের গাড়িতে করে তাঁকে শিলং-এ আনা হলো। আমি তো তাঁর জন্য রান্না করেছিলাম। তিনি খুব কম খেতেন। শিলং-এ গরম খাবার খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায়। তাঁর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে আমি ছোট ছোট ষ্টীলের বাটিতে করে সব পদ রেখে, বড় এক গামলায় স্বল্প জল দিয়ে তার মধ্যে বসিয়ে রেখেছিলাম। রান্নার ওই গামলাটি অল্প আঁচের উপর বসানো ছিল। তাই তিনি যখন খেতে বসলেন অভূতপূর্ব 'হট কেসটি' তাঁর সামনে রাখলাম। দেখেই কি হাসি তাঁর। কার এই সৃজনশীল বুদ্ধি, জানতে চাইলেন। সবটা বাটি থেকে একটু একটু করে তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন। শেষে বললেন, "আপ্যায়নটা মন্দ হলো না। কি বল ? শীতের দেশে 'ওয়ার্ম ওয়েলকাম'!!" আমার চোখের সামনে সেই দৃশ্য এখনো ভাসছে।

কয়েক বছর পরে আবার একবার শিলং-এ এলেন। যাওয়ার সময় আমাকে বললেন, "এবার ডাক আসবে।" আমার কাছে কথাটি হেঁয়ালির মতো লাগলো। তার কিছুদিন পরে আমাদের মঠাধ্যক্ষ স্বামী রঘুনাথানন্দজী আমাকে ডেকে বললেন, "তোমাকে ওঁরা বেলুড় মঠের প্রধান কার্য্যালয়ে বদলি করেছেন।" আমি ১৯৯২-র এপ্রিল মাসে মঠে চলে এলাম। তখন উনি মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে সবেমাত্র অব্যাহতি পেয়েছেন। তিনি তখনো প্রধান কার্য্যালয়ে তাঁর ঘরে থাকতেন।

একদিন আমি সকালে স্নানের পর আমার রোজকার পরার কাপড়টি ধুয়ে বারান্দায় একটি তারে শুকোতে দিয়ে কাজে বেরিয়ে গেছি। ফিরতে দেরি হয়েছে। সন্ধ্যের

আঁধারে আমি কাপড়টি তুলে এনেছি। ঘরে এসে দেখি যে ওটা অন্যকারো কাপড়। ফিরে গিয়ে লাইট জ্বালিয়ে দেখলাম ওখানে আর তো কারো কাপড় নেই। কি হলো? তখন সামনে দিয়ে একটি ছেলে যাচ্ছিল। সে প্রধান কার্যালয়েরই কর্মী। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে কিছু জানে কিনা। সে বলল যে পূঃ মহারাজ ঐ কাপড়টি নিজে তুলে নিয়ে গেছেন আর ওকে দিয়ে একটি নতুন কাপড় ওখানে রেখেছেন! আমি তো ভেবে পেলাম না আমার নিজের কাপড়টা কি দোষ করেছিল! যাইহোক, পরের দিন সকালে আমি উনার ঘরে গিয়ে উনাকে নতুন কাপড় দেওয়ার জন্য প্রণাম করলাম এবং আমার কাপড়টি ফেরত চাইলাম। উনি একটু মুচকি হেসে বললেন, "নাহে, উটি আর পাচ্ছোনি!" আমি হাসবো না কাঁদবো? পরে বললেন, "দেখ শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় আমাদের এখন সে দৈন্য নেই যে তুমি ছেঁড়া কাপড় পরবে।" তিনি উঠে গিয়ে আমার পুরোনো কাপড়টি এনে আমার হাতে দিলেন। আমি আর তাঁর চোখের দিকে তাকাতে পারিনি। আবার প্রণাম করে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি।

দোষে-গুণে মানুষ আমরা। ভুলভ্রান্তি আমরাই করি। তবু এইসব টুকরো ঘটনা জীবনকে সমৃদ্ধ করে; পথ চলাটা অংশতঃ সহজ হয়।

অন্তঃশীলা কিছু অঙ্কন রেখা

স্বামী যোগাত্মানন্দ

১৯৭৯ সাল থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে বেশ কয়েকবারই পরমপূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সান্নিধ্য লাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল (ঘটনাচক্রে ওনার সঙ্গে আমার প্রথম ও শেষ উভয় সাক্ষাৎকারেরই স্থান ছিল নাগপুর মঠ)। কোন গম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা অথবা কাউকে মৃদু তিরস্কার করার সময়েও তাঁর মুখমণ্ডলে থাকতো এক অদ্ভুত মনোরম প্রশান্তির প্রকাশ। মহারাজজীর সুশৃঙ্খল জীবন ও কর্মপদ্ধতি, আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গাদি প্রভৃতির মধ্যে প্রকাশ পেত তাঁর প্রকৃত ব্যবহারিক আধ্যাত্মিকতার অমূল্য গুণরাজি যা তাঁর ধ্যানমগ্নতা ও প্রার্থনাপরায়ণতার মধ্যেও পরিস্ফূট হয়ে থাকত। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাহিদা, সব রকম পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরণের কাজকর্মের পরিণাম জ্ঞান বিশেষ করে তা ভবিষ্যতে মঠ-মিশনকে এবং মানুষের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করবে সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর। শ্রীশ্রীঠাকুর কেন্দ্রিক তাঁর জীবনের বহু ঘটনার প্রেরণামূলক স্মৃতি যা তাঁর বিভিন্ন ধরণের কাজেকর্মে পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিফলিত হতো, সেসব আজ মনের পর্দায় ভেসে উঠছে।

১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে নাগপুর রামকৃষ্ণ মঠের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে যোগদান করতে মহারাজজী নাগপুর এসেছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বেশ কিছু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আগমন ঘটেছিল নাগপুরে এই উৎসবকে উপলক্ষ্য করে। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে ছিলেন পরমপূজ্য স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, অভয়ানন্দজী, রঙ্গনাথানন্দজী ও হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজগণ। আমি তখন ব্রহ্মচারী—মাত্র দুবছর হয়েছে মঠে যোগদান করেছি কিন্তু তখনও পর্যন্ত ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিনি। যেহেতু তখনও পর্যন্ত আশ্রমের অন্য কোন শাখায় যাবারও সুযোগ ঘটেনি তাই এটাই ছিল মঠের কোন অনুষ্ঠানে আমার প্রথম যোগদান যেখানে আমি একসঙ্গে এতজন

সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যলাভ ও তাঁদের কথা শোনার সুযোগ পেলাম। সে সময় পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজীকে দর্শন করার স্মৃতি আমার মানসপটে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি সেসময় সেবাপ্রতিষ্ঠানের সর্ব্বোচ্চপদে ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে একটা নির্মল আকর্ষণের অনুভূতি ছিল। তাঁকে দৈনন্দিন প্রণামের সময় তিনি প্রতিদিনই অল্প কিছু কথাবার্তা বলতেন যার বেশিরভাগই ছিল তাঁর আশীর্বচন এবং আমার দৈনন্দিন কাজকর্ম ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থাদি যেমন শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, স্বামীজির উপদেশাবলী, শ্রীমদ্ভগবদগীতার অধ্যয়ন সম্বন্ধে অনুসন্ধান। তাঁর অল্প কিছু কথার চেয়েও তাঁর স্নেহময় ও যত্নশীল মুখাবয়বের প্রশান্তি আমার মনে গভীরভাবে দাগ কাটে।

দুবছর পার হয়ে গেল এবং আমি বেলুড়মঠে শিক্ষানবিশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এলাম ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে (সেসময় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একটি অন্য বাড়িতে ছিল)। পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ সাধারণত সপ্তাহে দুদিন মঠে আসতেন, মঠ ও মিশনের সহ-সচিব হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। অন্যান্য দিনগুলিতে তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে শ্রমসাধ্য কাজগুলি সম্পন্ন করতেন। এই দুবছরের মধ্যে যখনই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হতো আমি তাঁকে প্রণাম করতাম। তবে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের দিনগুলিতেই তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কথাবার্তার সুযোগ আসতো। আমার বেলুড়মঠে থাকার প্রথম বৎসরে একবার আমি তখনকার হেডকোয়ার্টারের অফিসে তাঁর ঘরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রত্যেক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে চাইতেন। সেই সূত্রে পালাক্রমে আমারও সুযোগ এল। আমাদের অধ্যক্ষ মহারাজ (প্রয়াত পরমপূজ্য মুমুক্ষানন্দজী) বললেন, আমাকে ঠিক ১০টার সময় পরমপূজ্য গহনানন্দজী মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে হয়েছিল সকাল ১০ টায়, কিন্তু না, এটা ছিল রাত ১০টা। কি সদাশয় অনুগ্রহ! ঘুমবো কখন? প্রশিক্ষণকেন্দ্রে আমাদের সবাইকে রাত ১০.৩০ টার আগেই শুতে চলে যেতে হত। নাহলে ভোর ৪টের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে মঙ্গলারতিতে যোগদান করা বিশেষ কঠিন হতো। পরে আমি মানতে পারলাম পরমপূজ্য গহনানন্দজী মহারাজ অনেক বেশি রাত পর্যন্ত কাজকর্ম করেন। তাঁর এরকম বহু বিশেষ গুণাবলীর মধ্যে এটি অন্যতম। কিন্তু রাত জেগে কাজ করল মানে এই নয় যে তিনি দিনের বেলা অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নেন। আসলে অন্যান্যদের তুলনায় তাঁর ঘুমের প্রয়োজনটাই ছিল অত্যন্ত কম। আমি বেশ কয়েকটি ভাল ভাল বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে পড়েছিলাম যে আমরা কেন ঘুমাই এবং ঘুম আমাদের শরীরে কি কাজ করে। ঐ অধ্যয়ন থেকে আমি জানতে পারি যে এক সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত মনের কাছে ঘুমের প্রয়োজন অনেক কম।

সেসময় ছিল ঘন ঘন লোডশেডিং-এর দিন। মহারাজজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের সময়েও এইরকম লোডশেডিং ছিল আর তখনকার দিনে জেনারেটরও এত শক্তিশালী ছিল না যে প্রতিটি ঘরকে আলোকিত করতে পারে। সুতরাং আমরা অতি ক্ষীণ হ্যারিকেনের আলোতে বসেই কতাবার্তা বলছিলাম। তিনি অতিশয় স্নেহমাখা কণ্ঠে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে আমার মধ্যে সাধু হবার ইচ্ছা জাগ্রত হলো যেখানে আমার পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তা তারও আগে দরকার। আমাদের কথোপকথনের প্রধান ভাষাটা ছিল বাংলা (যা আমি তখনও পর্যন্ত একটু একটু শিখেছি এবং পরবর্তীকালেও বরাবর আমরা এই বাংলা ভাষাতেই কথাবার্তা বলেছি)। তিনি বললেন, প্রশিক্ষণকেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মঠ-মিশনের পবিত্র আদর্শ ও ভাবধারাকে নবাগতদের হৃদয়াঙ্গম করানো। সেখানে পড়াশোনা যদিও প্রয়োজনীয়, কিন্তু প্রধান নয়। স্বাস্থ্যকর খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস ও দৈনন্দিন শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্যও তিনি বিশেষ করে বললেন। "আমি দেখি তোমাদের মতো অনেকেই চিকিৎসার জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠানে আসো এবং আমার ভেবে অবাক লাগে যে এই অল্প বয়সে তোমরা এত অসুস্থ হও কি করে?"—খুব কঠিন গলায় এই কথাগুলি তিনি বললেন। "যদি তোমাদের স্বাস্থ্য ভালো না থাকে তোমরা পড়াশোনা, ধ্যানসাধনা করবে কি করে? যদি তুমি সর্বদা সঙ্ঘ থেকেই সেবা নিতে থাক তাহলে সঙ্ঘের জন্য তোমার সেবার কাজ তুমি করবে কিভাবে?" যদিও মহারাজজীর বাচনভঙ্গীর মধ্যে একটা তিরস্কারের ভাব ছিল, কিন্তু সাধু হতে আসা এই নবাগতদের সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে সত্যতা ছিল। বছর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যেমন তিনি বলেছিলেন, সুস্বাস্থ্য ও শারীরিক সুস্থতার গুরুত্ব বুঝতে পারলাম। সন্ন্যাসীর জীবন খুবই দুর্বিষহ হয়ে ওঠে যদি তাঁর জীবনের অর্দ্ধেক সময় নানারকম অসুখের চিকিৎসা নিয়েই কাটাতে হয়।

১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, যখন আমরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সকলে ব্রহ্মচারী দীক্ষালাভের জন্য আবেদন করি তারও একমাস মতো আগে আমার মহারাজজীর সঙ্গে পুনরায় ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয়বার সুযোগ এল। আমার লিখিত নিবন্ধে এমন কিছু ছিল যা থেকে মঠ-মিশনের আদর্শ সম্বন্ধে আমার মনের কিছু সন্দিগ্ধতা প্রকাশ পায়। সুতরাং তিনি আমাকে তলব করেছিলেন। মহারাজজী জানালেন সে মঠে পাকাপাকিভাবে যোগদানের পূর্বে মঠ-মিশনের আদর্শ ও ভাবধারা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। ৬/৭ বছর ধরে মিশনের সংস্পর্শে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশাবলী পাঠ করার পরেও যদি শ্রীশ্রীঠাকুরের অবতারত্ব সম্বন্ধে মনে

কিছুমাত্রও সংশয় থাকে, তবে মিশন থেকে চলে যাওয়াই ভাল। আমরা চাই পূর্ণ সমর্পণ, পূর্ণ প্রতিশ্রুতি। আমি তাঁর বক্তব্যের সমর্থন করলাম যে তিনি প্রথমেই এ ব্যাপারে স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট হয়ে নিতে চান। যখন আমি আমার লিখিত বক্তব্যের বিশদ বর্ণনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের অবতারত্ব ও মঠ-মিশনের আদর্শ গ্রহণের প্রতি আমার একান্ত আনুগত্য ও আমার পূর্ণ স্বীকৃতি জানালাম তখন তিনি সন্তুষ্ট হলেন। যদিও মহারাজজী অত্যন্ত দয়ালু ও পরদুঃখকাতর ছিলেন, কিন্তু মঠ-মিশনের আদর্শ ও সন্ন্যাসজীবনের সঙ্গে কোনরকম আপস করাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করতেন।

"তোমার কাছে কি আরও ভাল কোন সমাধান আছে?"—টেলিফোনের মাধ্যমে তিনি একথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। **১৯৮৩** থেকে **১৯৯৩** সালের মধ্যে কয়েকবারই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়, যদিও বিশেষ কোন ব্যক্তিগত আদান-প্রদান নয়। কিন্তু তিনি সর্বদা আমাকে মনে করতেন এবং তাঁর স্বভাবসুলভ স্নেহময় কণ্ঠে আমার সম্বন্ধে খোঁজখবর করতেন। সে সময় তিনি মঠ-মিশনের সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ ছিলেন এবং অধ্যাত্মপিপাসু ব্যক্তিদের দীক্ষা দান উপলক্ষ্যে নাগপুর মঠে এসেছিলেন। সে সময় নাগপুর আশ্রমের অনেক রকম কাজের দায়িত্ব আমার ওপর ছিল, যেহেতু নাগপুর মঠের অধ্যক্ষ মহারাজ পরমপূজ্য স্বামী ব্যোমরূপানন্দজী শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। আমি ফোনে জানতে পারলাম যে পরমপূজ্য গহনানন্দজী মহারাজ ট্রেনে নাগপুর আসবেন কারণ প্রয়োজনীয় দিনে বা তার আগের দিনেও কলকাতা থেকে নাগপুর আসবার কোন বিমানসেবা নেই। আমি জানতাম যে এই দীর্ঘ ট্রেন যাত্রা খুবই কষ্টকর। যখন তাঁকে একথা জানালাম তার উত্তরটি আজও আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে—"এর থেকে ভাল কিছু তোমার জানা আছে কি? যদি না থাকে তবে যা সুলভ তারই সদব্যবহার কর।" মাত্র দু সেকেন্ডের মধ্যে তাঁর সিদ্ধান্তের পূর্ণ যৌক্তিকতা ও স্বীকৃতি কার্যকরী হয়ে গেল। আপাতভাবে সাধারণ একটি বাক্য কিন্তু উচ্চারিত হলো এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে। কাজটা করতে হবে সুতরাং যা সহজলভ্য তার থেকেই যথোপযুক্ত সুবিধা গ্রহণ করতে হবে। যা দুষ্প্রাপ্য, তার জন্য অযথা সময় নষ্ট করার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাঁর এই কথাগুলি আমার জীবনে আমাকে অসংখ্যবার অসংখ্যভাবে আমাকে রক্ষা করে এসেছে। তিনি যখন নাগপুরে এলেন, এই প্রথম আমি এক মধুর অন্তরঙ্গতার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেলাম। এই নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমার সেই সময়কার স্মৃতি কথাগুলি বর্ণনা করা খুবই দুরুহ ব্যাপার। একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে ধ্যান ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ, সমস্ত কাজেকর্মে পূজা করার মানসিকতা আনয়ন এবং দেহকেন্দ্রিকতা

ব্যাতিরেকেও নিজের শরীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকার অভ্যাস শুধুমাত্র তাঁর নিকট সান্নিধ্যে থেকে এবং তাঁকে অনুসরণ করলেই প্রকৃত অর্থে বোধগম্য হবে।

আমাদের শাখা আশ্রমগুলির চতুষ্পার্শ্বের শূন্য জমি সংক্রান্ত সম্পত্তি ক্রয়ের ব্যাপারে মহারাজজী বরাবরই আগ্রহী ছিলেন, একথা সর্বজনবিদিত। যখন আমি নাগপুরে ছিলাম (একই ঘটনা যখন আমার শিলং থাকাকালীন তিনি শিলং-এ এসেছিলেন) আমাদের লাইব্রেরী সংলগ্ন আশপাশের জমি ক্রয়ের ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করেন। সেই জমি সংক্রান্ত সমস্ত দলিলাদি-সহ সেই সংক্রান্ত মানুষজনকে তিনি ডেকে পাঠান। ভূমি-ক্রয়াদি ব্যাপার কেন ও কিভাবে শীঘ্র সম্পন্ন করা দরকার সে ব্যাপারে আমাদের উপদেশ ও নির্দেশাবলী দিতে থাকেন। দেখ টাকা তো পরবর্তীকালেও পাওয়া যাবে, কিন্তু একবার যদি আশ্রম সংলগ্ন ফাঁকা জমিটি হস্তান্তর হয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের কর্ম প্রসারণের আর কোন জায়গা থাকবে না তাই শুধু নয়, পারিপার্শ্বিক জমিতে ব্যাবসা-বাণিজ্য ও নানাবিধ কার্যকলাপের যাবতীয় শব্দদূষণ আমাদের অসন্তোষেরও কারণ হতে পারে। তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এই বলে যে জমিগুলি অধিগ্রহণের ব্যাপারে আমাদের সর্বজনসম্মত পরিকল্পনাও সশক্তিক প্রচেষ্টার অভাবে আমাদের চতুষ্পার্শ্বে এরকম ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে। ব্যাক্তিগতভাবে যেহেতু আমি একজন জমি প্রসারণ বিশেষজ্ঞ নই সেহেতু আমার পক্ষে এসব ধারণা হৃদয়াঙ্গম করা খুবই মানসিক প্রচেষ্টার ব্যাপার ছিল, তবুও তাঁর উদ্বেগের কারণগুলি আমি অনুভব করতে পারছিলাম।

১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে আমি শিলং আশ্রমে স্থানান্তরিত হলোম। পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ শিলং আশ্রমের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত ছিলেন যেহেতু তিনি সেখানে বেশ কয়েকবছর কাজ করেছিলেন। কেবলমাত্র শিলং-এর প্রবীণ ভক্তগণই নন, অবিভক্ত আসাম-সংলগ্ন এলাকার বহু ভক্ত ও তাঁর সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত ছিলেন এবং তিনি খুব সম্প্রীতির সঙ্গেই এই হৃদ্যতা বজায় রেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ভক্তদের সেসব প্রিয় পুরনো দিনের অনেক সুন্দর সুন্দর ঘটনার কথা শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়—চিকিৎসালয়ের উন্নতিকল্পে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও আশ্রমের উন্নতির জন্য তিনি কিভাবে কাজ করতেন ইত্যাদি সব। তাঁর অসাধারণ প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম ও বিচক্ষণ পরিচালন ক্ষমতার গুণে শিলং আশ্রম কুইন্টল হলোটি অধিগ্রহণ করতে পেরেছিল। যেখানে ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ একটি ভাষণ দেন (এটি অবশ্য পরবর্তীকালে হয় যখন পরমপূজ্য মহারাজজী মঠ-মিশনের সাধারণ সম্পাদক এবং ক্রমে সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন)। এই কাজের সঙ্গে

সংযুক্ত বহু ব্যক্তির কাছ থেকে আমি সেই সময়কার সব ঘটনার কথা জানতে পারি।

শিলং আশ্রমের তখন ৬০ বৎসর পূর্ণ হয়েছিল এবং আমরা ৩-৪ দিনের একগুচ্ছ অনুষ্ঠানসহ আশ্রমের হীরক জয়ন্তী উৎসব পালনের পরিকল্পনা করেছিলাম। পরমপূজ্য মহারাজজী সেসময় মন্ত্রদীক্ষা প্রদান উপলক্ষ্যে আগরতলা যাচ্ছিলেন। তিনি সেখানেই এই উৎসব নিয়ে আলোচনা করবার জন্য সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে বললেন। সেই সাক্ষাৎকারে (যথারীতি অধিক রাত্রে আয়োজিত) তিনি অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন যে শিলং আশ্রম উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত। "সাতটি বোন ও একটি ছোট ভাই"—যে সাতটি রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়েছে তিনি তাদের উপমা দিলেন এবং নতুন সংযুক্ত সিকিমের কথা বললেন। এই সমস্ত রাজ্যকে এই উৎসবে সামিল করতে হবে, সে কথা জানালেন। উপজাতি উন্নয়নের ওপর একটি বিশেষ সম্মেলন আয়োজনের প্রয়োজনীয়তার কথাও খুব প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন। তাঁর এই সমস্ত নির্দেশাবলী আমি লিখিতরূপে সংগ্রহ করে নিলাম। মঠ-মিশনের অনেক প্রবীণ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তিনি নিজেও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ; সেই উৎসব খুবই সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল।

পরের দিন মন্ত্রদীক্ষা সম্বন্ধে তাঁর একটি খুবই সংক্ষিপ্ত কথোপকথন থেকে আমি এটা বুঝলাম যে সব অবস্থাকে অন্যান্যদের দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করার মানসিকতা বা ক্ষমতাও তাঁর কতখানি।

এই ৩-৪ দিন ধরে এক বড় সংখ্যক দীক্ষার্থীকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দান করেছিলেন—একদিনে প্রায় ২০০ জন করে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে ভক্তদের দুটি দলে ভাগ করে দেবেন, একটি দল সকালে এবং অন্যদল বিকেলে। এই সমস্ত কর্মদ্যম সকাল ৯টায় শুরু হতো এবং শেষ হতে বিকেল ৫টা বাজত। যারা এই সুবৃহৎ আয়োজনের সঙ্গে জড়িত ছিল তারা প্রত্যেকেই সারা দিনে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়তো। মহারাজজীর সেবকগণ ও সঙ্ঘের লোকজনেরা স্বয়ং মহারাজজীর ওপর এই প্রচন্ড চাপ অনুভব করে তাঁকে নিবেদন করলেন যে প্রত্যেক ভক্তের সঙ্গে সংক্ষেপে কথাবার্তা বলে খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে। কিন্তু তিনি এই সংক্ষেপ করতেন না। "হ্যাঁ, আমরা প্রতিদিন ১০০-র ওপর ভক্তদের জন্য এটা করছি; আমি বুঝতে পারছি তোমাদের ওপর খুব কঠিন চাপ হয়ে যাচ্ছে এবং তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছো। তোমরা শুধু তোমাদের ক্লান্তির কথা ভাবছো; কিন্তু যেমন ভক্তেরা দীক্ষা পেতে এসেছে ব্যাপারটা একবার তাদের দিক থেকেও বিবেচনা করে দেখ। ভক্তটির সারাজীবনে এটি একটি

বিশেষ শুভক্ষণ, মহৎ কার্যানুষ্ঠান। এটি তার মনের গভীরে গাঁথা হয়ে থাকবে। সেই ব্যক্তিটি হয়তো তার সারা জীবনে আর কোনদিন তার গুরুর পুনরায় দর্শন নাও পেতে পারে। সুতরাং দ্রুততার সঙ্গে সংক্ষিপ্তে এই কাজটি সম্পন্ন করলে তাদের জন্য খুবই অন্যায্য হবে।" তাঁর এই উক্তির অমূল্য বাস্তবতা ও গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না।

পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে স্বামীজি তাঁর শিলং ভ্রমণের সময় যে কুইন্টল হলে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ সেই হলোটি অধিগ্রহণের ব্যাপারে খুবই গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। তবে তিনি চেয়েছিলেন স্বামীজির স্মারকচিহ্ন হিসেবে হলোটি যেমন আছে ঠিক সেভাবেই পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ করতে। আমি এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু স্থপতি, ইঞ্জিনীয়ার ও শিলং-এর সন্ন্যাসীভ্রাতাদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি জানতে পারি যে হলোটি সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে না ফেললে যেমন আছে ঠিক সেভাবেই অধিগ্রহণ করা একান্তই দুঃসাধ্য। ঐ হলের প্রত্যেক অংশে ফাটল ধরেছে এবং অনেকাংশ ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে। হলোটি সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্য অন্ততপক্ষে নিরাপদ রাখতে ফেটে যাওয়া স্তম্ভ, সিলিং ও সিঁড়িতে অতিরিক্ত ভারবহনকারী কিছু দিতেই হবে যার জন্য বেশ ভাল অঙ্কের অর্থেরও প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত লিখে আমি হেড কোয়ার্টারে চিঠি পাঠিয়েছিলাম জানিয়ে যে আমাদের একটি নূতন কাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন যেটি পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মানানসইভাবে সুন্দর হবে, মজবুত গঠনশৈলীসম্পন্ন ও আয়তনে বৃহদাকার হবে যেখানে নানারকম শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কর্মসংস্থানের দ্বারা শুধুমাত্র একটি দর্শনীয় স্থান না হয়ে এটি স্বামীজির প্রকৃত জীবন্ত স্মারকচিহ্ন হয়ে থাকবে। আমাদের এই প্রস্তাব মঠের সাধারণ সম্পাদক মহারাজজী সমস্ত ট্রাস্টি মহারাজগণের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু আমাকে বলা হলো পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এ ব্যাপারে ফোনে আমার সঙ্গে কথা বলবেন এবং যেহেতু তিনি খুব গভীরভাবে এই পরিকল্পনাটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাই ওনার মতামতকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। সুতরাং আমাকে তার অনুমোদন নিতে হবে যেটি আদৌ সহজ ছিল না। পরমপূজ্য গহনানন্দজী মহারাজ আমাকে যোগোদ্যান মঠে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

আমাদের সাক্ষাৎকার যথারীতি রাত ১০টার পরে হলো। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানালেন যে যেহেতু স্বামীজি ঐ বাড়িতেই তাঁর বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাই তিনি ঐ বাড়িটিই পুনরুদ্ধার করতে চান। এই কাজে আমার উদ্যোগ নেই দেখে তিনি আমার প্রতি যথেষ্ট বিরক্ত হলেন এবং কঠোরভাবে আমাকে তিরস্কার করলেন আমি পুরনো বাড়ি

ভেঙে সেই জায়গায় নতুন বাড়ি নির্মাণ করার পরিকল্পনা করছিলাম বলে। আমি তাঁকে নতুন বাড়ি নির্মাণের স্বপক্ষে সব যুক্তিগুলি জানাই কিন্তু তার ওপর তিনি আস্থাস্থাপন করতে পারেন নি। আমাদের উভয় তরফ থেকে অকপটেই সমস্ত আলোচনা হয়—একটি আশ্চর্যজনক শিক্ষালাভ করি 'অপ্রীতিকর না হয়েও কি করে ভিন্নমত পোষণ করা যায়।'

"যখন তোমার প্রস্তাব ট্রাস্টি মিটিং-এ আসবে আমি এর প্রতিবাদ করব"—সবশেষে তিনি এটাই ঘোষণা করলেন। যেহেতু তখন সময়টা ছিল মধ্যরাত্রি এবং আমরা সবরকম আলোচনা সমাপ্ত করেছিলাম। তখন আমি আমার শেষ প্রশ্নটি তাঁর কাছে রাখলাম—"আমি যদি মঠের সাধারণ সম্পাদক মহারাজের কাছে প্রস্তাব রাখি বিষয়টি ট্রাস্টি মিটিং-এ রাখবার জন্য যে মিটিং-এ আপনি হয়তো আসতেই পারলেন না?"—এই কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করলাম যে আমার পক্ষে এটি বলা মোটেই শোভনীয় হলো না। কোথায় আমি নিতান্ত কনিষ্ঠ একজন সাধু প্রশ্ন করছে মঠ-মিশনের এক পরম শ্রদ্ধেয় পরমপূজ্য সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজকে ! তা-ও এরকম উদ্ধতভাবে। এটি মঠের নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ না হয়েই উত্তর দিলেন—বিষয়টিকে সর্বসমক্ষে পুনরায় বিবেচনার জন্য বলব। তিনি সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। মিটিং-এর ফলাফলও আশাতীত ছিল না, কিন্তু আমি আমার শ্রেষ্ঠতম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম—যে শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য আমি তার কাছ থেকেই অর্জন করেছি।

স্বাভাবিকভাবেই ট্রাস্টি মিটিং-এর সিদ্ধান্তানুসারে নতুন গৃহনির্মাণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলো। যেহেতু আমার সংশ্লিষ্ট সমস্ত ইঞ্জিনীয়ারগণ স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন যে পুরানো বাড়িটি সম্পূর্ণ নির্মূল না করে কিছু করা সম্ভব নয়, তাই পুরানো বাড়িটিকে কিভাবে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার কাজটি শুরু করবো সে ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমি পুনরায় পরমপূজ্য মহারাজজীর নিকট আর্জি নিবেদন করলাম। গৌহাটির একজন ভক্ত ইঞ্জিনীয়ারের (ডেকাবাবু) সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি ডেকাবাবুকে পুরনো বাড়িটি পরীক্ষা করে যাতে মেরামত করে বাড়িটি বজায় রাখা যায় তার উপায় বের করতে বললেন। ডেকাবাবু যথারীতি তাঁর পরিচিত অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় সম্পূর্ণ বাড়িটি পুনরায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরমপূজ্য মহারাজজীকে একটি বিশদ বিবরণে জানালেন যে পুরনো বাড়িটি পুনরুদ্ধার করা একেবারেই অসম্ভব। ফলত মহারাজজী নতুন গৃহনির্মাণে সম্মত হলেন যদি স্বামী প্রথমানন্দজী (প্রীতি মহারাজ) যিনি সেসময় ইটানগরে ছিলেন, এই নির্মাণকার্য

দেখাশোনা করার জন্য সম্মত হন—এই শর্তে।

এখন নবনির্মিত এই ভবনটি শিলং-এর এক বিশেষ বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান—বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টারের এক অপূর্ব স্থাপত্যগৃহ। আমি যতদিন শিলং-এ ছিলাম এই নির্মাণকার্য খুব বেশি অগ্রসর হয়নি, কিন্তু আমি USA প্রেরিত হবার পর ধীরে ধীরে কয়েক বৎসরের মধ্যে এটি সম্পূর্ণ হয়েছে। তাঁর সঙ্গে মতপার্থক্যের এই সময়গুলিতে এবং পরবর্তীকালেও সর্বদা মহারাজজী আমার প্রতি খুবই স্নেহশীল ও যত্নপরায়ণ ছিলেন।

পুনরায় এক বড় শিক্ষা—নিজের মতামত তা সে যতই অযৌক্তিক হোক না কেন, নিজের অন্তরের কাছে তা সর্বদাই প্রিয়। বহুদিন হৃদয়ে পোষণ করার জন্য তা বদ্ধমূল ও শক্তিশালী হয়ে যায়, তার প্রতি একটা আসক্তি বা ভালোবাসাও জন্মায়। তাকে ত্যাগ করা তাই খুবই কঠিন ব্যাপার (যা মহারাজজী অনায়াসেই করলেন)।

পরবর্তীকালে মহারাজজীর সঙ্গে পুনরায় দেখা করার সুযোগ আমার বেশ কয়েকবারই হয়েছিল কিন্তু খুবই কম সময়ের জন্য। ২০০১ সালে USA রওনা হবার পূর্বে আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসি তখন, তারপরে ২০০৩-এ যখন ভারতে আসি তখন এবং তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ হয় ২০০৬-এ—সবসময়ই তিনি আমায় আশীর্বাদ করেছেন।

তাঁর স্নেহের পরশ টুকরো স্মৃতি

স্বামী সর্বগানন্দ

সেবা প্রতিষ্ঠানের ঘটনা। একটি কিশোরের অশ্রুসজল স্মৃতিচারণ। সময়টা সত্তরের দশকের মাঝামাঝি। সেই কিশোর এখন রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার। তার বাড়ির একজনের অসুখ। হাসপাতালে ভর্তি। তখন পারিবারিক আয় পর্যাপ্ত ছিল না। কিন্তু চিকিৎসার খরচ অনেক। বিলটি হাতে নিয়ে সেই ভদ্রলোক অর্থাৎ ঐ কিশোরের বাবা মিঃ রায় সঙ্কোচে প্রবেশ করেছেন পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজীর অফিসে। তিনি সেক্রেটারি। অনেক ডাক্তার তখন অফিসে হাজির। ডাক্তাররা চলে গেলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, কী খবর? তোমার দাদা তো ভর্তি আছেন।

—"হ্যাঁ মহারাজ। অনেকটা সুস্থ এখন। কালই ছেড়ে দেবে।

—"বেশ। তোমার বাড়ির একজন অসুস্থ। আর আমার বাড়ির দেখো সকলেই অসুস্থ।"

একথা বলে মহারাজ উৎসুক নেত্রে ভদ্রলোকের প্রতিক্রিয়া কি দেখার জন্য অপেক্ষা করলেন। মিঃ রায় বুঝে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ হাসপাতালটাই তো আপনার বাড়ি। মহারাজ, যদি সাহস দেন একটা কথা বলবো ?"

—"কি কথা ?"

সেই কিশোরটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

মিঃ রায় বললেন—"আমাদের আর্থিক অবস্থা তো বর্তমানে ভালো নয়। যদি একটু'

হাতটা বাড়িয়ে মহারাজ বললেন, "কত হয়েছে? বিলটা দেখাও।"

মিঃ রায় কম্পিত হস্তে বিলটা বাড়িয়ে দেন। পূজনীয় মহারাজ এক ঝলক দেখে নিয়ে লাল কালিতে লিখে দিলেন, "Payment not required" :

—"তিন নম্বর ঘরে যে সাধু আছেন তাঁর কাছে জমা করো।"

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠের তত্ত্বাবধানে ভাবপ্রচার পরিষদের কর্মধারা তখনো

এতটা জমাটি হয়নি। ১৯৮৮-৮৯-র কথা। উত্তর ২৪ পরগণার প্রত্যন্ত এলাকা হিঙ্গলগঞ্জ, স্যান্ডেলেরবিল, শুলকুনী ইত্যাদি। আমি নামই শুনিনি। পূজনীয় মহারাজ ডাকলেন একদিন আমাকে মিশন অফিসে। তখন তিনি সহ-সম্পাদক। বললেন, "দেখ, আগামী শনিবার এক জায়গায় যাবো। আমার সঙ্গে তুমিও চলো।"

—"কোথায় মহারাজ ?"

—"চলো না, গিয়েই দেখবে। দুপুরে খাওয়ার পরে বেরোনো।"

আমি তখন বেলুড় বিদ্যামন্দিরের অফিস সুপারিন্টেডেন্ট। "শনিবার হাফ্ ছুটি। ম্যানেজ হয়ে যাবে।"

বললেন,—"তাই এসো।"

ভাবপ্রচার পরিষদ কি?—এ ব্যাপারে আমার তখনো কোনো ভাল ধারণা হয়নি। ভাবলাম নিশ্চয়ই গান গাইতে বলবেন। হারমোনিয়াম ইত্যাদি থাকবে কিনা কে জানে। শনিবার যথাসময়ে গিয়ে হাজির হলোাম। নিজের শোবার ঘরে ডেকে নিয়ে চেয়ারে বসালেন। বুঝলাম এখনো রেডি নন। সবে দুপুরের খাওয়া শেষ হয়েছে। বেরোনো হলো পৌনে দুটো। মঠেরই গাড়িতে। ডানলপ, সোদপুর, বারাসাত। ভাবলাম বারাসাতই বোধহয় গন্তব্যস্থল। মোটেই নয়। সেখান থেকে একজন বরিষ্ঠ স্বামীজি উঠবেন বলে দাঁড়ালো, এবং এক কাপ চা। অতঃপর বসিরহাট হয়ে হাসনাবাদে যখন পৌঁছলাম, তখন বিকেল পাঁচটা। রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। আমি ক্লান্তি অনুভব করলেও মহারাজের মুখে ক্লান্তির চিহ্ন নেই। পরে বুঝলাম রহস্যটা কি? আমার মেরুদণ্ড সোজা থাকলেও গাড়িতে মাঝে মাঝে আর সোজা থাকছিল না। যদিও বয়স কম। কিন্তু ৭৩ বছর বয়সে পূজনীয় মহারাজের মেরুদণ্ড সোজাই ছিল সারারাস্তা। সেদিন আবার বিয়ের লগ্ন ছিল। সুতরাং ফুল দিয়ে সাজানো গাড়ি প্রায়ই দেখা যাচ্ছিল। বারাসাত ছেড়ে বেরিয়ে মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "বিয়ের গাড়ি কটা দেখেছ?" আমি শুনিনি যদিও, বললাম—"পাঁচ-ছটা দেখেছি।" মহারাজ বললেন, "না, ১৩টা গাড়ি Cross করেছে এখনো পর্যন্ত।" মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছিলেন, "খিদে পেয়েছে?"

পরের অধ্যায়, নদীপথ। হাসনাবাদ থেকে প্রায় দেড় ঘন্টা। আলাদা লঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। আর যেখানে সেটা গিয়ে দাঁড়ালো, একটা পাটাতন লাগালেও গোড়ালির ৪ইঞ্চি ওপর পর্যন্ত কাদা। প্রায় ৫০ মিটার ঐরকম। ফলে ওরা একটা চেয়ারের ব্যবস্থা করে মহারাজকে চেয়ারে বসিয়ে চেয়ার ধরে মহারাজকে জায়গাটা পার করল। বাকিরা যথারীতি স্বহস্ত জুতো ছপাৎ ছপাৎ গতি। ভেবেছিলাম শুকনো রাস্তায় উঠে গাড়ি

থাকবে। ছিল একটা। তিনচাকার রিক্সা ভ্যান। ২ কিমি যেতে হবে। তার ওপর আসন পেতে দিয়ে মহারাজকে বসতে বলল। তিনি নির্বিকারভাবে উঠে বসলেন। গাড়ি নাচতে নাচতে চলল। বাকি সবাই পদব্রজে। আমি কখন এমনভাবে মহারাজের সঙ্গে যাইনি আগে। কাজেই খুব অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সম্পাদকের আচরণ—"যেখানে যেমন সেখানে তেমন।"

শুলকুনি আশ্রমের ছোট্ট ঠাকুরঘরে যখন পূজনীয় মহারাজ ঠাকুরকে অর্ঘ্য দিলেন তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা বাজে। একটা জনসভার আয়োজন হয়েছে। বুঝতে পারছি না রাত্রে থাকা হবে কিনা। কিছুই তো আনিনি। ভাবছি এই বুঝি শুরু হবে। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় একথালা বিস্কুট, মুড়ি ও চা এলো। অবাক হয়ে ভাবছি? মিটিং শুরু হলো। শ্রোতা মূলতঃ সত্তরোর্দ্ধ গ্রাম্য বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। বৃদ্ধাদের অনেকেই বিধবা। প্রৌঢ়রা পরিচালনায় ব্যস্ত। যুবক-মুখ দু-চারটে ছিল মনে পড়ছে। এই প্রথম ঐ গ্রামে এই ধরনের ধর্মসভা। আগে কখনো কিছু হয়নি। প্রথম বক্তা বারাসাতের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী। আমার অবাক হওয়ার তখনো অনেক বাকি ছিল। বারাসাতের মহারাজ বক্তৃতা লিখে নিয়ে গেছিলেন। তিনি শুরু করলেন মার্ক্স ও হেগেলের তত্ত্বের সঙ্গে বিবেকানন্দের তত্ত্বের পার্থক্য কোথায়, সেই প্রসঙ্গে! আমার চোখ কপালে উঠল। মনে মনে ভাবলাম, আমার ভাগ্যে বক্তৃতা না গান কি আছে জানি না। তবে বক্তৃতা হলে সংক্ষেপে সহজ সরলভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনীটাই বলব। আমার এই সিদ্ধান্তকে পূজনীয় মহারাজ পরে খুব বাহবা দিয়েছিলেন। অবশ্য কয়েকটি গানও গাইতে হয়েছিল।

ধর্মসভা শেষ হলো রাত দশটায় বারাসাতের মহারাজ রাত্রে এখানেই থাকবেন। খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে বেরোতে বেরোতে পৌনে এগারোটা। আবার সেই কাদা পেরিয়ে লঞ্চে ওঠা। পাশের গ্রামের সংগঠক—সুভাষ গায়েন—দেখলাম কাকে বকাবকি করছেন, "চেয়ারটা আনতে ভুলে গেলে ?" তখন দুই ব্যক্তি একজনের বাঁহাত অন্যজনের ডানহাত শক্ত করে ধরে নিচে রাখল এবং অপর দুই হাত পিঠের দিকে রেখে বেশ চেয়ারের মতো করে ধরলো। মহারাজ তার ওপর চড়ে বসলেন। তারা কাদা পেরিয়ে লঞ্চে মহারাজকে তুলে দিল। রাত সোয়া ১১ টায় লঞ্চ ছাড়লো। ফেরার পথে ভীড় না থাকায় নদীপথ ও সড়কপথে মোট লেগেছিল তিন ঘন্টা। অর্থাৎ যখন বেলুড়ে পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় আড়াইটে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মহারাজ আপনাকে কি একটা সষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে পারি?" আমার সপ্রশংস ইঙ্গিত বুঝে নিয়ে মহারাজ বললেন,—"এখন নয়, পরে।" ফেরার সময় গাড়িতে আমি ঘুমিয়ে পড়লেও মহারাজ সারা রাস্তা জেগে মেরুদণ্ড সোজা করেই বসেছিলেন। বিদ্যামন্দিরের গেটে ছেড়ে দিয়ে

বললেন,—"তোমাকে আজ খুব কষ্ট দিলাম।"

কাঁকুড়গাছিতে একদিন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলাম। একটু পরেই উদ্বোধন সঙ্গীত করতে হবে। ভক্ত সম্মেলন। অর্থাৎ যাত্রা পার্টির মতো বাজনা বাজিয়ে লোক জড়ো করা। দ্বিতীয় অধিবেশন। বেলুড় থেকে এসেছি সকালেই। মহারাজ কিন্তু সবার আগেই এসে চেয়ারে বসে আছেন। পরে বলেছিলেন,—"তোমার গানও ভাল, হারমোনিয়ামও ভাল।" আমি বুঝে না বুঝে বললাম,—"মেলোডির হারমোনিয়াম, খুব নামি দোকান।"

ওঁঙ্কারেশ্বর দর্শন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯৯২-তে পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে একই দলে ওঁঙ্কারেশ্বর যাবার। আসলে ইন্দোরেই মূল অনুষ্ঠান। আর স্বাভাবিকভাবেই ওঁঙ্কারেশ্বর এবং উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর সবই ওই প্রথম। স্বামী সত্যরূপানন্দের তত্ত্বাবধানে সব হচ্ছে। তিনি রায়পুরের অধ্যক্ষ। তখনো ইন্দোর আশ্রম নেওয়া হয়নি। কথা চলছে। ইন্দোরে রবীন্দ্রভবনে আমার গানের অনুষ্ঠান। আমার এখনো স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। পূজনীয় মহারাজ সেদিন সন্ধ্যায় এক ঘন্টা বসে গান শুনেছেন। ইন্দোরের ভক্ত সম্মেলন শেষ করে পরদিন সদলবলে ওঙ্কারেশ্বর যাত্রা। 'ঘাট' পেরিয়ে পাহারী রাস্তা। আমাদের সামনের গাড়িতে পূজনীয় মহারাজ যাচ্ছেন। এই গাড়িতে মুক্তিকামানন্দজীর সঙ্গে আমিও ছিলাম। নর্মদার তীরে পৌঁছে দেখলাম বেশ খানিকটা নিচে নামতে হবে। তখনো ব্রীজ হয়নি। অথবা চালু হয়নি। কাজে কাজেই নৌকায় ওপারে যেতে হয়। ওপারে পৌঁছে আবার প্রায় সাততলা বাড়ির সমান উঁচু ঘাট। ততোধিক সিঁড়ি। তারপর মন্দির। মন্দিরে শিব। পাশেই শঙ্করাচার্যের গুহা। বলা হয় ঐখানেই শঙ্করাচার্যের গুরু গোবিন্দপাদ থাকতেন। ভাবছি এই এতো সিঁড়ি ভেঙে ঐ সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধ উঠবেন কি করে? কিন্তু কোনও ব্যাপারই নয়। ধীরে ধীরে হলেও নিচে নামা, নদী পেরিয়ে ওপারে যাওয়া, ওপারে পৌঁছে অত সিঁড়ি ভেঙে মহারাজ স্মার্টলি উঠে গেলেন। পূজা দিয়ে ফের নেমে এসে ঘাটে নৌকায় চড়ে বসে আছেন। মন্দির কর্তৃপক্ষ অবশ্য খুব যত্ন করে মহারাজকে দিয়ে পূজো করিয়েছিল। আমি গিয়ে বললাম, "আপনার সবই দেখছি ব্যতিক্রমী।" মহারাজ হেসে আমার গালে হাত দিয়ে আদর করে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি পুজো দিয়েছ?" বললাম, "হ্যাঁ।" অতঃপর নৌকাতেই পাহাড় পরিক্রমা। কথাটা অবাস্তব লাগলেও সত্যি। ঘটনাটা এইরকম : নর্মদা নদী চলতে চলতে দুভাগ হয়ে গেল। কারণ সামনে পাহাড়। তেমনি বড় নয়। লম্বালম্বি দু-আড়াই কিমি হবে। তারপর সেই দুটি ধারা আবার এসে মিলিত হলো। সেই স্থানকে—'সঙ্গম' বলা হয়। এই পাহাড়ের ওপরে শ্রীশ্রীওঙ্কারেশ্বর শিব বিরাজিত। বেশ কিছুদিন যাবৎ স্বামী দুর্গানন্দ ওরফে শ্যামল মহারাজ (যিনি পরমপূজ্য স্বামী

বীরেশ্বরানন্দজীর সেবক ছিলেন) আমাদের কুটিয়ায় আছেন। ঐ কুটিয়ার নাম "সফেকুঠী"। দূর থেকে সাদা ধবধবে কুটিয়াটি দেখে স্থানীয় মানুষ 'শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম' না বলে 'সফেকুঠী'-ই বলে থাকে। অতএব শ্যামল মহারাজও আমাদের দলে এসে জুটলেন। সুতরাং নৌকায় পাহাড় পরিক্রমা শব্দটি অবাস্তব শোনালেও সত্যি। শিব মন্দিরের সরাসরি নিচে যে ঘাট আছে তার একটু পূর্ব দিকে একটি নিরিবিলি ঘাট আছে। সেখানে পূজনীয় মহারাজ সহ আমরা সকলে স্নান করলাম। নর্মদায় মহারাজের সঙ্গে একসঙ্গে স্নান করার ঐ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। স্নানের পর নৌকা করে 'সফেকুঠী'-র ঘাটে গিয়ে দেখি সেখানেও ৫০-৬০ টি সিঁড়ি। মহারাজ তো হেঁটে ওঠার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু স্বামী সত্যরূপানন্দের পীড়াপীড়িতে শেষমেশ চেয়ারে বসতে রাজি হলেন। চারজন সেই চেয়ার বহন করে মহারাজকে কুটিয়ায় নিয়ে এলেন। দুপুরের খাবার সবই ইন্দোর থেকে এসেছিল। নানারকম। অবশ্য সবই নিরামিষ। খুবই সুস্বাদু। ভক্ত মহিলারা আগেই কুটিয়ায় এসে সেসব গরম করে রেখেছিলেন। বিবিধ ব্যঞ্জনাদি দেখিয়ে শ্যামল মহারাজ স্বামী ভাস্করানন্দকে বললেন, "দেখুন। ছ-মাস ধরে তপস্যা করলাম। আজ তার ফল পাচ্ছি!" অতঃপর একটু বিশ্রাম করে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ সদলবলে ইন্দোর রওনা হলেন। আমি কুঠিয়াতেই থেকে গেলাম।

পূজনীয় গহনানন্দজীর অসাধারণ বাস্তববুদ্ধি এবং tenacity দেখে লোকে অবাক হয়ে যেত। তার প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। তবে একটি বিশেষ ঘটনায় আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম। পূজনীয় স্বামী স্মরণানন্দজী তখন চেন্নাই মঠের অধ্যক্ষ। ১৯৯৪-র ঘটনা। চেন্নাই থেকে মঠে এসেছেন। বিশেষ প্রয়োজনে কাঁকুড়গাছিতে পূজনীয় গহনানন্দজীর সঙ্গে দেখা করা দরকার। সারদাপীঠ থেকে গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। বিকেল তিনটে নাগাদ পূজনীয় মহারাজ আমাকে ও আর একজন ব্রহ্মচারীকে নিয়ে রওনা হলেন। প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হাওড়া দিয়ে না গেলেই ভাল হত। ব্রাবোর্ন রোডের ওপর ২ ঘন্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলে বিরক্ত। তখন মোবাইল ফোনের বালাই ছিল না। অবশেষে কাঁকুড়গাছিতে পৌঁছে মনে হলো ইতালির ভেনিস শহরে ঢুকেছি, রাস্তাগুলো সবই নদীবৎ। মঠের গেটের কাছাকাছি পৌঁছে গাড়ির ভেতর জল ঢুকে ইঞ্জিন বন্ধ হলো। আমরা দুজন গাড়ি ঠেলতে লাগলাম। পূজনীয় স্মরণানন্দজী ভিতরে। ড্রাইভার চালকের আসনে। কলকাতার 'পরিচ্ছন্ন' গলির অতি নোংরা ও জঘন্য জলে আমাদের জামা কাপড় ভিজে গেল। ভাবছি কি ভাবে ফিরবো। কোন ক্রমে যখন মঠের ভিতর ঢুকলাম দেখি মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন। সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ। প্রথমেই মৃদু তিরস্কার "বলেছিলাম Bye-pass দিয়ে না আসতে। ওদিকে জল বেশি

পেলে।" তারপর নিজের ঘরের বাথরুমের বাইরের দরজা খুলে মগে করে জল নিয়ে আমাদের হাতে পায়ে ঢেলে দিতে থাকলেন। আরতি চলছে ওদিকে। কাছাকাছি কোন সেবক বা কর্মী ছিল না সেই সময়ে। আমি সঙ্কুচিত। বললাম, "মহারাজ মগটা দিন আমি নিজে ধুয়ে নেবো।" তা দিলেন না। তারপর ঘর থেকে একটা নতুন গেরুয়া কাপড় এনে দিলেন আমাকে। কারণ আমার ধুতি বেশি ভিজে গেছিল। প্রসাদী কাপড় একটা লাভ হলো। ভাবছি এই বিপদে মহারাজকে কষ্ট দিলাম। সঙ্কোচে সিঁধিয়ে আছি। মহারাজের মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই, নির্বিকার।

হাওড়া জেলার একটি ছেলে, পদবী গাঙ্গুলী, আসতো আমার কাছে মাঝে মাঝে। গান বা স্বামীজির কথা শোনার জন্য। যতদূর মনে পড়ছে, ১৯৯৫ সাল। তার মন চঞ্চল হয়। ভিতরে খুব অস্বস্তিও হয়। অকারণ। একথা ওকথা বলার পর একদিন বলল, "দীক্ষা নিলে কি মন শান্ত হবে?" বললাম, "সঙ্গে সঙ্গে হবে কিনা বলতে পারি না, তবে জপ অভ্যাস করতে থাকলে ক্রমে ক্রমে হবেই। যাওনা একবার ভাইস-প্রেসিডেন্ট মহারাজের কাছে।" সে কাঁকুড়গাছি গেছিল। যখন মহারাজের কাছে গেল, সে একাই ছিল। প্রণাম করে উঠতেই মহারাজ বলে উঠলেন, "তোমার তো একবার দীক্ষা হয়ে গেছে। আবার দীক্ষার জন্য এসেছ কেন?" ছেলেটি অবাক। সে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিল। কাউকে বলেনি, কিন্তু জপ করত না। পরে অবশ্য পূজনীয় গহনানন্দজীর কাছেই তার দীক্ষা হয়। সে এসে একদিন নিজেই আমাকে এই কাহিনি বলেছিল।

আর একটি ঘটনা। স্বামী আত্মারামানন্দজীর কাছে শোনা। কোয়েম্বাটুরে একটি তামিল ছেলে ব্রহ্মচারী হিসাবে যোগদান করেছে। খুব খটমটে নাম। উচ্চারণ করা শক্ত। ফলে নতুন নামকরণ হলো, যতদূর মনে পড়ছে, বিবেক। কিছুদিন পরে পূজনীয় সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ এসেছেন। কোয়েম্বাটুরে পৌঁছানোর পর একটি ঘরে বসেছেন। সাধু ব্রহ্মচারী সকলে প্রণাম করছে। শেষে ঐ ব্রহ্মচারী প্রণাম করে উঠলে মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন "কি নাম ?"

"বিবেক", বলল ব্রহ্মচারীটি।

মহারাজ বললেন, "সে তো বুঝলাম। আসল নাম কি ?"

এক অষ্টেলিয়ান ভক্তের জীবনের ঘটনাও খুবই চিত্তাকর্ষক। নাম ফ্রাঙ্ক হো (Frank Hoedt)। কোন এক জাপানী ক্যাম্পে তার বাবা বালক অবস্থায়ই 'Prisoner of War' ছিলেন। বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে। মা নেদারল্যান্ডের মেয়ে। ফ্রাঙ্কের জন্ম

ইন্দোনেশিয়ায়। তার বাবার প্রাচ্য দর্শনে খুব আগ্রহ ছিল। এখন অবশ্য দুজনের কেউই বেঁচে নেই। ফ্রাঙ্ক থাকে অস্ট্রেলিয়ায়। রমণ মহর্ষির জীবনী ও উপদেশ পড়েছে।

যখন তার ১০/১১ বছর বয়স স্বপ্নে সে একজন মহারাজের দর্শন পেয়েছিল। এখন তার বয়স ষাট পেরিয়েছে। প্রবল সাংসারিক দুঃখ ও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে মন বিক্ষিপ্ত। হঠাৎই তার ইচ্ছা হলো একজন সদগুরুর কাছে দীক্ষা নেব। ভাবল, ভারতেই যাব। দিল্লীতে এসে তিব্বতীয় শরণার্থী ক্যাম্পে কিছুদিন থাকার পর কেউ বলল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সন্ধান করো। দক্ষিণেশ্বরে যাও, কালীমন্দির আছে। একটা অর্থবহ ভবিষ্যতের আশায় যখন বারাণসী, বুদ্ধগয়া হয়ে কলকাতা পৌঁছল। দক্ষিণেশ্বরে এসে নৌকায় বেলুড়মঠে এল। অকস্মাৎ সামনে দেখল একজন ইংরেজ পর্যটক/তীর্থযাত্রী কে একজন বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলছেন। সে নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করল কার কাছে যাব। সেই সন্ন্যাসী তাঁকে বললেন, “সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজীর কাছে যান।” প্রভুর ইচ্ছায় গহনানন্দজী সেই দিন বেলুড়ে এসেছেন। তার পর অনেক ঘটনা। পরে জানা গেল ঐ ইংরেজ ভক্তও গহনানন্দজীর কাছেই দীক্ষা পেয়েছে। স্মৃতি কথায় ফ্রাঙ্কে লিখেছে : “Upon seeing him. I had no doubt that I wanted to be initiated." (তাঁকে দেখে আমার সন্দেহ রইল না, এঁর কাছেই আমাকে দীক্ষা নিতে হবে)। পরে তাঁকে বলা হলো পরদিন কাঁকুড়গাছি যাবার জন্য। সেখানেই তাঁর দীক্ষা হলো। কিন্তু শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত তার মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। পরের দিন সকালে যখন মহারাজ পুকুরপাড়ে পায়চারি করছিলেন, ফ্রাঙ্ককে দেখে কাছে ডাকলেন। কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন “Do you feel better now?"

"From that moment mind changed and I forgot the world, from which I had come. From that day on a sense of deep peace grew in my heart and I felt very at home in Yogodyan...For me the place became alive with the vibration of Sri Ramakrishna...."।

টুকরো টুকরো অনেক স্মৃতি আছে যা কিনা আমার কাছে মূল্যবান হলেও অন্যের কাছে হয়তো ততটা নয়। অন্যের কাছে আমার স্মৃতির মণিকোঠায় রাখা রত্নরাজির আবেদন স্বাভাবিকভাবেই সমান সমান হতে পারে না। যে সব ঘটনা আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল তার কয়েকটির বর্ণনা দিতে চেষ্টা করেছি মাত্র। নিজেকে মহারাজের কাছে অত্যন্ত ছোট্ট মনে হতো বলেই হয়তো স্নেহের দাবিটাও বেশি ছিল। আমার অন্তরের প্রণাম নিবেদন করি পূজনীয় মহারাজের শ্রীচরণে।

রসবোধ আর বোধের প্রথম বোতাম

স্বামী বোধসারানন্দ

পূজনীয় গহনানন্দ মহারাজ সঙ্ঘে যোগদানের আগে অদ্বৈত আশ্রমে যেতেন। সেখানে সাধুদের সঙ্গে তার ওঠা-বসা ছিল। তার কিছুদিন পর তিনি ভুবনেশ্বর মঠে যোগদান করেছিলেন। ভুবনেশ্বর মঠ থেকে অদ্বৈত আশ্রমে posting হলে তিনি সেখানে ম্যানেজার পদে দীর্ঘদিন আসীন ছিলেন। তারপর সেখান থেকে বাংলাদেশ বাগেরহাট-এ যেতে হয়। ওখানে পূজনীয় বোধসারানন্দজী মহারাজ যখন ব্রহ্মচারী তখন একদিন বেলুড়মঠে ওকে দেখে পূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজ বলেন এ হল ideal ব্রহ্মচারী। উনি সবসময় বলতেন জামার কোন বোতাম যেন খোলা না থাকে। একবার পূজ্যপাদ মহারাজ অদ্বৈত আশ্রমে গেছেন। ওখানে একটি বই Unique message of Sri Ramakrishna by Swami Ganananda এটি দেখলেন তখন মহারাজ .... করে বললেন তুমি একটা জিনিস বাদ দিয়েছ এখানে 'ha' কারণ মহারাজের নাম Gahanananda। তখন মহারাজ মুচকি হাসলেন।

গ্রাম উন্নয়নের জন্য গহনানন্দ মহারাজের গহন অভিরুচি

স্বামী গোপালানন্দ

পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ রূপে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ভ্রমণ করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বব্যাপী শাখা কেন্দ্রে তার বিভিন্ন কর্মসূত্রে যাতায়াত হত, সেই সূত্রে তিনি রাঁচী (মোরাবাদী) তেও শোভাগমন করেন। রাঁচী নিবাসীদের নিজের উপস্থিতিতে নিজের পূতসঙ্গ প্রদান করেন এবং ইচ্ছুক ভক্তদেরও মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন। সেই সময় আমি রাঁচী স্থিত রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম দিব্যায়ন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সেবা কার্য্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সেই সময় উনি যখনই আসতেন তখন গ্রামে গ্রামে যে সেবামূলক কাজগুলো আশ্রম থেকে করা হত সেটার সম্পর্কে পূজনীয় মহারাজ জানার বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। নানা বিষয়ে মহারাজের সঙ্গে গ্রাম উন্নয়নের যে বিচার পরামর্শ হত তার থেকে উনার গভীর মনের চিন্তা ভাবনা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম। সেখান থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার সৌভাগ্য হলো। সেই সময় দিব্যায়ন থেকে রাঁচী জেলার আনগড়া, বুড়ম ইত্যাদি মহকুমার অন্তর্গত সুদূর বিভিন্ন গ্রামের ভিতরে চাষের জন্য জলের অভাব দূর করার জন্য ১০০০ কূপ নির্মাণের মহৎ কার্য্যটি নেওয়া হয়। সেটার খবর পূজনীয় মহারাজ পেয়েছিলেন। সেটা দেখার ইচ্ছে উনি প্রকাশ করেছিলেন। এই কথা শুনে আমি ওনাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে ওই স্থানে যাওয়ার জন্য অনেক পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে পায়ে হেঁটে কষ্ট করে যেতে হবে। এইসব শুনেও মহারাজ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং বললেন চল।

পরের দিন আমরা উনাকে বুড়ম মহকুমার অন্তর্গত খাকড়া গ্রামের উদ্দেশ্যে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। রাস্তায় দিব্যায়ন কার্য্যালয় থেকে গ্রাম উন্নয়নের অনুষ্ঠানের যে যে কাজটি হচ্ছিল তার সম্পর্কে আলোচনা হলো। গ্রাম উন্নয়নের প্রসঙ্গ শুনে তিনি সেটার গভীরভাবে আলোকপাত করেন এবং সেটাতে আমাদের কাজের প্রতি আগ্রহ আরও

তীব্র হয়ে উঠল। এমনই প্রেরণা মহারাজের সান্নিধ্যে আমরা পেতাম। মহারাজ আমাদের সাথে সেই দুর্গম পথ পায়ে হেঁটেই অতিক্রান্ত করে কূপ নির্মাণের স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে মহারাজ কূপ খননের কাজ দেখে পুলকিত হয়ে ওঠেন। মহারাজ আনন্দের বাঁধ বেঁধে রাখতে পারলেন না। মহারাজ বিস্মিত ছিলেন কিন্তু গ্রামবাসীদের উৎসাহ দেখে মহারাজ অন্তর থেকে উৎফুল্ল হলেন।

আমার মনে হয়েছে সেটা দেখে যে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের নূতন ভারত, যে কৃষকের কাঁধে ভার দিয়ে নূতন ভারতের নির্মাণ হচ্ছে। আমি যখনই মহারাজের সান্নিধ্যে আসতাম তখনই উনি নিশ্চিতভাবে কূপ নির্মাণের কথা জিজ্ঞেস করতেন। এমনকি বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী অধিবেশনের সময় যখন ওনার দৃষ্টি আমার উপর পড়ল, তখন উনি সভার মধ্যে দিব্যায়ন-এর মাধ্যমে কি প্রকার কৃষি উন্নয়নের জন্য কূপ নির্মাণের কার্য্য চলছে সেটার বর্ণনা করতে আমায় আদেশ করলেন। এটা আমার পরম সৌভাগ্য। পূজনীয় মহারাজ যখনই রাঁচী আশ্রমে আসতেন তখন উনি রামকৃষ্ণ মিশন টি. বি. সেনেটোরিয়ামও যেতেন। তখন আমার উনার সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন সরকারী ও বেসরকারী অনুদান না পাওয়ার জন্য সেনেটোরিয়ামের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না। সেই নিয়ে পূজনীয় মহারাজ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। রোজ মানুষের সেবা-শুশ্রুষা ঠিকভাবে চালিয়ে রাখার জন্য অনেকবার রাত ১-৩০ পর্যন্ত সেই নিয়ে আলোচনা হত। উনি সেনেটোরিয়ামের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করার জন্য অনেক পরামর্শ দিতেন।

সরল, হৃদয়বান স্বামী গহনানন্দ মহারাজ নিজের থেকে বেশী অপরের সুখ-সুবিধার চিন্তা অধিক ছিল। গাড়ীতে যখন কোথাও মহারাজের সঙ্গে যেতাম তখন তিনি জলযোগের জন্য জিজ্ঞাসা করতেন কিন্তু আমাদের ইচ্ছে থাকলেও না বলে দিতাম। তখন তিনি বলতেন, “ড্রাইভার-এর নিশ্চয় চা খেতে ইচ্ছে করছে, তার সুখ-সুবিধার খেয়াল রাখ।” পূজনীয় মহারাজ যখন কারও সাথে প্রথমবার সাক্ষাৎ করতেন তখন তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। সরল হৃদয়বান পরম পূজনীয় মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দ মহারাজ-এর শ্রীচরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি।

পরমপূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের স্মৃতি সঞ্চয়ন

স্বামী অমৃতেশানন্দ

১৯৭৮ সাল থেকে ওঁনাকে দর্শন করেছি। ভীষণ রাশভারি ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হোত। কাছে যেতে ভয় লাগত। কোনরকমে প্রণাম করে কাজের কথা সেরে চলে আসতাম। পরে কাজের সুবাদে যখন মেশার সুযোগ হয়েছে-তখন দেখেছি-উনি একজন হৃদয়বান সহানুভূতিসম্পন্ন, দরদী, প্রেমিক মানুষ। স্মৃতি থেকে কয়েকটি ঘটনার কথা এখন লিখছি।

১৯৮০ সালে জয়রামবাটীতে পূজনীয় মহারাজ গেছেন। ঐ সময় ‘পল্লীমঙ্গল’-এর কাজ শুরু হয়েছে। গ্রামের লোকেদের সাহায্যের জন্য নানা রকমের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। কৃষি ঋণ ও উন্নত প্রথায় চাষ, রিক্সা কিনে দেওয়া, ছাগল কিনে দেওয়া ইত্যাদি মেয়েদের ধূপ তৈরি করা, ব্যাগ, আসন ইত্যাদি তৈরি করা প্রভৃতি অনেক রকমের প্রকল্প ছিল। পূজনীয় মহারাজ কাজের সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়ায় জানতে পারলেন যে জনৈক গরীব গ্রামবাসীকে ছাগল কিনে দেওয়া হয়েছিল—সেগুলি মারা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ হুকুম দিলেন যে ওকে এখনই আবার ছাগল কিনে দাও, দেখলাম গরীবদের প্রতি মহারাজের কি ভালোবাসা !

ঐ সময় শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির আশ্রমে গোশালায় পর্যাপ্ত দুধ হচ্ছে জেনে পূজনীয় মহারাজ ওখানকার অধ্যক্ষ মহারাজকে বললেন “শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাঁর সন্তানদের দুধ সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। এখন মায়ের বাড়িতে প্রচুর দুধ হচ্ছে—তোমরা গ্রামের শিশুদের, প্রসূতি মায়েদের, রোগীদের দুধ দাও। “পূঃ মহারাজের নির্দেশে কার্ড ছাপিয়ে জয়রামবাটী গ্রামের প্রতিটি শিশুকে জন্মদিন থেকে শুরু করে এক বৎসর পর্যন্ত একপোয়া করে দুধ দেওয়া শুরু হোল। সেটা আজ ২০১৯ সালেও চালু আছে।

ঐ সময় (১৯৮০) জয়রামবাটী আশ্রমে দুধ বেশি হওয়ার জন্য ঐ আশ্রমের ঠাকুরের

সেবার জন্য (৫ লিটার), এবং রঘুবীরের সেবার জন্য দুধ পাঠাতেন।

জয়রামবাটীর পর কামারপুকুরে পল্লীমঙ্গলের মিটিং এর জন্য গেলে—কথা প্রসঙ্গে কামারপুকুরে আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজ—বলেন যে "কামারপুকুরে গোশালায় দুধ কম হওয়ার জন্য—(সামনে উপস্থিত জয়রামবাটীর অধ্যক্ষ মহারাজকে দেখিয়ে) জয়রামবাটী আশ্রম থেকে নিয়মিত দৈনিক ৫ লিটার করে দুধ ঠাকুর সেবার জন্য আসে।" এই কথা শুনে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ জয়রামবাটীর অধ্যক্ষ মহারাজকে ধমক দিয়ে বললেন, "আশ্রমের সম্পত্তি দান করার তুমি কে? তুমি কি মালিক নাকি?" এই কথায় কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর অধ্যক্ষ মহারাজগণ দুজনই নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন পূঃ মহারাজ আমাকে সামনে উপস্থিত দেখে বলেন, "কি হে expert - কি করে গরুর দুধ বাড়াতে হবে—সেটা তুমি এদের শিখিয়ে দাও।" এরপর থেকে জয়রামবাটী থেকে কামারপুকুরে দুধ আসা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা শিখলাম—যে আশ্রমের সম্পত্তি বিনা অনুমতিতে দান করা যায় না।

১৯৮৩ সালে পূজনীয় মহারাজ একবার জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরে এসেছেন। ঐ দিন রাত দেড়টা নাগাদ জনৈক বৃদ্ধ সাধু (সুধীনম) স্বামী শক্তিরূপানন্দ, (সারদানন্দজী মহারাজের আশ্রিত) Monk's Quarter এর বাইরে বলে ওনার শোবার ঘর থেকে "ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী" বলে বলে চিৎকার করছেন। এই চিৎকার শুনে আমি (তখন ওখানে রান্নাঘরের পাশে একটা ছোট ঘরে থাকতাম) ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়েছি—আর সেই সময় পূঃ গহনানন্দজী মহারাজ ও ওনার Monk's Quarter এর ঘর থেকে—খালি গায়ে হাতে একটা ছোট Pocket Torch নিয়ে "যাচ্ছি মহারাজ" বলে ছুটে আসছেন। (ঐ দিন Monk's Quarter এ তখন প্রায় ১৫জন সাধু ব্রহ্মচারী ঘুমিয়ে আছেন। একজন ও ঘর থেকে বের হননি)। তাড়াতাড়ি ঐ অন্ধকার ঘর থেকে চিৎকাররত বৃদ্ধ সাধুর—ঘরের বাইরের বারান্দার Net এ দরজার ছিটকানি বন্ধ ছিল ভিতর থেকে। সেটা পূঃ গহনানন্দজী মহারাজ—আমাকে Torch জ্বেলে আলো দেখাতে লাগলেন – আর আমি কোনরকমে বাইরে থেকে ছিটকানি খুলে দিলে—পূঃ মহারাজ (তখনও ঐ বৃদ্ধ সাধু মহারাজ চিৎকার করে যাচ্ছেন "মহারাজ এই যে আমি এসে গেছি।"—"আপনার কি হয়েছে?"

বৃদ্ধ সাধুর উত্তর, "আমি দরজা খুঁজে পাচ্ছি না।" তাড়াতাড়ি করে গহনানন্দজী মহারাজ জানালার ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে light দেখাতে ঐ মহারাজ বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বালিয়ে দরজা খুলে দিলে গহনানন্দজী মহারাজ ঘরে ঢুকেই আমাকে

বললেন, "তাড়াতাড়ি ওনাকে Bathroom এ নিয়ে যাও। আর ওনার বিছানাটা ভালো করে দেখে নাও—যদি নোংরা করে ফেলেন, তাহলে সেটা change করে দিয়ে মহারাজকে—শুইয়ে আসবে। আমি চললাম। "পূঃ মহারাজের নির্দেশানুযায়ী আমি সব কিছু করে ঘরে ফিরে আসি। মহারাজের সাধুদের ভালোবাসা ও দরদ দেখে আমি মুগ্ধ হলোম।

১৯৮৪ সালে বেলুড় মঠে পরম পূজ্যপাদ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের শরীর যাওয়ার পরে ভাণ্ডারার দিন বিকালে স্মরণ সভায় পূঃ গহনানন্দজী মহারাজ-তাঁর সংঘে যোগদান করতে ভুবনেশ্বরে আসার ঘটনার কথা বলেছিলেন। স্টেশন থেকে রাতে অন্ধকার-অচেনা রাস্তায় গরু গাড়ি ভাড়া করে—ভুবনেশ্বর মঠে পৌঁছালে—কিভাবে-স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ অভ্যর্থনা করেছিলেন—সেসব কথাও বলেছিলেন। আরও অনেক কথা বলেছিলেন—সেগুলি বইতে হয় তো সব বেরিয়ে গেছে। ঐ দিন স্মরণ সভায় পূজ্যপাদ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজও ভাষণ দিয়েছিলেন।

১৯৮১ সালে—Probationers Training Centre-এ ব্রহ্মচারীকে উদ্দেশ্যে—রাতে খাওয়ার পর মহারাজ অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশ মূলক ভাষণ দেন—যেগুলো সাধু জীবন যাপন ও জীবন গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং বাস্তব। ঐ সময় T.C. র অধ্যক্ষ স্বামী জয়দেবানন্দজী এবং আচার্য্য স্বামী পরাশরানন্দজী মহারাজও হাজির ছিলেন।

১৯৮৫ সালে পূজ্যপাদ স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পল্লীমঙ্গলের কাজকর্ম পরিদর্শনের জন্য—জয়রামবাটীতে আসেন—সঙ্গে স্বামী গহনানন্দজী, স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ ছিলেন। ঐ সময় ওনারা সকলেই পল্লীমঙ্গলের কাজ দেখে খুশি হন। মহারাজরা দুদিন ছিলেন। জয়রামবাটীতে। ঐ সময় একদিন রাতে খাওয়ার পর একসঙ্গে অনেকগুলো কুকুর চিৎকার করতে আরম্ভ করল। তখন পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ—হাসতে হাসতে বললেন—"হিংকার ধ্বনি।" তখন পূজনীয় স্মরণানন্দজী মহারাজ বললেন, "He is quoting from" ছান্দোগ্য উপনিষৎ।" পরে যখন ছান্দোগ্য উপনিষৎ পড়ি তখন কুকুরদের—হিংকার উপাসনার কথা জানতে পারি। তখন বুঝলাম মহারাজের শাস্ত্রজ্ঞান কি গভীর ছিল।

১৯৮৫ সাল, ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি নাগাদ তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠালে—আমি জয়রামবাটী থেকে বেলুড় মঠে চলে আসি। মঠে তখন স্বামীজির **১২৫**তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রস্তুতি চলছে। মন্দিরের

পূর্ব দিকের মাঠে—মিটিং এর Pandel এবং পশ্চিমদিকের মাঠে Exhibition-এর ব্যবস্থা হয়েছিল। আর বর্তমান Head Quarters বিল্ডিংয়ের নীচের তলায় (তখন জানালা দরজা বসানো হয়নি)—স্বামীজির exhibition হয়েছিল।

ঐ সময় একদিন পূজনীয় সাধারণ সম্পাদক মহারাজ আমাকে পুরুলিয়া আশ্রমে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি তখন ওনাকে প্রণাম করে (পুরাতন মিশন অফিসের দোতলায়)—পাশেই সহ-সম্পাদক পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজকে প্রণাম করার জন্য ওনার অফিস ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী-মোহন্ত মহারাজ ওনার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আর মহারাজ নিবিষ্ট মনে file দেখছেন আমি তখন চৈতন্য ব্রহ্মচারী। ওনার ঘরে একজন আছেন দেখে—ভয়ের চোটে ভিতরে ঢুকতে সাহস করলাম না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও যখন ঐ মোহন্ত মহারাজ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না—আর এদিকে আমার ট্রেন ধরার তাড়াও আছে—দেরি হয়ে যাচ্ছে—তখন যা থাকে কপালে বলে পূঃ গহনানন্দজী মহারাজের ঘরে ঢুকে পড়েই—"মহারাজ-আসছি"—বলেই ভূমিষ্ঠ হয়ে ওনাকে প্রণাম করে যখন দাঁড়ালাম—তখন file থেকে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার ? "ধমক দিলেন না। তারপর আমি হাত জোড় করে জানালাম যে, "আমার পুরুলিয়া আশ্রমে Posting হয়েছে—সেইজন্য প্রণাম করতে এসেছি।" কয়েকমাস পূর্বে পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে labour Article হয়ে গিয়েছে।

গোটা পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে তখন labour unrest চলছে। এ সব পরিস্থিতির কথা মহারাজ সবই জানতেন।

পূজনীয় মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বিয়ের প্রথম রাত্রে কি করতে হয় জানো?" উত্তরে আমি বললাম, "হ্যাঁ জানি।"—তখন পাশে দণ্ডায়মান সন্ন্যাসী মহারাজ আমার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছেন। পূঃ মহারাজ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কি?" (উনি বেশি কথা বলতেন না।) আমি তখন বললাম "বিড়াল মারতে হয়।"

উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজ বললেন, "এই তো তুমি জানো দেখছি।—এটা হলো এক নম্বর। আর দুই নম্বর হলো—যদি তোমার কাজ সম্বন্ধে knowledge এবং Experience থাকে—তাহলে যেকোন Problem 50% ওখানেই subside করে যাবে। আর বাকি Problem দেখে শুনে manage করতে হবে।"—পূজনীয় মহারাজের এই অমূল্য উপদেশ শিরোধার্য্য করে পুরুলিয়ায়—আট বছর কাটিয়েছি। কোন অসুবিধা হয়নি।

পূজ্যপাদ স্বামী মোক্ষদানন্দজী মহারাজের কাছে আরোগ্য ভবনে দুপুর বেলা আড়াইটে থেকে ওনার ঘরে শাস্ত্রপাঠ করার সৌভাগ্য হয়েছিল কয়েক বছর। ঐ সময় একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ General Secretary থাকার সময় আমার কাছে ব্রহ্মসূত্র পড়তে আসতেন। রোজ দুপুরবেলায় আড়াইটা নাগাদ আমার ঘরের দরজায় এসে টোকা দিতেন। ওঁনার জন্য আমি অপেক্ষা করতাম। উনি টোকা দিলেই আমি চেয়ার থেকে উঠে দরজা খুলে দিতাম। তারপর পাঠ শেষ হলে যাওয়ার সময় আমাকে রোজ একমুঠো করে লজেন্স দিয়ে যেতেন।"

পূঃ গহনানন্দজীর শাস্ত্রানুরাগ দেখে অবাক হয়ে যাই। আমরা অল্প ছোট কোন কাজের দায়িত্বে থেকে যুবক বয়সে দুপুরে বিশ্রাম না করে শাস্ত্র পাঠ করার আগ্রহ কয়জন সাধুর আছে সেটা আমার জানা নেই। অথচ সাধারণ সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব সামলে বৃদ্ধ বয়সে ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় কঠিন গ্রন্থ পাঠ করার জন্য দুপুরে বিশ্রাম না করে—আচার্য্যের কাছে গিয়ে পাঠ শেষ করে এসে আবার অফিসের গুরুদায়িত্ব নিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে যাওয়া আমরা-তো ভাবতেই পারি না। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ কৃপা ছাড়া এ জিনিস অসম্ভব।

১৯৮৯ সাল (সম্ভবতঃ)—ত্রিপুরায় TNB নামে একটা জঙ্গী সংগঠনের নানা ধরনের রাষ্ট্র বিরোধী কাজের জন্য ঐ দলের নেতাদের প্রধানমন্ত্রী (খুব সম্ভবতঃ)—মোরাজীভাই দেশাই—দিল্লীতে ডেকে পাঠান। উনি এই TNB Party নেতাদের কাছে তাদের দাবির কথা জানতে চাইলে—TNB র নেতারা তাদের অন্যান্য দাবির মধ্যে একটা দাবি ছিল—যে তাদের ছেলেদের রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তখন প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে বেলুড় মঠে অনুরোধ আসে যেন ত্রিপুরার কিছু ছেলেদের এখন ভর্তি করে নেওয়া হয়। আর আগরতলার আমতোলিতে রামকৃষ্ণ মিশনকে স্কুল তৈরির জন্য জায়গা দেওয়া হবে। (বর্তমানে ওখানে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে)।

কেন্দ্রের এই নির্দেশে পূজ্যপাদ সাধারণ সম্পাদক গহনানন্দজী মহারাজ—নরেন্দ্রপুর, দেওঘর এবং পুরুলিয়া আশ্রমকে-আগরতলায় গিয়ে Admission Test এবং interview নিয়ে এসে ছেলে ভর্তির নিদ্দেশ দেন। নরেন্দ্রপুর আশ্রমের থেকে Admission Test এর প্রশ্ন তৈরি করার দায়িত্ব ছিল। দেওঘর থেকে অমিয় মঃ কৈলাশহরে, আমি আগরতলার গাঙ্গাইল আশ্রমে আর নরেন্দ্রপুরের সহকারি প্রধান শিক্ষক মহাশয়-ধর্মনগরে পরীক্ষা নিতে গিয়েছিলাম।

পরীক্ষা নিয়ে ফেরার পথে মঠে এসে বিকালে পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম করে

পরীক্ষার সমস্ত খবর জানিয়ে-রাত্রের গাড়িতে ফিরে আসার কথা বলাতে—মহারাজ প্রায় ৫০০-৭০০ গ্রাম Dry fruits দিয়ে বললেন, "এটা রেখে দাও—রাস্তায় তোমার কাজে লাগবে।" পূজনীয় মহারাজের এই প্রসাদেই সেদিন আমার রাত্রের আহার হয়েছিল।

১৯৮৮ সাল। তখন পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে থাকি। একদিন আশ্রমের কাজে আমাকে দেড়শো কিমি দূরে গড়বেতা যেতে হয়েছিল। ট্রেনে ফেরার সময় late করে—রাত প্রায় বারোটা নাগাদ ট্রেনটি পুরুলিয়া স্টেশনে পৌঁছায়। ইতিমধ্যে প্রচন্ড বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়েছে। cyclonic weather শীতকাল—তারপর অসময়ে রাতে বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজে ভিজে আশ্রমে ফিরলাম রাত দেড়টা নাগাদ। পরদিন আশ্রমাধক্ষ্য মহারাজের সঙ্গে সকালে গাড়িতে করে বেলুড় মঠে যাওয়ার কথা। সারারাত্রি সমানে বৃষ্টি আর জোড়ো হাওয়া চলছে—মহারাজ তাঁর যাওয়া বাতিল করে—জনৈক ব্রহ্মচারীকে আমার সঙ্গে গাড়ি করে বেলুড় মঠে কাজের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। নিম্নচাপের জন্য বৃষ্টি আর ঝড় সন্ধ্যা আটটা পর্য্যন্ত তখনও সমানে চলেছে non-stop ঐ ব্রহ্মচারী আমাকে বেলুড় মঠের গেটের সামনে বৃষ্টির মধ্যে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে গোলপার্ক চলে গেল তার কাজে। আমি ঐ শীতের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মঠে ঢুকে প্রথমেই ঠাকুরের মন্দিরে প্রণাম করলাম। তারপর ঐ সময় Current off হয়েছিল। Generator চলছে। আমি তাকিয়ে দেখলাম যে পূজনীয় General Secretary মহারাজের অফিসে (তখন মন্দিরের সামনের বিল্ডিংয়ে) আলো জ্বলছে। আমি তখন ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে আস্তে আস্তে মহারাজের ঘরে ঢুকে প্রণাম করলাম। তখন মহারাজের ঘরে একজন সন্ন্যাসী মহারাজ বসেছিলেন। মহারাজের দৃষ্টি আমার দিকে পড়তেই শীতে কাঁপতে দেখে—journey র সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে আমাকে বসতে বললেন এবং calling bell টিপে সঙ্গে সঙ্গে office boy কে ডাকিয়ে বললেন, "এখনই গরম জল দিয়ে বড় গ্লাসে করে—আমার ঘরে complan আছে তৈরি করে নিয়ে এস।" তারপর ঐ গরম complan খেয়ে শরীরে কাঁপুনি থামল এবং energy পেলাম। ঐদিন পূজনীয় মহারাজের মাতৃসুলভ হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শ আজও ভুলতে পারিনি। এখনও এই ঘটনার কথা মনে পড়লে চোখে জল চলে আসে।

১৯৮৯ সালে বেলুড় মঠের গোশালার স্বামী বৈদ্যানন্দজী (কিশোরী) মহারাজ অবসর গ্রহণ করলে ওনার পরিবর্তে জনৈক মহারাজকে ওনার জায়গায় পূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজ (সাধারণ সম্পাদক) Posting করেন। ঐ মহারাজ বলেন—"আমি গোশালার কাজ কখনও করিনি এবং কিছুই জানিনা।" উত্তরে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ

বলেন, "তুমি কাজের দায়িত্ব নাও। তোমাকে শেখাবার ভার আমার।" যথারীতি ঐ মহারাজ গোশালার দায়িত্ব নিলে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহারাজকে নির্দ্দেশ দিলেন আমাকে কিছুদিনের জন্য মঠে পাঠিয়ে দিতে। আদেশ অনুসারে মঠে এসে পূজ্যপাদ মহারাজের সঙ্গে দেখা করলে উনি আমাকে বললেন, "তুমি এই সাধুকে গোশালার কাজ শেখাবে। সকাল এবং বিকাল দুবেলাতেই শেখাবে। আর তুমি যা বললে সেটা ওকে ডায়েরিতে note করতে বলবে। পরে তুমি ঐ লেখাটা দেখে Correction করে দেবে। না লিখলে-তুমি একটা বললে আর ও আর একরকম করলে-তোমার বদনাম হয়ে যাবে।" পূজনীয় মহারাজের নির্দেশে আমি পনেরো দিন মঠে থেকে মহারাজকে গোশালার কাজ শিখিয়ে পুনরায় পুরুলিয়া ফিরে আসার জন্য পূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজকে প্রণাম করতে গেলে উনি হাসতে হাসতে আমাকে বলেন, "তুমি এখন পুরুলিয়া যাও কিন্তু মাঝে মাঝে মঠে এসে ঐ সাধু ডায়েরি কি রকম চালাচ্ছে। দেখে আবার পুরুলিয়া ফিরে যাবে। পরে তুমি মঠেই থাকবে আর মাঝে মাঝে পুরুলিয়াতে যাবে।" মহাপুরুষের মুখের কথা, "তুমি মঠেই থাকবে"—কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। কয়েক বৎসর পরে আমি বেলুড় মঠে চলে আসি বদলি হয়ে। এখনও পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর মঠেই রেখেছেন।

স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের পবিত্র স্মৃতির আলোয়

স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ

দুরূহ ও প্রগাঢ় উপলব্ধির গভীরে তাঁর অবস্থান—তাঁর নামের সঙ্গেই সমার্থক—

স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া খুবই দুঃসাধ্য ও কঠিন—একেবারে তাঁর নামের সঙ্গে সমার্থক যার আক্ষরিক অর্থ হলো 'গভীর আনন্দ'। স্বল্পভাষী, শান্ত, সুতীক্ষ্ণ বোধবুদ্ধিসম্পন্ন, সুসমঞ্জস্য ও মর্যাদাপূর্ণ স্বামী গহনানন্দজী বেলুড় মঠের ইতিহাসে কয়েক দশক ধরে তাঁর পূর্ণ মহিমায় জাজ্বল্যমান ছিলেন। ভক্তিমিশ্রিত ভয়ের এক কঠিন আবরণের অন্তরালে তিনি ছিলেন সহৃদয় ও সুমিষ্ট স্বভাব-সহ এক সহজলভ্য ব্যক্তিত্ব। যখন আমরা আধ্যাত্মিক পথের এক নব্য পথিক হিসাবে বেলুড় মঠে আমাদের সন্ন্যাস-জীবনের যাত্রা শুরু করি, তখন আমাদের বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল এরকম ভক্তি ও ভয়মিশ্রিত তিনজনের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করার—একজন ছিলেন মঠের প্রেসিডেন্ট মহারাজ পরমপূজ্য স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, মঠের ম্যানেজার মহারাজ স্বামী অভয়ানন্দজী এবং তৃতীয়জন মঠের সাধারণ সম্পাদক মহারাজ স্বামী গম্ভীরানন্দজী। এই তিন ব্যক্তিত্ব মঠের তিনদিকে একটি ত্রিভুজাকৃতি রূপে বিরাজ করতেন। বেলুড়মঠের প্রবেশ পথের সম্পূর্ণ দক্ষিণে প্রেসিডেন্ট মহারাজের ঘরে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, সম্পূর্ণ বামদিকের কোণে ম্যানেজার মহারাজের ঘরে স্বামী অভয়ানন্দজী এবং একেবারে মধ্যস্থানে মঠ অফিসের হেড-কোয়ার্টারে স্বামী গম্ভীরানন্দজী। এ যেন কোনো পূজাস্থানে নির্মিত আধ্যাত্মিক ভিত্তিস্বরূপ সেই ধর্মীয় ত্রিভুজাকৃতি যা পূজার সমস্ত পবিত্র উপকরণ ধারণ করে রাখে। এই দিব্য ত্রিমূর্তি (তিন দিব্য ব্যক্তিত্ব) বেলুড় মঠের তিনটি কোণকে সংযুক্ত করে রেখেছে—প্রেসিডেন্ট মহারাজের কোয়ার্টার, ম্যানেজার মহারাজের ঘর এবং অফিসের হেড কোয়ার্টার— যেন এই পৃথিবীর বুকে বেলুড়মঠের মতো স্বর্গীয় স্থানকে এক আধ্যাত্মিক আবেষ্টনীর বেষ্টনে ধারণ করে আছে।

দুরকমের আধ্যাত্মিক শিক্ষক—‘আঙুরের মতো’ আর ‘নারকেলের মতো’ অপর একজন সন্ন্যাসী স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ সম্বন্ধে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে এই লেখক তাঁর বক্তব্যে যা যা বলেছিলেন তা ব্যাপকভাবে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এমনকি সেই কথাগুলিই যদি প্রায় আক্ষরিকভাবে এনার সম্বন্ধেও উচ্চারিত হয় তাহলেও এতে অকারণ পুনরুক্তিতে দোষ হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করা উচিত হবে না। কারণ আধ্যাত্মিক সত্যের উপলব্ধির জন্য আমাদের স্থুল মনের পক্ষে বারংবার এসব কথা শ্রবণ-মননের প্রয়োজন, যা আমাদের মনে এক গভীর দাগ রেখে যেতে পারে। শুধুমাত্র একবারের কথায় কোন আধ্যাত্মিক সত্যকে অনুভব করা সম্ভব নয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষত কবিসাহিত্যিকদের দু’ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি সুবিখ্যাত কবিতা আছে। এই স্বল্প-পরিচিত কবিতাটি আচার্য কৃষ্ণমোহন শাস্ত্রী তাঁর ‘সাহিত্যদর্পণের লক্ষ্মীব্যাখ্যা'-তে (উদাহরণ ৪৬৮, চৌখাম্বা, সংস্কৃত সম্পাদন সংস্থা) বর্ণনা করেছেন। আমরা নিম্নে কৃষ্ণমোহন শাস্ত্রীর লেখা সেই কবিতাটির মূল অংশটুকু বাংলা অনুবাদ-সহ উপস্থাপন করলাম :

“অর্থগম্ভীরিমাপাকঃ স দ্বেধা কবিসম্মতোঃ।
দ্রাক্ষাপাশে নারিকেলপাকশ্চ প্রস্ফুটান্তরৌ।।
দ্রাক্ষাপাকঃ স কথিতো বহিরন্তঃ স্ফুরদ্রসঃ।
স নারিকেলপাকঃ স্যাদন্তগূঢ়রসোদয়ঃ।।

অর্থাৎ—

সাহিত্য জগতে একটি কথা প্রচলিত আছে যে প্রকৃত জ্ঞান ও রসসাহিত্য পরিবেশনের ভিত্তিতে কবিকুলকে দু’টি ভাগে ভাগ করা যায়—এই রস হলো, একটি আঙুরের মতো এবং অপরটি নারিকেলের মতো। আঙুরের ক্ষেত্রে রস ভিতর ও বাহির—উভয় ক্ষেত্রেই প্রদর্শিত, আস্বাদিত। কিন্তু নারিকেলের ক্ষেত্রে বাহ্যিক কঠোরতার অন্তরালে রসাস্বাদন পরিপ্লুত।

এই দুই ধরনের অনুভূতির পার্থক্য সর্বদা উচ্চতর জ্ঞান জগতের সর্বত্র বিশেষজ্ঞ আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিরাজিত। রামকৃষ্ণ সংঘের পরম্পরায় স্বামী প্রেমানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই দুই ধরনের স্বভাববৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রথমজনের ভালোবাসার প্রাচুর্য ছিল আঙুরের মতোই অন্তরে-বাহিরে দৃশ্যমান যেখানে দ্বিতীয়জনের ভালোবাসার গভীরতা ছিল অদৃশ্য, অপরিমেয়; এমনকি ওপর ওপর দেখলে তা ছিল নারিকেলের

মতোই বাহ্যত অননুমেয় অর্থাৎ অনুমান করা কঠিন। ইদানিংকালে এই লেখকের এই দুরকম প্রকৃতি-বিশিষ্ট মহাত্মাদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল—একজন পরমপূজ্য স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ অপরজন পরমপূজ্য স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। তাবাদে, সন্ন্যাসপূর্ব ছাত্রজীবনেও বর্তমান লেখক এই পরস্পর-বিপরীতধর্মী আরও দুই মহাত্মার সাহচর্য লাভ করতে পেরেছিলেন—একজন স্বামী প্রেমরূপানন্দজী (মহাপুরুষ মহারাজের শিষ্য হরিপদ মহারাজ নামে যিনি অধিক পরিচিত, সেসময় কয়েক বৎসরের জন্য চেন্নাই মঠের গর্ভমন্দিরের পূজারী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে বেলুড়মঠে অল্পসময়ের জন্য এসেছিলেন এখানকার ম্যানেজারের দায়িত্বপালনের প্রশিক্ষণ নিতে) এবং অপরজন হলেন স্বামী কৈলাসানন্দজী (যিনি কয়েকদশক ধরে মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন)। এঁরা দুজনেই যথাক্রমে আঙুর ও নারকেল টাইপের উদাহরণ-স্বরূপ। কেউ এ-ও বলতে পারেন, মাদ্রাজ মঠের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দজী আঙুরফল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং তাঁর পূর্ববর্তী অধ্যক্ষ স্বামী তপস্যানন্দজী ছিলেন নারকেলের মতো। যদিও বর্তমান লেখকের এ বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই, কিন্তু এটা সর্বজনবিদিত যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের গুরু পরম্পরার ঐতিহ্যে এই ধারা প্রবহমান। ৭ম প্রেসিডেন্ট স্বামী শঙ্করানন্দজী ছিলেন নারিকেল ফল এবং ৮ম প্রেসিডেন্ট স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী ছিলেন আঙুরফলের উদাহরণস্বরূপ। যেখানে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীকে আমরা দেখি এই দুই প্রকৃতির এক সম্মিলিতরূপে। সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরে মঠ মিশনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে এক আধ্যাত্মিক গুরুরূপে আঙুরফলের বৈশিষ্ট্যে এবং সর্বজনসমক্ষে ছিলেন স্বামী গম্ভীরানন্দজীর মতো নারিকেল ফলস্বরূপ।

রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে আরও কিছু পশ্চাদপসরণ করলে আমরা দেখি উজ্জ্বল ও গৌরবময় উদাহরণ স্বরূপ দুই আধ্যাত্মিক মহাত্ম্যাকে—যাঁরা মঠ সংগঠিত হওয়া ও স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমান্তরালভাবে একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক কার্য সম্পাদনও করেছেন। একজন পরিব্রাত্মা দয়ালু ও স্নেহময়ী জননী শ্রীমা সারদাদেবী যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণেরই এক অভিন্ন সত্তা বলে মনে করা হয় এবং অন্যজন স্বামী ব্রহ্মানন্দ—যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক পুত্র এমনকি তাঁর সঙ্গে অভেদ বলে মনে করা হয়—‘পিতা-পুত্র দুজনেই এক’, ‘যে পুত্রকে দেখেছে সে পিতাকেই দেখেছে’—এরকম সর্বজনবিদিত একটি প্রবাদবাক্য আছে।

পরমপূজ্যস্বামী গহনানন্দজী যখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এবং স্বামী আত্মস্থানন্দজীও অন্য একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, সে সময় আমরা শিক্ষানবিশ হিসেবে বেলুড় মঠে যোগদান করি। পরবর্তীকালে স্বামী গহনানন্দজী মঠ

মিশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং তাঁর মহাসমাধির পরে স্বামী আত্মস্থানন্দজী সেই পদে আসীন হন। তখনও আমরা ঐ দুই মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে সেই একই বৈপরীত্য দেখতে পাই—আঙুর-সদৃশ এবং নারিকেল সদৃশ। স্বামী আত্মস্থানন্দজী বহুভাষী, অনুভূতি ও আবেগের উচ্ছ্বসিত প্রকাশভঙ্গিসহ তাঁর সরব ভালোবাসার জোর তোমার ওপর আছড়ে পড়বেই, তুমি চা-ও বা না চাও। অপরদিকে স্বামী গহনানন্দজী কথাবার্তায় সতর্ক, আবেগের এক সংযত প্রকাশভঙ্গিসহ শান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ তাঁর গভীর ভালোবাসা ও শিষ্টাচার যা তোমার মনে এক ভয়ের অনুভূতি উৎপন্ন করবে, তোমার সমস্তরকম বাচালতা ও চঞ্চলতাকে প্রশমিত করে দেবে। স্বামী গহনানন্দজীর সুখ-দুঃখে নির্লিপ্ততা ও ধৈর্য্য লোকপ্রসিদ্ধ। একইসঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক অন্তর্মুখীনতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা—আধ্যাত্মিক মহাত্মাদের মানসিকতার ওপর গবেষণাকারী কোনো যথার্থ ছাত্রের কাছে এক সশ্রদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়নের বিষয় বরং তার চেয়েও অধিক আরও কিছু।

উপরিল্লিখিত এই বিশদ বর্ণনায় আঙুর সাদৃশ্য ব্যক্তিত্বরা হলো খুবই অনুভবনীয়, দর্শনীয় এবং আধ্যাত্মিক ভালোবাসার প্রাচুর্যের উচ্ছ্বাসময়। এবং নারিকেল-সদৃশ ব্যক্তিত্বরা হলো গভীর সহজে পরিমেয় নয় অর্থাৎ অপরিমেয়, অন্তরাত্মাকে নাড়িয়ে দেয় এমন, সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক শান্তিপ্রদ এক অসীম রহস্যময় ভালোবাসা—এই দুই ধারাই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত। এই দুই বৈপরীত্যের সুসমঞ্জস ও মাধুর্যময় মিশ্রণে উৎপন্ন এক রাজকীয় সৌন্দর্য্যই সঙ্ঘের মহান আধ্যাত্মিক গৌরবের বিষয় যা প্রায় সমস্ত সঙ্ঘগুরুর মধ্যেই অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হয়।

অত্যন্ত নৈপুণ্য সহকারে নিঃস্বার্থসেবা এবং বিভিন্ন ধরনের কর্মে নিমগ্নতা তাঁর সময়কার নিষ্ঠাবান সব প্রবীণ সন্ন্যাসীদের (যেমন সমসাময়িক ছিলেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী) সঙ্গে তুলনায় স্বামী গহনানন্দজীর দুর্দান্ত এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, মঠ মিশনের তরফ থেকে যে কাজই তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা হত, সেইসব কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এবং দৈবীপূজানিবেদনের মতো নিঃস্বার্থ সেবা মনোভাব—স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগের নির্দেশানুযায়ী বহুমুখী কার্যধারা নিপুণতার সঙ্গে সম্পন্ন করা। এই 'বহুমুখী কার্যধারা'' কথাটি হয়তো আধুনিক কিন্তু এই ধরনের কর্মমনস্কতার ধারণাটি প্রাচীন। বস্তুতঃ স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর অনুগামী। সন্ন্যাসীদের বলতেন, "বাস্তবজীবনে আদর্শকে অনুমান করার পদ্ধতি হলো, প্রথমতোঃ আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের কোন অবাস্তব আদর্শ থাকবে না। কোন আদর্শ যদি খুব উচ্চ হয় তাহলে সেই আদর্শের অনুসরণকারী জাতি ক্রমশ দুর্বল ও নিম্নমানের হয়ে যায়। এটা

ঘটেছিল বুদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রচলনের পর। অপরদিকে খুব বেশি বাস্তবতার অনুসরণও ভ্রান্তিমূলক। যদি আমাদের কোন কল্পনাশক্তি না থাকে তাহলে আমরা ক্রমশ পশুতে পরিণত হয়ে যাব। সুতরাং আমাদের আদর্শকে ছোট করা যাবে না আবার বাস্তবতার দিকটিকেও মাথায় রাখতে হবে। আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শ হলো গুহায় বসে ধ্যান কর এবং ক্রমে শরীর ত্যাগ করে দাও। অন্যের মুক্তির জন্য কিছু করার কথা ভাবাও ছিল অপরাধ। আমরা আগে হোক পরে হোক একদিন ঠিক অনুভব করতে পারব যে আমাদের ভাইদের মুক্তির জন্য যদি আমরা সচেষ্ট না হই তাহলে কোনদিনও নিজেদের মুক্ত করতে পারব না। জীবনে উচ্চ আদর্শের সঙ্গে কঠিন বাস্তবতার সমন্বয়ের চেষ্টা আমাদের করা উচিত। এক মুহূর্তে গভীর ধ্যানরাজ্যে ডুবে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে আবার পরমুহূর্তেই এই মাঠে চাষ করার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে (মঠের জমির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে স্বামীজি একথা বললেন)। এই মুহূর্তে শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত জটিল গূঢ় অর্থগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং পরমুহূর্তেই তোমাকে ক্ষেত্রজ এই বস্তুগুলি বাজারে বিক্রয় করতে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি থাকতে হবে। তোমাদের সর্বদা সবরকম কাজের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, শুধু এখানেই নয়, যে কোন জায়গায়।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, বিভাগ-৩)

স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ স্বামীজির এই শিক্ষা পদ্ধতিকে তাঁর জীবনে ব্যাপকভাবে সর্বান্তঃকরণে অনুসরণ করতে পেরেছিলেন। অত্যন্ত কঠিন অবস্থাতেও তাঁর মানসিক স্থৈর্য্য, শিষ্টাচার, সুতীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং তাৎক্ষণিক বুদ্ধিসহ যে কোনো সমস্যার সমাধান করা সত্যিই প্রশংসারযোগ্য। কলকাতার অন্যতম বৃহত্তর রামকৃষ্ণ মিশনের হাসপাতাল 'সেবা প্রতিষ্ঠানে'র সেক্রেটারির দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বোচ্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পদের দায়িত্বভারও তাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছিল। তিনি তাঁর সময়কে বেলুড় মঠ ও সেবাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুইভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। যখন যেখানে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যেত তখন সেখানকার সঞ্চিত থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত কাজ করতে হত। সংবাদ আদান-প্রদানের যে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাগুলি আছে (যেমন সেসময় ছিল টেলিফোন) সেগুলি মহারাজজী খুবই আগ্রহের সঙ্গে ব্যবহার করতেন। তিনি এই টেলিফোনেই প্রয়োজনমতো দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করতেন এমনকি সমস্যার সমাধানও করে ফেলতেন। যখন তিনি য়ুরোপ আমেরিকায় (উত্তর ও দক্ষিণ উভয়ই) রামকৃষ্ণ মঠের বেদান্ত সেন্টারগুলি পরিদর্শনে যেতেন তখন ভারতে তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে সর্বদাই

টেলিফোনে যোগাযোগ রাখতেন এবং সমস্যাগুলি জট অনুধাবন করে তৎক্ষণাৎ সমাধানের পথ নির্দেশও করে দিতেন। এবিষয়ে, এই লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে যখন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল মঠ মিশনের ইতিহাসে এক কষ্টকর ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। পশ্চিমবঙ্গে মিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শগত পথে পরিচালিত করতে ও নিজস্ব প্রশাসনের অধিকার বজায় রাখতে মিশনকে সংগ্রামার্থে কোর্টেও দাঁড়াতে হয়েছিল। মঠ-মিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসেবে, স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ মিশনের যাবতীয় আইন-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ মঠের তখনকার প্রেসিডেন্ট মহারাজ পরমপূজ্য স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর প্রত্যক্ষ উপদেশ নির্দেশাবলী ও পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে দেখাশোনা করতেন। এবং যতদিন মিশনের অধিকার রক্ষার জন্য কোর্টে যাওয়া আসা ও কঠিন সব কাজকর্মের মাধ্যমে তাঁকে নজরদারি রাখতে হয়েছে, কখনই তিনি তাঁর স্বভাবজাত শান্ত মনোভাব ও শিষ্টাচারবোধ থেকে একবিন্দুও নড়েননি। যথারীতি তাঁর ধ্যান ও প্রার্থনাও সময়মতো সংঘটিত হতো এমনকি সেবাপ্রতিষ্ঠানের মতো এক সুবৃহৎ হাসপাতালের প্রধান পদে থাকার জন্য সেখানকারও বিভিন্ন রকমের দায়িত্ব তিনি এমন নিপুণতার সঙ্গে পালন করতেন যে তা সকলের কাছে উদাহরণস্বরূপ ছিল। তাঁর এই আদর্শ জীবন নবীন সন্ন্যাসীদের কাছে ছিল অনুসরণীয়। তিনি ছিলেন গীতায় বর্ণিত এই উক্তিটির সচলবিগ্রহ স্বরূপ—

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্মকুশলে নানুষজ্যতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমারিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ।।

(গীতা, ১৮ অধ্যায় ১০ম শ্লোক)

অর্থাৎ, যে পুরুষ অকল্যাণকারক কর্মকে দ্বেষ করে না, কল্যাণকারী কর্মেও আসক্ত হয় না, সেই শুদ্ধ সত্ত্ব গুণবিশিষ্ট পুরুষই সংশয়রহিত, জ্ঞানবান ও ত্যাগী।

আমাদের মতো নবীন সন্ন্যাসীদের কাছে এইসব ছিল খুবই সংশয়পূর্ণ যখন আমরা দেখতাম যে অত্যন্ত পবিত্রতম দিনেও, যেমন 'মহাশিবরাত্রি'-র দিন যেদিন ঈশ্বরের নাম সংকীর্ত্তন, জপ-ধ্যান ইত্যাদিতে নিমগ্ন হয়ে যাওয়ার কথা সেসব দিনেও স্বামী গহনান্দজী, স্বামী আত্মস্থানন্দজী, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর মতো প্রবীণ সন্ন্যাসীগণ কাগজপত্র ফাইল ইত্যাদি সহ এমনকি আইনজ্ঞের কাছে বা কোর্ট চত্বরেও যাবার জন্য কুণ্ঠিত নন। এসব দর্শন করে, আদর্শ অনুসরণের পথ সম্বন্ধে আমরা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়তাম। উপরিল্লিখিত শ্লোকটির অর্থবোধগম্য করার জন্য তাঁদের এই ধরনের

কার্যকলাপই যথেষ্ট প্রেরণাদায়ক ছিল। এবং এতে শঙ্করভাষ্যেরও সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে যেখানে শঙ্কর বলেছেন যে 'অকুশলম্ কর্ম' (অর্থাৎ যে কাজ পবিত্র নয়) তা দৃশ্যত আধ্যাত্মিক জীবনের অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ কিন্তু অনাসক্ত বা উদাসীন জ্ঞানীপুরুষ এইসব কর্মকে ত্যাগ না করে এবং "ত্যাগী, সত্ত্বসমাবিষ্ট, মেধাবী এবং ছিন্ন সংশয়-রূপে এইসব কর্মকে গ্রহণ করেন। (অর্থাৎ আত্মনিবেদন, সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠান, আধ্যাত্মিক বোধে বোধিত ও সমস্ত সংশয় দূরীভূত করে এইসব কর্মের অনুষ্ঠান করেন)।

বেদান্তের বেশিরভাগ বিদ্যায়তনই বৈদান্তিক সত্য উপলব্ধির একমাত্র উপায় হিসাবে যে গুণাবলীর ওপর বেশি জোর দিয়েছেন তা হলো—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন।—(জ্ঞানী আচার্যগণের কাছ থেকে বা শাস্ত্রপাঠ থেকে শ্রবণ, শ্রুত বিষয়কে গভীরভাবে চিন্তন এবং শ্রবণ-মনন দ্বারা প্রাপ্ত বস্তুতে সমাধিস্থ হয়ে আধ্যাত্মিক সত্যকে অনুধাবন)। এইরকম সাধনার গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপটি হলো আচার্য প্রবর্তিত-ধর্মগ্রন্থ এবং টীকাভাষ্যের ওপর ক্রমাগত আলোচনা ও গভীরভাবে চিন্তা করা বিশেষত শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের ওপর। 'পঞ্চদশী' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক বিদ্যারণ্য এরকম সাধনাকে 'ব্রহ্মভাষ্য' নামে মহিমান্বিত করেছেন। ব্রহ্মভাষ্য অর্থাৎ ব্রহ্মাবাদ—ব্রহ্মাকে পুনঃপুনঃ চিন্তনের অভ্যাস—এখানে ব্রহ্মা কথাটির অর্থ খুব সম্ভব বেদ ও উপনিষদ। তৎচিন্তনাম তৎকথানাম অন্যান্যাম তৎপ্রবোধনাম তদেকাপরাত্বম চ ব্রহ্মভাষ্যম বিধুরবুদ্ধ (পঞ্চদশী, ৬.১০৭?)

অর্থাৎ—তাঁর (পরম সত্য) ধ্যান করা, তাঁর কথা আলোচনা করা, কথোপকথনের মাধ্যমে পারস্পরিক প্রেরণা সঞ্চার করা এবং সমস্ত ক্ষণস্থায়ী পার্থিব বস্তুর ওপর নিস্পৃহ থেকে সেই পরম সত্য সম্বন্ধে অনবরত ধ্যান করা—এই অভ্যাসটাকেই বলে ব্রহ্মভাষ্য—ব্রহ্মের অভ্যাস অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' এই দিব্য শব্দটি অর্থাৎ ধর্মীয় স্তোত্রপাঠের অভ্যাসের মাধ্যমে ক্রমাগত সেইস্বরূপে অধিষ্ঠান করা।

যে সব মহান সন্ন্যাসীগণের সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল, যেমন স্বামী গম্ভীরানন্দজী, স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী তপস্যানন্দজী—কয়েক দশক ধরে এঁরা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনচর্যায় বিদ্যারণ্য কথিত ব্রহ্মভাষ্যের অনুসরণকারী ছিলেন। আমরা দেখেছি কীভাবে স্বামী গম্ভীরানন্দজী এবং স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ মঠ মিশনের অধ্যক্ষ ও সহাধ্যক্ষের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েও একদিনের জন্যও ধ্যানচিন্তন ও ধর্মীয় গ্রন্থানুবাদ ও রচনা থেকে বিরত থাকেন নি। এটাই ব্রহ্মভাষ্য।

মঠ মিশনের অধ্যক্ষ সহাধ্যক্ষ পদে আসীন থাকা সত্ত্বেও প্রবীণ সন্ন্যাসীগণের এই ব্রহ্মভাষ্যচর্চা সমস্ত নবীন সন্ন্যাসী ও অধ্যাত্মপিপাসু শিক্ষানবিশদের কাছে একটি বৃহৎ প্রেরণার উৎস ছিল। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই একই আদর্শের কথা ভক্তিভাবের ভাষায় বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

> "মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
> কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষন্তি চ রমন্তি চ।।" (গীতা ১০, ৯)

অর্থ—

যাঁরা নিরন্তর আমাতেই মনঃসংযোগ করে থাকেন (আর) আমাতেই প্রাণ অর্পণ করে থাকেন (বাসুদেবরূপ আমার জন্যই যাঁরা নিজের জীবন অর্পণ করে দিয়েছেন, তাঁদের নাম 'মদঅগতপ্রাণা') এরকম ভক্তগণ সর্বদাই পরস্পর আমার ভক্তির চর্চা দ্বারা আমার প্রভাব বিজ্ঞাপন করেন এবং (গুণ ও প্রভাবের সঙ্গে) আমার কীর্ত্তন করেই সন্তুষ্ট হন ও (বাসুদেবরূপ আমাতেই) রমন করেন।

সুদীর্ঘ বৎসরের এই ব্রহ্মভাষ্য অভ্যাসের ফলে এই সন্ন্যাসীগণের মন এতটাই উচ্চস্তরে অবস্থান করত যে এই বৈদান্তিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা ব্যতিরেকে একমুহূর্ত কাটানোও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। স্বামী ভূতেশানন্দজী আমাদের মতো তরুণ সন্ন্যাসীগণকে সর্বদাই এক আধ্যাত্মিক চর্চা, পারস্পরিক আধ্যাত্মিক আলাপ-আলোচনার মধ্যে নিযুক্ত থাকার জন্য উৎসাহিত করতেন। অপরদিকে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সন্ন্যাসী যাঁরা সর্বকর্মের প্রভু ও সর্বময়কর্তারূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে আদর্শ করে এবং শ্রীরামকৃষ্ণে আত্মনিবেদন করে নিঃস্বার্থ সেবার (যা কর্মযোগেরই রূপান্তর) মধ্য দিয়ে তাঁদের আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করতেন। এটি স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত যোগ-সমন্বয় (চারটি যোগের সুসামঞ্জস্য) যা পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মতো এ যুগের বহু প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসীগণের জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে পরিব্যাপ্ত এবং নবীন সন্ন্যাসীদের আদর্শস্বরূপ।

তিতিক্ষা এবং বাক্‌সংযম (সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য এবং বাক্ সংযম)

যে ব্যক্তি দৈবক্রমে স্বামী গহনানন্দজীর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়েছেন জীবনে, তিনি তাঁর অপরিসীম সহিষ্ণুতা শক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন। Endurzance—সহিষ্ণুতা সংস্কৃতে যাকে বলা হয় তিতিক্ষা—বেদান্তে উল্লিখিত ষড়সম্পদের অন্যতম গুণরাজি যা একজন প্রকৃত সাধুর জীবনে অতিপ্রয়োজনীয়, যার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলেছেন, 'যে সয় সে রয়, যে না সয়,

সে নাশ হয়।' এই প্রসঙ্গে 'সফলতা' সম্বন্ধে স্বামীজির বিখ্যাত সূত্রটি স্মরণযোগ্য—"পবিত্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়—এই তিনটি গুণরাজিই সফলতার জন্য প্রয়োজনীয়, সর্বোপরি, ভালোবাসা।" স্বামী গহনানন্দজীর মধ্যে এই তিন গুণরাশিই অভিব্যক্ত এবং ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়—সুস্পষ্টভাবে তাঁর চরিত্রের এই দুইটি গুণ-বিশিষ্টতায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে কোন সংকটমুহূর্তে তিনি একজন প্রকৃত কর্ণধারের ভূমিকা নির্বাহ করেছেন। যে বুদ্ধি সহযোগে এসব কার্য তিনি সম্পাদন করতেন গীতায় তাকে বলা হয়েছে 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি' অর্থাৎ 'কার্যসম্পদানার্থে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সেই বিষয়ের ওপর বুদ্ধিকে প্রবলভাবে কেন্দ্রীভূত করা (গীতা ২.৪১)। গীতায় উক্ত 'দৈবী সম্পদ' গুলি (গীতা, ১৬.২,৩) হলো 'অক্রোধ', 'মাদব', 'অচাপলাম', 'নাতিমানিতা'। 'অক্রোধ', মানে বিরক্তি এবং ক্রোধের কারণ থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ না করা, উদ্বিগ্নতা থাকলেও (সকারাত্মকভআবে দেখা অর্থাৎ শান্ত থাকা, 'শান্তি' দৈবী সম্পদের অন্য আর একটি গুণ)। 'মাদবম্' অর্থাৎ কোমলতা—যে কোন অবস্থাতেই নম্র, ভদ্র ও দয়ালু ব্যবহার। 'অচাপলম্' অর্থাৎ ব্যর্থ চেষ্টাগুলির অভাব (গভীর আত্মপ্রত্যয়গত স্থৈর্য্য, বিশ্বাসের দৃঢ়তা)। 'নাতিমানিতা' অর্থাৎ স্বাভিমানিতার অভাব, নিজের প্রতি অতিমান বা নিজেকেই সবজান্তা বলে মনে করার মানসিকতার অভাব (প্রকৃত অর্থে এটি হলো বিনম্রতা—অন্যের ইচ্ছা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে মর্যাদা দেওয়া এবং সর্বদা এক শিক্ষানবিশের মানসিকতা)। স্বামী গহনানন্দজীর সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক অন্তরঙ্গতায় এইসকল গুণরাজি যে তাঁর মধ্যে অধিকমাত্রায় প্রকাশিত তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আমরা বিশ্বাস করি তাঁর এই সকল গুণরাজি শ্রীরামকৃষ্ণের (এবং সশক্তিক শ্রীসারদাদেবী ও সপার্ষদ তাঁর শিষ্যবর্গের) আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ জাত।

তাঁর 'নাতিমানিতা'র উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ২০০৫ সালের ৫ই জানুয়ারীতে যখন ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়কে 'ডীমড য়ুনিভার্সিটি'(স্বয়ংচালিত বিশ্ববিদ্যালয়) রূপে ঘোষণা করল তখন এটা স্থিরীকৃত হলো যে এই সুখবরটি বেলুড়মঠের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘোষণা করা হবে যেখানে মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান আধিকারিক (অধুনা প্রয়াত) অর্জুন সিং প্রধান অতিথির পদটি অলংকৃত করার জন্য নিমন্ত্রিত থাকবেন। সে সময় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো ছিল না; তাই মনে করা হলো যে, এই দীর্ঘসময় অনুষ্ঠানে বসে থাকা তাঁর পক্ষে আরও কষ্টদায়ক হবে। বরং অনুষ্ঠানশেষে অর্জুন সিং বেলুড়মঠের প্রেসিডেন্ট কোয়ার্টারে

গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করে নেবেন। সবকিছু এভাবেই স্থির হয়ে গেল কিন্তু শেষ মুহূর্তে অর্জুন সিং অসুস্থতার কারণে হঠাৎ করেই তাঁর এই অনুষ্ঠানে আসবার প্রোগ্রামটি বাতিল করে দিলেন। এটি ছিল অনুষ্ঠানের পূর্বদিনের সন্ধ্যা যখন আমরা অর্জুন সিং-এর আসতে না পারার সংবাদটি জানতে পারি। আমরা পড়লাম উভয় সংকটে। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক যিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হয়েছেন, অন্য কয়েকজন প্রবীণ সন্ন্যাসীসহ স্বামী গহনানন্দজীর কোয়ার্টারে ছুটে গেলেন এবং তাঁর শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে সব নিবেদন করে তাঁকে ২০০৫-এর ৪ঠা জুলাইয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করার অনুরোধ জানালেন। সবকিছু সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়ার পর 'তিনি নিমন্ত্রিত হননি', বা 'তাঁকে পূর্বে কেন জানানো হয়নি' ইত্যাদি বলে তিনি একবারও কাউকে হতাশ বা বিরক্ত করলেন না। তাঁর স্বভাবজাত শান্তভঙ্গিতে তিনি যে শুধু তাঁর স্বীকৃতিই জানালেন তাই নয় বরং উৎসাহিত হলেন এই ভেবে যে এরকম একটি ঐতিহাসিক ঘটনায় তিনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন বলে। তাঁর 'নাতিমানিতা', 'মাদবম্' এবং 'শান্তি'র এই স্পর্শকাতর অভিব্যক্তিতে আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম। তাঁর এই অতিকরুণা দর্শনে আমরা একটু অপদস্থও হলোাম এবং মনে মনে নিজেদের তিরস্কার করলাম এই ভেবে যে বোকার মতো শুধু শুধু ওনার স্বাস্থ্যের কথা মনে করে আমরা ওনাকে প্রথমেই কেন ডাকিনি বলে। এইভাবে, স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ের, যা তিনি মহাসমাধির কিছু আগেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, ঐতিহাসিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি মঠ মিশনের প্রেসিডেন্ট মহারাজের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে এবং আগত সমস্ত সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্তমণ্ডলীর পরম হর্ষ ও আনন্দের মধ্য দিয়ে সুসম্পন্ন হলো।

৫) সংস্থার প্রশাসনিক কার্য থেকে আধ্যাত্মিক কার্য সম্পাদন

মঠ মিশনের সকলরকম কাজকর্মকে শ্রদ্ধা সহকারে পূজা হিসাবে দেখবার যে মানসিকতা স্বামী গহনানন্দজীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল খুব সহজভাবেই গভীরভাবে বিজড়িত প্রশাসনকার্য থেকে তা আধ্যাত্মিককার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রেও ছিল সমানভাবে প্রযোজ্য। একজন সুদক্ষ প্রশাসক যিনি কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সেবাপ্রতিষ্ঠানের মতো একটি সুবৃহৎ হাসপাতালের দায়িত্বপূর্ণ সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকে দক্ষতার সঙ্গে কার্যভার পরিচালনা করেন এবং একই সঙ্গে মঠমিশনের সহ সম্পাদক ও ক্রমে সাধারণ প্রধান সম্পাদকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদনেও মঠ মিশনের সমস্ত কার্যধারাকে একজন সুদক্ষ কর্ণধারের মতো চালিত করে নিয়ে গেছেন—তিনিই আবার

পরবর্তীকালে মঠ মিশনের সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ এবং ক্রমে সঙ্ঘাধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করে আধ্যাত্মিক জগতে নিজেকে কীভাবে অবলীলায় প্রতিষ্ঠিত করে সহস্রাধিক মানুষের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণ করেছেন—এটি খুবই মহত্ত্বপূর্ণ যা আজও তাঁর উৎসর্গীকৃত জীবনের এক মহান পরিচয় বহন করছে। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের মোটামুটি প্রায় সমস্ত অধ্যক্ষ মহারাজদের ক্ষেত্রেই এইটি দেখা যায় যে তাঁরা প্রশাসনের জগৎ থেকে আধ্যাত্মিকতার জগতে নিজেদের কি রকম অবলীলায় পরিবর্তিত করে নিয়েছেন।

স্বামী গহনানন্দজী যখন মিশনের সহ-সম্পাদক ছিলেন তখনই আমরা সবাই বুঝতে পারি যে তিনি একদিন মঠের সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ এবং ক্রমে সঙ্ঘাধ্যক্ষের মহান আসনটি অলংকৃত করবেন যাঁর প্রধান কাজটি হবে একমাত্র আধ্যাত্মিক কার্য সম্পাদন অর্থাৎ ভক্তগণকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান (একটি পবিত্র মন্ত্র প্রদান যা বারংবার জপ ও ধ্যান দ্বারা পুনর্মিলন করা)। এই ধারণাটি আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল যখন বেলুড়মঠে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর মহাপ্রয়াণের সময় সেই অবিস্মরণীয় এবং মর্মস্পর্শী ঘটনাটি স্বচক্ষে দর্শন করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি জীবনের শেষ সময়ে কোন চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাবেন না এবং তিনি যেখানে এত বৎসর ধরে বাস করে এসেছেন সেই বেলুড় মঠেই, গঙ্গাতীরে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চান। তাঁর কাছে একটি ছোট্ট ব্যাগে পবিত্রতাস্বরূপিনী শ্রীমা সারদা দেবীর পবিত্র অস্থিচূর্ণ সর্বদা থাকতো যা তিনি মন্ত্রদীক্ষায় সময় ভক্তদের মাথায় স্পর্শ করে দিতেন। তাঁর শরীর ত্যাগের মাত্র কয়েক ঘন্টা পূর্বে তিনি হঠাৎ স্বামী গহনানন্দজীকে ডেকে পাঠান এই পবিত্র অস্থি তাঁকে সমর্পন করার জন্য। স্বামী গহনানন্দজীও তৎক্ষণাৎ প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর নিকটে দ্রুত আগমন করেন এবং এই পবিত্র অস্থি গ্রহণ করেন। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী সেসময় একেবারেই দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাই এই আধ্যাত্মিক মানদন্ডটি প্রদানের পর আশ্বস্ত হবার জন্য তাঁর সেবক স্বামী দুর্গানন্দজীকে (শ্যামল মহারাজ) জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি স্বামী গহনানন্দজীর হস্তেই যেটি প্রদান করতে পেরেছেন কিনা। এবং এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে তিনি পরম আনন্দ ও সন্তোষের সহিত তাঁর দুই চোখ মুদ্রিত করেন। আমরা যারা সেসময় এই ঘটনা, প্রত্যক্ষ করেছিলাম তৎক্ষণাৎ বুঝেছিলাম যে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ ও ক্রমে সঙ্ঘাধ্যক্ষ হতে চলেছেন যিনি মন্ত্রদীক্ষা প্রদান দ্বারা সহস্রাধিক ভক্তকুলকে আশীর্বাদ প্রদান করবেন। এই মন্ত্রদীক্ষা প্রদান ব্যাপারে তাঁর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অত্যন্ত লোকপ্রসিদ্ধ। মন্ত্রদীক্ষাপ্রদানের দিন তাঁকে বেশ কয়েক ঘন্টা সময় অতিবাহিত করতে হতো, সম্ভবত কখনও পুরো একটি

সমস্তদিনও লেগে যেত ভক্তদের মন্ত্রের অর্থ, সাধনপদ্ধতি এবং অন্যান্য বিষয় ব্যাখ্যার্থে। কিন্তু যখনই তাঁকে তাঁর বয়সের কথা উল্লেখ করে তাঁর শরীর স্বাস্থ্যের ওপর এই অত্যধিক ধকলের পরিণামের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হতো, তিনি তখন অত্যন্ত করুণা ও সহানুভূতির সঙ্গে বলতেন, "দেখ, এই শিষ্যগণ তাদের এই একমাত্র অনুষ্ঠানে তাদের গুরুর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে সাধনার জটিল অর্থগুলি পর্যালোচনা করতে পারছে। সেইসঙ্গে গুরুর ও গুরুভাইবোনেদের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যও উপভোগ করে আনন্দ পাচ্ছে। সেখানে কেন আমি আমার আরামের কথা ভেবে তাদের এই মঙ্গলদায়ী দিব্য আনন্দে বাধা সৃষ্টি করব?" তাঁর এই হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যায় তাঁর সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি যেন—যে সহানুভূতি শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর মন জুড়ে প্রবাহিত ছিল—সেই ঐতিহ্যের ধারাকেই বহন করে চলেছে।

(৬) তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক জীবনচর্যা ও নিষ্ঠা

স্বামী গহনানন্দজী তাঁর প্রচন্ড কার্যতৎপরতা এবং বিপুল দায়িত্বপরায়ণতা সত্ত্বেও তাঁর প্রতিদিনের জীবনচর্যায় নিষ্ঠাসহকারে আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়মাবলী পালনেও অবিচল থাকতেন। যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্মসকলের প্রতি তিনি সারাদিনে মনোযোগ দেবার সময় পেতেন না সেগুলি সম্পাদনের জন্য তিনি অধিক রাত্রি পর্যন্ত কাজকর্ম করতেন। কিন্তু তারপরেও তাঁর ধ্যানজপের প্রতি নিয়মানুবর্তিতাও পরিলক্ষিত হতো। যদিও সর্বদা তিনি তথাকথিত সময়নিষ্ঠা বজায় রাখতে পারতেন না কিন্তু কোন সংকটকালেই তাঁকে কখনও কোন জিনিসের জন্য দৌড়তে, উত্তেজিত বা উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায়নি। (ঠিক এইরকমই সর্বব্যাপারে অনুদ্বিগ্ন, অনুত্তেজিত, থাকতে আমরা স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীকেও দেখেছি, তবে তিনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারতেন।) আমরা বিশ্বাস করি সাধুদের মধ্যে এই ধীরস্থির আত্মসমাহিত ভাবের উৎস শুধুমাত্র তাঁদের আত্মসংযমই নয়, বরং তাঁদের অন্তর্লীন গভীর এক প্রশান্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ যা তাঁদের অশান্ত মন শান্ত করার নিছক যৌগিক প্রয়াস লভ্য নয়, বরং তা সেই মহান দিব্যশক্তির নিকট পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের পথে আগত অন্তর্নিহিত এক দিব্যশান্তিরই বহিঃপ্রকাশ। তাঁরা সকলেই ছিলেন স্বল্পভাষী যা ছিল সেই মহান প্রভুর শ্রীচরণে সমর্পণ-জাত। এই অন্তর্লীন প্রশান্তির উৎস—বহু বৎসরের ধ্যান-সাধনা দ্বারা অর্জিত সেই শান্তি থেকেই তাঁরা এই দ্বৈতবাদী জগতের সবকিছুকেই নিছক এক দ্রষ্টারূপে প্রত্যক্ষ করতে প্রযত্নশীল ছিলেন। এখানে আত্মসমর্পণরূপী ভক্তি এবং দ্রষ্টারূপী (সাক্ষী-ভব) জ্ঞান—এই দুয়ের এক সুন্দর সমন্বয় যা নিঃস্বার্থ সেবা এবং উৎসর্গীকৃত মানবতার মধ্যে প্রত্যক্ষীভূত, তা সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্নিহিত এক

দিব্যশক্তিরই অভিব্যক্তিস্বরূপ। আমাদের সময়কার যুবসম্প্রদায়ের (তা যে সাধুই হোক বা সাধারণ মানুষ) অনুসরণযোগ্য এই উদাহরণগুলিই তাদের জন্য প্রয়োজ্য। 'বীরবাণী" তে উদ্ধৃত স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশগুলি এই সূত্রে মনে পড়ছে।

"কথাবার্তায় তোমার বেশি এনার্জি অপচয় করো না, নিঃশব্দে ধ্যান কর। নিস্তব্ধতার মধ্যে সব শক্তিকে সঞ্চয় করে রাম এবং আধ্যাত্মিকতার বজ্র হয়ে যাও।" এই প্রসঙ্গে মহান কবি এইচ. ডাব্‌লু লং ফেলোর সেই কবিতার উজ্জ্বল লাইনগুলি উদাহরণস্বরূপ মনের মধ্যে প্রাণবন্ত ও সত্য হয়ে উঠছেঃ

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And departing, leave behind us
Footprints on the sands of Time."

আমরা খুবই সৌভাগ্যশালী যে এইসব মহান জীবনের সান্নিধ্যে আমরা লাভ করেছি যা আধ্যাত্মিক রাজ্যে চলার পথে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে, প্রেরণা, দান করেছে; আধ্যাত্মিক জীবনস্রোতের বাধাবিঘ্নপূর্ণ অনুকূল-প্রতিকূলতায় সাহসের সঙ্গে সম্মুখীন হবার, সংশয়াকুল ঘূর্ণায়মান আবর্তে অসীম শক্তির সঙ্গে নির্ভয়ে হাল ধরার দৃঢ়বিশ্বাস প্রদান করেছে। এই দৃঢ়বিশ্বাস সমৃদ্ধ সাহসের সঙ্গে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের সমন্বয়েই (যেমন স্বামী বিবেকানন্দ শিখিয়েছেন) সেই মহান দিব্যশক্তির নিকট আত্মসমর্পণরূপী ভক্তি যা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে এবং এই জীবনস্রোতের সাক্ষাৎ দ্রষ্টারূপী দ্বৈত জ্ঞান—সকলের মধ্যেই সেই মহাজাগতিক শক্তির বিকাশ। এই প্রেরণা আমাদের হৃদয়ে চিরজাগরুক হয়ে থাকুক। এই মহান আত্মার স্মৃতিসুধা আমাদের হৃদয়কে চির উজ্জ্বল করে রাখুক এবং আমাদের আধ্যাত্মিক রাজ্যের যাত্রাপথকে আলোকিত করে অনন্তকাল ধরে অনুপ্রাণিত করুক আমাদের অন্তরাত্মাকে।

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের পুণ্য স্মৃতিকথা

স্বামী পূর্ণব্রহ্মানন্দ

ক'বছর আগে শ্রীভগবান কৃপা করে জগতে এনেছেন এবং যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর চরণে, তাঁর নামাঙ্কিত সঙ্ঘে আশ্রয় দিয়েছেন বলে ধন্য এই জন্ম, ধন্য এই জীবন। সেই সঙ্গে ভাবলে আনন্দে মনটা ভরে যায় শ্রীরামকৃষ্ণে অর্পিত কিছু পবিত্র সাধু-মহাত্মার পূত সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল বলে। পূজ্যপাদ গহনানন্দজী তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন। তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখা যথেষ্ট কঠিন ব্যাপার, ভয় হয় পাছে তাঁর অবান্তর কিছু লিখে ফেলি। তবুও চেষ্টা করছি তাঁর সম্বন্ধে কিছু স্মৃতি-চারণ করার।

পূজনীয় মহারাজ ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্দশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ। নিম্নে সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজগণের ক্রমান্বয়ে নামের তালিকা উল্লেখ করা হলো—

১) স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ২) স্বামী শিবানন্দ ৩) স্বামী অখণ্ডানন্দ ৪) স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ৫) স্বামী শুদ্ধানন্দজী, ৬) স্বামী বিরজানন্দজী ৭) স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী ৮) স্বামী শঙ্করানন্দজী ৯) স্বামী মাধবানন্দজী ১০) স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, ১১) স্বামী গম্ভীরানন্দজী ১২) স্বামী ভূতেশানন্দজী ১৩) স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী ১৪) স্বামী গহনানন্দজী ১৫) স্বামী আত্মস্থানন্দজী ১৬) স্বামী স্মরণানন্দজী

পূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহরাজ ছিলেন স্বভাবগতভাবে মিতভাষী ও মিতহারী। কোন ব্যাপারে বেশি উচ্ছ্বাস দেখা যেত না তাঁর মধ্যে। তিনি ছিলেন দায়িত্বে ক্লান্তিহীন, স্নেহে সীমাহীন ও ক্ষমার প্রতিমূর্তি। কেউ কোন গুরুতর অপরাধ করেও তাঁর শরণাগত হলে যেমন করেই হোক তিনি তাকে রক্ষা করতেন। উদাহরণস্বরূপ দু-একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের (হাসপাতালের) কর্মচারীরা যারা হাঙ্গামা করেছিল তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলায় তাঁর উক্তি—"সমস্যা তো মিটে

গিয়েছে। যারা হাঙ্গামা করেছিল তারা তো আমার সংসারের ছেলে। কোন স্টাফ অন্যায়ভাবে প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করলে তাকে ডেকে কেবল বলতেন—"পায়ের তলার মাটি শক্ত আছে কিনা ভেবে দেখেছ?"

তাঁকে কখনও রাগতে দেখা যেত না। কোনদিন একটি কটু কথাও উচ্চারণ করতে শোনা যেত না। তাঁর মেজাজ ছিল অসম্ভব ঠান্ডা অথচ গভীর সংবেদনশীল। কখনও যদি কারও ওপর ভেতরে ভেতরে রাগতেন, তাহলে তাঁর রাগের বহিঃপ্রকাশ ছিল—"আহাম্মক কোথাকার।—ব্যস্ এটুকুই। এই কথাটুকুতেই বুঝতে হবে তিনি অত্যন্ত চটেছেন।

কারও কাজে কোন ত্রুটি হলে মহারাজ অন্যের সামনে কিছু বলতেন না। তাঁরও আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য তাকে পৃথকভাবে ডেকে বুঝিয়ে বলতেন।

তিনি ছিলেন অমানুষিক পরিশ্রমী। সেই সঙ্গে তাঁর নিদ্রা ও বিশ্রাম ছিল খুবই কম। সারাদিন ধরে বাইরের কাজ সেরে এসেও অনেক রাত্রি পর্যন্ত তিনি অফিসে বসে কাজ করতেন। আমার ছিল প্রধানতঃ পূজ্যপাদ হিরন্ময়ানন্দজীর কাছে কাজ। তাঁর ব্যক্তিগত সেবা, চিঠিপত্রের dictation দেওয়া, type করা ইত্যাদি। তাঁর কাজ সেরে অবসর পেলে ডাক পড়ত পূজনীয় গহনানন্দজী, আত্মস্থানন্দজী, গীতানন্দজী ও প্রভানন্দজীর কাছে। যত রাত্রি হত পূজনীয় গহনানন্দজীর কাজের energy তত বাড়ত। মাঝে মাঝেই রাত্রি ১১-৩০টা /১২-০০ টার সময় হিরণ্ময়ানন্দজীর ঘরে এসে আমার কানে কানে বলে আসতেন—'দুলাল, মহারাজের কাছ থেকে ছাড়া পেলে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও। সেদিন বুঝতাম—আজ আমার শিবরাত্রি হবে। চিঠিপত্রের dictation নেওয়া চলছে। একটা চিঠি লেখা শেষ হলে আর একটা চিঠির জবাবের বিষয়ে ভাবছেন, এটুকু সময়ের মধ্যে তাঁর সামনে বসে আমি ঘুমে ঢুলতে শুরু করেছি। এ-দৃশ্য দেখে তিনি বলতেন—'আজ এই পর্যন্ত থাক। ব্যস ছুটি পেলাম সে-রাত্রির মতো। কারণ মহারাজ বুঝতেন যে ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে কি লিখতে কি লিখবে তার ঠিক নেই, তার থেকে ছুটি দেওয়াই ভাল। পূজনীয় হিরণ্ময়ানন্দজীর সঙ্গে ১৯৭৯ ছিল আমার। দেখতাম তিনি অফিসের কাজ সেরে ৩-৩০টা/৪-০০টার সময় দুপরের খাবার খেতেন। তারপর অল্প বিশ্রাম। সেসময় তাঁর বিছানার পাশে একটা টুলের ওপরে ৩টি ফোন থাকত (একটা intercom, একটা direct land ফোন ও একটা through PBX)। ফোন call আসতই। তিনি শবাসনে থাকতেন চোখে ছোট একটা তোয়ালে চাপা দিয়ে। অনবরত ফোন আসত, কিন্তু তিনি বিরক্ত হতেন না। চোখের তোয়ালে

না সরিয়ে আওয়াজ শুনে যে ফোনটি বাজত ঠিক সেটাই ধরতেন।

শ্রদ্ধেয় রঘুনাথ মহারাজ বেলুড় মঠের আইনের কাজ-কর্ম দেখতেন। প্রায় দিনই তাঁকে আইনের কাজে কোর্টে যেতে হোত। সকাল সকাল বেরিয়ে ফিরতে রাত্রি প্রায় ৮-৩০/৯-০০ টা বেজে যেত। সারাদিনের পরিশ্রমের ফলে ক্লান্ত থাকতেন, তাই রাত্রে খেয়ে-দেয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তেন। মাঝে মাঝেই দেখতাম পূজনীয় গহনানন্দজী রাত্রি প্রায় ১২-০০ টা বাজে তখন রঘুনাথ মহারাজকে টেলিফোনে তাঁর ঘরে ফোন করছেন—"রঘু, একটু আসবে নাকি !" কিছুক্ষণের মধ্যেই রঘুনাথ মহারাজ ঘুমে টলতে টলতে এসে হাজির হতেন।

মঠ-মিশন জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আশ্রমের adjacent কোন জমি হাত ছাড়া হয়ে যাবে এটা তিনি চাইতেন না। কারণ আপাতত জমি নেওয়া থাকলে ভবিষ্যতে সেবা কাজে সাহায্য হবে।

পূজনীয় গহনানন্দজী আইন-কানুন ভালো বুঝতেন। উকিল ব্যারিষ্টারের chamber-এ যাওয়াটা ছিল তাঁর নিত্য তীর্থ-দর্শনের মতো। আইনের ব্যাপারে অ্যাডভোকেট তপন রায়চৌধুরী, শক্তি মুখার্জী, তাপস ব্যানার্জী, ব্রতীন্দ্র নারায়ণ বাগচী, নীরেন সরকার, দীপক ঘোষ, সমর সেন প্রভৃতির সঙ্গে বলা যায় তাঁর নিত্য যোগাযোগ ছিল।

তখন মোবাইল ফোন চালু হয়নি ভারতবর্ষে। পূজনীয় মহারাজ তাঁর অফিসে বসে (পুরোনো মিশন অফিসের দোতলায় তাঁর অফিস ছিল) Land Line থেকে একটি টেলিফোন নম্বর ডায়াল করলেন। আমি বুঝতে পারছি অপর দিকে কেউ ধরেছে ফোনটি। কথোপকথনে যা বুঝেছি তা নীচে উল্লেখ করলাম।

প্রঃ কে? .....(সম্ভবত উত্তর এসেছে) .... কিংকর।

প্রঃ কার কিংকর? ....(সম্ভবত উত্তর এসেছে)....শ্রীরামকৃষ্ণের।

বুঝলাম যে অপরপারের উত্তর শুনে পূজনীয় মহারাজ খুশিই হয়েছেন। এরপর কিছু কাজের কথা বলে মহারাজ ফোনের receiver-টি রেখে দিলেন।

সন্ন্যাসীদের প্রতি স্বামীজির নির্দেশ; 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে এই উচ্চ আদর্শ যে ভুলে যায় 'বৃথৈব তস্য জীবনম্। পূজনীয় গহনানন্দজী এই আদর্শ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন ও সেইমতো জীবন অতিবাহিত করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গোছালো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট অথচ কঠোর। তাঁর ব্যবহারের জন্য তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস-পত্র রাখতেন না।

তাঁর দৈনিক রুটিন ছিল অনুকরণ করার মতো। বাইরের কাজে বের হলে, ফিরতে যতই রাত হোক না কেন, তিনি স্নান সেরে, জপ-ধ্যান করে তবে রাতের খাবার খেতেন। তিনি বলতেন, ‘দেরি হলেও যেমন স্নান-আহার বাদ পড়ে না, তেমনি এই চিন্তাটিও বাদ দেওয়া চলে না।’ খাবারের পরিমাণ ছিল খুবই কম। কেউ তাঁকে জোর করে খাওয়াতে পারতেন না। তাঁর খাবার তাঁর শোবার ঘরের পাশেই অফিসের টেবিলে ঢেকে রাখা থাকত। কত রাত্রে তিনি শুতে যেতেন জানা নেই। তবে যত রাত্রেই শুতে যান না কেন তিনি শয্যা ত্যাগ করার পর নিত্য শরীরচর্চা করে স্নান, জপ-ধ্যান সেরে তারপর প্রাতঃরাশ করতেন। (তাঁর অফিসের টেবিলে ঢাকা থাকত)। তারপর তিনি বের হতেন সমস্ত মন্দিরে প্রণাম করতে। প্রণাম পর্ব শেষ করে দৈনিক মিটিং-এ বসতেন সকাল ৯-৩০ মিনিট নাগাদ। সবদিক থেকে তাঁর balance life, অনুকরণ করার মতো।"

পূজনীয় মহারাজজী নীতিবাক্য মেনে চলতে খুব পছন্দ করতেন। ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠানের শপথ মন্ত্র উচ্চারণ করে আহুতি মন্ত্রের প্রায়ই উদ্ধৃতি দিতেন। তাঁর মধ্যে তার বেশি পছন্দের কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি—

১) শরীরমাদ্যং খলুধর্মসাধনম্' ইতি নীতিবাক্যমধার্য শ্রমক্ষম-সেবাসমর্থ-নীরোগশরীরায় স্বাস্থ্যংপরিপালয়িতুমহৎ যথাসাধ্যং যতিষ্যে।’....‘শরীরই ধর্মলাভের প্রথম উপায়'— এই নীতিবাক্য অবলম্বন করে পরিশ্রমের উপযোগী সুস্থ শরীরের জন্য আমি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসকল পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

২) ‘সর্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ দুঃখভাগ্ ভবেৎ’—সবাই সুখী হোক্, সবাই নিরাময় (উপদ্রবশূন্য) হোক। সবাই যেন সর্বত্র মঙ্গলময় বস্তুই দেখতে পান, কেউ যেন কোন দুঃখ না পায়।

৩) ‘মক্ষিকাবৃত্তিং পরিহৃত্য, প্রমাদো মনুষ্য সহজ ইতি সমবগম্য, দোষদর্শন সর্বথা পরিবর্জ্য, অন্যেষু সাধুতায়াঃ পবিত্রতায়া সদয়তায়শ্চ অনুসন্ধানপূর্বকং মধুকরবৎ ভবিতুমহৎ যথাসাধ্যং যতিষ্যে।' মক্ষিকাবৃত্তি (দোষদৃষ্টি) পরিত্যাগ করে—ভুলভ্রান্তি মানুষের সহজাত’, এটি মনে রেখে অন্যের সাধুতা, পবিত্রতা সহৃদয়তা প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহের অনুসন্ধান করে মৌমাছির স্বভাব (ফুল থেকে শুধুমাত্র মধু সংগ্রহ করা) অনুসরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

সাধারণ মাছি ফুলেও বসে বিষ্ঠাতেও বসে, ক্ষততেও বসে কিন্তু মৌমাছি শুধুমাত্র ফুলে বসে মধু সংগ্রহ করার জন্য। আমাদের মৌমাছির স্বভাব হওয়া উচিৎ।

এবারে আসি সম্পূর্ণভাবে আমার নিজের ব্যাপারে। একদিন সকালে পূজনীয় হিরন্ময়ানন্দজী (তখন মঠ-মিশনের সাধারণ সম্পাদক) আমায় বললেন, 'নরেশকে ডেকে দাও তো।' (পূজনীয় গহনানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নরেশ)। আমি তো তাঁর নির্দেশ মতো নরেশ মহারাজকে ডেকে দিলাম। তিনি পূজনীয় হিরন্ময়ানন্দজীর ঘরে এসে তাঁর সঙ্গে বেশ অনেকটাই সময় নিয়ে কথা বলে বেরিয়ে এলেন। বেলার দিকে হিরন্ময়ানন্দজী আমাকে বললেন, 'কই প্রকাশকে ডেকে দিতে বললাম যে!' আমি বললাম, 'মহারাজ, আপনি তো নরেশ মহারাজকে ডাকতে বললেন।' আমি তাঁকে ডেকে দিলাম, তিনি আপনার ঘরে এসে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে গেলেন যে। হিরণ্ময়ানন্দজী বললেন, 'আমি তোমায় প্রকাশকে ডাকতে বললাম, আর তুমি নরেশকে ডেকে দিলে! নিশ্চয়ই তুমি কানে কম শোনো।

তার কয়েকদিন পরে পূজনীয় হিরন্ময়ানন্দজী বাইরে কোথাও গেলেন আমাকে সঙ্গে না নিয়ে। সাধারণতঃ হিরন্ময়ানন্দজী না থাকলে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের কাছে আমার কাজ থাকত, চিঠিপত্র shorting, চিঠিপত্র dictation নেওয়া ইত্যাদি। একদিন তাঁর কাছে কাজ করার সময় হঠাৎ তিনি আমাকে বললেন, "তুমি কালকে সকালে একটু সেবা প্রতিষ্ঠানে যাবে, গিয়ে মঙ্গলানন্দের সঙ্গে দেখা করবে।" এ-কথা শুনে আমি অনুমান করলাম যে আমাকে কান পরীক্ষার জন্য পূজনীয় মহারাজ সেবা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে চান। সে জন্য আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—'কেন মহারাজ, আমার কান পরীক্ষা করতে? আমি তো আপনার সঙ্গে কাজ করছি। আপনার কি মনে হয় আমি কানে কম শুনি?' মহারাজ সে বিষয়ে কোন গুরুত্ব না দিয়ে শুধু বললেন, 'যাওনা, একবার ঘুরে এসো।' পরের দিন সকালে সেবা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে মঙ্গলানন্দজীর সঙ্গে দেখা করলাম। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। মঙ্গলানন্দজী আমার কান পরীক্ষার জন্য department-এ বলে রেখেছিলেন, চটপট hearing capacity test হয়ে গেল, report-3 পেলাম—normal. বিকালে বেলুড় মঠে ফিরে এসে পূজনীয় গহনানন্দজীকে report দেখালাম। report দেখে তিনি কোন মন্তব্য না করে চুপচাপ রইলেন।

কয়েকদিন পরে পূজ্যপাদ হিরন্ময়ানন্দজী বাইরে থেকে ফিরে এলেন। পরে তাঁকে hearing test-এর report দেখাতে তিনি মন্তব্য করলেন,—"তাই তো report তো দেখছি normal, তবু তুমি কম শোন কেন?' কিছু বলার নেই, চুপচাপ শোনা ছাড়া। তাঁর মন্তব্য শুনে মনে মনে খুব মজা পেলাম।

পূজনীয় মহারাজের কাছে চিঠি-পত্র dictation নেওয়ার সময়ে কোচবিহার রামকৃষ্ণ আশ্রমের ব্রহ্মচারী নিমাই মহারাজকে উদ্দেশ্য করে অনেক চিঠি লিখতে হয়েছে (তখন কোচবিহার আশ্রম বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ অধিগ্রহণ করেননি)। পূজনীয় মহারাজ আশ্রম পরিচালনার ব্যাপারে নিমাই মহারাজকে পত্র মারফৎ অনেক পরামর্শ দিতেন। সম্বোধন করতেন—'প্রিয় নিমাই' বলে। তখনই আমার মনে হয়েছিল কোচবিহার রামকৃষ্ণ আশ্রমের জন্য যেহেতু পূজনীয় মহারাজের এত দরদ, ঐ আশ্রমটা ভবিষ্যতে বেলুড় মঠের অধীনে আসতে পারে। সময়টা ছিল ১৯৮৬ বা ১৯৮৭। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় এই আশ্রম ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর বেলুড় মঠ অধিগ্রহণ করেছে। আর আমিও ভাবতে পারিনি যে আমার posting এখানে হবে এবং এখানকার দায়িত্বও নিতে হবে। আমাকে এই মঠের দায়িত্বভার নিতে হলো ২০১৩ খৃঃ এর ৭ই জুন শ্রীশ্রীফলহারিণী কালিকাপূজার দিনে।

ম্যাগাজিন বা সংবাদপত্র পড়ে তিনি সময় ব্যয় করতেন না। সর্বদাই জপ করতেন ও অন্যদেরও তাই করতে উপদেশ দিতেন। ট্রেনে, বাসে, বিমানে, এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে, যখনই সময় পেতেন জপ করতেন।

ধৈর্য এবং তিতিক্ষা তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল। ১৮৯৭ খৃ-এ স্বামীজি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় কলকাতায় তাঁকে ঠিক যেমন যেমনভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল, ১৯৯৭ খৃ. এ স্বামীজির স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে তেমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ আয়োজিত বিশেষ ট্রেনে বজবজ থেকে স্বামীজির প্রতিকৃতি পূজনীয় মহারাজ স্বয়ংই নিয়ে আসেন শিয়ালদহ স্টেশনে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় বাগবাজার মায়ের বাড়ি থেকে শিয়ালদায় এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল।

সেবা প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন main nurse আছেন। সেবা কাজের সুবিধার জন্য পূজনীয় গহনানন্দজী কয়েকজন ছেলেকে nursing training-এর ব্যবস্থা করেছিলেন। পাস করার পরে তাঁদেরকে ward-এ sister-দের মতো সেবা করতে হয়। তাঁদের বলা হয় brother। সেরকমই একজন ছিলেন শরৎ ব্রাদার। এখন তিনি retirer করেছেন। এখন যে ঘটনাটা বলতে চাচ্ছি, সেটা তাঁর nursing training-এর আগের কথা। তখন গহনানন্দজী সেবা প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি। শরৎ ব্রাদার তাঁর অফিসে তাঁর নির্দেশ মতো নানাপ্রকার কাজ করতেন। তার মধ্যে মহারাজের অফিস সময়মতো খোলা, সাফ-সোফ করা, তাঁর টুকটাক নির্দেশ পালন করা ও মহারাজ অফিস থেকে

বেরিয়ে গেলে অফিস বন্ধ করা। এ-রকম একদিনের ঘটনা। পূজনীয় মহারাজের অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে, কিন্তু কোন কারণে মহারাজ একটু বেশি সময় অফিসে ছিলেন। শরৎ ব্রাদারকে মহারাজ হয়তো কোন কাজে কাছাকাছি কোথাও পাঠিয়েছিলেন। কাজ সেরে ফিরে এসে পূজনীয় মহারাজ অফিসের ভেতরে আছেন কিনা না দেখে মহারাজ থাকা অবস্থায় অফিসের দরজায় তালা মেরে দিয়েছেন। মহারাজ বুঝতে পেরে ডাকাডাকি করতে আবার তালা খুললেন শরৎ ব্রাদার এবং ভয়ও পেয়ে গেছেন এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য। পূজনীয় মহারাজ অফিস থেকে বের হবার সময় শুধু একটা কথা বললেন—'দেখে শুনে কাজ করবি।' কোন রাগ-রোষের প্রকাশ নেই। এই ছোট্ট ঘটনা প্রমাণ করে মহারাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির। reaction হলো না। তিনি এত সংযত যে কোন ঘটনা ছোট্ট হলেও যদি এটা আমাদের ক্ষেত্রে হোত তাহলে আমরা আরও কি করতাম বা কি বলতাম জানি না।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডঃ অমল চক্রবর্তী। ছাত্র অবস্থা থেকে (VIMS-এ M.S.-এর ছাত্র ছিলেন) তিনি পূজনীয় গহনানন্দজীকে পেয়েছেন। তিনি ছিলেন যেমন ডানপিটে, তেমন মেজাজী, তাঁর অপারেশনের হাতও তেমনই ভাল। এই ছেলেটিকে সামলানো একমাত্র মহারাজের পক্ষে সম্ভব ছিল। তিনিই ঠিক ঠিক বুঝেছিলেন, এই ছেলেটির ভিতরের ভবিষ্যৎ সম্ভবানা। ডঃ চক্রবর্তীর নিজের মুখের কথা—"আপাতকঠিন, শৃঙ্খলাপরায়ণ, মিতভাষী, মিষ্টভাষী, কর্মবীর এই মহাপুরুষ আমার জীবনদর্শন। তাঁর স্মরণে ও মননে পাই মানসিক শান্তি।"

বিখ্যাত Orthopadic Surgeon ডঃ অরুণ কুমার ব্যানার্জী ছিলেন পূজ্যপাদ নির্বাণানন্দজীর দীক্ষিত। তিনি এখন প্রয়াত। তাঁর ইউনিটের একজন সিনিয়র ডাক্তার অপারেশন থিয়েটারে অল্প-সল্প ত্রুটির জন্যও O.T.sister, জুনিয়র ডাক্তার প্রভৃতির উপর রাগারাগি করেন, চিৎকার চেঁচামেচি করেন। সেটা পূজনীয় গহনানন্দজীর কাছে অভিযোগ করলেন ডঃ ব্যানার্জী। জবাবে পূজনীয় মহারাজ বললেন—তাহলে তিনি আসছেন বলো।' মহারাজের জবাব শুনে অরুণবাবু নির্বাক হয়ে গেলেন। ভাবলেন, কেন যে অভিযোগ করতে এলাম।

আসলে দেখলেন যে একজন ভালো ডাক্তার, ভুল-ভ্রান্তি হলে বকাঝকা করেন সে তো রোগীর স্বার্থে, রোগীর ভালোর জন্য। উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে কিছু বলা মানে, প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর অভিমান হবে এবং তাতে প্রতিষ্ঠানের কাজের ক্ষতি হবে।

পূজনীয় গহনানন্দজী সম্বন্ধে আমার স্মৃতি যেমন যেমন মনে পড়েছে এখানে যথাসম্ভব উল্লেখ করলাম। এখন তাঁর একটি মৃদু রসিকতার উল্লেখ করে প্রসঙ্গ শেষ করব। রসিকতা হলেও বাস্তবে তা ঘটে থাকে। সেটা হলো বিদেশী শিক্ষার বিপরীত প্রভাব। একদিন মহারাজের সঙ্গে এক জায়গায় এক আলোচনা সভায় আমি শ্রোতা ছিলাম। বক্তৃতা চলা কালে যা শুনেছি তার একটু অংশ—গ্রামের এক অবস্থাপন্ন দম্পতি। তাঁর পুত্র পড়াশুনায় ভালো, প্রত্যেক পরীক্ষায় ফলও ভাল করে। তাকে তার বাবা-মা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। বিদেশে পড়াশুনা শেষ করে নিজের দেশে গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসেছে। এখন বাবাকে বলছে, 'ড্যাড্ডি', মাকে বলছে 'মাম্মি'। মা তো গ্রামের সাদাসিধে মহিলা। মা 'মাম্মি' ডাক শুনে ছেলের বাবাকে আড়ালে ডেকে বলছেন, 'ওগো এ কি হলো ! পাঠালাম ছেলে আর ফিরে এল ভাগ্নে! আমাকে মামি বলছে যে!' আসলে বাঙালি পরিবারে মায়েরা 'মা' ডাক শুনে অভ্যস্ত। মা ডাকে যে আনন্দ পাওয়া যায় ও তার যে মর্যাদা থাকে 'মাম্মি' ডাকে সে আনন্দ পাওয়া যায় না এবং সে মর্যাদাও থাকে না।

কয়েক বছর আগে 'আনন্দ বাজার' সংবাদপত্রে পড়েছিলাম—ইংল্যান্ডের একটি সংস্থা পৃথিবীর সব দেশ থেকে নিত্য ব্যবহার্য মধুর শব্দ-সকল সংগ্রহ করছে। তাদের বিচারে 'মা' শব্দটি নিত্য ব্যবহার্য ও মধুরতম শব্দ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে।

পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে উপরিউক্ত স্মৃতিকথা পাঠ করে পাঠকের যদি স্বল্পতমও আনন্দ হয় ও কিছুমাত্র উপকার হয় তাহলে এই স্মৃতিচারণ সার্থক হবে।

“রামকৃষ্ণ সংঘ নিবেদিত এক মহাপ্রাণ”

স্বামী সুনিশ্চিতানন্দ

মহাভারতে কুরুক্ষেত্রে রণাঙ্গনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় যোদ্ধা ভক্ত অর্জুনজীকে বিশ্বরূপ দর্শন দিয়ে মোহমায়া মুক্ত করে যুদ্ধে উৎসাহী করে তুলেছিলেন দেখতে পাই। এযুগে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেব দরিদ্র অখ্যাত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে বিশ্বমানবকে পরিত্রাণের নাটক পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে ভারতভূমির কলিকাতাস্থিত গোপাল লাল শীলের বাগানবাটীতে ১৮৮৬ সালে “হাটে হাড়ি ভেঙ্গে” দিয়ে তিনি যে অবতার বরিষ্ঠ স্বয়ং ভগবানরূপে নিজের স্বরূপ কতিপয় ভক্তের সম্মুখে “তোমাদের চৈতন্য হোক” বলে বিশ্বরূপ দর্শন দিয়েছিলেন। সেই পুণ্য পবিত্র ভূমি এ যুগের মহান কুরুক্ষেত্র সমতুল্য কাশীপুর উদ্যান বাটীতে ১৯৭৮ সালে পরম পূজনীয় (রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ১৪তম সঙ্ঘাধ্যক্ষ) শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দ মহারাজজীর প্রথম সাক্ষাৎ বা দর্শন লাভ করি। তখন তিনি মঠ ও মিশনের প্রথম ট্রাস্টি। তখন কাশীপুর উদ্যানবাটী রামকৃষ্ণ মঠে বৎসর খানেক হলো যোগদান করেছি মাত্র। প্রথম দর্শনে মনে হলো একজন স্বামী বিবেকানন্দর মতো রাজসিক ভাবাপন্ন বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী সুন্দর সুঠাম চেহারা চলনে বলনে বলিষ্ঠতার প্রতাপ অনুভব করলাম, স্মৃতিপটে আজও অনুভব করে থাকি।

সেই সময় বেলুড় মঠের পরিচালন সমিতির সন্ন্যাসী মহারাজরা কলকাতায় এলে দেখতাম সকাল বা বিকালে সন্ধ্যায় উদ্যানবাটী ঘুরে যেতেন, এইরকম একদিন সন্ধ্যা আরতির পর তিনি কাশীপুর উদ্যানবাটীতে দুই-একজন ভক্তদের সঙ্গে শ্রীঠাকুরের মন্দির দর্শনের পর মঠবাড়িতে অফিস রুমে এসে বসেন, স্বাভাবিকভাবেই শ্রীঠাকুরের প্রসাদ জলযোগের সাথে চা পানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কাশীপুর উদ্যানবাটীর শুধু সন্ন্যাসীর সংখ্যা এখন খুবই নগণ্য। মোহন্ত মহারাজ, স্বামী যোগস্থানন্দ তিনি শ্রীঠাকুরের শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত, ভক্ত মহারাজ ও বিজয় মহারাজ

একজন পূজারী মহারাজ একজন ভান্ডারী মহারাজ আমি সকল কাজেই তাদের সহায়তা করে থাকি এই পর্যন্ত।

স্বাভাবিকভাবেই আমার উপর দায়িত্ব পরে চায়ের ব্যবস্থা করা, রাধুনী ঠাকুর একজন তিনি চা তৈরি করে দিলে আমি নিয়ে গিয়ে হাজির হলোম, চা দেবার পর মহারাজ মুখে এক ঢোক দিয়েই মুখ থেকে ফেলে দিলো তিনি বেশ জোড়ের সঙ্গে বলে উঠলেন আরে এটা কি চা হয়েছে, নাকি ঘোড়ার মুত এনেছিস। উপস্থিত সকলের জোড় হাসির রোল উঠল। আজও স্মৃতিপটে অনেক সময় চা বানানোর কথা হলে মনে মনে বেশ হাসির সঙ্গে তাঁর স্মৃতি মন্থন করে থাকি।

মহারাজ বললেন কে বানিয়েছে এই চা, আমার কথা শুনে বললেন যা এই ভাবে বানিয়ে নিয়ে এসো, কিভাবে চা তৈরি করতে হয় বুঝিয়ে বলে দিলেন। এবার নিজে সেই মতো চা তৈরি করে এনে দিতে বলেন। একটু ভয়েই চা পরিবেশন করলাম, এবার কিন্তু একটু প্রথমে মুখে ঠেকিয়ে পান করে বলেন, হ্যাঁ এবার ঠিক হয়েছে, চা এইভাবে করতে হয় বুঝলে। শুনে আমিও বেশ মনে মনে আনন্দিত হলোম। প্রথম দর্শন বা সাক্ষাৎকার এইভাবেই হয়েছিল বলে আমাকে স্মৃতিপটে স্থান করে নিয়েছিলেন, পরবর্তিকালে তা বেশ অনুভব করেছিলাম।

স্বামী হিরনমায়ানন্দজী তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক। ওঁনার সঙ্গে বিকেলবেলা উদ্যানবাটী এসেছেন বিশেষ কাজে। বর্তমানে সাধু নিবাসের প্রবেশের ডানদিকে যে লম্বা কামরাটি Book Stall হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে তখন ঐ কামরাটি পাঠাগার ও প্রতি রবিবার কল্পতরু অফিস হিসাবে বিকেল বেলা ব্যবহার হত। দরজার সম্মুখে একটি পুরানো ধুতী টাঙ্গানো ছিল—পূজনীয় গহনানন্দ মহারাজ দেখতে পেয়ে আমাকে চুপ চুপ করে বললেন, ছুটে গিয়ে ওটা সরিয়ে দিয়ে এসো, সঙ্গে সঙ্গে পূজনীয় হিরন্ময়ানন্দ ঐ কামরায় যাবার পূর্বেই ধুতিটি সরিয়ে দিয়ে এলাম, ঘটনাটি অতি সামান্য কিন্তু স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের একটি রুচিবোধের দৃষ্টান্ত দেখে মুগ্ধ হলোম। তাঁর সাত্বিক ও রাজসিক বাস্তবচিত জ্ঞানের পরিধি বহুক্ষেত্রে সচক্ষে দৃষ্টিপাতে ব্যক্তিগতভাবে সমৃদ্ধ হয়েছি।

১৯৮৪ সালে বেলুড় মঠে ট্রেনিং সেন্টারে আছি, ঐ বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজায় আমাদের ব্রহ্মচর্য্যব্রত অনুষ্ঠানের নামের লিস্ট প্রকাশ হয়েছে, সেই লিস্টে কর্তৃপক্ষ সম্মতি প্রকাশ করেছে জেনে বেলুড়মঠের প্রথা অনুযায়ী মঠের সকল গুরুজনদের আশীর্বাদ প্রার্থী হিসাবে নির্দিষ্ট দিনে একসঙ্গে সকল ব্রহ্মচারী বৃন্দ পূজনীয় সন্ন্যাসী

বৃন্দের কাছে প্রণাম করতে গিয়েছি, মিশন অফিসের একজন ট্রাস্টি মহারাজ শরীর স্বাস্থ্য কারণে তিনজন ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠানের উপযুক্ত নয় মনে করে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বলেন তোমাদের তিনজনের (ব্রঃ দীপঙ্কর, ব্রঃ নন্দকুমার, ব্রঃ সমীর) এ বৎসর ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবে না, স্বাভাবিকভাবেই আমরা তিন জন খুবই মর্মাহত হই, পরে আমরা তিন জন, পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদককে দেখা করে জানাতে তিনি সমস্ত ঘটনা শুনে আমাদের নির্দেশ দিলেন তোমরা আগামীকাল সকালে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ডাক্তার দেখিয়ে এসো, এখন তো তোমাদের ব্রহ্মচর্য্যব্রত অনুষ্ঠানের ট্রাস্টি কমিটির নির্দেশে নির্বাচিত হয়েছে। এখন তো কোনভাবে বাদ দেওয়ার নিয়ম নেই তবু ট্রাস্টি মহারাজ বলেছেন সেহেতু তোমরা হাসপাতাল থেকে দেখিয়ে রিপোর্ট দিও। আমি সেবাপ্রতিষ্ঠানের ডাক্তারকে বলে দিচ্ছি, আমাদের সামনেই নিজে ফোন করে আমাদের ব্রহ্মচর্যের ব্যাপারে সমস্ত ঘটনা নির্দিষ্ট ডাক্তারবাবুকে বলে দিলেন।

পরদিন সকালে দুশ্চিন্তা নিয়ে সেবাপ্রতিষ্ঠানে গেলে ডাক্তার আমাদের শারীরিক পরীক্ষার পর, ভাল করে একটু খাওয়ার জন্য চার্ট তৈরি করে হাতে ধরিয়ে দিলেন আর সব ঠিক আছে, আমরা নিশ্চিন্তে মঠে ফিরে এসে পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজীকে জানালাম। পরদিন সকাল, দুপুর, রাত্রে বিশেষ ভাল ভাল ফল, দুধ, ইত্যাদি ব্যবস্থা দেখে আশ্চর্য্য হলোাম, পূজনীয় গহনানন্দজীর কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। তাঁর ঐ বিশেষ ব্যবস্থা ও করুণাপূর্ণ দৃষ্টি, আর মমতাপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয়ে আজ এই বয়েসে সে দিনের সেই ঘটনা তাঁর নাম উচ্চারণের সাথে সাথে শ্রদ্ধাভক্তিতে মাথা নত হয়ে যায়। ছিল তাঁর মানবদরদী মহাপ্রাণ।

তাঁর সুঠাম দীর্ঘদেহী শরীরের ভিতর ধির স্থির এক প্রজ্ঞা দরদী মন গুপ্তভাবে যে অবস্থান করতো তা জানার উপায় ছিল না, এমনি ছিলো বাহিরের একটি দুর্ভেদ্য আবরণ। রুচি ও রসবোধ ঘিরে থাকতো সদা সর্বদা তাঁর মনের অন্তরালে ভক্তি প্রেমের এক পরাকাষ্ঠা রূপধারী স্বামী গহনানন্দ রূপী সন্ন্যাসীর গৈরিকবস্ত্রের অন্তরালে তিনি হয়তো বাগ্মী, লেখক ছিলেন না, ছিলেন কর্মবীর যেটা স্বামী বিবেকানন্দ আশা করতেন কর্মবীর। "তোরা কর্ম করতে করতে মরে যা" সেটাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান। স্বামী গহনানন্দজীকে দর্শন করলে মনে হতো স্বামীজি যে বীরের কথা বলেছিলেন, সেই বীরত্ব স্বামী গহনানন্দজীর ভিতর পূর্ণমাত্রায় পরিপূর্ণতায় বিকশিত হয়েছিল।

এক সময় রাঁচি থেকে (T.B. Sanatrium) বেলুড় মঠে এসেছি আশ্রমের কাজে। মহারাজ তখন সাধারণ সম্পাদক, ওনার অফিসে ঢুকে প্রণাম করলাম, সম্মুখে চেয়ারে কয়েকজন দর্শনার্থী বসে। প্রশ্ন করলেন তুমি এখন কোথা থেকে? সংক্ষেপেই উত্তর দিলাম রাঁচি থেকে। আমার চোখের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন ও বললেন একটু অপেক্ষা কর। তারপরেই ভক্তেরা প্রণাম করে বিদায় নিলেন। তারপর মহারাজ হাসতে লাগলেন ও বললেন তুমি ঐ যে রাঁচি উত্তর দিলে ওরা কি ভাবলো বলো তো। আমিও হেসে উত্তর দিলাম বুঝতে পেরেছি তবে এখন আর সেরকম আর কেউ ভাবে না—রাঁচিতেই শুধু পাগল থাকে। মহারাজ বললেন হ্যাঁ, তা অবশ্য অনেক জায়গাতে পাগলা গারদ আছে। তুমি কি জানো দমদমে একটা আছে? আমি বলি জানি মহারাজ। কিছুক্ষণ কথা বলার পর বিদায় নিলাম। মহারাজের এই প্রকার ছিল রসবোধ, যেটা বাহির থেকে বোঝা খুবই শক্ত ছিল।

অপর একটি রসবোধের ঘটনা উল্লেখ না করে তাঁর সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ সমাপ্ত করা যায় না। সেই রসবোধের মধ্যেও তাঁর ব্যক্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট থাকতেন—১৯৮৮ সালে আমাদের সন্ন্যাস দীক্ষার পর তাঁর সময় মতো রাত্রি ১০ টার পর সকলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে নবসন্ন্যাসীবৃন্দ প্রণাম করতে গিয়েছি। মহারাজকে একে একে প্রণাম ও নূতন সন্ন্যাস নাম সঠিকভাবে উচ্চারণ করে শোনান পর্ব চলছে, আমাদের মধ্যে একজন বাংলাদেশ থেকে আগত সন্ন্যাসী প্রণামের পর নিজের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে ঐ দেশীয় ভাষার প্রথা অনুযায়ী নিজ নাম স্বামী বিজিত্মানন্দ বলতে গিয়ে বারবার স্বামী- জি এর স্থলে চি উচ্চারণ করার জন্য সমবেত সকলে উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন, মহারাজ কিন্তু তাঁর সঠিক উচ্চারণ না হওয়া পর্যন্ত বারবার সঠিক উচ্চারণ করতে বলে যাচ্ছেন; আমরা সকলে হেসে হুটুপাটি করছি। পূজনীয় মহারাজ কিন্তু গম্ভীরভাবে উপভোগ করছেন, বাইরে কিন্তু তার এতটুকু বহিঃপ্রকাশ নেই অথচ মুখমন্ডলে আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। এমনি ছিলেন তাঁর রীতি ও সৌজন্যবোধ যা সত্যই শিক্ষণীয়।

রাঁচি T.B. Sanatrium-এ আদিবাসীদের মধ্যে মহারাজের অহেতুকী কৃপাপ্রদানের কথা ঐ অঞ্চলে মানুষ এখনো মনে রেখেছে। ১৯৯০ সালের কথা—আশ্রমের বহু আদিবাসী কর্মী নিজ ধর্ম পরিবর্তনের দিকে। ঐ সময় কোন আদিবাসী আশ্রমের মন্দিরের প্রণামের আস্থা পর্যন্ত তৈরি হয়নি। দু'চারজন যুবক ছেলেকে জোড় করেই প্রণাম করতে পাঠাতাম। তাঁদের মধ্যে ঠাকুর, মা, স্বামীজির ভাবের চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গ নিয়ে তখনকার অধ্যক্ষ স্বামী তপনানন্দ মহারাজকে অনুরোধ করি, আপনি

বেলুড় মঠে যাচ্ছেন, যোগোদ্যান যাবেন পূজনীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বামী গহনানন্দজীকে যদি আদিবাসী ভাই বোনেদের দীক্ষার জন্য একটু অনুরোধ করে বলেন। এরপর অধ্যক্ষ মহারাজ কলকাতা থেকে ফিরে এসে আমাকে বলেন, মহারাজ দীক্ষা দিতে সম্মত হয়েছেন—দেখ কতজন আদিবাসী ভক্ত দীক্ষা নেবে। উৎসাহ নিয়ে ১৬জন যুবক এবং ২ জন মহিলা আদিবাসী ভক্ত দীক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক জেনে তাঁদেরকে সেইভাবে প্রস্তুত করা হয়। কয়েকমাস পরে যখন পূজনীয় মহারাজ Ranchi T. B. Sanatrium এলেন, দীক্ষার দিন মহারাজ সকল ভক্তদের দীক্ষার পর আলাদা করে দীক্ষা দেন। দীক্ষা দেবার সময় মহারাজ লক্ষ করেন তাঁরা অতি সহজে দীক্ষার প্রণাম, জপ করার পদ্ধতি সহজে রপ্ত করায় পূজনীয় মহারাজ খুবই আশ্চর্য হয়ে যান। দীক্ষার পর মহারাজের প্রধান সেবক স্বামী নরসিংহ মহারাজ মজা করে তোমাদের আদিবাসী ভক্তরা তো মন্ত্রটা ছাড়াই ট্রেনিং প্রাপ্ত ছিল, আঙ্গুলের কর গোনা থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যাপারে। মন্ত্রটা দিয়ে দিলেই হতো। ...।

প্রথমবার পূজনীয় মহারাজ মোট ১৮ জন আদিবাসী ভক্তদের দীক্ষা দেন, তারপর কয়েক বৎসরের মধ্যে ৭০০ এর অধিক ১৯ গ্রামের মধ্যে দীক্ষাদানে কৃপা করেন, সেই কারণে আশ্রম প্রীতি তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠে, বহু খ্রীষ্টান আদিবাসী পর্যন্ত মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে শ্রীঠাকুর, শ্রীমার ও স্বামীজির জন্ম তিথিতে গ্রাম থেকে ঢোল, মাদন, ধামসা বাজাতে বাজাতে রামকৃষ্ণ শরণম্, জয়ধ্বনী দিতে দিতে আশ্রমে যোগদান করত। এমনকি মন্দিরে তাদের ভাষায় লিখিত শ্রীঠাকুরের কথা ওরাই পাঠ করত। এবং প্রতি বৎসর ঐ গ্রামগুলো হতে ২/১ জন করে দীক্ষিতদের বেলুড় মঠে তিন রাত্রি বাস, কামারপুকুর, জয়রামবাটী দর্শন করে পুরুলিয়া হয়ে বাসে করে রাঁচি প্রত্যাগমন করত। সে সব সুখ স্মৃতি ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। পূজনীয় মহারাজের রাঁচির আদিবাসী ভক্তদের প্রতি আলাদা আকর্ষণ বেশ অনুভব করে থাকি।

‘জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথায় কবে’, সময়ের সাথে সাথে দীর্ঘদিন রোগভোগে শয্যায় ছিলেন। কলিকাতার মিশনের সেবাপ্রতিষ্ঠানে বহুবার সময় পেলে নরেন্দ্রপুর থেকে দেখতে আসতাম বিকেলের দিকে। অবশেষে ২০০৭ সালের ৪ ঠা নভেম্বর তিনি চিরবিদায় নিয়ে রামকৃষ্ণ লোকে ফিরে গেলেন। রেখে গেলেন স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের আদর্শ, দূরদর্শিতা দৃষ্টিসম্পন্ন এক রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ সংঘ নিবেদিত মহাপ্রাণ, তাঁর শ্রীচরণে শ্রদ্ধা ভক্তিযুক্ত শতকোটি প্রণাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ জয়তু

স্বামী জুষ্ঠানন্দ

স্বামী নির্বাণানন্দ মহারাজ স্বামী গহনানন্দ মহারাজকে দেখেই বলতেন, "ওর মধ্যে গুরুশক্তি জাগ্রত।" আমি জামসেদপুরে মহারাজকে প্রথম দেখি। খুব ভালো স্বাস্থ্য ছিল মহারাজের। প্রত্যহ স্বাস্থ্য চর্চা করতেন, বলিষ্ঠ দেহ ছিল। কী বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা ছিল। তাঁর সঙ্গে ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তাও দেখে ভয় হত না, এত প্রেমিক লোক ছিলেন। মহারাজ লোকের চলাফেরা দেখেই বুঝতে পারতেন যে তার মধ্যে মানসিকতার কী ভাব আছে। সেবাপ্রতিষ্ঠানে মহারাজ থাকাকালীন দেখেছি কীভাবে সেটার তদারকী করতেন। মহারাজ সপ্তাহের দুদিন থাকতেন সেবাপ্রতিষ্ঠানে। তখন তিনি রামকৃষ্ণ সংঘের ও সহ-সম্পাদক ছিলেন। দুটো জায়গার কাজ দেখতে হত মহারাজকে। সমস্ত দিন কাজ করে রাত ১০ টার পর হিসাব নিয়ে বসতেন, যত রাত বাড়ত কাজের গতিও আরও বাড়ত, এ যে বিশাল রামকৃষ্ণ সংঘের কাজ। এখন তো কম্পিউটারের যুগ তখন তো আর সেসব ছিল না। মহারাজ নিজের হাতেই সব কাজ করতেন। এত বিশাল রামকৃষ্ণ সংঘের কাজ, জায়গা- জমি, নতুন বিল্ডিং এই সমস্ত কাজ একজন আইনজ্ঞ এর মতো সামলে নিতেন। যতটুকু জানি তিনি জমিদারও ছিলেন না, তাও যেন এইসব বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। মহারাজ খুব রসিক ছিলেন। হাসতেনও আর হাসাতেনও। একজন উড়িয়া রাঁধুনি ছিল মঠে, মহারাজ তার সামনে গিয়ে একদিন উড়িয়া ভাষায় গান গাইলেন। "নন্দন পিলা..."। মহারাজের ধৈর্য্য শক্তি ছিল অপরিসীম। আমি তখন ব্রহ্মচারী শেলাতে গেছিলাম, মহারাজ তখন শিলং এ যান সেখান থেকে যান শেলাতে। শেলাতে একটি পাহাড়ি নদী আছে। খাসি ভক্তরা যেমনই জানতে পারল স্বামী গহনানন্দ মহারাজ সেখানে গেছেন, তারা সেই নদীতে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে ভিজে কাপড়-চোপড় নিয়ে দল বেঁধে মহারাজকে প্রণাম করতে আসছে, আর মহারাজ ও আনন্দের সহিত তাদের প্রণাম গ্রহণ করছেন। ধৈর্য্যের বাঁধ কিন্তু মহারাজের ভাঙছে না। মহারাজের সঙ্গে একজন ব্রহ্মচারী সেখানে গেছিলেন, সে কিন্তু অধৈর্য্য

হয়ে পড়েছিল আর সেখানে একটি বেঞ্চ রাখা ছিল সেটাতেই শুয়ে পড়ল। সেটা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় মহারাজের ধৈর্য্যশক্তি কতটুকু ছিল। গুরু শক্তি যে দারুণ সেটা নিজেই দেখেছি, জপ-ধ্যানের ব্যাপার খুব ভালো বুঝতেন, অনেক নবীন ব্রহ্মচারীদের যা হত মন স্থির থাকত না, যাকে বলে আধ্যাত্মিক সংকট। সেটাকে কী করে কাটাতে হয় সেটা খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন, যার জন্য অনেকের বহু উপকার হয়েছে। মহারাজের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে অনেক কাজে গেছি তাই জানতে পেরেছি অনেক কিছু। যতই কঠিন সমস্যাই আসুক না কেন মহারাজকে কখনও বিচলিত হতে দেখিনি।

মহারাজের ব্যক্তিত্বের ভিতরে স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ ছিল। যেমন গীতাতে আছে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন,

"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেতকিম।"

এই যে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝালেন, সেই লক্ষণের আভাস আমরা পূজনীয় মহারাজের মধ্যে লক্ষ করেছি, যার কোনো শেষ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চতুর্দশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দ মহারাজের পাদপদ্মে প্রণাম জানিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলাম।

"শ্রী রামকৃষ্ণ জয়তু"

(বিঃ দ্রঃ উপরে উল্লেখিত লেখা পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দ মহারাজের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে শিলচরে আয়োজিত অনুষ্ঠান ২৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তে বলা বক্তৃতা থেকে পাওয়া কিছু কথা)

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের স্মৃতিসুধা

স্বামী অভয়াত্মানন্দ

যাঁর স্মৃতিচারণা লিখতে যাচ্ছি তিনি এক দিব্যপুরুষ—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্দশ সঙ্ঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। ১৯৮০ সালের অক্টোবরে কালীপূজার কয়েকদিন আগে বেলুড় মঠে পুরাতন মিশন অফিসে তাঁকে প্রথম দর্শন করি। তিনি তখন মিশন অফিসের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। একজন সিনিয়র ব্রহ্মচারী দূর থেকে মহারাজকে দেখিয়ে বললেন, 'উনি গহনানন্দজী মহারাজ।' গহনানন্দজী মহারাজ তখন মঠ ও মিশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক।

সেদিন শুধু দূর থেকে দর্শন। কিন্তু তাতেই মন ভরে গেল। অনেক সন্ন্যাসীর মুখে শুনতাম, গহনানন্দজী মহারাজের কাছে নিঃসঙ্কোচে সব কথা বলতে পারা যায়। পরবর্তীকালে সঙ্ঘ জীবন-যাপনে ওনার সাথে কথা বলে ঐ উক্তির সত্যতা অনুভব করেছি। শুধু সাধু-ব্রহ্মচারীরা নন, বেলুড় মঠে আগত ভক্ত-অনুরাগীদের প্রতিও ছিল মহারাজের সমদৃষ্টি ও আন্তরিক ভালোবাসা। তাছাড়া মঠের প্রতিটি ছোটখাটো বিষয়েও তাঁর তীক্ষ্ম নজর ছিল। এ প্রসঙ্গে এক অভিজ্ঞতার কথা এখানে জানাচ্ছি। তখন বেলুড় মঠেই আছি। অন্নভোগ নিবেদনের জন্য শ্রীমন্দিরের দরজা বন্ধ রয়েছে। যথারীতি ভোগ নিবেদনের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগমূর্তি দর্শনের জন্য ভক্তরা নাট মন্দিরে বসে আছে। তাঁদের চটি রয়েছে শ্রীমন্দিরে ওঠার সিঁড়ির নিচে। ঐ সময় আমি কোন কারণে শ্রীমন্দিরের পূর্বদিকে অর্থাৎ গঙ্গার সমান্তরালে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঠিক ঐ সময়েই পূজনীয় মহারাজজীও ঠাকুরের ভোগমূর্তি দর্শন ও প্রণাম করার জন্য ঐ পূর্বদিক দিয়েই মন্দিরে উঠতে যাবার মুহূর্তে আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন। আমি কাছে যেতেই মহারাজজী গঙ্গার ধারে ব্যাগ হাতে নিয়ে ঘুরতে থাকা একজনকে দেখিয়ে বললেন, 'বাঁকুড়া, ঐ যে লোকটিকে দেখছো, ও ভক্তদের খুলে যাওয়া চটিজুতো নিয়ে যাবে। মন্দির থেকে বেরিয়ে ভক্তরা তাদের চটিজুতো না পেলে মন খারাপ হবে।

তাই, ভক্তরা না আসা পর্যন্ত তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো।' প্রসঙ্গত জানাই, যেহেতু আমি বাঁকুড়া মঠের সাধু তাই মহারাজজী আমাকে 'বাঁকুড়া' বলেই সম্বোধন করতেন।

পূজনীয় মহারাজের চেয়ে বয়সে বড় সাধুদের গহনানন্দজী মহারাজ কী সম্মান করতেন তাও দেখেছি। গহনানন্দজী যখন ব্রহ্মচারী হয়ে ভুবনেশ্বর মঠে যোগদান করেন তখন সেই মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ ও কর্মী সন্ন্যাসী ছিলেন শ্রেয়সানন্দজী (শৈলেন মহারাজ)। ইতিমধ্যে বহুদিন গত হয়েছে। সেদিনের যুবক সন্ন্যাসী শৈলেন মহারাজ বৃদ্ধ হয়েছেন। বাঁকুড়া মঠেই তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। গহনানন্দজী সঙ্ঘের সহ-অধ্যক্ষ হবার পর বাঁকুড়া মঠে দীক্ষা দিতে এসেছেন। রাত্রে প্রসাদ পাবার পর মহারাজের মুখ থেকে ঠাকুর-মা-স্বামীজির কথা শোনার জন্য আমরা সব সাধু ব্রহ্মচারীরা মহারাজজীর ঘরে জড়ো হয়েছি। কথাপ্রসঙ্গ শোনার পর আমরা গহনানন্দজীকে একে একে প্রণাম করলাম। সেই সাধুদের মধ্যে শ্রেয়সানন্দজীও গহনানন্দজী মহারাজের পাশে বসে ছিলেন। গহনানন্দজী বললেন, 'দেখি, শৈলেনদাকে প্রণাম করা যায় কিনা।' এ কথা শুনে শ্রেয়সানন্দজী বার বার আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'আবার ভাই তুমি কেন?' গহনানন্দজী কিন্তু কোন আপত্তি শুনলেন না। শৈলেন মহারাজকে প্রণাম করলেন। এভাবে তিনি সঙ্ঘের বয়ঃজ্যেষ্ঠ সাধুদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতেন। মহারাজের সন্ন্যাসজীবনের এই ব্যবহার ঠাকুরের সেই উক্তি মনে করায়—উঁচু জমিতে জল দাঁড়ায় না, নীচু জমিতেই জল দাঁড়ায়।

ভুবনেশ্বর মঠে থাকাকালীন এক অভিজ্ঞতার কথাও গহনানন্দজী মহারাজের মুখে শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। ঘটনাটি এইরকম যে, তাঁর সময়ে ভুবনেশ্বর মঠে আরো যাঁরা ব্রহ্মচারীরূপে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনের আশ্রমের অন্যান্য কাজকর্ম না করে শুধুমাত্র জপধ্যান ও শাস্ত্রপাঠ করার ইচ্ছে হয়েছিল। গহনানন্দজী মহারাজের নিজের কথায়, সে একদিন অধ্যক্ষ নির্বাণানন্দজীকে বলল, মহারাজ আমার কাজে ইচ্ছে নেই। জপধ্যান শাস্ত্রপাঠ করতে চাই। মহারাজ ব্রহ্মচারীর ওই কথা শুনে খুব খুশি। আমাদের সকলকে ডেকে হাসতে হাসতে বললেন, শোনো, এই ব্রহ্মচারী শুধু জপধ্যান করতে চায়। এ রকম মানুষের আজ বড়ই অভাব। আমি চাই ও জপধ্যান নিয়েই থাকুক। তা বাপু, ওর কাজটি তোমরা সকলে দায়িত্ব নিয়ে করে দাও।

অধ্যক্ষ মহারাজের অনুমতি পেয়ে সে ব্রহ্মচারী বেজায় খুশি। তারপর দু'তিন দিন বেশ কেটে গেল। নির্বাণানন্দজীর আদেশ ছিল ওই ব্রহ্মচারীকে কেউ যেন বিঘ্নিত না করে। সেই কারণে আমরা ওই ব্রহ্মচারীর সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতাম না বা

মেলামেশা করতাম না। আরো কয়েক দিন এভাবে কেটে যাবার পর দেখি, সেই ব্রহ্মচারী নির্বাণানন্দজীর পা ধরে কেঁদে কেঁদে বলছে, মহারাজ আমাকে কাজ দিন। মহারাজ তখন আমাদের সকলকে ডেকে আবার হাসতে হাসতে বললেন, ভাবলাম, জপধ্যান নিয়ে থাকবে এমন একজন ব্রহ্মচারী পাওয়া গেল—তা ইনিও দেখছি কাজ চাইছেন। এর কাজ ফেরত দাও। তারপর আমাদের সকলকে লক্ষ্য করে নির্বাণানন্দজী সেদিন আরও বলেছিলেন যে, স্বামীজি যে কর্মধারা এই সংঘে করে গেছেন—তা চার যোগের সমন্বয়ে তৈরি। তোমরাও চার যোগের অনুসরণ করে এগিয়ে যাও।

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজীর জীবন ছিল গীতায় কথিত চার যোগের সমন্বয়ে গঠিত। তাঁর শতবর্ষ স্মরণে তাঁরই কিছু কথা স্মৃতিচারণা করে তাঁরই শ্রীচরণে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হলো। এ যেন সেই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।

পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ

স্বামী অঘোরেশানন্দ

১৯৮১ সাল। আমার তীব্র ইচ্ছা সংসার ত্যাগ করে সাধু হব। পরিচিত একজন ভক্তকে বললাম। তিনি বললেন, তুমি মঠের সাধু হবে। তিনি আমাকে বেলুড় মঠে রঞ্জিত মহারাজের (স্বামী নির্লিপ্তানন্দজী) কাছে নিয়ে গেলেন। সব শুনে রঞ্জিত মহারাজ বললেন তুমি কাশিপুরে যাও। ওখানে লোকের দরকার। তবে দেখো, থাকতে বললে থেকে যাবে। বাড়ি যাবে না।

আমি যথারীতি কাশীপুরে গেলাম। মোহন্ত মহারাজ ছিলেন পূজনীয় স্বামী যোগস্থানন্দজী মহারাজ। তিনি সাদরে আমাকে গ্রহণ করলেন।

কাশীপুর মঠে আছি। সাধ্যমতো শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করি। পূজনীয় মহারাজ আমাকে স্নেহ করেন। একদিন তিনি মঠে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, ওঁরা বলেছেন তুমি সঙ্ঘে সাধু হতে পারবে না। কারন মঠে যোগদান করার যে যোগ্যতামান তা আমার ছিল না। তবে উনি বললেন, আমি যতদিন আছি ততদিন তুমি নিশ্চিন্তে এখানে থাক। আমি ভাবলাম তাতে কি। এখানে না হলে বাইরে যে কোন জায়গায় গিয়ে থাকব। এদিকে শ্রীশ্রীমার কাছে দিনরাত প্রার্থনা করি। সব শুনে আমার পরিচিত একজন ভক্ত বললেন, আমরা পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের সঙ্গে কথা বলব। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হলোাম। পূজনীয় মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠালেন। বেশ কয়েকজন ভক্ত আমাকে নিয়ে মহারাজের কাছে গেলেন। এঁরা সবাই পুজনীয় মহারাজকে দেবতার মতো ভক্তি করতেন। বলতেন, একজন সাধুর মতো সাধু।

বেলুড় মঠে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ পূজনীয় আত্মস্থানন্দজী মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে আমার ইন্টারভিউ নিলেন। প্রশ্নোত্তর ছিল এইরকম তুমি অঙ্ক জান কিনা না, ইংরাজী জান কিনা --- না, টাইপ জান কিনা --না। এইরকম অনেকবার না শোনার পর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি রান্না জান? আমি বললাম ঐটা একটু একটু পারি। মহারাজ

বললেন, আচ্ছা তাহলে চলবে। পূজনীয় আত্মস্থানন্দজীকে বললেন, একে অপনার পি, পি, টি সি-তে নিয়ে নিন। সঙ্ঘে প্রবেশ করবার সুযোগ পেলাম। এত কথা বলবার কারন, আমার মতো যোগ্যতামানহীন আরো অনেকে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের কৃপায় সঙ্ঘে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছে।

তখন শিকড়া কুলিনগ্রামে রিলিফের কাজ দেখছি। বাড়ি তৈরী করে দেওয়া। প্রচুর পরিশ্রম হচ্ছে। আশ্রমের মোহন্ত ছিলেন স্বামী সর্বানন্দজী মহারাজ। তার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছে। হয়তো মাত্রাটা একটু বেশি ছিল। তিনি যথারীতি গহনানন্দজী মহারাজের কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। মহারাজ তখন জেনারেল সেক্রেটারি। আমাকে মঠে ডেকে পাঠালেন। মঠে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে আমাকে দুপুরে আসতে বললেন। দুপুরে গেলাম। দরজা জানলা বন্ধ করে দিলেন। আমাকে নিয়ে বসলেন। উনি চেয়ারে আমি নীচে মাদুরে, মাথা নীচু করে। একথা সেকথার পর আমাকে তীব্র তিরস্কার করলেন। আমার ভিতরটা দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে গেল। কিন্তু বাইরের কাক-পক্ষী কেউ টের পেল না ভিতরে কি হলো। এত অনুচ্চ অথচ এত তীব্র এবং কঠোর ছিল সেই স্বর। তিনি ছিলেন ভদ্রতার প্রতিমূর্তি। তাঁর চলাফেরায়, কথাবার্তায়, রাগে আনন্দে ছিল তার প্রকাশ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ওজস্বিতা।

স্বামী রঘুনাথানন্দজী তখন শিলঙের মোহন্ত মহারাজ। তাঁর সঙ্গে দক্ষিন ভারতে বেড়াতে গেছি। ফিরে বেলুড় মঠে এসেছি। পুজনীয় মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। রঘুনাথানন্দজী মহারাজ খুব আনন্দ করে বললেন, মহারাজ এই দীপক ডিস্পেন্সারী দেখে। এবার প্রায় এক লক্ষ টাকার উপর সারপ্লাস হয়েছে। মহারাজ বললেন, ষ্টাফদের মাইনে বাড়িয়ে দাও। রঘুনাথানন্দজী হ্যাঁ বললে, তিনি জোরের সঙ্গে বললেন, বেশি করে বাড়িয়ে দেবে। আমি অভিভূত হলোাম। গরীব কর্মীদের উপর তার কতখানি দরদ ছিল বুঝলাম।

শিলঙে আছি। পূজনীয় হিরন্ময়ানন্দজী (জেনারেল সেক্রেটারি) এবং গহনানন্দজী (অ্যাসিষ্টান্ট সে:) আশ্রমে এসেছেন। গৌহাটী এয়ারপোর্টে সুমেধানন্দজী মহারাজ তাঁদের আনতে গিয়েছেন। ওঁরা যাবেন চেরাপুঞ্জি। আসতে অনেক দেরি হয়েছে। আমরা ভেবেছি গৌহাটীতে খেয়ে আসবেন। খাবার রাখিনি। তারা আসার পর খাবার কথা আমরাও জিজ্ঞাসা করিনি ওঁরাও কিছু বলেননি। বিকেলবেলায় মহারাজকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মহারাজ ঠান্ডা খাবেন না গরম? উনি বললেন, ঠান্ডা গরম যা হোক

কিছু এনে দাও। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। আমিতো অবাক। অনুযোগ নয়, রাগ নয়, কোন উত্তেজনা নয়। এমন দেখিনি। ছুটে গেলাম খাবারের ব্যবস্থা করতে।

আমি তাঁর সঙ্গ বেশি করিনি। দুর থেকে দেখেছি। দেখেছি ঝক্‌ঝকে মুখে অমলিন হাসি। সাধুদের সঙ্গে দেখা হলে বলতেন, 'করিষ্যে যতিষ্যে মনে আছে তো? অর্থাৎ অগ্নি সাক্ষী রেখে বেলপাতা দিয়ে শ্রীশ্রী ঠাকুরের সামনে যে প্রতিজ্ঞা করেছ, তা মনে আছে? দর্শন সাফ্‌ হ্যায় ?

তখন তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট। আর কিছুদিনের মধ্যে তিনি সঙ্ঘের অধ্যক্ষ হবেন। কন্টাই এসেছেন। অনেক ভক্তকে দীক্ষা দিয়েছেন। সেই শেষ দেখা। দেখলাম সে গহনানন্দজী আর নেই। এ অন্য মানুষ। তাকিয়ে আছেন। আত্মস্থ।

স্নেহের পরশ

স্বামী পরিতুষ্টানন্দ

১৯৮৮ সালে জানুয়ারি মাসে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ বিদেশে গেলে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তখন রাত্রে আমাকে সাধারণ সম্পাদক মহারাজের অফিসে শুতে হত। রাতে নিরিবিলি থাকার জন্য গহনানন্দ মহারাজ সাধারণত রাতে কাজ করতে পছন্দ করতেন। রোজ রাতে প্রায় ১০টা বা ১০.৩০ নাগাদ তিনি সাধারণ সম্পাদকের অফিসে আসতেন ও কিছুক্ষণ কাজ করে চলে যেতেন। একদিন আমি ক্লান্ত থাকায় তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি। মহারাজ যথারীতি রাতে এসে দেখেন আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছি। তিনি আমাকে ডেকে ওঠান এবং জিজ্ঞাসা করেন আমার শরীর খারাপ কিনা। আমি "না" বলায় আবার জিজ্ঞাসা করেন, আমার খাওয়া হয়েছে কিনা। আমি বলি যে, প্রচণ্ড ঘুম পাবার জন্য আমি শুয়ে পড়েছি। তিনি বললেন, "এসো আমার সঙ্গে"। তারপর তিনি তাঁর জন্য যে খাবার রাখা ছিল তা থেকে আমার যা প্রয়োজন তা নিয়ে খেয়ে, শুয়ে পড়তে বললেন। আমি যত বলি যে আমার ক্ষিদে নেই, তিনি তার থেকে জোরে বললেন, "যা বলছি তা করো। খেয়ে শুয়ে পড়।" আমার এত সঙ্কোচ লাগছিল—তাঁর জন্য আনা খাবার তিনি নিজে না খেয়ে আমাকে দিলেন, তাও অগ্রভাগ। সেইজন্যই বলেছিলাম যে আমার ক্ষিদে নেই। যাইহোক, অগত্যা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট খাবার থালা থেকে একটা রুটি আর একটু তরকারি হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছি। তিনি তা দেখে বললেন, "এটা নাও, ওটা নাও। ফ্লাস্কে দুধ আছে, সেটাও নাও।" প্রতিবাদ করে কোন লাভ হবে না জেনে তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। এত বছর আগেকার ঘটনা এখনও আমার মনে জ্বলজ্বল করছে। আমার মতো একজন সাধারণ ব্রহ্মচারীর (তখন আমি ব্রহ্মচারী) জন্য তাঁর এত ভালবাসা।

আরও একটি ঘটনা। ১৯৯২ সালের শীতকালের একটি রাত। তখন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক। যথারীতি রাতে ওনার সঙ্গে কাজ করছি। রাত বারোটা বা সাড়ে বারোটা হবে। হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। রাতে ১১টা পর্যন্ত জেনারেটার চলত সেই সময়। কাজেই তখন জেনারেটার আর চলবে না। তিনি বললেন, "আর তো কাজ করা যায় না, চলো তোমায় এগিয়ে দিই।" তখন আমাদের প্রধান কার্য্যালয় বর্তমান জায়গায় স্থানান্তরিত হয়নি। পুরনো অফিসের কাজ করতাম আর নতুন অফিসে শুতে আসতাম। মহারাজের কথার উত্তরে আমি বললাম, "মহারাজ, এর কোন প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই চলে যাব। আপনাকে আর আমাকে এগিয়ে দিতে হবে না।" তাঁর কাছে একটা এমারজেন্সি লাইট ছিল। তিনি বললেন, "না, চলো তোমাকে এগিয়ে দিই।" এখানেও দেখলাম প্রতিবাদ নিষ্ফল যাইহোক, নবনির্মিত প্রধান কার্যালয়ে মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে এলাম। আমি বাথরুম গেলাম, হাত-পা ধুলাম। তিনি আলো নিয়ে বাথরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি আবার বললাম, "মহারাজ, আপনি চলে যান। আমার কোনও অসুবিধা হবে না।" তিনি ততই বলেন, "যা বলছি তাই কর এরপর আমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরে গেলাম। তিনি ঘরের বাইরে আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি মশারি টাঙ্গালাম। মশারি গুঁজেছি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি "হ্যাঁ" বলাতে তিনি পুরানো মিশন অফিসে তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন। তাঁর এই ভালবাসা আজীবন ভুলতে পারব না।

পরবর্তী ঘটনাটি স্বামী নির্মলাত্মানন্দজীর (কৃষ্ণমূর্তি মহারাজ) কাছে শোনা। তখন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ মঠ ও মিশনের সহ-সম্পাদক। তাঁর শোবার ঘরের ঠিক ওপরে তিনতলায় কৃষ্ণমূর্তি মহারাজ তখন থাকতেন। একদিন বেশ গভীর রাতে কৃষ্ণমূর্তি মহারাজ শরীর খারাপের জন্য তাঁর নিজের ঘরেই বমি করে ফেলেন। বমি করার পর শরীরে বেশ ধকল হওয়াতে কৃষ্ণমূর্তি মহারাজ একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলেন। গহনানন্দজী মহারাজ বমি করার আওয়াজ শুনে সেই গভীর রাতে কৃষ্ণমূর্তি মহারাজের ঘরে গিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দেন। তারপর মহারাজ নিজের ঘর থেকে তাঁর ঔষধের বাক্সটি আনান ও একটি কর্মীর সাহায্যে বমি পরিস্কার করার ব্যবস্থা করেন। কিছুটা সুস্থ বোধ করার পর গহনানন্দজী নীচে নেমে আসেন। সেই রাতে গহনানন্দজী মহারাজের স্নেহের পরশে কৃষ্ণমূর্তি মহারাজের মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজকে যেমন দেখে ছিলাম

স্বামী প্রজ্ঞাত্মানন্দ

আমি যখন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের হেডকোয়ার্টার অফিসের সাধারণ বিভাগে কাজ করতাম, তখন আমার পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের নিকট সান্নিধ্যের আমার এক ... সুযোগ ঘটে। এইসময় এই মহাত্মার অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে খুব কাছ থেকে এক ঝলক দেখার সৌভাগ্য আমার হয়।

তাঁর চওড়া কাঁধযুক্ত শক্ত সমর্থ চেহারা ছিল তাঁর নেতৃত্বতায় ব্যক্তিত্বেরই পরিচায়ক। তাঁর এই সুস্বাস্থ্যের পিছনে পড়ল নিয়মিত শরীরচর্চা এবং খাদ্যাভ্যাসের পরিমিতি জ্ঞান। 'স্বামী গহনানন্দ' তাঁর এই নামের সঙ্গেই সমার্থক এক গভীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উদয় হতো, এক আধ্যাত্মিক শান্তিময় দৃষ্টি এবং সবরকম পরিস্থিতিতে সদাহাস্যময়তা ছিল তাঁর মুখাভিব্যক্তির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর এই শান্ত স্নিগ্ধতা মিশ্রিত দৃঢ়চেতনা সম্পন্ন মানসিকতা ছিল ভীষণভাবে প্রেরণামূলক। তিনি যুক্তিবাদী, পরিমিতবাক্ স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি আবেগের অতিরিক্ত প্রকাশকে অপছন্দ করতেন, এবং তাঁর কথা বলার মধ্যে কোনরকম বাধাসৃষ্টি করলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বাধাপ্রদানকারীকে নম্রভাবে সে ব্যাপারে সচেতন করে দিতেন। তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন, বাস্তবিক অর্থে তাঁর উপস্থিতির মধ্যে সর্বদাই এক অনন্ত অখণ্ড সত্তার অনুভব উপলব্ধ হতো। এই বিশেষ চারিত্রিক গুণাবলী তাঁকে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের গুরু পরম্পরার আলোকবর্তিকার অন্যতম ধারক ও বাহক রূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

মহারাজজী সর্বদা তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করতেন। তাঁর যে চারিত্রিক গুণ আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল তা হলো কোনো অবস্থাতেই বিন্দুমাত্র মানসিক স্থৈর্য্য ও শালীনতা বিসর্জন না দিয়ে দিনে এবং রাত্রে এক অমানুষিক শক্তি নিয়ে তাঁর কাজ করে যাওয়া। যখন তিনি মঠ-মিশনের সাধারণ সম্পাদক (General Secretary) তখনও সারাদিন ধরে তাঁর কর্মব্যস্ততা আমরা দেখেছি। তিনি

তাঁর রাতের খাবার খেতেন, প্রায় ১০-৩০টার সময় তারপর পুরনো হেডকোয়ার্টারে অফিসের সামনের বারান্দায় পায়চারি করতেন। তারপর রাত ১১ টা নাগাদ পুনরায় অফিসে আসতেন এবং প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রাদি দেখাশোনা করতেন। সেইসময় তাঁর সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য আমি লাভ করেছিলাম। তিনি চিঠি পত্রাদি বিশদে না বলে শুধু পয়েন্টগুলি আমাকে লিখে নিতে বলতেন এবং তার ওপর ভিত্তি করে আমাকে চিঠিগুলি লিখতে হতো। এরফলে তাঁর সময় বাঁচতো এবং আমারও তাঁর অধীনে থেকে নিজ সৃজনশৈলির চর্চা হতো। এরমধ্যে থেকে কিছু চিঠিপত্র সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত নেবার আগে তিনি তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। এইভাবে প্রতিদিন তিনি রাত্রি ১টা, কখনও ২টা পর্যন্ত কাজ করতেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই ছিল যে, পরের দিনের সকালে তাঁর মুখে চোখে কোন ক্লান্তির ছাপও চোখে পড়ত না। যথারীতি প্রতিদিন সকাল ৮টার সময় তাঁকে বেলুড়মঠের সব মন্দিরে মন্দিরে প্রণাম নিবেদন করতে দেখা যেত। যখন তিনি মন্দিরে দেবতার সামনে দাঁড়াতেন মনে হতো যেন তাঁরা সত্যিই সেখানে প্রাণময় হয়ে বসে আছেন আর মহারাজজী তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। একবার কোন বিশেষ উৎসবের সময় কয়েকজন ব্রহ্মচারী মন্দিরে কাজ করার সময় একটু জোরে কথা বলছিল। মহারাজ সেসময় সেখান দিয়ে যাবার সময় এটা লক্ষ করেন এবং ইশারায় মন্দিরে ঠাকুরকে দেখিয়ে তাদের নিঃশব্দে কাজ করার জন্য সচেতন করে দেন। যত বেশি তাঁর কাজের চাপ থাকত তত বেশি তিনি শান্ত থাকতেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, তাঁর নিয়মিত নিষ্ঠাভরে আধ্যাত্মিক সাধনার জন্যই তাঁর মধ্যে এই অসাধারণ গুণাবলীর সমাবেশ।

এটা খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল যে অনেক সন্ন্যাসী তাঁর কাছে আসতেন সংগঠন সংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত নানারকম সমস্যা নিয়ে। পরবর্তীকালে আমি জানতে পারি যে সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁদের প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দেওয়া ছাড়াও তিনি সেইসঙ্গে তাঁদের উপদেশ দিতেন জপ ধ্যান ও প্রার্থনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা করার জন্য। আর একটি খুব সহজ উপদেশ তিনি প্রায়ই দিতেন—“সবসময় এটা মনে করবে যে তুমি কিসের জন্য বাড়ি ঘর ছেড়ে এই পবিত্র আশ্রমে যোগদান করেছ। এটা তোমাকে অনেক ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবে।

আমি মহারাজজীকে কখনও ক্রোধে উত্তেজিত হতে দেখিনি। অবস্থা যতই অসহ্য হোক না কেন, কোনদিন তাঁর মুখনিঃসৃত কোন কটুবাক্য শুনিনি। এমনকি, আমরা যদি কখনও ভুল কাজ করেও ফেলতাম, কখনও তাঁকে তাতে বিচলিত হতে অথবা আমাদের ভর্ৎসনা করতে দেখিনি। বরং পরিবর্তে তিনি আমাদের নিজেদের ভুলটিকে

বুঝতে সাহায্য করে আমাদের নিজেকেই নিজে সংশোধন করে নেবার অনুপ্রেরণা দিতেন। তাঁর নির্দেশগুলি সবসময়ই ছিল ইতিবাচক।

খুব প্রয়োজন না হলে মহারাজজী কখনও সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতেন না। তার মানে এই নয় যে তিনি শাস্ত্রপাঠ বা প্রচারে আগ্রহী ছিলেন না । স্বামী রঘুনাথানন্দজী মহারাজ ব্রহ্মচারী অবস্থায় শিলং আশ্রমে পূজনীয় মহারাজের আশ্রয়ে ছিলেন। তাঁর কথায়, সেসময় পূজনীয় মহারাজের সাপ্তাহিক ধর্মীয় পাঠের ক্লাসগুলি খুবই আকর্ষক ছিল যেখানে ভারি সংখ্যায় ভক্তদের উপস্থিতি লক্ষ করা যেত এমনকি আশ্রমের সন্ন্যাসীগণও সেই পাঠে যোগদানের জন্য আগ্রহান্বিত হতেন। স্বামী রঘুনাথানন্দজী এ-ও বলেন যে পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ তাঁদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ যেমন ঠাকুরসেবা, সবজি কাটা ইত্যাদিতেও পথপ্রদর্শন করতেন। এমনকি তিনি যখন মঠ-মিশনের সাধারণ সম্পাদক (General Secretary) রূপে অতি ব্যস্ত মানুষ তখনও তিনি পণ্ডিতসাধু স্বামী মোক্ষদানন্দজীর সঙ্গে নিয়মিত শাস্ত্রাদি পাঠ ও আলোচনা যে সময় বার করে নিতেন। রাত্রে আহারের পর, সাধারণত রাত্রি ১০-৩০ টা নাগাদ যখন তিনি বারান্দায় পায়চারি করতেন তখন শাস্ত্রের সূক্ষ্মাদিসূক্ষ্ম ?????????

?????জন্য মহারাজজী সর্বদা আগ্রহান্বিত....মহারাজের শয়ন অন্তর্যামী

একবার তিনি আমাকে বলেন, 'নিজের পায়ে দাঁড়াও, অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ো না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের .... ডিগ্রির ভারে তাঁর ঝোলা ভর্তি করেন নি ঠিকই, কিন্তু যা .... তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর সম্পদেই সমৃদ্ধ ছিলেন, সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। পরমপূজ্য মহারাজজী কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জনকে গুরুত্ব না দিয়ে সর্বদা প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রচণ্ড বিদ্যার্জন, জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করতেন। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা আমার মনে পড়ছে—একবার তিনি একজন সন্ন্যাসীকে তার ডক্টোরেট ডিগ্রি অর্জনের প্রচেষ্টাকে এই বলে নিরুসাহিত করেছিলেন যে এটা শুধু আত্মগরিমার বুদ্ধির সহায়ক মাত্র।

মহারাজজী কখনও ভাবের আবেগে ভেসে যেতেন না, কারণ তিনি সর্বদা পশ্চাৎপটের কঠিন বাস্তবকে দেখার চেষ্টা করতেন। তাঁর এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তাঁকে সর্বদা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করত। অন্যান্য দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মঠ মিশনের আইনি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারেও দেখাশোনা করতেন। এসব ব্যাপারে তিনি সর্বদা .....অ....জী মহারাজের (শম্ভু মহারাজ) সঙ্গে সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রী তাপস ব্যানার্জী, শ্রী দীপানের দ্বন্দ্ব প্রমুখের সঙ্গে আলোচনা করতেন। এসব স্বপ্নেও

সর্বদা সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব মহত্ত্ব ও বুদ্ধি এ জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতেন বেশি। এরকম অন্তর্দৃষ্টি ও যথাযথ বিচারক্ষমতা ছাড়া তিনি কখনই এত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতেন না।

এক সময় আমি ধূলাবালি থেকে সৃষ্ট একধরনের এ্যালার্জিতে কষ্ট পাচ্ছিলাম। ফলস্বরূপ আমার চোখ সর্বদাই লাল হয়ে থাকত। পরমপূজ্য মহারাজজীকে যখন একথা জানালাম তিনি বললেন, "কিন্তু তুমি তো তোমার চোখে কোনো বাড়তি ধুলোময়লা ঢালছো না।" একথার মধ্য দিয়ে তিনি আমাকে বোঝাতে চাইলেন যে আমার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবই এই সমস্যার প্রধান কারণ, এজন্য পরিবেশকে বৃথা দোষারোপ করা ঠিক নয়। আমরা সাধারণত আমাদের দুঃখ-কষ্টের জন্য আমাদের পরিবেশকে দোষারোপ করে থাকি যেখানে আমাদের নিজেদের অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটিই এর প্রধান কারণ। এটি ছিল আমার জীবনে একটি অনেক বড় শিক্ষা।

মহারাজজী তাঁর চতুস্পার্শের মানুষজন সম্বন্ধে যেমন ওয়াকিবহাল থাকতেন সেরকম সমান সচেতন থাকতেন পশুপক্ষী গাছপালা ইত্যাদি সম্বন্ধেও। একবার রাত্রি প্রায় ১টার সময় একটি কুকুর বেলুড়মঠ ক্যাম্পাসের মধ্যে একটু অস্বাভাবিক রকমের শব্দ করে খুব আস্তে আস্তে ডাকছিল। তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ নীচে গিয়ে ব্যাপারটি অনুসন্ধান করতে বললেন। আমি নীচে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে আর অনুসন্ধান অফিসের সামনে পাবলিক টেলিফোন বুথের মধ্যে মঠের নৈশ প্রহরীটি ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই দেখে কুকুরটি তাকে জাগানোর চেষ্টা করছে। যে কেউ এরকম সাধারণ একটা কুকুরের ডাককে হয়তো গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতো না; কিন্তু পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ সর্ববিষয়েই সচেতন থাকতেন।

মহারাজজী সর্বদাই যুবসম্প্রদায়কে তাদের অন্তরের বিশেষ বিশেষ প্রতিভাকে বিকশিত করতে উৎসাহিত করতেন যাতে করে তারা আরও নিপুণভাবে তাদের প্রভুর সেবা করতে পারে। পরবর্তীকালে .... মহারাজজী মঠের অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট হন, তখন ক্বচিৎ কখনও তাঁর দর্শন পেতাম। তিনি তাঁর চিরপরিচিত অনুপম স্মিতহাস্যে জিজ্ঞেস করতেন আমি আমার ভক্তিসঙ্গীতের চর্চা এখনও বজায় রেখেছি কিনা।

যখন মহারাজজী ত্রিপুরা পরিদর্শনে আসেন, তখন একদিন তাঁকে আশ্রমের নতুন নির্মীয়মান উপশাখা ধলেশ্বরে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি নির্মীয়মান নতুন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ভবনটিও পরিদর্শন করেন। সবকিছু ঘুরে দেখার পর যখন ফিরে

আসছিলেন সে সময় গেটের কাছে এসে একটু থেমে যান। এবং মহান উপস্থিতির প্রতীক হিসাবে গেটের কাছেই দণ্ডায়মান এক সুবিশাল প্রাচীন তালবৃক্ষের প্রতি মুগ্ধনয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপরে নীচুস্বরে জিজ্ঞেস করেন—'এই তালবৃক্ষটি কি থাকবে?' আমরা সঙ্গে সঙ্গে জানাই—'নিশ্চয়ই!'বাস্তবিক, নির্মাণের স্বার্থে বা সৌন্দর্যরক্ষার নামে আমরা অনেক সময়ই অনেক গাছ নির্মমভাবে কেটে ফেলতে দ্বিধা করি না। মহারাজজী সর্বত্র এবং সকলের মধ্যে ঈশ্বরকেই অনুভব করেন এবং প্রত্যেক প্রাণীকেই এমনকি বৃক্ষকেও সমানভাবে শ্রদ্ধা জানান।

জীবনের শেষ সময়ে পরমপূজ্য মহারাজজীর শরীর স্বাস্থ্য এক বিশেষরূপেই খারাপ হয়েছিল যার জন্য তিনি প্রায় দেড়মাস জামতাড়া আশ্রমে এসে বিশ্রামগ্রহণ করেন। সেসময় রাঁচী মোরাবাদী আশ্রমে আমার পোস্টিং হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল জামতাড়া আশ্রমে গিয়ে তাঁকে দর্শন করার কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার সেখানে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। একটি চিঠির মাধ্যমেই তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কিন্তু খুব বিস্মিত ও উৎফুল্ল হই যখন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সান্ত্বনা বাক্য সহ তাঁর কাছ থেকে তাঁর সাক্ষ্যসহ সেই চিঠির উত্তর পাই। তাঁর মানবিকতা এবং সহৃদয় স্বভাবের এ ছিল এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কখনও কখনও একথা ভাবলে বিস্মিত হই যে আমি কি সত্য সত্যই কোনদিন এই মহাত্মাকে সেবা করার মধ্য দিয়ে আমার প্রভুকে সেবা করেছি—নাকি এ ছিল শুধুই স্বপ্ন। পরমপূজ্য মহারাজজীর মহাপ্রয়াণের পরে তাঁর ব্যবহৃত, তাঁর স্পর্শে পবিত্র একটি গরম লংকোট তাঁর সেবক হিসাবে অযাচিতভাবে আমি পাই। তাঁর আশীর্বাদ ও তাঁর পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এটি আমি পরমসম্পদের মতো রক্ষা করি। ঘটনাচক্রে পরবর্তী কালে অত্যন্ত শীতের দেশ আলমোড়া আশ্রমে আমার পোস্টিং হয়। এই কোটটি তখন আমায় সেই অতিরিক্ত ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে। সেইসঙ্গে আমার আধ্যাত্মিক পথের সমস্ত অশুভ শক্তি থেকেও বর্মের মতো রক্ষা করে।

আমি যখনই তাঁর সঙ্গে সেই গভীর রাত্রে নিঃশব্দে কাজ করার কথা ভাবি, তখনই অনুভব করি তাঁর আশীর্বাদ চিরকাল প্রতিনিয়তই আমাকে রক্ষা করে চলেছে।

পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের পুণ্য স্মৃতি

স্বামী সুমনসানন্দ

পরম পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে। আমি তখন বেলুড় মঠে PPTC তে থাকি, কিছুদিন পর নরেন্দ্রপুরে পোস্টিং হবে। একদিন পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম করতে গেছি তখন অবশ্য কথাবার্তা বিশেষ কিছু হয়নি, তখন আমি পূজনীয় আত্মস্থানন্দজী মহারাজের under এ ছিলাম। উনিই আমার (Mentor and Guide) তখন পরামর্শদাতা এবং পথপ্রদর্শ, অভিভাবক। কাজেই যা প্রয়োজন হত কম বেশি উনার সাথে কথাবার্তা হত। তারপর নরেন্দ্রপুরে চলে যায়। নরেন্দ্রপুরে যাওয়ার পরে সেবা প্রতিষ্ঠানে আমাদের মাঝে মধ্যে আসতে হত। পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ তখন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। একই সাথে পূজনীয় মহারাজ যেহেতু সহকারী সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সেজন্য বেলুড় মঠে সপ্তাহে দুদিন যেতেন। কাজকর্ম সেরে আবার সেবাপ্রতিষ্ঠানে ফিরতেন, এটাই ছিল পূজনীয় মহারাজের রুটিন। আমরা যখন বয়স্ক সাধুদের নিয়ে সেবাপ্রতিষ্ঠানে যেতাম তখন পূজনীয় মহারাজের সাথে স্বাভাবিকভাবেই দেখা হত। পূজনীয় মহারাজকে দেখতাম খুবই কম কথা বলতেন এবং গাম্ভীর্যভাব নিয়ে থাকতেন। তখন পূজনীয় মহারাজকে আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করতাম। কখনো আমরা যখন প্রসাদ পেতে যেতাম তখন পূজনীয় মহারাজ আমাদের ঈশারা করে জিজ্ঞাসা করতেন খাওয়া হয়েছে ? উত্তরে বলতাম হ্যাঁ মহারাজ হয়েছে। যথারীতি মহারাজকে প্রণাম করে আবার নরেন্দ্রপুরে ফিরতাম।

১৯৮৩ সাল, আমার একটু শারীরিক অসুবিধার কারণে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হয়। তখন মহারাজ মাঝে মধ্যে প্রেমানন্দ ওয়ার্ডে এসে ঘুরে দেখে যেতেন। আর একদিনের ঘটনা, দিনটা কোনো একটা রবিবার, আমরা গিয়েছি সেবাপ্রতিষ্ঠানে পূজনীয় মহারাজ তখন ডাক্তার এবং নার্সদের নিয়ে ওয়ার্ড ঘুরে ঘুরে দেখছেন। আমি জুতো

খুলে মহারাজকে প্রণাম করতে গেলে মহারাজ বললেন, না এটা হাসপাতাল, সেদিন অবশ্য জুতো পরেই মহারাজকে প্রণাম করেছিলাম। ১৯৮৪ সালে পুনরায় নরেন্দ্রপুর থেকে আবার বেলুড় মঠে ট্রেনিং সেন্টারে চলে আসি। তখন মঠের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন পূজনীয় হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ। সেবারে পূজনীয় হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ তখন পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজকে বললেন তোমাকে সেবাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে পুরোপুরিভাবে সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে হবে। এখনও মনে আছে, PPTC তে থাকতে দেখতাম, পূজনীয় মহারাজ খুব শরীর চর্চা করতেন এবং প্রতিদিন নিয়ম করে মন্দির প্রণাম করতেন। একদিন পূজনীয় মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি দেখা করতে গেছি, মহারাজ তখন মন্দির প্রণাম করে আসছেন – প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মহারাজ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ইশারা করে আমাকে উপরে আসতে বললেন। তাঁর কথামতো উপরে গিয়ে আমি ওনার রুমে গিয়ে ওনাকে প্রণাম করলাম এবং বললাম মহারাজ আমি ব্রহ্মচারী সুভাষ । আপনি আমাকে দেখা করতে বলেছেন। উনি বললেন – I want to see your education and meditation, go with Rathin Maharaj, do what we wants don't what he does not. Help him all possible ways. রথিন মহারাজ তখন স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজী, উনি তখন রামহরিপুরের হেড। রথিন মহারাজ তখন মঠে এসেছেন, ওখানে আমার পোস্টিং হবে। মহারাজ আমাকে বললেন, রথিন মহারাজকে চেনো, দেখা হয়েছে। আমি বললাম, না মহারাজ। তখন মহারাজ বললেন যাও দেখা করো। মহারাজের কথামতো আমি তখন রথিন মহারাজের সাথে দেখা করলাম। পরদিন ওনার সাথে আমাকে যেতে হবে। ওখানে আমাকে হস্টেলের দায়িত্ব দিয়েছিল এবং এছাড়াও অন্যান্য আরও অনেক কাজকর্ম করতাম এবং রথিন মহারাজকে সব কাজে সাহায্য করার চেষ্টা করতাম। পরবর্তীতে রথিন মহারাজ চলে গেলেন মস্কোতে সম্পাদক হয়ে। রথিন মহারাজ গোলপার্কে যেতেন রাশিয়ান শিখতে। আমি তখন ব্রহ্মচারী। আমাকে বলা হল হেডমাস্টার হতে, কিন্তু কিছুতেই আমি হেডমাস্টার হবো না। তখন রথিন মহারাজ আমাকে বললেন – মঠ থেকে আমাকে গহনানন্দজী, আত্মস্থানন্দজী এবং প্রভানন্দজী মহারাজ বলেছেন – বড়দের কথা না করতে নেই। তখন অবশ্য সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ। শেষমেশ আমাকে হেডমাস্টারের চেয়ারে বসানো হলো। আমার অবশ্য মনটা একটু খারাপ হল কারণ অনেক বয়স্ক মাস্টারমশাইদেরকে বকাবকি করতে হবে এই ভেবে। এই মন খারাপ অবস্থায় রথিন মহারাজ আমাকে বললেন, চলো মঠ থেকে ঘুরে আসি। তখন রথিন মহারাজ আমাকে পূজনীয়

গহনানন্দজী মহারাজের কাছে নিয়ে গেলেন। রথিন মহারাজ পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজকে সবটা খুলে বললেন – মহারাজ এই হচ্ছে সুভাষ। এ হেডমাস্টার হতে চাচ্ছিল না। পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ তখন বললেন কেন, তুমি আশ্রমে পূজো করছ, অন্য কত কাজ করছ – কোনো কিছুতে তোমার না নেই তবে এ বিষয়ে না কেন ? তখন আমি পূজনীয় মহারাজকে বললাম অনেক বয়স্ক শিক্ষক আছেন তারা লেট করে আসেন তাদেরকে অনেক সময় বকাবকি করতে হয়, সেজন্য আমার সংকোচ হচ্ছিল। সব শুনে পূজনীয় মহারাজ বললেন, শোনো – you are the Headmaster, you will take the decision yourself for the good of the institution and for the good of the students. বয়স্ক শিক্ষকদের সম্মান দেবে, যেমন তুমি Teachers' Room এ যাচ্ছিলে তেমন যাবে, চা-টা খাবে, শিক্ষকদের সাথে বসবে। দেখবে সবাই তোমাকে সমীহ করবে। কিন্তু তোমার যেন কোনো অহংকার না হয়। সবার কথা শুনবে কিন্তু decision তুমি নেবে। যেটা স্কুলের এবং ছাত্রদের জন্য কল্যাণকর সেটাই করবে। আর যে কোনো জায়গায় – Prayer এবং কোনো অনুষ্ঠানে তুমি পাঁচ মিনিট আগে যাবে দেখবে বাকি বয়স্ক শিক্ষক এবং সবাই তাড়াতাড়ি আসছে। আর বয়স্ক শিক্ষকদের সবার সামনে বকবে না। তোমার অফিসে ডেকে নিয়ে আলাদা করে বলবে যাতে তাঁদের সম্মানে না লাগে এবং বলবে আপনাকে দুমাস সময় দিলাম আপনি নিজেকে শুধরে নিন। তাতেও যদি না শুধরায় তখন আর একজন বয়স্ক শিক্ষক সহ তাকে ডেকে নিয়ে অফিসে বলবে দেখুন আপনাকে দুমাস সময় দিয়েছিলাম আপনি শোনেননি। তখন পাশে বসে থাকা বয়স্ক শিক্ষক বুঝবে যে ওনাকে এর আগেও বলা হয়েছে। তখন দেখবে পাশে বসে থাকা বয়স্ক শিক্ষক Teachers' Room এ গিয়ে অন্য শিক্ষকদেরও ব্যাপারটা বলবে তাতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

১৯৮৬-৮৮ এই সময়ে আমি বেলুড় মঠে ট্রেনিং সেন্টারে ছিলাম। আমি এবং শ্যামল মহারাজ আমরা রামহরিপুর থেকে ট্রেনিং সেন্টারে গিয়েছিলাম একসাথে। শ্যামল মহারাজের হঠাৎ একটা অসুবিধা হল – রক্তবমি শুরু হল। তখন প্রিন্সিপাল মহারাজ আমাকে বললেন যেহেতু তুমি রামহরিপুর থেকে এসেছো – তুমি ওর সাথে যাও সেবা প্রতিষ্ঠানে, পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের সাথে দেখা করে। আমি তখন মহারাজকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম, মহারাজ তখন বললেন ফিরে এসে আমাকে ফোন করবে। আমি বললাম, মহারাজ তখন তো অনেক রাত হয়ে যাবে, আপনি জেগে থাকবেন – মহারাজ বললেন আমি জেগে থাকবো, তুমি আমাকে ফোন করবে।

আমি অবশ্য ফিরে এসে ট্রেনিং সেন্টার থেকে উনাকে ফোন করেছিলাম। তারপর একদিন বেলুড় মঠে গেছি, মহারাজের সাথে দেখা – মহারাজ বললেন মিটিং শেষে তোমার সাথে কথা আছে। তারপরেই অবশ্য মহারাজের রহড়ায় একটা মিটিং ছিল। তাই মহারাজ বললেন, চলো আমার সাথে গাড়িতে করে রহড়া। রথিন মহারাজ তখন রামহরিপুরে নেই। আমি তখন ব্রহ্মচারী হেডমাস্টার। নতুন কোন সম্পাদক রামহরিপুরে পোস্টিং হয়নি। রহড়া যেতে যেতে মহারাজ আমাকে বললেন সব খবরাখবর আমাকে দেবে। ১৯৯৩ সালে আমরা স্বামীজির একটা শিকাগো Centenary of Swamiji's voice to America স্বামীজির একটা বড়ো ছবি তৈরি করেছিলেন পূজনীয় মহারাজ। পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ তখন যোগোদ্যানে থাকতেন। আমরা মাঝে মধ্যে যেতাম মহারাজের সাথে দেখা করতে। ২০০৭ সালে আমার পোস্টিং হয় নিউইয়র্কে। এর আগে অবশ্য আমি মালদা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলাম, তখন একদিন আমি বেলুড় মঠে এসছি মহারাজের আশীর্বাদ নিতে। পুজনীয় গহনানন্দজী মহারাজকে প্রণাম করতেই বন্ধুরা যাঁরা ছিল তারা বলতে লাগল - দেখুন মহারাজ নিউইয়র্কে পোস্টিং হয়েছে কাপড় চোপড় দেখুন ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ। তার মানে আমার ধুতি, কাপড় বিভিন্ন রঙের। পূজনীয় মহারাজ তখন বেলুড়মঠের প্রেসিডেন্ট। পূজনীয় মহারাজ তখন সপ্তর্ষি মহারাজকে ঈশারা করে বললেন – সাথে সাথে সপ্তর্ষি মহারাজ আমাকে মহারাজের ব্যবহার করা ২ সেট জামা, ধুতি, ২ সেট উত্তরীয় দিয়ে দিলেন। একেবারে নতুন চকচক করছে। আমি স্নান করে সেগুলো পরলাম। আমার মনে আছে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ একবার আমাদের সন্ন্যাসের পরে নতুন সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে এসেছেন – মহারাজ বলছেন, মনে আছে তো – মানে যে জন্য ঘর বাড়ি ছাড়া – সেটা মনে আছে তো। ঠাকুরের নাম মনে আছে তো – মানে এই নানানরকম কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত আছি এটা যেন না হয়। জপ-ধ্যান, সাধন ভোজন হচ্ছে তো। ঠাকুরের স্মরণ-মনন ঠিক মতো হচ্ছে তো। এই কথাটা শুধুমাত্র সাধুদের নয় ভক্তদেরকে উনি সবসময় মনে করিয়ে দিতেন। জাগতিক কোন বিষয়ে মন যাচ্ছে না তো। মানুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য মনে আছে তো। এসব কথা পূজনীয় মহারাজ সবসময় মনে করিয়ে দিতেন। মহারাজের সেই পুণ্য বাণী আজও প্রতিক্ষণ কর্ণকুহরে বাজতে থাকে আর তখনই নিজের অন্তরাত্মাকে সেই প্রশ্নগুলি করতে থাকি এ জীবনের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছি না তো।

পরমপূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজীর স্মৃতিকথা

স্বামী জীবেশ্বরানন্দ

পরম পূজনীয় মহারাজকে প্রথম দর্শন করি শিলং-এ ১৯৭৯ সালে। এরপরে দ্বিতীয় দর্শন হয় কাটিহার আশ্রমে, তখন পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে স্বামী গীতানন্দ মহারাজ এবং স্বামী সুমেধানন্দ মহারাজও ছিলেন।

কাটিহার আশ্রমে সকালের জলখাবারের সময়ে স্বামী সুমেধানন্দজী পূজনীয় মহারাজকে আমার বিষয়ে বললেন যে মহারাজ আমাকে চেনেন প্রথমে মহারাজজী বুঝতে পারেননি, কিন্তু যখন স্বামী সুমেধানন্দজী ওনাকে আমার পূর্বাশ্রমের কথা বললেন তখন মহারাজজী খুব অবাক ও খুশি হয়ে বললেন, "আচ্ছা এ! আরে এর পূর্বাশ্রমের সকলকেই তো আমি চিনি।" এরপর আমাদের মোহন্ত মহারাজ (স্বামী বিকাশানন্দ) আমাকে বললেন যে মহারাজ (পূজনীয় গহনানন্দজী) তোমাকে আর এখানে রাখবেন না, কালই বেলুড়ে পাঠিয়ে দেবেন। একটু পরে মহারাজ আবার বললেন যে, না এখন না, ৭-৮ দিন পরে যাবে। তারপরে আরো একটু পরে মহারাজ আবার বললেন, "না, তুমি আজই যাব।" এরপরে পূজনীয় মহারাজ ঐসময়ের সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় বন্দনানন্দজীর কাছে একটি পত্র লিখে দিলেন আর আমাদের মোহন্ত মহারাজও একটি চিঠি দিলেন আর আমি ঐদিনই বেলুড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। পূজনীয় মহারাজকে এই আমার বাস্তবিক প্রথম দর্শন।

বেলুড় মঠে পৌঁছে আমি যখন পি.পি.টি.সিতে ছিলাম তখন আমার পোস্টিং এর কথা চলছিল। কিন্তু পূজনীয় মহারাজজী ঐ সময়ে বাইরে ছিলেন। মহারাজজী ফিরে আসার পরে একদিন সকালে আমাকে ডেকে ভান্ডারী মহারাজকে (ঐ সময়ে সমীর মহারাজ ভান্ডারী ছিলেন) বললেন "এই ছেলেটি তোমাকে দিচ্ছি, একে দেখো "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" একে সব শিখিয়ো, এ সব শিখে নেবে।

প্রথম প্রথম আমি পূজনীয় মহারাজকে ভয় পেতাম কিন্তু একদিন পূজনীয় মহারাজ

ভয়ের প্রাচীর সরিয়ে দিলেন।

উনি আমাকে বলতেন সর্বদা যে, শরণমনন ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা। প্রথমে আমি কিছু বলতাম না, কিন্তু যেদিন ভয় ভেঙে গেল, সেদিন বললাম মহারাজজী! কাজের এত ব্যস্ততা শরণ মনন হয়ে ওঠে না। কিন্তু পূজনীয় মহারাজজী বললেন, 'না করতে হবে, নিশ্চিতই হবে।" আর সেইদিন আর আজকের দিন! মহারাজের আশীর্বাদে সব ঠিক আছে।

তখন পূজনীয় মহারাজ সহকারী সম্পাদক ছিলেন—বাইরে আসা যাওয়া করতেন, অনেক কাজকর্ম থাকতো কিন্তু আমার পুরো খোঁজ খবর নিতেন। জপধ্যান ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, আমি কি কাজ করি এবং কত পড়াশোনা করি সব কিছু। আর সর্বদা বলতেন কি আমাদের যা কিছু আছে সব ঠাকুর একমাত্র ঠাকুর। ঠাকুরসেবা মন প্রাণ দিয়ে করো। এখানে ঠাকুর জীবন্ত, স্বামীজি স্বয়ং ঠাকুরকে এখানে বসিয়েছেন। মুখ বন্ধ করে কাজ করো তাঁর শরণমনন ঠিক মতো করো।

যখন পূজনীয় মহারাজ সাধারণ সম্পাদক হলেন তখন উনি আমাকে রাজকোট পাঠালেন। কিন্তু আমাদের যাবার ইচ্ছা না থাকায়, মহারাজজীকে বললাম "মহারাজ! এত দূর!" তখন পূজনীয় মহারাজ বললেন, "দেখো যখন ছোট ছিলে আমার কাছে ছিলে, এখন বড়ো হয়েছো, এখন যাও, কোনো চিন্তা নেই।"

এই কথা আমি আমার গুরুদেব স্বামী ভূতেশানন্দজীকে বলতে, মহারাজ বললেন "আরে এতো দূরে! আচ্ছা ঠিক আছে। আমি কথা বলবো।'

পরের দিন পূজনীয় মহারাজজী আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন "দেখো তুমি রাজকোট যাও। আমি ছিলাম; আর চিন্তা করো না, "আমি" আছি।

পূজনীয় মহারাজজী যখন সহাধ্যক্ষ হলেন, তখন কয়েকবার ওনার গুজরাত আসা যাওয়া করতে হলো আর আমিও ওনার সান্নিধ্য পেলাম। এ সময়ে যখন মহারাজজী গুজরাতে এসেছিলেন ওনার সঙ্গে আমার সোমনাথ, দ্বারকা দর্শন হলো। পূজনীয় মহারাজ দ্বারকা দর্শন করে খুব আনন্দিত হলেন।

এরপর আমরা গির জঙ্গল দেখতে গেলাম। ওখানে সিংহ সিংহী দেখলেন মহারাজজী, ফিরতে অনেক দেরি হলো। পরের সকালে মহারাজজীর লিখড়ী যাওয়ার কথা তাই আমি সকালে ওনাকে দেখতে ওনার ঘরে গেলাম। আর প্রণাম করলাম। তখন মহারাজ বললেন, "এই! কালতো মায়ের বাহনের দর্শন করলাম!" একথা বলতে গিয়ে মহারাজজী এক আলাদাভাবেই ছিলেন। যখন একটু পরে মহারাজজীর ভাব একটু কম হলো, তখন বললেন, "আরে তোমরা তৈরি হয়ে গেছো, চলো।"

আরো একটি ঘটনা মনে পড়ছে—তখন আমি রাজকোটেই ছিলাম । মহারাজজী গুজরাতে দীক্ষা দিতেই আসছিলেন। আসার একদিন আগে আমাদের মোহন্ত মহারাজের কাছে পূজনীয় মহারাজজীর ফোন এলো, বললেন "কাউকে ফিরিয়ো না।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে আরো একটি ঘটনা আছে। দীক্ষা ও গুরুপূজা সম্পন্ন হবার পরে মহারাজজী আমাকে বললেন গুজরাতী ভাষায় নবদীক্ষিতদের জিজ্ঞাসা করতে যে তাঁরা সব জপ্ করবেন তো! তখন আমি তাঁদের বললাম মহারাজজী জানতে চাইছেন আপনারা সবাই জপ করবেন তো? তখন সবলোক উৎসাহিত হয়ে উচ্চস্বরে বললেন "হ্যাঁ করবো মহারাজ।" পূজনীয় মহারাজজী খুব আনন্দিত হলেন।

পূজনীয় মহারাজজী সবার উপরে নিজ কৃপাবৃষ্টি করতেন। আর যখনই গুজরাতে আসতেন তো একদিনে কমসে কম ১০০ লোককে দীক্ষাদান করতেন। মহারাজজী একদিন সবচেয়ে বেশি ১৮১জন লোকের উপরে নিজ কৃপা বৃষ্টি করেছেন।

পূজনীয় মহারাজজী যখন ঠাকুরকে প্রণাম করতেন, সে এক আলাদা দৃশ্যই হতো যেন ঠাকুরজী ও পূজনীয় মহারাজজী নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন; মহারাজজী ও যেন নিজের সমস্ত মনোবেদনা, সবকিছু ঠাকুরকে বলছেন। পূজনীয় মহারাজজী সর্বদা বলতেন কি ঠাকুরকে নিজের সবকিছু, সুখদুঃখ সবকিছু বলো, উনি শোনেন।

একটি মজার কথা আছে; মহারাজজীর সঙ্গে খুব মজাও হতো। এটি মনসাদ্বীপের ঘটনা। একদিন সপ্তর্ষি মহারাজ ও আমি সমুদ্র স্নানের মানস করলাম। এখন যাবার জন্য সপ্তর্ষি মহারাজ, পূজনীয় মহারাজজীর অনুমতি ভিক্ষা করতে গেলেন, তখনকার পূজনীয় মহারাজ বললেন "একলাই যাবে ? আর কে যাবে?" শেষে মহারাজ অনুমতি দিলেন সপ্তর্ষি মহারাজ, আমি ও আর একজন সাধু মহারাজ স্নান করে এলাম। ফিরবার পর মহারাজজী বললেন "একলাই ঘুরে চলে এলে, আমাকে নিয়ে গেলে না?" তো আমরা বললাম "মহারাজজী! আপনিই তো অনুমতি দিয়েছিলেন।" মহারাজজী বললেন অনুমতি দিয়েছিলাম, তাতো ঠিক আছে। কিন্তু একবার বলতেও তো পারতে ! (সঙ্গে যাবার জন্য) আর এ কথা বলে মহারাজজীও হাসতে লাগলেন আর আমরা সবাইও। এ পর্যন্ত যে জীবন চলছে, পূজনীয় মহারাজজী, আর ঠাকুর, মা, স্বামীজি মহারাজের আশীর্বাদে ভালোই চলছে। আমার ভিতরে যদি কিছুমাত্র ভালো থাকে তবে তা পূজনীয় মহারাজজীর আশীর্বাদপ্রাপ্ত। আর যা কিছু খারাপ আছে তা আমার নিজস্ব।

পূজনীয় মহারাজের আশীর্বাদ সবার উপরে থাকুক—এই প্রার্থনা করি। ঠাকুর, মা, স্বামীজি আর মহারাজের চরণে প্রার্থনা যে সবার কল্যাণ হোক।

স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী মুক্তিদানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সেক্রেটারি পরমপূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ (চতুর্দশ প্রেসিডেন্ট মহারাজ) সম্বন্ধে কোন স্মৃতিচারণা করা এবং সে সব ঘটনার অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার আনন্দ এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ব্যাপার। যদিও খুব কম সময়ের জন্যই মহারাজজীর সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বেলুড়মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ শিবিরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার পর যখন আমাকে মাইসোর মিশনের বিদ্যালয়ে কাজ করার জন্য নির্বাচন করা হলো, আমার একটা প্রচন্ড আশঙ্কা হচ্ছিল এই ভেবে যে, যেহেতু বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস একই বাড়িতে অবস্থিত, আমি এই সুবৃহৎ ছাত্রসম্প্রদায়ের সঙ্গে সর্বদা ঠিকমতো মানিয়ে চলতে পারবো কিনা। মঠের চিরাচরিত আশ্রম জীবনের প্রতিই আমার আকর্ষণ ছিল বেশি। ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ শিবিরে যাওয়ার পূর্বে আমি মন্দিরে পূজারীর কাজকর্ম করতেই বেশি ভালোবাসতাম। এরকম অবস্থায়, ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ শিবিরের অধ্যক্ষ মহারাজ পরমপূজ্য স্বামী জয়দেবানন্দজী আমাকে পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের নিকট নিয়ে গেলেন। তখন সময় রাত্রি ১০ টা ১৫ মিনিট মতো হবে। মহারাজজী আমাকে ডেকে তাঁর ঠিক পার্শ্ববর্তী চেয়ারে বসতে বললেন। জয় দেবানন্দজী মহারাজ অন্য একটি চেয়ারে বসলেন। তিনি সংক্ষেপে পূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজকে আমার সম্বন্ধে জানালেন। তিনি আরও জানালেন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়ার প্রতি আমার আশঙ্কার কথা এবং মঠ সেন্টারে থেকে অন্যান্য কাজে আমার আগ্রহের কথা। তখন মহারাজজী তাঁর স্বভাবসুলভ সহাস্যে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “দেখ, স্বামীজি চেয়েছিলেন সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্বটাই আমাদের হাতে থাকবে এবং আমাদের চিরন্তন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলো মিশ্রিত করে এমন শিক্ষার প্রচলন করতে

হবে যার প্রভাবে আমাদের ছাত্রগণ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে আর তখনই আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব হবে। স্বামীজি একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষাই একমাত্র মাধ্যম যার সাহায্যে সমাজের কোন রূপান্তরকরণ বা নতুন কিছু প্রবর্তন করা সম্ভব। দেখ, তোমাদের মতো শিক্ষিত ব্রহ্মচারীগণেরই স্বামীজির এই আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসা উচিত, স্বামীজির কাজে আত্মোৎসর্গ করা উচিত। আমাদের নানাবিধ সেবাকর্মের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্র একটি অতি মূল্যবান মাধ্যম। তুমি হয়তো দেখেছ এই পশ্চিমবঙ্গে এরকম অনেক বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি ভালোই শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। দক্ষিণ ভারতের একটি বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মাইসোরের 'বিদ্যাশালা'-য় যাওয়ার সুযোগ তুমি পেয়েছ। তোমাদের মহারাজ (স্বামী সুরেশানন্দজী মহারাজ) বেলুড় মঠে এসে তোমাকে ওখানে পাঠানোর জন্য আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি তোমাকে খুব ভালোভাবে দেখাশোনা করবেন। এমন কি তিনি তোমাকে পাঠানোর কথা জানিয়ে চিঠিও লিখেছেন। নাগপুর আশ্রম থেকেও তোমাকে নাগপুরে পাঠানোর জন্য অনুরোধ আসে কিন্তু যেহেতু আমাদের মনে হয়েছে তুমি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্যই বেশি উপযুক্ত তাই তোমাকে আমরা মাইসোরে পাঠানোর জন্যই বিবেচনা করেছি। তুমি এ ব্যাপারে আর কোন দুশ্চিন্তা কোরো না। এটুকু জানবে যে, যারা স্বামীজির আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে এই সঙ্ঘের মাধ্যমে ঠাকুরের কাজে নিঃস্বার্থ সেবাদান করেন, নিজের জীবন উৎসর্গ করেন, ঠাকুর তাদের ঠিক সময়মতো যথাযথভাবে অবশ্যই পুরস্কৃত করেন। জানবে, ঠাকুর সর্বদা সর্বত্র আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন এবং আমাদের রক্ষা করছেন। সুতরাং যখন স্কুলের পরিবেশে কাজকর্ম করবে তখন তোমার সাধন-ভজন, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধা-বিপত্তি এসব নিয়ে অহেতুক চিন্তা-ভাবনা করবে না। ঠাকুর যথাসময়ে আমাদের শুভ সংস্কার ও আন্তরিক আকুতি অনুসারে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে ঠিক এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সুতরাং খুশিমনে আনন্দের সঙ্গে মাইসোর চলে যাও সব বিষন্নতাকে বিসর্জন দিয়ে। যদি কোনরকম সমস্যার সম্মুখীন হও আমাদের অবশ্যই জানাতে দ্বিধা করবে না। এখন এটাই শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিপ্রায় মনে করো, আর প্রফুল্ল মনে মাইসোর রওনা হও।

পরমপূজ্য মহারাজজীর সঙ্গে কুড়ি মিনিটের এই সাক্ষাৎকার থেকে আমি তাঁর সম্বন্ধে যা অনুভব করলাম তা হলো এইরকম—

১) স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা সংক্রান্ত আদর্শ সম্বন্ধে মহারাজজীর চিন্তাধারা খুব স্বচ্ছ ও স্পষ্ট।

২) পরমপূজ্য মহারাজজী আন্তরিকভাবে চাইতেন যে, সমস্ত বিদ্বান সাধু ও ব্রহ্মচারীগণের সহায়তায় স্বামীজির শিক্ষা-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর আদর্শ বাস্তবায়িত হয় এবং রামকৃষ্ণ মিশনের 'জগদ্ধিতায়' আদর্শটিও এই পদ্ধতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে জগতে বিস্তার লাভ করে।

৩) ব্রহ্মচারী ও সাধুজীবনের আধ্যাত্মিকতার পথে যে সব সমস্যা ও বাধাবিপত্তি আছে সে সম্বন্ধে মহারাজজী পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং তিনি তাদের সমর্থন ও পথনির্দেশ নিয়ে চিন্তাভাবনাও করেন, তবে তা কোন আবেগের বশবর্তী হয়ে নয়, বরং বাস্তব উপলব্ধিকে প্রাধান্য দিয়েই তিনি তার সমাধান করতে চাইতেন।

এখন আমি আরও অনুভব করতে পারি যে পরমপূজ্য মহারাজজী আমাকে মাইশোর বিদ্যাশালায় প্রেরণের জন্য যে উৎসাহদান করেছিলেন তা ছিল আমার জীবনে এক মহান আশীর্বাদস্বরূপ। ওখানে যোগদান করার ফলে আমি মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভাকে আবিষ্কার করার কৌশল আয়ত্ত করতে শিখলাম, জীবনে নানারকম অবস্থার সম্মুখীন হবার সাহস ও নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মোকাবিলা করার মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করলাম। এমন কি বিভিন্ন ধরনের কর্মদক্ষতা লাভ করার এক বড় সুযোগ পেলাম। বিস্ময়করভাবে, পরবর্তীকালে আমি আরও বুঝতে পারলাম যে পূজ্যপাদ মহারাজজীর বিদ্যাশালায় আমাকে প্রেরণ করা আমার জীবনে এক পুরস্কার- স্বরূপ ছিল। কারণ প্রশিক্ষণ শিবিরে থাকাকালীন শিক্ষার্থীর আনুগত্যে এককালে আমি যে 'মানুষ গড়ার বিদ্যা' নামক প্রবন্ধ লিখেছিলাম, এখানে এসে আমি তার বাস্তব রূপটি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলাম। আর এই সব কিছু সম্ভব হলো পরমপূজ্য মহারাজজীর আমাকে বিদ্যাশালায় প্রেরণ করার জন্যই। এখন আমি অনুভব করি পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ সম্পূর্ণরূপে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজির ওপর বিশ্বাস ও আত্মসমর্পনের দ্বারা কীভাবে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্য সহকারে বিভিন্নজনকে তাদের সাধ্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রেরণা ও উৎসাহ দান করেছেন এবং এইভাবে সংঘের শাসনব্যবস্থাকে তাঁর সেবা ও কর্মদক্ষতা দ্বারা অনুশাসন করে সঙ্ঘের কাজে নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন।

বিশাল হৃদয়

স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দ

শ্রী ব্রতীন্দ্র নারায়ণ বাগচী হলেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, বেলুড় মঠ সহ বিভিন্ন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন-এর কেন্দ্রের কর্মচারীদের কর্মসংক্রান্ত সামাজিক আইনি পরামর্শদাতা। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত— পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ সেখানকার সম্পাদক ছিলেন তখন থেকেই।

১৯৭৬ সালে সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের একাংশ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন বিভিন্ন কারণে। ঐ আন্দোলন চলাকালীন কর্মীরা জানালা, দরজা ইত্যাদি ভাঙচুর করেন। সেইসময় একটি দামি এক্স-রে মেশিনও তাঁরা ভেঙ্গে দেন। সেবাপ্রতিষ্ঠানের এমন আর্থিক স্বচ্ছলতা তখন ছিল না যে এই মেশিনটি সারিয়ে তোলা যায়। এমতাবস্থায় পূজ্যপাদ মহারাজের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ আন্দোলনকারি কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কিন্তু ঐ কাজের দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে? এমতাবস্থায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন ও সেবাপ্রতিষ্ঠানের অতি ঘনিষ্ঠ হিতৈষী বন্ধু শ্রী সমর কুমার সেন বাগচী বাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন পূজনীয় মহারাজের। পরিচয় হয় শ্রী সেন-এর চেম্বারেই। সেইসময় পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে ছিলেন পূজনীয় স্বামী অকুণ্ঠানন্দজী মহারাজ।

শ্রী সেন পূজ্যপাদ মহারাজের সামনেই বাগচী বাবুকে বললেন—‘এই কাজের ভার তোমাকে দিলাম।’ বাগচীবাবু তখন সদ্য সদ্যই লেবার ট্রাইব্যুনাল-এ কাজ শুরু করেছেন। প্রস্তাব তথা দায়িত্বগ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ ইতঃস্তত করছেন। কিন্তু ঐভাবেই দায়িত্ব নিতে হলো।

সেবা প্রতিষ্ঠানের ১৮জন কর্মীকে চিহ্নিত করে তাদের সবাইকে অভিযোগপত্র দেওয়া হলো। শুনানির পর ১৮ জনকেই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

১৯৮৪-৮৫ সালে ঐ বিষয়টি লেবার ট্রাইবুনাল-এ যায়। ঐ কর্মীবৃন্দ বরখাস্ত-

আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করেন। থার্ড ট্রাইব্যুনালে কেসটি হয়। তিনদিন ধরে শুনানি হয়। শুনানির পর কোর্টের সিদ্ধান্ত সেবাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষেই হয়।

কোর্টের রায়-এর একটি কপি এনে পূজ্যপাদ মহারাজকে দেন বাগচীবাবু। খুব খুশি হন। পূজ্যপাদ মহারাজ বসে আছেন তাঁর অফিসে। উল্টোদিকে বাগচীবাবু একটি চেয়ারে বসে। পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁর টেবিলের টানা থেকে একটি চেকবই বার করলেন। তাতে কিছু লিখে সই করলেন। চেকটি বই থেকে আলাদা করে চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে বাগচীবাবুর কাছে এলেন। এসে তাঁর দিকে চেকটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "বাগচী, তুমি এতদিন আসছ, এত কাজ করেছ, তোমায় তো কিছু দিতে পারিনি। তুমি এই চেকটি নাও। বাগচী বাবু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে। তাকিয়ে দেখলেন চেকে ৭,৫০০ টাকা লেখা রয়েছে টাকার অঙ্ক।

এমতাবস্থায় বাগচীবাবু পূজ্যপাদ মহারাজকে বললেন, "মহারাজ, আপনারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে একত্রে এসে রয়েছেন সেবা করার জন্য। আমি এই সামান্য কাজ করেছি তার জন্য টাকা দিতে চাইছেন। ঠাকুর, মা, স্বামীজির নামে যে কাজ আমি করেছি, তার জন্য কোন টাকা আমি নিতে পারব না।"

বাগচী বাবুকে পূজ্যপাদ মহারাজ বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, "From today you are a member of our family." (আজ থেকে তুমি আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হলে।)

পূজ্যপাদ মহারাজ বাগচীবাবুকে বলেছিলেন, 'বাগচী, আমাদের Personal Development-এ কোন নিত্যকর্মী নেই। তুমি মাসে ২/১ দিন এসে দেখে নিতে পার?' তিনি রাজী হয়েছিলেন এবং এখনও প্রতি মঙ্গলবার বিকাল ও সন্ধ্যায় তিনি উপস্থিত থাকেন সেবা প্রতিষ্ঠানে।

এখানেই ঘটনার শেষ নয়। প্রায় ৩-৩১/৩ মাস পরে পূজ্যপাদ মহারাজ ডেকে পাঠান বাগচীবাবুকে। তিনি এসে দেখা করেন পূজ্যপাদ মহারাজের সঙ্গে। বলেন একটি বিশেষ কাজের জন্য তাঁকে ডেকেছেন। কি কাজ জানতে চাইলেন বাগচী বাবু।

গম্ভীরভাবে ও ধীরে ধীরে পূজ্যপাদ মহারাজ মুখ খুললেন। বললেন, "বাগচী, যে ১৮ জনকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে, তাদেরকে আবার কাজে নিতে হবে! তুমি যা ব্যবস্থা নেবার নাও!

বাগচীবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন! বললেন, "মহারাজ, বলেন কি? যারা প্রতিষ্ঠানের এত ক্ষতি করেছে, যাদের আমরা এত কষ্ট করে আইনগতভাবে বরখাস্ত

করতে পেরেছি, তাদের আবার কীভাবে কাজে নেবেন?" বাগচীবাবু বলে গেলেন কিছুক্ষণ। পূজ্যপাদ মহারাজ রইলেন নীরব শ্রোতা হয়ে।

বাগচীবাবু থামলে পর পূজ্যপাদ মহারাজ ধীর, দৃঢ় ও গম্ভীরভাবে বললেন, "কিন্তু বাগচী, ওদের বাড়ির ছেলে-মেয়েরা খাবে কি ভেবেছো !"

বাগচীবাবু আর কোন কথা বলতে পারেননি। শুধু বসে বসে ভেবেছেন পূজ্যপাদ মহারাজের হৃদয় সম্বন্ধে মহানুভবতা সম্বন্ধে, উদারতা সম্বন্ধে, ভালোবাসা সম্বন্ধে! অবাক্ হয়েছেন! বিস্মিত হয়েছেন !

ঐ ১৮-জন কর্মীকে তাঁদের কাজে পুনর্বহাল করা হয়। তাঁদের অনেকেই এখন প্রতিষ্ঠানের কর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন।

এক অনুসরণীয় জীবন

স্বামী ঋতানন্দ

রামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য ত্যাগী সন্তানদের জীবন-বাণী ও কর্ম মানুষের কাছে এক অনুসরণীয় আদর্শ। এছাড়াও যুগে যুগে বহু সন্ন্যাসীর জীবন ও কর্মে সে-আদর্শ স্ফুরণের নিরিখে তাঁরাও হয়ে উঠেছেন এক এক উচ্চকোটির অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। এমনই এক অপূর্ব জীবন স্বামী গহনানন্দ মহারাজের।

মহারাজের দৈনন্দিন জীবনচর্চায় প্রতিটি পদক্ষেপে আদর্শ জীবনের এক নজির দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। তাঁর চলাফেরা, কথাবার্তা, কাজকর্ম, মেলামেশা, শাসন-স্নেহ সবকিছুর মধ্যেই ছিল সাধুজনোচিত আদর্শবোধে পুষ্ট মনোভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশ। তাঁর যেকোন ব্যবহারের ভিতরে-বাইরে থাকত অর্থপূর্ণ মনন। তাই অনেকের দৃষ্টিতে তাঁর জীবনের সাধারণ গতিটি ছিল যেন একটু ধীর। এই ধীরতা এবং সার্বিক স্থিরতা মহারাজের চরিত্রের অন্যতম ভূষণ বলে পরিগণিত হয়েছিল।

বেলুড় মঠে যোগদানের পর থেকে দু-দশকের বেশি সময় ধরে পূজ্যপাদ মহারাজজীকে কাছে পেয়েছি। তিনি সহসম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদক থাকাকালে হেডকোয়ার্টার্সে সেবারত ছিলাম বলে প্রায় প্রতিটি নিত্যকাজের সুবাদে তাঁর কাছে যাওয়ার সুযোগ হতো। পুরনো মিশন অফিসের দোতলায় ছিল তাঁর অফিস এবং থাকার ঘর। ওই বাড়ির দক্ষিণে ছোট রাস্তার ওপারে নতুন ব্রহ্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট পি.পি.টি.সি. (Pre-Probetioners' trainess corner) ছিল, সেখানেই থাকতাম আমরা। নতুন ব্রহ্মচারীদের দেখাশোনা করতেন পূজ্যপাদ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। তাঁরা দুজনে বহুবছর একই বাড়ির দুধারে ছিলেন, আর তারই সবচেয়ে কাছাকাছি থাকতাম আমরা—নতুন ব্রহ্মচারীরা।

আমরা যখন মঠে যোগদান করি পূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজ ছিলেন রামকৃষ্ণ

মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ সম্পাদক এবং সেইসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। এরকম দায়িত্বপূর্ণ দুটি পদে যুগপৎ কর্মপালনে রত দ্বিতীয় ব্যক্তি আমরা আর দেখিনি। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মঠে কাজ করে সেবাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া এবং রাতে ফিরে এসে নিত্যকর্মাদি সেরে আবার অফিসে বসা এবং দ্রুত সে-কাজে ডুবে যাওয়া—সবই ছিল মহারাজের কাছে অতি সহজ-সরল। একেবারে ছিমছাম ও পরিপাটি ছিল তাঁর চলন-বলন ও কাজকর্মের ভঙ্গিমা। অবিরাম কাজকর্মে নিয়োজিত থেকেও দুটি জিনিস তাঁর জীবনে কখনো দেখা যায়নি, এক–ব্যস্তভাব এবং দ্বিতীয়টি হলো ক্লান্তি। তাঁকে কেউ কখনো ব্যস্ত হতে এবং ক্লান্ত হতে দেখেনি। এই ছিল তাঁর জীবন ও চরিত্রের এক অদ্ভুত রহস্য।

প্রথমেই বলে রাখি, এমন মহাজীবনের মূল্যায়ন করা এ-রচনার উদ্দেশ্য নয়, আর সত্যি বলতে কি তা করা কখনো সম্ভবও নয়। তাঁদের আমরা শেষপর্যন্ত কতটুকুই বা বুঝতে পেরেছি, কতটুকুই বা তাঁদের কাছ থেকে নিতে পেরেছি। এই অনুধ্যানে আমি বিশেষভাবে বলতে চাই তাঁর সান্নিধ্যে—তাঁর সংস্পর্শে আমাদের দৈনন্দিন জীবনটি কীভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে, তারই কিছু কথা। তাঁর পূত সন্নিধানে যাপিত আমাদের দিনগুলির কথা কিংবা ঘটনাগুলির কথা যখনই মনে স্বতই উদিত হয়, আর তা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যখন নজরে আসে—মনে হয় সেগুলি আমাদের চরিত্র গঠনে সত্যিই অপরিহার্য। উপলব্ধি করি আদর্শ হিসাবে স্বামী গহনানন্দজী এখনও আমাদের পরিচালন করছেন। যেকোন মহান-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি সেখানেই। সেদিক থেকে দেখতে গেলে মহারাজজী আমার রোজকার জীবনযাপনে সামনে থাকা এক পদচিহ্ন।

গাড়িতে বেরোলে প্রয়োজন না হলে পথে কোন কথা বলতেন না। কোলের ওপর চাদরটা রেখে জপ করতেন। জীবনে আত্তীকরণ করার মতো এক সুঅভ্যাস এটি।

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট, চিঠিপত্রাদি সই করার সময় মনে মনে জপ করে করতেন। এই অভ্যাসটি আমাকে শিখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "কাগজপত্র তোমরা তৈরি করে দাও, আমি সই করি। শেষ দায়িত্ব আমার। সবকিছু দেখে বুঝে সবসময় সই করা সম্ভব হয় না। ঠাকুরের নাম করতে করতে সই করলে তিনি দায়িত্ব নেন।"

সাক্ষাতে সই করা সম্ভব না হলে মহারাজজী ফাইলে চিঠিপত্র রেখে আসতে বলতেন। পরে নিয়ে আসতে গেলে দেখতাম যেগুলো মহারাজের কোন জিজ্ঞাসা আছে সে চিঠির কাপড়গুলো ভাঁজ করে রেখেছেন। তখন ঐ কয়টির জিজ্ঞাসা মিটিয়ে আনলেই হতো।

মহারাজের টেবিল বইপত্র, ফাইল, কাগজের স্তূপে ভর্তি হয়ে থাকত। মাঝেমধ্যে একটু একটু গুছিয়ে রাখার প্রশ্ন করছি দেখলে বলতেন—“আমার গোছানো টেবিল একদম অগোছালো করবে না।” আমি হাসতাম। তিনিও মৃদু হেসে এরপর বলতেন, “একটা দিন বার করো যেদিন তুমি আর আমি গোছগাছ করব।” সত্যিই এরকম সময় তিনি দিতেন। সেদিন বহুক্ষণ ধরে একটি একটি করে ফাইল এবং কাগজপত্র দেখে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় ভাগ করে দিতেন আর আমি বাকি কাজ সারতাম। গোছানো টেবিল দেখে নিজেই রসিকতা করে বলতেন, “কতক্ষণ এরকম থাকবে?” দুজনেই হাসতাম।

তখন আমরা পি.পি.টি.সি.-র ব্রহ্মচারী। হাতে থালা নিয়ে মিশন অফিসের ভিতর দিয়ে ঘরে ফিরছি। মহারাজজী অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, “সব কোত্থেকে ফিরলে?” “খেয়ে ফিরছি”বলতেই মহারাজ বললেন, “না, খেয়ে ফিরলে না। বলবে—প্রসাদ পেয়ে ফিরলাম।” একথাটি তাঁরই কাছে প্রথম শিখি।

মহারাজজীর ব্যক্তিত্ব এমনই ছিল যে, তাঁর সান্নিধ্যে থাকলে অপরিমিত কোন কিছু করার প্রবৃত্তি সাধারণত কারো হতো না। হলেও মহারাজের নজর এড়ানো যেত না। সেসময়ে মিশন অফিসে অ্যাকাউন্টসে কাজ করতেন স্বামী সারদাত্মানন্দজী মহারাজ। তাঁর সঙ্গে মাঝেমধ্যেই আত্মস্থানন্দজী একটু-আধটু ঠাট্টা-রসিকতা করতেন। একদিন এরকম সামান্য মস্করা চলছে। আমরা কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী সেখানে রয়েছি। অল্পবয়স্ক এক সাধু সেই মজায় যোগ দিয়ে হঠাৎই খুব জোরে হেসে উঠেছেন। তৎক্ষণাৎ গহনানন্দজী মুখে শুধু ‘উহুঁ’ বলে ওই সাধুর দিকে এমনভাবে তাকালেন যে সে-সাধু তৎক্ষণাৎ শান্ত হয়ে নিঃশব্দে সেই স্থান ছেড়ে চলে গেল।

একদিন মহারাজের অফিসে রয়েছি। একজন সাধু সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। মহারাজ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, “কে যায়?” মানে সেই সাধুর চটিতে থপথপ শব্দ হচ্ছিল। এরপর মহারাজজী পূজনীয় শঙ্করানন্দজী কীরকম নিঃশব্দে চলাফেরা করতেন সে-প্রসঙ্গ করলেন। বললেন, “আমিও তো কঠোর খড়ম ব্যবহার করি, কিন্তু খড়মের নিচে রবার লাগিয়ে নিই। শঙ্করানন্দজীর খড়মের নিচে রবার থাকত না, তবু এতটুকু শব্দ হতো না।”

মহারাজজী খুব বেশি যে পুরনো দিনের প্রসঙ্গ করতেন—তা নয়। তবে প্রসঙ্গক্রমে পূজনীয় স্বামী অচলানন্দজী, স্বামী বিরজানন্দজী, স্বামী শঙ্করানন্দজী, স্বামী নির্বাণানন্দজী এবং মাধবানন্দজীর কথা দৃষ্টান্ত হিসাবে একটু-আধটু কখনো কখনো উল্লেখ করতেন।

স্বামী অচলানন্দজীর তপোনিষ্ঠ সেবাময় জীবন, স্বামীজির আদর্শকে সংঘে কার্যকরী করতে বিরজানন্দজীর প্রাণপাত চেষ্টা, রাজা মহারাজকে সর্বোচ্চ authority- মান্যতা দিয়ে তাঁর সামান্য ইচ্ছা-অনিচ্ছার জন্য শঙ্করানন্দজী এবং নির্বাণানন্দজীর জীবনপণ, মাধবানন্দজীর শৃঙ্খলাপরায়ণতা ইত্যাদি ছিল সেসব আলোচনার মুখ্য বিষয়।

মহারাজজীর সাধু-জীবনের গোড়ার দিকের কথা-প্রসঙ্গে ভুবনেশ্বর মঠের সাধনার অনুকূল পরিবেশ ও নির্জনতার কথা, বাগেরহাট ও শিলং-এর কঠোরতা ও কৃচ্ছ্রসাধনের কথা ইত্যাদিও উঠে আসত। বলতেন, “কখনও কষ্টবোধ হতো না। কঠোরতা করার কম্পিটিশন আমাদের মধ্যে চলত।” মহারাজ যখন শিলং-এ থাকতেন, সে সময়কার কথা বলতে গিয়ে মহারাজের অনুজ দু' একজন সন্ন্যাসী ভ্রাতা জানিয়েছিলেন, “মহারাজ আমাদের বড় দাদার মতো ছিলেন। তিনি আমাদের আগলে রাখতেন। সকলের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজখবর রাখতেন।” বাগেরহাটে থাকাকালীন অন্যান্য কাজের সঙ্গে গোয়াল ঘরের কাজও করতেন তিনি। এবং সে-কাজ গোয়ালাদের থেকেও ভাল করতে পারতেন। এমনকী প্রয়োজনে গরুর দুধ পর্যন্ত দোয়াতেন।

সহ-সম্পাদক থাকাকালে মহারাজের অন্যতম দায়িত্ব ছিল সাধু-ব্রহ্মচারীদের স্থানান্তর নির্ধারণ করা—যাকে আমরা সাধারণত পোস্টিং' বলে থাকি। সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রের বিশিষ্টতা, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন এবং কর্মীর গুণাগুণের ওপর এই কর্তব্যটির ফলাফল নির্ভর করে। অত্যন্ত বিচক্ষণতা এবং সুচিন্তিত মনোভাবের সঙ্গে মহারাজজী এই দায়িত্বটি পালন করতেন। প্রায় অধিকাংশ সাধু-ব্রহ্মচারীদের নাম, কর্মক্ষমতাা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং দোষগুণ জানার জন্য কদাচিৎ তাঁকে ফাইলের ওপর ভরসা করতে হতো। কঠিন, সংবেদনশীল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিংবা অনিচ্ছুক প্রার্থীকেও সরাসরি আদেশ না করে যথেষ্ট সময় নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে তাকে তার ভালমন্দ বুঝিয়ে এবং একই সঙ্গে সংঘের কল্যাণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়ে কর্মীটিকে সম্মত করতে পারতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহারাজের নির্বাচন সংঘে অব্যর্থ শুভফল দিয়েছে। কিছু বিশেষ কেন্দ্র বা বিশেষ কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য তিনি পরবর্তী উপযুক্ত কর্মীর কথা ভেবে রাখতেন। স্থানান্তরের সময় যে বিষয়গুলি মনে করিয়ে দিয়ে অন্য সকলকে চিন্তামুক্ত করতেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রকাশনা ইত্যাদি বিশেষ ধারার কেন্দ্রগুলির হেড প্রিন্সিপাল, হেড মাস্টার, এডিটর ইত্যাদি কাজের জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি তৈরি করায় তাঁর চিন্তা-ভাবনা ছিল এক দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

আলোচনা করে সংশোধনের চেষ্টায় মহারাজের ছিল সতত প্রয়াস। কর্তৃপক্ষের

অন্যরা যেখানে প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছেন—দেখা যেত, সেখান থেকে তিনি শুরু করে বহু বিষয়ের ফয়সালা করছেন। একথা আমাদের অজানা নয়।

অপর একটি ক্ষেত্রে মহারাজজীর বিশেষ কৃতিত্বের কথা বলে নেওয়া যাক। পরবর্তী পোস্টিং-এর জন্য কোন কোন সাধু-ব্রহ্মচারীকে কিছুদিনের জন্য হয়ত বেলুড়মঠে অপেক্ষা করতে হতো। তাদের সাময়িকভাবে কোন না কোন কাজে নিয়োগ করতেন। এই বিষয়টিতেও মহারাজ ছিলেন সফল। আবার হয়তো সেই মুহূর্তে যাদের কোথাও একেবারেই নিযুক্ত করা যাচ্ছে না, নিজের অফিসের কাজে সামান্য হলেও নিযুক্ত করে তাদের মনটিকে তিনি সজীব রাখার চেষ্টা করতেন। আর তাতে সংঘের কাজেও উক্ত সাধুদের কিছু না কিছু অবদান থেকে যেত। যারা বিশেষ মেধাবী কিংবা সাধারণ চোখে যারা তেমন কাজের নয়, তাদের আশ্রয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

১৯৮০ সালে গঠিত হয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ। তখন থেকেই পরিষদ গঠন ও নিয়ন্ত্রণে গহনানন্দজীর ভূমিকা এক বিশেষরূপ ধারণ করেছিল। মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলি কীভাবে প্রাইভেট আশ্রমগুলির মাধ্যমে রামকৃষ্ণ -বিবেকানন্দ ভাবধারাকে জনসমাজে আরও বেশি কার্যকরী করে তুলতে পারে সে বিষয়ে মহারাজজীর চিন্তা-ভাবনা এবং সক্রিয় ভূমিকা রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনকে এক নতুন গতি ও মাত্রা দিয়েছিল বললে অতিরঞ্জন হয় না। সারা ভারতবর্ষের—সম্ভব হলে সকল রাজ্যে এবং সেই রাজ্যের জেলাগুলিতে পরিষদ গঠনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তাতে মহারাজজীর আন্তরিক প্রচেষ্টা অচিরেই ফলপ্রসূ হয়েছিল। বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত রামকৃষ্ণ-ভাবধারায় পরিচালিত অননুমোদিত কেন্দ্রগুলির কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা ও দিগনির্দেশ দানে মহারাজজী ছিলেন নিরলস। সুদীর্ঘ সময় ও শক্তি ব্যয় করে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করার বিষয়টি মহারাজের দিনচর্যায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছিল।

মহারাজ চাইতেন নিজেদের আশপাশের প্রাইভেট সেন্টারগুলির প্রতি স্থানীয় মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলি যেন খেয়াল রাখে। সেই আশ্রমগুলির মধ্যে যেগুলির মঠ ও মিশনের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা বা সামর্থ আছে, সেগুলি যেন ধীরে ধীরে মঠ ও মিশনের কেন্দ্র বলে গৃহীত হয়। এরকম বহু প্রাইভেট আশ্রমের সংঘে অন্তর্ভুক্তি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসের শুরু থেকেই এক শক্তিশালী ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে। আর সেই ধারায় মহারাজজী গতিসঞ্চার করেছেন বলা যেতে পারে।

এছাড়া মঠ ও মিশনের কেন্দ্র এবং তাদের কার্যধারার মধ্যে গতি ও ব্যাপকতা আনার দিকে মহারাজের ছিল প্রয়োজনীয় দৃষ্টি। যেকোন কেন্দ্রে গেলে তিনি যেমন

নিজেদের বর্তমান কার্যকলাপের খোঁজ খবর নিতেন, তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনের স্থানীয় নিরিখে কিংবা তৎকালীন সমাজের নিরিখে কীধরনের সেবার প্রতি চাহিদা রয়েছে—তাও পর্যালোচনা করতেন। এভাবে বহু কেন্দ্রের কাজের পরিধি এবং গুনমান বাড়ানোর দিকে মহারাজ খুবই জোর দিতেন। নিজেদের চৌহদ্দির চারপাশে ফাঁকা জমি বা বাড়ি দেখলে মহারাজজী খোঁজ নিতে বলতেন এবং প্রয়োজনে কেন্দ্রের সম্প্রসারণে আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে সেই জমি গ্রহণের ব্যবস্থা করা যায় কিনা, ভাবতে বলতেন। এভাবে বহু কেন্দ্রের আশপাশের জমি বা বাড়ি লাভ এবং সেখানে কেন্দ্রের কার্যধারার বিস্তার ঘটানোতে মহারাজের ছিল বিশেষ আগ্রহ। বেলুড় মঠের দক্ষিণাংশে নীলাম্বরবাবুর বাগান বাড়ি, দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত এক বিশাল কারখানার পতিত জমি এবং উত্তর দিকে ইটখোলার জমি অধিগ্রহণে মহারাজজীর উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে আমরা খুবই উৎসাহিত হতাম। যোগোদ্যানের লাগোয়া টাটা অয়েল মিলের পতিত জমি বহুবাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ মঠ, যোগোদ্যানের সহযুক্তিকারণ মহারাজজীর উদ্দেশ্যসাধনের দৃঢ় একনিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এভাবে দেখলে, শিকড়া কুলীন গ্রাম, বারাসাত, আঁটপুর, স্বামীজির বাড়ি, বলরাম মন্দির, শ্যামপুকুর বাটী, বরানগর মঠ, সিঁথি বেনীপাল উদ্যান, রাজারহাট বিষ্ণুপুর নাওড়া ইত্যাদি অসংখ্য আশ্রমের সংঘে সংযুক্তিকরণে মহারাজজীর কোন না কোন ভূমিকা কীভাবে কালে কার্যকরী হয়েছিল ভাবলে অবাক হতে হয় এবং মহারাজজীর কর্মকুশলতা ও ভবিষ্যদৃষ্টির নিদর্শন লাভে স্তম্ভিত হতে হয়।

বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচারে মহারাজজীর সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা ও উৎসাহপ্রদান তাঁর এক উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা। সেখানকার কেন্দ্রগুলির সমস্যা সম্পর্কে তিনি সর্বদা ওয়াকিবহাল থাকতেন এবং সেসবের সমাধানে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে তিনি ছিলেন তৎপর। এক একটি কেন্দ্রের সাধু-ব্রহ্মচারী, স্থানীয় বিশিষ্ট ভক্ত এবং মানুষজনের কথা যখন তিনি আলোচনা করতেন মনে হতো সেসব জায়গা যেন তাঁর চোখের সামনে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত ও সমাধানও যেন তাঁর নখদর্পনে। সেভাবেই তিনি সেখানকার কেন্দ্রগুলির সমস্যা সমাধানে নিরত থাকতেন। লক্ষ করা গেছে, সে-সমস্তের কর্তৃপক্ষের অন্যান্যরা বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁরই ওপর নির্ভর করতেন এবং তাঁরই সুপরামর্শে সকলে পরিচালিত হতেন। পরবর্তী সময়ে সহ সংঘাধ্যক্ষ হয়ে বহুবার বাংলাদেশে গিয়ে অগণিত অধ্যাত্মপিপাসু মানুষকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-বাণীর ওপর বক্তৃতা দিয়ে তাদের জীবনকে অধ্যাত্মমুখী করেছেন ও শান্তিপ্রদানে সমর্থ

হয়েছেন। মহারাজ যখন যেখানে থাকতেন সেখানেই বাংলাদেশ থেকে আগত সাধু ব্রহ্মচারীদের আলাদা করে বিশেষ সময় দিতেন। সে দেশের ভক্তদের প্রতিও ছিল তাঁর নজরকাড়া স্নেহ ও শুভাকাঙ্খা। সেদেশে ও ভাবপ্রচার সংসদ গঠনে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও নির্দেশ। নতুন কেন্দ্র অধিগ্রহণে মহারাজের ছিল চির আগ্রহ এবং এ ব্যাপারেও সাফল্যের সঙ্গে বেশ কয়েকটি নতুন কেন্দ্রের সংঘভুক্তিকরণে তাঁর ভূমিকা অগ্রগণ্য।

বাংলাদেশের সিলেট কেন্দ্রের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী চন্দ্রনাথানন্দ (মানিক মহারাজ)-এর সংঘভুক্তি এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছার বাস্তবরূপটি যেন গহনানন্দজীর আশীর্বাদে সংঘটিত হয়েছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। এক্ষেত্রে মহারাজজীর ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণা শেষ পর্যন্ত অমোঘ ও ফলপ্রসু হয়েছিল। মানিক মহারাজ সিলেট আশ্রমে থাকার আগে ঢাকা কেন্দ্রে ব্রহ্মচারীর মতো থাকতেন। বয়স অনেকটা বেশি হওয়ার দরুণ নিয়ম নীতি অনুসারে তাঁকে সংঘের অন্তর্ভুক্ত করা যাচ্ছিল না। বহুবার আবেদন করেও তা কার্যকরী হচ্ছিল না। শেষে অবিবাহিত স্বেচ্ছাসেবক হয়েই জীবনটা কাটিয়ে দেবেন বলে সংকল্প করে মানিক মহারাজ ঢাকায় থেকে যান। সেখানকার অধ্যক্ষ মহারাজ যদিও প্রতিবছরই তাঁকে সংঘের ব্রহ্মচারী বাবার আবেদনপত্র লিখিয়ে বেলুড় মঠে পাঠাতেন। পূজনীয় স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ মানিক মহারাজকে নিরাশ না হয়ে অপেক্ষা করতে বলেন। এভাবে আরও বেশ কয়েকবছর পেরিয়ে যায়। সংঘের সাধারণ সম্পাদক হলেন স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ। এইকালেও মানিক মহারাজের আবেদন দুবার নাকচ হয়ে যায়। স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী ছিলেন এক অসাধারণ রবীন্দ্র অনুরাগী। ঠাকুর-মা-স্বামীজির ভাবধারায় স্নাত হয়েও মহারাজের রবীন্দ্র-গুণ-মুগ্ধতা সকলকে বিস্মিত করত। আমরা মহারাজজীর জীবনে এই প্রীতির যথেষ্ট নিদর্শন পেয়েছি। যাইহোক, ঘটনাটি হলো এইরকম : স্বামী গহনানন্দজী সেবারও মানিক মহারাজকে আবেদন করতে বলেন এবং মঠে এসে পূজ্যপাদ হিরন্ময়ানন্দজীর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। বেলুড় মঠে এসে মানিক মহারাজ প্রথমে গহনানন্দজীর সাথে দেখা করলে মহারাজজী কথাপ্রসঙ্গে মানিক মহারাজকে বলেন, সাধারণ সম্পাদক মহারাজ তোমায় দেরিতে যোগদান করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তুমি তোমার সে সময়কার সমস্যার কথা নিঃসঙ্কোচে বলবে। আর তুমি যে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বহুবছর যাবৎ পড়াশুনো করছ, যদি সুযোগ পাও—তাও বলবে। যথাসময়ে হিরন্ময়ানন্দজীর সঙ্গে মানিক মহারাজ দেখা করলে মহারাজ সেদিন সেকথাই শুনতে চাইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার

কি অসুবিধা ছিল ?”

—মা ছিলেন, দেখভাল করতে হতো।

—তারপর ?

—স্বামীজিকে খুব ভালোবাসতাম। স্বামীজির ছোট ছোট বই নিয়ে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিলি করতাম আর স্বামীজির কথা বলতাম।

—আর?

—আর, রবীন্দ্রনাথের ওপর পড়াশুনা ও গবেষণা করতাম। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ সৃষ্টি হলো। ধনী ও অভিজাত হিন্দুরা একে একে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। যাদের ভারতে যাওয়ার ইচ্ছে নেই—আর্থিক সামর্থ কিংবা মনোবলও নেই। তাদের organize করতে লাগলাম। তাদের মধ্যে স্বামীজি ও রবীন্দ্রভাবনার প্রচারে জীবনটা ব্যয় করব বলে সিদ্ধান্ত নিই। সমাজে ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতির উন্নতির জন্য ঘরে ফিরে যাব না বলে প্রতিজ্ঞা করি।

—এরপর?

—এরপর পূজনীয় স্বামী অক্ষরানন্দজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তারপর থেকে মঠ-মিশনে থেকেই এই কাজ করে চলেছি। সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথি পড়ে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা করতে শুরু করি। এতেই প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেছে।

মানিক মহারাজকে অবাক করে হিরন্ময়ানন্দজী বলে ওঠেন—“তাতে কি? তুমি মঠের সাধু হবে। তোমাকে আমি গ্রহণ করব। তোমাকে ব্রহ্মচারী করে নেব। তার আগে তোমায় ট্রেনিং সেন্টার শেষ করতে হবে”—ইত্যাদি।

এরপর সব ইতিহাস। মানিক মহারাজ ট্রেনিং শেষ করে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা লাভ করেন। কয়েকবছর পর সন্ন্যাসও হয়। বেশ অনেক বছর ধরে তিনি সিলেটের অধ্যক্ষ। শুধু সিলেট নয়, বাংলাদেশের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগী ভক্তদের কাছে তিনি এক অতি পরিচিত নাম ও ব্যক্তিত্ব। জীবনপণ করে সংঘের সেবা করে চলেছেন। তাঁর প্রতি অসামান্য সংবেদনা ছিল গহনান্দজীর। মানিক মহারাজের যোগদানের অনুমতি মেলার পর স্বামী ভূতেশানন্দজী গহনানন্দজীকে বলেছিলেন, “দেখছি, তুমি অবশেষে এক অসাধ্য সাধন করলে।”

প্রবীণসাধুদের প্রতি গহনানন্দজীর শ্রদ্ধা সম্ভ্রম ছিল সত্যিই দেখার মতো। তাঁদের খোঁজখবর রাখা, স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা, বিশেষত চিকিৎসার উদ্‌যোগ তিনিই করতেন।

পরম পূজনীয় অভয়ানন্দজী মহারাজ (ভরত মহারাজ), স্বামী নির্বানানন্দজী মহারাজ (সূর্য মহারাজ), স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ (প্রভু মহারাজ), স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ প্রমুখ বর্ষীয়ান মহারাজদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে গহনানন্দজী যেন ছিলেন স্বনিযুক্ত দায়িত্ববান এক সেবক। প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও গভীর সচেতনতার সঙ্গে ডাক্তার নিয়োগ, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, সেবকের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজন হলে উপর্যুপরি হাসপাতালে আনা-নেওয়া, সেখানকার ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠুতা রক্ষা করা ইত্যাদিতে মহারাজজী সেসময়ে হয়ে উঠেছিলেন এক কিংবদন্তী। চিকিৎসা এবং গহনানন্দজী যেন তৎকালীন মঠে প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিলেন। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর শেষে অসুখের সময় গহনানন্দজী বেশ কয়েকবছর তাঁকে বেলুড় মঠ থেকে দক্ষিণ কলকাতার ঠাকুরপুকুর হাসপাতালে প্রত্যেক সপ্তাহে দুদিন করে নিয়ে যেতেন এবং চিকিৎসা করিয়ে মঠে এনে রেখে আবার সেবা প্রতিষ্ঠানে যেতেন। সেখানকার কাজ সেরে রাত্রে মঠে ফিরতেন। তিন-চার বছর ধরে পরমনিষ্ঠায় এ দায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন। মঠে প্রত্যেকদিন কোন না কোন সময়ে প্রভু মহারাজ, ভরত মহারাজ এবং সূর্য মহারাজের কাছে গিয়ে প্রণাম করে কুশল জানতেন। গহনানন্দজীর এই রুটিনে কদাচিৎ ব্যত্যয় ঘটত না।

পূজনীয় নির্বানানন্দজী মহারাজের মহাসমাধির আগে বেশ কিছুদিন মহারাজজীর সেবকদের সঙ্গে আমাকে এবং আরও দু-একজন ব্রহ্মচারীকে পূজ্যপাদ মহারাজের সামান্য সেবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন গহনানন্দজী। সূর্য মহারাজের ঘর থেকে মহারাজের সচিব, জ্ঞান মহারাজ ও অন্যান্য সেবকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় খবর নিয়ে গিয়ে দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার আমাকে গহনানন্দজীকে বলতে হতো। চিকিৎসার বিভিন্ন পর্যায়ের উত্থান-পতনের মনিটরিং, ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলা, প্রয়োজনীয় নির্দেশ নেওয়া এবং প্রয়োজনে কলকাতা থেকে ডাক্তারদের টিমকে রাতে মঠে এনে মহারাজকে দেখিয়ে ডাক্তারদের জন্য রাখা খাবার মঠ ক্যান্টিন থেকে খাইয়ে রাত এগারোটা-সাড়ে এগারোটার সময় তাঁদের বিদায় জানাতে দেখেছি। তারপর ঘরে ফিরে গহনানন্দজী নিজের বাকি কাজকর্ম সারতেন। সে সময় অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য হওয়ায় দেখেছি নিজের জপধ্যান, শৌচ, মন্দির প্রণাম, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি প্রতিটি ব্যাপারে, অসাধারণ নিষ্ঠা ও অক্লান্ত সেবার মনোভাবে পূর্ণ এক মানুষকে। শুধুমাত্র প্রভু মহারাজ বা সূর্য মহারাজ নয়—ভরত মহারাজের ক্ষেত্রেও সেইরকম সেবা তিনি করেছেন, যা দেখে আমরা পরিতৃপ্ত ও লাভবান হয়েছি। শুধু তাঁদের সেবা বা দেখভালেই তিনি নজর রাখতেন—তা নয়, প্রবীণ মহারাজরাও

গুরুত্বপূর্ণ নানা ব্যাপারে মহারাজের প্রতি একান্তভাবে নির্ভর করতেন। বিশেষ দিনে আরোগ্যভবনে প্রবীণ সাধুদের প্রণাম এবং অসুস্থতায় তাঁদের কাছে পৌঁছে যাওয়া গহনানন্দজীর দৈনন্দিন রুটিনের অন্যতম কাজ ছিল। বাইরের কেন্দ্রের বেশ কয়েকজন, বৃদ্ধ সাধু সম্পর্কে তিনি আমাদের বলে রেখেছিলেন, তাঁরা যেন দোতলায় মহারাজের অফিসে কষ্ট করে উঠে না যান। আমরা যেন মহারাজেদের নিচে বসিয়ে গহনানন্দজীকে খবর দিই। তিনি নিচে নেমে এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেন ও কাজের কথা বলতেন। উক্ত শ্রদ্ধেয় মহারাজদের মধ্যে ছিলেন পূজ্যপাদ নিত্যস্বরূপানন্দজী, লোকেশ্বরানন্দজী, যজ্ঞানন্দজী, আপ্তকামানন্দজী, অকুণ্ঠানন্দজী এবং আরও অনেক প্রবীণ মহারাজ।

গহনানন্দজী মহারাজ তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক। একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, ট্রেনিং সেন্টারের আচার্যদের মধ্যে কে কি পড়ান। কোন্ কোন্ উপনিষদ পড়ানো হয় এবং কে কে সেই ক্লাস নেন। মহারাজ জানতেন ট্রেনিং সেন্টারের পরেও আমি পূজনীয় স্বামী মোক্ষদানন্দজীর (রাম মহারাজ) কাছে পড়তে যাই। জানতে চাইলেন, "তুমি মহারাজের (মোক্ষাদানন্দজী) কাছে এখন কী পড়ছ?" বললাম, "মহারাজের বেদান্ত দর্শনের ক্লাসগুলোর ক্যাসেট করেছিলাম, তার থেকে অনুলিখন করেছি। এখন গিয়ে সেগুলো মহারাজকে শোনাই।" বলতেন, "আচ্ছা।" এর দুদিন পর গহনানন্দজী আমায় বললেন, "মোক্ষদানন্দজীকে তাঁর সময়মতো একবার আমার সঙ্গে একটু দেখা করতে বলো তো।" পরদিন মোক্ষদানন্দজী পূজ্যপাদ গহনানন্দজীর সঙ্গে দেখা করলে তাঁকে তিনি বললেন, "বুঝলে রাম মহারাজ, এতদিন পর মঠে দুপুরের পর একটু সময় পাচ্ছি। একটু উপনিষদ্ শোনা ও না।" রাম মহারাজ "বেশ তো" বলে চলে গেলেন। পরের সপ্তাহ থেকে বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে কিছুক্ষণ গহনানন্দজী রাম মহারাজের কাছে উপনিষদ্ পাঠ ও আলোচনা শুনতেন। মঠের অনেকেই কিন্তু মহারাজজীর এই আগ্রহের কথাটি জানতেন না। এসব ঘটনা আমার জীবনে এক অনুপ্রেরণা।

গহনানন্দজী মহারাজের চরিত্রের অন্যতম লক্ষণীয় দিক তাঁর লোকব্যবহার। ব্যবহার ও আচার-আচরণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধীর, স্থির, শান্ত, মৃদুভাষী, আলোচনাপ্রবণ এবং সংবেদনশীল। আগ্রহীদের সময় দিতেন, কখনো বিরক্ত হতেন না। সাধু-ব্রহ্মচারীদের আলাদা করে সময় দিতেন। বহু সময় সমস্যা শোনার জন্য তিনি তাঁর যাতায়াতের সময়ও তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন এবং আলোচনা করতেন। ভক্তদের সঙ্গে সাধু-ব্রহ্মচারীদের মেলামেশায় পরিমিতিবোধের লক্ষণরেখা অতিক্রম করলেই

তা তাঁর নজর এড়াতো না। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁদের সে বিষয়ে আলাদা করে সাবধান করতেন। তাঁর প্রণামে গেলে জানতে চাইতেন, প্রেসিডেন্ট মহারাজ এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট মহারাজদের আমরা প্রণাম করে এসেছি কিনা। অসহিষ্ণু, অশৃঙ্খল সাধু-ব্রহ্মচারীদের শাসন করার সময় ব্রহ্মচর্য মন্ত্র বা সন্ন্যাস মন্ত্র থেকে উদ্ধৃত করে শিক্ষা দিতেন। কারও জামার সবকয়টি বোতাম আঁটা না থাকলে সেদিকে দিগনির্দেশ করতেন, উত্তরীয় কাঁধে না থাকলে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। এরকম ছোট-খাটো আচার-আচরণের প্রতিও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। যে ভক্তরা তাঁর কাছে কাজের জন্য আসতেন তাঁরা তাঁদের প্রসাদের ব্যবস্থা করেছেন কিনা খোঁজ নিতেন। ব্যবস্থা না করে থাকলে কাউকে সঙ্গে দিয়ে বা মঠ অফিসে নিজে ফোন করে তাঁদের প্রসাদের ব্যবস্থা করতেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন তবে বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। বিলাসিতা দেখলে পুরনো কালের অভাবের দিনগুলির স্মরণযোগ্য ঘটনা উল্লেখ করতেন।

একবার আমরা কয়েকজন সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ গহনানন্দজীর সাথে কোন এক ভাবপ্রচারের উৎসব-অনুষ্ঠানে গিয়েছি। এক ভক্ত বাড়িতে আমাদের প্রসাদের ব্যবস্থা হয়েছে। মহারাজজীর সঙ্গে আমরা বসেছি। টেবিলে খাবার থালার চারধারে, প্লেটে প্লেটে অনেক পদের রান্না পরিবেশন করছেন বাড়ির মায়েরা। দু-একজন সাধু 'এটা খাব না', 'এটা খাই না', 'এটা নিয়ে যান'— ইত্যাদি বলে সেই প্লেটগুলো সরিয়ে নিতে বলছিলেন। লক্ষ করছিলাম মহারাজজীর থালার চারধারেও তো কত প্লেট সাজানো রয়েছে। কিন্তু তিনি কোন আপত্তি করছেন না। দেখলাম, সাধুদের অমন আচরণে মহারাজজী সামান্য গম্ভীর হয়ে গেলেন। ফেরার সময় ঐ প্রসঙ্গ তুলে গহনানন্দজী মহারাজ অত্যন্ত বাস্তবসম্মত কয়েকটি কথা বলেছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সেগুলি যেন আমাদের কাছে চিরদিনের জন্য এক আদর্শ ও অনুসরণীয় পন্থা হয়ে রয়েছে। মহারাজজী বলেছিলেন, দেখো, প্লেটগুলো দিতে না দিতে তোমরা বিভিন্ন ভাবে তোমাদের গ্রহণ না করার ইচ্ছা প্রকাশ করছিলে। ওতে তো ওরা বিড়ম্বনা বোধ করল। তোমরা কী খাও বা খাও না—সে তো ওদের জানার কথা নয়। ওদের তো তোমরা তোমাদের পছন্দের মেনু লিস্টটা জানিয়ে আসনি। তারা তোমাদের সেবার জন্য যা যা ভাল বোধ করেছেন সেসবই রান্না করেছেন এবং দিয়েছেন। যে সেটি খাবে না সেটি স্পর্শ না করে টেবিলে রেখে দিলেও তো চলে। ওরকমভাবে ওদের আঘাত দেওয়া ঠিক নয়। তুমি খাবে না রেখে দেবে। পরিমাণে কম যদি নিতে চাও, তাদের কমাতে না বলে তোমার প্রয়োজন মতো চামচ দিয়ে নিজে নেবে—বাকিটা প্লেটে থাকবে। বলাবলি করে সকলের দৃষ্টিগোচর করাটা সৌজন্য বা শালীনতা নয়।"

দেখেছিলাম, মহারাজজী ঠিক তেমনভাবেই খেয়েছিলেন। যে পদটি যতটা প্রয়োজন সেটুকু নিঃশব্দে নিজে চামচ দিয়ে গ্রহণ করে সেটুকু খেয়ে ভক্তদের খুশি করেছিলেন ও নিজে তৃপ্ত হয়েছিলেন। এরপর এপ্রসঙ্গে গহনানন্দজী পূজনীয় ভূতেশানন্দজী মহারাজ ও স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী মহারাজের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করলেন। বললেন, "একবার ভূতেশানন্দজী ও গৌরীশ্বরানন্দজী একসঙ্গে গেছেন এক ভক্ত বাড়িতে। তাঁদের যে কলাগুলি খেতে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি পচা। ফেরার সময় গৌরীশ্বরানন্দজী মহারাজ ভূতেশানন্দজীকে রাগ করে বলছেন, "আরে, তুমি ওই পচা কলাটা কীভাবে খেয়ে নিলে?" ভূতেশানন্দজী বললেন, "আপনি তো না খেলে পারতেন, রেখে দিলেই হতো।" গৌরীশ্বরানন্দজী বললেন, "তা কি হয়? তুমি দেখছি অবলীলায় গলাধঃকরণ করলে আর আমি না খেয়ে ফেলে দেব, সেটা কি ভাল দেখায়?" গহনানন্দজী মন্তব্য করলেন, "এই হলো ভদ্রতা।"

মহারাজজীর শরীর ছিল অত্যন্ত সুস্থ ও সবল। সহ সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদক থাকাকালে তাঁকে কখনো অসুস্থ হতে দেখিনি, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া তো দূরের কথা। জীবনের শেষের দিকে ছাড়া তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ জীবন কাটিয়েছেন। এটাও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। পরের দিকে অসুস্থতার সময়ও নির্বিকার ভাবে সহ্য করা, কাউকে বিচলিত না করা, ঠিক সময়ে স্নানাহার, গ্রহণ ইত্যাদিতে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা তাঁর স্বচ্ছ ও নিয়মানুবর্তী জীবনের প্রতিফলন সেসময়েও যথাযথভাবে লক্ষ করা গেছে। অসুস্থ থাকাকালে মহারাজ নিজে ডাক্তার, সেবক, কর্তৃপক্ষ সকলের খবর নিতে ভুলতেন না। এবং এ সময়েও তাঁর জপ-ধ্যান, স্মরণ-মননে কোন ছেদ পড়েনি। তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকার সময় একটা শান্তির বাতাবরণ অনুভূত হতো। ক্লেশ, বিরক্তি কিংবা অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ কখনো আসত না।

মহারাজজী জানতেন আমরা—বিশেষত কয়েকজন সাধু ও ব্রহ্মচারী পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজী মহারাজের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কথাবার্তা বলতাম। গহনানন্দজী তাতে আমাদের উৎসাহ দিতেন। বলতেন, "মহারাজের তপস্যার কথা জেনে নাও, আমাদের tradition শুনে নাও, ঠাকুরের সন্তানদের কথা জিজ্ঞাসা করে নাও। এরকম মানুষ আর পাবে না।"

মহারাজজীর অভ্যাস ছিল প্রেসিডেন্ট মহারাজের কোয়ার্টার্স বা মঠ অফিসের দিক থেকে ঘুরে এসে মিশন অফিসের ভিতরে ঢুকে জেনারেল সেকশন এবং আমাদের অ্যাকাউন্টস সেকশনে একবার আসা। বলতেন, "একবার ঢুঁ মেরে যাই।" আমাদের

জিজ্ঞাসা করতেন, “হিসাব মিলছে তো ?” কথাটা বলে একটু হাসতেন। বর্তমান প্রজন্মের মেধাবী বুদ্ধিমান সাধু ব্রহ্মচারীদের উৎকর্ষের তারিফ করে, বলতেন, “তোমরা তো কাজকর্মে কত উৎকর্ষতা নিয়ে এসেছ, তোমরা মঠে এসে প্রবীণদের কাছে থেকে সব কাজ শিখেছ। একটা স্ট্যাম্প লাগানোও যে সম্পূর্ণ মনসংযোগ দিয়ে করতে প্রবীণেরা বলতেন—সেটি প্রায়ই উল্লেখ করতেন।

মহারাজ ছিলেন স্বাবলম্বী। পুরনো মিশন অফিসে থাকার সময় স্নানের পর কাপড় জলকাচা করে এবং বাথরুম পরিষ্কার নিজেই করতেন। কাপড় রোদে দেওয়া এবং গামছা মেলে দেওয়ার মধ্যেও একটা নিপুণ হাতের ছোঁয়া আমরা লক্ষ করেছি। ক্লিপ দিতে ভুলতেন না। শব্দ না করে বালতিতে জল ভরা, দরজা-জানলা খোলা ও বন্ধ করার সুষ্ঠু প্রক্রিয়া তাঁর কাছ থেকে রপ্ত করেছি। গরমকালে স্নানের পর দু-বালতি জল তুলে রাখতে ভুলতেন না। খবরের জন্য খবরের কাগজে সামান্য চোখ বোলাতেন। রেডিও বা টি.ভির দরকার তাঁর কখনো হয়নি। মহারাজজী তখন সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ। তাঁর আগের সচিবের কাজ সেবক সপ্তর্ষি মহারাজ সবে গ্রহণ করেছেন। এরই মধ্যে মহারাজের একটা বিদেশযাত্রা ছিল। সম্ভবত সে বছরই সপ্তর্ষি মহারাজের সন্ন্যাস হলো। একেবারে নবীন সন্ন্যাসীকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিতে মঠ কর্তৃপক্ষ রাজি হচ্ছিলেন না। তার বদলে অন্য কাউকে না চেয়ে গহনানন্দজী সেই বছর একেবারে একলা বিদেশযাত্রা করলেন এবং সমস্ত সফর নিরাপদে শেষ করে ফিরলেন। এরকমই ছিল তাঁর স্বাবলম্বনের নমুনা।

এবার একটি ব্যক্তিগত বিষয়ের উল্লেখ করা যাক। পূজনীয় মহারাজ জানতেন আমি পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজী মহারাজের ‘ন্যাওটা’। ভূতেশানন্দজী মহারাজের শেষ অসুখের আগে মঠ থেকে ছুটি নিয়ে বেরিয়েছিলাম অমরনাথ দর্শনে। দর্শনাদি সেরে দিল্লী হয়ে তখন আমি জয়পুর-বিকানীরের দিকে ঘুরছি। এদিকে ভূতেশানন্দজী মহারাজ শেষ রোগশয্যায় হাসপাতালে। সকলেই উদ্বিগ্ন। বিশেষত গহনানন্দজী ও আত্মস্থানন্দজীর খেয়াল হয় আমি সে সময় মঠে অনুপস্থিত। স্বামী নির্মলাত্মানন্দ (কৃষ্ণমূর্তি মহারাজ) আমায় পরে বলেছিলেন, ওঁরা দুজন আমার খোঁজ করতে বলেন এবং খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজজীকে দেখার জন্য মঠে যেন দ্রুত ফিরে আসি—সে কথাও বলেন। কৃষ্ণমূর্তি মহারাজ বৃন্দাবন, দিল্লী, জয়পুর ইত্যাদি জায়গা ফোন করে পূজনীয় গোকুলানন্দজীকে অনুরোধ করে রাখেন দিল্লী থেকে একটা এয়ার টিকিট কেটে আমায় দ্রুত মঠে পাঠিয়ে দিতে। সেই মতো খবর পেয়েই ৯ আগষ্ট ১৯৯৮ সকালে আমি দিল্লী ফিরে বিকেলের ফ্লাইটে কলকাতা আসি। রাতে এসেই গহনানন্দজী ও

আত্মস্থানন্দজীর সঙ্গে দেখা হতেই তাঁরা বললেন, "এসেছ, বেশ করেছ। মহারাজতো উডল্যান্ডস নার্সিংহোমে। কাল আমাদের সঙ্গে যাবে।" পরদিন গহনানন্দজী, আত্মস্থানন্দজী, গীতানন্দজী ও প্রমেয়ানন্দজীর সাথে মঠ থেকে উডল্যান্ডসে গেলাম। পৌঁছনোর পরই জানা গেল একটু আগে ভূতেশানন্দজী মহারাজ মহাসমাধি লাভ করেছেন। শরীর ত্যাগের পর মহারাজের সেবকরা ছাড়া সে সময়ে আমরাই প্রথম মহারাজের কাছে গিয়ে উপস্থিত হই। সে-মুহূর্ত থেকে মহারাজের শরীর মঠে আনা পর্যন্ত মহারাজজীর চরণদুটি ধরে বসে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেজন্য আমার ওপর গহনানন্দজী ও আত্মস্থানন্দজীর অশেষ কৃপার কথা কোনদিন ভুলতে পারব না।

১৯৯৩-৯৪ সালে স্বামীজির শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ এবং পরে ১৯৯৭- ৯৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষ পালিত হয়েছিল। সে সময়ে বহু জায়গায় গহনানন্দজীকে ভাষণ দিতে হয়। স্মরণিকায় লেখা, শুভেচ্ছাবলী এবং আশীর্বাণীও পাঠাতে হতো। টাইপ ও আনুষঙ্গিক কাজের সুবাদে সেইসব অতুলনীয় ভাবসম্পদে পূর্ণ ভাষণে সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ আমরা পেয়েছি। তাতে আমরা ধন্য।

স্বামীজির ইংরেজি বাণী ও রচনার প্রথম প্রকাশ থেকে সমসময় পর্যন্ত প্রাপ্ত সংস্করণগুলির মধ্যে যে-সব ভিন্নতা দেখা যায়, সেগুলি পরিহার করে নবীন সংস্করণ কার্যের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের মহারাজরা ছাড়াও বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ সন্ন্যাসী সেই কাজের জন্য নিয়মিত আহূত মিটিং-এ উপস্থিত থেকে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এবং বিষয়গুলি সংশোধনে মত প্রদান করে কাজটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। পূজনীয় গহনানন্দজী মঠে থাকলে প্রতিটি মিটিংয়েই সাগ্রহে যোগদান করতেন। স্বামী নিশ্চলানন্দজী (রণেন মহারাজ) কাজটির আদ্যোপান্ত দায়িত্বে ছিলেন। এই কাজটায় রণেন মহারাজকে কখনো কখনো অল্পস্বল্প সাহায্য করতাম দেখে গহনানন্দজী খুশি হতেন।

মহারাজজী আইনি কাজকর্ম ভাল বুঝতেন। সেবা প্রতিষ্ঠান এবং বেলুড় মঠে থেকে আইন সংক্রান্ত কাজে তিনি বহু আইনজ্ঞের কাছে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তাঁদের মধ্যে শ্রী তাপস ব্যানার্জী, নীরনে বাবু, দীপক ঘোষ, পিনাকী ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। শ্রী শক্তিনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছেও তাঁকে যেতে হতো। সাধারণত বিকেলের পর মহারাজজী তাঁদের উদ্দেশ্যে বেরোতেন। তাঁর সঙ্গে যাওয়ার অভিজ্ঞতা অনেকবারই হয়েছে। দেখেছি, উপরিউক্ত আইনজ্ঞদের নিজক্ষেত্রে জ্ঞান ও কর্মকুশলতা ছাড়াও

বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনো ও আগ্রহ বিস্ময়কর। কাজের কথা হয়ে যাওয়ার পরই শুরু হতো বিবিধ বিষয়ে আলোচনা। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতাম। এক কাপ চা, সঙ্গে একটি বিস্কুট ছাড়া মহারাজজী সেসময়ে কিছু খেতেন না। ফিরে আসার সময় গাড়িতে জপ করতে করতে ফিরতেন। যে কোন ধরনের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়ে থাকে গভীর সংকট ও সমস্যা মোকাবিলা করার সহজাত ক্ষমতা ও শক্তির উপর। সেক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি মোকাবিলার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেখানে সংঘের ইতিবৃত্তে মহারাজের অনলস পরিশ্রম এবং মানবিক স্থিরতা অনুসরণীয় আদর্শ হয়ে আছে। প্রথম, নরোত্তম নগর কেন্দ্রের মামলা। সেখানকার মিশন স্কুলের একটি ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এক ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা। পূজনীয় আত্মস্থানন্দজীর আগ্রহে এবং গহনানন্দজীর সমর্থনে মঠ কর্তৃপক্ষ ব্রহ্মচারীর পক্ষে দাঁড়িয়ে মামলা চালাবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। তাঁরা উভয়ে মাসের পর মাস ধরে কয়েকবছর সেই মামলার পক্ষে প্রচেষ্টায় বিন্দুমাত্র নিরুদ্যম না হয়ে গৌহাটি ও কলকাতা হাইকোর্টে সংঘর্ষপূর্ণ আইনি লড়াই করতেন। পরিশেষে, ব্রহ্মচারী নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয়ে জেল থেকে ছাড়া পেলে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বচ্ছতা সেই রাজ্যে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয়টি হলো, মিশনের কাজকর্মকে বিভিন্ন দিক থেকে খর্ব করার একটা দুষ্ট প্রচেষ্টা শুরু হলে রামকৃষ্ণ মিশন অ-হিন্দু সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান বলে দাবি করে মামলা করে। সে মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় মিশনের বিরুদ্ধে গেলেও উক্ত মামলাটিতেও গহনানন্দজী ও আত্মস্থানন্দজী দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে, উপর্যুপরি দিল্লী যাতায়াত এবং মামলা-সংক্রান্ত কাজে নিজেদের তীব্রভাবে সক্রিয় রেখেছিলেন। নিষ্কাম কর্ম অথবা সংঘের কাজে তাঁদের যেকোন প্রচেষ্টা যে সাধনারই নামান্তর, তা আমরা উপলব্ধি করেছিলাম মামলাটির সিদ্ধান্ত মিশনের বিরুদ্ধে গেলে এবং মহারাজের সে-সিদ্ধান্তকে 'ঠাকুরের ইচ্ছা' বলে শান্ত মনে গ্রহণ করার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখে।

তৃতীয়টি হলো, স্বামী হিরন্ময়ানন্দজীর আনীত মামলা। তিনি মঠ কর্তৃপক্ষের কয়েকটি পদক্ষেপকে অসংবিধানিক বলে দাবী করে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা আনেন। যদিও সে মামলা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। হাইকোর্টের রায়ে অচিরেই মামলাটির নিষ্পত্তি ঘটে এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, মঠ কর্তৃপক্ষের কর্মধারা অসাংবিধানিক নয়, বরং সেগুলি স্বামী বিবেকানন্দ রচিত মঠের নিয়মাবলী ও সংঘের ঐতিহ্যের সঙ্গে মানানসই। অতএব মামলাটি খারিজ হয়ে যায় ও দোষারোপের নিষ্পত্তি ঘটে।

মামলা-মোকদ্দমা চিরদিনই অপ্রীতিকর, কখনোই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। তথাপি এগুলি

উল্লেখের সার্থকতা এই দিক থেকে যে, একটি ভাবান্দোলনকে কালের গতিপথে কতরকম হতে হয় তা দেখানো। সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের এই চরম সত্যটিকে চিরমান্যতা দিয়ে ভাবাদর্শকে উজ্জ্বলতর মহিমায় সংস্থাপনের অপরিহার্য তাগিদেই তার মোকাবিলায় সামান্যতম পিছু হঠার মানসিকতা না রাখা। এই মনোভাবাই যেকোন আন্দোলনের প্রাণ ও চালিকাশক্তি। বারবারই রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন সে পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে নিজের গতিবেগকে ত্বরান্বিত করে চলেছে।

তৃতীয় মামলাটির উল্লেখ এই কারণে আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, পূজ্যপাদ হিরন্ময়ানন্দজীকে সেসময়ে সংঘ-কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সাধুরাও কী শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গেই না গ্রহণ করেছিলেন—সেটি দেখানো। তাঁর মর্যাদা ও সম্মান যাতে অটুট থাকে, সে বিষয়ে সকলের আন্তরিক নজর ছিল। বার্ষিক অধ্যক্ষ সমাবেশ এবং ত্রৈবার্ষিক সাধু সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে সর্বসমক্ষে আলোচনা এবং সংঘের কী করণীয় তা জানানোর এতটুকু কার্পণ্য ছিল না, তাঁর সেবা, স্বাচ্ছন্দ্য সবকিছুর দিকে যথোচিত লক্ষ রাখা হতো। কর্তৃপক্ষের অনেকেই নিয়মিত তাঁর কাছে যেতেন। অপ্রিয় হলেও ধীরস্থির হয়ে কোনরকম প্রতিবাদ না করে তাঁরা শুনতেন। এরফলে সাধু ও সংঘজীবনকে এক নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে আমরা সমর্থ হয়েছি। গুরুত্বপূর্ণ কথা, হিরন্ময়ানন্দজী কখনো ব্যক্তিগতভাবে টাকা-পয়সা রাখতেন না। সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিরালম্ব ও উদাসীন। মজার কথা, তাঁর মামলা চালানোর খরচ পর্যন্ত মঠ থেকেই মেটানো হয়েছে। সে বিষয়েও সকলে একমত ছিলেন। তবে পুরোধা ছিলেন স্বামী গহনানন্দজী।

এরপর শুরু হলো মহারাজজীর সহ-সংঘাধ্যক্ষ ও সংঘাধ্যক্ষ হয়ে ভক্তদের মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করার গুরু দায়িত্ব। প্রায় ......বছর ধরে সারা বছর দেশের বিভিন্ন প্রদেশে দীক্ষাদানে মহারাজজী অবিরাম নিরত ছিলেন। বহু প্রত্যন্ত স্থানে কষ্ট করে গিয়ে দীক্ষা দিতেও তিনি কখনো নারাজ হতেন না। অনেক অসুবিধা স্বীকার করেও ন্যূনতম পরিকাঠামো সম্পন্ন আশ্রয়ে গিয়ে দীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের এতটুকু ঘাটতি ছিল না। দীক্ষার আগের দিন বিকেলে দীক্ষার্থীদের নিয়ে বসতেন। দীক্ষা-সংক্রান্ত কথাবার্তা ও উপদেশ দিয়ে ভক্তদের মনকে তৈরি করে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। দীক্ষার্থীর সংখ্যা সীমিত রাখতে চাইতেন না। সকল আগ্রহী দীক্ষার্থীকে কৃপা করতে তিনি ছিলেন উদগ্রীব। দীক্ষার্থীদের সংখ্যা অধিক হলে দীক্ষা প্রদান শেষ করে গুরুপ্রণাম শেষ হতে কখনো কখনো খুব দেরি হয়ে যেত। সেবক ও ডাক্তাররা দীক্ষার জন্য সময় কমাতে বললে মহারাজ রাজি হতেন না। বলতেন, "আমি নয় দীক্ষা নিয়মিত দিচ্ছি কিন্তু ভক্ত তো জীবনে দীক্ষা একবারই পাচ্ছে।" তিনি যে কতিপয় শারীরিক

অসুস্থ প্রার্থীকে এককভাবে কৃপা করে ধন্য করেছেন, সেরকম নিদর্শনও আমাদের অজানা নয়।

কেবলমাত্র আত্মমুক্তিতে নিরত না থেকে একই সঙ্গে জগদ্ধিতেও নিয়োজিত থাকার ফলে রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শকে অনেক সময়েই বহু অবান্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এসবের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আধ্যাত্মিক আদর্শকে অটুট রাখার কৃত সংকল্প এই সংঘকে এক অত্যুচ্চ অভিনব প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করেছে। সামাজিক সমস্যার তাৎক্ষণিক প্রসাধনী সংস্কারের প্রয়াস এবং রাজনীতির সঙ্গে কোনরকম প্রত্যক্ষ সংস্রব না রাখার নীতি দুটি এই সংঘের কার্যধারাতে স্বামী বিবেকানন্দের এক চিরন্তন নির্দেশ। বিভিন্ন সমস্যার আবর্তে এই নির্দেশের পূর্ণ মান্যতা দান কম কৃতিত্বের কথা নয়। আদর্শ-সচেতনতা গহনানন্দজীর অস্থি-মজ্জায় মিশে ছিল। রহড়া, নরেন্দ্রপুর, গোলপার্ক, সেবাপ্রতিষ্ঠান—এসব কেন্দ্রের বিভিন্ন সমস্যার সময়, বেলুড় মঠের নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি এবং গোলপার্কের সংলগ্ন ‘বেদী ভবন'-এর জমি অধিগ্রহণের সময় সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের ঘন ঘন হস্তক্ষেপ ও সাহায্যের অঙ্গীকার এসেছিল। অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে কোন রাজনৈতিক দলের দিকে সামান্যতম ঝুঁকে না পড়ে, প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রেখে কার্যসিদ্ধি করার মানসিকতা গহনানন্দজীর আদর্শ নিষ্ঠ কর্মক্ষমতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দেশের আইনানুগ সাহায্য বা অনুমোদন পাওয়ার ক্ষেত্রেও কোন বিশেষ দলের সাহায্য গ্রহণ না করে কিংবা সরাসরি তাদের প্রত্যাখ্যান না করে মহারাজ সরকারের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিতে পারতেন। এই নিরপেক্ষ দৃষ্টি সকলের কাছেই মঠ-মিশনের মর্যাদাকে সমুন্নীত করেছিল।

সংকীর্ণ গুরুবাদ, ব্যক্তিপূজা ও গোষ্ঠীগঠনের সম্ভাবনাকে নির্মূল করতে ঠাকুর, মা, স্বামীজি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্য ত্যাগীসন্তানদের ছাড়া পরবর্তী সন্ন্যাসীদের জীবনালেখ্য লেখায় ও প্রচারে অনুমোদন এতদিন ছিল না। এই অনুমোদন এ সংঘের ঐতিহ্য। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শে একতা সম্পন্ন এইসব সন্ন্যাসীর জীবন ও কর্মের তথ্যাদি সংকলন ও প্রচার সমাদৃত না হওয়ার একটি দুর্বল দিক আছে। এমনটা হলে উক্ত সংঘের যুগে যুগে আরও অনেক উচ্চ কোটির সন্ন্যাসীর আবির্ভাব যে হয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগৃহীত না হওয়ায় সংঘের ইতিহাস সমগ্রতা লাভ করতে পারে না। ভবিষ্যকালের কাছে ব্যাপারটি সংঘের আদর্শের শক্তিহীনতাকেই দাখিল করে। ভবিষ্যসমাজ মনে করে, অত্যুচ্চমানের সন্ন্যাসীর অভাব ছিল বলেই এমনটা ঘটেছে। এই দুর্বলতার দিকটি নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের নিরিখে উচিত-অনুচিতে বিচার করার পর ধীরে ধীরে উপলব্ধি করা গেল যে,

সংঘের উচ্চপর্যায়ের সাধুর জীবন ও কর্মকে ইতিহাসের তাগিদে লোকসমাজের গোচর করা প্রয়োজন। গত শতকের নয়ের দশকে গহনানন্দজী প্রসঙ্গটি আমাদের জানান এবং গত এক শতাব্দীর মধ্যে যাঁরা সংঘাধ্যক্ষ বা সহ সংঘাধ্যক্ষ হননি কিন্তু সংঘে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন—এমন পঞ্চাশজন উচ্চকোটির সন্ন্যাসীর নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করে দিতে কয়েকজনকে বলেন। এবং তাঁদের জীবনের সম্ভাব্য উপাদান সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করেন। কিছুদিন পর তিনি এই কাজটির দায়িত্ব পূজনীয় পরেশ মহারাজ-এর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। পরেশ মহারাজ কয়েক বছর যাবৎ পুরনো বুলেটিন এবং অন্যান্য নথিপত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করে একত্রিত করে থাকেন। পরেশ মহারাজের দেহান্ত হলে উক্ত কাজটি পূজ্যপাদ স্বামী শিবময়ানন্দজী শেষ করতে অগ্রসর হন। কাজটি প্রায় সম্পন্ন হয়ে এসেছে বলে জানা গেছে।

এরকম উদার ও মুক্ত স্রোতের প্রবাহের ফলে দেখা গেল গত দু-তিন দশক ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং স্মরণিকায় সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রের শতবর্ষ জয়ন্তী, সুবর্ণ জয়ন্তী ইত্যাদি উপলক্ষে কেন্দ্র গুলির এবং সংশ্লিষ্ট সাধুদের জীবনকথা লিপিবদ্ধ হয়ে চলেছে। মাঝেমাঝেই স্মৃতিকথা ও স্মৃতিচারণ হিসাবে মহৎ জীবনের স্বাদ আমরা পাচ্ছি। সে রসদ বা উপাদান কম নয়। বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করে লিখেছেন, ইংরেজরা শিকার করতে গেলেও তার ইতিহাস লেখা হয়, কিন্তু বাঙালির ইতিহাস লেখা হয় না। প্রশ্ন করেছেন, বাঙালির ইতিহাস কে লিখিবে ? নিজেই উত্তর দিয়েছেন, আমি লিখিব তুমি লিখিবে, যে বাঙালি সেই লিখিবে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষই ইতিহাসের বিবরণ লিখিবে। আর কেবলমাত্র তখনই সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ও আবেগ ইতিহাসের উপাদান হয়ে উঠবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আক্ষেপ ছিল বাঙালি জাতির ইতিহাস নিয়ে। আমাদের আক্ষেপ রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের ইতিহাস নিয়ে। আক্ষেপ বা দিকনির্দেশটি সত্য ও যথার্থ। অনেক পুরনো সাধুই বলে থাকেন, সংঘে কত দিকপাল সব সন্ন্যাসীর সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁদের কথা কিছুই আর জানা যায় না। কতজনের ত্যাগ, তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন, বাধা-বিপত্তি, প্রতিকূলতা পেরিয়ে সংঘকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দুর্জয় আত্মযোগ কালের গহ্বরেই বিলীন হয়ে গেছে। অপরপক্ষে বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফলে তথ্যকে ধরে রাখার কত নিত্যনতুন কৌশল, হস্তগত হচ্ছে, কিন্তু ধরে রাখার মতো জীবন ও চরিত্র কোথায় ? যাহোক, সে আক্ষেপকে কাটিয়ে শ্রদ্ধেয় সচ্চিদানন্দ ধর কর্তৃক সংকলিত 'স্বামী প্রেমেশানন্দের পত্রাবলি', 'সন্ন্যাসীর স্মৃতি-কথা, 'অনৃত' গোষ্ঠীকৃত 'স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর স্মৃতিসুধা', নরেন্দ্রপুর আশ্রমের প্রাক্তনীদের দ্বারা প্রকাশিত

'স্বামী মুমুক্ষানন্দজীর স্মৃতি' ইত্যাদি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে পূজ্যপাদ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ সংকলিত 'মুসাফিরের গাঁটরি' ও 'সারগাছির স্মৃতি' প্রকাশের ফলে সংঘের ইতিহাস রচনার অপূর্ব সব উপাদান, দৃষ্টিভঙ্গি আপামর মানুষের লভ্য হয়ে উঠেছে। উচ্চকোটির সন্ন্যাসী, সারস্বত সাধক, রামকৃষ্ণ ভাবধারার অন্যতম বিশিষ্ট চিন্তক স্বামী প্রেমেশানন্দজীর জীবন ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের আঙ্গিনা থেকে মুক্ত করে সকলের করে তোলায় অন্যতম এক আদর্শবাহী সাধুজীবনের আস্বাদ আমরা লাভ করছি। পূজনীয় স্বামী চেতনানন্দকৃত সমগ্র জীবনের মাধুকরী 'প্রাচীন সাধুদের কথা (প্রথম খণ্ড)' গ্রন্থটি সেই প্রস্রবনের এক অফুরন্ত নির্ঝর। সাধুরা যে যাঁর দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন তাঁদের সামান্য কথা লিপিবন্ধ করে রাখলে রামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাস পৃথিবীর যেকোন বিশ্বকোষকে অতি সহজেই অতিক্রম করে যাবে। স্বামীজি বলেছেন, পৃথিবীর ইতিহাস মুষ্টিমেয় কয়েকটি শক্তিশালী আত্মবিশ্বাসী মানুষের ইতিহাস। সেই ইতিহাস রচনায় আমাদের উদ্বুদ্ধকরণে গহনানন্দজী আজ অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর এই উদার উন্মুক্ত ভবিষ্য-দৃষ্টি অন্যের দৃষ্টিগোচর করা অবশ্যকর্তব্য। আর সেই কারণেই বর্তমান বিষয়টির অবতারণা।

এবার আমাদের আলোচনা শেষ করে আনা যাক। মনে পড়ে, একেবারের চতুর্থ মাসিক অছি পরিষদের সভায় (Four-Monthly meeting) তিনজন সাধুর নাম কাটা যায় অর্থাৎ তাঁরা সংঘ থেকে বহিষ্কৃত হন। পরদিন সকালে পরম পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ ভূতেশানন্দজীর প্রণাম চলছে। মহারাজজী খুবই গম্ভীর হয়ে রয়েছেন। সে সময় পূজনীয় স্বামী আত্মরামানন্দজী মহারাজ (রাধাকৃষ্ণ মহারাজ) সেখানে এলেন। তিনি তখন বেলুড় মঠের একজন ট্রাস্টি এবং কোয়েম্বাটর কেন্দ্রের সম্পাদক। সেদিন তিনি নিজ কেন্দ্রে ফিরে যাবেন। তাই তার আগে পূজ্যপাদ মহারাজজীকে প্রণাম করে যেতে চান। রাধাকৃষ্ণ মহারাজ প্রণাম করে উঠতেই ভূতেশানন্দজী মহারাজ বলছেন, "দেখো রাধাকৃষ্ণ, সাধুরা দোষ করলে যে কোন সময় আমরা আদালত বসিয়ে তাদের চলে যেতে বলতে পারি। কিন্তু কীভাবে তাদের আর একটু ভালবেসে আপন করে ধরে রাখা যায় সেকথা আমাদের ভাবতেই হবে।" পরিবেশ থমথম করছে। রাধাকৃষ্ণ মহারাজ প্রণাম করে বেরিয়ে গেলে সাধু ব্রহ্মচারীরাও একে একে বিদায় নিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজজী ঘরে গিয়েও সে কথার স্বগতোক্তি করলেন—"কীভাবে সাধুদের আর একটু ভালোবেসে আপন করে ধরে রাখা যায় সে কথা ভাবতেই হবে।" আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্বামী গহনানন্দজী হয়ে উঠেছিলেন এরকম দোষে দুষ্ট, দুর্বল সাধুদের আশ্রয়। তিনি তাঁদের নিয়ে কাজ করতে পারতেন

এবং তাঁদের সংশোধনের দিকে তীক্ষ্ণ অথচ স্নেহশীল দৃষ্টি রাখতেন। একেবারে বেপরোয়া ও দুর্দান্ত হয়ে ওঠার আগের পর্বে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের প্রধান ও অন্যান্যদের কর্তব্য হলো সে-সাধুর সমস্যা দূর করা এবং আন্তরিক মেলামেশার মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করা। আয়ত্বের বাইরে চলে যাওয়ার পর হেডকোয়ার্টাসকে নিয়ম নির্ভর সিদ্ধান্ত নিতেই হয়। নতুবা চিরকালের জন্যে বিপরীত নজির সৃষ্টি করা হয়ে যায়।

এ কারণে কেন্দ্রগুলির সকলকেই এই সমস্যাটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে স্নেহ-ভালবাসা ও আর একটু স্বাধীনতা দিয়ে ঠাকুর-মা-স্বামীজির ওপর নির্ভরশীল হয়ে উদ্দিষ্ট সাধুটিকে আগলে রাখার চেষ্টা করতে হবে। খুব মারাত্মক দোষের ক্ষেত্রে হেড কোয়ার্টার্সের হাতে ছেড়ে দিয়ে অন্তত মান-অভিমান, রাগারাগি বা ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্রগুলিতে সে চেষ্টা করতেই হবে। এই লক্ষ্য সাধনে স্বামী গহনানন্দজী হয়ে উঠেছিলেন দায়ভার গ্রহণের এক সার্থক 'বটবৃক্ষ'। বটবৃক্ষের বিশালতা ব্যক্তিভেদে, শক্তিভেদে কমবেশি হলেও নরেন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য করে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের তাঁর সন্তানদের যে বিশাল বটবৃক্ষ করে তোলার আকুতি, তাতে আমাদের সকলের সামান্য অংশগ্রহণও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি বটবৃক্ষের মাধ্যমে এক বটবৃক্ষের বনানী সৃজন করার সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে রাখে। এ সত্যে অটল বিশ্বাস এবং গহনানন্দজীর বটবৃক্ষসম নিশ্চিত আশ্রয় হয়ে ওঠার উদাহরণ আমাদের প্রতিনিয়ত সে-আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবে।

মুক্তিপথের অগ্রদূত স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

স্বামী সত্যাস্থানন্দ

'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা
আমি যে পথ চিনি না।'

জগতে দুঃখ-কষ্ট আছে এবং থাকবে, এই দুঃখ কষ্টের হাত থেকে মুক্তির উপায়ও আছে। যাঁরা সেই উপায়কে অবলম্বন করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁরা হন মুক্ত পুরুষ। একমাত্র মুক্ত পুরুষই পারেন মুক্তি পথের অগ্রদূত হয়ে সেই পথগামী তথা মুক্তিকামী মানুষকে মুক্ত করতে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্দশ সংঘাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ছিলেন তেমনি একজন মুক্ত পুরুষ। ধীর, স্থির, শান্ত ও সৌম্য এবং সদাই হাসিতে ভরা তাঁর মুখমণ্ডল। ঠাকুর-মা-স্বামীজি ও তাঁদের আধ্যাত্মিক পার্ষদ (মন্ত্র শিষ্যগণ) যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের রূপরেখা তৈরী করেন, সেই রেখায় পরিবৃত হয়ে তাঁর সন্ন্যাসজীবনে এক অদ্ভুত গুরুশক্তি বিরাজ করত। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। তাই দেখা যায় যাঁরা যেভাবে তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন এবং তাঁর ভাবকে আশ্রয় করে নিজেদের জীবনকে সেই ভাবের ধারায় বয়ে নিয়ে চলেছেন গুরুশক্তির কৃপাবলে তাদেরকে মুক্ত করতে রামকৃষ্ণ নামের জোয়ারে তিনি তার জীবন তরী ভাসিয়ে দিয়েছেন। ভাসিয়ে দিয়েছেন ৬৭ টি বছর। ২৪ বয়স থেকে ৯১ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন।

মহারাজ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে যে সকল গুরুদায়িত্ব পালন করেন তা এক কথায় তুলনারহিত। মঠের কার্যবিবরণী দেখলে বোঝা যায় শ্রীশ্রী ঠাকুর ও মায়ের শতবার্ষিকী, রামকৃষ্ণ সংঘের দ্বিতীয় মহাসম্মেলন, সর্বভারতীয় যুব সম্মেলন, শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধশতবর্ষ উদযাপন, শিকাগো বক্তৃতার শতবার্ষিকী, রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার সম্মেলন ইত্যাদি মহোৎসব ও মহানুষ্ঠানগুলি তাঁর সময়েই সংঘটিত হয়। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

তিনি যখন মঠাধ্যক্ষ হয়ে মঠ মিশনের বিভিন্ন শাখাগুলিতে দীক্ষা দিতে যেতেন তখন, কখনো সখনো সেখানে তাঁকে রাত্রিবাস করতে হতো।—এইরকম বেশ কয়েকদিন রাত্রিবাসের পর তিনি যখন মঠে ফেরেন তখন মঠের এক প্রবীণ সন্ন্যাসী মহারাজকে দেখে বলেন, মহারাজ আপনি ছিলেন না জায়গাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। তিনি মহারাজকে আরও বললেন, মহারাজ আপনি প্রেসিডেন্ট, কত এগিয়ে! মহারাজ তার গুরু ভাইয়ের কথা শুনে সবিনয়ে বললেন, 'দেখ, ঠাকুর কৃপা করে চরণে আশ্রয় দিয়েছেন—এই-ই যথেষ্ট।'

'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে নিও না
নিও না সরায়ে।'

ঠাকুরের চরণাশ্রিত হয়ে ত্যাগ, ভগবৎ প্রেম ও সেবা—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এই তিন আদর্শকে সামনে রেখে একজন প্রকৃত কর্মবীরের ন্যায় তিনি নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করেন। কর্মসূত্রে তিনি যখন যেখানে থাকতেন সেখানকার মানুষজনও সেই স্থানকে এতটাই আপন করে নিতেন যে তাঁর সেই আপনহারা আত্মভোলা আত্মীয়তায় তিনিও সেই স্থানটি একসূত্রে হয়ে উঠত অভিন্ন। তিনি যখন সেবা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন তখন তাঁর দায়িত্বভাবের মূল্যায়ন করে পরম পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বলেন, 'সেবা প্রতিষ্ঠান মানেই গহনানন্দ, গহনানন্দ মানেই সেবা প্রতিষ্ঠান।' সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক থাকাকালীন মহারাজ ডাক্তার ও নার্সদের একটা কথা খুবই বলতেন। তা হলো, যখন রুগীদের সেবা করবেন, 'এরা আমার বাড়ির লোক' এই মনে করে করবেন।

মহারাজের কথায় কেউ কখনো কোনদিন রাগ করেননি। কারণ তিনি কথা বলতেন হাসিমুখে। একবার একজন প্রবীণ অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজ ঠিকমতো না হওয়ায় তিনি তাকে ডেকে পাঠান। অ্যাকাউন্ট্যান্ট তখন বেশ উত্তেজিত হয়ে মহারাজকে বলেন, অ্যাকাউন্টের কাজ করতে করতে আমার চুল সাদা হয়ে গেল আর ...। মহারাজ তখন তাকে বলেন, আপনার তো শুধু সাদা হয়েছে আর অ্যাকাউন্টসের কাজ দেখতে দেখতে আমার চুল সাদা হয়ে পাক ধরে গেল। —এইরকম আত্মীয়তার সম্পর্কে সকলকে নিয়ে একসাথে চলার এক অদ্ভুত ছন্দ তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে বজায় রাখতেন। মহারাজের কাছে তাঁর কর্মস্থল ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির। কর্মস্থলে কাজের মধ্য দিয়ে তিনি শ্রীশ্রী ঠাকুরের পূজা করছেন, এই ছিল তার ভাব।

মহারাজের এই পবিত্র ও পুণ্যভাবের সংস্পর্শে যাঁরা আসেন তারা অনেকেই জীবনে

নতুন পথের সন্ধান পান এবং সেই পথকে আশ্রয় করে জীবনকে সার্থক করে তোলেন।

একবার এক সদ্য পুত্রহারা মা তাঁর জোয়ান ছেলেকে অকালে হারিয়ে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে মহারাজে কাছে এলেন। মহারাজ মায়ের দুঃখ মোচন করতে বলেন, 'তুমি আমাকে তোমার সন্তান ভাববে।' মহারাজের এই কথায় তাকে পুত্র রূপে পেয়ে মা চোখের জল মুছলেন। সেই মা যতদিন বেঁচে ছিলেন সময় পেলেই মহারাজের জন্য রান্না করে নিয়ে আসতেন এবং পরম স্নেহে মহারাজকে পুত্ররূপে খাইয়ে আনন্দ পেতেন। মহারাজও পুত্রের মতো তাঁর গভীর স্নেহের পাত্র হয়ে তাঁকে মায়ের মতোই শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন।

'আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো
তোমা ছাড়া এ জগতে মোর কেহ নাই কিছু নাই গো।'

মহারাজ মায়েদের উদ্দেশ্যে একটা কথা প্রায়ই বলতেন, জন্ম দিলেই মা হওয়া যায় না। মায়ের স্বাদ পেতে গেলে শুদ্ধ ও পবিত্র চিত্তের অধিকারী হওয়া চাই।

চিত্তের শুদ্ধতায় ও পবিত্রতায় কেউ তাঁকে পুত্র রূপে কেউবা পিতারূপে কেউ বা দাদা, বন্ধু ও সখারূপে তাদের স্নেহ-ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে মহারাজের ত্যাগ, ভগবৎ প্রেম ও সেবার সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া রামকৃষ্ণ ভেলায় উঠেছেন। মুক্তি পথের অগ্রদূত হয়ে মহারাজ তাদেরকে নিয়ে ভেসে চলেছেন সচ্চিদানন্দ সাগরে।

শিলচরে ভক্তদের পরিচালনায় গহনানন্দ মহারাজের শততম জন্মজয়ন্তী উৎসব উদযাপন অনুষ্ঠানে স্বামী সত্যাস্থানন্দজী মহারাজ যে বক্তৃতা দেন তারই সংক্ষিপ্তসার প্রবন্ধ আকারে তুলে ধরা হয়েছে।

স্মৃতির মানসপটে স্বামী গহনানন্দ মহারাজ

স্বামী প্রভাসানন্দ

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।

প্রথমে ঠাকুর-মা-স্বামীজি ও পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দ মহারাজের শ্রীচরণকমলে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি। মঞ্চে উপবিষ্ট শ্রীমৎ স্বামী সত্যস্থানন্দ মহারাজজীর শ্রীচরণ কমলে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। মঞ্চে উপবিষ্ট রাজস্থানের খেতড়ী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দ মহারাজকে আমার শ্রদ্ধা, নমস্কার ও ভালোবাসা। সামনে উপবিষ্ট পূজ্যপাদত্রয় শ্রীমৎ স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী জুষ্ঠানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী নরেশানন্দজী মহারাজের শ্রীচরণে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি। আর স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের জন্ম শতবর্ষ কমিটির কর্মীবৃন্দ, সদস্যবৃন্দকে আমার নমস্কার, শুভেচ্ছা। ভক্তমণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলীকে আমার যথাযথ নমস্কার, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা।

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে গহনানন্দজী মহারাজের সম্পর্কে বলতে হবে। তাঁর ছিল দীর্ঘ সেবাপরায়ণ জীবন। মহারাজের পরিণত বয়সে যখন তিনি মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট, তখন তাঁর এক সেবক তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "মহারাজ, আপনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?" মহারাজ তাকে বললেন, "তোমার এসব জেনে কী লাভ?" "শুনলে আমাদের বল, বিশ্বাস, ভক্তি বাড়বে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে।" মহারাজ তখন বলেছিলেন, "আমি সেবা প্রতিষ্ঠানে থাকা কালে একবার উদ্বোধনে মায়ের বাড়ি

গিয়েছিলাম। মাকে প্রণাম করে মায়ের যে চরণ আছে, তার দিকে তাকিয়ে দেখছি, এমন সময় দেখি মা পাশে দাঁড়িয়ে।" সেবক জানতে চাইলেন, "মা কিছু বললেন ?" মহারাজ বললেন, "না"। এরকম একজন ঈশ্বরপ্রাপ্ত মানুষের সম্পর্কে কিছু বলা, প্রায় সমুদ্র পরিমাপ করার ব্যাপার। যাই হোক, কিছু তো বলতেই হবে।

মহারাজ ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার পাহাড়পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী। মহারাজরা ছিলেন চার ভাই—রাকেশ রঞ্জন, সুরেশ রঞ্জন, বীরেশ রঞ্জন ও নরেশ রঞ্জন। এই নরেশ রঞ্জনই পরবর্তীকালে হন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। তখন থেকেই তাঁর মধ্যে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সেবাপরায়ণতা দেখা যায়। তাঁর খুড়তুতো দুই ভাই কেতকীরঞ্জন ও প্রমথরঞ্জন সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। কেতকীরঞ্জন রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ নামে পরিচিত। (বর্তমানে মঠ ও মিশনের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ, অন্য ব্যক্তি।) স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ অল্প বয়সে শিলং এর নিকটবর্তী মেলা অঞ্চলে খাসিয়াদের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করেন। এত পরিশ্রমের ফলে কম বয়সেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। সেই সময় মিশনে সেবা-পরিচর্যা পাবার সুবন্দোবস্ত ছিল না। কাজেই, সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজনে তাঁকে তখন বাড়িতেই ফিরে যেতে হয়। তাঁকে সেবা-যত্ন করেন স্কুলের ছাত্র, তাঁর জেঠতুতো ভাই নরেশরঞ্জন। এই নরেশরঞ্জনের একনিষ্ঠ সেবার পরেও তাঁর শরীর চলে যায়। তাঁর কাছ থেকেই তিনি স্বামীজির কাজের প্রেরণা পান। তাঁর ভাবাদর্শে ভাবিত হন। একদিন একজন তাঁর হাত দেখে বললেন, "এখানে থেকে তোমার লাভ নেই, তুমি কলকাতায় চলে যাও।" তিনি কলকাতায় দাদার কাছে চলে গেলেন।

তখন ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ। দাদার কাছে থাকেন। একদিন গেছেন ঠাকুরের উৎসবে বেলুড় মঠে। তারপর দক্ষিণেশ্বরে হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন। মাঝে মাঝে যান কলকাতা অদ্বৈত আশ্রমে। সাধুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। একদিন দাদা তাঁকে বলছেন, "যদি সাধু হতে হয়, তবে ওইরকম সাধু হবি। ওই বাসন-মাজা সাধু হবি না।" কথাটা তাঁর মনে খুব দাগ কেটেছিল। এরপর সাধুদের সঙ্গে অনেকটা আলাপ আলোচনা করে ঠিক করলেন যে তিনি ভুবনেশ্বর মঠে যোগ দেবেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাদ্রাজ মেলে চেপে একদিন গভীর রাতে ভুবনেশ্বর পৌঁছলেন এবং আশ্রমে গেলেন। সেখানে তখন ছিলেন স্বামী নির্বাণানন্দ মহারাজ। তাঁর তত্ত্বাবধানে তিনি ঘর ঝাড়ু দেওয়া, জল তোলা, সাধু সেবা সবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিখলেন। স্বামী নির্বাণানন্দ মহারাজ তাঁকে বলতেন যে, সবই নিজের কাছে। সেখান থেকে তিনি অদ্বৈত আশ্রমে আসেন। তখনকার দিনের

দিকপাল সাধুরা, যেমন বন্দনানন্দজী, বীরেশ্বরানন্দজী প্রমুখ সেখানে ছিলেন। তিনি তাঁদের সংস্পর্শে আসেন। এরপর তিনি স্কুলের জন্য বর্তমান বাংলাদেশের বাগের হাটিতে পাঁচ-ছমাস ছিলেন। এরপর যান শিলঙে। সেখানের একটি ঘটনা খুব মনে আসছে। স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজ গেছেন শিলঙে, ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে। একজন ভক্ত বলছেন যে স্বামীজি এসেছেন ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে। শংকরানন্দজী মহারাজ বলছেন, "না ঠাকুর এখানে বসবেন বলে আমাকে আসতে হয়েছে"। কথাটা গহনানন্দ মহারাজকে খুব প্রভাবিত করেছিল। তাঁর সেবাপরায়ণতার কথা একটু বলি। শিলঙে একজন সাধুর শরীর খারাপ হয়েছে। রাতে তিনি খাবেন না। বারবার ডাকলেও খেতে যেতে রাজি হচ্ছেন না। তখন গহনানন্দজী বলছেন, "আচ্ছা, শরীরটা কার"? সাধু বলেন, "আমার"। গহনানন্দজী বলছেন, "উহুঁ, তুমি যেদিন থেকে মিশনে এসেছ, সেদিন থেকে এই শরীরটা শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পত্তি। অতএব এর সাথে তুমি অন্যায় আচরণ করতে পারবে না। যা নিয়ম আছে, তাই করতে হবে।"

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'সেবাপ্রতিষ্ঠান'-এ যোগ দেন। তখন তার নাম ছিল 'শিশুমঙ্গল'। সেখানে তখন ছিলেন স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজ। তিনি পাশ্চাত্য থেকে এসে শিশুমঙ্গল শুরু করেন। প্রথমে প্রসূতি বিভাগ খোলা হয়। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বামী গহনানন্দজী স্বামী দয়ানন্দজীর সহকারী রূপে কাজ করেন। প্রতিটি কাজে তিনি দয়ানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করে, তাঁর আজ্ঞায় করেছেন। প্রতিটি কাজের খুঁটিনাটি তিনি তাঁর কাছ থেকে শিখেছেন। এরপর ১৯৬৩ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর জীবনের এ এক বিরাট অধ্যায়। অনেক ঘটনা আছে। একবার ১৮ জন কর্মচারীকে তাদের অপকর্মের জন্য কাজ থেকে বাদ দেওয়া হলো। আবার পুনর্বহালও করা হলো তাদের পরিবারের কথা চিন্তা করে। কারণ, তাদের বাচ্চা-কাচ্চারা খাবে কী? বেশ গোলমালের সময় ছিল সেটা। একদিন বাইরের রাজনৈতিক পার্টির লোকেরা, যুবকরা চিৎকার চ্যাঁচামেচি করছে, ঢিল ছুঁড়ছে, একেবারে অতীষ্ট করে তুলেছে শিশুমঙ্গল প্রাঙ্গণ। সেই সময় ঘরে বসে ছিলেন দুজন সাধু। একজন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, অন্যজন উত্তরাখণ্ডের একটি মঠের মহামণ্ডলেশ্বর। আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর না হলে মহামণ্ডলেশ্বর হওয়া যায় না। যাইহোক, তাঁর মতো সাধু রেগে গেছেন 'এসব কী চলছে? এইসব অত্যাচার, ভাঙচুর চলছে, আর আপনি কিছু বলছেন না?' স্বামী গহনানন্দ মহারাজ ধীরস্থির ভাবে বললেন, "আমি মায়ের ছেলে। ওরাও তো মায়ের ছেলে। কী বলব।" তাঁর ধৈর্য, তিতিক্ষার কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

একবার বেলুড় মঠ থেকে তাঁর কলকাতায় সেবাপ্রতিষ্ঠানে আসবার সময় রাস্তায়

খুব জানযট। এরমধ্যে এক মিলিটারি অফিসারের গাড়ি তাঁর গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন, ওই গাড়ির নাম্বার নোট করলেন তারপর নিজের চাদরটাকে নাড়িয়ে নাড়িয়ে তিনি ট্র্যাফিক পুলিশের মতো রাস্তার জ্যাম সরালেন। এরপর তিনি ওই মিলিটারি অফিসারের গাড়ি নিয়ে ভবানীপুর থানায় এলেন যা যা করণীয়, করলেন। এরকম ছিল তাঁর বীরত্ব আর প্রতিটি কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করার ধরণ।

ডাক্তার, নার্সদের তিনি বলতেন, "রোগীদের সেবা করবে, এদের তোমাদের আত্মীয় জেনে সেবা করবে। তোমাদের মা, বাবা, ছেলে অসুস্থ হলে যেভাবে সেবা করতে, এদেরও সেভাবেই সেবা করবে।" বিশেষত ট্রেনিং নার্সদের প্রথম দিনই বলতেন, "তোমরা এক একটি ক্ষুদ্র পরিবারে ছিলে। সেখানে একরকম নিয়মকানুন ছিল। এখানে বিশাল একটা পরিবারে এসেছ। এখানকার নিয়ম কানুনও বিশাল। সুতরাং সেগুলো মেনে ঠিকঠাক ভাবে চলতে থাক।"

শিশুমঙ্গল থেকে তখন সেবা প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তনের কাজ চলছে। সবকিছুই বড় হচ্ছে, বাড়ছে। একজন ব্রহ্মচারীকে নিযুক্ত করা হয়েছে বিল্ডিঙের কাজ-কর্ম দেখার জন্য। কিন্তু তিনি অনেকেরই অপছন্দের লোক ছিলেন। তাঁর হাতে অপচয়ও হত। মহারাজের কাছে অভিযোগ এসেছে, 'একে এরকম দায়িত্ব দিয়েছেন? সবার সঙ্গে মনোমালিন্য, অপচয় করে ইত্যাদি। মহারাজ শুনে বলছেন, "করুক না, করুক না। কী আর নষ্ট করবে? একডজন সেবাপ্রতিষ্ঠান তৈরির চেয়ে একজন সাধুর জীবন বেশি মূল্যবান।" সুতরাং কাউকে তিনি ছোটো করে দেখতেন না। তারপর আসছে তাঁর অতিথি আপ্যায়নের কথা, সে-ও দেখবার মতো ছিল। একজন সাধু এসেছিলেন, যাবেন পরদিন খুব ভোরের ফ্লাইটে। মহারাজ বলে রেখেছিলেন, "সকালে চা খেয়ে যাবেন।" যাবার আগে সেই সাধু এসেছেন মহারাজকে প্রণাম করতে। মহারাজ জানতে চাইলেন তাঁর চা খাওয়া হয়েছে কি না। সাধুটি বললেন, "না মহারাজ"। তারপর তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে নিচে নেমে এসে দেখলেন মহারাজ নিজে চা বানিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।

কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্বদা জপ করতেন। একবার ত্রিবান্দ্রম থেকে কন্যাকুমারী যাচ্ছেন গাড়ি করে। সঙ্গে একজন প্রবীণ সাধু ছিলেন। ত্রিবান্দ্রম আশ্রমের অধ্যক্ষও ছিলেন। একটা জায়গায় গাড়িটা হঠাৎ ব্রেক ফেল করলে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী জেনে সবাই গাড়ির দরজা খুলে বাইরে ঝাঁপ দেন। গহনানন্দজীও তৎক্ষণাৎ "জয় রামকৃষ্ণ"

বলে ঝাঁপ দিলেন। একজন সাধু সম্ভবত স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী বললেন, "ও সর্বদা জপ করে"। বিপদের সময় ঠাকুরের নাম মনে রাখা এ কম কথা নয়।

তাঁর অভিভাবকত্বও ছিল বলবার মতো। যেমন শাসন করতেন তেমন সোহাগও করতেন। সেবা প্রতিষ্ঠানের জুনিয়র ডাক্তাররা প্রায়ই রাতে সিনেমা দেখতে যেত আর দেরি করে ফিরত। এটা মহারাজ জেনেছেন। একদিন রাত দশটা সাড়ে দশটায় তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানের গেটে দাঁড়িয়ে আছেন। ডাক্তাররা ফিরছে, তাঁর মুখোমুখি। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি জানি তোমরা প্রায় দিনই দেরি করে সিনেমা দেখে ফের"। তারা আর কী বলবে? লজ্জায় একেবারে শেষ। একদিকে দেখুন শাসন করলেন আবার পরক্ষণেই দেখলেন ওদের তো রাতে খাওয়া হবে না। এত রাতে আর কী পাওয়া যাবে। এদের নিয়ে গিয়ে কেক, বিস্কুট এসব খাওয়ালেন। একদিকে পিতার মতো শাসন, অন্যদিকে মায়ের মতো স্নেহ। এই ছিল মহারাজের সারাজীবন ব্যাপী চলার ধারা।

তাঁর প্রত্যেকটি কথা এবং কাজে মিল ছিল। তখন সেবাপ্রতিষ্ঠানের খুব আর্থিক অনটন ছিল। একবার মাসের বেতন দেবার মতো টাকা নেই। ক্যাশিয়ার খুব অস্বস্তিতে আছেন। মহারাজ তাঁকে বললেন, "চিন্তা করো না। ঠাকুরের ইচ্ছাতে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একবার হঠাৎ ৩৫ লক্ষ টাকা ডেফিসিট হয়ে গেছে। ক্যাশিয়ার মহারাজকে জানালেন সে কথা। মহারাজ বললেন, "তোমাদের ঘুম হচ্ছে না? মন দিয়ে সেবা করো, সব ঠিক হয়ে যাবে।" তিনি নিশ্চিন্ত। একদিন এক নাম করা কোম্পানির ম্যানেজার এক স্যুটকেস টাকা নিয়ে এসেছেন। মহারাজ সেদিন সেবাপ্রতিষ্ঠানে নেই। সেই ম্যানেজার ক্যাশিয়ারের কাছে গিয়ে উপস্থিত, "মহারাজ, এই টাকাটা আমি দিতে চাই।" কিন্তু ক্যাশিয়ার মহারাজ বারবার বলা সত্ত্বেও নিজের নাম ঠিকানা তিনি কিছুতেই দেবেন না। সুতরাং সে টাকা নেওয়া গেল না। ভদ্রলোকটি যাবার সময় বলে গেলেন, "একদম বুদ্ধু হ্যায়।" এদিকে ক্যাশিয়ার মহারাজ পরে ভাবলেন, 'টাকাটা যদি রাখা হত।' মহারাজকে সব জানালে তিনি বললেন, "ঠিক করেছ। ঐ রকম টাকায় আমাদের প্রয়োজন নেই। ঠাকুর আছেন। আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।" এরকম ছিল তাঁর নীতিটি। পেছনের দরজা দিয়ে টাকা দিয়ে কাজ করানো, এটা রামকৃষ্ণ মিশনের নীতি নয়।

ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ সমাজের জন্য তাঁর পঞ্চ 'স' ছিল—স্বাধ্যায়, সাধন, সেবা, সংযম ও সত্য। এটা যদি তারা পালন করে, সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি কঠোর ছিলেন। আবার মজা-মস্করাও করতেন। লৌকিকতাও করতেন। একবার তিনি কোথাও যাবেন। সেবকরা গাড়িতে মালপত্র সব তুলে দিয়ে এসে বলছে, "মহারাজ, মাল-পত্র

সব ওঠানো হয়ে গেছে।” মহারাজ তখন নিজেকে দেখিয়ে বলছেন, “আসল মালই তো এখানে রয়ে গেছে।” এরকম ছিল তাঁর রসিকতাবোধ। একবার সেবাপ্রতিষ্ঠানে রান্নায় আরশোলা পড়ে গেছে। খেতে বসে সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। মহারাজের পাতে আরশোলার মুণ্ডুটা পড়েছে। মহারাজ চামচ দিয়ে সেটা সরিয়ে বললেন, “কী ব্যাপার এর ধড়টা গেল কোথায়?” নির্বিকার চিত্তে রসসিক্ত উক্তি।

যোগোদ্যানে তখন মহারাজ ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট অবস্থায়। প্রতিদিন মহারাজের প্রণাম হত। সাধুরা এবং ভক্তরা প্রণাম করতেন। একজন সাধু ছিলেন, তাঁর নাম ছিল বিষ্ণু। তিনি প্রতিদিনই দেরি করতেন। সেদিনও দেরিতে এসেছেন। মহারাজ বললেন, “আমরা এতক্ষণ বিষ্ণুহীন যজ্ঞ করছিলাম।” সকলের হাস্য।

দীক্ষার ব্যাপারে বলার অবকাশ রাখে না। তিনি ২০০৫ সালে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তিনি শিলচর আশ্রমে বহুবার এসেছেন। তাঁর সেবা করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। তিনি একদিনে ২০০/২২৫/২৫০ জনকে পর্যন্ত দীক্ষা দিতেন। প্রত্যেকটি দীক্ষার্থীকে তিনি নিখুঁতভাবে বোঝাতেন। যতক্ষণ না বোঝানো শেষ হত, তিনি থামতেন না। তাঁর খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যেত। একবারের কথা বেশ মনে পড়ছে। সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে, আরতির সময় পেরিয়ে গেল। দীক্ষাদান পর্ব থামছে না। একজনের মন্ত্রজপ বা এরকম জেনো কিছু একটা ঠিকমতো হচ্ছে না, তার সমাধান না করে তিনি ক্ষান্ত হতেন না। এরকম তাঁর নিষ্ঠা ছিল। তিনি ১,৪২৯৫৫ জনকে দীক্ষা দিয়েছেন, এরকম শোনা যায়।

মঠ ও মিশনের প্রাচীন সাধুদের ওপর ছিল তাঁর শ্রদ্ধা। মঠ ও মিশনে এরকমই দেখা যায়। তখন তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। সাধুরা সব লাইন দিয়ে প্রণাম করতে এসেছেন রীতি অনুযায়ী। লাইনে তাঁর চেয়ে বেশি বয়সের একজন সাধু দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখেই স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বলতে লাগলেন, “মহারাজ, মাথায় একটু হাত দিয়ে দিন, মাথায় একটু হাত দিন।” শুনে সেই সন্ন্যাসী বলছেন, “কী বলছ? তুমি মঠ-মিশনের প্রেসিডেন্ট।” কেউই ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত প্রবীণতর মহারাজকে তিনি প্রণাম করে ছাড়লেন। এরকমই ছিল বড়দের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা।

একবার মঠে সহ-সংঘাধ্যক্ষ স্বামী নির্বাণানন্দ মহারাজ আছেন। সবাই প্রণাম করছেন। লাইনে, গহনানন্দজীও আছেন। তিনি প্রণাম করলে পর নির্বাণানন্দজী তাঁকে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। তিনি অবশ্য বসলেন না, বসাটা সম্ভবও ছিল না। পরে এই বসতে বলার প্রসঙ্গে সেবক প্রশ্ন করায় নির্বানানন্দজী, (তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ

ছিলেন), বললেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি ওর মধ্যে গুরুশক্তি জ্বল জ্বল করছে।"

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের তখন শরীর চলে যাবে, তাঁর কাছে মায়ের পদধূলি সম্বলিত যে কৌটাটি বুক পকেটে থাকত, সেটি গহনানন্দজীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তিনি সেটিকে যত্ন করে রেখেছিলেন। প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে ভাবের বিকাশ দেখা যায়। সমগ্র জীবনটিই তাঁর সংঘের জন্য উৎসর্গীত ছিল। তাঁর জপ করা সম্পর্কে তো আগেই বললাম। তিনি বলছেন, "ক্ষুধার সময় যেমন খেতে হয়, তৃষ্ণার সময় যেমন জল পান করতে হয়, নিশ্বাসের জন্য যেমন অক্সিজেনের দরকার হয়, তেমনি ভগবান লাভের জন্য একান্ত নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা খুব প্রয়োজন।" আর তাঁর ব্যবহারও খুব মধুর ছিল। তিনি বলতেন, "মিষ্টি কথায় জগৎ জয় করতে পারা যায়।" ধীরতা, স্থিরতা বিশেষ করে নিষ্ঠা ও ধৈর্য তাঁর চরিত্রের সম্পদ ছিল। আরও অনেক আছে, আমার সময় শেষ হয়ে গেছে। ১৯৮০ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে মহা সম্মেলন হয়েছিল, তার উদ্যোক্তা তিনিই ছিলেন। এক সপ্তাহব্যাপী এই মহাসম্মেলনের সভাপতি ছিলেন স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী, সহ-সভাপতি স্বামী গহনানন্দজী এবং সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী। মহাসম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতি স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী বললেন যে এক সপ্তাহের এই অনুষ্ঠানে সারা দেশ থেকে এত সাধু ভক্তরা এলেন, এত আলোচনা ইত্যাদি হলো, এত আনন্দ হলো, এর মূল উদ্যোক্তা, যিনি এই মহাসম্মেলনের কথাটা তুলেছিলেন, তিনি শুনলে বিব্রত বোধ করবেন, তিনি স্বামী গহনানন্দ। ১৯৮০ সালের সারা ভারত যুব সম্মেলনেরও তিনি উদ্যোক্তা ছিলেন।

আজকের এই পুণ্য দিনে মহারাজের যে ধৈর্য্য, নিষ্ঠা তা আমাদের উপর বর্তাক। কারণ ঠাকুর বলেছেন,—পিতার ঐশ্বর্য পুত্র পায়। অতএব আমরা তাঁকে যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখি, শ্রদ্ধা করি, তাঁর যে ঐশ্বর্য ছিল, সম্পদ ছিল, বিশ্বাস, ধৈর্য, ভগবানের নাম তো আমাদের মধ্যেও নিশ্চয়ই বর্তাবে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।।
হরিওঁ।

২৫-১২-২০১৬ তে শিলচরে ভক্তদের দ্বারা আয়োজিত স্বামী গহনানন্দ মহারাজের শতবার্ষিক উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ।

এক অমর জীবনকথা

স্বামী শিবপ্রদানন্দ

গহন আনন্দের তলাতল সহজলভ্য নয়। তবু ডুব দিলে কিছুটা আভাস মেলে। সে আশায় বুক বেঁধে যাঁর স্মৃতিপূজা করব তিনি স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

পরার্থে কর্মই তাঁর জীবন ধর্ম ছিল। এ-বিষয়ে তিনি সদা-জাগ্রত। নিবিষ্ট একাগ্র। অথচ সম্পূর্ণ অনাসক্ত। স্বামী বিবেকানন্দের এই শিক্ষা-তত্ত্ব তাঁর জীবনে প্রয়োগ-প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর দৃঢ় চরিত্রে প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতির আশ্চর্য উদ্ভাস মানবসমাজকে নিরন্তর মুগ্ধ করেছে। তাঁর বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি নিরভিমান সেবাযোগের মাধ্যমে নিরন্তর প্রবাহিত হয়েছে মঙ্গলকর লক্ষ্যে, কল্যাণকর ধারায়।

সুদর্শন ও স্মিত হাস্যময় স্বামী গহনানন্দজী সম্ভ্রম ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কেউ তাঁকে অশান্ত দেখেনি। ধৈর্যচ্যুতি মানুষকে ভুল পথে চালিত করে। অথচ তার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে স্বামী গহনানন্দজী এক উচ্চতর বিকল্প পথ নির্মাণ করেছেন। ধৈর্যশীলতা যে মানব চরিত্রের অক্ষয় সম্পদ তা স্বামী গহনানন্দজীর জীবনের নিরিখে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ভিন্ন মতাদর্শের মানুষজনের সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁকে শানিত যুক্তির ব্যবহার করতে হলেও তা কখনো সৌজন্যকে বিসর্জন দেয় নি। পরন্তু প্রতিপক্ষ তাঁর স্নেহের প্রশ্রয় লাভ করে মুগ্ধ হয়েছে।

স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ তাঁর সমগ্র জীবন রামকৃষ্ণ সংঘের কাজের জন্য হাসিমুখে উৎসর্গ করে গেছেন। বৃহত্তর মানব সমাজের সেবার জন্য নিজের জীবনকে নিবেদন করেছেন। আর সদা-সর্বদা নাম-জপে নিমগ্ন থেকেছেন।

অসুস্থ শরীরকে উপেক্ষা করেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বহু দুর্গম অঞ্চলে দরিদ্র মানুষের গ্রামে, আদিবাসী অধ্যুষিত প্রান্তরে উপস্থিত হয়েছেন। রাত্রিবাস করেছেন। বৃদ্ধ বয়সে তার জন্য তাঁকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। তবু তিনি অকাতরে শ্রীরামকৃষ্ণ নাম বিতরণ করে গেছেন।

পরিবর্তনশীল জগত সম্পর্কে স্বামী গহনানন্দজী সচেতন ছিলেন। বৌদ্ধিক ও সামাজিক প্রক্রিয়াগুলিতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়ে চলেছে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে তিনি সচেষ্ট হয়েই ক্ষান্ত হননি একই সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এক বিশ্বজনীন সমাজ, আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা, সমন্বয় ও ঐক্য নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

বর্তমান দ্রুতগামী জীবনের জন্য মানুষের মনের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মানসিক উত্তেজনা মানুষের বিচারবোধকে লুপ্ত করে দিচ্ছে। তাই মনঃসংযমের উপর স্বামী গহনানন্দজী গুরুত্ব আরোপ করতেন। আজকাল ডাক্তার, বিজ্ঞানী সকলেই ধ্যান করার পরামর্শ দেন। স্বামী গহনানন্দজীর মতে প্রজন্মগত দূরত্ব কমিয়ে আনার উপায় শান্ত মন। যেমন সহনশীল, ত্যাগস্বীকারে উন্মুখ এবং অপরের জন্যে ভাবিত, সে মন যে কোন সমস্যার হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দের নিষ্কাম কর্মযোগের একনিষ্ঠ পুজারী-সন্ন্যাসী ছিলেন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। রামকৃষ্ণ সংঘ তাঁকে যে কাজের দায়িত্ব যখন দিয়েছে তখন তিনি তা মনপ্রাণ ঢেলে করেছেন। তাঁর শরণাগতির ভাব সহকর্মীদের মুগ্ধ করেছে। বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে সংযতবাক এই সন্ন্যাসীর মুখে কেউ কোনদিন অপশব্দ শ্রবণ করেননি।

স্বামী গহনানন্দ মহারাজ তাঁর সংঘ জীবনে নানা শাখা কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ সংঘের প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েছেন। পরিশেষে মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁর জীবনের পূজাকে সম্পন্ন করেছেন। সেই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের সকলের প্রতি তাঁর ভালোবাসার অন্ত ছিল না। অথচ তার বাহ্য প্রকাশ কখনও দেখা যেত না। সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী থেকে শুরু করে বৃহত্তর ভক্তসমাজ তাঁর পূত সান্নিধ্যে এসে অপার শান্তি ও আনন্দলাভ করেছেন, মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছেন তাঁর অপরিমেয় প্রীতি।

রামকৃষ্ণ পরিবারের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই তাঁর চরণে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা যেন সর্বদা নিবেদন করতে পারি। স্বামী গহনানন্দ মহারাজ এ-বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। কারণ এই অভ্যাস আমাদের স্মরণ-মননকে বর্ধিত করে এবং জাগতিক বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ হ্রাস করে দেয়।

রামকৃষ্ণ ভাবপ্রবাহ বিস্তারে স্বামী গহনানন্দ মহারাজের অবদান ইতিহাসের সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে। সেই কালজয়ী নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের অঙ্গীভূত সত্ত্বার পরিণতি অমরতা।

স্মৃতি-পটে গহনানন্দজী মহারাজ

স্বামী বিনিশ্চয়ানন্দ

প্রথমেই আত্মসমর্পণ করি এই কারণে যে, প্রবন্ধটি নিছক স্মৃতিচারণ। এতে নেই কোন প্রামাণিক তথ্য। এক কথায় সবই Off the record। কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় সম্পাদক স্বামী তৎপরানন্দজীকে (সোমেশ মহারাজ) যাঁর ঐকান্তিক আগ্রহে এবং অনুরোধে রচনায় প্রয়াসী। সেসঙ্গে আরও বিনম্রচিত্তে স্বীকার করি এই যে, যেহেতু প্রবন্ধটি নিতান্ত স্মৃতিচারণ, তাই স্বাভাবিকভাবেই আত্মশ্লাঘা অবশ্যম্ভাবী। আশা রাখি, পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই এ-বিষয়ে যাঁর উদ্দেশ্যে স্মৃতিচারণ তাঁর মহত্ত্বকেই উপলব্ধি করবেন প্রাবন্ধিককে নয়।

১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের পূজাবকাশের সময় কলকাতার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের একটি শাখা কেন্দ্রে আমি যোগদান করি। পূজ্যপাদ গহনানন্দজী তার কিছুদিন আগে পর্যন্ত ঐ কেন্দ্রের পরিচালন কমিটির সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেছেন এবং তখন তিনি বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রবীণতম সহ-সম্পাদক (তখন সহ-সাধারণ সম্পাদক পদটি ঐ মাসে চিহ্নিত ছিল), সেসঙ্গে কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। পরে অবশ্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তানুযায়ী তিনি আর শাখা কেন্দ্রটির পরিচালন কমিটির সভাপতি থাকলেন না—কিন্তু তখন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক তথা মঠ ও মিশনের প্রবীণতম সহ-সম্পাদক। যাইহোক এর কয়েকমাস পরই আমাকে সঙ্গে করে আশ্রমের সহ-সম্পাদক মহারাজজী সেবাপ্রতিষ্ঠানে নিয়ে এলেন, সংঘে যোগদান করতে হলে আমার অনুপু..... স্বাস্থ্য পরীক্ষা (detailed medical report) করানোর জন্য। একটু ভোর ভোর উঠে শরীর পরীক্ষার জন্য কয়েকটি নমুনা সংগ্রহ করে খালি পেটে সেবাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছালাম সকাল সাড়ে আটটা-নটার সময়। নমুনাগুলি জমা করে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেবাপ্রতিষ্ঠানের সাধু নিবাসের দোতলায় যেখানে সাধুদের খাবার টেবিল চেয়ার পাতা থাকে, যেগুলি এখনও আছে। breakfast-এর জন্য আমরা দুজন এসেছি তখন প্রায় সাড়ে নটার মতো বাজে। এখানেই আমি পূজনীয় গহনানন্দজীকে প্রথম দর্শন করি। উনিও

breakfast-এর জন্য এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে আশ্রমের সহ-সম্পাদক মহারাজজী তাকে প্রণাম করে বললেন, "ও Join করতে চায়—তাই ওকে আজ এনেছি thorough medical Check up করানোর জন্য।" আমিও সঙ্গে সঙ্গে পূজনীয় গহনানন্দজীকে প্রণাম করলাম। উনিও তখন চা-জল খাবারের জন্য পাশেই ওনার নির্ধারিত চেয়ারে বসলেন, পাশে দু-তিনটি ফোনের Cordless রাখা।

ঐ সময় ঐ জায়গায় আমরা তিনজন ছাড়া আর কোন সাধু না থাকায় পূজনীয় মহারাজজী আমাদের আশ্রমের সম্পর্কে নানা খোঁজ খবর নিচ্ছেন। এরই মধ্যে একটি ফোন এল। ধীর স্থির অতি সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় সন্ন্যাসী ততোধিক ধীরভাবে ফোনের উত্তর দিচ্ছেন। যার কিছু কিছু আভাসেই বুঝলাম ফোনটি আমারই medical report সংক্রান্ত বিষয়েই হবে। ফোনটি রেখে ধীরভাবে পূজনীয় মহারাজজী আমাদের আশ্রমের সহ-সম্পাদক মহারাজজীকে বলছেন শুনলাম, "কালীপদ, সবই ঠিক আছে—ওজন মাত্র বিয়াল্লিশ কেজি। ডাক্তারবাবু তাই জিজ্ঞেস করছেন আমার মতামত কি।" বলেই পরক্ষণেই বলছেন, "বলে দিই ঠিক আছে! ওকে ভালো করে খাওয়া দাওয়া করতে বলো।" উনি উত্তর দিলেন, "আপনি তো জানেন মহারাজ, আমাদের খাওয়া দাওয়া যথাযথ ব্যবস্থা থাকে ওতো সবেতেই 'না', 'না' করে—আপনিই ওকে একটু বলে দিন।" পূজনীয় মহারাজ তদুত্তরে আমার দিকে স্নেহ দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, "কি হে—ঠিক আছে তো !" ব্যস, আমার মনে হলো অতি সামান্য দুটি কথা, কিন্তু কত স্নেহ সুধা মাখা ! আমার মুখ থেকে হ্যাঁ বা না কিছুই উত্তর নেই। শুধু মনে মনে বুঝলাম ঐ জন্যই উনি এতো বড় সাধু। কতো বড় দায়িত্ব কিন্তু অতলান্ত স্নেহের বিচ্ছুরণ। এরপর থেকে কত ভাবে কতবার পূজনীয় মহারাজজীর স্নেহ পেয়েছি জান্তে ও অজান্তে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা বাহুল্য যে ঐ শাখা কেন্দ্রটির সঙ্গে মহারাজের যেন আজীবন আত্মিক সম্পর্ক ছিল তা বেশ বোধ হতো। সেবাপ্রতিষ্ঠানের Nurse দের একটি Rural training Centre থাকার কারণেও হতে পারে। এরপর সম্ভবতঃ ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দে পূজনীয় মহারাজজী স্থায়ীভাবেই বেলুড়মঠে থাকতে লাগলেন মঠ ও মিশনের প্রবীণতম সহ-সম্পাদক হিসাবে। এরই মধ্যে ১৯৮৬-র গোড়ার দিকে কোন একদিন নতুন সাধারণ সম্পাদক মহারাজ তিনজন সহ-সম্পাদক মহারাজসহ আমাদের কেন্দ্রে পরিদর্শনে আসছেন। সঙ্গে মহারাজজীও আছেন। আমার তখন আড়াই বছরের মতো আশ্রমে থাকা হয়েছে। স্বভাবতই মঠের বড়রা এসেছেন একটু জড়তা, ভয়, কৌতূহলো মেশানো অবস্থা। দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার ঠিক আগে পূজনীয় মহারাজগণ সকলেই আমাদের আশ্রমের District Library-তে এসেছেন, আমি এখন Children Sec-

tion-এ বেশ কিছুদিন ধরে বসছি, আমাকে দেখে এক সহ-সম্পাদক মহারাজজী আমাকে কিছু আমার নিজের ব্যাপারে ও কাজের ব্যাপারে কথা জিজ্ঞেস করলেন। ওনাদের মধ্য কি কথা হলো জানিনা। আমার প্রতি আদেশ হলো—বিকেলে ওনারা যখন মঠে ফিরবেন আমাকেও ওদের সঙ্গে গাড়ীতে বেলুড়মঠে যেতে হবে। (বলে রাখা নিষ্প্রয়োজন—তখন মঠে খুব বেশি গাড়ী ছিল না, ওনারা একটা কালো রঙের Ambasador-এ করে সকলে মিলে এসেছিলেন এবং ফেরার সময় আমিও ঐ গাড়ীতেই যাচ্ছি। পথে ওনাদের বিক্ষিপ্ত আলোচনায় বুঝলাম আমার পরবর্তী গন্তব্য বেলুড়মঠ নয় সারদাপীঠের শিক্ষণমন্দিরের ছাত্রাবাস। পূজনীয় সনাতনানন্দজী তখন ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ এবং পূজনীয় স্মরণানন্দজী (বর্তমান সংঘাধ্যক্ষ মহারাজজী) তখন সারদাপীঠের অধ্যক্ষ। রাস্তাতে মাঝে মধ্যেই ওনারা আমাকে কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করছিলেন, যেগুলির উত্তর আমি যতটা না দিয়েছি পূজনীয় গহনানন্দজীই আমার হয়ে ওঁদের উত্তরগুলি দিচ্ছিলেন। ভাবলাম আমি নবাগত কী প্রশ্নের কী উত্তর দিয়ে ফেলব, তাই মহারাজজী স্নেহশীলা মাতার মতোই তাঁর সন্তানকে রক্ষা করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন। বলে রাখা ভাল, তখন সাধারণ সম্পাদক পদে আছেন পূজনীয় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ এবং তিনি নিজেও ঐ দলে আছেন।

যাইহোক শিক্ষণ মন্দিরে প্রশিক্ষণ শেষে কিছুদিন নিজ কেন্দ্রে অতিবাহিত করে (১৯৮৮ এপ্রিল থেকে ১৯৯০ মার্চ) ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যখন আছি তখন পূজনীয় মহারাজজী মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক (১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত)। ১৯৯০ এর ফেব্রুয়ারীতে আমার নিজ কেন্দ্রের নতুন মন্দির উদ্বোধনের সময় আসন্ন হঠাৎ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ফোন এল পূজনীয় মহারাজজী আমাদের (ঐ কেন্দ্রের দু-জন ব্রহ্মচারী আমরা একসাথে ছিলাম) মিশন অফিসে ডাকছেন। যেতে না যেতেই সব ঠিকঠাক, পূজনীয় মহারাজজী আমাদের দুজনকে বলছেন, ...তোমরা দুজন তোমাদের কেন্দ্রের আসন্ন মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানের জন্য ঐ কেন্দ্রে কালই যাবে অনুষ্ঠান শেষে আবার যথাসময়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ফিরবে ইত্যাদি। মনে মনে কী আনন্দ! যেন মেঘ না জমতেই বৃষ্টি। মনে মনে ভাবলাম, মহারাজ আমাদের জন্য কত ভাবেন! এর কিছুদিন পর মার্চ ১৯৯০ এর শেষের দিকে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ব্রহ্মচারীদের Posting হয়ে যাবে—কত ভালো, কৌতূহলো, জল্পনা-কল্পনার অবসান হলো। এক বিকেলে পূজনীয় মহারাজজী আবার মিশন অফিসে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারীদের ডেকেছেন। যথাসময়ে যাওয়া হলো। কিছুক্ষণ পর মহারাজজী আমাদের Posting ঘোষণা শুরু করলেন। দু জোড়া ব্রহ্মচারীর নামের পরই আমাদের দুজনের নাম ঘোষিত হলো। "... তোমরা তোমাদের নিজ কেন্দ্রে ফিরে যাবে।" এও যেন এক স্নেহাশ্রিতের প্রতি আদেশ মনে হলো।

ক্রমে ১৯৯২ খ্রীঃ পূজনীয় মহারাজজী সঙ্ঘের সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ হয়ে কলকাতার কাঁকুড়গাছির 'যোগোদ্যান' কেন্দ্রে চলে গেলেন। আমাদেরও বেলুড় মঠে যাতায়াত থাকলেও যোগদ্যানে তেমন যাওয়া হয়ে উঠছে না। এমতাবস্থায় ১৯৯২ এর শ্রীশ্রী দুর্গাপূজার পর যোগোদ্যান মঠেই পূজনীয় মহারাজজীকে শ্রীশ্রী বিজয়ার প্রণাম জানাতে গেলাম। দুপুরে প্রসাদ পাবার পর মহারাজজী সমস্ত ভক্তদের প্রণাম নিচ্ছেন। আমিও ঐ সময় ঐখানে রয়েছি। ভক্তগণ মহারাজজীকে প্রণাম করে অনেকেই জিজ্ঞাসা করছেন—"মহারাজ, আপনার খাওয়া হয়েছে?" মহারাজ প্রতিজনকেই শান্তভাবে উত্তর দিচ্ছেন—"হ্যাঁ, প্রসাদ পেয়েছি। তোমরা প্রসাদ পেয়েছ?" 'প্রসাদ' কথাটিতে মহারাজ ধীরে অথচ বেশ জোরের সঙ্গে বলছেন। পরে ভক্তরা প্রণাম করে বিদায় নিলে মহারাজ আমাদের সমবেতদের উদ্দেশ্যে বললেন—"দেখছ, এই আমাদের (গুরুদেব) অবস্থা!" যতবার ওরা খাওয়া হয়েছে বলছেন ততবারই সংশোধন করতে হচ্ছে—"প্রসাদ পেয়েছি" বলে। এখানে লক্ষণীয় এই যে ভক্তরা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ পেলেন এইটি মহারাজ জনে জনে সংশোধন করে বলছেন তাদের কল্যানের জন্য কিন্তু কোন বিরক্তি প্রকাশ নেই। দীক্ষাদান কালেও মহারাজজীর এরূপ ব্যবহার প্রকাশ পেত। এক একদিনে প্রায় দুশোজন দীক্ষার্থী প্রত্যেককেই পৃথক পৃথকভাবে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে তবে ছাড়ছেন। নেই কোন ধৈর্যচ্যুতি বা বিরক্তির প্রকাশ। গুরু যে তিনি! এইভাবে হয়তো সারাটাদিন কাটছে পরদিনেই আবার দীক্ষা অথবা স্থানান্তরে গমন, নির্দ্বিধায় এবং নিরলসভাবে ভক্তদের এইভাবে কল্যাণ করে গেছেন।

এর কিছুদিন পর বাংলার বাইরে চলে যাওয়ায় পূজনীয় মহারাজকে আর তেমনভাবে পাইনি। মহারাজজীও দীক্ষার কাজে নানা স্থানে যাচ্ছেন। বহুদিন তেমন ঘনিষ্টভাবে সাক্ষাৎকার হয়নি। এবং ঐ সময়ে যে কেন্দ্রে আমি ছিলাম সে কবছর পূজনীয় মহারাজজীও যাননি। ফিরে এসেও আরও দূরত্ব বাড়তে থাকল। বেশ দীর্ঘ কয়েক বছর পর ২০০৫ খ্রীঃ মহারাজজী যখন সঙ্ঘাধ্যক্ষ পদে আসীন খুব অল্প সময়ের জন্য দু-একবার দর্শন করেছি। তবে তেমন কোন ঘনিষ্টভাবে তাঁর সঙ্গ করার সুযোগ হয়নি। কিন্তু ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিলের একটি ঘটনা আমাকে মহারাজজীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ এবং তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। যদিও ঘটনাটি খুব সামান্য তবুও এখানে তার উল্লেখ করা হলো—শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি পূজা ও সাধারণ উৎসবের পরে বেলুড়মঠের দুজন সাধুর সঙ্গে আমি দুমাসের জন্য দক্ষিণভারত তীর্থগুলিতে যাচ্ছি। ট্রেনেই যাচ্ছি। ওনারা হাওড়া স্টেশনে উঠেছেন। আমার খড়্গপুরে ওঠার কথা। সেমতোই ব্যবস্থা হলো। যখন ট্রেনে সবাই এক জায়গায় হলোম মঠের দুসাধুর একজন হঠাৎ একটি প্যাকেট বের করে আমাকে বললেন, "এটা পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ তোমার জন্য পাঠিয়েছেন।" যেহেতু ওনারা মঠ থেকে আসছেন তাই ওনাদের সঙ্গে খাবার দাবারের

প্যাকেট, এমনকি অপরাপর সাধুদের দেওয়া প্রণামীর প্যাকেটও ছিল দেখলাম। কিন্তু প্রেসিডেন্ট মহারাজের আমাকে পাঠানো প্যাকেট ঠিক সেধরণের নয়! কৌতূহলী হয়ে সেখানেই প্যাকেটটি খুলে যা দেখলাম—পূজনীয় মহারাজজী আমার শরীরের কথা ভেবে (যদিও দক্ষিণ ভারত মূলত গরমের জায়গা) প্যাকেটের মধ্যে ছোট একটি হালকা গোলাপি রঙের উলের টুপি, একটি কাশ্মিরী শালের মাফলার (যেমনটি ওনার কোন কোন ফোটোতে গলায় দেওয়া দেখা যায়) এবং একটু খুব পাতলা অথচ Pure wool এর ফুল গেঞ্জী ঐ প্যাকেটে প্রসাদী হিসেবে আমাকে পাঠিয়েছেন। বুঝলাম সঙ্ঘগুরু শুধু আমাদের গুরুই নয়, তিনি পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং আরো কিছু যা আমরা জানিনা বা অনেকে বুঝতেও পারি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফিরে এসে মহারাজকে আর সুস্থাবস্থায় দর্শন করতে পারিনি। সুযোগ পেয়ে একেবারে সেবাপ্রতিষ্ঠানে দর্শন ও প্রণাম তাও দরজার কাঁচের ফাঁক দিয়ে। তাঁর লালিত পালিত সাধের সেবা প্রতিষ্ঠানের কোলে তখন তিনি যেন নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নিচ্ছেন। অতি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে এলাম।

এরপর এল সেই সময় ২০০৭ এর শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার কদিন আগে। তখন আমি পূজাবকাশে কয়েকদিনের জন্য জামতাড়া, দেওঘর, পাটনা, ছাপরা এবং মজফ্ফরপুর যাত্রায় আছি। সেদিন সন্ধ্যায় পাটনা আশ্রমের চিকিৎসালয়ের বর্ধিত কিছু অংশের শুভ উদ্বোধন হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত সরকারী বিশিষ্ট জনেরও অনুষ্ঠানের জন্য উপস্থিত আছেন। এমতাবস্থায় তৎকালীন আশ্রমাধ্যক্ষ (পূজনীয় কার্তিক মহারাজ) কানে কানে বললেন— "এইমাত্র খবর এল পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজজীর জীবনাবসান হয়েছে তাঁর আদরের সেবা প্রতিষ্ঠানের কোলে।" যখন ফিরলাম ততদিনে সবই শেষ।

পরিশেষে বলতেই হয় পূজনীয় মহারাজজীর জীবিতকালের দুটি উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা যা সকলেই স্বীকার করবেন। একটি তাঁর অধ্যক্ষতায় কলকাতার শিশুমঙ্গল থেকে সেবাপ্রতিষ্ঠানের উত্তরণ অপরটি তাঁর সাধারণ সম্পাদককালে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের যাত্রা এবং বিস্তার। শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা এবং স্বামী বিবেকানন্দ ভাবধারায় বেলুড় মঠের অনধিনস্থ বহু আশ্রমকে একসূত্রে গ্রন্থনা তথা পরিচালনার পর প্রায় ত্রিশ বছরের এই ভাবপ্রচার পরিষদের ভূমিকা আজ অনস্বীকার্য। যার উৎগাতা ছিলেন স্বামী গহনানন্দ মহারাজ। এছাড়াও লক্ষাধিক ভক্তগণকে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর, মা এবং স্বামীজির চরণে উৎসর্গ করে তাঁদেরকে ধন্য করেছেন। কারণ তিনি নিজেও যে—'স্বামী গহনানন্দ এক উৎসর্গীকৃত জীবন'।

গুরুর ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ!

স্বামী সুবিজ্ঞেয়ানন্দ

আমি স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল বদোদরাতে আছি। আমি 1985 রামকৃষ্ণ সংঘের হেডকোয়ার্টার বেলুড় মঠ এখানে জয়েন করেছিলাম ওই সময়ে স্বামী হিরণময়ানন্দ জি মহারাজ জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ছিলেন। আত্মস্থানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী নিত্যানন্দজী মহারাজ ও সেক্রেটারি ছিলেন ওই সময় থেকেই গহনানন্দজী মহারাজের সঙ্গে আমার পরিচিতি হয়েছে! উনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি! ওই সময় উনার মারগদর্ষণ আধ্যাত্মিক সাধন-ভজন সম্পর্কে কিছু কথা যা আমার এখন মনে আছে সে আপনাদের সামনে প্রস্তুত করার চেষ্টা করছি ! স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ওই সময়ে আমাদের পোস্টিং দেখতেন। হেডকোয়ার্টার্স থেকে সাধু ব্রহ্মচারীদের সারা ভারতে যে বিবিধ শাখা কেন্দ্র আছে ওখানে সাধু ব্রহ্মচারীদের কর্মী হিসেবে পাঠানো হতো। স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের এই দায়িত্বটা ওই সময়ে বহন করেছিলেন তখন আমার পোস্টিং চেন্নাই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম টি-নগর এই শাখা কেন্দ্রে হয়েছিল। বেলুড় মঠ থেকে যখন চেন্নাইতে বনান— হওয়ার আগে আমি খুঁজে নিয়ে মহারাজকে যখন প্রণাম করতে গেলাম তখন তিনি বিশেষ করে আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন কি -"দেখো রাজেন! যে সেন্টারে তোমাকে আমি পাঠাচ্ছি ওই সেন্টারে প্রচুর কাজ করতে হবে ! ওই সেন্টারে তুমি একা ব্রহ্মচারী ! তোমার সঙ্গে অন্য কেউ ব্রহ্মচারী নেই ! ওখানে শুধু তোমার মোহন্ত মহারাজ আছেন ! ওনার সঙ্গে উনি যেভাবে বলবেন যে কাজ বলবেন সেই কাজ শ্রীশ্রী ঠাকুর আমাকে আদেশ দিচ্ছেন এই ভাওতা মনে রেখে সেই কাজ নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা তোমাকে করতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ, ঠাকুরের সেবা এই নিখুঁতভাবে ঠাকুরের কাজ করা সেবা করা এটা কিন্তু আমাদের সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। যেমন আমরা নিয়মিত গ্রুপে সাধন ভজন করি

যোগদান করি সেইরকমই আমাদের এই সেবাকাজ আমার চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়ে আমাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি হওয়ার জন্য সাহায্য করে। এই কথা এই বিচার সবসময় মনে যেন জাগ্রত থাকে। দেখো স্বামীজি চেয়েছিলেন আমাদের প্রত্যেক সাধু ব্রহ্মচারীদের মধ্যে জ্ঞানযোগ কর্মযোগ ভক্তিযোগ অভিযোগের সময় যেন থাকে। আর এই সব যৌগের সমন্বয়ে এক সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হিসাবে আমাদের চরিত্র আমাদের ব্যক্তিগত যেন গড়ে ওঠে! সেই জন্য তোমাকে বলছি কি তুমি যখন টি নগরে যাবে তোমার মোহন্ত মহারাজ এর অর্থ সেন্টার তোমাকে যে যে কাজ বলবে প্রত্যেকটি কাজ ঠাকুরের ইচ্ছে এই ভাবটা নিয়ে তুমি আনন্দে করো। দেখবে প্রচুর আনন্দ পাবে। আর তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হওয়ার জন্য সাহায্য পাবে। "শ্রী পরমপূজ্যপাদ গহনানন্দজীর অমূল্য ধন সারা জীবন ধরে আমি পালন করে চলেছি। যখন আমি চেন্নাইতে টি নগরে ছিলাম অনেকগুলো কাজ আমাকে করতে হতো। ওখানে হস্টেলে 125 ছেলে প্র্যাকটিক্যালি দেখতে গেলে কেজি থেকে আরম্ভ করে বার্বি অবধি 125 ছাত্র ছিল। ছোট ছোট বাচ্চারা পড়াশোনা করত। যারা 4-5 বছরের বয়স ওদের সকলকে প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন ছিল সকলকেই একটু মমতা, একটু ভালোবাসা নিয়ে সকলের দেখাশুনা করতে হতো। হোস্টেলের অ্যাকাউন্ট দেখতে হতো। কম্পিউটার সেন্টারে জব দেখতে হতো আরও অন্য কিছু থাকতো। দেখা গেলে বলতে গেলে সকাল থেকে সারাদিন রাত্রে এগারো টা অবধি সারাদিন কোথায় কাজে কর্মে চলে যেত আমি বুঝতেই পারতাম না কিন্তু তার পরিণাম এমন হয়েছে যে আমি খুব করে জপ ধ্যান করতে পারতাম না। যাই হোক কিছু কাজের জন্য পরমপূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠ থেকে চেন্নাই এসেছিলেন সম্ভবত এই ঘটনা 1987 সনের। মহারাজকে দর্শন করতে আমি মাইলাপুর চেন্নাই মঠে গিয়েছিলাম। ওখানে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ যিনি ভাইস-প্রেসিডেন্ট মহাপুরুষ মহারাজের শিষ্য ছিলেন। পরমপূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজ আমাকে উনার ঘরে ডেকে নিলেন আর একান্তে উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী প্রতিদিন জপ করি?

যখন উনি এই প্রশ্নটা করলেন আমার খুব লজ্জা হলো আর আমি কিছুই উত্তর না দিয়ে শুধু আমার ঘাড়টা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলাম। এই চুপচাপ প্রতিমার মতো বসার দেখা আমার মনের ভাবটা বুঝে গেলে আর আমাকে বললেন কি "দেখরে ! শ্রীশ্রীমা আমাদের 15 হাজার, বিশ হাজার এরকম একটি বড় সংখ্যাটি যোগ করতে বলেছে। শ্রীশ্রীমা নিজেও করতেন আর শ্রীশ্রীমা তো অনেকগুলো কাজ করতেও ওই এতগুলো যে উনি সহজেই করে নিতেন! অবশ্যই মাকে যে সহজ হতো সে তোমাকে আর আমাকে তো সহযোগিতায় হবেনা কিন্তু আমাদের এই প্রয়াস সবসময় যেন থাকে

আমি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা নিয়ে জপ নিশ্চিতভাবে যেন করি। তুমি আমাকে কথা দাও, তুমি নিশ্চিতভাবে প্রতিদিন মিনিমাম দশটি মালা জপ নিশ্চিত করবে। সকালে করবে, রাত্রে করবে। যেমন তোমার সময় হবে। কিন্তু সারা দিনে দুবার করে মিনিমাম দশটি মালা জপ তোমাকে করতে হবে। আমাকে কথা দিতে হবে। "মহারাজ এমনভাবে জোর দিয়ে এই কথাটা বললেন আমি আর না বলতে পারলাম না। উনাকে আমি কথা দিলাম আর তারপর থেকে আমি নিয়মিত ভাবে যতই কম সময় আমার কাছে থাক, যতই আমার কাজ থাকুক না কেন,আমার যতই কষ্ট হোক কিন্তু আমি মহারাজকে যা কথা দিয়েছিলাম সেই কথা রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেলাম। আর আস্তে আস্তে মহারাজ যেমনটি আমাকে বললেন একটু একটু করে আমি আমার জপটা বাড়িয়ে দিলাম মানে প্রথম যেমনটি মহারাজ বললেন মিনিমাম দশটি মালা যোগ করতে হবে তারপরে ধীরে ধীরে 11 করলাম 12 করলাম এই করতে করতে আমি সংক্ষেপে বাড়াতে লাগলাম তো দেখলাম মহারাজ আমার দ্বারা এইভাবে জপ ধ্যান করার একটা খুবই সুন্দর উপায় যেন আমাকে বলে গেলেন। আমি যখন টিসিতে গেলাম তখন উনি যেন জনরল সেক্রেটারি হয়েছেন। উনাকে যখন প্রণাম করতে গেলাম তখন আবার উনি আমাকে একা উনার অফিসে ডাকলেন আর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—"গত তিন বছর ধরে টি নগরে তুমি আমাকে যেমন কথা দিয়েছিলে সেই কথা কি তুমি ঠিকভাবে পালন করছো ? আমি বললাম হ্যাঁ, আমি আপনাকে যেমনটি কথা দিয়েছিলাম তেমনটি আমি পালন করেছি। আর জপ সংখ্যায় একটু একটু করিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছি।" আমার কথা শুনে মহারাজ ভারী প্রসন্ন হলেন। খুব প্রসন্ন হাসি। আর তারপরে আমাকে বললেন—"দেখলে তো কাজ! কাজ! কাজ! ঠাকুরের কাজ তো আমাদের সকলকেই করতে হয় কিন্তু ওর সঙ্গেই এই জপ ধ্যান, সাধন-ভজন এটাই করতে হয়। আর যদি ইচ্ছে থাকে সবকিছু সম্ভব হয়। ভেড়ভেড়ী জেবিল বেরিয়ে যাবে। আর দেখো এই যে তুমি কথা বললে আমি একটু একটু করে যত সংখ্যা দাঁড়িয়েছে! এটা কেন হলো বলতো কি করে এই সম্ভব হলো ? তখন তো তুমি কিছুই করার সাহস পেতেন না, তখন তোমার মনে হতো কি জপ টা কি করে করব ? সময় কোথায় ? দেখো এই যোগ করতে করতে তোমার অন্তঃকরণে শ্রী শ্রী ঠাকুরের কৃপাতে জপের প্রতি একটা ভালোবাসার জন্মটা হয়েছে! ভেতরে ভেতরে জপের প্রতি রুচি হয়েছে! জপ প্রতি এই যে রুচি হয়েছে এই রুচি তোমাকে জপ বাড়াবার জন্য প্রেরণা দিয়েছে! দেখো এই ভাবেই আমরা আমাদের সিনিয়র সাধুদের কাছ থেকে শিখেছি!" দেখুন কি সুন্দর কথা! পরমপূজ্যপাদ মহারাজের এই কথা আজও আমার কানে গুনগুন করে। আজও আমার এখনই অনেক বয়স হয়ে যাচ্ছে আর আগের মতো শরীর সুস্থ

নয় কিন্তু ঠাকুরের নামের প্রতি রুচি- এই ঠাকুরের বিশেষ করে কৃপা, আর তার সঙ্গে আমি মনে করি সেটি শ্রী গুরু মহারাজ !আর পরমপূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদে এটা সম্ভব হয়েছে।

আমি বেলুড় মঠের ট্রেনিং সেন্টারের পড়ে মিশন অফিসে আমার পোস্টিং হলো। আমি কম্পিউটার সেকশনে ডাটা ফ্রি লিঙ্গের কাজটা করতাম। সারা দিন ওই কাজে আমার চলে যেত। কিন্তু এই যে নির্দিষ্ট জপ করার যে অভ্যাসটা তিন বছর ধরে আমি পালন করেছিলাম তার ফলেই বেলুড়মঠে ও ডাটা শৃঙ্গের কাজের সকাল সাতটা থেকে অনেক রাত্রে দশটা অবধি আমাকে ডাটা ফ্রিংয়ের কাজ করতে হতো কিন্তু তার মধ্যেও আমি এই ঠাকুরের জপ নিয়মিতভাবে করতে পেতাম !

পরমপূজ্য গহনানন্দজী আমাকে আরেকটি জিনিস বলেছিলেন। সেটা হলো উনি বললেন, “ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করো! শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আলাপ করো! ঠাকুর, মা শুধু ফটো নেই ওই ফটোর আঁধারে শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজি ওই স্থানে সাক্ষাৎ বিরাজমান থাকেন! তোমার মনের মধ্যে যা কিছু আসবে সবকিছু ঠাকুর কে জানাতে হবে! উদাহরণ অর্থ মনে করো তুমি বাজারে যাচ্ছ বাজার করতে গিয়ে সবজি কিনতে গিয়েছো, ওখানে ঘুরে ঘুরে সব বাজার দেখলে সবজির দাম দেখলে তরিতরকারি কেনাকাটি হয়ে গেল। ফিরে যাওয়ার আগেও ঠাকুরকে নিবেদন করে যাবে কি ‘ঠাকুর, আমি সবজি বাজারে যাচ্ছি’, আর যখন কেনাকাটি হয়ে ফিরে আসবে তখনও আসার পরে ঠাকুরকে গিয়ে নিবেদন করবে, খবর দেবে “ঠাকুর আমি বাজার থেকে ফিরে এসেছি আর বাজারে কি কি দেখেছ সব কিছু খুঁটিনাটি কথা সবকিছু ঠাকুরকে কিন্তু জানিয়ে দিও। শ্রীশ্রীমাকে জানিয়ে দিও। দেখো এইভাবে যখন আমরা শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে সাক্ষাৎ জীবন্ত হয়ে বসে আছেন এইভাবে উনার সঙ্গে আলাপ করি সব খবরা খবর দি তখন তুমি দেখবে তোমার ভেতরে আসতে আসতে এইযে ঠাকুরের উপস্থিতি, শ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমা এই ভাবটা যেন ঝলঝল করে সব সময় জাগ্রত হয়ে থাকবে। আমরা সাধু, আমি ভগবানের সঙ্গে আছি ভগবান আমার সাথে আছে আমার পাশে আছে ভগবান শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে দেখছেন আমার প্রত্যেকটি কাজ উনি দেখছেন আমি কিভাবে কাজটা করছি আমার মনের মধ্যে কেমন করে কি কি বিচার আসছে যাচ্ছে, দেখো এই যে ঠাকুরমা এখানে সাক্ষাৎ উপস্থিত আছে এই বোধ গুলি তোমাদের ভেতর কোন আজেবাজে বিচার আসতে দেবে না। মনের মধ্যে কোন আজেবাজে ফালতু বিচারই নেই। সব সময় ভগবদ্গীতা তাহলে তার পরিণাম চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলেই আমরা আত্মোন্নতির দিকে এগোতে পারি !"

পরমপূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজ আমাকে এই যে দুইটি অমুল্য উপদেশ দিলেন এটাতো যেন আমাদের জীবনের একটি অমূল্য ধন হয়ে আছে। আমি আজকে নিশ্চিতভাবে এটা বলতে পারি কি আমি তখন থেকে এই প্রায় তিরিশ বছর তার থেকে বেশি হয়ে গেল কিন্তু অন্তরে অন্তরে সবসময় যেন এই সরস্বতী নদীর মতো এই ঠাকুর আছে মা আছেন উনি আমার সঙ্গে আছেন এই ভাবটা সত্য প্রবাহমান হয়ে আছে। আমি আজকে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি যা কিছু জানি না, আমি খুবই সামান্য মানুষ একজন সাধারন সাধু কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে আমি আছি। ঠাকুর আমার সঙ্গে আছে। এই ভাব আমার অন্তঃকরণে যে দৃঢ়ভাবে আছে তার পেছনে পরমপূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজের অমূল্য উপদেশ আছে! তার সঙ্গে আমার দীক্ষাগুরু পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী ও আমাকে সব সময় এই সাধন-ভজন আর এই সাধু জীবন-যাপন করতে সাহায্য করে চলছে।

2003 সালে আমার পোস্টিং পুনাতে হয়েছিল পরমপূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজ আমি যতটা জানি প্রায় 12 13 বার উনি পুনাতে এসেছিলেন আর দীক্ষার আয়োজন হয়েছিল। 2005 সালের ঘটনা টা বলছি, দীক্ষা হয়ে গেল। মহারাজ বেলুড় মঠে সরি কাঁকুড়গাছি তে ফিরে যাবেন তার একদিন আগে রাত্রে আমরা সব সাধু ব্রহ্মচারী উনার ঘরে সম্মিলিত হয়েছিলাম। সপ্তর্ষি মহারাজ আমাদের সকলকে দেওয়ার জন্য ওখানে ধুতি রেখেছিলেন। পরম পূজ্য গহনানন্দজী মহারাজ এসে বসলেন। মহারাজ তখন উনাদের অধ্যক্ষ উনিও ছেড়ে এসে বসেছেন। আমরা সাধু ব্রহ্মচারী সবাই মাটিতে বসে পরলাম। প্রথম কথামৃত পাঠ হলো, কথামৃত পাঠ হওয়ার পরে ধুতি বিতরণের প্রোগ্রামটা শুরু হলো। সপ্তর্ষি মহারাজ এক একটি ধুতি মহারাজের হাতে ধরে দিতেন আর আমরা মহারাজের কাছ থেকে ধুতি গ্রহণ করতাম। তো প্রথম সপ্তর্ষি মহারাজ একটা ধুতি পরমপূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজের হাতে দিলেন আর বললেন মহারাজ বৌমানন্দজী মহারাজ কে দিয়ে দিন। মামানন্দ জি মহারাজ একটুও হাত বাড়ালেন। মহারাজ ধুতি খুলে দেখলেন। আপনারা হয়তো জানেন ধুতির উপর অনেকবার কিছু নাম লেখা থাকে তার পরিণতি, এর কোয়ালিটি, কোম্পানির নাম এইসব কিছু লেখা থাকে। তো বৌমানন্দজী মহারাজ কে যে ধুতি মহারাজ দেবেন সেই খুলে উনি দেখলেন ওর উপরে লেখা ছিল 'প্রেসিডেন্ট ধুতি' দেখে উনি বললেন কি "ওহো! প্রেসিডেন্টকে প্রেসিডেন্ট!" ওই কথা শুনে বৌমানন্দজী মহারাজ বললেন- "মহারাজ আপনি সংঘের প্রেসিডেন্ট আর আমি এই শাখা কেন্দ্রের প্রেসিডেন্ট!" মহারাজ হাসলেন আর বললেন "হ্যাঁ আমি ঠাকুরের প্রতিনিধি! দয়াকরে ঠাকুর আশ্রয় নিয়েছেন সেই জন্য আমি আছি!" আমরা তো এই কথা শুনে অবাক হয়ে গেছি। রামকৃষ্ণ সংঘের প্রেসিডেন্ট-সংঘের অধ্যক্ষ

মহারাজ নম্রভাবেই কথাটা বলছেন ঠাকুর আমাকে এই পথে বসিয়েছে নামিয়ে তার চরণে আশ্রিত দয়াকরে ঠাকুর আসলেই দিয়েছেন! ভূতেশানন্দজী মহারাজ কে দেখেছি, গহনানন্দ মহারাজ কে দেখেছি, আমরা দেখেছি কি সত্যিই যারা আধ্যাত্মিক পথেতে উন্নতি করে -কিরকম কত বিনয় হতে পারে তাকে এই সাক্ষাৎ ভাবে দেখেছে বলে ভেতরে কি যে আনন্দ আর আমরা জানি যে শাস্ত্র বর্ণনা আর আমাদের সংঘগুরু-এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তারপরে আমার নম্বর এল। আমি মহারাজ কে প্রণাম করলাম। সপ্তর্ষি মহারাজ আরেকটি ধুতির হাতে ধরিয়ে দিল। ধুতি খুলে দেখলেন তার উপর লেখা ছিল 'পরম সুখ' ওরকম লেখা দেখে মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন - "রাজেন, ভগবত প্রাপ্তিতেই পরম সুখ পাওয়া যায়। ভগবত প্রাপ্তিই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।" এই কথা বলে আমাকে ওই ধুতিটা ধরিয়ে দিলেন। তারপরে অজয় মহারাজের নম্বর এল। যে ধুতি দেওয়া হচ্ছে ওর উপর লেখা ছিল 'সোলজার' তখন মহারাজ বললেন "অজয়,মনে রেখো আমরা সব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সোলজার! শ্রীশ্রী ঠাকুর-স্বামীজির সোলজার! আমাদের যুদ্ধ করতে হয়! এই যুদ্ধ কার সঙ্গে? যুদ্ধ করতে হয় আমাদের ভেতরে ভেতরে যে কুসংস্কার আছে তার যে প্রভাব আমার উপর ছড়াচ্ছে ওর সঙ্গে যুদ্ধ। সুন্দর আধ্যাত্মিক সংস্কার যেন আমাদের ভেতরে গড়ে ওঠে। এই সংঘর্ষ আমাদের সকলকে করতে হয়। এই আন্তরিক যুদ্ধ হৃদয়ের ভেতর সংগ্রাম সব সময় চলছে। এই যুদ্ধে আমরা শ্রী শ্রী ঠাকুরের সোলজার। তারপরে আরেকজন মহারাজ প্রণাম করলেন। অনুভূতি দেবার কথা ধুতি খুলে দেখলেন তার উপর নাম লেখা ছিল 'victory!' তখন মহারাজ হাসতে হাসতে ওই ব্রহ্মচারীকে বললেন "দেখো নিয়ম করে আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের উপর জয় করা! কঠোপনিষদ এর কথা মনে আছে? দেখো কঠউপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে নানা প্রলোভন দেখাচ্ছে কিন্তু কোনটাই প্রলোভন নচিকেতাকে প্রভাবিত করতে পারলো না ! তুমি ব্রহ্মচারী,সাধু হতে এসেছো, ভবিষ্যতে তোমার সন্ন্যাস হবে। দেখো আমাদের সকলকে এই নচিকেতার মতো আস্তিক্য বুদ্ধি শুয়ে তোর মতো জিজ্ঞাসা - এইসব ভেতরে জাগ্রত রাখতে হয়। আর যতগুলি প্রলোভন আমার জীবনে আসতে পারে সকল থেকে আমরা যেন জয় করতে পারি। দেখো এই জগতে নানা প্রলোভন আমাদের আশেপাশে সব সময় থাকতে পারে, থাকবেই। কিন্তু নচিকেতার মতো সেই প্রলোভন যেন আমাদের উপর কোন প্রভাব না রাখে এই জন্য আমাদের সব সময় সচেতন থাকতে হয়। ভিকট্রি! ভিকট্রি! ভিকট্রি!" এইভাবে মহারাজ সামান্য একটি কথা একটি শব্দ ধরে এত সুন্দর ব্যাখ্যা করে আমাদের সকলকে পুরনো আধ্যাত্মিক তত্ত্ব গুলি, সিদ্ধান্তগুলি সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিলেন এইসব ঘটনা আজও আমার মনে খুবই সুস্পষ্টভাবে জাগ্রত আছে।

গুরু সত্যিই কি ওর এক উদাহরণ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সংঘগুরু অধ্যক্ষ তারমানে শ্রীশ্রীঠাকুরের উনি প্রতিনিধি। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিনিধি পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ যখন পুনে রামকৃষ্ণ মঠে এসেছিলেন মন্ত্র দীক্ষার আয়োজন ছিল। সকালে প্রায় সাড়ে আটটার সময় সব দীক্ষার্থী ঘরে ঘরে রেডি হয়ে বসে আছেন !পরমপূজ্যপাদ গহনানন্দজীর একটা নিয়ম ছিল দীক্ষা গ্রহের জন্য বসার আগে উনি গর্ভ মন্দিরে প্রবেশ করে ঠাকুরের মায়ের স্বামীজির শ্রীচরণে অর্ঘ্য প্রদান করতেন। অর্ঘ্য প্রদান করার আগে উনি আমাদের থেকে জেনে নিতেন কত দীক্ষার্থী আছে আর এই নম্বর টা শোনার পরেই উনি শ্রীশ্রীমা, ঠাকুর আর স্বামীজির চরণে অর্ঘ্য প্রদান করতেন। ঐদিনও এরকমই হয়েছিল গর্ভ মন্দিরে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, উত্তর দিলাম মহারাজ দীক্ষার্থী 93। উনি বললেন ঠিক আছে। তারপরে ঠাকুরকে অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। আর আমরা ওনাকে নিয়ে শিবানন্দ সভাগৃহে যেখানে দীক্ষার আয়োজন ছিল ওখানে আমরা পৌছে গেলাম। উনি দীক্ষা গৃহে প্রবেশ করতেই সকল দীক্ষার্থী এক নজরে দেখলে চেয়ারে বসতেই উনি আমাকে ডাকলেন। আর আবার জিজ্ঞেস করলেন কত দীক্ষার্থী? যখন আমি বললাম 93 তখন উনি বললেন "না ! ভালো করে গোনো ! ভালো করে গোনো ! এই কথা বলে মনি চোখ বন্ধ করে চুপ করে রইলেন আর জপ করা শুরু করলেন। উনার আদেশ অনুসারে আমরাও দীক্ষার্থী গণনা করা শুরু করলাম! আর আশ্চর্য ব্যাপার! আমরা দীক্ষার্থী যখন গুনে দেখলাম তখন দীক্ষার্থী ছিল 95 !আমরা তো অবাক হয়ে গেলাম! কি করে দুজন বেশি ? সকলকে জিজ্ঞেস করা হলো, কেউ আর হাত তুলছে না! শেষের দিকে দীক্ষার ফর্মটা আর দীক্ষার লিস্ট টা এনে প্রত্যেকেরই নাম ডাকা হলো আর যে দুজন এক্সট্রা প্রবেশ করেছিল ওদেরকে বার করা হলো! কিন্তু আমরা আশ্চর্য এই জন্যই বলছি কি পরমপূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজ প্রবেশ করতেই শুধু একনজর দিয়ে জারা দীক্ষার্থী ছিল ওদের দিকে দেখলেন মাত্র আর আমাকে ডেকে বললেন দীক্ষার্থী কত এটি কি আশ্চর্যের ব্যাপার নয় আমার মনে হয় এখানেই শ্রী শ্রী ঠাকুরের যে শক্তি রামকৃষ্ণ-সংঘের যে প্রেসিডেন্ট ভেতরে সব সময় সচেতন রয়েছে তারা যেন এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই রকম ঘটনা হয়তো অনেকেই অনেক সময় ঘটেছে! আমার জানা নেই কিন্তু যখন এই ঘটনা দেখলাম তখনই মনে মনে বুঝে গেলাম সংঘ গুরু-গুরু শক্তি-তার প্রভাব তাঁর সামর্থ্য যে অত্যন্ত অপার মহান তার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। যেন আমার মনের এই ভাবনা সব সময় যেন জীবন্ত থাকে এই জন্যই যেন শেষে ঠাকুর আর পরমপূজ্য গহনানন্দজী মহারাজ দয়া করে এই আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। এইসব কথা যখন মনে পড়ে তখন সত্যিই মন আনন্দে ভরপুর হয়ে যায় আর নিজেকে মনে হয় সত্যিই ঠাকুরের কৃপায় ঠাকুরের কৃপায় ঠাকুরের কৃপা!

বাণীর মূর্ত বিগ্রহ—স্বামী গহনানন্দ মহারাজ

স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দ

একজন মহান মানুষের মহত্বের পরিচয় ফুটে ওঠে তাঁর ছোটখাটো খুঁটিনাটি কাজের মধ্যে। পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দ মহারাজের জীবন দর্শনে—এ কথাটি আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি। আমার এই উপলব্ধি একদিনের নয় দীর্ঘ পনেরো বছরের। মহারাজের সেবক হয়ে যখন তাঁর কাছে থাকতাম, গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতাম তাঁর কাজের ধরণ, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার সবকিছু। আমি আমার সেই মহোপলব্ধির কথাই এখানে তুলে ধরছি।

বেলুড়মঠে ব্রহ্মচারীদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান চলছে, মহারাজের সেখানে ভাষণ আছে। আমার দায়িত্ব ছিল মহারাজকে নিয়ে যাওয়া। আমি মহারাজকে নিয়ে আসতে গেছি। মহারাজ আমাকে দেখেই বললেন, 'হাতে তো বেশি সময় নেই দেখছি, কোন দিকে দিয়ে যাব?' আমি দেখলাম দুদিক দিয়েই যাওয়ার রাস্তা আছে। আবার রাস্তা ছেড়ে লনের মাঝখান দিয়ে যদি কোণাকুণি যাওয়া যায় তাহলে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে। মহারাজ রাস্তা ছেড়ে লনে উঠলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, অনেক সময় বাঁধাধরা পথের বাইরে চলতে হয়। সময় ও পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে ছকে বাঁধা জীবন পথের বাইরে পথ চলাটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় বরং চলাটাই স্বাভাবিক। এই জীবনের এই সহজ সরল ছন্দ আমি আমার সন্ন্যাস জীবনের প্রারম্ভে মহারাজের সংস্পর্শ লাভ করি।

আমি তখন কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান মঠে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সেবক হয়ে আছি। আমার হাত ব্যান্ডেজ করা আছে। এই অবস্থায় আমাকে দেখে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ জানতে চাইলেন কী হয়েছে? আমি বললাম হাতে ইলেকট্রিক শক লেগেছে। এই কথা শুনে মহারাজ বললেন, যখন শক লাগল তখন কি তোমার ঠাকুরের নাম মনে পড়েছিল। আমি ভীষণ লজ্জায় পড়লাম। বললাম, সত্যি বলতে কি মহারাজ আমার তখন ঠাকুরের নাম মনে পড়েনি। আমার এই কথা শুনে

ভূতেশানন্দজী মহারাজ বললেন, তুমি সত্যি বলবে না কি মিথ্যা বলবে? আমি আরও ভীষণ লজ্জায় পড়লাম। মহারাজের সমক্ষে আমার সেদিনের সেই লজ্জা আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছিল বিপদের সময় সবার আগে ঠাকুরকে স্মরণ করা দরকার। তা যদি না করি তবে এ কথা বিস্মৃত হব যে, ঠাকুরই আমাদের পরিত্রাতা, ঠাকুরই আমাদের রক্ষাকর্তা।

মহারাজ এমনিতে কথা খুব কম বলতেন, মূলত মহারাজের জীবন দর্শনই ছিল 'কথা কম কাজ বেশী'। আবার এই কম কথাটাও তিনি এত মিষ্টি করে বলতেন যে, কথাটা শোনার পর মনটা আনন্দে ভরে উঠত। একবার এক জায়গায় মহারাজের প্রণাম চলছে। অনেক ভক্ত সব। মহারাজকে প্রণাম করবেন বলে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে একজন স্বেচ্ছাসেবক ভক্ত যাতে প্রণাম পর্ব সুষ্ঠুভাবে চলে তাই নিজে থেকে লাইন মেনটেন করছেন এবং মহারাজকে প্রণাম করে উঠবার সময় ভক্তদের উদ্দেশ্যে বাহির পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছেন, এই দিক দিয়ে বেরিয়ে যান। মহারাজ বেশ কয়েকবার সেবকটির কথা শুনলেন তারপর তাকে কাছে ডেকে বললেন, বেরিয়ে যান না বলে, বলবে এগিয়ে যান। মহারাজের এই কথাটি শোনার আগে পর্যন্ত আমার ধারণা হয়নি যে, স্বেচ্ছাসেবকের ঐ কথায় ভক্তরা আঘাত পাচ্ছে। কিন্তু মহারাজ বলার পর বুঝতে পারলাম, 'কথাবার্তা বলতে হবে মধুরভাবে'।

মহারাজ সর্বদা হাসিমুখে থাকতেন। কখনোই কোনো পরিস্থিতিতে মহারাজকে বিচলিত হতে দেখিনি। বরং দেখেছি কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে মহারাজ ধীর, স্থির ও শান্তভাবে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করছেন। এ প্রসঙ্গে দুটি ঘটনার কথা খুব মনে পড়ছে। মহারাজ তখন সেবা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে আছেন। হাসপাতালে রোগী ভর্তি করতে এলে রোগীর বাড়ির লোকজনের সাথে সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্মীদের খুব চেঁচামেচি হচ্ছে। কারণ হাসপাতালে বেড নেই। এই কথা শুনতে তারা নারাজ। তাদের রোগীকে ভর্তি নিতেই হবে এই ছিল তাদের দাবী। মহারাজ সেই চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বাইরে বের হলেন এবং দেখলেন কে চেঁচামেচিতে লিড করছে। মহারাজ শান্তভাবে তার কাছে গেলেন এবং তাকে ভিতরে ডাকলেন। বাড়ির লোকজন ভাবল যাক এইবারে রোগী ভর্তির একটা সুরাহা হবে। এই ভেবে তারাও সব হৈ চৈ করা বন্ধ করল। এদিকে মহারাজ সেই ভদ্রলোককে তার ঘরে ডেকে তাঁর সামনের চেয়ারে বসালেন ও বোঝালেন তাঁরা কতটা নিরূপায়। আর অনেককেই তারা ভর্তি নিতে পারেননি। মহারাজের কথায় সেই ভদ্রলোক তাদের ভুল বুঝতে পারলেন এবং বাইরে বেড়িয়ে সে তার বাড়ির লোককে বোঝাতে লাগল। উত্তেজনায় অবুঝ মন অবশেষে মহারাজের কথায় শান্ত হলো এবং তারা আর দেরী না করে অন্যত্র রোগী ভর্তির ব্যবস্থায় তৎপর

হলো। সেই দিন মহারাজকে দেখে বুঝলাম—প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মেজাজ ঠান্ডা রাখাই হলো প্রকৃত কর্ম তৎপরতা।

আর একবার হাসপাতালে কর্মী বিক্ষোভের জেরে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সভা পরিষদবর্গের সাথে মহারাজের জোরালো মিটিং বসেছে। সেখানে মন্ত্রী মহারাজকে বলছেন, আপনি আমাদের কর্মীদের চার্জশিট দিয়েছেন, ঠিক করেন নি। মহারাজ মন্ত্রীর সেই কথা শুনে হাসিমুখে শুধু বললেন, আমরা কি আপনার লোক নই। মহারাজের এই কথার পরে আর কোন কথা উঠল না। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সবাই সমান। সেখানে আমরা তোমরার ভেদাভেদ চলে না। মহারাজের ওই একটি কথায় সকল বিবাদের নিষ্পত্তি হলো। সেদিন মহারাজের সেই যুক্তিপূর্ণ কথায় বুঝলাম, বিবাদের সময় অভেদ সম্পর্ক স্থাপনই হলো প্রকৃত বিবাদের নিষ্পত্তি।

মহারাজ একটি কথা খুব বলতেন, জীবন মানেই সংঘর্ষ এবং সংঘর্ষের মধ্যে দিয়েই চৈতন্যের উদয় হয়। আর বলতেন আমরা স্বামীজির বীর সৈনিক। আমাদের আবার ভয় কি? নির্ভয়ে সব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কাজের মধ্যে মহারাজ সব সময় আনন্দে থাকতেন এবং সবাইকে আনন্দে রাখতেন। একবার এক ভক্ত মহারাজকে একটি সুন্দর ক্যালেন্ডার উপহার দেন এবং মহারাজকে বলেন, এটা আপনার এই বলার ঘরে রাখতে হবে। ভক্তের কথামতো ক্যালেন্ডারটি মহারাজের বলার ঘরে টাঙানো হলো। পনেরো দিন পরে সেই ভক্ত মহারাজের ঘরে ঢুকে দেখেন তার ক্যালেন্ডারের উপর আরও দশ-বারোটি ক্যালেন্ডার পড়েছে। তার ক্যালেন্ডার দেখাও যাচ্ছে না। তিনি ভীষণ অখুশি হয়ে মহারাজকে তার অভিমানের কথা ব্যক্ত করেন। মহারাজ চলতে চলতে বলেন, তোমার ক্যালেন্ডারটাই তো ফাউন্ডেশনের কাজ করছে। মহারাজের কথায় ভদ্রলোক না হেসে পারলেন না। তার সব অভিমান গলে জল হয়ে গেল। সেদিন বুঝলাম—মান-অভিমান নিষ্পত্তির একমাত্র পাওয়াই হলো হাসি। মহারাজ তাঁর হাসিমুখে কথা অল্প বলতেন এবং খুব মেপে গুণে কথা বলতেন। কথা প্রসঙ্গে যাঁরা মহারাজের সামনা সামনি এসেছেন, তাঁদের কাছে মহারাজের কথা হয়ে উঠেছিল অমৃত বাণী। এ প্রসঙ্গে এক সম্পন্ন ঘরের মহিলার কথা বলব। তিনি মহারাজের ভীষণ ভক্ত ছিলেন। মহারাজ সেবা-প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন তিনি মহারাজের কাছে মাঝে মধ্যেই আসতেন। একদিন তিনি নিজের চিকিৎসার জন্যই সেবা প্রতিষ্ঠানে এসেছেন। ডাক্তার দেখিয়েছেন, ওষুধ নিতে গিয়ে দেখলেন ভীষণ লাইন। তখন তিনি লাইন দিতে চাইলেন না। তিনি মহারাজের সাথে তার বিশেষ পরিচিতির কথা বলে আগে ভাগে ওষুধ নিতে চাইলেন। ওষুধ তো পেলেন না, এর জন্য অনেক কটু কথাও তাকে শুনতে হলো। তার ভীষণ অভিমান হলো। তিনি মহারাজের কাছে এসে কেঁদে

ফেললেন এবং অভিমানের সুরে কেঁদে কেঁদে বললেন, মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠানকে আমি নিজের মনে করি। আর সেই স্থান থেকে আজ এই ব্যবহার...। মহারাজ তার কথা শুনে হাসিমুখে বললেন, তোমার বাড়িতে অতিথি এলে তুমি কি করো, আগে অতিথিদের আপ্যায়ণ করো, না নিজে আগে খেয়ে নাও। এই প্রতিষ্ঠান যখন তোমার নিজের তখন সবার নেওয়া হয়ে গেলে তারপরই তো তোমার নেওয়া উচিত। মহারাজ তাঁর মিষ্টি কথায় সেই ভদ্রমহিলার মান ভাঙালেন। ভদ্রমহিলা তার কান্না থামিয়ে মহারাজকে প্রণাম করলেন। মহারাজ অবশ্য এক কর্মচারীকে দিয়ে তাঁর ওষুধ আনিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন মহারাজের কথায় বুঝলাম, যে জায়গাটিকে তোমার নিজের বলে ভাববে, সেখানে জোর খাটাবে না, সেবার ভাব নিয়ে থাকবে। কারণ এই ভাবের মধ্যে রয়েছে এক অপার্থিব আনন্দ।

মহারাজ সকলের সাথে এককভাবে কথা বলতেন যেন প্রত্যেকেই তাঁর আপনজন। একবার মহারাজের এক ভক্ত সেবা প্রতিষ্ঠানের এক জুনিয়র ডাক্তারের সাথে তাঁর মেয়ের সম্বন্ধ করেছেন। তাই ছেলেটি পাত্র হিসাবে কেমন হবে মহারাজের কাছে তা জানতে চাইলেন। মহারাজ সেই ভক্তের কথা শুনে বললেন, ও তো আমাদেরই ছেলে, তোমার মেয়েটি কেমন সে কথা বলো। মহারাজের ওই একটি কথায় তার সকল প্রশ্নের অবসান হলো এবং নিশ্চিন্তে সম্বন্ধ পাকা করলেন। মহারাজের সেদিনের সেই ব্যবহারে বুঝলাম—সংশয়াপন্ন মানুষের সাথে কথাবার্তা এমনভাবে বলতে হবে যাতে তিনি নিশ্চিন্ত হন।

একবার এক বিধবা মা মহারাজের কাছে দীক্ষা নিতে এসেছেন সঙ্গে একটি ছোট্ট মেয়ে আছে। মেয়েটিকে আত্মীয়দের কাছে বাইরে রেখে তিনি দীক্ষা নিতে বলেছেন কিন্তু বাইরে মেয়েটিকে তার আত্মীয়রা কিছুতেই ভোলাতে পারছে না। তার একটাই বায়না সে দীক্ষা নেবে। মহারাজের কাছে এই খবর যখন গেল, মহারাজ মেয়েটিকে কাছে ডেকে লজেন্স দিতে চাইলেন। সে নিল না। মহারাজ তখন তাকে আরও কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চাও? মেয়েটি বলল, আমি দীক্ষা নিতে চাই। মহারাজ তখন তাকে প্রশ্ন করলেন তুমি কেন দীক্ষা নিতে চাইছ? সে বলল, দীক্ষা নিলে ভগবান কাছে আসবেন। মহারাজ মেয়েটির উত্তর শুনে খুব খুশী হলেন। তার মাকে ডেকে বললেন, একটি শর্তে আমি তোমার মেয়েকে দীক্ষা দিতে পারি। যতদিন না তোমার মেয়ে বড়ো হচ্ছে ততদিন ওর জপটাও তোমাকে করতে হবে। মা রাগ হলো। মেয়েরও কান্না থামল। ভক্তসহ সকলের মন ভরল। মহারাজের সেদিনের সেই সিদ্ধান্তে বুঝলাম। কাজের জায়গায় সিদ্ধান্ত এমনভাবে নিতে হবে যেন সকলের মন ভরে।

সদাই হাসিতে ভরা মহারাজের জীবন কথার ইতিবৃত্ত খুঁজতে গিয়ে দেখি মহারাজ তাঁর সন্ন্যাস জীবনে স্বামী শংকরানন্দ, স্বামী অচলানন্দ, কেদারবাবা প্রমুখ আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ মহাপুরুষদের সঙ্গলাভ করেন। তাঁদের কাছে তিনি তাঁর সন্ন্যাস জীবনের যে সব উপদেশ পান তা তাঁর কাছে ছিল এক অমূল্যধন। তিনি সেইসব উপদেশ একটি ডায়রীতে লিখে রাখতেন। যা তাঁর দেহাবসানের পূর্বে কেউ কখনো দেখেনি। সেই ডায়রীতে তার জপ-ধ্যান কেমন হচ্ছে, আরও কত কী করতে হবে সে সব কথা লিখে রাখতেন। তাঁর লেখা সেই ডায়রীতে কেদারবাবাজীর একটি কথাকে তিনি অতি সযত্নে লালন করেন, একটি ভাবকে নিয়ে থাকবে, সেই ভাব থেকেই ভক্তি এবং ভক্তি থেকেই প্রেম আসবে। এই তিনটি কথা ছিল মহারাজের আধ্যাত্মিক জীবনসাধনার অঙ্গ। এই আঙ্গিকে শুরু হওয়ার পূর্বেই অনেকেই তাঁর মধ্যে গুরুশক্তিকে উপলব্ধি করেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা আমার খুব মনে পড়ছে। সুয্যি মহারাজ তখন ভুবনেশ্বর মঠের কর্মাধ্যক্ষ। গহনানন্দ মহারাজ তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। তিনি ভুবনেশ্বর মঠে এসেছেন, সুয্যি মহারাজ তার সেবকদের খুব ডাকাডাকি করছেন একটা চেয়ার আনার জন্য মহারাজকে বসতে দেবেন। অবশ্য মহারাজের তখন বসার সময়ও ছিল না। সুয্যি মহারাজের এই ব্যস্ততা দেখে আর এক বয়োজ্যেষ্ঠ মহারাজ বললেন, মহারাজ, উনি তো আপনার কাছেই জয়েন করেন, উনি তো আপনার সেই নরেশ। সেই কথা শুনে সুয্যি মহারাজ বলেন, দেখ আমি দেখতে পাচ্ছি ওর মধ্যে গুরু শক্তি জ্বলজ্বল করছে।

সত্যিই তাই। তাই দেখা গেল পরবর্তীকালে মহারাজ যখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংঘাধ্যক্ষ হন, গুরুশক্তির কৃপাবলে তিনি দেশ ও বিদেশের নানা স্থানে তাঁর কৃপাবারি বিবরণ করেন (দীক্ষা দেন) তখন মহারাজের বয়স ৮০-র উপরে। তাঁর বয়সের কথা ভেবে কোন দূর স্থানে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় বিচলিত হতাম। কিন্তু মহারাজকে কখনোই চিন্তিত বা বিচলিত হতে দেখিনি। মহারাজের জীবন ছিল কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার অধীন। তিনি মনে করতেন শৃঙ্খলিত জীবনেই মন একান্ত হয়। তাঁর সারাদিনের সব কাজের একটা রুটিন থাকত এবং যেখানে যেটুকু সময় দেওয়ার সেখানে সেটুকু সময় দিতেন। তিনি বলতেন, রুটিন অনুযায়ী চললে কাজে মনোনিবেশ করা সহজ হয়। এবং মনটাকে সম্পূর্ণভাবে সেই কাজে নিয়োজিত করা যায়। তাঁর সকল কাজের মাঝে সবার আগে সবার উপরে ছিল তাঁর জপ-ধ্যান। এ প্রসঙ্গে আবার এক অলৌকিক ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মহারাজ তখন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি, তাঁর শরীরের অবস্থা ভীষণ খারাপ, শরীর যায় যায়। ঠিক দুর্গাপূজার আর দু-এক দিন বাকি। মঠের কর্মকর্তারা সবাই ভেবে অস্থির যে, এই সময় মহারাজের শরীর গেলে

কী ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হবে তাদের। কিন্তু না তাদের সকল চিন্তার অবসান হলো। পূজা নির্বিঘ্নে কাটল। অধ্যক্ষ মহারাজদের মিটিং-ও হয়ে গেল। সেবাপ্রতিষ্ঠানের .... নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সেবাপ্রতিষ্ঠানে সমাগত মহারাজরা সব একে একে মহারাজকে প্রণাম করলেন। ভক্তেরা সব লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মহারাজকে প্রণাম করবেন। কিন্তু মহারাজদের ভিড়ে তারা উপরে উঠতে পারছেন না, তাই মনে মনে দূর থেকেই মহারাজকে তাঁরা প্রণাম নিবেদন করেছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে এক ভদ্রমহিলা লাইনে দাঁড়িয়ে দেখলেন। মহারাজ লিফট-এ নেমে আসছেন। মহিলা দেখে অবাক হলেন তিনি ভাবলেন, মহারাজ অসুস্থ শুনে তিনি দেখতে এসেছেন। তাহলে কি মহারাজ সুস্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। মহারাজ তার পাশ দিয়ে গেলেন এবং যাওয়ার সময় বলে গেলেন, জপধ্যান নিয়মিত করবেন। ঠিক সেই সময় খবর এল মহারাজ তাঁর ইহলৌকিক জীবন ত্যাগ করে পারলৌকিক জীবন তথা রামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করেছেন। ঘটনাটি অত্যাশ্চর্যরূপে মনে হলেও ভক্তের হৃদয়ে তা এতটাই দাগ কাটে যে একথা বলতে বলতে শোকে-দুঃখে ও আনন্দে তাঁর চোখ জলে ভরে ওঠে। দু চোখের কোন দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ে। মহারাজের এই মহাপ্রয়াণের দৃশ্য আজও যখন আমার চোখের সামনে প্রতিভাত হয় তখন জ্বল জ্বল করে মহারাজের সেই শেষ বাণী—'জপধ্যান নিয়মিত করবে।'

আমার কাছে মহারাজ তাঁর সমগ্র জীবন কথায় হয়ে ওঠেন বাণীর মূর্ত বিগ্রহ। এই বিগ্রহের আরাধনায় যারা যেভাবে ব্রতী হয় তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে যখন সেখানে যাই তখন নিজেকে দেবতার বাহন বলে মনে হয়। দেবতাদের সাথে তার বাহনরাও পূজিত হন। আমিও শিলচরে মহারাজের জন্মশত উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নিজেকে এইরূপ সম্মানিত বোধ করি, আনন্দ পাই। তাঁকে সেবা করেছিলাম বলেই আজ আমি এই আনন্দের ভাগীদার। তাঁকে সেবা করার সুযোগ ছিল আমার জীবনের এক মহোত্তম অধ্যায়। এই অধ্যায়কে আমি চিরটাকাল বয়ে নিয়ে বেড়াব তার বাহন হয়ে।

'বাণী রূপে রহিয়াছ মুরতি ধরি,
রামকৃষ্ণগতপ্রাণ তোমায় প্রণাম করি।'

২০১৬ সালে শিলচরে অনুষ্ঠিত স্বামী গহনানন্দ মহারাজের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানে সপ্তর্ষি মহারাজ যে বক্তব্য রাখেন এবং কিছু স্মৃতি কিছু কথায় স্বামী গহনানন্দ মহারাজের উপর তিনি যে বক্তব্য পরিবেশন করেন—সেসব কথাকে নতুন আঙ্গিকে এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধ লেখক—সমিত কুমার বাগ।

পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎস্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

স্বামী অবিচলানন্দ

কবির ভাষায় শুরু করছি—

জন্ম যদি বঙ্গে তব তিষ্ঠ ক্ষণকাল

অবিভক্ত বাংলার শ্রীহট্ট জেলার বাণিয়াচং এর পাহাড়পুর গ্রামে তিনি **১৯১৬** সালে পৃথিবীর আলো দেখেন। আবার নিজ জন্মস্থানটিও শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী ও অনুরাগীদের ইচ্ছায় পরবর্তীতে পাহাড়পুর রামকৃষ্ণ আশ্রম হিসেবে ভক্ত জনগণের মাঝে সেবারত।

১৯৯০ সাল বেলুড় মঠ ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এসে পূজনীয় মহারাজের দর্শন লাভ করি। প্রায়ই দেখতাম তিনি অনেক রাত অবধি নিজের অফিসে কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আবার দেখা যেত নিত্য অভ্যাসের ফলে এইদিকে ভোর বেলায় মন্দিরে মঙ্গল আরতির পূর্বেই উনার ঘরে আলো জ্বলছে মানে ঘুম থেকে উঠেই হাত-মুখ ধুয়ে জপ করতে বসতেন। আবার সন্ধ্যার পরে দেখতাম খড়ম পায়ে প্রত্যেকটি মন্দিরে প্রণাম করতে যেতেন।

পূজনীয় মহারাজ অন্যতম সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন **১৯৯২** সালে। নিজ সেবককে পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছেন, যেন গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু সপ্তর্ষী মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশন, পুরীতে সেবারত। আমি বেলুড় মঠে ট্রেনিং সেন্টারের শাস্ত্রাদি পাঠ শেষে পুরীতে একরাত্রে জগন্নাথদেবের দর্শনের জন্য ছিলাম, ছাত্রাবাসের সব কাজ সম্পন্ন করে সপ্তর্ষী মহারাজ অনেক রাতে নিজে সাইকেল চালিয়ে জগন্নাথদেবের দর্শনের মানসে নিয়ে যান। পরদিন তিনি সকালে বিশেষ পাণ্ডা মারফত আমাকে জগন্নাথদেবের স্নান দর্শনের জন্য পাঠান। আশ্রমের সেবা কাজ শেষ করে দুপুরে সপ্তর্ষী মহারাজ ও আমি পুরী ধামের নিয়মানুযায়ী একপাত্রে একত্রে জগন্নাথদেবের

মহাপ্রসাদ গ্রহণ করি সেই বিশেষ স্থানে বসে, যেস্থানে স্নানযাত্রার পূণ্যদিবসে জগন্নাথদেবের মহাস্নান করনো হয়।

১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের বরিশাল রামকৃষ্ণ আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সাথে স্বামী প্রমেয়ানন্দজী মহারাজও এসেছিলেন। সেখান থেকে দিনাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম হয়ে কলকাতা ফিরে যান। ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার শুভাগমন করেন, সেবার তিনি ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ সহ কয়েকটি আশ্রমে শুভাগমন করে ভক্তদের মনোক্ষুধা নিবৃত্তি করেন। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎস্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের পরে এই প্রথম বেলুড়মঠের সর্বোচ্চ পরিষদের একজন বাংলাদেশের কেন্দ্রগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে শুভাগমন করে ভক্তদের মনোক্ষুধা নিবৃত্তি করেন। উল্লেখ্য, ঢাকা রামকৃষ্ণ মন্দিরের শুভারম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও ১৯৯৪ সালে পূজনীয় মহারাজই সুসম্পন্ন করেন। বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র মহানদীর লাঙ্গলবন্ধের যে পবিত্র (রাজঘাটে) ঘাটে স্বামীজি স্নান করেছেন, সেই পবিত্র তীর্থস্থানে পূজ্যপাদ মহারাজ, ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ অক্ষরানন্দজী ও অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে প্রার্থণা করেছেন । নারায়ণগঞ্জের দেওভোগে নাগ মহাশয়ের বাড়িতে গঙ্গা আবির্ভাবের পবিত্র স্থান পূজ্যপাদ মহারাজ, সেবক ও ভক্তবৃন্দসহ দর্শন করেছেন। এছাড়াও ঢাকায় স্বামীজির অবস্থানের ও পরিভ্রমণের স্থানসমূহ তিনি দর্শন করেন। পূজ্যপাদ মহারাজ অনেক চিন্তা ও চেষ্টা করেছেন এবং বলতেন দেখ সেইসব পবিত্র স্থানের কোনও অংশাদি রামকৃষ্ণ মঠ বা মিশনের নামে সংগ্রহ করা যায় কিনা। হয়তো বা ভবিষ্যতে হবে, ঠাকুর স্বামীজির কাজ তো কখনও ব্যর্থ হয় না। পূজনীয় মহারাজ দিনাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন করেন ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে । এবার বাংলাদেশে পূজনীয় মহারাজের বিশেষ সফরসঙ্গী ছিলেন পূজনীয় স্বামী অনেরানন্দজী, স্বামী ভজনানন্দজী, পূজনীয় স্বামী শ্রীকরানন্দজী প্রমুখ সন্ন্যাসীবৃন্দ।

একবার বাংলাদেশে ভক্তদের দীক্ষা দান উপলক্ষ্যে তিনি ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে অবস্থান করছেন। একদিন সকাল বেলা দীক্ষার পূর্বে পূজনীয় মহারাজের সচিব-সেবক সপ্তর্ষী মহারাজ আমাকে বললেন, সুভাষ মহারাজ আপনি কিন্তু পূজনীয় অক্ষরানন্দজী মহারাজকে বলতে পারবেন না। তখন আমি আরও বেশী আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলাম মহারাজ কি ? বললেন, পূজনীয় মহারাজের গতরাত থেকে জ্বর, অক্ষরানন্দজী মহারাজ জানলে পর দীক্ষার অনুষ্ঠান বন্ধ রাখবেন। দীক্ষার্থী ভক্তদের কথা চিন্তা করে মহারাজ সব ব্যবস্থা ঠিক রাখতে বললেন। এদিকে আবার দীক্ষা দান উপলক্ষে প্রায়ই ব্যস্ত

থাকেন, তাই ভক্তদের বিজয়া দশমীর পত্রাদি যোগদ্যান ম থেকে ঢাকা আনিয়ে আশীর্বানী প্রদানে অনেক রাত অবধি ব্যস্ত থাকেন। এই সময় মহারাজের আবার চোখেরও একটু সমস্যা হচ্ছিল। পূজনীয় ভূতেশানন্দজী মহারাজ ও প্রমেয়ানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদে হোমিও চিকিৎসা সেবা করছেন বাংলাদেশে চন্দ্রনাথানন্দ মহারাজ। উনার ব্যবস্থা পত্র অনুযায়ী বিদেশী একটি হোমিও চোখের ড্রপও ব্যবহার করছেন পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ। অক্ষরানন্দজী মহারাজজী সব শুনে সপ্তর্ষী মহারাজকে বললেন ভাল চোখের ডাঃ রুহুল আমিন সাহেব আছেন দেখিয়ে নাও। আমাকে নির্দেশ দিলেন এপয়েন্টমেন্ট ঠিক করে রাখতে। সেদিন ছিল বিশেষ পর্ব উপলক্ষে হাসপাতালে উনার চেম্বার বন্ধ, উল্লেখ্য উনি আবার সেই হাসপাতালের পরিচালকও। যখন উনাকে ফোন করা হলো উনি বললেন অবশ্যই তিনি স্বামীজিকে দেখার জন্য সন্ধ্যায় হাসপাতালে আসবেন। অক্ষরানন্দ মহারাজজী আমাদের বলে রেখেছিলেন উনার ভিজিটের ফি যেন ঠিক মতো প্রদান করা হয়। জ্বর সহ ঐদিন প্রায় দু'শতাধিক দীক্ষা প্রার্থীদের দীক্ষানুষ্ঠান সম্পন্ন করেই প্রায় সন্ধ্যে নাগাদ দীক্ষানুষ্ঠানের হলো থেকে বেড়িয়েই সরাসরি হাসপাতালে উনার চেম্বারে পৌঁছালাম। দুপুরে বা বিকেলে কিছু আহারও করলেন না। পূজনীয় মহারাজকে দেখার পর অনেকক্ষণ স্বামী বিবেকনন্দের প্রসঙ্গ আলোচনা করে মঠে ফেরার পূর্বে ডাঃ এর ভিজিটের ফি প্রদান করতে গেলাম। ভিজিটের ফি তো নিলেনই না বরং ডাঃ সাহেব অনুনয়ের সুরে বলেছিলেন, আজ তো চেম্বার বন্ধ শুধু স্বামীজির দর্শণ ও সেবার জন্যই আসা হলো।

পূজনীয় মহারাজ বাংলাদেশে যতবার ভক্তদের কৃপা করার জন্য যেতেন তিনি প্রত্যেকবার সেইসব আশ্রমে ঠাকুরসেবা ও সাধুসেবা পার্মানেন্ট (permanent) ফান্ড এর জন্য যথাসাধ্য নিজের প্রনামী থেকে রেখে আসতেন। বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসার পূর্বে তিনি সচিব-সেবকদের বলতেন, দেখ নূতন টাকার নোটের প্রত্যেকটির একটি একটি করে সাথে নিও। আসলে নিজের কোনও প্রয়োজনে নয়, আমাদের মতো সাধু-ব্রহ্মচারী যারা বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা-সেবা এবং বেলুড় মঠ, জয়রামবাটী ও কামারপুকুর দর্শনে এসে নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে যাবার পূর্বে উনার পূন্য দর্শনে গেলে উনি মনের অবস্থা বুঝতে পারতেন। এদিকে সেইবার আমি সেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা-সেবা শেষে পূর্বতন আশ্রমে ফেরার পূর্বে মহারাজজীর পূন্য দর্শনে গেলে উনি সচিব-সেবকদের মারফত আমার গাড়ী ভাড়া ইত্যাদির খোঁজ নিলেন এবং এও জানলেন যে আমার সাথে সেইবার একজন বিশেষ রোগী সহ আরও দুইজন গাড়ীতে থাকবে। অনেক রাত হবে আশ্রমে ফিরতে, পথে অনেক খরচ হবে জানলেন। তাই

উনি সচিব-সেবকদের আদেশ করলেন উনার আনিত সে নূতন টাকার সবটাই যেন আমাকে দেওয়া হয়। অন্তর্যামী তো ভগবানেরই প্রেরিত হন, কারন এর পর উনার আর ওদেশে যাওয়া হবে না বুঝেছিলেন।

পূজনীয় মহারাজ কোন আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে রওনা হবেন। সচিব-সেবক ও অন্যান্যরা বলছেন, মহারাজ সব মালামাল রেডী গাড়ীতে উঠে গেছে। উনি শুধু জানতে চাইতেন, ব্যাগটি – মানে এই ব্যাগটির মধ্যেই থাকতো শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পদরজ ছোট একটি রূপোর কৌটতে রুমাল দিয়ে বেরিয়ে। এইটি উনাকে দশম প্রেসিডেন্ট পূজ্যপাদ স্বামী বীরশ্বরানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণলোকে যাত্রার দিন মহারাজের হাতে তুলে দেন। যাঁর পূত স্পর্শ দীক্ষিত ভক্ত সন্তানগণ দীক্ষার দিন লাভ করতেন।

বাংলাদেশের বাগেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন করেন ২০০১ সালের মার্চ মাসে। ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে নবনির্মিত মন্দিরের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বাংলাদেশের রাজধানী সবচেয়ে ব্যস্ততম শহরের অফিস চলাকালীন ব্যস্ততম দিনে অনেকেই নগ্নপদে ঢাকা শহরের অনেকটাই প্রায় প্রদক্ষিন করেন। কখনো আমরা পূজনীয় মহারাজের হিমালয়ে তপস্যার কথা শুনিনি। বাংলাদেশের কয়েকটি বেলুড় মঠ-মিশনের শাখাকেন্দ্র ও কয়েকটি প্রাইভেট আশ্রমেও পূজনীয় মহারাজ দীক্ষা প্রার্থীদের অকাতরে কৃপা বিতরণ করেছেন । আমরা যেটুকু অল্প পরিসর সময়ের জন্য পূজনীয় মহারাজের স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি, তাতে প্রত্যেক বারেই দেখা গেছে তিনি সকলকে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে আনন্দদায়ক কল্যাণকর কর্মে নিয়োজিত থাকার প্রেরণা যোগাতেন।

কাকুড়গাছী মঠে নূতন অধিকৃত স্থানে পঞ্চবটী স্থাপিত হবে। বেল গাছের চারাটি কিন্তু দক্ষিণেশ্বর থেকে সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। পূজনীয় মহারাজ তখন বেলুড় মঠে প্রেসিডেন্ট। আমি সেই সময় সেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা নিতে মঠে রয়েছি। সচিব-সেবক সপ্তর্ষী মহারাজের আদেশে, চারাটি সংগ্রহ করে সেদিন পূজ্যপাদ মহারাজের পূত সান্নিধ্য ও আর্শীবাদ পেয়েছি।

মহারাজের আশীর্বাণী দিয়ে শেষ করছি –‘শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের কেন্দ্রস্থল (central figure)। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এটি ভুললে চলবে না।’ যখনই বিপদে পড়বে, সমস্যার সম্মুখীন হবে, তাঁকে জানাবে, তাঁকে বলবে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। “আমাদের উচিত ঠাকুরের উপর নিজেদের ভার অর্পণ করা। নিজে কি চাইতে কি চেয়ে বসব, কে জানে। ঠাকুরের উপর নির্ভরতা চাই।”

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

স্বামী সত্যেশানন্দ

১৯৮৭ সালে পরমপূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজকে দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি তখন রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সচিবগণের অন্যতম ছিলেন। আমি সেসময় বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ-শিবিরে প্রশিক্ষণরত ছিলাম। মিশনের পুরাতন হেড কোয়ার্টারের ওপরে দোতলার একটি ঘরে সেসময় পূজনীয় মহারাজজী থাকতেন।

আমরা লক্ষ করতাম, প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে এই দোতলার ঘরের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে মহারাজজী অনবরত জপও করে চলেছেন। তিনি সর্বদা আমাদের কাছে অনুসন্ধান করে জানতে চাইতেন আমরা আমাদের সাধন ভজন ঠিকমতো করছি কিনা, প্রতিদিন ক্রমাগত জপের সংখ্যা বাড়াতে পারছি কিনা। যখন পরমপূজ্য আত্মস্থানন্দজী মহারাজ বেলুড়মঠের বাইরে থাকতেন, সেসময় আমরা, প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্রহ্মচারীরা প্রতিদিন রাত্রে আহারের পর পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের কাছে যেতাম। সে সময় তিনি আমাদের বলতেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর হলেন, এই রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সর্বোচ্চ প্রধান, আমাদের সর্বময় প্রভু, আমরা সকলেই তাঁর অনুগত সেবক মাত্র। নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম শুরু করার পূর্বে তোমাদের সবরকম কাজের বিবরণ তোমরা অবশ্যই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিবেদন করবে। এবং কাজকর্মের সমাপ্তির পর সে সকলের বিশদ বিবরণাদি, ভাল-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদির কথাও দিন শেষে তাঁর কাছে সবিস্তারে পেশ করবে। তাহলে তোমাদের দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগের কোন কারণ আর থাকবে না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিবেদন করে দেওয়ার ফলে সমস্ত কাজের ফলাফলের দায় তখন তাঁরই দায়িত্বের মধ্যে চলে আসবে।

পরমপূজ্য মহারাজজী প্রতিদিন যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে তাঁর শ্রীচরণে অর্ঘ্য নিবেদন করতেন তখন সেটি এক অপূর্ব দৃশ্যমান ব্যাপার হয়ে

উঠেছে। কারণ পূজ্যপাদ মহারাজজীর নিকট, শ্রীশ্রীঠাকুর শুধুমাত্র একটি শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি তো নন, তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত ও বহু জীবন্ত মূর্ত্তির প্রতীক। মহারাজজী যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখীন হবেন তখন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে ও আচরণে দেখা যেত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় ভরা এক বিশেষ অনুভূতির প্রকাশ।

আমি অন্যান্য অনেক প্রবীণ সাধুদের নিকট শুনেছিলাম যে সর্বপ্রকার অবস্থাতেই পরমপূজ্য মহারাজজী কেমন করে শান্ত ও সদাহাস্যময় থাকতে পারতেন। আমাদের সকলের প্রতিই মহারাজজী ছিলেন অত্যন্ত সহৃদয়, স্নেহশীল ও সদাপ্রফুল্লচিত্ত। নিজের খাদ্যাভাসের প্রতি মহারাজজী ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক ও সংযমী এবং শারীরিক ব্যায়ামাদির ব্যাপারে বিশেষভাবে নিয়মানুবর্তিতার পক্ষপাতী।

আমি বহুদিন মহারাজজীকে রাত্রি **১১**টার সময় সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে ফিরতে দেখেছি। গাড়ী থেকে নেমেই তিনি সোজা চলে যেতেন মায়ের মন্দিরে। মাকে প্রণাম করার পর ঘরে ফিরে তিনি পুনরায় রাত্রের স্নান সমাপন করতেন। এবং চেয়ারে বসে অফিসের কাজকর্ম শুরু করে দিতেন। তিনি রাত্রে খুব কমই ঘুমাতেন। একই সঙ্গে জপধ্যান ও বাহ্যিক কাজকর্ম সম্পন্ন করবার এক অদ্ভুত অতিমানুষিক ক্ষমতা ছিল তাঁর।

রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতি তাঁর আত্মোৎসর্গের প্রতিশ্রুতি তিনি নিজের জীবনেই সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন।

প্রয়াত পরমপূজ্য স্বামী একাত্মানন্দজী মহারাজ (মৃণাল মহারাজ) যিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানে মহারাজজীর সঙ্গে প্রায় কুড়ি বছর ছিলেন তিনি যখন রাঁচী টিবি স্যানেটোরিয়ামে থাকতেন তখন একদিন আমাকে বলেছিলেন, "আমি নরেশ মহারাজকে (স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম) কোনদিন কোনব্যাপারে উদ্বিগ্ন বা বিচলিত হতে দেখিনি। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজির প্রতি তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ও আন্তরিক নির্ভরতা ছিল।"

পরমপূজ্য মহারাজীর পুণ্যস্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অমর হয়ে থাকবে। তাঁর আদর্শ জীবন প্রতিটি মানুষকে সারাজীবন অনুপ্রাণিত করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহামন্ত্রের রূপকার স্বামী গহনানন্দজী

স্বামী ত্যাগিবরানন্দ

এমন এক করুণা বিগলিত বিবেকচেতনা সম্পূর্ণ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর স্মৃতিচারণ করব যিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সেই মহামন্ত্রঃ 'শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ যজ্ঞের'-মূর্ত বিগ্রহ, যিনি ঠাকুরের সেই মহান ব্রতটি হৃদয়ে চিরদিনের জন্য বেঁধে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন জীবন-নাট্যের অন্তিম স্কুল পর্যন্ত তিনি আর কেউ নন, তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন রামকৃষ্ণসঙ্ঘের চতুর্দশ প্রেসিডেন্ট (অধ্যক্ষ) পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান বা শিশুমঙ্গল হাসপাতালে সেবারত তরুণ সন্ন্যাসীটিকে কোন ভক্ত বা অনুরাগী কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করলে তাঁর সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে যিনি তৎক্ষণাৎ বলতেন—না, ভাল নেই"! প্রঃ-কেন মহারাজ? উত্তরে তিনি করুনার্দ কণ্ঠে বলতেন—"যেখানে বাড়ির একজন অসুস্থ থাকলে বাড়ির সকলেই দুঃখিত হন, সেখানে এই বিশাল বাড়িটির (শিশুমঙ্গল হাসপাতাল), এতজন অসুস্থ, সেখানে আমি কেমন করে ভাল থাকব?" পূজনীয় মহারাজ দীর্ঘ **১৯৫৮** থেকে **১৯৮৫** খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত **২৭** বৎসর ধরে তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানের অসুস্থ রুগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর একমাত্র ব্রত ছিল অসুস্থ জীবন্ত দেবতার পূজা করা—অর্থাৎ, ঠাকুরের মহানব্রতটিকে কার্যে রূপায়িত করা।

তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নরেশরঞ্জন রায়চৌধুরী। **১৯১৬** খ্রিস্টাব্দের দুর্গাপুজোর মহাষ্টমী তিথিতে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলায় (বর্তমান বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ থানা) বাণিয়াচং-এর অন্তর্গত পাহাড়পুর গ্রামে (ভরদ্বাজ গোত্র) দেবরায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, মাতা সুখময়ী দেবী। ছেলেবেলা থেকেই নরেশরঞ্জনের অসামান্য মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বরাবরই বিদ্যালয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতেন। তাঁর প্রকৃতি ছিল গম্ভীর, সংযতবাক্। তাঁর মুখাবয়বে ছিল অসীম ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের ছাপ। নিজের খুড়তুতো দুই দাদা

কেতকীরঞ্জন (প্রয়াত স্বামী প্রভানন্দ) ও প্রমোদরঞ্জন (ব্রহ্মচারী প্রমোদ) তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনে খুবই প্রভাব ফেলেছিলেন। কেতকী মহারাজ খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ী অঞ্চলে গরীব অশিক্ষিত নরনারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনিই তাঁর প্রেরণার প্রথম ইন্ধন দেন। কিন্তু মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেছিলেন। কেতকী মহারাজ উত্তরপূর্বাঞ্চলের শেলা, চেরাপুঞ্জী ও শিলং আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে নরেশরঞ্জন প্রথম বেলুড় মঠ ও দক্ষিণেশ্বর দর্শন করেন। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছিলেন, "বিজয়া দশমীর দিন বেলুড় মঠ গিয়েছিলাম। মন্দির তখন সম্পূর্ণ হয়নি। বেলুড় মঠ দর্শনের পর আমরা দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম।" ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের স্বামী বামদেবানন্দজীর অনুপ্রেরণায় ভুবনেশ্বর মঠে যোগদান করেন। মাদ্রাজ মেলে রাত আড়াইটে নাগাদ ভুবনেশ্বরে পৌঁছান। ভুবনেশ্বর স্টেশন থেকে গরুর গাড়িতে করে রামকৃষ্ণ মঠে পৌঁছলে মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নির্বাণানন্দ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। ঐ দিনই সকালে নাপিত এসেছে দেখে নির্বাণানন্দজী মহারাজ তাঁকে শিখা রেখে মুণ্ডন করে ফেলতে বলেন। কচ্ছমুক্ত কাপড় পরিহিত ব্রহ্মচারী নরেশরঞ্জনের অধ্যাত্মসাধনা শুরু হলো সেদিন থেকেই। নতুন বেশে স্বামী নির্বাণানন্দজীকে প্রণাম করলে তিনি তাঁকে (নরেশরঞ্জন) বলেছিলেন যে, প্রতিটি কাজই ঠাকুরের কাজ হিসেবে করবে। কেদার বাবা একদিন তাঁকে বলেছিলেন, "স্বামীজি বলতেন যখন কারও সেবা করবে, ভাববে শ্রীরামকৃষ্ণদেবই তাঁর মধ্যে থেকে আমার সেবা গ্রহণ করছেন এই কথাগুলি তাঁর হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল চিরদিনের জন্য।

ভুবনেশ্বরে তিনি দীনেশচন্দ্র পণ্ডিত (শাস্ত্রী) ও পণ্ডিত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্যের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। সেই সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ দীক্ষাদানের নিমিত্ত ভুবনেশ্বর মঠে আসেন এবং কয়েকজনকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন, যাঁদের মধ্যে নরেশরঞ্জন ছিলেন অন্যতম। এরপর মঠ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে তাঁকে কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমে কর্মী হিসাবে আসতে হয়। ১৯৪৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী স্বামী বিরজানন্দজীর কাছে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা লাভ করে নাম হয় ব্রহ্মচারী অমৃতচৈতন্য। ১৯৪৮ সালের ১২ই মার্চ ঠাকুরের তিথিপূজার দিন নিজ গুরুর কাছ থেকেই সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করে তাঁর সন্ন্যাস নাম হয় স্বামী গহনানন্দ। কলকাতা অদ্বৈত আশ্রমে তিনি আরও ৪-৫ বছর কর্মী হিসাবে ছিলেন। ১৯৫২ সালের জুন মাসে তিনি সেখান থেকে বাগেরহাট আশ্রমে যান কর্মী হিসাবে। সেখানে তিনি ছয় মাস

থাকেন। দেশ বিভাগের সময় কলকাতায় তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে, ঐ সময় একদিন আশ্রমের ছাদ থেকে মহারাজ দেখলেন নিকটবর্তী একটি বাড়ির ওপরতলায় কয়েকজন মুসলমান বিপন্ন হয়ে রয়েছেন। তাঁরা দূর থেকে আকার ইঙ্গিতে জানালেন যে তাদের কোন খাবার নেই। যদি কিছু খাবার দেন! মহারাজ তখন টিফিন ক্যারিয়ার করে নিয়মিত তাঁদের জন্য খাবার পাঠাতে থাকেন। এইরূপ অনুভব ছিল তাঁর। পরে সেই দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের পুলিশ উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠায়। এরপর ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে গহনানন্দজী চলে আসেন উত্তরপূর্বাঞ্চলে মেঘালয়ের শিলং আশ্রম-এ। তখন সেখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী সৌম্যানন্দ। শিলং-এ তিনি সাড়ে চার বছর সহজ সরল দরিদ্র পাহাড়ী জনগণের মধ্যে মহানন্দে ঠাকুরের সেবাযজ্ঞ চালিয়ে যেতেন।

শিলং-এর পর মহারাজ এলেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে। স্বামী দয়ানন্দজীর আদর্শ বজায় রেখে তাঁরই অধীনে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত নিজেকে গড়ে তুলতেন উপযুক্ত সেবক হিসাবে। “শিবজ্ঞানে জীব সেবা’-এই মহামন্ত্রকে আদর্শ করে মহারাজ তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৮৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর ধরে তিনি সেখানে সেবাকার্য চালিয়ে গেলেন। সেবাপ্রতিষ্ঠানে কর্মীদের একাংশের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল তখন। হাসপাতালের সামগ্রিক অবস্থা, বিশেষ করে আর্থিক সঙ্গতি চরম দুর্দশায় পড়ে। সামগ্রিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে অসীম ধৈর্য এবং পুরুষকারের সহায়তায় মহারাজ এই বিক্ষোভ আয়ত্তে আনেন এবং—প্রাতিষ্ঠানিক শান্তি রক্ষা করেন। অন্যান্য সহকর্মীরা এই বিক্ষোভে বিচলিত হয়ে উঠলেও তিনি ধৈর্যহারা হননি। একবার সেবাপ্রতিষ্ঠানের ১৮জন কর্মীকে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অভিযোগে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তার প্রায় তিন মাস পর যে আইনজীবী এ কাজে সাহায্য করেছিলেন তাঁকে ডেকে মহারাজ বললেন, “যে ১৮জনকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল তাদের আবার কাজে নিতে হবে। আপনি যা ব্যবস্থা নেবার নিন।” তিনি (উকিল) অবাক হয়ে বললেন, “মহারাজ, বলেন কি? যারা প্রতিষ্ঠানের এত ক্ষতি করেছেন, যাদের আমরা এত কষ্ট করে আইনগতভাবে বরখাস্ত করতে পেরেছি, তাদের আবার কিভাবে কাজে নেবেন?” মহারাজ দৃঢ় ও গম্ভীরভাবে বললেন, “কিন্তু ওদের বাড়ির ছেলে মেয়েরা খাবে কি-তা ভেবেছেন?” তারপর সেই আইনজীবী আর কোন কথা বলতে পারেন নি। এইরকমই ছিল মহারাজের হৃদয়বত্তা, মহানুভবতা ও দরিদ্রের প্রতি তাঁর অসীম স্নেহ ও ভালোবাসা। ঐ ১৮ জন কর্মীকে প্রতিষ্ঠানের কাজে পুনর্বহাল করা হলো। পরবর্তীকালে পূজনীয় মহারাজ জনৈক

সন্ন্যাসীকে বলেছিলেন, “কর্মই শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর মানুষের সেবাই ঈশ্বরের পূজা-এই দুই সাধনই আমি সারাজীবন করে এসেছি।”

১৯৬৫ সালে গহনানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠের অছি পরিষদের ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালিক সমিতির সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৭৯ খ্রিঃ তিনি সহকারী সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন এবং ১৯৮৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯১-এর জুলাই মাসে ইংলণ্ডে যান এবং ইউরোপে রামকৃষ্ণ মিশনের সকল বেদান্ত কেন্দ্রগুলির অধ্যক্ষদের নিয়ে একটি সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ঐসময়ে তিনি মস্কো যান। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-প্রচার পরিষদ আন্দোলনকে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী ছাড়া তিনিও বাস্তব রূপ দান করতে সাহায্য করেছিলেন। ‘ভাবপ্রচার পরিষদ-এ’ অন্তর্ভুক্তির জন্য তিনি দশবিধ নিয়ম বিধি উদ্ভাবন করেন এবং সেটি প্রয়োগে বিশেষ ভূমিকা নেন। ১৯৯২ সালে তিনি রামকৃষ্ণসঙ্ঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষ (ভাইস-প্রেসিডেন্ট) হন এবং কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান মঠের অধ্যক্ষেরও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৭-এ গঙ্গোত্রী ও বদ্রীনাথ দর্শন করেন এবং ২০০২-তে শিবতীর্থ অমরনাথ দর্শন করেন। ঐ বছরেই মহারাজ গয়াধাম গমন করে ভগবান বিষ্ণুর পাদপদ্ম দর্শন ও পূজা দিয়ে কয়েকজন ভক্তকে দীক্ষাদানও করেন। গয়ায় অবস্থানকালে তিনি গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের উৎপত্তি। কাজেই এই গয়াতে একটি রামকৃষ্ণ কেন্দ্র হওয়া দরকার।”

১৯৯৯ এর মার্চ মাসে দিল্লীর AIIMS হাসপাতালে মহারাজের বাইপাস সার্জারি হয়। ২০০৫ সালের ২৫শে এপ্রিল ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ (প্রেসিডেন্ট) স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী দেহত্যাগ করেন। তারপর ২৫শে মে, ২০০৫সালে চতুর্দশ অধ্যক্ষ পদে বৃত হন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। ১৯৯২ সালের ১৫ই জুন স্নানযাত্রার দিন যোগোদ্যান মঠে ২৫ জন ভক্তকে তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং ২০০৭-এর ১৭ই জুলাই ২জন ভক্তকে শেষ দীক্ষা দান করেন। মহারাজের মোট দীক্ষিত ভক্তসংখ্যা ১,৪২,৯৫৫ জন। ২৮শে আগস্ট ঝুলন পূর্ণিমার দিন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজনীয় মহারাজ আগত ভক্ত ও সাধুদের প্রণাম গ্রহণ করেন। তারপর থেকেই মহারাজের শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ হতে থাকে। Alzheimer ও বার্ধক্যজনিত রোগের ফলেই তাঁর শারীরিক অবনতি হতে থাকে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর, মহারাজকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো হয়। বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় মহারাজ থাকেন বেশ কিছুদিন। ৪ঠা নভেম্বর, সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্ল্যাটিনাম জুবিলী উদযাপন করতে এসেছিলে প্রায় ৭০ জন সাধু তাঁরা সকলেই দুপুরে মহারাজকে প্রণাম করলেন। এরপর, বিকেল ৪-৪৫

মিনিট থেকে মহারাজের শরীরের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। চিকিৎসকগণ তৎক্ষণাৎ সেবকদের চরম সঙ্কটের কথা জানিয়ে দেন। সেখানে উপস্থিত সকলেই দেখলেন যে মহারাজ চোখ দুটি খুললেন। তখন সেবকগণ সঙ্গে সঙ্গে বেলুড় মঠ থেকে আনীত একটু চরণামৃত মহারাজের মুখে দিলেন, মহারাজের কপালে ও হৃদয়স্থলে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্মাল্য স্পর্শ করালেন। ঠাকুর-মা ও স্বামীজির ছবির দিকে বিস্ফারিত নয়নে মহারাজ দেখতে লাগলেন। তারপর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণপদে চিরকালের জন্য মিলিত হলেন। তখন সময় সন্ধ্যা ৫-৩৫ মিনিট। বেলুড় মঠে মহারাজের দেহ আনা হলো। পরদিন মধ্যাহ্নে সাধু-ব্রহ্মচারীরা 'হরি ওম্ রামকৃষ্ণ' বলতে বলতে মহারাজের শরীর নিয়ে গেলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের সামনে গঙ্গার ঘাটে। মহারাজকে গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করানো হলো। তারপর, তাঁকে আরতি করা হলো। অগণিত সাধু ও ভক্তগণ শ্রীগুরু মহারাজের জয় দিতে লাগলেন। তারপর, সমাধি ঘাটে সজ্জিত চিতায় মহারাজের শরীরে অগ্নিসংযোগ করা হলো, তখন দুপুর ১টা। মহারাজের পার্থিব শরীর ভস্মীভূত হলো। সমাধিস্থল ফুল ও মালা দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হলো। তারপর, সকলে মিলিত হয়ে বৈদিক শান্তিমন্ত্র পাঠ করতে করতে শেষকৃত্য সম্পূর্ণ হলো।

মহারাজ ভক্তদের উদ্দেশ্যে প্রায়ই বলতেন : "শ্রীশ্রীঠাকুরই আমাদের কেন্দ্রস্থল। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এটি ভুললে চলবে না। তিনি আমাদের পরিবারের কর্তা, তিনি আমাদের আশ্রমের অধিপতি। যখনই বিপদে পড়বে, সমস্যার সম্মুখীন হবে, তাঁকে জানাবে, তাঁকে বলবে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। সবসময় মনে করবে আমি তাঁর, ঠাকুরের প্রতিনিধি। প্রতিনিধির নিজস্ব বলতে কিছু থাকে না। এই ভাব সর্বদা মনে জাগরূক থাকলে কখনো বেচালে পা পড়বে না। আমাদের উচিত ঠাকুরের উপর নিজেদের ভার অর্পণ কার নিজে কি চাইতে কি চেয়ে বসবে, কে জানে। ঠাকুরের উপর নির্ভরতা চাই।' 'চরিত্র গঠনই আসল কথা। ঠাকুর-স্বামীজির আদর্শে চরিত্র গঠন করতে হবে। চরিত্র গঠনের জন্য আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার খুব প্রয়োজন। যেসব যুবক সামনে কোন আদর্শ পাচ্ছে না—তাদের সামনে ঠাকুর, মা ও স্বামীজির আদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজ নিজ বাড়িতেও একটা আদর্শ মেনে চলে, তবে তার প্রভাবে ছেলে-মেয়েরাও সত্যকার মানুষ হয়ে উঠবে। আজকের এই যুগসন্ধিক্ষণে ঠাকুর, মা ও স্বামীজির ভাবধারাকে আশ্রয় করে সকলের তরে এগিয়ে এসে একটি যোগসূত্র রচনা করা আমাদের আশু কর্তব্য, যে যোগসূত্রের মূলমন্ত্রটি হবে 'নিঃস্বার্থ-ভালবাসা।'

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

স্বামী গহনানন্দের স্মৃতিকথা

স্বামী যজ্ঞেশানন্দ

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে ছাব্বিশটি দৈবী গুণের কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে তিনটি গুণ এখানে উল্লেখনীয়—অক্রোধ, মাদব এবং ক্ষমা। স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের এই জীবনে তিনটি গুণের উল্লেখ দেখেছি। তখন ১৯৯০ সাল, আমি বেলুড় মঠের ঠাকুর মন্দিরে ঠাকুর সেবা করি। মহারাজ প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট নাগাদ মন্দিরাদি প্রণাম করতে আসতেন। ঠাকুর মন্দিরের পিছন থেকে মন্দিরে ওঠার জন্য দু-দিকেই পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি সিঁড়ি আছে। তখন মহারাজ একদিকে সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে সবে চাতালে এসেছেন। আমি মহারাজের পিছনেই ছিলাম। এমন সময় অপরদিকে সিঁড়ি দিয়ে একটি যুবক ছুটতে ছুটতে উঠে চাতালে পায়ের জুতো দুটি ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত পদে ঠাকুরের নাটমন্দিরের দিকে যাচ্ছিল। জুতো দুটি এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলল যে, প্রায় মহারাজের গায়ের উপর ছিটকে পড়ার উপক্রম। আমি যুবকের এ হেন ব্যবহারে বিরক্ত। কিন্তু মহারাজ শান্তভাবে পিছনে আমার দিকে তাকিয়ে যুবকটিকে ডাকতে বললেন। যুবকটি কাছে আসতেই মহারাজ খুব শান্তভাবে নিচুস্বরে যুবকটিকে বললেন—দেখ আমরা কেমনভাবে পাশাপাশি ভালভাবে জুতো জোড়াকে রেখে মন্দিরে যাই। আর তুমি একটা জুতো এখানে, আর অন্যটাকে ছুঁড়ে আর একদিকে ফেলে দিচ্ছ। এটা ঠিক নয়, কেমন! এহেন বিরূপ পরিস্থিতিতে মহারাজের শান্ত, ধীর, মধুর ব্যবহার আমাকে খুবই মুগ্ধ করল এবং আমার হৃদয়ে এই সুন্দর চিত্র চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হয়ে গেল। উনি তখন সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা প্রশাসনিক প্রধান অর্থাৎ যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। খুব সহজেই ঐ উচ্ছৃঙ্খল যুবকটিকে প্রচণ্ড বকুনি দিতে পারতেন। তাতে আমি এবং মন্দিরের কর্মী, দারোয়ানেরা পূজনীয় মহারাজকেই সমর্থন করতাম। এই ঘটনা মনে পড়ে যায় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দজী জীবনে অনেক ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা। মা সারদা তখন অসুস্থ হয়ে মায়ের বাড়ির দোতলায়

অবস্থান করছিলেন। স্থূলকার শরৎ মহারাজ ঐ বাড়ির নিচে সিঁড়ি আগলে দাঁড়িয়ে আছেন যাতে কোন ভক্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠে শ্রীমাকে যাতে বিরক্ত করতে না পারে। একজন ভক্ত অনেক দূর থেকে শ্রীমার দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছেন। শরৎ মহারাজ তাঁকে উপরে না যাওয়ার জন্য ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন। তখন ঐ পুরুষ ভক্ত শরৎ মহারাজকে কটু কথা বলে ধাক্কা দিয়ে একদিকে ঠেলে দিয়ে উপরে মাকে প্রণাম করে নিচে নামার সময় ভাবছেন যে, শরৎ মহারাজের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করা উচিত হয়নি। নিচে এসে লজ্জিত হয়ে শরৎ মহারাজের কাছে দুর্ব্যবহার করার জন্য ক্ষমা চাইলেন। তখন শরৎ মহারাজ স্মিত হাস্যে ভক্তকে বলছেন যে, এরূপ ব্যাকুলতা না থাকলে কি শ্রীমার দর্শন মেলে? শরৎ মহারাজের মধ্যে কোন ক্রোধ বা বিরক্তির চিহ্নই দেখা গেল না। যে ক্রোধ বা বিরক্তি এইরূপ পরিস্থিতিতে কয়েকজন মহাপুরুষ, ছাড়া বাকি সব মানুষের মধ্যেই দেখা যায়—বিজ্ঞানী নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। যে প্রতিক্রিয়া দেখায় তার শক্তিক্ষয় হয়। বরঞ্চ প্রতিক্রিয়া না দেখানো বেশী শক্তির প্রকাশ বলে প্রমাণ হয়। যেসব অতিমানব প্রতিক্রিয়া দেখান না তাদের সামান্য কাজে প্রতিক্রিয়াজনিত শক্তিক্ষয় হয় না। ফলে তাদের শক্তি সঞ্চিত হয়ে তাঁরা অসীম শক্তিধর হন। ফলে বৃহৎ কাজে সেই সঞ্চিত শক্তি প্রকাশ এবং স্ফুরণ ঘটে এইসব মহাপুরুষের জীবনে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জন্মস্থান শিকড়া মঠে আমি বেড়াতে গেছি। এক বয়স্ক ভক্ত মঠের রাস্তায় চলতে চলতে তার এক সঙ্গীকে বলছে যে প্রায় পঁচিশ বছর আগে আমি একটা পাকা কলা খেয়ে কলার খোসাটা মঠের ভিতরে রাস্তায় ফেলে দিই। সেটা দেখে মঠের সম্পাদক মহারাজ কলার খোসাটা নিজ হাতে তুলে আমাকে দেখিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দেন আর বলেন যে, এভাবে কলার খোসাটা রাস্তায় ফেললে যে কেউ কলার খোসার উপর পা পিছলে পড়ে যেতে পারে। মহারাজের সেই প্রতিক্রিয়াহীন শান্ত ব্যবহার এখনও বৃদ্ধ ভক্তের মনে চিরকাল সমভাবে প্রোজ্জ্বল। তাই মহাভারতে যথার্থই বলা হয়েছে,

মৃদুনা দারুণং হন্তি মৃদুনা হন্তি অদারুণম্।
নাসাধ্যং মৃদুনা কিঞ্চিৎ তস্মাৎ তীক্ষ্ণতরো মৃদুঃ।।'

—মৃদুতার দ্বারা কঠোর বা অকঠোরকে জয় করা যায়। মৃদুতার দ্বারা অভিভূত হয় না এমন কিছুই নাই; সুতরাং মৃদুতাই তীক্ষ্ণ অস্ত্র।

শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে যাঁকে আমরা Ideal Management-এর জীবন্ত

উদাহরণ বলি, অসংখ্য ঘটনায় এই গুণের প্রকাশ দেখি। তাই অন্যের প্রতি ব্যবহারের এই ভদ্র, সদাচরণ সর্বদাই পালনীয়। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন যথার্থই বলেছেন যে, প্রথমে ভদ্র হও। এহেন মহাপুরুষদের জীবন থেকে আমরা এ শিক্ষাটাই পাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যে, ছোটো ছোটো কর্মের মধ্যেই মানুষের চরিত্র প্রতিফলিত হয়। তাই আমি একটা সামান্য ঘটনা উল্লেখ করলাম যার মাধ্যমে পূজনীয় গহনানন্দ মহারাজের চরিত্র প্রতিফলিত হয়, যেটা আমাদের কাছে অভিমানরাহিত্য বিষয়ক। গীতাকার বলছেন, অভিমান হচ্ছে ছটি আসুরিক সম্পদের মধ্যে একটি। এক ভক্ত শ্রীমাকে বলছেন, "মা, খুবই অভিমান আসে।' মা উত্তরে বলছেন, 'হ্যাঁ বাবা, অভিমান সহজে যায় না।'

এখন আর একটি সামান্য ঘটনা উল্লেখ করছি, মহারাজের অভিমানরাহিত্য বিষয়ের। সব সাধু ব্রহ্মচারী দুপুরে প্রসাদ গ্রহণের পরে মহারাজ মঠের ভোজন কক্ষে প্রসাদ পেতে আসতেন। একদিন প্রসাদ পাওয়ার পর যখন মুখ ধুচ্ছেন তখন আমি কাছে দাঁড়িয়ে আছি ওনাকে মোছার জন্য তোয়ালে দিতে। হঠাৎ ভোজনকক্ষের বিপরীতে উত্তর দিকে সাধুনিবাসের নিচে বেঞ্চে বসে থাকা এক নবাগত ব্রহ্মচারীকে লক্ষ করে আমাকে বললেন, দেখ তো ঐ ব্রহ্মচারী দুপুরে প্রসাদ পেয়েছে কি না? আমি ব্রহ্মচারীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে বলল যে, সে এখনও প্রসাদ পায়নি। তখন আমি ঐ ব্রহ্মচারীকে মহারাজের কাছে নিয়ে এলাম। মহারাজ খুব স্নেহভরে তাকে আগে তাড়াতাড়ি প্রসাদ পেতে বললেন। তারপরে তিনি ঐ ব্রহ্মচারীর কথা শুনবেন সেটাও বলে দিলেন। ভোজন কক্ষ থেকে সাধুনিবাসের দূরত্ব আছে যেটা বয়স্ক মহারাজের কাছে দেখাটাও সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু এমনই মহারাজের হৃদয়ের প্রসারতা সেটা তিনি ঐ দূরে থেকেও অনুভব করেন। এই ছোট্ট ঘটনায় মহারাজের স্নেহ, প্রীতি, হৃদয়ের উদারতা দেখে আমি খুব মুগ্ধ হলোম।

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী সিদ্ধিপ্রদানন্দ

মনসি বচসি কায়ে পূণ্যনীযুষপূর্ণাঃ
ত্রিভুবনমূলকারশ্রেণিভিঃ প্রীণয়ন্তঃ।
পরগুণপরমানন পর্বর্তীকৃত্য নিত্যং
নিজ হৃদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ।।

যাঁর মন বাণী ও শরীর অমৃতে পরিপূর্ণ, যিনি ত্রিলোকের প্রভূত উপকার ও কল্যাণ সাধন করে থাকেন এবং অন্য ব্যক্তিতে যৎসামান্য গুণ থাকলে তাকে পাহাড় প্রমাণ বৃহৎ করে দেখে সর্বদা প্রসন্ন হৃদয়ে বিরাজ করেন এমন সৎপুরুষ (এই সংসারে) কয়জনই বা আছেন? অর্থাৎ এমন সজ্জন ব্যক্তি বড়ই দুর্লভ।

শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো,
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্নবং জনা,
অহেতুনান্যায়পি তারয়ন্তঃ।।

এই সংসারের ভয়ংকর ভবসাগর যিনি স্বয়ং পার হয়ে এসে নিঃস্বার্থভাবে জগতের মঙ্গল সাধন হেতু পরোপারের বৈঠা স্বরূপ, এইরূপ শান্তচিত্ত সাধু মহাত্মা বসন্ত ঋতুর মতোই বিচরণ করে থাকেন।

ওনার অন্তঃকরণের দ্বার বিশ্ববাসীর জন্য সর্বদা খোলা। ঠিক এইরূপ মহাপুরুষোচিত ব্যক্তিত্ব শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মধ্যে লক্ষ করা যায়। যিনি পরে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কর্ণধার হয়েছিলেন। মহাপুরুষদের স্মৃতিচারণ করাও বড় কঠিন কার্য, তবু ওনার কৃপায় যা কিছু আমার স্মৃতিপটে আঁকা আছে তাই লেখার প্রয়াশ করছি মাত্র।

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সান্নিধ্য যদিও আমি বিশেষ পাইনি তবু যতটুকু পেয়েছি ওনাকে সর্বদা প্রসন্ন থাকতে দেখেছি। আমার উপর ওনার কৃপা অসীম। ইং ১৯৯২ সনে মার্চের অন্তিম সপ্তাহে আমাকে রামকৃষ্ণ মিশন, নারায়ণপুর থেকে বেলুড়

মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হলো। ঐ বছরেই মাহারাজজী মহাসচিবের পদ ছেড়ে মহা-উপাধ্যক্ষের পদে সুশোভিত হয়েছেন। উনি প্রায়ই কাঁকুড়গাছি থাকতেন তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখায় গিয়ে মন্ত্র দীক্ষা দিতেন ও ভক্তদের আধ্যাত্মিক মার্গদর্শন করাতেন, কিন্তু যতটুকু সময় বেলুড়ে আসতেন আমরা প্রশিক্ষার্থী ওনাকে প্রণাম করতে ওনার কাছে উপস্থিত হতাম। ওনার তেজময় মুখমণ্ডল সদাপ্রসন্ন ও হাস্যময় দেখেছি। ১৯৯৪ সনে প্রশিক্ষণ শেষ হলে আমায় পুনরায় নারায়ণপুর পাঠানো হয়। ওখানেই ভিতরের কেন্দ্রগুলির আমি কেন্দ্র প্রভারী পদের দায়িত্বপালন করতে থাকি। এর মধ্যে ১৯৯৫-৯৬ সনে তৎকালীন সচিব স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী মহারাজের ডাকে প্রয়াগরাজের মাঘ মেলার অবসরে তাঁবুতে পূজা তথা ভজন-কীর্তনের জন্য গিয়েছিলাম। ঐ বছরেই বিলাশপুর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের নব নির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের দ্বারোদঘাটন এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম ছিল। ঐ সময় তৎকালীন রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নারায়ণ সচিব স্বামী শ্রীকরানন্দজী মহারাজ আদেশ করলেন আমি যেন যত শীঘ্র সম্ভব প্রয়াগরাজ থেকে ফিরে আসি। আমি তখন রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, কানপুরের তৎকালীন সচিব স্বামী ভাগবতানন্দজী মহারাজের সঙ্গে ওখান থেকে বিলাশপুর আসি। পূজ্য শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের হাতেই ঐ নব নির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করানোর কথা হয়ে আসছে। মন্দির প্রতিষ্ঠার পশ্চাৎ ওনার যে কৃপা আমাদের সাধু- ব্রহ্মচারীদের উপর বর্ষিত হয় তা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ওনার উপস্থিতিতে মন্দির প্রতিষ্ঠার সাক্ষী হওয়া একটি আনন্দদায়ক অনুভূতি। এমন দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে সেই প্রথম যেখানে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং ভক্তগণ রামকৃষ্ণভাবে বিভোর হয়ে উঠেছেন। সেই দৃশ্য এখনও আমার অক্ষপটে ভাসে। ঐদিন মহারাজজী অশেষ কৃপা করেন গেরুয়া রঙের কাপড়ে মোড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি আমাদের প্রত্যেক সাধু ব্রহ্মচারীদের মস্তকে স্পর্শ করে দিয়েছিলেন। ঐ স্পর্শে পুরো শরীরের রোমাঞ্চ খেলে যায়। মনে হলো যেন জীবন ধন্য হয়ে গেল।

পূজ্য মহারাজজী বিলাশপুর থেকে ভিলাই হয়ে নারায়ণপুর আসেন। সম্ভবতঃ ঐ বছরই ভিলাই আশ্রমেও মহারাজজীর উপস্থিতিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। আমার ভিলাই আশ্রমের মন্দির প্রতিষ্ঠা দেখার সুযোগ হয়নি কারণ আমাকে নারায়ণপুরের ভিতরে সব কেন্দ্রগুলির এক কেন্দ্রান্তরগত বিবেকানন্দ মন্দির কচ্ছাপালের নব-নির্মিত মন্দিরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকতে হয়। মহারাজজী নারায়ণপুর এলেন। ওখান থেকে নারায়ণপুরের ভিতরে সব কেন্দ্রগুলি দেখে কচ্ছাপাল পৌঁছলেন। ওনার করকমল দ্বারা সেই নব-নির্মিত প্রার্থনা-মন্দিরের দ্বারোদঘাটন হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ, হনুমানজী ও মা দন্তেশ্বরী দেবীর (শক্তিপীঠ দন্তেওয়াড়া) পটস্থাপন

করা হয়। ভিতরের কেন্দ্রগুলির প্রভারী হবার দরুণ মহারাজজীর গাড়ীর সামনে একটি মোটরসাইকেলে বসে পাইলটের মতো পথ দেখাতে দেখাতে ওখানকার পাঁচটি কেন্দ্রতেই যেতে পেরেছিলাম। ঐ দিন আমার আনন্দের আর সীমা পরিসীমা ছিল না। মহারাজজী বোধ করি সঙ্ঘের প্রথম মহা-উপাধ্যক্ষ যিনি ঐ রকম দুর্গম স্থানে, যেখানে রাস্তা বলে কিছুই নেই সেখানে গমন করেন ও সেখানকার কার্য গতিবিধি দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন এবং সন্তুষ্ট হন। এমন মহারাজজীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মস্তক এমনি নত হয়ে আসে।

১৯৯৮ সনে আমার সন্ন্যাস দীক্ষা হেতু যখন বেলুড় মঠে আসি তখন ওনার দর্শন পাই, ওনার প্রফুল্ল প্রশান্ত বদন অবলোকন করে মন বড়ই তৃপ্ত হয়। আমি ঐ বছর নারায়ণপুর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে প্রায় তিন মাস বেলুড় মঠেই থাকি। সেই সময় নানা কারণে বিভিন্ন অবসরে ওনার দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করি। মহারাজজী দুর্গা পূজার পর সম্ভবতঃ নভেম্বরে বেলুড় মঠে এসেছিলেন। এর কিছুদিন পর কাঁকুড়গাছিতে সাধু-ভান্ডারা ছিল। মহারাজজীকে যখন প্রণাম করতে যাই তখন উনি স্বয়ং নিজ মুখে বলেন, "কাঁকুড়গাছিতে সাধু-ভান্ডারা আছে এসো।" আমার মনে আছে যে ঐ সাধু-ভান্ডারাতে গিয়ে অত্যন্ত সুখকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এরকম ছিল আমার প্রতি ওনার স্নেহ ভালোবাসা। এর কিছুদিন পর আমার চন্ডিগড়ে পোষ্টিং হয়। চন্ডিগড়ে এক বছর থাকার পর যখন আমি পুনরায় বেলুড় মঠে এলাম তখন পুনরায় মহারাজজীর দর্শন লাভ করি। মহারাজজীর আমার প্রতি অসীম কৃপা। যখনই ওখানে দর্শন করতে যেতাম ওনি অত্যন্ত স্নেহের সহিত হাস্যবদনে অবলোকন করতেন এবং আমায় ঠিক চিনতে পারতেন। আমার মতো নগণ্য নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি ওনার এত কৃপা। কোথায় উনি এই বিরাট সঙ্ঘের মহা-উপাধ্যক্ষ আর কোথায় আমি এক নবীন সন্ন্যাসী কিন্তু আশ্চর্য এই যে ওনার মধ্যে যে প্রসন্নতার অভিব্যক্তি দেখতে পেতাম সেইরূপ আর কারও মধ্যেই পাইনি এর কারণ আমি জানি না। আমার মনে হত উনি যেন এক অকৃত্রিম স্নেহের আধার। এটি অতিশয়োক্তি নয়। এটি সম্ভপর যে আমার মতোই সবার সবই অনুভূতি হয়েছে ওনার সান্নিধ্যে এসে, কে বলতে পারে।

২০০০-২০০১ সনে আমি রামকৃষ্ণ মঠ, জামতারাতে পূজারীরূপে কার্যরত ছিলাম। তখন মহারাজজী accupresure চিকিৎসার জন্য প্রায় এক সপ্তাহের বেশি সময় ওখানে ছিলেন, ঐ সময় ওখানকার তৎকালীন অধ্যক্ষ পূজ্য স্বামী আধ্যাত্মানন্দজী চৈতন্য মহারাজজী ছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ও স্বামী আধ্যাত্মানন্দজী মহারাজ পরস্পর গুরুভাই ছিলেন। দুজনের একই স্থানে সমাগম বড়ই আনন্দদায়ক ও মধুর ছিল। দুজনের উপস্থিতিতে ওখানকার বাতাবরণ আধ্যাত্মময় হয়ে উঠত। আমরা প্রতি রাতের ভোজনের পর মহারাজজীর নিকট গিয়ে ওখানে প্রণাম করে

ওনার কথা শুনতাম। মন আনন্দে ভরপুর থাকত। ওখানেও একদিন উনি একটি পুটলিতে রাখা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাবশেষ আমাদের সাধু-ব্রহ্মচারীদের মস্তকে স্পর্শ করে দেন। এখনও মনে আছে যে ঐ স্পর্শে আবারও শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল।

২০০১ সনে যখন মহারাজজী জামতারা মঠে ছিলেন তখন বর্তমান মহাসচিব স্বামী সুবীরানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, দেওঘরের সচিব ছিলেন। পূর্ব-নির্ধারিত কার্যক্রমানুসারে মহারাজজীকে নিয়ে যেতে জামতারায় এসেছিলেন। মহারাজজীর ইচ্ছানুসারে আমারও ওনার সঙ্গে দেওঘর বিদ্যাপীঠ যাবার সুযোগ হয়। মহারাজজীর সঙ্গে দেওঘরে স্থিত জ্যোতির্লিঙ্গ ভগবান বৈদ্যনাথ শিবজীর দর্শন, স্পর্শন ও পূজা করার সৌভাগ্য হয়। ওখানে দর্শনার্থীদের ভারি ভীড়। তথাপি ওখানকার অধিকারীবৃন্দদের সহযোগিতায় মহারাজজীর সঙ্গে আমাদের সবাইকে প্রায় ২০-২৫ মিনিট পূজা তথা অভিষেক করার সুযোগ প্রদান করা হয়। তথায় উপস্থিত পূজারীদের দ্বারা উচ্চারিত বেদ পাঠের মধ্য দিয়ে মহারাজজী ভগবান আশুতোষ বৈদ্যনাথ শিবজীর পূজা সম্পন্ন করলেন। মহারাজজী তথা অন্যান্য সন্ন্যাসীদের ওখানকার পূজারীরা শিব নির্মাল্য পরিয়ে ও ভস্ম ত্রিপুন্ড অংকর করে স্বাগত করলেন। ঐ ওখানে পংক্তিবদ্ধ শিব ভক্তবৃন্দ মহারাজজীর প্রতি শ্রদ্ধায় নত মস্তক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ওনার উপস্থিতিতে সেই দিনও ঐ মন্দির প্রাঙ্গণের পরিবেশ আধ্যাত্মময় হয়ে উঠে। আমার মনে আছে উনি প্রাঙ্গনস্থিত সমস্ত দেবী-দেবতার প্রতিকৃতিতে উনার শ্রদ্ধার্পন করেন।

আমি দেওঘর থেকে ফিরে যখন জামতারা মঠে এলাম তখন জানতে পারি আমার স্থানান্তরকরণ, ওখান থেকে বেলুড় মঠে হয়ে গেছে পুনহঃ বেলুড় মঠে ২০০১-২০০৩ পর্যন্ত প্রায় দুবছর থাকার সৌভাগ্য হয়। এই অবকাশে অনেকবার মহারাজীর সান্নিধ্য লাভ করি। যদিও ঐ দিনগুলিতে মহারাজজীর সঙ্গে বার্তালাপের সুযোগ কোনদিন পাইনি তথাপি ওনার স্নেহের অনুভব সর্বদা হত কারণ ওনার নেত্র তথা ওনার মুখমন্ডলের ভাবেই তা পরিপূর্ণ মাত্রায় অভিব্যক্ত হত। ২০০৩-এ পুনরায় আমার পোষ্টিং রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নারায়ণপুরে হয়ে গেল। এরপর আমি ওনার স্থূল শরীরে আর দর্শন পাইনি কিন্তু মহারাজজী সর্বদা আমার মানস পটে সজীব হয়ে আছেন। মহারাজজী সম্পর্কিত স্মৃতিকথা আমার কাছে বেশি নেই কিন্তু যেটুকু আছে সেটুকুই আমার জীবনে ম্লানহীন দাগ রেখে গেছে, সেটুকু ধ্যান করে, ওনার কৃপার কথা স্মরণ করে আজও আমার চোখে জল ভরে আসে তথা শ্রদ্ধায় মস্তক নত হয়ে যায়।

মহারাজজীর চরণে পুনঃপুনঃ প্রণাম ও শ্রদ্ধার্পন করে এই লেখায় বিরাম দিলাম।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

গহন আনন্দের কিঞ্চিৎ

স্বামী জ্ঞানদীপানন্দ

ভগবান শংকরাচার্য তাঁর বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে বলেছেন—"মনুষ্যত্ব-মুমুক্ষত্ব-মহাপুরুষ সংশ্রয়।" বহু পুণ্যের ফলে আমরা এই মানব জন্ম পেয়েছি। 'জন্ম' অর্থাৎ জীবন। জীবন হলো জন্ম ও মৃত্যুর মাঝের একটি অধ্যায়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ, যা কেবল এই দুর্লভ মনুষ্য জীবনেই হতে পারে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হলো একের দয়া বিনে জীব ছারে খারে গেল। শাস্ত্রে আছে অধ্যাত্ম জীবনে প্রবেশের জন্য গুরুকরণ একান্ত আবশ্যক। অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং বেশ কয়েকজন গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন—তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের সাধনকালে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্মশক্তির বীজমন্ত্র আমরা পেয়ে থাকি দীক্ষার মাধ্যমে। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘেও সেই চিরাচরিত গুরুকরণ বা দীক্ষা দেওয়ার প্রথা চালু আছে। এই মহতী মন্ত্রদীক্ষা কার্যটি সম্পন্ন করেন—সংঘাধ্যক্ষ ও সহ সংঘাধ্যক্ষ মহারাজগণ।

স্বামী গহনানন্দজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের চতুর্দশ সংঘাধ্যক্ষ। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ মাত্র চার বৎসর পূজনীয় মহারাজজীর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। পূজনীয় মহারাজজীর সঙ্গে আমার প্রথম সংলাপ হয় সম্ভবত ১৯৮৯ বেলুড় মঠের শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দিরের পশ্চিম দিকের রাস্তায়। পূঃ মহারাজজী তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সাধারণ সম্পাদক দ্বিতীয় পংক্তিতে খেতে যাচ্ছেন। আমি কোন কাজে কাঁকুড়গাছি থেকে মঠে গিয়েছি—প্রথম পঙক্তিতে খেয়ে ফিরছি। সামনা সামনি হতেই মহারাজজীকে প্রণাম নিবেদন করলাম। আমার পাঞ্জাবীর গলার কাছে ওপরের বোতাম খোলা দেখে পূঃ মহারাজজী আঙুল দিয়ে ইশারা করে বোতাম লাগাতে বললেন। সেদিন প্রথম বুঝেছিলাম—যাঁরা বড় হন—তাঁরা ছোটখাট কাজটিও সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

গুরুদেবের দেওয়া নাম—গহনানন্দ সার্থক নাম। পূজনীয় মহারাজ মোটেই আবেগ প্রবণ ছিলেন না। প্রতিকূল পরিবেশে তাঁকে মোটেই বিচলিত হতে দেখিনি। বরং বেশি স্থিতধী মনে হতো। দীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে কানপুর যাওয়ার কথা। রাস্তায় ট্রাফিকের জন্য হাওড়া স্টেশনে সময়মতো পৌঁছাতে না পারায় রাজধানী এক্সপ্রেস ধরতে পারা গেল না। পরের ট্রেন কালকা মেল ধরার জন্য পূজনীয় মহারাজকে প্রায় ৩ ঘন্টা হাওড়া স্টেশনে বসে থাকতে হয়। আমরা সেবকরা বিচলিত হয়ে পড়ি। পূজনীয় মহারাজজীর মধ্যে কোন ক্লান্তির ছাপ নেই। তিনি নির্বিকার যেন কিছুই হয়নি। পূজনীয় মহারাজজী ছিলেন "Ever Green"। তাঁর মুখমণ্ডলে কোন দিন কোন ক্লান্তির ছাপ লক্ষ্য করিনি।

দীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে পূজনীয় মহারাজ অনেক প্রত্যন্ত গ্রামে প্রাইভেট আশ্রমে গিয়েছেন, যেখানে যাতায়াতের ভালো ব্যবস্থা থাকত না এবং থাকার ও খাবারের ভালো ব্যবস্থা থাকত না—আমরা সেবকরা বিচলিত হতাম। পূজনীয় মহারাজ কিন্তু নির্বিকার স্থিতবী। মৃদু হেসে বলতেন—আমাদের বাবু এই ব্যবস্থা আছে—এতে পারতো দেখ।

আমরা বিশ্বাস করি সংঘাধ্যক্ষ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন্ত প্রতিনিধি। শ্রীশ্রীঠাকুর পূঃ মহারাজজীর মহাজীবন অধ্যায়ের মাধ্যমে দেড় লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে তাঁর পরমব্রহ্ম নামরূপ মহামন্ত্র দান করেছেন। দীক্ষাদানের ব্যাপারে পূজনীয় ছিলেন উদার। কেউ দীক্ষা নিতে এলে মহারাজজী সাধারণত তাকে ফেরাতেন না। পূঃ মহারাজজী জানতেন সংসারের ঝামেলা বা গ্রাম্য নিরক্ষতার জন্য সকলের সব সময় ঠাকুর-মা-স্বামীজির জীবনী পড়া সম্ভব হয় না। পূঃ মহারাজজী বলতেন—যাঁকে (অর্থাৎ ঠাকুরকে) জীবনের পথ প্রদর্শক আরাধ্য দেবতা হিসাবে গ্রহণ করবে—তাঁর সম্বন্ধে কিছু না জানলে তাঁর প্রতি ভালোবাসা কেমন করে হবে? তাই দীক্ষা দেওয়ার আগে মহারাজজী স্বয়ং দীক্ষার্থীদের ঠাকুর-মা-স্বামীজির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁদের উপদেশ সম্বন্ধে ধারণা দিতেন। দীক্ষা দেওয়ার সময় মহারাজজী একটু বেশি সময় নিতেন। বলতেন—আবার এদের (দীক্ষার্থী ভক্তদের) সঙ্গে কবে দেখা হবে তার তো কিছু ঠিক নেই—না হয় একটু বেশি সময় এদের সাথে থাকলাম। তাঁর এই উক্তিতে বোঝা যেত—শিষ্যের প্রতি গুরুর কি ভালোবাসা! দীক্ষাকালে গুরু প্রণামের সময় পূজনীয় মহারাজজী দীক্ষিত ভক্তদের মাথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদী কিছু স্পর্শ করাতেন। সেই সময় মহারাজজীর স্নিগ্ধ মুখশ্রী দেখে মনে হতো স্বয়ং ঠাকুর মহারাজজীর মদ্য দিয়ে ভক্তদের আশীর্বাদ করছেন।

পূজনীয় মহারাজজী ছিলেন ভালো শ্রোতা। তাঁর দীক্ষিত সন্তানদের আধ্যাত্মিক জীবন ও সংসার জীবনের সমস্যাগুলি মন দিয়ে শুনতেন এবং উপযোগী পরামর্শ দিতেন। দৈনন্দিন ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্য মহারাজজী নিজের প্রতি বিশ্বাস অর্থাৎ আত্মশ্রদ্ধার উপর গুরুত্ব দিতেন। এই প্রসঙ্গে ভক্তদের প্রায় কঠোপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যান ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা..." শ্লোকটি উল্লেখ করতেন।

মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য মনকে সর্বদা এক উচ্চ আধ্যাত্মিক চেতনায় জাগিয়ে রাখে। পূঃ মহারাজজীর কাছে যখন ছিলাম—তখন সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো, অথচ তার মধ্যে জপধ্যান-স্মরণ-মননে খুব আনন্দ পেতাম। বেলুড়মঠে মিটিং থাকলে আগের দিন সন্ধ্যারতির পর ভক্তদের প্রণাম নিয়ে তিনি যোগোদ্যান থেকে মঠে আসতেন সাধারণত আমাকে নিয়ে। সন্ধ্যারতির পর জপধ্যানের সময়—পূজনীয় মহারাজজী গাড়ির পিছনের সিটে বসে ধ্যান করছেন আর আমি ড্রাইভারের পাশে বসে জপ করছি—তখন গাড়ীটাকেই যেন মনে হতো মন্দির। ট্রেনে যাওয়ার সময়ও তিনি ভোর চারটার সময় উঠে ধ্যানে বসতেন, হয়তো আমরা সেবকরা তখনও ঘুমাচ্ছি। রাত্রিতে ঘুমাতে দেরি হলে আমাকে ভোরের সময় ডেকে দিতে বলতেন। ডাকতে গিয়ে দেখি ঘরে ছোট আলো জ্বলছে—তিনি ধ্যানে মগ্ন। পূজনীয় মহারাজজী ছিলেন বাকসংযমী আর আমি ছিলাম তার উল্টো, হলোহলো করে বেশি কথা বলতাম। মহারাজজী আমাকে বাকসংযমের উপযোগিতা সম্বন্ধে বোঝালেন এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার প্রতি সংযম আনতে বললেন।

আমি একজন সামান্য ব্রহ্মচারী, দয়া করে তিনি তাঁর সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি একদিন মহারাজজীকে বললাম—মহারাজজী আমার একটি প্রার্থনা আছে। তিনি বললেন—ঠিক আছে বল। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্র, তবুও কিছু কিছু ব্যাপারে তার নিজস্বতা। যেহেতু ঠাকুরের পার্ষদ মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত কিছু নিয়ম চালু করে গেছেন। অন্যান্য শাখা কেন্দ্রে মন্দিরে প্রতিদিন মঙ্গলারতি হয়। কিন্তু যোগোদ্যানে বৎসরে ২ মাস মঙ্গলারতি হয়। যোগোদ্যানে মঠে তখন আমাদের প্রায় ১০-১২ জন ব্রহ্মচারী। ভোরের সময় কেউ কেউ মন্দিরে আসত—কেউ কেউ আসত না। মহারাজজীকে বললাম—যদি প্রতিদিন মন্দিরে মঙ্গলারতি হয় এবং নিয়ম করা হয়—সকল ব্রহ্মচারীকে মঙ্গলারতিতে যোগ দিতে হবে। আমার এই প্রার্থনা পূজনীয় মহারাজজীর মন স্পর্শ করল। তিনি পূজারী ঠাকুরদাস মহারাজ ও ভান্ডারী অরুন মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিদিন মঙ্গলারতির ব্যবস্থা করলেন। আমার প্রার্থনা পূর্ণ হওয়াতে আমার খুব আনন্দ।

ভোর চারটের সময় উঠে জপধ্যানের পর নিত্য কিছু সময় ব্যায়াম করতেন। দীর্ঘদিন নিত্য ব্যায়ামাদির ফলে মহারাজজীর শরীর স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল। বাথরুমে দুটি বালতিতে ঠাণ্ডা গরম জল মিশিয়ে স্নানের জল ঠিক করে দিতাম। স্নান সেরে মহারাজজী মন্দিরে যেতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজির পাদপদ্মে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে প্রণাম করতেন। আমি এই সময় টিফিন তৈরী করতাম এবং মন্দির থেকে ফিরে এলে মহারাজজীকে খেতে দিতাম। মহারাজজী ছিলেন খুবই সিতাহারী। খাওয়ার ব্যাপারে তাঁহার সংযম ছিল দেখার মতো। তিনি একটু একটু করে সব রকম ফল (আপেল, পেঁপে, মুশাম্বি, বেদানা, কলা ইত্যাদি) ও এক কাপ দুধ আর ছোট্র ছোট্র ২ পিস মাখন দেওয়া পাঁউরুটি ও চা খেতেন।

যোগোদ্যানে তাঁর বিছানার পার্শ্বে ছোট কুলুঙ্গীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি ছবি তিনি রেখেছিলেন এবং পার্শ্বে থাকত ছোট্ট একটি কমণ্ডুলুতে গঙ্গাজল। মাঝে মাঝে গঙ্গা জল দিয়ে তিনি ঠাকুরের ছবিটি পরিষ্কার করতেন।

স্বামীজির শিব জ্ঞানে জীব সেবা রূপ কর্মযজ্ঞের তিনি ছিলেন এক সুদক্ষ পুরোহিত। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী দয়ানন্দজী ছিলেন শিশুমঙ্গলের প্রতিষ্ঠাতা আর পূজনীয় মহারাজজী ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের সফল রূপকার, যাহা বর্তমানে—রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান।

দশম সংঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরেশ্বরানন্দজী ছিলেন ঠাকুর-মা-স্বামীজির ভাবপ্রচার পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। রামকৃষ্ণ সংঘের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন পূজনীয় মহারাজ এই পরিষদের মধ্যে সুশৃঙ্খল রূপ দান করেন। যার মাধ্যমে ভারতবর্ষের সর্বত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে ঠাকুর-মা-স্বামীজির ভাব ছড়িয়ে পড়ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সেবাকার্য্যে সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যেসব কর্মচারীগণ যুক্ত তাদের আর্থিক ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পূঃ মহারাজ প্রভিড্যান্ট ফান্ড নিয়ম চালু করেন। স্বামীজির সেবামূলক কর্মসূচীর বৃদ্ধির সাথে সাথে আশ্রমগুলির পারিপার্শ্বিক জমি সংক্রান্ত পরিধির বিস্তারে পূজনীয় মহারাজজী খুব উৎসাহী ছিলেন। নিজেই যোগোদ্যান মঠের পাশে টাটার জায়গাটি ক্রয় করে তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

স্মরণং তব ইতি ধ্যান-চিন্তনম্

স্বামী গুণাশ্রয়ানন্দ

পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ যিনি আমাদের রামকৃষ্ণ সংঘের ১৪তম পরমাধ্যক্ষ ছিলেন। পূজনীয় মহারাজজীর সঙ্গ এবং তাঁর সাথে অতিবাহিত করা দিনগুলোর স্মৃতি আমার জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। যেমন তাঁর নাম তেমন তাঁর জীবনও অর্থাৎ গহনাতিগহন বিবিধ রূপে জীবন অতিক্রম করে নিজের জীবনে গহন আধ্যাত্মিক অনুভূতির আত্মসার করে তিনি নিজের জীবনে এই নামকরণের সার্থকতা করে দেখিয়েছেন। পূজনীয় মহারাজজীর জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনাই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। আমি আমার জীবনে তাঁকে অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি, তাঁর সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। পূজনীয় মহারাজজী সম্পর্কে যদি কিছু লিখতে পারি তবে আমি নিশ্চয় নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করব। কিছু কিছু তাঁর স্মৃতিকথা যা আমার স্মৃতিগোচর আছে, তাই পূজনীয় মহারাজজীর শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ অর্পণ করছি। আমি যখন কলেজের পড়াশুনা শেষ করে বেলুড় মঠস্থিত ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ব্রহ্মচারী রূপে প্রবেশ করি তখন স্বামী গহনানন্দজদী মহারাজ মহাসচিব পদে শোভিত ছিলেন, সেই সময় আমার বলতে গেলে খুবই অল্প বয়স ছিল এবং বিশেষ করে বেলুড় মঠের নিয়মানুবলী সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। বেলুড় মঠের নবাগত (PPTC) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একজন মনিটার থাকে, যিনি কিনা নবাগতদের কীভাবে থাকতে হয় সেই সম্পর্কে অবগত করান।

নবাগতরূপে সাধু হওয়ার জন্য মঠে যোগদান করার মাত্র কয়েকদিন হয়, একদিন রাতের খাবার শেষ করে সকল ব্রহ্মচারীগণ নিজের নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমিও যখন ভোজন কক্ষ থেকে আমার ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম তখন পুরানো মিশন কার্যালয় যা কিনা বেলুড়মঠের মুখ্য মন্দিরের সম্মুখে ছিল, সেটার উপর তলার তখনও আলো জ্বলছিল এবং সেই কার্যালয়ের আলো জ্বলছে দেখে সেখানে গেলাম, একজন লম্বা

করে খুব তেজস্বী ব্যক্তিত্বকে দেখতে পেলাম, সেইরকম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি, পূজ্য মহারাজজীর এই ব্যক্তিত্ব এখনও আমার স্মৃতিপটে, অঙ্কিত আছে। একজন তেজস্বী, সুন্দর গেরুয়াধারী, সম্পূর্ণ সুগঠিত শরীর সম্পন্ন মহারাজ নিজের কাজে ব্যস্ত, তখন প্রায় রাত ১.৩০ বাজে। তাঁর হাতে কিছু চিঠিপত্র ছিল যা তিনি পড়ছিলেন। আমি খুব কাছে গিয়ে তাঁর হাত থেকে চিঠিপত্রগুলো নিয়ে নিই এবং কার্যালয়ের ঘড়ি দেখিয়ে বলি, মহারাজজী ঘড়ি দেখুন অনেক রাত হয়ে গেছে, আপনি আপনার রাতের খাবার খেয়ে নিন্ এবং বিশ্রাম করুন। পূজনীয় মহারাজজী তাঁর তেজস্বী মুখমন্ডলে একটু মৃদু হেসে আমার দিকে তাকান এবং আমার কাঁধে আশীর্বাদ স্বরূপ হাত রেখে গম্ভীর গলায় বললেন তুমি কি খেয়েছ? আমি হ্যাঁ বললাম, তখন পূজনীয় মহারাজজী বললেন এখন তুমি বিশ্রাম করো, কেন না তোমাদের ভবিষ্যতে এই সংঘে থেকে অনেক কাজ করতে হবে, তাই তুমি বিশ্রাম নাও এবং এই ভাবে পূজনীয় মহারাজজী সহাস্য মুখে চকলেট দিয়ে আমায় বিদায় করলেন। আমি তাঁর মতো ব্যক্তিত্বকে দেখে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। তারপর যখন আমি আমার ঘরে ঢুকি তখন দেখি আমাদের লিডার যাঁকে আমরা বড়দা বলতাম, তিনি দেরি করে ঘরে ঢুকার কারণ—জিজ্ঞেস করলেন, কারণ আমি তখন নতুন নতুন এসেছি, তাই তিনি আমায় নিয়ে চিন্তা করতেন। আমি উত্তর দিলাম যে আমি ঐ মহারাজজীর কার্যালয়ে গিয়েছিলাম। আমার লিডার বুঝতে পারলেন যে আমি জেনারেল সেক্রেটারি মহারাজের কার্যালয়ে ছিলাম। তখন তিনি আমায় বললেন আরে তোমার তো সাংঘাতিক সাহস, তুমি জান না উনি কে ? মহারাজজী সম্পূর্ণ রামকৃষ্ণ মিশনের মহাসচিব অর্থাৎ জেনারেল সেক্রেটারি। আমি উত্তরে বললাম আমি কি জানি। কিন্তু উনি তো আমায় অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ সহাস্য মুখে কথা বললেন। আমাদের লিডার খুব ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু এমন মহান সন্ন্যাসীর সঙ্গে এইভাবে দেখা করে আমার মন তো আনন্দে বিহ্বল হয়ে ওঠে এবং সেই আনন্দ নিয়েই কখন যে রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে আমার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (PPTC) এর ইনচার্জ বললেন যে সত্যি সত্যি তুমি খুব ভাগ্যবান বলেই এই সুযোগ পেলে। আমি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (PPTC) এ প্রায় ৯/১০ মাস ছিলাম। এবং তারপর কেরল রাজ্যের কালীকট সেন্টারে আমাকে নিযুক্ত করা হয়। তখন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ সংঘের উপাধ্যক্ষ পদে সুশোভিত ছিলেন। স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ যিনি এই নবাগত ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু করেছিলেন তিনি তখন মহাসচিব পদে নিযুক্ত হন এবং আমি কেরলের

কালীকট রামকৃষ্ণ মিশনে নিযুক্ত হই। সেখানকার মহারাজ স্বামী সিদ্ধিনাথানন্দজী এবং স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সন্ন্যাস ১৯৪৮ সালে এক সঙ্গে হয়েছিল। সুতরাং স্বামী সিদ্ধিনাথানন্দজী স্বামী গহনানন্দজীকে কালীকট আসার জন্য আমন্ত্রণ করেন। আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি ১৯৯৩ বা ৯৪ সালে আসেন এবং আবারও আমি তাঁকে সংঘের উপাধ্যক্ষ রূপে দর্শন করি। পূজ্য স্বামী গহনানন্দজীর কালীকট আগমনের আগে সেখানকার সচিব স্বামী সিদ্ধিনাথানন্দজী আমায় ডেকে পাঠালেন এবং বললেন উপাধ্যক্ষ মহারাজ আমার ঘরে থাকবেন, সুতরাং তুমি তোমার ঘরটিকে ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখো। এটা শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘরটিকে পরিষ্কার করে ওটাকে উপাধ্যক্ষ মহারাজের থাকার জন্য সজ্জিত করি। এখন আমার মন আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করি কবে যে তিনি আসবেন। যথাসময় অনুসারে পূজনীয় মহারাজ উপাধ্যক্ষ রূপে সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। পূজনীয় মহারাজের তেজস্বী মুখমন্ডল এবং বিশাল ব্যক্তিত্ব দেখে আমি ধন্য হই। পূজনীয় মহারাজের কালীকটে ২ বা ৩ দিন থাকা হয় এবং আমি সেবা করার সুযোগ পাই। পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ রাতে খাচ্ছিলেন তখন আমি জিজ্ঞেস করি, মহারাজজী এই ঘরে আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো? পূজনীয় মহারাজের উত্তর শুনে আমি অবাক হয়ে যাই, আমার চোখ দুটো স্থিত হয়ে যায়। তিনি উত্তরে বললেন, 'এটা তোমার ঘর না? এটাই হলো মহাপুরুষের গহন চিন্তন যে অন্যের মনের ভাবকে বুঝতে পারেন। আমি কিছু উত্তর দিলাম না শুধু নিজেকে ধন্য অনুভব করলাম। যে দিন তিনি কলকাতায় ফিরে যাবেন সেই দিন পূজনীয় মহারাজের প্রাতরাশের আগে নিজের ঘরে শারীরিক ব্যায়াম করছিলেন। আমি প্রথমবার পূজনীয় মহারাজকে খোলা শরীর দেখি এবং সত্যি সত্যি তাঁর শরীর তেজস্বীতায় পূর্ণ মনে হচ্ছিল, যেন এক অধ্যাত্মিক অন্তরদৃষ্টি নিহিত আছে। শারীরিক ব্যায়ামের পরও তিনি ঘরেই ছিলেন এবং সেখানেই তিনি প্রাতরাশ করলেন। সেই দিন প্রাতরাশে ইডলী, সাম্ভার, চাটনী ছিল, তিনি তা নিলেন। আমি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। উনি ইশারা করে আর একটি ইডলী দিতে বললেন, আমি এক সঙ্গে দুটো ইডলী দিয়ে দিই এবং বলি খেয়ে নিন তখন তিনি আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন এটা উঠিয়ে নাও এবং এখন খেয়ে ফেল। আমিও প্রসাদ মনে করে খেয়ে ফেলি। অগণিত স্মৃতি রেখে পূজনীয় মহারাজ কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তখন আর আমার ইচ্ছা হলো না ঘরটিতে থাকার কারণ সেই ঘরটি তাঁর স্পর্শে পবিত্র হয়ে গেছিল, যা স্মৃতিগুলোকে মনে করিয়ে দিতে। তারপর ১৯৯৫ সালে ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ

কেন্দ্র (PPTC) বেলুড় মঠে স্থিত সেখানে আমার ২বছর প্রশিক্ষণ হয়। সেই সময়কালে পূজনীয় মহারাজ বিশেষ দিনে বা মিটিংয়ে বেলুড়মঠ কাঁকুড়াগাছি থেকে আসতেন। একবার আমরা সবাই পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম করতে যাচ্ছি সেই সময়ে উনি আমায় চিনে ফেললেন এবং হাসি মুখে বললেন কালী...কট...(মা কালী যেমন বন্ধন ছিন্ন করেন সেই ভাব নিয়ে) এবং সবাই আমরা হাসতে লাগলাম।

আমি বেলুড়মঠে ২বছর ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ শেষ করে ব্রহ্মচারী পরেশ চৈতন্য দীক্ষা নিয়ে দিল্লীস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনে আমার নিযুক্তি হয়। সেখানে আমি পূজনীয় স্বামী গোকুলানন্দজী মহারাজ যিনি ষষ্ঠতম পরমাধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্র দীক্ষিত এবং পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ও স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের শিষ্য ছিলেন। এখন আমি একটি সুন্দর সুযোগ পেলাম স্বামী গোকুলানন্দজী মহারাজ থেকে তাঁর গুরু স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কিছু স্মৃতিকথা শোনার। কিন্তু তিনি নিজের গুরু স্বামী বিরজানন্দজী লিখিত পুস্তক, "পরমার্থ প্রসঙ্গ" এ লেখা প্রসঙ্গ এবং কথা বিশেষ রূপে—বলতেন এবং সেটাই সত্যি সত্যি স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী গোকুলানন্দজী মহারাজ নিজেদের জীবনে চরিতার্থ করে মহান সন্ন্যাসী এবং আদেশ আধ্যাত্মিক পথে যারা যেতে চান তাঁদের আদর্শ প্রতীক হিসাবে উপস্থিত হন। দিল্লী স্থিত রামকৃষ্ণ মিশনে আমি প্রায় ১৮ বছর থাকি এবং তার মধ্যে প্রায় ১০ বছর স্বামী গোকুলানন্দজী মহারাজের সঙ্গে থাকার সুযোগ হয়। তিনি কখনও কখনও কথা প্রসঙ্গে তাঁর গুরু স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী গহনানন্দজদী মহারাজ সম্পর্কে আমার কাছে বলতেন এবং আরও বলতেন যে আসল কর্মযোগীরূপে গীতাতে যা বলা হয়েছে এবং স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ যা বলা হয়েছে তার মূর্তি মন্ত্র স্বরূপ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ছিলেন।

আমি স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের খুব কাছে থেকেছি এবং তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তিনি রামকৃষ্ণ সংঘে অত্যন্ত ধৈর্য এবং অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েও স্থিতপ্রজ্ঞ থেকে অনেক অনেক কাজ বিশেষ করে বিবাদিত জমি ও সম্পত্তির মামলা, নতুন নতুন আশ্রম স্থাপিত করা ইত্যাদি, অগণিত এমন সমস্যাগুলোকে ধৈর্যপূর্বক নিজের কুশাগ্র বুদ্ধির দ্বারা সমাধান করেছেন, যা রামকৃষ্ণ সংঘে পূজ্য মহারাজজীর অবদান অমলিন থাকবে। মধ্য রাত পর্যন্ত কাজ করে যেতেন কিন্তু তাঁর মুখমন্ডলে কোন ক্লান্তির রেখা প্রতিফলিত হতে দেখিনি।

আমি দিল্লী থাকাকালীন পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ হৃদরোগের চিকিৎসার

জন্য প্রায় ৩ মাস দিল্লী আশ্রমে ছিলেন। আমরা সকল সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দগণ পূজনীয় মহারাজজীর সেবা করি। সেই সময় আমি সাধুসেবা সম্পর্কে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। পূজ্য মহারাজের খুব সরল কথার ভিতরও গহন তথ্য লুকানো থাকত, যা এখানে সমস্ত কথা বিস্তারিতভাবে লেখা সম্ভবপর নয়। পূজনীয় মহারাজজী আধ্যাত্মিক পিপাসুদের জন্য অনেক দুর্গম স্থানে দীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেতেন এবং সব রকম প্রতিকূল ও অনুকূল পরিবেশকে খুব সুন্দরভাবে বরণ করে নিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের চার যোগ—জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এবং রাজযোগ ও প্রেমের সুগম সমন্বয় পূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মধ্যে মূর্তিমান ছিল। বিশেষ কিছু নয় যদি আমরা পূজ্য মহারাজজীর জীবন থেকে কিছু আদর্শ নিয়ে নিজের জীবনে চরিতার্থ করি তবে আমাদের জীবনে অনেক পরিবর্তন অনুভব করব এবং সেটাই পূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের চরণে প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি হবে ও সে সঙ্গে আমাদের জীবন ধন্য হয়ে উঠবে, আর এটার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজি মহারাজ আমাদের শক্তি, ভক্তি প্রদান করবেন।

স্মৃতির পাতায় পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ

দেওঘর ১৯৯৪

১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অন্যতম শাখা আশ্রম দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ-এ আমি প্রথম যোগদান করি। সেসময় পরমপূজ্য স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ আমাদের এই আশ্রমের অধ্যক্ষ (প্রধান) ছিলেন।

১৯৯৪ সালের (অথবা ১৯৯৫) শেষের দিকে কোনো সময় রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজ পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী কয়েকদিনের জন্য দেওঘর বিদ্যাপীঠ পরিদর্শনে আসেন। আমার মনে পড়ে সেসময় তিনি বেশ কিছু অধ্যাত্মপিপাসু ব্যক্তিদের মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন। একদিন রাত্রে, আহারের পর তিনি সব সাধু ও আমাদের মতো নবাগত ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে বসেন। সেসময় বেশ কিছু নবাগত ব্রহ্মচারী ছিল দেওঘরে।

পরমপূজ্য মহারাজজী আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কিসের জন্য এই সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করলে?" আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজ নিজ চিন্তাভাবনা অনুযায়ী যথাসাধ্য উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম। কেউ বললে, "আমি মনে শান্তি পেতে চাই।" অপরজন বললে, "আমি এক স্তব্ধ ও পবিত্র জীবনের অধিকারী হতে চাই।" আরো কেউ কেউ বললে, "আমি ঈশ্বর উপলব্ধি করতে চাই।" পরমপূজ্য মহারাজজী খুব মনোযোগ সহকারে সকলের কথা শুনলেন এবং সবশেষে একটি মাত্র কথা শুধু বললেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রশান্ত। হাসি হেসে খুব শান্ত স্বরে বললেন, "তোমরা সকলেই কিছু পেতে এসেছ, কেউ দিতে আসনি ?"

আমার মনে পড়ে সেসময় তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি আমার একটুও ভাল লাগেনি এবং সেকথা এখনও আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। প্রথমত আমার মনে হয়েছিল, 'আমরা নবাগত ব্রহ্মচারী মাত্র—আমরা কি দিতে পারি? এখন আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন

গঠনের জন্য প্রয়োজন উপদেশ, শিক্ষা ও ট্রেনিং। তারপর না হয় আমরা অন্যকে কিছু দিতে পারব।" কিন্তু যতদিন যেতে লাগল তাঁর এই সহজ কথাগুলি উপযুক্ত অর্থ ও প্রেরণাসহ মনের মধ্যে বোধগম্য হয়ে উঠতে লাগল। আমি অনুভব করলাম যে তাঁর এই সাধারণ কথাটির মাধ্যমে তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের এক অতি অমূল্য শিক্ষাপ্রদান করেছেন। কেবলমাত্র গ্রহণ নয়—দান করার মানসিকতা যদি সর্বদা আমাদের মনের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা যা চাই তা স্বাভাবিকভাবেই আমরা লাভ করব। মানসিক শান্তি, জীবনের পবিত্রতা এমনকি ঈশ্বরোপলব্ধি পর্যন্ত আমাদের জীবনেরসহজলভ্য হয়ে যাবে কেবলমাত্র এই মানসিকতা থেকে——কিছু চাওয়া নয়, শুধু দিয়ে যাওয়া।'

তারপর পঁচিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে কিন্তু পরমপূজ্য মহারাজজীর প্রশান্ত মুখচ্ছবি, তাঁর স্নিগ্ধ হাসি, তাঁর কণ্ঠস্বর এবং সেদিনের সেই কথাগুলি আজও আমার স্মৃতিতে সমানভাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

গহন, গভীর এক দিব্যজীবন

স্বামী স্তবপ্রিয়ানন্দ

সালটা ছিল ২০০৬। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দের শুভ আবির্ভাব তিথির শেষ রাত্রে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্ঘগুরু পরম পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী ব্রহ্মচারীদের আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করছেন। পুজনীয় মহারাজের ডান হাতের কব্জী ভাঙ্গা থাকার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। দীক্ষান্তে গর্ভমন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিগ্রহের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে প্রার্থনারত। লেখক আছে মহারাজজীর বাম পাশে। হঠাৎই প্রার্থনা থামিয়ে সেবককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক'জনের ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা হলো?' উত্তর এল '৩৮'। আবার সেই নিরুচ্চারিত প্রার্থনা শুরু হলো। কিছুক্ষণ থেমে আবার একই প্রশ্ন, একই উত্তর, একই সঙ্গে প্রার্থনা চলল। লেখক হতবাক। মনে হচ্ছে, তিনি সব কিছু যেন শ্রীশ্রী ঠাকুরকে জানাচ্ছেন। আমরা আমাদের সঙ্ঘগুরুকে শ্রীশ্রীঠাকুরের চলমান বিগ্রহ বলে বোধ করি আর তিনি মনে করেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক। সর্বাবস্থায় সব কিছু শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানানোর দরকার কারণ তিনিই মালিক। সেই আধো অন্ধকার রাতে এক নতুন আলোক জ্বলে উঠল লেখকের মনে। আর যিনি তা প্রজ্জ্বলিত করলেন তিনি স্বামী গহনানন্দ, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চতুর্দশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ।

খুব দীর্ঘ সময় সঙ্গ করার সুযোগ হয়নি লেখকের কিন্তু যখনই দেখেছি মনে হত এক গভীর ভাবনার জগতে ডুবে আছেন। সব থেকে আকর্ষণীয় তাঁর শান্ত, উজ্জ্বল, হাস্যোজ্বল মুখখানি। যেন নির্ভাবনার এক জীবন্ত বিগ্রহ।

১৯৯৬ সাল। প্রথমবার রামকৃষ্ণ মঠ বারাসাতের শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পূজারী হবার সৌভাগ্য হয়েছে লেখকের। মহাষ্টমীর ভোগ উঠবে। এমন সময় পূজনীয় মহারাজ এলেন। পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ঘরে চলে গেলেন। ভোগারতির পর পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম করতে গিয়েছি বললেন, "তুমি মাকে কি বললে?" ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। ক্ষনিক বাদে নিজেই উত্তর দিলেন, বললেন, "মা-কে বলবে, মা! আমরা সবাই

মন-প্রাণ উজার করে তোমার পূজাটির আয়োজন করেছি, তুমি আমাদের সবার পূজা গ্রহণ কর, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ কর। আশ্রমের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কর।"

কাঁকুড়গাছি থেকে বেলুড় মঠে এলেই তিনি সব সাধু ব্রহ্মচারীদের প্রণাম নিতেন। পরিচিতদের খোঁজ নিতেন, নতুনদেরও জিজ্ঞাসা করতেন। 'পোষাক যেন ঠিক থাকে, সবার কাঁধে যেন উত্তরীয় থাকে, পাঞ্জাবির উপরের কিন্তু বোতাম যেন বন্ধ থাকে।'

—ত্রৈমাসিক অছি পরিষদের বৈঠকে এলে রোজ সন্ধ্যায় সদর কার্যালয়ের বারান্দায় পায়চারী করতে আসতেন। ঐ সময় দপ্তরে আমরা কেউ কাজ করলে ঘরে আসতেন। কি কাজ করছি জিজ্ঞাসা করতেন। একবার ত্রাণ বিভাগের প্রধান স্বামী গোপালানন্দজী গুজরাটের মানচিত্র নিয়ে দেখাচ্ছেন কোথায় কোথায় ভূমিকম্পের পর পুনর্বাসনের কাজ চলছে। প্রায় আধ ঘন্টারও বেশি গভীর আগ্রহ নিয়ে সব দেখলেন। প্রশ্নও করলেন, অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। সেবক শেষের দিকে তাড়া দিচ্ছেন মহারাজজীর পায়চারী হচ্ছে না। আমরা বলতে বলতে থেমে গেলে উনি বললেন, 'ও (সেবক) ওর কাজ করুক (তাড়া দিতে থাকুক) তোমরা তোমাদের কাজ কর (বলে যাও তোমাদের কথা)।

আরেকবার আমাদের দপ্তরে এসেছেন। আমরা তখন বার্ষিক হিসাব চূড়ান্ত করার কাজে ব্যস্ত। আমাদের বললেন, "ও হো, তোমাদের তো এখন বার্ষিক দুর্গাপূজা। দম ফেলার সময় নেই।' মহারাজজীকে অনুরোধ করলাম 'আমার চেয়ারে একটু বসুন' বললেন, 'কেন বসব' বললাম আমার খুব ভাল লাগবে। সঙ্গে সঙ্গে বসলেন। ফিরবার পথে নিজের বাম হাত দিয়ে আমার ডান হাতটা ধরে থাকলেন। যখন চলে গেলেন মনে হলো হাতটি বড় পবিত্র হয়ে গেছে।

সঙ্ঘগুরু হবার পর রোজ হাঁটতেন সন্ধ্যারতির পর নিজের বাসভবন থেকে প্রধান ফটক অবধি। পরে অবশ্য আর তা সম্ভব ছিল না। সদর কার্যালয়ের সাধুরা প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় সমবেতভাবে কালী কীর্তন অভ্যাস করত। একদিন এমনই সঙ্গীত অভ্যাসের সময় মহারাজজী হাঁটতে বেরিয়েছেন। বেশ অনেকটা সময় সদর কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে গান শুনেছেন। পরদিন প্রণামের সময় আমরা ওনার কাছে গেলে সেবক আমাদের সঙ্গে 'কালকের গানের দল' বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। "বেশ গান, জানো।" পূজনীয় মহারাজ বললেন। আমাদের দলনেতা মহারাজজীকে বললেন "আমাদের এই গান গাওয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রীতি উৎপাদনের জন্য। আপনি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিনিধি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের গাওয়া গানে আপনার ভাল লেগেছে মানে

তা ঠাকুরেরও ভাল লেগেছে। আমাদের গান গাওয়া এখন সার্থক।" মহারাজজী এক অপূর্ব হাসি হাসলেন। আমাদের মনে হলো, যেন সত্যিই শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের গীতি অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন।

মহারাজজীকে যত দেখেছি তত মনে হয়েছে তিনি যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিত হয়ে বসে আছেন। এত শারীরিক কষ্ট কিন্তু কিছু স্পর্শ করত না তাঁকে। মনে হ'ত দৈহিক কষ্ট তাঁর মনের দরজার কাছে এসে No entry বোর্ড দেখে থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

মহারাজজীকে দেখি প্রথম যখন তিনি সহকারী সম্পাদক, পরে সাধারণ সম্পাদক হলেন, সহকারী সঙ্ঘগুরুর পদ অলঙ্কৃত করলেন। কিন্তু সর্বাবস্থায় দেখেছি তিনি আছেন তেমনি, ঈশ্বরনির্ভরশীল প্রার্থনা-পরায়ণ হয়ে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে যাঁরা কর্মী বিশেষতঃ সরকারী অনুদানে যাঁদের বেতন হয় না তাদের জন্য তাঁর ভাবনা চিন্তার শেষ ছিল না। কেমন করে অন্যান্য খরচ কমিয়ে কর্মীদের বেতন বেশি দেওয়া যায় তা নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবতেন। সামান্য বেতনে কাজ করার পর অবসরের পর কর্মীদের অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ১৯৭১ সালে তৈরি হয় প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাষ্ট (ভবিষ্যৎ নিধি কোষ)। এটি কর্মীদের অবসর পরবর্তী সময় আর্থিক কষ্টের হাত থেকে রক্ষা করে। তাঁর এই চেষ্টা জন্ম দেয় সদর কার্যালয়ে 'রামকৃষ্ণ ভবিষ্যৎ নিধি কোষ' যা প্রায় মঠ মিশনের প্রতিটি কর্মীর সেবাতে নিরত।

দৈবাসুর সংগ্রামে দেবতাদের মুক্তির জন্য প্রয়োজন ছিল দিব্যাস্ত্রের। দধীচি তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করেন আর তাঁর অস্থি দিয়ে তৈরি হয় দিব্যাস্ত্র। যা মুক্তি দেয় দেবতাদের, বিজয় আসে দৈবাসুর সংগ্রামে।

পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মহাপ্রয়াণের আগে প্রায় ৫ মাস সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ছিলেন। দূর থেকে দেখে মনে হত রণক্লান্ত সৈনিক চলেছে মহাপ্রয়াণের পথে। মুখে ছিলনা ক্লান্তি, তার বদলে ছড়িয়ে ছিল নিজেকে ভুলে আত্মোৎস্বর্গের সন্তুষ্টির দীপ্তি। মনে হয়েছিল এ যুগের দধীচি তাঁর সবটুকু উজাড় করে দিয়ে গেলেন আগামী দিনের মানুষকে, যারা তাদের অন্তরের অসুরকে বধ করে মনুষত্ব থেকে দেবত্বে উত্তীর্ণ হবে।

ধন্য তারা যারা এই দিব্যজীবনের আলোয় নিজেদের আলোকিত করার সৌভাগ্য লাভ করেছে ও করবে। পরম পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজীকে আমাদের অন্তরের ভক্তি বিনম্র প্রণতি।

কয়েকটি স্মৃতিকণা

স্বামী তত্ত্বসারানন্দ

বেলুড় মঠে খুব ছোটোবেলা থেকে যাতায়াত করার সূত্রে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চতুর্দশ অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজকে নানাভাবে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের সময় স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করার জন্য হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের পক্ষ থেকে লাইন দিয়ে আমরা যখন মঠ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতাম, পূজনীয় গহনানন্দজী আমাদের দেখে বলতেন, "এই বাদলদার দলবল এসে গেল।" বাদলদা হলেন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের শিষ্য প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শ্রী মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যাঁর গান শুনে মহাপুরুষজীর ভাবসমাধি হয়েছিল। একবার শিক্ষামন্দিরে অনুষ্ঠিত একটি সভায় পূজনীয় মহারাজের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করার সুযোগ আমায় হয়েছিল—খুব সম্ভবত মহারাজ তখন মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি।

আমরা বেশ কয়েকটি যুবক (তা প্রায় ১৪/১৫জন হবে) তখন ব্রহ্মচারী হিসেবে দেওঘর বিদ্যাপীঠে যোগ দিয়েছি। পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ দীক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যাপীঠে এসেছেন (তখন তিনি সঙ্ঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষ)। শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী (বর্তমানে সঙ্ঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষ) বিদ্যাপীঠের সেক্রেটারি। প্রতিদিনই পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের সন্ধ্যার জপ-ধ্যান সেরে উঠতে উঠতে রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা বেজেই যেত—তারপর নামমাত্র রাতের খাবার খেয়ে সুহিতানন্দজী মহারাজের সঙ্গে তিনি আশ্রমের মধ্যেই হাঁটতে বের হতেন (তখন হয়তো রাত ১১টা সওয়া ১১টা হবে)। একদিন বিদ্যাপীঠের মন্দিরের সামনে প্রশস্ত রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সুহিতানন্দজীকে তিনি বলছেন, "দেখ, মন্দিরের মেন দরজাটা বামদিকে একটু বেশি সরে আছে, ঠিক মাঝখানে নেই।" ঐ রাতের বেলাতেই ফিতে আনানো হলো । পূজনীয় মহারাজ জুতো খুলে মন্দিরে উঠে সুহিতানন্দজী মহারাজকে সঙ্গে ছয় ইঞ্চির মতো বেশি ঢুকে আছে, ঠিক মাঝখানে নেই।

ঐ বারেই আর একদিন রাতের বেলায় (তখন অন্ততঃ পৌনে এগারোটা হবে) পূজনীয় মহারাজ বিদ্যাপীঠের সকল সাধু ব্রহ্মচারীকে নিয়ে বসেছেন, প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে তার সাধুজীবনের সুবিধা-অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। নবাগত ব্রহ্মচারীদের জনে জনে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "কেন তুমি সাধু হতে এসেছো?" কেউ বলল, "শান্তি পাবো বলে," কেউ বলল, "আনন্দ পাবো বলে।" সবার বলা শেষ হলে মহারাজ বিষাদ গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, "তোমরা সবাই নিতে এসেছ? কিছু পেতে এসেছ? কেউ কিছু দিতে আসনি ?"

মহারাজ তখন রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হয়েছেন—কাঁকুড়গাছি থেকে মঠে চলে আসবেন। যোগোদ্যানে তিনি একটি সাধু-ভান্ডারা দিয়েছিলেন যেখানে মঠ ও সারদাপীঠের সাধুরা নিমন্ত্রিত ছিলেন না কারণ, তাদের জন্য তিনি মঠে এসে স্বতন্ত্র একটি ভান্ডারা দেবেন। বি.এড. কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ এবং বন্ধুবর বিশ্বরূপ মহারাজ (স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ, বর্তমানে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির মিনিস্টার-ইন-চার্জ) ব্যক্তিগত উদ্যোগে যোগোদ্যানে হাজির হয়েছেন ভান্ডারা উপলক্ষ্যে—কিন্তু খুবই দ্বিধাগ্রস্থ কারণ সারদাপীঠের আর কোনো সাধু যোগোদ্যানে আসেন নি। প্রসাদ পেতে বসে বারবার আমাকে বলছেন, "বোধহয় আমার এখানে আসাটা নির্লজ্জের মতো হয়ে গেল—রবাহূত, অনাহুতের মতো হয়ে গেল। খুবই লজ্জা লাগছে।"আমি বিশ্বরূপ মহারাজকে যতটা সম্ভব আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছি। এমন সময়, কী আশ্চর্য? পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ অকুস্থলে এসে হাজির ! ধীর পদক্ষেপে আমরা যেখানে প্রসাদ পাচ্ছিলাম ঠিক সেইস্থানে এসে তর্জনী নেড়ে নেড়ে বিশ্বরূপ মহারাজকে বলতে লাগলেন, "দেখো! নির্লজ্জের মতো খাবে—একদম লজ্জা করবে না। রবাহূত, অনাহুতের মতো খাবে! চেয়ে নিয়ে পরিতৃপ্তি করে খাবে!" আমরা স্তম্ভিত, বিস্ময়ে অভিভূত।

আর একবার সেটি শ্রীশ্রীঠাকুরের কোনো এক পার্ষদের তিথি পূজার দিন। সরিষা থেকে পূজনীয় রাজীবানন্দজী মহারাজের সঙ্গে মঠে এসেছি—পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজের বেডরুমেই প্রণাম করতে ঢুকে পড়েছি। মহারাজ কাঠের চেয়ারে চোখ বুজে বসে আছেন। কোনো কথা নেই (তখন কথা বলা কমে এসেছে)। প্রণাম করে পায়ের কাছে বসলাম।

পূজনীয় মেধসানন্দজী জাপান থেকে এসেছেন, তিনিও মহারাজের পায়ের কাছে বসে আছেন এবং কথা বলে যাচ্ছেন কিন্তু পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ শুনছেন কি শুনছেন না বোঝা যাচ্ছে না। মেধসানন্দজী বলছেন, "মহারাজ ঠাকুর তাঁর নিজের

প্রচারের ব্যবস্থা নিজেই করে রাখেন। আমি ভাবছি, কাউকে দিয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের জাপানী ভাষায় অনুবাদ করাব। তা একদিন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (অবশ্যই জাপানী) এক বান্ডিল কাগজ এনে বলছেন, 'স্বামীজি, অনেক বছর ধরে জাপানী ভাষায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের এই অনুবাদটুকু করেছি। আপনি দেখতে পারেন—যদি আপনার কোনো কাজে লাগে!" পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ তাঁর সেই বড় বড় চোখ দুটো খুলে এতক্ষণে মেধসানন্দজীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাহলেই বুঝে দেখ লীলাময় ঠাকুরের কী কৃপা !

তখন আমি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় তন্ত্রধারক হিসাবে যেতাম। যাবার আগে মঠে প্রেসিডেন্ট মহারাজকে প্রণাম করে যাওয়ার রীতি। প্রণাম করে বলছি, "মহারাজ জয়রামবাটিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় তন্ত্রধারক হিসাবে যাচ্ছি। আশীর্বাদ করুন—পূজা যেন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়।" পূজনীয় মহারাজ তাঁর বড় বড় চোখ দুটো আমার উপর স্থাপন করে স্মিত হেসে বললেন, "জয়রামবাটী! জয়রামবাটী কোথায়?" আমার উত্তর দেওয়ার কোনো ভাষা ছিল না। "যিনি স্বয়ং মহামায়া, জগন্মাতা তিনি কোনো মৃন্ময় ভূমিতে জন্মগ্রহণ করতে পারেন না। সুতরাং যে জয়রামবাটী কেবল বাঁকুড়াস্থিত কোনো গ্রাম মাত্র নয়। এ হলো চিন্ময়ধাম জয়রামবাটী—যা ভক্তসাধকের ধ্যানগম্য"। আমার মনে হলো "জয়রামবাটী কোথায়?" এই আপাতনিরীহ সরল প্রশ্নের মধ্য দিয়ে পূজনীয় মহারাজ ঐ জড়ের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

পরম পূজ্যপাদ মহারাজের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আভূমি প্রণতি নিবেদন করছি।

পরমপূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজীর স্মৃতিকথা

স্বামী নিত্যতৃপ্তানন্দ

১) **প**রমপূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজকে প্রণামের যে বহু প্রাচীন প্রথা বেলুড়মঠে অনেকদিন ধরে প্রচলিত আছে তা হলো—সমস্ত ভক্ত ও সাধু-ব্রহ্মচারিগণের থেকে অন্তত দুমিটার দূরত্ব রেখে সারি সারি বেঞ্চ দিয়ে মহারাজজীর চারিদিকে একটি প্রাচীর তৈরি করে দেওয়া। কিন্তু যে মুহূর্তে পরমপূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ বেলুড়মঠের প্রেসিডেন্ট-পদ আলোকিত করে এলেন—বেলুড় মঠের ইতিহাসে, সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দের কাছে এক প্রবল আনন্দের উৎসমুখ উন্মুক্ত হয়ে গেল। তাঁদের মহারাজজীকে পাদস্পর্শ করে প্রণামের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিলেন তাঁর সম্মুখ থেকে বেঞ্চ দিয়ে গড়ে তোলা ঐ সমস্ত কৃত্রিম প্রাচীরের আবেষ্টনকে দূরে সরিয়ে দিয়ে। পূজ্যপাদ মহারাজজীর পবিত্র পাদমূলে মস্তক লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের কোনো বাধাই আর রইল না বেলুড় মঠে।

২) মহারাজজীকে প্রণাম চলাকালীন যদিও আমরা সর্বদা তাঁর সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখে এক অপূর্ব আনন্দের প্রকাশ দেখতাম, তবুও আমি যখন তাঁকে নিয়মমতো প্রতিদিনের প্রণাম করতে যেতাম, সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখে অন্য আর একরকম অনুভূতির প্রকাশও লক্ষ করতাম। যে মুহূর্তে আমি প্রণাম সেরে উঠতাম, মহারাজজীর হাস্যোজ্জ্বল মুখে এক অদ্ভুত আন্তরিকতা আমি অনুভব করতাম; মনে হত যেন তিনি আমার কত জন্ম জন্মান্তরের পরিচিত। যখনই তাঁকে আমি প্রণাম করতে যেতাম, আশ্চর্যজনকভাবে এটি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

৩) যখনই কোন সাধু ব্রহ্মচারী তাঁর কাছে যেতেন তিনি সবকিছু খুব গভীরভাবে লক্ষ করতেন। যদি কারো জামার ওপরের বোতামটা একটু খোলা থাকত তখনই মহারাজজীর দক্ষিণহস্তের তর্জনী সেইদিকে নির্দেশ করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

কারো জামার সব বোতাম সঠিকভাবে লাগানো থাকলে তবেই মহারাজজী তাঁর প্রণাম গ্রহণ করতেন।

৪) একদিন আমি দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলাম। সিঁড়ির নীচে পরমপূজ্য মহারাজজী সে-সময় পায়চারি করছিলেন। যে মুহূর্তে আমার দিকে তাকালেন, তখনই তাঁর তর্জনী আমার সার্টের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সঙ্গে সঙ্গে আমি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমার সার্টের বোতাম পরীক্ষা করলাম। কিন্তু দেখলাম যে সবগুলিই সুন্দর-ভাবে লাগানো আছে। সুতরাং তাঁর এই অঙ্গুলিনির্দেশ আমার বোধগম্য হলো না। তখন তাঁর সেবক আমাকে আমার কোঁচকানো দোমড়ানো সার্টের দিকে ইঙ্গিত করলেন। আমার সমস্ত জীবনের জন্য আমি একটি বিশেষ শিক্ষা লাভ করলাম। যদিও আমি কোনদিন আমার জামা ইস্ত্রি করতাম না, কিন্তু আমি এখন থেকে এটাই শিখলাম যে সর্বঅবস্থায় আমার অবস্থান যেন আমার মার্জিত রুচির পরিচায়ক হয়।

৫) অবশেষে একদিন আমার সন্ন্যাস-জীবনের সেই বিশেষ এক দুর্লভতম মুহূর্ত এল। সেই বিশেষ দিনটিতে প্রণাম শেষে যে মুহূর্তে মহারাজজী আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। সেই চিরপরিচিত সদাহাস্যময় আন্তরিকতার পরিবর্তে তাঁর চোখে আমি এক অত্যন্ত গভীর গম্ভীর দৃষ্টির আভাস প্রত্যক্ষ করলাম। কিছুক্ষণ সেইভাবে দৃষ্টিদানের পর তিনি সেই ঘরের প্রথম দরজার দিকে ইঙ্গিত করে গম্ভীরমুখে বললেন, "এখানে তুমি অপেক্ষা কর, তোমাকে আশীর্বাদ করতে হবে।" (প্রেসিডেন্ট মহারাজের জন্য বেলুড়মঠে নির্দ্ধারিত পুরনো বাড়িতে তাঁকে প্রণাম নিবেদনের ঘরে দুটি দরজা ছিল যার দ্বিতীয় দরজা দিয়ে সমস্ত সাধুগণ প্রণাম করতে আসতেন। সেজন্য আমাকে প্রথম দরজার কাছে অপেক্ষা করতে বলা হলো) এমন কি তাঁর সেবক যখন দ্বিধান্বিত হয়ে আমাকে পুনরায় মহারাজজীর নিকট টেনে নিয়ে গেলেন তখন পুনরায় তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "হ্যাঁ, আমি বলেছি।" যখন প্রণামপর্বের শেষে হলোঘরটি সম্পূর্ণরূপে জনশূন্য হয়ে গেল, আমি মহারাজজীর কাছে গেলাম এবং তাঁর পবিত্র পদযুগলে মস্তক নত করে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম (যে ব্যাপারে মহারাজজী কোন আপত্তি করলেন না)। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি আমার মস্তক উত্তোলনের উপক্রম করেছি সেই মুহূর্তেই তিনি তাঁর উভয় হস্ত প্রায় দু মিনিট পর্যন্ত আমার মস্তকের উপর ধারণ করে রাখলেন। তারপর একটি স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করে বললেন, "হ্যাঁ, এখন যাও।"

আমি প্রকৃত অর্থেই জানি না, মহারাজজী আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কোন বাধা,

কোন বিপদ অথবা আমার আধ্যাত্মিক জীবনের কোন দৈন্যতা আগে থেকেই অবলোকন করতে পেরেছিলেন কিনা। কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময় ধরে আমার মস্তকে তাঁর আশীর্বাদপুত হস্তের স্পর্শে আমি বেশ ভাববিহ্বল হয়ে পড়লাম এবং এই ভাবানুভূতি বেশ কয়েকমাস পর্যন্ত আমার হৃদয় মনকে আচ্ছন্ন করে রাখল। সময়ের সাথে সাথে মহারাজজীর আশীর্বাদের প্রভাব আমার জীবনে ক্রমশ এমনই গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিদায়ী হয়ে উঠেছিল যে আজও যখনই আমি সেদিনের কথা স্মরণ করি আমার দুটি চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে পড়ে এবং আমি পুনরায় ভাববিহ্বল হয়ে যাই। আজ আমি অনুভব করতে পারি যে আমি সত্য-সত্যই সৌভাগ্যশালী।

কৌতুকছলে পাথেয়

স্বামী একেশানন্দ

১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসের কথা। তখন রামকৃষ্ণ মঠ, মঠ-চণ্ডীপুর আশ্রমে আছি ব্রহ্মচারী ব্রতে। সবে এসেছি। একদিন রাত্রিকালে প্রসাদান্তে পূ: মহারাজের চরণপ্রান্তে ঘরে বসে আছি। বিভিন্ন প্রসঙ্গ হচ্ছে। বললাম, মহারাজ, কিছুই তো জানিনা। কেমনভাবে থাকব—একটু বলুন। মহারাজ কৌতুকভরে হাসতে হাসতে আমার কানটি ধরে বললেন। ভয় কি? ঠাকুর আছেন। ধরে থাক। সব ঠিক হয়ে যাবে। এটি একটি বড় পাওনা। তাই আজও এই কৌতুকছলে পাথেয়টিকে আশ্রয় করে চলেছি।

সঙ্ঘগুরু সমীপে

স্বামী নিষ্ঠানন্দ

ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণার ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে যে সর্বোচ্চ উপলব্ধি আমরা করতে পেরেছি তা হলো, তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তিনি নির্গুণ, নিরাকার যুগ প্রয়োজনে সেই নির্গুণ সগুণ হলেন, নিরাকার হলেন সাকার। নররূপ ধারণ করলেন—গ্রহণ করলেন "শ্রীরামকৃষ্ণ"রূপ। যুগধর্ম সংস্থাপনকালে পূর্বের অবতার পুরুষগণের ভাবরাশির সমষ্টিরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হলেন। তিনি আজও সংঘগুরুদের দেবশরীর অবলম্বনে সমানভাবে সক্রিয়। রাজা মহারাজ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সংঘগুরুগণ শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিরূপে কাজ করছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই আমাদের গুরু, আমাদের ইষ্ট। চতুর্দশ সংঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ কেমন ছিলেন, কেমন ছিল তাঁর জাগতিক ও পারমার্থিক জীবন, তারই অবতারণায় এই শ্রদ্ধাঞ্জলি। সংঘগুরুগণ স্বয়ং ঠাকুরের নির্বাচিত ও নির্দিষ্ট—এই হলো আমাদের সংঘের ভাবধারা। তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলতে ও লিখতে গেলে বেশ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। তাঁরা ঠাকুরের প্রতিনিধি, তাঁদের সম্পর্কে লিখে শেষ করা যায় না।

চতুর্দশ সংঘগুরুর বাণী প্রত্যক্ষে শোনবার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। দুর্লভ এই কারণে যে, তাঁরা নিজমুখে না বললে অনেক কথাই তো অজানা থেকে যায়।

শৈশব থেকে কৈশোর :

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর বুধবার দুর্গামহাষ্টমী তিথিতে বাংলাদেশের শ্রীহট্টের পাহাড়পুর গ্রামে মহারাজের জন্ম। পূর্বাশ্রমের নাম নরেশরঞ্জন রায়চৌধুরী। পিতার নাম শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, মাতা শ্রদ্ধেয়া সুখময়ী দেবী, চার ভাই—রাকেশ রঞ্জন, সুরেশ রঞ্জন, বীরেশ রঞ্জন এবং নরেশ রঞ্জন। উল্লেখ্য শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ আন্দোলনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। শ্রীশ্রীমার প্রচুর ভক্ত ও শিষ্য শ্রীহট্টের বিভিন্ন অংশে বাস করতেন।

ছোটবেলায় পাঠশালার কয়েকটি মজার কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। "পাঠশালায় থাকাকালীন একদিন বিদ্যালয় পরিদর্শক পর্যবেক্ষণে এসেছেন। তিনি আমাদের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পরীক্ষাও হলো। তবে সে পরীক্ষায় একজনই পাশ করল।" জিজ্ঞাসা করলাম, সে কে মহারাজ ? "(নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) একমাত্র ইনিই— ফার্স্ট।"

তখন অবিভক্ত ভারতবর্ষ। আমি কুমিল্লাতে থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করি। তারপর নারায়ণগঞ্জে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। দশম শ্রেণি তখন প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং আমরাই ফার্স্ট ব্যাচ্ ছিলাম। তারপরই দশম শ্রেণির পরীক্ষা পদ্ধতি আলাদা হয়ে যায়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কড়া লোক, তার আত্মসম্মানবোধও প্রবল। একবার ট্রেন থেকে তিনি সাহেবের কোট ফেলে দিয়েছিলেন। যাক সে কথা, বলছিলাম, যিনি আমার পড়াশুনার খরচ যোগাতেন উনি বললেন দশম শ্রেণির পরীক্ষায় প্রথম ডিভিসন হলে তবে আমাকে আরও পড়াবেন। নচেৎ এখানেই ইতি। তা হলোও তাই। প্রথম ডিভিসনে পাশ। বড়দাদা আমার পড়াশুনার খরচ দিতেন, তিনি তখন ত্রিপুরার কুমিল্লাতে ইন্সপেক্টর পদে রয়েছেন। এটা তার বদলির চাকরি ছিল। তিনি বদলি হয়ে গেলে কুমিল্লাতে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে আমার থাকবার ব্যবস্থা করলেন যাতে আমি পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারি।

কুমিল্লাতে থাকাকালীন এক ভদ্রলোক তার ছেলেকে পড়ানোর জন্য আমায় বললেন। ছেলেটি ছিল বেশ দুষ্টু। ছেলেটির মতিগতি হাবভাব দেখে তার মা-বাবাকে বললাম, তাকে চাবুক লাগাতে হবে; নতুবা উপায় নেই। তাতে ওর মা-বাবা বললেন যা করার তা অবশ্যই করুন। তাদের সম্মতি পেয়ে আমি একদিন এমন মার দিলাম যে ওতেই ওর শিক্ষা হয়ে গেল। জীবনে আর দুষ্টুমি করেছিল কিনা জানি না। তবে তার মা-বাবা খুব খুশি ছিলেন, পড়াশুনাও চলতে লাগল। আমাকেও আর কোনো দিন বেগ পেতে হয়নি। পড়াশুনার পাট শেষ করে আমি কলকাতায় চলে আসি। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির ঠিক উল্টোদিকের পাঁচতলার এক বাড়ি, নাম সারদা সৌধ তার তিনতলার সবগুলো ফ্ল্যাট নিয়ে এক দাদা থাকতেন। তার বহুধরনের কারবার ছিল। তার মধ্যে Salesmanship Training College নামে একটি প্রতিষ্ঠানও ছিল। ওটি আমায় দেখতে বললেন, কিন্তু মন থিতু হতে দিল কই ? অনবরত নিশির ডাকের মতো বিশ্বজগতের আহ্বান, এদিকে স্বামীজির কিছু বইপত্রও ওল্টাতে শুরু করেছি। এর মধ্যে বেলুড়মঠের একজন সাধুর (স্বামী বামদেবানন্দ) সঙ্গেও পরিচয় হলো, যা আমার কাছে মণি-কাঞ্চন যোগ।

সংসার ত্যাগ ও গোরুর গাড়ি করে মঠে যোগদান :

১৯৩৯ সালে ২৩ বছর বয়সে বউদির অনুমতি নিয়ে সংসার ত্যাগ করে সোজা ভুবনেশ্বর আশ্রমে।

মাদ্রাজ মেল শেষ রাত্রে আড়াইটে নাগাদ ভুবনেশ্বরে আসত। স্টেশনে নেমে দেখলাম, কাছেই চারিদিকে জঙ্গল। স্টেশনে টিম্ টিম্ করে একটা কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে। তাতে অন্ধকার যেন আরও বেশি মনে হচ্ছে। শুনেছিলাম স্টেশনে গরুর গাড়ি পাওয়া যেতে পারে। গরুর গাড়িতে 'বেলুড় মঠ' যাব বললে ভুবনেশ্বর মঠে পৌঁছে দেবে। তখন ভুবনেশ্বর মঠকে স্থানীয় লোক 'বেলুড় মঠ' বলত। একটা গরুর গাড়ি পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—বেলুড় মঠ চেন? বলল—"হুঁ, মঁ জানে সুয্যিবাবা আছন্তি, বলাইবাবা অছন্তি।" তখনকার দিনে ভাড়া ছিল তিন আনা। মঠে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া দিচ্ছি, সেই সময় দেখা গেল, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা টর্চের আলো আমার দিকে এগিয়ে আসছে। "কে কে"–জিজ্ঞাসা করাতে পরিচয় দিলাম। যিনি টর্চ নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন তিনি হলেন পূজনীয় সুয্যি মহারাজ (স্বামী নির্বাণানন্দজী) - ভুবনেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ। স্বামী নির্বাণানন্দজীর চরণে নিজেকে নিবেদিত করে বললাম, আমি মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চাই।

ভুবনেশ্বরে যেদিন এলাম ঐদিনই সকালে নাপিত এসেছে দেখে শিখা রেখে মাথা মুন্ডন করে ফেললাম। সেদিন ছিল সোমবার। শিবের বার। ম্যানেজার মহারাজ এ কান্ড দেখে বলছেন, করছ কি, করছ কি, এতো সুন্দর চুলগুলো এসে না এসেই কেটে ফেলবে? আমি তখন নাপিতের কাঁচি নিয়ে নিজেই চুল কাটতে লাগলাম। একজন ব্রহ্মচারী একটা কাপড় নিয়ে এলো সেটা দুভাগ করলাম। দুটো কাপড় হয়ে গেল। কাছা ছেড়ে কাপড় পরা শুরু করলাম। ব্যস ঐদিন থেকে মণ্ডিত মস্তক ও কচ্ছ মুক্ত। তা এ সকল একজন লক্ষ্য করছিলেন। তিনি হলেন শম্ভু মহারাজ। সেইদিন থেকে আমার সাথে ওঁর ভাব জমে যায়। একেবারে শেষ দিন পর্যন্ত।

শম্ভু মহারাজ ছিলেন বলরামবাবুর নাতি, উনি যখন সংঘে যোগদানের ইচ্ছায় বেলুড় মঠে আসেন তখন আমারই মতো প্রথমদিন ওইভাবে মুন্ডন ও কচ্ছমুক্ত করতে চাইলে নির্মল মহারাজ (স্বামী মাধবানন্দ) বাধা দেন। বলেন—মঠের নিয়ম, কেউ মঠে যোগদান করতে চাইলে তাকে প্রথম বছরই কচ্ছমুক্ত ও মুণ্ডিতমস্তক করা যাবে না। শম্ভু মহারাজ কিছুটা অভিমানের সুরে বললেন, ও তাই নাকি ? আমি যে দেখলাম, ভুবনেশ্বরে দুজন ট্রাস্টির (সুয্যি মহারাজ ও স্বামী শঙ্করানন্দজী) সামনে একজন

যোগদান করল; আর এসে না এসেই কচ্ছমুক্ত হয়ে গেল। নির্মল মহারাজ সব শুনে বললেন, ও ঠিক হয়নি। (মৃদু হাসি)

রাশভারী স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের সেবাধিকার লাভ :

পূজনীয় মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠে যখন যোগদান করেন, সেই সময় স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ সেখানে অবস্থান করছেন। পূজনীয় মহারাজের মনে খুব ইচ্ছা হয় তাঁর কোন সেবার কাজে লাগি। একদিন সকালে পরম পূজনীয় শঙ্করানন্দজী মহারাজ ঘর খোলার পর পূজনীয় মহারাজ বিছানার চাদরটি ভাঁজ করতে শুরু করলেন, ভাঁজ করা শেষ হবার আগেই শঙ্করানন্দজী মহারাজ তাঁর স্বভাব সিদ্ধ ভরাট গলায় হুঙ্কার দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, "রেখে দাও, কাজ বাড়িও না।" অর্থাৎ যেহেতু উনি যেভাবে চাদরটি ভাঁজ করছেন তা যার সেবা করছেন তাঁর মনমতো হয়নি, তাই ঐ ভাঁজটি শঙ্করানন্দজী মহারাজকেই খুলে আবার ভাঁজ করতে হবে। তাই তাঁর কাজ বেড়ে যাবে। ঐ হুঙ্কার শোনার পর মহারাজের হাত থেকে চাদরটি বিছানার উপর পড়ে গেল। ঘরে আর থাকবার উপায় ছিল না, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু মহারাজও নিরাশ হবার পাত্র নন। শঙ্করানন্দজী মহারাজ ঘরের বাইরে গেলে তিনি ঘরে ঢুকে ভালো করে দেখে নিলেন কিভাবে শঙ্করানন্দজী মহারাজ চাদরটি ভাঁজ করেছেন। পরদিন প্রাতে ঐ সময়ে আবার মহারাজ, শঙ্করানন্দজী মহারাজের ঘরে ঢুকলেন এবং চাদরটি যেমনটি দেখে রেখেছিলেন সেইভাবে ভাঁজ করে রাখলেন। আজকে আর শঙ্করানন্দজী মহারাজ কোনো কথা বললেন না। মহারাজ এইভাবে পরমপূজনীয় শঙ্করানন্দজী মহারাজের সেবাধিকার লাভ করলেন।

প্রসঙ্গক্রমে মহারাজের মুখে বলা শঙ্করানন্দজী মহারাজের বিষয়ে একটি গল্প বলি—

পূজনীয় শঙ্করানন্দজী মহারাজের বয়স তখন অনেক বেশিই হয়ে গেছে। আর শম্ভু মহারাজ তাঁর সেবা করছেন। একদিন পূজনীয় মহারাজ একটি ছবি হাতে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে, উপর নিচ করে দেখে শম্ভু মহারাজকে কাছে ডেকে নিয়ে বলছেন :

শম্ভু.....উ...উ

শম্ভু মহারাজ সাড়া দিয়ে বললেন : মহারাজ...

পূজনীয় মহারাজ : এই ছবিটির এই দিকটা, এটা লেজ, কি বল ?

শম্ভু মহারাজ : হ্যাঁ... মহারাজ

পূজনীয় মহারাজ : আর এই দিকটা, একটা মুখ, কি বল ?

শম্ভু মহারাজ : হ্যাঁ.... মহারাজ

পূজনীয় মহারাজ : আর নীচের দিকে এগুলো পা, কি বল ?

শম্ভু মহারাজ : হ্যা....মহারাজ

পূজনীয় মহারাজ : তাহলে এটি একটি বাঘের ছবি, কি বল ?

শম্ভু মহারাজ : হ্যাঁ....মহারাজ এটিতো বাঘেরই ছবি।

এরপরও পূজনীয় মহারাজ বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওই ছবিটিকেই নিরীক্ষণ করছিলেন, শম্ভু মহারাজও ঘরের মধ্যে অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। পূজনীয় মহারাজ আবার শম্ভু মহারাজকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন :

শম্ভু....উ...উ

শম্ভু মহারাজ সাড়া দিয়ে বললেন.....মহারাজ....

পূজনীয় মহারাজ : এই ছবিটির এইগুলো ডালপালা, কি বল ?

শম্ভু মহারাজ : হ্যাঁ মহারাজ ।

পূজনীয় মহারাজ : আর এই গুলো মূল, কি বল ?

শম্ভু মহারাজ : হ্যাঁ....মহারাজ।

পূজনীয় মহারাজ : তাহলে সিদ্ধান্ত হলো ছবিটি বাঘের নয়, ছবিটি গাছের।

শম্ভু মহারাজ : হ্যাঁ...মহারাজ, এটা বাঘের কেন হতে যাবে, এটা তো গাছেরই ছবি।

পূজনীয় মহারাজ খুব খুশি হলেন। এই বয়সে মহারাজকে হাসি খুশি রাখাই সেবকের কর্তব্য। এঁরা জাগতিক স্তরের ঊর্ধ্বে অতি জাগতিক স্তরে বিরাজ করতে থাকেন, এঁদের সেবা করা খুব কঠিন।

এরপর শম্ভু মহারাজ ধীর পদবিক্ষেপে ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে মহারাজের দিকেই আবার মুখ ফিরে তাকিয়ে করজোড়ে মৃদুস্বরে বলছেন "ছবিটি বাঘের হোক বা গাছের হোক ! আমার কিছু যায় আসে না। হে, শঙ্করানন্দ, আপনিই প্রসন্ন থাকুন

কেদারবাবা ও কেতকী মহারাজের সঙ্গলাভ :

ভুবনেশ্বরে অবস্থানের শেষের দিকে কিছুদিন স্বামীজির চেলা কেদার বাবার (স্বামী অচলানন্দ) সঙ্গ লাভের সৌভাগ্যও হয়েছিল। এছাড়াও স্বামী বামদেবানন্দজী মহারাজের যিনি আমার আসার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, তিনি তখন ইনস্টিটিউট অব কালচাব, ৪ ওয়েলিংটন স্কোয়ার-এ স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দজী মহারাজের সহকারী ছিলেন।

তখন স্বদেশী আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। কেতকী মহারাজ (স্বামী প্রভানন্দ) আসাম, মেঘালয় অঞ্চলে কাজ করবার জন্য খাসিয়া ভাষা শিক্ষা করলেন। ব্রিটিশ সময়, শিলং তখন ওদিককার রাজধানী। Assam was one, Foot hill-এ শেলা, Top-এ চেরাপুঞ্জী ও রাজধানী শিলংকে কেন্দ্র করে ঠাকুর-মা-স্বামীজির ভাবপ্রচার প্রথম উনিই শুরু করলেন। শরীরের কথা ভুলে দিনরাত খেটেছেন। ওই পাহাড়ী অঞ্চলে দিনের পর দিন চড়াই-উৎড়াই অতিক্রম করে, অথচ পুষ্টিকর খাবার না পেয়ে কম বয়সেই শরীরের মাংসপেশীগুলো সব শুকিয়ে গিয়েছিল। তখন মঠ-মিশনের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না, তাই কঠোর পরিশ্রমে অসুস্থ হয়ে পড়লে, শারীরিক অসুস্থতায় ওঁকে বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হয়। অনেক চিকিৎসকই তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন, এমনকি Dr. B. C. Roy দেখে বলেছিলেন, এই রোগের ওষুধ এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। শেষে কেতকী মহারাজকে বদ্যির বাজার নামক একস্থানে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো আর আমিও সেবা করার সুযোগে বদ্যির বাজারে এলাম। শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর সেবা করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। শেষের দিকে দেখতাম মহারাজের সমস্ত শরীর শুকিয়ে গেলেও তাঁর মুখমন্ডলটি ছিল খুবই উজ্জ্বল।

চতুর্দশ সংঘগুরু বলতেন :

"যিনি যুগধর্মের সংস্থাপক, যিনি সর্বধর্মস্বরূপ, যিনি অতীত অবতার পুরুষ সকলের ভাবরাশির সমষ্টিস্বরূপ, অর্থাৎ যাঁর মধ্যে সকল ধর্মের পথিক নিজ নিজ আদর্শকে পূর্ণ বিকশিত দেখেছেন, (তাই তাঁকে অবতারবরিষ্ঠ বলা হয়েছে), সেই যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁকে নমস্কার।

গুরু :

"যিনি সাধককে কোন বিশেষ পথে আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য পরিচালিত করেন, তাঁকেই বলা হয় "গুরু"। এই গুরুর প্রতি অচলা শ্রদ্ধা সাধকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। শাস্ত্র বলেন, গুরু-ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পরব্রহ্মস্বরূপ মানব গুরু সেই পরব্রহ্ম গুরুর প্রতীক মাত্র। এই শ্রদ্ধা দৃঢ় থাকলে সাধক তার নির্দিষ্ট পথে সহজে অগ্রসর হতে পারে। তাই শাস্ত্র বলেন, গুরুতে মানুষ- বুদ্ধি করতে নেই, তাঁকে ঈশ্বর দৃষ্টিতে দেখতে হয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সচ্চিদানন্দই গুরু।"

দীক্ষা :

"ভগবান লাভের নানা পন্থা অধ্যাত্ম-পথিকেরা নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। এই

বিভিন্ন বর্ণনা প্রত্যেকেই নিজের নিজের রুচি বা গুরু নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে তাঁদের অনুগামীদের জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

প্রবর্তক সাধকের—যাদের গুরুকরণ হয়নি-এজন্য বিভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক, কারণ কোন পথ তাদের জন্য প্রশস্ত তারা নিজে স্থির করতে পারে না এবং অনিশ্চয়তার জন্য দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তারা সাধন পথে অগ্রসর হতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্র বলছেন—প্রত্যেকের গুরু-নির্দিষ্ট প্রণালীতে নিষ্ঠা রেখে অগ্রসর হওয়া উচিত, প্রবর্তকের মনে এ নিষ্ঠা দৃঢ় করার জন্য গুরু তাহার জন্য একটি পথ নির্দিষ্ট করে দেন। এই পথ নির্দেশের নামই "দীক্ষা"।

সাধক এই গুরু নির্দিষ্ট পথে অবিচল থেকে সাধনায় নিবিষ্ট থাকার জন্য যে সংকল্প নেয় তার পক্ষে এটিই "দীক্ষা" গ্রহণ।"

দীক্ষার উদ্দেশ্য :

"দীক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা ভ্রান্ত ধারণা আছে। কেউ বলে দীক্ষা নিলে হাতের জল শুদ্ধ হয়, দেহ শুদ্ধ হয়, কেউ বলে দীক্ষার ফলে সাধকের শরীরে কোন দুরারোগ্য রোগ থাকলে সেরে যায়। কারো মতে দীক্ষার ফলে জাগতিক উন্নতি হয় এবং ধন-সম্পদ-মান-যশ হয়। কেউ বলে এর দ্বারা গ্রহের দোষ কেটে যায়। মনে রাখতে হবে এ সব দীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। দীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য—গুরুনির্দিষ্ট পথে সাধন করে পরমেশ্বরের কৃপা অনুভব করা, তাঁর সাক্ষাৎকার করা।"

ইষ্টদেবতা :

"সাধারণত মানব কোন নির্বিশেষ স্বরূপকে ধারণা করতে পারে না। এজন্য তাঁকে কোনও একটি মানবীয় রূপের ভিতর দিয়ে তাঁর আদর্শকে কল্পনা করতে হয়। এই আদর্শ ব্যক্তিকেই ইষ্টদেবতা বলা হয়। (অবতারই একমাত্র আদর্শ ব্যক্তি বা ইষ্টদেবতা হতে পারেন।)"

"এই জগৎ যা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে এবং যাতে স্থিত আছে, আর অন্তে যাতে লয় হয়ে যাচ্ছে—তিনিই ব্রহ্ম (যতো বা ইমানী ভূতানী জায়ন্তে...), তিনিই ভগবান নিজ মায়া দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, আবার সব ফিরিয়ে নিচ্ছেন। যেমন মাকড়সা ও তার জাল। তিনিই আবার অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়ে ধর্ম সংস্থাপন করছেন।"

"ঠাকুর, মা, স্বামীজি এই ত্রিমূর্তিকে একই সত্ত্বার তিনটি অভিব্যক্তি বলে মনে করা

হয় আর তাঁরা বস্তুত পৃথক নন। বিভূরূপে ভগবান সর্বত্র আমাদের সকলের মধ্যে রয়েছেন, প্রকাশ কোথাও কম, কোথাও বেশী। এই যুগে (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিতে) পৃথিবী যেন একটি পরিবারের মতো হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন একটি সার্বজনীন যুক্তি বিচার সিদ্ধ আদর্শ যা সকলের কাছে গ্রাহ্য হবে। সে কারণেই এবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়ে নিজ জীবনে সনাতনধর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা (পথের) সাধন করে একই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, আবার ইসলাম মতে, খ্রীষ্টান মতেও সাধন করে একই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। সর্ব সাধনার শেষে তিনি "যত মত তত পথ"—এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।"

জপধ্যান বিষয়ে প্রাথমিক পরামর্শ :

"জপ করার সময় আসনে সোজা হয়ে সহজভাবে বসবে। মেরুদণ্ড ঘাড় ও মাথা সমান থাকবে। পূর্ব কিংবা উত্তর মুখে বসবে। প্রতিদিন এইভাবে বসে জপ ধ্যান করবে। (উপাসনা পদ্ধতিতে বিশদভাবে বলা হয়েছে। সেখানে সব দেখে নেবে।)

এমন একটি আদর্শ তোমরা মহাসৌভাগ্যে লাভ করেছ, যার ফলে তোমাদের কাছে সব দেশের, সব জাতির লোক আপনার হয়ে গেল, কাজেই অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, ধর্মে ধর্মে ভেদ-যাবতীয়-দ্বন্দ্ব সব ঘুচে গেল। তোমাদের নিকট "বসুধৈব কুটুম্বকম্"।

জপধ্যান প্রতিদিন করবে, কোন দিন বাদ দেবে না, নির্দিষ্ট সময় সকাল, দুপুর (সম্ভব হলে) ও সন্ধ্যা-প্রশস্ত। কোনও কারণে ঠিক সময় যদি না করতে পার তাহলে পরে করবে, কিন্তু বাদ দেবে না।

জপধ্যানের জন্য একটি নির্দিষ্ট আসন রাখবে, তা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করবে না। ঠিক সময় একই আসনে বসে জপ ধ্যান করলে আসনের একটা প্রভাব হয়, ওখানে ঐ সময় বসলেই মন সহজে একাগ্র হয়। এইভাবে জপের আসন জাগিয়ে রাখতে হয়। আর যোগসূত্রে (১।২৮) আছে তজ্জপঃ তদর্থভাবনম্। মানে মন্ত্র জপের সময় মন্ত্রের অর্থও ভাবতে হবে।

মানস জপ-ই শ্রেষ্ঠ। মনে মনে জপ করবে, আর সাথে সাথে ইষ্টদেবতার ধ্যান করবে। মানস জপে শব্দ হবে না—মনে মনে জিহ্বা বা ঠোঁটও নড়বে না। মন্ত্রস্থ বর্ণের চিন্তাকে মানস জপ বলে।

জপ ধ্যানের সময় ভাববে তুমি (বা তোমরা) শুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্পাপ, সব বাসনা রহিত।"

আরও কিছু উপদেশ :

- মন চঞ্চল, তাকে বশ করা খুবই কঠিন।
- জপ-ধ্যান কতদিন করতে হবে? যতদিন না বস্তুলাভ হয় ততদিন চালিয়ে যেতে হবে। হতাশ হবে না।
- একটি ধারণা লোকের আছে যে দীক্ষা হলে গুরু সব ভার নেন। নিজেকে আর কিছু করতে হয়না। এটি সর্বৈব মিথ্যা।
- গুরুপথ দেখিয়ে দিলেন। তোমাদের এখন পথ নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হবে। তাঁর উপদেশ নির্দেশ পালন করবে। গুরুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে। গুরুতে মানুষ বুদ্ধি করবে না। তিনি ইষ্টের প্রতীক। তাঁর ইষ্ট রয়েছেন—এই জেনে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে।
- এছাড়াও আরও পাঁচটি নিয়ম আন্তরিকতার সাথে পালন করতে হবে।

১) অহিংসা—কারো অনিষ্ট করবে না—কায়মনোবাক্যে।

২) সত্য—সত্যনিষ্ঠা—কায়মনোবাক্যে।

৩) অস্তেয়—কোন ব্যক্তিকে ঠকাবে না।

৪) ব্রহ্মচর্য—সংযম-সব ইন্দ্রিয়গুলোকে বশে রাখা শুধু বিদ্যার্থীদের জন্য নয়, সব আশ্রমেই (গৃহস্থাদি) পালনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, দু একটি সন্তান হবার পর ভাই-বোনের মতো থাকা।

৫) অপরিগ্রহ—অপরের নিকট কিছু চাইবে না—হাত পাতবে না। জীবনকে সাদাসিধে ভাবে চালাবে—বিলাসিতা বর্জন করবে। ভোগ বিলাসের দিকে যাবে না।

- সকলের সাথে সৎ ব্যবহার করবে এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবে।
- একটি কথা মনে রেখো—জপ-ধ্যান যতই কর না কেন এর দ্বারা তাঁকে কেনা যায়না। তাঁর কৃপা ভিক্ষা কর। তিনি কৃপা করলে তবেই হবে।
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য খুব পড়বে এবং অপরকেও পড়তে উৎসাহিত করবে। উদ্বোধন পত্রিকার গ্রাহক হতে চেষ্টা করো।
- মঠের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে এবং মঠ ও মিশনের সেবাদি কার্যের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখবে। সাধ্যমতো দানাদি করবে।
- ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করবে : হে রামকৃষ্ণ, তুমি অউম্, তুমিই পরম পুরুষ,

তুমিই পরমা প্রকৃতি, তোমা হতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে, তুমি আমার সকল দুঃখ হরণ করে শুদ্ধ জ্ঞান, শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি প্রদান কর।

১০৮ বার জপ করার মাহাত্ম্য

- ১০৮ সংখ্যা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্বের সূচক, শরীরের আয়তন ৯৬ আঙ্গুল পরিমাণ, "শরীরং সর্বজন্তুনাং ষন্নাবত্যঙ্গুল্যাত্মকম্" (বরাহোপণিষদ্ ৫/১৯), শরীরের অন্তর্গত নাভির ১২ আঙ্গুল উপরে পরমাত্মার স্থান—অধো নিষ্ঠ্যা বিতস্ত্যান্তে নাভ্যানুপরিতিষ্ঠতি"–(মহানারায়ণ উপনিষদ্ ১৩।৭), সুতরাং ৯৬ + ১২ = ১০৮ সংখ্যা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব নির্দেশ করে।
- জীব ও শরীর ৯৬ আঙ্গুল পরিমিত, আদিত্য মণ্ডল স্থিত পুরুষ ১২ কলাযুক্ত। পুরুষ শরীরস্থ আত্মা ও আদিত্যমণ্ডলীবর্তী পুরুষ অভিন্ন—"স যশ্যায়ং পুরুষে সশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ" (তৈ উপনিষদ, ৩/১০/৪), সুতরাং ৯৬+১২=১০৮ সংখ্যা জীব ও ব্রহ্মের একত্বের নির্দেশক।
- ১০৮ সংখ্যা জগদ্ব্যাপী ঈশ্বরের প্রতীক। বর্ণমালার সংখ্যা ৮০, অনুলোম-বিলোম ক্রমে ১০০ মাতৃকাবর্ণে শব্দের সৃষ্টি বোঝায়, অনুলোম সৃষ্টি ও বিলোম সংহারের মাধ্যমে সমস্ত জগতকেই গ্রহণ করা হয়। তার সাথে জগতের মূল পঞ্চতত্ত্ব ও তিনগুণকে যোগ করলে ফল দাঁড়ায় ১০৮, সুতরাং ১০৮ সংখ্যা জগদ্ব্যাপী ব্রহ্মের প্রতীক।
- পূজনীয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মতে—মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হবার আগে মানুষ সংকল্প করে যে, সে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ভগবানের নাম নেবে। একজন সুস্থ মানুষের সারাদিনে ২১৬০০ বার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চলে। কিন্তু মায়ার সংস্পর্শে এসে মানুষ সংকল্প ভুলে যায় এবং ঐ সংখ্যার দুটো শুন্য বিলীন হয়ে যায়, বাকি থাকে ২১৬। তাই সকালে ও সন্ধ্যায় সে ১০৮ বার করে জপ করে।

গুরুভাব :

পরম পূজনীয় মহারাজ দীক্ষা দান শুরু করেন ১৯৯২ সালের ১৫ই জুন, স্নানযাত্রার দিন, কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান মঠে। প্রথম দিন দীক্ষা দেন ২৫ জনকে। ঐ সময় বেশ কিছু বৎসর তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মহারাজ ও বরিষ্ঠ ভাইস্ প্রেসিডেন্ট মহারাজের অসুস্থতার কারণে বিভিন্ন প্রান্তে দীক্ষা দেওয়ার জন্য যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই পূজনীয় মহারাজ ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দীক্ষা দানের জন্য তাগিদ আসতে শুরু করেছিল। পূজনীয় মহারাজও সেই ডাকে সাড়া

দিতে দেরি করেননি। কাঁকুড়গাছির বাইরে প্রথম দীক্ষা দেন মালদায় এবং তারপর জলপাইগুড়িতে।

ঐ বৎসর পরবর্তী ৬ মাসে আঁটপুর, কামারপুকুর, জয়রামবাটী, তমলুক, আসাম ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গা ছাড়া বিদেশে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ফিজি এবং অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে দীক্ষাদানের জন্য গিয়েছিলেন। অনেক জায়গায় এক একদিনের দীক্ষার্থীর সংখ্যা ২০০ থেকে ২৫০ পর্যন্ত হয়ে যেতো। পূজনীয় মহারাজ নিজের কষ্ট অগ্রাহ্য করে কাউকে কখনো ফেরাতে না। ধৈর্য্য ধরে প্রতি দীক্ষার্থীকে দীক্ষার সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে দিতেন। সংখ্যা বেশী থাকলে কোন কোন সময় দীক্ষা সম্পূর্ণ হতে বিকেল বা সন্ধ্যা পর্যন্ত হয়ে যেত। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোন ক্লান্তি ছিল না। যখন যেখানে যেতেন সেখানকার সাধু ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে খুব মিশতেন। তাদের ঠাকুর স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করতেন। পূজনীয় মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বীকৃত কেন্দ্রগুলি ছাড়াও ভক্তদের পরিচালিত বহু ছোট ছোট আশ্রমে গিয়ে দীক্ষা দিয়েছেন। সব জায়গায় পূজনীয় মহারাজের অবস্থানের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও হয়তো থাকতো না। কিন্তু তাতেও কখনো তিনি বিরক্ত হতেন না। সেবক আশ্রম কর্তৃপক্ষের কাছে পূজনীয় মহারাজের ব্যবস্থাদির বিষয়ে কোন অভিযোগ করলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হতেন। আহার্য বস্তু সুপাচ্য না হলেও বলতেন—আমরা যদি এখন ঋষীকেশে থাকতাম ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতে হতো। এ খাবার তো রসনার পক্ষে তার থেকে অনেক উৎকৃষ্ট।

দ্বিতীয় বৎসর পূজনীয় মহারাজ পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জায়গা ছাড়াও আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মেঘালয় গিয়েছিলেন। এছাড়াও ঐ বৎসর সিঙ্গাপুর ও জাপান হয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। শিকাগো বক্তৃতার শতবৎসর জয়ন্তী উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে, ঐ সময় তিনি আমেরিকা ও কানাডায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সবকটি কেন্দ্রে গিয়ে ঠাকুর স্বামীজির বাণী বিতরণ করেছিলেন।

- ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশের বরিশালে ও তামিলনাড়ুর মাদুরাইতে নতুন মন্দির উদ্ঘাটন করেছিলেন। ঐ বৎসরই মে মাসে ভক্তদের পরিচালিত রেঙ্গুন আশ্রমের আমন্ত্রণে সেখানে দীক্ষাদানের জন্য যান। রেঙ্গুনে ফৌজী সরকারের আদেশে দীক্ষা অনুষ্ঠান প্রায় ৩০ বৎসর বন্ধ ছিল। তাই ঐ বৎসর সেখানকার বহু ভক্ত দীক্ষা লাভে কৃতার্থ হন। ঐ বৎসর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান ছাড়া আসাম, ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু, গুজরাট, কর্ণাটক কেরালা,

বিহার, আন্দামান, অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে দীক্ষা দেন। এই বৎসর বাংলাদেশেরও সমস্ত প্রান্তে গিয়ে অগণিত মানুষকে দীক্ষা দানে কৃতার্থ করেন। পূজনীয় মহারাজ কোন কোন আশ্রমে প্রথম দীক্ষাদান শুরু করে পরপর প্রায় প্রতিবছর সেখানে দীক্ষাদান করে আশ্রমগুলির ভক্ত অনুরাগীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর করে দিয়েছিলেন। যেমন বরানগর সংরক্ষণ সমিতি (পুরানো বরানগর মঠ), বোলপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম, দুর্গাপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম, খারুপেটিয়া (আসাম) রামকৃষ্ণ আশ্রম বসিরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রম ইত্যাদি।

- ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়া ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, দিল্লী, চন্ডীগড়, আসাম, অরুণাচল, গুজরাট, মেঘালয়ে দীক্ষাদান করেছিলেন। এছাড়া বিদেশে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও রেঙ্গুন গিয়েছিলেন।
- ১৯৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে দীক্ষা দান করেছিলেন। বিদেশের মধ্যে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া গিয়েছিলেন।
- ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ত্রিপুরা, দিল্লী, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, মেঘালয়, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, আসাম এবং বাংলাদেশের ১২টি জায়গায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। এ সময় বাংলাদেশ থেকে ফেরার পথে প্রথম হৃদরোগের সূত্রপাত ধরা পড়ে।
- কিছুদিন বিশ্রামের পর পরের বৎসর ১৯৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা ছাড়া উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, বিহারে দীক্ষাদান করেন।
- ১৯৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আসাম, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, চণ্ডীগড়, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং বিদেশে সিঙ্গাপুরে দীক্ষাদান করেন।
- ২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আসাম, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, বিহার, গুজরাটে ও বিদেশে মরিশাসে দীক্ষাদান করেন।
- ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কেরালা, ত্রিপুরা, রাজস্থান, হিমাচলপ্রদেশ, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ-এ দীক্ষাদান করেন। এই বৎসর বিদেশের মধ্যে বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াতে দীক্ষা দেন। এই বৎসরই বাংলাদেশের বাগেরহাট কেন্দ্রের নতুন মন্দির উদ্‌ঘাটন করেন।
- ২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বিহার, ত্রিপুরা, কর্ণাটক, আসাম, মেঘালয়, তামিলনাড়ু,

চণ্ডীগড়, উত্তরপ্রদেশ-এ দীক্ষাদান করেন। এই বছরই পূজনীয় মহারাজ গয়াতে দীক্ষাদান করেন। পূজনীয় মহারাজের গয়াতে বিষ্ণুপাদ-পদ্ম দর্শন ও সেখানে রামকৃষ্ণ নাম বিতরণের বিশেষ আগ্রহ ঐ সময় পরিলক্ষিত হয়েছিল। পূজনীয় মহারাজ বলতেন, গয়ার গদাধর থেকে রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। কাজেই গয়াতে একটি রামকৃষ্ণ কেন্দ্র হওয়া দরকার। সেখানে ভক্তবাড়িতে অবস্থান করে সেখানকার স্বল্প সংখ্যক ভক্তকে দীক্ষাদান করে পূজনীয় মহারাজ মনে হয় ভবিষ্যতের রামকৃষ্ণ কেন্দ্রের বীজ বপন করে দিয়ে গেছেন। ত্রিপুরার কৈলা শহর ও মেঘালয়ের কুড়লভাঙ্গা আশ্রমের নতুন মন্দির এই বছরই উদ্বোধন করেছিলেন।

- ২০০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অরুণাচল, আসাম, কেরালা, বিহার, মহারাষ্ট্র, ত্রিপুরা, রাজস্থান, উড়িষ্যায় দীক্ষা দান করেন।
- ২০০৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বিহার, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, আসাম, উড়িষ্যা, এবং উত্তরপ্রদেশ, চণ্ডীগড়, দিল্লীতে দীক্ষাদান করেন। এই বৎসর তিনি ইংল্যান্ড ও ইউরোপে গিয়েছিলেন এবং কতিপয় ভক্তকে দীক্ষা দান করে তাদের জীবনে প্রকৃত সুখ ও শান্তির পথ প্রদর্শন করে জীবনের রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন।
- ২০০৫-এর প্রথমার্ধে পূজনীয় মহারাজ আসাম, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জায়গায় দীক্ষাদান করেন। ঐ সময় বাংলাদেশের ঢাকা কেন্দ্রের নতুন মন্দির উদ্‌ঘাটন করেন।

২৫শে মে অধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণ করার পর প্রথম দীক্ষা দেন ২৭শে মে বেলুড় মঠ, এছাড়া কালাডী, ব্যাঙ্গালোর, গৌহাটী, শিলং, চেরাপুঞ্জী, দিল্লী, শ্যামলাতালে দীক্ষা দিয়েছেন। এই বৎসর বিদেশে মালয়েশিয়ার কোয়ালামপুর ও পেনাং, সিঙ্গাপুর ও মরিশাশে দীক্ষা দিয়েছেন।

২০০৬ সালে বেলুড়মঠ ছাড়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মস্থান শিকড়া-কুলীনগ্রামে দীক্ষা দান করেন পরে নাগপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নতুন মন্দির উদ্‌ঘাটন করেন। এছাড়া বোম্বে, পুণে, টাকী, আগরতলা, উদয়পুর (ত্রিপুরা), দেওঘর, স্বামীজির জন্মস্থান, রহড়া, রামহরিপুর, বোলপুর, ভুবনেশ্বর, পুরী প্রভৃতি স্থানে দীক্ষা দান করেন।

২০০৭ সালে কামারপুকুর, জয়রামবাটী, পুণে, মুম্বাই, জামতাড়ায় দীক্ষা দিয়েছেন। বেলুড়মঠে শেষ দীক্ষা দেন ১৭ই জুলাই ২০০৭। এই সকল তথ্য শ্রদ্ধেয় সচিব সেবক মহারাজের কাছ থেকে নভেম্বর, ২০০৭ সালে প্রাপ্ত।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী কাঁকুড়গাছিতে ৪ বার শুভ পদার্পণ করেছেন। সেখানে গিয়ে

শ্রীমা ঠাকুর ভাণ্ডারের উপর তলার ঘরে অবস্থান করতেন। মহারাজ কোন কোন ভাগ্যবানকে মায়ের পদার্পণের কথা স্মরণ করিয়ে ঐ ঘরেই কৃপা করতেন বিশেষত বিদেশি ১/২ জন এলে তো ওখানেই মন্ত্র দীক্ষা দান করতেন।

প্রসঙ্গ যখন কথামৃত :

পূজনীয় মহারাজ কথামৃতের যে অংশটি ভক্তদের প্রায় পড়ে শোনাতেন ও নিত্যপাঠ করতে বলতেন এমনকি দীক্ষাদান কালেও প্রায়ই পাঠ করতেন সেটি হলো : কথামৃত—১৮৮২ মার্চ।

মাষ্টারমহাশয়ের ঠাকুরকে দ্বিতীয় দর্শন—পঞ্চম পরিচ্ছেদ :

মাষ্টার (বিনীতভাবে)—ঈশ্বরে কি করে মন হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ : ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ। ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভেতর ও বিষয়কাজের ভেতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরের মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড় কঠিন।

যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল, গরুতে খেয়ে ফেলে।

ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্বদা সদসৎ বিচার করবে। ঈশ্বরই সৎ-কিনা নিত্যবস্তু আর সব অসৎ কি না অনিত্য। এই চিন্তা করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে।

মাষ্টার : সংসারে কি রকম করে থাকতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ : সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে থাকবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক, কিন্তু মনে জানবে যে তারা তোমার কেউ নয়। ....

মাষ্টার : ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ : হ্যাঁ অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জন বাস-তাঁর নামগুণ গান বস্তুবিচার-এইসব উপায় অবলম্বন করতে হয়।

দীক্ষার অনুষ্ঠান গ্রাম্যমেলার রূপ নিত :

প্রাইভেট আশ্রমগুলো যেমন কুড়োলভাঙ্গা (তুরা, মেঘালয়), সেন্ডেলেরবিল (সুন্দরবন) প্রভৃতি জায়গায় দীক্ষাদান অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেলা বসে যেত। মেলায় হরেকরকম

জিনিস, যেমন - বেলুন, পাঁপড়ভাজা, বাঁশি, ভেঁপু, বাচ্চাদের খেলনা, মুড়ি, চপ, বাড়ির নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ইত্যাদি কেনাবেচা হত। নাগরদোলাও থাকত। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাত্রে যাত্রানুষ্ঠান হত।

অবিচল শরণাগতি :

চট্টগ্রামে একটি পুরানো দোতালার লম্বা ঘরে দীক্ষা দান করছেন—বাড়ি জীর্ণ, একটু জোরে হাঁটলেই বাড়িটি দুলতে থাকে, এমন সময় এক বড় বিপদ এসে উপস্থিত হলো। মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হতে শুরু করল। পূর্ব ভীতিপূর্ণ আতঙ্কের স্মৃতি মানুষকে বিচলিত করে তুলল। অস্থির হয়ে উঠল। দীক্ষিতেরা ঘর ছেড়ে সবাই বাইরে চলে যেতে চাইলে মহারাজ ধমক দিয়ে বললেন—"থামো ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস হচ্ছে না বসো, ভূমিকম্প থেমে যাবে।" নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দীক্ষাদান চলতে লাগলো—ভূমিকম্পও থেমে গেল।

বেশ কিছুকাল আগে, তখন ২য় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে। মহারাজজী হাওড়া ব্রীজ পার হচ্ছেন। এমন সময় বিপদ সংকেতের সাইরেন বেজে উঠল। হাওড়া ব্রীজের উপরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চোখে পড়ল এক ঝাঁক বোমারু বিমান এক্ষুনি বোম্বিং করে হাওড়া ব্রীজটি ধ্বংস করে দেবে। সবাই দিশাহারা হয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। সেই সময়ও মহারাজ অবিচল, তিনি ভাবলেন মৃত্যুই যখন নিশ্চিত তখন মৃত্যুর ভয়াবহ আতঙ্কের কথা চিন্তা না করে ভগবানের চিন্তা করাই শ্রেয়। গীতায় রয়েছে—"যদ্ যদ্ স্মরণ ভাবন ত্যজতন্তে কলেবরম্....।" মৃত্যু যখন তার করাল রূপে সম্মুখ শিয়রে, মহারাজ তখন শান্ত প্রশান্ত হয়ে ভগবানের নাম নিচ্ছেন।

যাইহোক, যে কারণেই হোক, সেই দিন বোমারু বিমান গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হয়েছিল, মহারাজও নিশ্চিন্ত মনে হাওড়া ব্রীজ পেরিয়ে গেলেন।

ঠাকুরের ভাবে ভাবিত দেবমানব :

তাঁর ভালবাসার পরিধি খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধু মহাত্মা থেকে কেবল দুরাত্মা পর্যন্ত নয়, কোর্টের ব্যারিষ্টার থেকে জেলের কয়েদী, উড়োজাহাজের পাইলট থেকে সর্বস্তরের মানুষ, যেমন খ্রীষ্টান, মুসলমান পর্যন্ত অকাতরে সবাইকে কৃপা করেছেন, মহামন্ত্র দান করেছেন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে। জন্মজন্মান্তরের কর্মফল ভাল-মন্দ সমস্ত কিছু স্বয়ং তাদেরকেও ঠাকুরের পাদপদ্মে সমর্পণ করেছেন। দীক্ষার দিন দীর্ঘক্ষণ ধরে তাদের সঙ্গে কথা বলতেন—অন্যান্য আশ্রমবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে বলতেন—ওদের সঙ্গে আর কবে আমার দেখা হবে—তার কোন ঠিক নেই তাই ওদের জন্য একটু

বেশি সময় দিই। কখনো কখনো মন্ত্র সরল করেও দীক্ষা দান করেছেন দীক্ষার্থীর ব্যাকুলতা দেখে। অথর্ব মানুষকে ও মুমুর্ষ মানুষকেও দীক্ষা দিলেন—দেখা গেল তার কয়েকদিন পরেই তার শরীর গেল—এতে বোঝা যায় ঐ মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্তিটুকু বাধা ছিল—তার পর স্বধামে চলে গেল। ত্রিসন্ধ্যা বসার কথা বলতেন, অন্ততঃ দুবেলা অবশ্যই বসবে। যে যত করবে সে তত ফল পাবে এবং এত আনন্দ হবে যে, মনে হবে যে আরো আগে কেন শুরু করিনি। দীক্ষার দিন দীক্ষাগুরুগণ আর সাধারণ মানব থাকেন না, তারা ঠাকুরের ভাবে এত ভাবিত হন যে ঠাকুরময় হয়ে যান। ঠাকুরের জীবন্ত সচল দেবমানব বিগ্রহ দীক্ষার্থীর সম্মুখে চলে আসে।

অভেদানন্দজীর প্রতি শ্রদ্ধা :

খুব সম্ভব তখন **১৯৩৮** খ্রীষ্টাব্দ। নরেশরঞ্জন (মহারাজের পূর্বনাম) ধর্মলাভের জন্য চিরতরে গৃহত্যাগ করবার পূর্বে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাসহচর অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের পুণ্য দর্শন লাভ করেন। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করেন। তিনি তখন মেছুয়াবাজারের এক বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। পুণ্যদর্শন ও প্রণাম মহারাজজীর জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। পরবর্তীকালে এই ঘটনাটি বেশ গাম্ভীর্যের সাথে আমাদের বলতেন। এমনকি দেখা গেছে যে উপাসনাকালে নিত্য ব্যবহৃত হতো একটি ফোটোফ্রেম যাতে ঠাকুর, মা, স্বামীজির নিচে স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ এবং স্বামী অচলানন্দজী মহারাজবৃন্দের ছবি থাকত। উপাসনার অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত এই ফোটোফ্রেমটি মহারাজজীর জপবাক্সে অতি সন্তর্পণে রাখা থাকত। উপাসনাকালে ঘরের সব আলো নিভিয়ে ফেলে কেবল ঐ ফোটো ফ্রেমটির উপর আলোর বিকল্প ব্যবস্থা করা হত। মহারাজজী তাতে অপলক দৃষ্টি ফেলে বেশ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করতেন, দর্শন প্রণাম করতেন। এটি অন্যান্যদের সাথে স্বামী অভেদানন্দজীর প্রতি মহারাজজী অকৃত্রিম গভীর শ্রদ্ধার সাক্ষ্য বহন করে। সময় সুযোগ পেলে বেদান্ত মঠে যেতেন। ওনার জন্মতিথি পুজোর দিন অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীদেরও সেখানে যাওয়ার অনুমতি দিতেন।

স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের স্মৃতিধন্য সকল স্থানই ছিল তার নিকট তীর্থস্বরূপ। তাই তিনি সেই সকল স্থানেও যেতেন। এই সকলের দ্বারা মহারাজজীর প্রতি তাঁর যে অপরিসীম শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল তা সহজেই অনুমিত হয়।

সম্ভবত **১৯৩৮** সাল পূজনীয় মহারাজ বলছেন—সেই সময় ঠাকুরের পার্ষদদের মধ্যে কেবল স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ স্থূল শরীরে ছিলেন। তিনি তখন কলকাতায়

থাকতেন। তাঁকে কলকাতার মেছুয়া বাজারে একটি বাড়িতে (তৎকালীন বেদান্ত মঠ) দর্শন করি। (তাঁর) বলিষ্ঠ দেহ ও গম্ভীর গলা (কণ্ঠস্বর), সৌম্য মূর্তি—বসে আছেন। সেই একবারই আমার তাঁর দর্শন ও প্রণাম করার সৌভাগ্য হয়েছিল।....মা ঠাকুরণের উপর তাঁর কী ভক্তি ও শ্রদ্ধা, তা না হলে এমন লেখা (প্রকৃতিং পরমাম্) স্তোত্র তাঁর হাত থেকে বেরোয় ! ঠাকুরের সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা বোঝা যায়, "হৃদয়কমল মধ্যে" ইত্যাদি সুন্দর রচনা থেকে। পরবর্তীকালে এইটি ঠাকুরের ধ্যান-মন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আধ্যাত্মিক শক্তি ও সম্পদ :

গুরু শক্তি লাভের উপযুক্ত আধার তথা যোগ্য উত্তরাধিকারী স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ছিলেন মহা আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন, স্বামীজির শিষ্য—পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান। পরম পূজনীয় ব্রহ্মজ্ঞানী স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ স্পষ্ট দেখতেন যে স্বামী গহনানন্দজী তাঁর থেকে অনেক ছোট হলেও এমন কি তাঁর নিকট সংঘে নবাগত ব্রহ্মচারী রূপে যোগদান করলেও ওরই ভিতর গুরুশক্তির জড়বল জ্বল জ্বল করছে।

পূজনীয় মহারাজজীর নিজস্ব ছোট লাল বাক্সে যে জিনিসপত্র গুলো থাকত :—

১) শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২) উপাসনাপদ্ধতি ৩) দীক্ষাদান পদ্ধতি প্রভৃতি।

ক) পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ সর্বদা তাঁর বুক পকেটে শ্রীশ্রীমায়ের পদরজঃ সম্বলিত কালো রঙের তামার তাবিচ সযত্নে রাখতেন। জীবনের অন্তিমপর্বে একদিন স্বামী গহনানন্দজীকে ডেকে বললেন : "যখন দেখবে আমি আর শুচি-অশুচি রক্ষা করতে পারছি না তখন আমার বুক পকেট থেকে ওটি তুমি বার করে নেবে এবং তোমার কাছে রাখবে।" জীবনের অন্তিম সময় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী সচেতন ছিলেন। দেহত্যাগের মাত্র কিছুক্ষণ আগে তাঁর ঘরে উপস্থিত বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীগণের মধ্যে থেকে মহারাজকে কাছে ডাকেন এবং মহারাজকে নিজ হাতে তামার তাবিচটি ওনার হাতে অর্পণ করেন। কিছুক্ষণ পরে সুনিশ্চিত হবার জন্য মহারাজকে পুনরায় কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁকেই দেওয়া হয়েছে কিনা। তার কিছুক্ষণ পরেই তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করে বাঞ্ছিত লোকে গমন করেন। বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে এই ঘটনা পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের দেবশরীর অবলম্বনে যে গুরুশক্তি কাজ করবে এ তারই পূর্বাভাস। পরবর্তীকালে পূজনীয় মহারাজ দীক্ষার সময় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই আধ্যাত্মিক সম্পদ প্রত্যেক দীক্ষার্থীর মাথায়

স্পর্শ করিয়ে ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করতেন। এছাড়াও বহু আধ্যাত্মিক সম্পদ মহারাজের কাছে পরবর্তীকালে এসেছিল।

খ) শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে প্রাপ্ত মাদুলীতে শ্রীশ্রীমায়ের পদরজঃ।

গ) ২৭-৮-১৯৯২ তারিখে শ্রীমতী হেনা সিন্‌হা সিঙ্গাপুর থেকে প্রাপ্ত সোনার তাবিজে শ্রীশ্রীঠাকুরের নখ ও কেশ।

ঘ) ছোট Capsule-এ শ্রীশ্রীমায়ের কেশ এবং বড় Capsule-এ স্বামীজির কেশ এ দুটিই স্বামী শ্রীধরানন্দ মহারাজের কাছ থেকে প্রাপ্ত।

ঙ) বলরামবাবুর বংশধর পুতুলদির নিকট হতে প্রাপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের কেশভর্তি একটি তাবিজ যা আবার একটি অতিক্ষুদ্র বাক্সে রাখা থাকত। পুতুলদিরা সেই অতিক্ষুদ্র বাক্সটি "আত্মারামের কৌটা" জ্ঞানে নিত্যপুজো করতেন।

চ) নিজ গুরুদেব স্বামী বীরজানন্দজী মহারাজের ব্যবহৃত একটি ছোট কমণ্ডুলু এছাড়াও সাধন ভজন উপাসনার উপযোগী সামগ্রী, ঠাকুর, মা, স্বামীজির ফোটো, দুইটি জপমালা (১০৮ দানা একটি, ৫৪দানার আর একটি), পুরীর আটকে প্রসাদ, গঙ্গাবারি, কম্পাস, (চুম্বক শলাকা) হাতঘড়ি, টেবিল ঘড়ি (ছোট), কলম, সামান্য প্রণামী ও রবারের দুটি ছোট বল ওঁনার কাছে থাকত।

উত্তর বা পূর্ব মুখ করে জপের আসন পাতা হয়েছে কিনা, উত্তর বা পূর্বে মুখ করে জপে বসা হলো কিনা তা নির্ণয় করবার জন্যই চুম্বক শলাকা ব্যবহার করতেন। ভাবতে অবাক লাগে জপে বসার জন্যও চুম্বক শলাকা ব্যবহার করতেন।

গুরুতত্ত্ব :

মহারাজজীর নিকট পূজনীয় যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের কিছু স্মৃতি স্মারক বস্তু ছিল যা তিনি একদিন ট্রাস্টি মিটিং শেষে আত্মরামানন্দজী মহারাজকে দেন। আর গুরু বিষয়ে লিখিত যা তত্ত্বকথা ছিল তা হলো :

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে ও অন্যান্য সকল দেশে দীক্ষাদাতা গুরুকে বা অধ্যাত্মজীবনের শিক্ষককে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। হিন্দু শাস্ত্রে গুরুকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এমনকি পরমব্রহ্ম—পরমচৈতন্যস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনা যে উচ্চ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকেই করা হয়েছে, লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মোটেই নয়, একথা কিন্তু অনেকেই ভুলে যান।

অধিকাংশ ধর্মজিজ্ঞাসুই নিজের শরীর ও মানসিক ভাবের সঙ্গে স্ব- স্বরূপকে মিশিয়ে ফেলে এবং কোন বিশেষ দেব বা দেবীর উপাসনা করতে করতে তাতেই বদ্ধ হয়ে থাকে। এবং তাদের মন্ত্রদাতা গুরু কেউ থাকলে, তাঁরও বাহ্যরূপ—মানুষ-ভাবটিকে তারা আঁকড়ে ধরে থাকে। এটা আধ্যত্মিকতার ছোপ লাগানো একরকম জড়োপাসনা ছাড়া কিছুই নয়। প্রথম অবস্থায় তা যতই সহায়ক হোক, আধ্যাত্মিক এই জড়ত্বকে আমাদের অতিক্রম করতেই হবে। কীভাবে তা করা যায় সেটাই এখন প্রশ্ন।

আধ্যাত্মিক পথে একটু অগ্রসর হলে সাধক ক্রমে নিজেকে জীবাত্মা এবং উপাস্য দেবতাকে পরমাত্মারূপেই অনুভব করেন। জীবাত্মা বাস্তবিকই পরমাত্মা বা অনন্ত চৈতন্যের অংশ এবং গুরুও প্রকৃতপক্ষে তাঁরই এক দিব্য প্রকাশ, যাঁর মাধ্যমে ভক্তের কাছে ভগবৎ করুণা—জ্ঞান, প্রেম ও শান্তি প্রবাহিত হয়ে থাকে। সাধক, ইষ্টদেবতা এবং গুরু যে সেই একই পরমচৈতন্যের প্রকাশ—এই সত্যটিকে উপলব্ধি করাই হচ্ছে আমাদের সাধনা।

ধ্যান আরম্ভ করবার প্রাক্কালে আমরা নিজেদের দেহকে যেন মন্দিররূপে কল্পনা করি। হৃদয়পথ বেয়ে এই মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখতে পাব, অনন্ত জ্যোতি ও চৈতন্যময় পরমাত্মারই অংশস্বরূপ জীবাত্মার চেতনালোকে মন্দিরটি পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আমাদের শরীর মন ও সমস্ত জগতকে এইবার সেই পরমসত্ত্বার মধ্যে নিমজ্জিত করে দিয়ে কল্পনা করতে হবে—আমরাও অনন্ত জ্যোতি ও চৈতন্যদ্বারা অনুস্যূত ও আবিষ্ট এক-এক কণা জ্যোতি ও চৈতন্যই। কিন্তু এরকম ধ্যান তো সাধারণের আয়ত্তের বাইরে। তাই ভাবতে হবে, আমাদের আত্মা যেন একটি শুদ্ধ দেহ ও শুদ্ধ মন পরিগ্রহ করেছেন—পরমাত্মাই একদিকে গুরু ও অপরদিকে ইষ্টমূর্তি ধারণ করেছেন। এখন আমরা গুরুকে প্রণাম করে তাঁর রূপ ইষ্টে লয় করে, ইষ্ট দেব বা দেবীর ধ্যান করবো এবং ইষ্ট মন্ত্র জপ করতে থাকবো।

ধ্যানের প্রথম সোপান রূপধ্যান—অর্থাৎ ইষ্টের জ্যোর্তিময় আনন্দঘন সাকার মূর্তি ধ্যান। পরবর্তী সোপান গুণধ্যান—অর্থাৎ ইষ্টের অনন্ত গুণাবলী—অনন্ত পবিত্রতা, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও আনন্দের ধ্যান। তৃতীয় ও সর্বশেষ সোপান স্বরূপ-ধ্যান—অর্থাৎ ইষ্ট, গুরু ও শিষ্য যে সর্বব্যাপী চৈতন্যের এক-একটি অভিব্যক্তি তারই ধ্যান। ধ্যানের পূর্ববর্তী স্তরগুলিতেও অনন্ত এই ধারণাটি কখনও ভুললে চলবে না। অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসু-মাত্রেরই এই কথাটি স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন মনুষ্য মূর্তিকে আদর্শরূপে ধরা বা কোন ব্যক্তিকে অন্ধ উপাসনা করা, আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রবল প্রতিবন্ধক এবং তা

শিষ্য ও গুরু উভয়ের পক্ষে অনিষ্টজনক। "সদ্গুরু হচ্ছেন মুক্ত আত্মা এবং তিনি তখনই আনন্দিত হন যখন তাঁর প্রতিটি শিষ্য নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে উপলব্ধি করতে পারে এবং উদার উন্মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে নিজেরাই নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করে নিতে পারে। সবাই নিজের উপর নির্ভর করে শিষ্য যদি গুরুর মানবীয় সত্তাটিকেই মাত্র আঁকড়ে ধরে থাকে এবং প্রতি পদক্ষেপে তাঁর সাহায্য ও নির্দেশের অপেক্ষা করে, তবে গুরুও বন্ধন বোধ করেন এবং তিনি স্বানুভূত আনন্দ ও মুক্তি শিষ্যদেরও অনুভব করাতে পারছেন না এই অক্ষমতায় দুঃখ পেয়ে থাকেন। হাজার হাজার অন্ধ চেলার চেয়ে তিনি বরং একজন স্বাধীন-সক্ষম শিষ্যকেই বেশি স্নেহ করেন।" এই কারণেই জ্ঞানী আচার্যরা ভারতবর্ষে বহুপ্রচলিত তথাকথিত গুরুসেবাকে আদৌ আমল দেন না। অধিকাংশ শিষ্যই গুরুর ব্যক্তিগত সেবা অপেক্ষা তাঁর আদর্শ অনুসরণ ও তদনুযায়ী জীবন গঠন করা যে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ এ কথাটি ভুলে যান। আমাদের নিজেদের জীবনকে এমনভাবে ক্রমশ প্রস্তুত করা উচিত যাতে বাইরের গুরুর উপর অত্যধিক নির্ভর না করে, অন্তর্যামী গুরুর উপরই উত্তরোত্তর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারি। এবং গুরু ইহলোকেই থাকুন, বা পরলোকেই থাকুন,—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় তিনি 'এ ঘর থেকে ও ঘরে গিয়ে থাকলেও—অর্থাৎ স্থূল সত্তা ত্যাগ করে সূক্ষ্ম সত্তায় থাকলেও আমরা যেন আমাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে নিশ্চিতই পৌঁছাতে পারি। গুরুবাদের দুশ্ছেদ্য বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে গেলে, অসীম অনন্ত চৈতন্যের—যিনি অফুরন্ত জ্ঞান, প্রেম ও শান্তিস্বরূপ তাঁরই সম্বন্ধে উল্লিখিত উপায়ে ধ্যান ধারণা করতে হবে। যখনই আমরা মানবীয় স্তরে নেমে আসবো তখনই আমাদের বাহ্যরূপ অপেক্ষা আত্মিক শক্তির উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা সাধতে হবে। আধ্যাত্মিক প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা পেতে, সমস্ত জড়ভাবকে সীমাহীন আত্মাতেই বিলয় করে দিয়ে নিয়ত অভ্যাসের সাহায্যে সেই অনন্ত চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করাই শ্রেয়। এই সাধনা শুধুমাত্র শিষ্যকেই নয়, গুরুকেও পূর্ণ মুক্তি এবং শান্তির অনুভূতিলাভে সাহায্য করে।

অবতারতত্ত্ব :

জামতাড়াতে অবস্থান কালে অনতিদূরে অতিদ্রুতগামী ট্রেন কু-ঝিকঝিক শব্দে ছুটে চলেছে গন্তব্যস্থলের দিকে, লক্ষ্যের দিকে, তাই দেখে মহারাজ বলছেন—"অবতার কী রকম জান? ঐ ইঞ্জিনের মতো—সে নিজে তো যায়ই আবার বহু বগিকেও টেনে নিয়ে যায়।"

জিতনিদ্র :

পূজনীয় মহারাজ অতি ভোর ভোর উঠে পড়তেন। নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ এই তিনটি তমোগুণ এগুলি জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, শান্তি, সুখ, প্রেম, সমাধিলাভের পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। নিদ্রা হলো সবিশেষ তমোগুণ, তা তিনি জয় করেছিলেন। রাতে ঘুমোতে যেতে যেতে তাঁর অধিক রাত্রি হয়ে যেত। যখন তাঁকে শয়ন দিতাম তখন হয়ত ১২ টা, ১২-৩০, কিন্তু যথারীতি ভোর ৪ টেয় উঠতেন, তিনি বলতেন—কৈ হে! ওঠো, জাগো। প্রাতঃকৃত্যাদি, হাত মুখ ধুয়েই তিনি জপে বসতেন। কখনো কখনো স্নান সেরেই জপে বসতেন।

আসন-সিদ্ধ ধ্যানযোগী :

আহা ভগবান ভগবানের জপ করছেন—ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মের চিন্তায় নিমগ্ন, সে এক দুর্লভ অবর্ণনীয় দৃশ্য, কী করে বর্ণনা করব সেটি! আলো নিভিয়ে চারিদিক অন্ধকার করে দেবেন—সম্মুখে স্থাপন করবেন ঠাকুর, মা, স্বামীজির ছবি। একটি Emergency light দিয়ে আলো ফেলবেন কেবল ঠাকুর, মা, স্বামীজির উপর। হাতে গঙ্গা জল নিয়ে, নেবেন জপমালা, চলবে জপধ্যান দীর্ঘক্ষণ। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো যে, নিত্য দুবেলা জপে বসবার অভ্যাস তিনি গড়েছিলেন উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর মঠে। ভুবনেশ্বরের ভূমিতলেই তিনি পেতেছিলেন তাঁর প্রথম জপের আসন। সূয্যি মহারাজের সঙ্গলাভে, সান্নিধ্য লাভে তিনি পেয়েছিলেন জপ-ধ্যানের স্বাদ, যা তিনি ধরে রেখেছিলেন আজীবন। শেষ পর্যন্ত তিনি আসন-সিদ্ধ ধ্যানযোগী হয়ে উঠেছিলেন যার প্রমাণ মেলে বেলুড়মঠে কালীপূজা, দুর্গাপূজার সময়, তিনি একাসনে দীর্ঘক্ষণ বসে জপ ধ্যান করতে পারতেন। নিত্য অভ্যাস না থাকলে এ সম্ভব নয়।

অর্ঘ্যপ্রদান :

এরপর তিনি মন্দিরে যেতেন, মন্দিরে প্রবেশ করতেন অতি ধীর পদবিক্ষেপে, ঠাকুর সাক্ষাৎ বসে আছেন—এই ছিল তাঁর অনুভূতি। শরীর দরজাতে লেগে গিয়ে যাতে না শব্দ হয় সে জন্য মনস্থির করে সচেতনভাবে করজোড়ে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হতেন। আমরা হাতে সচন্দন পত্রপুষ্প, যাকে বলে অর্ঘ্য, তুলে দিতাম আর তিনি তা অতি সন্তর্পনে ঠাকুরের কোলে রাখতেন, দেখতেন রাখবার সময় ঠাকুরের কাপড় নড়ে গেল কিনা, যথাযথভাবে রাখা হলো কিনা—ফুলটি পোকায় কাটা কিনা ইত্যাদি। ঠাকুরকে কেমন কাপড় গাঢ় রঙের বর্ণের পড়ানো হয়েছে—পশ্চাতের পর্দা Dark colour (মূর্তির সাথে Contrast হতে হবে)-রয়েছে কিনা যাতে নাটমন্দির

থেকে ভক্তেরা ঠাকুরকে স্পষ্ট দর্শন করতে পারেন, এও দেখতেন।

দীক্ষার দিন থাকলে দীক্ষার্থীদের সংখ্যা জেনে নিয়ে তাদের ঠাকুরের চরণে ঐ সময়ই নিবেদন করতেন। পূজারীর নিকট ঠাকুরের পূজা সেবা প্রভৃতির খোঁজ আকারে ইঙ্গিতে নিয়ে ঘরে ফিরতেন।

অপচয় অপছন্দ :

এরপর মহারাজ প্রাতরাশ সারতেন, সেই সময় ওটস, কর্নফ্লেক্স ছিল তাঁর প্রিয় খাবার, প্রণামের ঘরে পার্ষদদের প্রণাম নিবেদন করে মঠের সাধু ব্রহ্মচারীদের প্রণাম গ্রহণ করতেন।

এরপর ফল খেতেন, আমরা বিভিন্ন ধরনের ফল সুন্দরভাবে কেটে বেশ কয়েকটি বাটিতে দিলে উনি প্রয়োজনের বেশি খেতেন না। বার বার কমিয়ে দিতে বলতেন, অপচয় একদম পছন্দ করতেন না। পাকা পেঁপে, পাকা পেয়ারা, সফেদা, আতা, খেজুর, কমলালেবু, কাজুবাদাম, বেদনার জুস্, মোসাম্বির জুস্ ইত্যাদি ছিল তাঁর প্রিয়।

আবালবৃদ্ধবনিতার প্রতি উপদেশ :

এরপর ভক্তদের দর্শন দিতেন উপদেশ দিতেন বিশিষ্ট দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। মাতৃকোলে কোন শিশু এসেছে, তো দেখেই মহারাজ তাকে কাছে ডাকতেন। তার দুহাতে চকোলেট দিতেন। কোন ছাত্র এসেছে তো, তাহলে তাকে বলতেন—"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ...." আবার বলতেন—পঞ্চ 'স' কার পালন করতে-স্বাধ্যায়, সেবা, সংযম, সাধন ও সত্য। ঘুম কমিয়ে ৫ ঘন্টার মধ্যে রাখতে বলতেন। নিয়মিত শরীরচর্চা সহ সারাদিনের একটি রুটিন তৈরী করতে বলতেন, বলতেন যে দিনটি চলে গেল তা আর ফিরে আসবে না।

অবাক জলপান :

নিয়ম করে মহারাজ সারাদিনে পরিমাণমতো জল পান করতেন। এর অন্যথা হতো না। **১১** টার সময় তো **১১** টায়ই পান করবেন, সামান্য দেরিও তিনি বরদাস্ত করতেন না।

শরণাগতকে আশ্রয় প্রদান :

কোন ভক্ত এসে বলছে—মহারাজ পরিবারে শান্তি নেই। মহারাজের সংক্ষিপ্ত উত্তর, "তা অশান্তির কর্ম না করলেই হলো," উত্তরটি ভক্তের মনোমতো না হওয়ায় যখন তাঁর শরণাগত হতো তখন তিনি তাঁর কল্যাণকারী হস্তটি অশান্ত ভক্তের মস্তকে স্থাপন

পূর্বক তাকে আশীর্বাদ করতেন—পরিবারে শান্তির বাতাবরণের জন্য ঠাকুর-মা-স্বামীজির নিকট প্রার্থনা করতেন।

ভক্তদের পরম আত্মীয়জ্ঞান :

প্রণাম চলাকালীন কোন ভক্তকে হয়তো প্রসাদ পেয়ে যেতে বলেছেন। অনেক সময় মুখের নিকট হাত নিয়ে গিয়ে খাবার খাওয়ার ভঙ্গিমায় দেখাতেন "প্রসাদ পেয়ে যেও,"..এবার তারা প্রসাদ পেলেন কিনা, প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা, নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে খেতে বসেও উঠে আসতেন। দেখতে চাইতেন, জানতে চাইতেন, ওরা প্রসাদ পেয়েছে তো? ভক্তদের যে পরম আত্মীয় জ্ঞান করতেন। এসকল দৃশ্য প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট প্রামাণ্য দলিল হয়ে রয়েছে।

ভক্ত কল্যাণকারী মন :

যাইহোক দুপুরের প্রসাদ ধারণের জন্য মহারাজজীকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো, সাবান দিয়ে তিনি হাত ভালোভাবে পরিষ্কার করতেন, কখনো কখনো দেখা গেছে তিনি বেসিনের সামনে বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কথা বলে বুঝতে পারতাম তখনো ভক্তদের কল্যাণের চিন্তা তাঁর মনকে অধিকার করে রেখেছে। খেতে বসেও তিনি ভক্তদের বিষয়ে নানা খোঁজখবর নিতেন। এইরূপ ছিল তাঁর ভক্তকল্যাণকারী মন।

জিতরস :

দুপুরের প্রসাদে বিশেষ বন্দোবস্ত ছাড়াও নানা ধরনের সুস্বাদু খাবার মহারাজজীর জন্য আসতো। ঠাকুরের প্রসাদের সব রকম Item আসতো। কিন্তু মহারাজজীর একটি নির্দিষ্ট বাটি ছিল। তাতে তিনি কয়েকটি মাত্র জিনিসই অল্প অল্প করে নিতেন, নির্দিষ্ট বাটিতে নির্দিষ্ট পরিমাণই নিতেন। তার বেশি তিনি একদমই খেতেন না। যারা যোগী পুরুষ তাদের আহার বিহার সব পরিমিত থাকে। নানা সুস্বাদু খাবার চোখের সামনে থাকলেও লোভ সংবরণ করে থাকেন। মহারাজজীও ছিলেন সেইরূপ একজন জিতরস যোগী পুরুষপ্রবর, তিনি বলতেন, "জিত রসে, জিতং সর্বে"।

দেবশরীর :

খাবার সুন্দরভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতেন। নিত্যপাতা টকহীন দই খেতে ভালবাসতেন। সবজির মধ্যে সজনে ডাঁটা চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া পছন্দ করতেন। শেষ দিন পর্যন্ত সব কটি দাঁতই ছিল। দাঁতের তিনি ভীষণ যত্ন নিতেন। আমাদেরও

দাঁতের যত্ন নিতে বলতেন। প্রসঙ্গক্রমে বলি যে, শরীর যাবার পূর্বেও মহারাজজীর দেবশরীরে বার্ধক্যের লক্ষণ যেমন-চর্ম লোল হয়ে যাওয়া), দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে যাওয়া, শ্রবণ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া প্রভৃতির কোন লক্ষণই লক্ষিত হয়নি। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল, শ্রবণ শক্তি ছিল। শরীর মুখমন্ডলের উজ্জ্বলতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। তিনি বলতেন সচল থাকতে থাকতেই যাবো।

বৈকালিক ভ্রমণ :

যাইহোক বেলুড়মঠে থাকাকালীন দুপুরবেলা প্রসাদ গ্রহণের পর বিশ্রামে যেতেন, বিশ্রাম সেরে হালকা টিফিন, তারপর বিকেল বেলার পড়ন্ত রোদে পরিষ্কার আকাশ তলে নিকানো পথে গঙ্গাদর্শনে বেরোতেন ও বৈকালিক ভ্রমণ সারতেন। ভ্রমণের সময় সরল সুবোধ শিশু থেকে আরম্ভ করে ন্যুব্জ, কুব্জ, বৃদ্ধ পর্যন্ত মহারাজজীর দৃষ্টিপথে পড়ে কৃপাদৃষ্টি লাভে কৃতার্থ হতো। অনেক সময় অযাচিতভাবে তাদের কুশল সংবাদ নিতেন। শুধু কি তাই ! সন্ধ্যা সমাগমে বেলুড় মঠে পাখিরা বৃক্ষের ডালে কিচির মিচির কলরব শুরু করেছে মহারাজ তা মন দিয়ে শুনতেন—আমাদের জিজ্ঞাসা করতেন, "ওরা কী বলছে বল দেখি?" সেবকরা বলতেন—কী আর বলবে, কে কোন ডালে বসবে, কে উপরের ডালে, কে নীচের ডালে বসবে এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি কিচিরমিচির করছে, আর কী? মহারাজ—"আরে না-না-না, ওরা নিজেদের মধ্যে খোঁজ নিচ্ছে—কে এলো, কে এলো না, কে এলো, কে এলোনা। ওরা অফিস বাবুর মতো প্রতিদিন সকালবেলা গঙ্গার ওপারে খাবারের সন্ধানে কলকাতায় উড়ে যায়, আবার সন্ধেবেলা অফিস বাবুদের মতোই বাড়ি ফেরে। তাই নিজেদের বাড়িতে ফিরে খোঁজ নিচ্ছে কে এলো, কে এলো না।" আমরা আশ্চর্য হতাম মহারাজের এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখে, তিনি তাদের কথা বুঝতেন, তাদের কথাও ভাবতেন।

একতাই বল ও সংঘবদ্ধ জীবন :

হাঁটবার পথে হয়তো চোখে পড়ল যে পিঁপড়ের সারি বড় আকারে খাবার বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মহারাজজী সেক্ষেত্রে তাদের পা দিয়ে না মাড়িয়ে ডিঙিয়ে যেতেন। বলতেন, দেখেছো তাদের সংঘবদ্ধজীবন আর নিজের দেহ থেকে বহুগুণ বড় ও ভারী বস্তুকে কিভাবে একতার শক্তিতে অনায়াসে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

খাদ্য-খাদ্যক শৃঙ্খল :

দূরে সাপ হয়তো ব্যাঙ ধরেছে, টিকটিকি হয়তো পতঙ্গ ধরতে যাচ্ছে, শীতকালে আলো জ্বললে অনেক পতঙ্গ টিকটিকি দেখা যায়, আমরা তখন তাদের বিপদের কথা

ভেবে তাড়িয়ে দিতে যেতাম। মহারাজ নিষেধ করতেন, বলতেন—না, না, খেতে বসা কোন মানুষকে যদি খেতে না দিয়ে তুলে দাও তাহলে তার কেমন লাগবে-এই জগৎটি চলছে—"অন্ন অন্নাদঃ ভবতি", (তৈঃ উঃ) খাদ্য-খাদক শৃঙ্খলে (Ecosystem)।

গঙ্গাভক্তি ও গঙ্গাদর্শন :

মহারাজজী নিয়মিত গঙ্গাদর্শন করতে ভালোবাসতেন। বেলুড়মঠে অবস্থানকালে সকাল বিকাল স্থিরা স্বচ্ছ সলিলা মা গঙ্গার সম্মুখে দণ্ডায়মান হতেন। করজোরে দক্ষিণেশ্বরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে মা ভবতারিণীর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করতেন। মহারাজের দৃষ্টিশক্তি খুবই ভালো ছিল। বেলুড় মঠ থেকেই দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরের চূড়ো সুন্দর ভাবে দর্শন করতে পারতেন, শুধু তাই নয়—সন্ধে হলে মন্দিরের চূড়োতে কী রঙের আলো ফেলা হয়েছে তাও তিনি দেখে বলতে পারতেন। সেখান থেকে মহারাজজীর দৃষ্টি পড়ত গঙ্গার পূর্বকুল বরাবর গিয়ে কাশীপুর শ্মশানঘাটে—যেখানে ঠাকুরের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এটি ভাবতে ভাবতে বাগবাজারের উদ্দেশ্যে দৃষ্টি নিরীক্ষণ করে ক্ষান্ত হতেন। পবিত্র গঙ্গাতীরবর্তী তীর্থসকল দর্শন করতে করতে মন আনন্দে ভরে উঠত। একদিন হঠাৎ করে লোডশেডিং হলে তিনি বলে ওঠেন—

ঋক্‌বেদের (১০.১২৯.১-৩) নাসদীয় সূক্তে বলা হয়েছে, তখন অসৎ ছিল না সৎ ও ছিল না। পৃথিবীও না, তার পারে অন্তরীক্ষও না। তখন আঁধার ছিল, প্রথমে সবই আঁধারের দ্বারা ঢাকা আঁধার, অভিন্ন এক সত্তা ছিল। অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আচ্ছাদিত ছিল।

যখন সৃষ্টি ছিল না এই সৃষ্ট জগৎ ছিল না তখন কী ছিল?—এই ছিল। ভোরবেলার আলো আঁধারি পরিবেশে শান্তগঙ্গাকে একটি লম্বা রূপালী পাতের মতো চকচকে দেখায়। সকালবেলা তাঁর মনে হতো—তিনি হিমালয় থেকে অতি দ্রুতগতিতে নিচে নামছেন, বহুকাজ বাকি-কত নগর শত রাজধানী পেরিয়ে তবে সাগরে মিলিত হওয়া, কত পাপী কত তাপীকে উদ্ধার করা, এসকল ভাবতে ভাবতে মা গঙ্গা যেন চঞ্চলা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এখানে শান্ত-কেননা তার সমস্ত কাজ সারা হয়ে গেছে—শুধু সাগরে মিলবার অপেক্ষায়। এই শান্ত স্নিগ্ধ স্বচ্ছসলিলা গঙ্গাকে দর্শন করতে করতে মহারাজজী অন্তর্মুখী হয়ে যেতেন।

—দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে।
ত্রিভুবনতারিণী তরল তরঙ্গে।।

(সুরেশ্বরী ভগবতী দেবী গঙ্গা, তিন ভুবন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তরল তরঙ্গে তারণ করছেন)

মন্দিরে ঠাকুর প্রণামের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বে মহারাজজী, তাঁর গুরুদেবের ব্যবহৃত ছোট একটি সুন্দর কমণ্ডুলু থেকে এক ফোঁটা গঙ্গা জল-বাম হাতে নিয়ে ডান হাতের একটি আঙ্গুল দিয়ে ঐ গঙ্গাজল স্পর্শ করে ভ্রুমধ্যে, চোখের পাতায়, কানের পাতায়, মুখে, বক্ষে, পরিহিত বস্ত্রে স্পর্শ করতেন। ভাব এই :

"ভদ্রং কর্ণেভি শৃণুয়াম দেবাঃ ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভিজত্রাঃ"

কর্ণ দ্বারা কল্যাণময়ী বাণী শ্রবণ, চক্ষুদ্বারা সুশোভন দৃশ্য দর্শন।

অন্তশুচিতা বহিশুচিতায় তিনি ছিলেন ভীষণভাবে আন্তরিক। শুচিশুদ্ধ জীবন ছিল তাঁর।

বেলুড়মঠ বাস :

মহারাজজী ভুবনেশ্বর মঠে সুয্যি মহারাজের সান্নিধ্যে হাজার কাজ করেও নিয়মিত জপধ্যান, প্রার্থনা এবং স্মরণ মননের যে অভ্যাস গড়ে নিয়েছিলেন জগন্নাথদেবের রথচক্রের মতো বুদ্ধের ধর্মচক্রের মতো, তাঁর সেই জপচক্রকে অনবরত চালিয়ে নিয়ে গেছেন—জীবনযাত্রার শেষ বেলা পর্যন্ত।

বিশ্বব্যাপী এই বিশাল রামকৃষ্ণ সংঘের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার দক্ষতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করতেন। এই সময় পাড়ার মস্তান ছেলেরা তার নামে নানা রকম দেওয়াল লিখলেও তিনি সন্ধ্যায় বেলুড় মঠের আরতিতে স্থির হয়ে অবিচলিতভাবে বসতে পারতেন। ঘরে এসে ধোয়া জামাকাপড় পরে খড়ম পায়ে মন্দিরে মন্দিরে প্রণাম করতে যেতেন—তখন মনে হত সুঠামদেহধারী পট্টবস্ত্র পরিহিত কোন দেবতার আবির্ভাব—যার স্মিতহাসি-প্রশস্ত মুখমণ্ডল, প্রশান্ত প্রাণে শ্রদ্ধার সঞ্চার করছে।

স্বামীজির শয়নকক্ষ থেকে রাজামহারাজের মন্দির পর্যন্ত যে রাস্তা তার মাঝখানে কয়েক জন সন্ধ্যারতির পর কথা বলছিলেন—মহারাজজী তাঁদের সম্মুখে আসতেই তারা সচেতন হয়ে গেলেন। মহারাজ বললেন সবে সন্ধ্যারতি সম্পন্ন করে ঠাকুর প্রসন্ন মনে বসে রয়েছেন। এখন এইভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা শোভা পায় না। ঠাকুরের উপস্থিতি ও সান্নিধ্য মহারাজ এইভাবে অনুভব করতেন।

পূজনীয় মহারাজ সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও মার্জিতভাবে থাকতে ভালোবাসতেন। এলোমেলো অগোছালো ভাব সহ্য করতে পারতেন না। নিজের জামার সবগুলি বোতাম লাগাতেন ও অন্যান্য সাধু ব্রহ্মচারীবৃন্দও ভক্তেরাও তাই করুক এই ছিল তাঁর অভিপ্রেত।

যেদিন বাইরে যেতে হতো সেদিন মঠে ফিরেই মায়ের মন্দিরে যেতেন—মায়ে পোয়ে নানা কথা শেষ হলে পর, তবে ঘরে ফিরতেন।

বেলুড়মঠে দুপুরবেলা ভক্তেরা চলে যাবার পর—তিনি গটগট করে মায়ের ঘাটে এসে দাঁড়াতেন—এক তরুণ সন্ন্যাসী মহারাজজীর কাপড়গুলো সুন্দরভাবে হাতের বাহুতে ধরতেন—মহারাজজীও নিশ্চিন্তে গঙ্গায় ঝাঁপ মেরে—পূর্বে পশ্চিম উত্তরে দক্ষিণে—জলের তলার দিকে, জলতলের উপরের দিকে, কখনো সাধারণভাবে, কখনো বিশেষভাবে, কখনো প্রজাপতি ভঙ্গিমায়—কখনো সাধারণ সাঁতার কাটতে লাগলেন, কখনো এমনি চিৎ হয়ে জলে শুয়ে থাকতেন—এই ভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে গঙ্গাস্নান—গঙ্গাসন্তরণ—হলে পরে তবে তৃপ্ত হয়ে জল ছেড়ে উপরে উঠে আসতেন।

সত্যস্বরূপ ভগবানকে জেনেছি :

১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস, পূজনীয় মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠে অবস্থান করছেন। জনৈক যুবক ভক্ত (শ্রীকুমার) জিজ্ঞাসু হয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই মঠে যাতায়াত করছে। শেষ পর্যন্ত পূজনীয় মহারাজজীর সঙ্গে একদিন সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করে। নানা কথাবার্তার পর মহারাজজী তার সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ শুরু করলে পর ঐ যুবক জিজ্ঞাসা করে—আপনি যে ভগবানের বিষয়ে বলছেন—তা আপনি কি ভগবানকে দর্শন করেছেন? পূজনীয় মহারাজ দৃঢ় ও গম্ভীরভাবে জোর দিয়ে বললেন—“দেখো, আমি সত্যস্বরূপ ভগবানকে জেনেছি—আমি না জেনে তোমায় কিছু বলছি না।”

নিত্য উপাসনা :

সান্ধ্যকালীন উপাসনা ও জপধ্যান নিত্য কমপক্ষে দুবেলা বসা চাইই। বলতেন স্নান, আহার, বিহার, ঘুম, বিশ্রাম এগুলো ঠিক থাকবে—আর ওটির বেলা অর্থাৎ মন-শুদ্ধি-জপ-ধ্যানটি হবে না? ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়তে হবে। এমনও দেখা গেছে কোনদিন ট্রেন ধরবার জন্য, প্লেন ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে—সেদিনও তিনি জপে বসে মালাটি কয়েকবার ঘুরিয়ে নেবেনই নেবেন। আমাদের খাবার নিয়ে আসতে বলে উনি জপে বসে পড়তেন। অবশ্য ওই সময় স্বল্পই করে উঠে পড়তেন। কিন্তু নিয়মিত বসার অভ্যাসটি কিছুতেই ছাড়তেন না।

সব শব্দই ঈশ্বরের শ্রীমুখ থেকে আসে :

মহারাজজীর বৈরাগ্য এতই নিশ্ছিদ্র ছিল যে তার ফলে তিনি অন্তর্জীবনে প্রভূত মুক্তির স্বাদলাভ করেন ও সর্বদা মহানন্দে ভরপুর থাকতেন। অধ্যাত্ম দৃষ্টির ফলে তিনি পাখি জীবজন্তু, গাছপালা, এমনকি নিষ্প্রাণ বস্তুর সঙ্গে ও আত্মীয়তা গড়ে তুলতে পারতেন—লিখিত শব্দের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা-তিনি যদি পথে কোন কিছু লেখা কাগজ পড়ে থাকতে দেখতেন তবে তিনি সেটিকে সযত্নে পাশে সরিয়ে দিতেন পাছে

অন্যে সেটিকে পা দিয়ে মাড়িয়ে না ফেলে, বলতেন'—"সব শব্দই ঈশ্বরের শ্রীমুখ থেকে আসে।"

অধ্যাত্মজীবন হলো যেন একটা স্রোতপ্রবাহ—অধ্যাত্ম সাধকের পক্ষে দৈহিক-বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক স্রোত প্রবাহের গতিরুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। মহারাজ বলতেন— "Expantion is life, Contraction is death." প্রকৃত আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভঙ্গি হলো, আমাদের নিজেকে, আমাদের অন্তরের ঈশ্বরকে, সকলের অন্তরের ঈশ্বরকে জানা—আধ্যাত্মিক শক্তি (সিদ্ধাই) লাভ করা নয়। অধ্যাত্ম মনস্ক যারা তাদের হারাবার কিছু নেই। বিষয় বাসনায় আসক্ত লোকেরা মৃত্যুভয়ে ভীত হয়।

সীমাহীন সহানুভূতি :

দেশভাগের পর যখন কলকাতায় সাম্প্রদায়িক হিংসা চলছে ঐ সময় একদিন অদ্বৈত আশ্রমের ছাদ থেকে দেখলেন নিকটবর্তী একটি বাড়িতে উপরতলায় কয়েকজন মুসলমান বিপন্ন হয়ে রয়েছেন। তাঁরা দূর থেকে আকারে ইঙ্গিতে পূজনীয় মহারাজকে জানালেন—তাঁদের ভাঁড়ার শূন্য। পূজনীয় মহারাজ তৎক্ষণাৎ অদ্বৈত আশ্রম থেকে টিফিন ক্যারিয়ারে নিয়মিত কয়েকদিন তাদের খাদ্য সরবরাহ করেছিলেন। পরে তাদের পুলিশ উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যায়।

দরিদ্র অবহেলিত মানুষের প্রতি পূজনীয় মহারাজের টান ছিল অপরিসীম। কোথাও 'ট্রাইবাল' বা দরিদ্র পিছিয়ে পড়া মানুষ দীক্ষা নিতে আগ্রহী জানলে তিনি শত অসুবিধা সহ্য করেও তাদের নিকট পৌঁছবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এইভাবে তিনি বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেমন খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, পার্বত্য প্রদেশে ছোট ছোট জনপদ শেলা, কুড়োলভাঙা, ডালু ইত্যাদি মেঘালয়ের প্রভৃতি অঞ্চলে গেছেন তেমনি আবার সুন্দরবনের সেন্ডেলের বিল, হিমাচল প্রদেশের বাপ্পা, ছত্তিশগড়ের পাখানঝোর, নবরংপুর বা অন্ধ্রপ্রদেশের প্রতিপাদু ইত্যাদি প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে গিয়ে দীক্ষা দিয়েছেন, আবার কোথাও কোথাও রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদিত কেন্দ্রগুলিতে-যেমন শিলচর প্রভৃতি। এইকাজে শাখাকেন্দ্রের অধ্যক্ষদের উৎসাহিত করতেন।

কোলাহলোপূর্ণ শহরে বস্তিবাসীর প্রতি :

পূজনীয় মহারাজ যোগোদ্যানে যাবার পর দেখলেন সেখানে বড় বড় খাবার ঘরগুলি অধিকাংশ শুধু উৎসবের দিন ব্যবহার হয়। উনি তখন আশেপাশের দরিদ্র বস্তির ছেলেদের যারা পড়াশোনার জন্য শান্তিপূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশ পায় না, তাদের সকাল বিকেল ঐ ঘরগুলোতে বসে পড়াশুনা করার সুযোগ করে দিলেন। পরে ধীরে ধীরে

তাদের ফ্রী কোচিং এর জন্য আলাদা ভবনের ও সকাল বিকাল জলযোগের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন।—এইভাবে কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে যোগোদ্যানে যেমন বালক সংঘের সূচনা হয়েছিল তেমনি ভারত ভূখন্ডের অপরভাগে মহারাষ্ট্রের পুণাতেও পার্বতীহিলের বস্তির ছেলেদের উন্নয়নের সুব্যবস্থা হয়েছিল পূজনীয় মহারাজের অনুপ্রেরণায়।

স্বামীজির বাড়ির প্রতি মহারাজজীর দৃষ্টিভঙ্গি :

মহারাজজী বাইরের 'ট্যুর' সেরে সবে কাঁকুড়গাছিতে ফিরেছেন—বিকেলবেলা ইচ্ছা হয়েছে শিমলাতে স্বামীজির বাড়ির কাজকর্ম কীভাবে এগোচ্ছে দেখতে যাবেন। একজন মহারাজ পূজনীয় মহারাজের বিশ্রামের কথা ভেবে সেইদিনই না যাওয়ার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু পূজনীয় মহারাজ ড্রাইভার ডাকিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, সাথে অপর সেবকবৃন্দ গেলেন। ফিরে এসে দেখি ওই মহারাজ উৎকণ্ঠা নিয়ে পূজনীয় মহারাজজীর জন্য অপেক্ষা করছেন। অনুযোগের সুরে তিনি কিছু বলবার আগেই মহারাজজীর উত্তর : "কালে মহাতীর্থস্থান হবে কিনা তাই দর্শন করে এলাম। ওটা কি কেবল বাড়ি? ওটি তীর্থস্থান।"

দৈনন্দিন কাজকর্ম :

পূজনীয় মহারাজকে সহ-সংঘাধ্যক্ষ হবার পরেই দীক্ষা দেবার জন্য বহু জায়গায় যেতে হতো। যাত্রার ক্লান্তি এবং স্থানীয় ভক্তদের দর্শন প্রণাম দীক্ষা ইত্যাদির অনুষ্ঠানে সেবকরা যেখানে বয়স অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তেন, সেখানে পূজনীয় মহারাজকে কখনো ক্লান্ত হতে দেখা যেতো না। শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিদিন ভোরে নিজের উপাসনা ঘরে কিছুক্ষণ ব্যয়াম করতেন—তারপর স্নানাদি সম্পূর্ণ করে ঘর খুলতেন। রাত্রেও সমস্ত অনুষ্ঠানের শেষে মহারাজ স্নান করে জপে বসতেন। তারপর খাওয়া দাওয়া এই সবের জন্য তাঁর বেশিরভাগ সময় রাত্রি ১০টা - ১০-৩০টা বেজে যেত। অনেক সময় এই নিয়ম রাখতে গিয়ে পূজনীয় মহারাজের রাত্রের আহার ১২টা বা তার পরেও করতে হয়েছে। আবার রাত্রে আহারের পরে নিয়মিত হাঁটতে বেরোতেন। অনুযোগ করলে বলতেন, "সহ-সংঘাধ্যক্ষ করেছ কেন?...ঠাকুরের কাজ।"

সূক্ষ্ম শরীর :

ব্রহ্মচারী সুশান্ত জানান মাত্র কয়েকদিন হলো, বেলুড় মঠ থেকে পূজনীয় মহারাজজীর নিকট তাঁর (ব্রঃ সুশান্ত) মন্ত্রদীক্ষা হয়েছে। বেশ কয়েক জায়গা ঘুরে ঘুরে বিধাতা নির্দিষ্ট কেন্দ্র ভুবনেশ্বরেই সংঘে যোগদান করেছি। সংঘে এসে জানতে পারলাম

যে-এই ভুবনেশ্বর কেন্দ্রেই পূজনীয় গুরুদেবের সাধুজীবনের সূচনা হয়। এতে আমার আনন্দের সীমা রইল না। কিন্তু কয়েকদিন পরেই খবর এল গুরুদেব স্থূল শরীর ত্যাগ করেছেন। তাতে আমার মন ভীষণ ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। কেননা কয়েকদিন মাত্র হলো আমার দীক্ষা হয়েছে এর মধ্যে সাধনজীবনের কিছুই গুরুদেবের নিকট হতে জেনে নেওয়া হলো না। সাধুদের প্রতি গুরুদেবের আদেশ উপদেশ কী ছিল, তার কিছুই জানা হলো না। আবার মন্ত্রটি এরকম না ওরকম এ বিষয়েও সংশয় শুরু হয়েছে। তাহলে আমার কী হবে? আমার জীবনটি কি বৃথায় গেল? আমি কি কারও কাছে আবার দীক্ষা নেব? মহা অশান্তি মনে। এইভাবে বেশ কয়েকদিন কাটবার পর দেখি কি গুরুদেব মন্ত্রটি আমায় পুনরায় জানিয়ে দিলেন। মনে আশার সঞ্চার হলো— আরও কয়েকদিন পরে শুনলাম যে গুরুদেবের একজন সেবক ভুবনেশ্বরেই তপস্যা করবার জন্য আসছেন। তখন নিশ্চিত হলোাম—গুরুদেব আমার তীব্র ব্যাকুলতায় সাড়া দিয়েছেন। সেবকের নিকট হতেই জেনে নেব সাধনজীবনে মহারাজের নির্দেশ উপদেশ কি কি ছিল। তিনি কি কি পছন্দ করতেন কী কী করতেন না। আধ্যাত্মিক জীবনের টুকিটাকি জেনে নেওয়ার ব্যবস্থা দান করে গুরুদেব নিজেই সূক্ষ্ম শরীরে তাঁর উপস্থিতির বিষয়ে আমায় নিশ্চিতভাবে অবগত করলেন। শিষ্যের আর্তিতে গুরুদেব সর্বদা সর্বক্ষণ সর্বত্র সক্রিয় হন—এটি উপলব্ধি করে আমার মন পুনঃ আনন্দে ভরে উঠল।

After Supper rest a while, After dinner Walk a mile :

রাতে রুটি, ডাল ৫ রকমের সিদ্ধ, স্টু, সব্জি ও সোয়াবিনের তরকারি খেতেন। যখন কাঁকুড়গাছিতে থাকতেন তখন রামকৃষ্ণকুণ্ডের চারপাশে ঐ পুণ্য পুকুর পরিক্রমা করে হাঁটতেন ৭/৮ বার। অন্যান্য সাধুব্রহ্মচারীরাও এই দিব্য সঙ্গলাভে নিজেদের ধন্য মনে করতো। বেলুড় মঠে অবস্থানকালে গিরিশ ভবন থেকে আরম্ভ করে ঠাকুর মন্দিরের সম্মুখ পর্যন্ত কখনো কখনো বা প্রধান ফটক পর্যন্ত হাঁটতেন। তখন সারা পরিবেশে স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব হতো। গঙ্গার জলে উচ্ছ্বলতা নেই—নেই পাখিদের কলরব, বৃক্ষগুলিও যেন ধ্যান মগ্ন। আকাশের নক্ষত্ররাজিও যেন ভগবানের লীলা সন্দর্শনে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

অপূর্ব শয়ন :

শয়ন ছিল অদ্ভুত। ঘুমিয়ে পড়বার আগে তিনি দেখতেন বাইরের দরজাগুলো বন্ধ হয়েছে কিনা। বিছানায় রাখা Bed Switch off-on করে দেখবেন ঠিক আছে কিনা। বালিশের পাশে Emergency light, জপের বাক্স রাখা হয়েছে কিনা। বালিশে মাথা

রেখে ডানদিকে রাখা মায়ের ছবিদর্শন করতে করতে ‘মা’, ‘মা’ বলতে বলতে ছেলে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন।

এটি শুদ্ধ জীবন :

শুচিতা গুণটির তিনি ছিলেন পরকাষ্ঠা। প্রতিদিনই ধোয়াকাপড় পরে তবে মন্দিরে প্রবেশ করতেন। অর্ঘ্য প্রদান করতেন। দোমড়ানো, মোচড়ানো বস্ত্র পরে মন্দিরে যেতে পারতেন না। অপর কেউ ওই রকম কাপড় পরে গেলেও তিনি তা মেনে নিতে পারতেন না। তাঁর বেশ কয়েক জোড়া পাদুকা ছিল, ছিল কয়েক জোড়া খড়মও। তাই দেখে অনেকে তীর্যক মন্তব্য করেছে। কিন্তু নির্বোধ তারা জানে না যে- যে জুতো জোড়াটি পরে মহারাজ ঘরের কাজ করতেন তা পরে মন্দিরে যেতেন না।

ভক্তদের দেওয়া পরিশ্রম করা জিনিসের সদ্ব্যবহার :

এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যাওয়ার সময়, যে ঘর ছেড়ে যাচ্ছেন, সেই ঘরের আলো-পাখার এর স্যুইচ অফ করা হলো কিনা দরজা জানালা বন্ধ হলো কিনা, বসার জায়গায় ভক্তদের দেওয়া কোন জিনিস ছড়িয়ে পড়ে রয়ে গেল কিনা, ভক্তের কোন সামগ্রী নির্দিষ্ট স্থানে গেল কিনা-ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রণামী তুলে রাখল কিনা, গণনা করে হিসেব দিল কিনা, এইরূপ দৈনন্দিন জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যেও মহারাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকতো। ভক্তদের পরিশ্রম করে দেওয়া জিনিসের সদ্ব্যবহার করতেন।

“পৃষ্ঠতো সেবয়েৎ অর্কম্”

শীতকালে সূর্যোদয়ের পর মহারাজজী হাঁটতে বেরোতেন। হাঁটবার সময় পিঠ দিয়ে রোদ পোয়াতেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মৃদু উষ্ণতা বেশ উপভোগ করতেন, বলতেন—

“পৃষ্ঠতো সেবয়েৎ অর্কম্
জঠরেণ হুতাশনম্
স্বামিনং সর্বভাবেন
পরলোকম্ অমায়য়া।”
অর্থাৎ রোদ পোয়ানো পিঠ দিয়ে
আগুন পোয়ানো সামনে দিয়ে।

অন্তরে বাহিরে Perfection (মার্জিত রুচিবোধ) :

একঘর থেকে আর এক ঘরে যাওয়া আসার পথে যদি দেখেন যে পাপোশটি

যথাযথ ভাবে নেই—তো ব্যস্ আগে ওটি পা দিয়ে যথাযথভাবে রাখবেন তারপর অগ্রসর হবেন। এইরূপ ছিল তাঁর পারফেক্‌শন। (অন্তরের পারফেক্‌শানেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল তাঁর এইরকম।)

অতি ছোট ছোট কার্যে ও মনঃসংযোগ :

জুতো খুলে ঠিকভাবে রাখবার জন্য যতটুকু সময় দেওয়া প্রয়োজন তা তিনি দিতেন। নির্দিষ্ট জায়গাতেই জুতো খুলে রাখতেন ফলে জুতো খুঁজে বেড়াতে হতো না। ঘরেও নির্দিষ্ট জিনিস নির্দিষ্ট জায়গাতেই রাখতেন ফলে খুঁজে পেতে হয়রান হতে হতো না। কাপড় বা চাদরের ভাঁজ যথাযথভাবে রাখলে ঘরের সৌন্দর্য পরিপাটি থাকে, রুচিবোধ প্রভৃতি নষ্ট হয় না সেই বোধ তাঁর ছিল। আলনার কাপড় থেকে দেওয়ালের কেলেন্ডার, ঠাকুরের ফটো সব ঠিকঠাক সোজাসুজিভাবে থাকতে হবে। সামান্যতম বেঁকে থাকলে তা মহারাজের কাছে যন্ত্রণাদায়ক হতো। উনি কিছুতেই সামান্যতমও এলোমেলো, এলোপাথাড়ি কাজ সহ্য করতে পারতেন না। দৈনন্দিন জীবন ছিল তাঁর এতো নিখুঁত, এতো সুন্দর। তা না হলে কি সত্যম্ শিবম্ সুন্দরকে পাওয়া যায়। বিছানার চাদর টান টান থাকবে—টেবিলের জিনিস গুছানো থাকবে। ঘড়ি, কলম থেকে আরম্ভ করে টেবিলে জলের গ্লাস, গ্লাসের ঢাকনা, ঢাকনা খুলে টেবিলে রাখবার সময় উপুড় করে রাখা যাতে পুনরায় ঢাকবার সময় নোংরা দিকটি না জলের গ্লাসে থাকে ইত্যাদি সব ঠিকঠাক থাকতে হবে। এর অন্যথা তাঁর নিকট অমার্জনীয় অপরাধ বলে পরিগণিত হতো।

ঘরে খড়ম/চটি, বাইরে গেলে জুতো ব্যবহার করতেন। নির্দিষ্ট বাটি, নির্দিষ্ট চামচ, বাইরে গেলে বিছানার চাদর, বালিশ, মশারি প্রভৃতি নিজের ব্যবহৃত জিনিস ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। মোট কথা মার্জিত রুচিবোধ সম্পন্ন ছিলেন।

ব্রহ্মচারীদের প্রতি :

ব্রহ্মচারীদের মধ্যে কাউকে শিখা/টিকি খোলা অবস্থায় বা টিকি ভালোভাবে বাঁধা না থাকলে তাকে তৎক্ষণাৎ যথাযথভাবে বেঁধে দেখিয়ে যেতে বলতেন, না পারলে প্রথম প্রথম অপরের সাহায্য নিতে বলতেন।

রুটিন তৈরি করে দেখিয়ে যেতে বলতেন। সময়ের অপচয় না করে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন। কোন কোন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের উপর লক্ষ্য রাখতে বলতেন, গাইড করতে বলতেন আর বলতেন 'সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিও না।' ব্রহ্মচর্য মন্ত্র গুলো নিত্য স্মরণ, মনন করতে ও ব্রতগুলো পালনে সদা সজাগ থাকতে বলতেন।

ভালো শ্রোতা :

তিনি ভালো শ্রোতা ছিলেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন বলে শোনা যায় না। অপরের দুঃখ কষ্টের কথা ধৈর্য সহকারে দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনতে পারতেন। দুঃখী তাপিত জনগণের ব্যথা তিনি অনুভব করতে পারতেন। তাই অপরেরা তা বুঝতে পেরে অনেকটা লাঘব হতেন।

প্রস্তুতি ছাড়া বক্তৃতায় বক্তার দৈন্যতাই প্রকাশ পায় :

মহারাজ দীর্ঘ বক্তৃতা করেছেন বলে শুনিনি—ধর্ম মুখে বলে যাননি, করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। বক্তৃতা দিতে যাবার আগে কোন মহারাজ পূজনীয় মহারাজের অনুমতি নিতে গেলে বলতেন পেপার রেডি হয়েছে অর্থাৎ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে? প্রস্তুতি না নিয়ে বাইরে বক্তৃতা দিতে যেতে নিষেধ করতেন, কারণ প্রস্তুতি ছাড়া বক্তৃতা বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই উপকারে আসে না। প্রস্তুতি ছাড়া বক্তৃতা দানে বক্তার দৈন্যতাই প্রকাশ পায়। এতে উভয়েরই সময় নষ্ট, উভয়েরই ক্ষতি, আসলে মহারাজের অভিমত ছিল বক্তৃতা কেবল কথার ফুলঝুরি পরিবেশন নয়, এটা সাধুর সাধনার অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হোক। তিনি অতি অল্প কথা বলতেন—যা বলতেন তা করতেন, অনেক সময় তিনি ভ্রূসংকেতেও কথা বলতেন।

সর্বসমক্ষে কিছু না খাওয়া :

কানপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০০২, একজন মহারাজ জানাচ্ছেন বিঠুর দর্শন করে আশ্রমে ফিরে পরের দিন লক্ষ্মৌ হয়ে রাজকোট যাওয়ার জন্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। তাই বিকেলের কোন টিফিন খাওয়া হলো না। সন্ধ্যারতির পর পূজনীয় মহারাজের প্রণামের সময় তার খুব খিদে পেয়েছিল। তাই দুই-তিনটি সন্দেশ পাশের ঘরে খাচ্ছিলেন। এমন সময় পূজনীয় মহারাজের প্রণামের বারান্দার অপর প্রান্তে টিউব লাইট টি বার্স্ট হয়ে যায়। তাই ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে খাওয়ার থালা হাতেই তিনি ছুটে যান এবং পাশে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার করানোর ব্যবস্থা করতে থাকেন। খুব কম সময়, কিন্তু এরই মধ্যে মহারাজের চক্ষুতে ঐ সময়টুকু ধরা পড়ে। পরে তাঁর কল্যাণের জন্য খুব বকলেন, পরে বললেন, যে রসনাকে জয় করেছে সে সব জয় করে বসে আছে। বয়স তো হচ্ছে, কবে শিখবে! তিনি তার খিদে পাওয়া ও নিরূপায় অবস্থার কথা বললেও পূজনীয় মহারাজ সন্তুষ্ট হননি। কিন্তু একটা বিরাট শিক্ষা পেলেন যে সর্বসমক্ষে কিছু খাওয়া চলবে না। মহারাজ বলতেন যে ব্রত গ্রহণ করেছ তা সংযমের পথ।

সমব্যথী :

পূজনীয় মহারাজ যখন সেবা প্রতিষ্ঠানে ছিলেন তখন কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতেন, "মহারাজ ভালো আছেন?" তখন তিনি বলতেন—"না ভালো নেই"। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন "যেখানে বাড়িতে একজন অসুস্থ থাকলে বাড়ির সকলেই দুঃখিত হন সেখানে এই বাড়িতে (হাসপাতালে যেখানে এতজন অসুস্থ সেখানে আমি কেমন করে ভালো থাকবো?") এই জন্য তিনি হাসপাতাল ছেড়ে প্রয়োজন না থাকলে কোথাও যেতেন না। রোগী নারায়ণদের সাথে এমনি ছিল তাঁর একাত্মতা।

উদারতা :

বোরোলিন ক্রিমটি ছিল তাঁর অতি প্রিয় ক্রিম। যদিও একটি অনিবার্য কারণে ঐ কোম্পানির সম্পর্কে কোর্টে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাহলেও তাদের Product তিনি ব্যবহার করতেন একেবারে শেষ সময় পর্যন্ত। এইরূপ ছিল মহারাজের উদারতা।

দক্ষ প্রশাসক :

পূজনীয় মহারাজ সমস্যা সমাধানে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন—হাসপাতাল চালানো কত হাজারো সমস্যা, সে সকল সমাধান করতে করতে একসময় এমন অবস্থা এসেছিল যে নিত্য নতুন সমস্যা তাঁর কাছে কিছুই নয়। শুধু হাসপাতাল নয় অরুণাচল প্রদেশ, পুরুলিয়া সহ, সমগ্র সংঘের নানা সমস্যা সমাধানে তিনি সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। হয়েছিলেন সঙ্ঘের "Trouble Shooter"।

আমরা বেশ অবগত আছি মহারাজ একটি শিশু মঙ্গল কেন্দ্র নামে সেবা কেন্দ্রকে জেনারেল হসপিটাল-এ পরিণত করেছিলেন। শুধু তাই নয় নার্সিং স্কুল, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স অফ মেডিকেল সায়েন্স-এর ব্যবস্থাও করেছেন। চিকিৎসা জগতে এতখানি সেবা ব্যবস্থা কোন Non-Govt Organisation এর আগে ছিল না।

পূজনীয় মহারাজ কেবল সেবা প্রতিষ্ঠানের রূপকার নয়, ভাবপ্রচার পরিষদেরও রূপকার ছিলেন।

মৃদুভাষী দুঃসাহসী :

দয়ার শরীর হলেও ভয়ের কাছে অন্যায়ের কাছে মাথা নত করার মনোবৃত্তি ছিল না পূজনীয় মহারাজের। কিছু কর্মীর দুর্বিনীত আচরণের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেননি। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সাফাই কাজের জন্য তিনি তরুণ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের

নিয়ে এলেন। শোনা যায়, এই সময় এক আঘাতে তিনি সামান্য আহত হয়েছিলেন। রক্ত মুছতে মুছতে সন্ন্যাসীদের বলেছিলেন, ঠাকুরের ইচ্ছে বলেই রক্তপাত হয়েছে। পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ এসেছিল, মহারাজ রাজি হননি। বলেছিলেন, সমস্যা তো মিটে গিয়েছে। যারা হাঙ্গামা করেছিল তারা তো আমার সংসারের ছেলে, আবার শোনা যায়, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একবার রাইটার্সে বলেছিলেন, মহারাজ, যে আটজনকে বিদায় দেওয়া হয়েছে তাদের নিয়ে নিন। পূজনীয় মহারাজ বলেছিলেন, আপনি যেমন ওদের মুখ্যমন্ত্রী তেমন আমাদেরও মুখ্যমন্ত্রী। সারা রাজ্য জুড়ে আপনার তো অনেক জায়গা রয়েছে। আপনিই ওদের কোথাও নিয়ে নিন না, আমাদের রোগীর সেবা করতে দিন।

রসবোধ :

(ক) একবার একজন ব্যক্তি তার মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠানের এক ডাক্তারের সন্ধান পান। ব্যক্তিটি পূজনীয় মহারাজের কাছে সরাসরি বলেন—মহারাজ আমার মেয়েকে ওই ডাক্তারের সঙ্গে সম্বন্ধ করবার মনস্থির করেছি, ছেলেটি কী রকম? মহারাজ সকৌতুকে বললেন, “ছেলেটি তো আমাদের....আপনার মেয়েটি কী রকম বলুন ?” এই ছিল মহারাজের রসবোধ। (খ) জনৈক : মহারাজ ইনি আমাদের আশ্রমের President, আপনাকে প্রণাম করবেন।

মহারাজ: সেকি আমি তো Vice-President. President কি Vice-President কে প্রণাম করে? (হো হো হাসি)

জনৈক : না মহারাজ হলেন বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের Vice-President আর ইনি হলেন আমাদের এই গ্রামের ছোট আশ্রমের President, আপনার সাথে তুলনা হয় ?

(গ) তিনি মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টাও করতেন—একবার এক ভক্ত ফোন করে সেবা-প্রতিষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে দুপুরে দেখা করতে এসেছেন। কাজের ব্যাপারে কথাবার্তার পর তিনি বলে বসলেন—“মহারাজ আজ এখানে প্রসাদ পেতে পারবো?” মহারাজ উত্তর দিলেন— “এখানে বসে প্রসাদ পাওয়া যায় না—শুয়ে পড়তে হয়।” হাসপাতাল তো তাই একথা বললেন।

Consultation Charge for:

সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় ধাপ গুলো Uneven থাকলে তা তিনি ধরে ফেলতেন। steps অনেকগুলো এক সঙ্গে না করে মাঝখানে Landing রাখতে বলতেন। অনেক

জায়গাতে অকারণে অনেক ছোট বড় step থাকতো, সেগুলি সমান করে একটি বা দুইটি step এর মধ্যে রাখতে বলতেন, যাতে স্বচ্ছন্দে হাঁটা যায়। পরিশেষে তাঁর সকৌতুক উক্তি ছিল—"Consultation Charges for'

নিত্য শরীরচর্চা :

পূজনীয় মহারাজ নিত্য শরীরচর্চা করতেন। মহারাজজীর শরীরের কাঠামো খুব সুন্দর ছিল, সুস্থ সবল সক্ষম রাখবার জন্য নিয়মিত শরীরচর্চা বা ব্যায়াম করতেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম :

১) লাঠি হাতে ধরে মাথার উপর তোলা, সামনে clockwise, anti- clockwise ঘোরানো কোণাকুণি।

২) এক পায়ে ভর দিয়ে অপর পা হাঁটুতে ভাজ করে উপরে তোলা, পা পরিবর্তন করে অপর পায়ে অনুরূপ করা।

৩) দেওয়ালের কিছুটা সামনে দাঁড়িয়ে উপর দেওয়ালে ছাতি স্পর্শ করে, পূর্বের অবস্থায় ফিরে এসে পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করা

বসে বসে ব্যায়াম :

৪) বসা অবস্থায় হাঁটুতে দুই হাত রেখে পা দুটো উপরে তোলা, নামানো।

৫) পায়ের পাতা সামনে সোজা করা।

৬) পায়ের পাতার তলায় ফাইবার পাইপ দিয়ে গড়ানো।

৭) পায়ের আঙ্গুলগুলো সামনে পিছনে করা।

৮) হাতে রাবারের বল নিয়ে বারবার চাপ দেওয়ার ফিঙ্গারিং এক্সারসাইজ।

শুয়ে শুয়ে ব্যায়াম :

৯) কতকগুলি শুয়ে, কতকগুলি চিৎ হয়ে, কতকগুলি উপুড় হয়ে।

১০) Eye ball-এর ব্যয়াম, চোখের মণি উপরে নীচে ডাইনে বাঁয়ে ঘোরানো।

১১) মুখে যন্ত্র লাগিয়ে Breathing exercise করা।

১২) জিহ্বার ব্যায়াম।

মহারাজজী বলতেন কেবল যে আলাদা সময় বের করে ব্যায়াম করতে হবে তা নয় বসে আছেন তখন হাতের, পায়ের, ঘাড়ের ব্যায়াম হতে পারে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীজীর Physiotherapist Dr. Belsare

Delhi, 25/8/2002 তারিখে পূজনীয় মহারাজজীকে যে exercise গুলি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তা এইরকম :

Shoulder :

1) Forward & Backward

2) Side ways-up and down

3) Rotation to Left/Right

4) Cyding

5) Breathing

6) Foot movements

7) Hands on neck - In and Out

8) Relaxation

In lying :

1) SLR-up and down alternate

2) Alternate Folding of Legs

Sitting :

1) Foot up and down alternate

2) To Straighten the leg (Alternate)

সংক্ষেপে সকাল বেলার Routine :

ঘুমোতে যখনই যান না কেন

—অতি ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়তেন

—শয্যা ত্যাগ

—ভালো ভাবে হাত মুখ ধোওয়া

—জলপান করা

—ধোয়া কাপড় পরে জপ ধ্যানে বসা

—নাটমন্দির থেকে ঠাকুরকে প্রণাম

—প্রাতঃভ্রমণ

—জগন্নাথের আটকে প্রসাদ গ্রহণ

—স্নান

—ধোয়া কাপড় পরে গর্ভমন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম

—স্বাধ্যায়,কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ, শিকাগো বক্তৃতা, মঠের নিয়মাবলী ইত্যাদি পাঠ।

—প্রাতঃরাশ গ্রহণ।

দিতে এসেছি নিতে নয় :

পূজনীয় মহারাজ মঠ ও মিশনের President। সমস্ত স্থাবর অস্থাবর President এর নামে ক্রয় করা হয় অর্থাৎ তিনিই স্বত্বাধিকারী, অথচ তাঁর যখন কোন বই কেনবার প্রয়োজন হয় তখন তিনি নিজের প্রণামী টাকা দিয়ে মিশনের Book Stall থেকে বই কেনেন—আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব।

পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ হলেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের রূপকার—পূর্ব, উত্তর পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় Non-Govt. Hospital। তিনি যখন Vice President, President হলেন-যতবার ঐ সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছেন ততবারই Treatment-এর খরচ দিয়ে দিয়েছেন-অন্তত যেটুকু জানা যায়।

গুরু শাশ্বত নিত্য বিদ্যমান :

মহারাজজীকে দর্শন মাত্রই তাঁর প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধার ভাব উদয় হতো। তাঁকে দেখলেই বোধ হতো তিনি কোন এক অলৌকিক আনন্দের আস্বাদ পেয়ে তাতে নিমগ্ন রয়েছেন। তাঁর নিকট যাওয়া মাত্রই যেন সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে যেত—যেন মনে আর সংসারের লেশমাত্র থাকতো না। তাঁর পবিত্র স্পর্শে বা অহেতুক কৃপাকটাক্ষে নিদ্রিত ব্রহ্মশক্তি জাগরিত হয়ে উঠলে সাধক/শিষ্য চারিদিকে আনন্দের সাগর দেখতে পান। সৎ-চিৎ আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরই গুরুরূপে আসেন। গুরু শিষ্য নিত্য।

তিনি স্থূলদেহেই আবদ্ধ নন, স্থূল শরীর নষ্ট হলে আমরা 'গুরুহারা' হলোম-একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা; গুরু শাশ্বত নিত্য বিদ্যমান।

ব্রহ্ম লীন :

যে ধরনের অসুখ মহারাজের হয়েছিল তাতে সাধারণত অচেতন অবস্থায়ই মানুষের শরীর ত্যাগ হয়ে থাকে। কিন্তু এই দেব শরীর যার তিনি শান্তিপূর্ণ ও সচেতন ভাবেই মহাসমাধিলীন হলেন। আমরা প্রত্যক্ষদর্শীরা তার সাক্ষী। যে শারীরিক অসুস্থতাজনিত সংকট ঝাঁকুনী, শ্বাসকষ্ট এইগুলো দুই মাস ধরে চলছিল—শরীর ত্যাগ কালে তা ছিল

সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্বাসকষ্ট হলে তবেই Oxygen দেওয়া হত নতুবা মহারাজজী স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসই নিতেন। শরীর ত্যাগের আগের দুই দিন ভালো ছিলেন। ৪.৩০ টার পর ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস প্রশ্বাস নিলেন। মনিটারে স্যাচুরেশন দেখা হয়—তখন ধরা পড়ে রক্তে Oxygen কমে যাচ্ছে, Oxygen দেওয়া শুরু হলে পূজনীয় মহারাজের শরীর নিচ্ছিল না। যে ওষুধগুলো ঐ সময় দিলে 20 Seconds এর মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যায় সেগুলোও কোন কাজ করছে না। এইরকম সময় পূজনীয় মহারাজ বেশ কয়েকবার সুন্দর ভাবে চোখ মেলে তাকালেন। মুখে চরণামৃত দেওয়া হলো। মাথায় ও বুকে নির্মাল্য স্পর্শ করানো হলো। হরি ওঁ ধ্বনি সমবেতভাবে উচ্চারিত হতে লাগলো। চিকিৎসকরা বলেন Hearing (শ্রবণশক্তি) সবশেষে যায়—শেষ পর্যন্ত থাকে, তাই আমাদের মনে পরমশান্তি যে পূজনীয় মহারাজ শেষ সময়ে ঠাকুর, মা, স্বামীজিকে দর্শন, তাঁর পবিত্র নাম শ্রবণ করতে করতে গেলেন। মা বলেছেন—ঠাকুর শেষ সময়ে আসবেন, তাঁর সন্তানদের নিয়ে যাওয়ার জন্য-তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হয়ে রইলাম, কেননা এইরকম অসুখেও যখন শেষ পর্যন্ত ঠাকুর স্মৃতি ফিরিয়ে এনে দেন তখন শরণাগতোহম্,শরণাগতোহম্ শরীর যাওয়ার জন্য কোন না কোন একটি/দুইটি উপলক্ষ চাইই নতুবা শরীর ত্যাগ হবে কী করে ?

স্থূল দেহের অবসান হলেও গুরু সূক্ষ্মদেহে বর্তমান থেকে শিষ্য কল্যাণ জীবোদ্ধাররূপ কর্ম করতে থাকেন, যতদিন না সকল জীবের মুক্তি হয়। ততদিন এই শক্তি অমর অব্যয় অক্ষয়।

১৯৯২ সালের ১৫ জুন স্নানযাত্রার দিন যোগোদ্যানে ২৫ জন ভক্তকে দিয়ে তাঁর যে দীক্ষাদান পর্ব শুরু হয়েছিল তা ১৭ জুলাই ২০০৭ এ ২ জন ভক্তকে দীক্ষা দিয়ে সমাপ্ত হয়। মহারাজের এই শেষ দিন পর্যন্ত দীক্ষিত ভক্তসংখ্যা হয়েছিল ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৫৫ জন। এই পর্যন্ত তিনিই সবচেয়ে বেশি মানুষকে দীক্ষা দিয়ে ঠাকুরের চরণ তলে দিয়ে এসেছিলেন। সাধু, ব্রহ্মচারীবৃন্দ যেমন ছিল তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ তেমনি ভক্তেরাও ছিল তাঁর নিকট আত্মীয়। এছাড়াও রামকৃষ্ণ ভাবানুরাগী ও বহু সাধারণ মানুষও তাঁর অকৃত্রিম প্রেম ভালবাসার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন স্থিতধীজাপক, প্রধানত কর্মযোগী, Spiritual Journey তে আধ্যাত্মিকতার দুঃসাহসিক অভিযানে বিশ্রাম নেওয়ার সময় ও সুযোগ কোনটাই হয়ে ওঠেনি, তাই তো জীবন সায়াহ্নে তিনি টানা দুই মাস বিশ্রাম নিয়ে চলে গেলেন জগজ্জননীর মাতৃক্রোড়ে, আর রেখে গেলেন 'গুরুশক্তি'। এই সঞ্জীবনী গুরুশক্তি আমাদের জীবনে সঞ্চারিত হয়ে জাগ্রত জীবাত্মার অধিকারী হতে সহায় হোক এই প্রার্থনা।

ঠাকুরের কাজ :

রামকৃষ্ণ মিশনের গতবছরের কার্যাবলীর রিপোর্ট এবং সেই সঙ্গে মঠ কেন্দ্রগুলির কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের সামনে পেশ করা হলো। রিপোর্ট থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশের বর্তমান সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতি সত্ত্বেও মিশন কী পরিমাণ কাজ করছে। সঙ্ঘের বর্তমান অবস্থায় এই কাজের বোঝা অত্যন্ত বেশি। কিন্তু আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতার ফলে, সাধু কর্মী ও গৃহী ভক্তদের আত্মযোগের ফলে, কাজ মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে চলছে—যদিও আমরা প্রতিপদেই অনুভব করছি যে অসুবিধা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি সেগুলো বিবেচনা করলে আমাদের কাজ সন্তোষজনক বলতে হবে। এই কাজের পিছনে রয়েছে এক বিরাট শক্তি। সেই শক্তির উৎস হলো ঠাকুর ও স্বামীজির অনুপ্রেরণা।

আমাদের কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যাতে আমাদের কাজের প্রেরণাস্বরূপ যে আদর্শটি আছে সেটিকে ভুলে না যাই। আদর্শটির প্রতি আমাদের বিশ্বস্ত থাকতেই হবে। তাহলেই মাত্র আমাদের কাজের একটা আধ্যাত্মিক মূল্য থাকবে। আমাদের সংঘ আধ্যাত্মিক সংঘ। আমাদের সামাজিক সেবাকার্যগুলি, আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কারণ আমরা মনে করি ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকিউলার বলে কিছু নেই—সবই আধ্যাত্মিক। মিশন যখনই জনসেবামূলক কোন কাজ করে তখনই চেষ্টা করে প্রত্যেক মানুষকে ভগবানেরই এক একটি রূপ হিসাবে দেখতে। এই আদর্শটি আমাদের সামনে স্থাপন করেছেন ঠাকুর-স্বামীজি। আমরা যাতে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে আদর্শটি থেকে এতটুকুও সরে না গিয়ে কাজ করে যাই সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। চিরকাল এই আদর্শটিই আমাদের পথ নির্দেশ করবে।

কি পরিমাণ কাজ করা হলো সেটা তত বড় কথা নয়, কি ভাব নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সেটাই আসল। আমাদের বারংবার নিজেদের মনে বিচার করে দেখতে হবে আমাদের ভাব ঠিক থাকছে কিনা। ভাব ঠিক রেখে নরনারায়ণের সেবা করলে তা-ই ভগবানের পূজা হয়ে দাঁড়ায়। মিশনের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে এই মাপকাঠিতে। আমরা একটা সমাজসেবী সংস্থামাত্র নই। এই সংঘের আদর্শ হলো সেবাকার্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—এই যুগ্ম আদর্শই আমাদের অনুসরণ করতে হবে; অন্যথায় আমাদের কাজের কোন মূল্য থাকবে না। এই নীতি অনুসরণ করলে তবেই আমরা দাবি করতে পারব যে আমরা মিশনের কর্মী এবং স্বামীজির অনুগামী। অন্যেরা হয়ত আমাদের কাজের পরিমাণ দেখে বিচার

করবে; কিন্তু আমরা নিজেদের বিচার করব আমাদের আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে—আমরা আদর্শের প্রতি কতটা বিশ্বস্ত থাকছি, আধ্যাত্মিক সাধনা হিসাবে সেবাকার্য করছি কিনা, আমাদের কাজ নিছক সমাজসেবা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিনা। আমাদের ক্ষেত্রে সমাজসেবা হচ্ছে বাই-প্রোডাক্ট, আসল লক্ষ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক সাধনা। এই সব সেবাকার্যের মাধ্যমে আমরা মুক্তির চেষ্টা করছি।

ঠাকুর-স্বামীজির আদর্শ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমি করব না। প্রতিবছর আমরা সে আলোচনা করে থাকি। আমরা এখানে প্রধানত গতবছরের কাজের রিপোর্ট আপনাদের সামনে পেশ করছি। কিন্তু পিছনের আদর্শটিও স্মরণ রাখতে হবে। আমাদের কাজের দাম যাচাই করতে হবে কাজের মধ্যে কতটুকু আধ্যাত্মিক ভাব আছে তা দিয়ে। এই ভাবটুকু না থাকলে কাজকর্ম অর্থহীন হয়ে যাবে যেহেতু আমাদের সংঘ হলো আগাগোড়া আধ্যাত্মিক। আমি আশা করি আদর্শটিকে সামনে রেখে আমরা কাজ চালিয়ে যেতে পারব কেবলমাত্র সেক্ষেত্রেই আমরা ঠাকুর, মা, স্বামীজির আশীর্বাদ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছি ভেবে তৃপ্তি লাভ করব।

সবশেষে আমি ঠাকুর, মা, স্বামীজির চরণে প্রার্থনা জানাই যেন তাঁদের আশীর্বাদ সর্বদা আমাদের উপর বর্ষিত হয়। আমরা যেন স্মরণ রাখতে পারি যে তাঁদের শিক্ষা সর্বদা আমাদের সামনে রাখতে হবে। তাঁদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে তবেই আমরা আমাদের সংঘের কাছে জনসাধারণের এবং দুঃস্থ মানুষের যে দাবি তা পূরণ করতে পারব। আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়ে আমরা যেন এগিয়ে যেতে পারি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

শ্রীরামকৃষ্ণার্পনমস্তু।।

- খণ্ডন ভববন্ধন.... শুরু হয়েছে। সময়ের অভাবে সবে প্রণাম গ্রহণ শেষ করে মহারাজ হাঁটছেন (নিত্য হাঁটা), পাশে জনৈক সঙ্গ করছেন। মনে তার খণ্ডন ভব ছাড়াও নানা চিন্তা তরঙ্গ উঠছে ডুবছে। মহারাজ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন "এখন কি ভাবছো? নাম চলছে তো?"

  একজন উত্তরে বললেন—অনেক কিছু...প্রথমে খণ্ডন ভব...পরে...বলা শেষ হতে না হতেই বললেন..."মন্ত্রটি চিন্তা কর, আর সব সময়ই এটি অভ্যাস করবে।" তিনি বললেন—হ্যাঁ মহারাজ (যথেষ্ট জোরের সাথে অঙ্গীকার বদ্ধ হলেন)। [Gauhati, 6. 15 PM 11.05.2002]
- "মনকে সর্বদা "ওয়াচে" রাখবে। সর্বদা লক্ষ্য রাখবে মন কোথায় কোথায় যায়

প্রতিনিয়ত তাকে ঠাকুরের পাদপদ্মে নিয়ে আসার অভ্যাস করবে।" (কাঁকুড়গাছি)

- "প্রতিদিনই কিছু না কিছু ব্যায়াম করা দরকার।" (07-12-2002 কাঁকুড়গাছি)
- যারা শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের আদর্শে বিশ্বাসী তারা সকলেই রামকৃষ্ণ সংঘের অন্তর্ভুক্ত কেবল সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দই নয়।
- ২৬ শে জানুয়ারী ২০০৩, ৫৪তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সকালবেলা দীর্ঘক্ষণ TV তে নানা প্রোগ্রাম, বিশেষ করে কুচকাওয়াজ প্রভৃতি সাধুব্রহ্মচারীবৃন্দ মহারাজজীকে সঙ্গে নিয়ে দেখছেন। রাত্রিতেও নানা খবর, নানা প্রোগ্রাম দর্শন চলছে। মহারাজ এক মহারাজকে TV বন্ধ করে দিতে বললেন—

  বললেন—"খবরের কি আর শেষ আছে? এত TV দেখলে মন বহিঃমুখ হয়ে যায়। আমাদের ব্রত বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে।"

  [চ্যানেলের নাম 24 ঘন্টা চ্যানেল-কাঁকুড়গাছি]
- "মাছি যত্রতত্র বসে, পচা ঘায়েতেও। কিন্তু মৌমাছি ফুলে বসে মধু আহরণ করে—আমাদের মনটিকে মৌমাছির মতো হতে হবে।

  নিত্য নিয়ম করে "ডাইরি" লেখার অভ্যাস করবে। নিয়ত চিন্তন রাখবে আমি কেন এখানে এসেছি।" (09-01-05)

  "Forgatefulness বলে একটি কথা আছে। ভুলে গেছি....। ব্যাস্ যা হবার তো হলো। 'বোধহয়' আবার কি? (বোধহয়, জানি না, ভুলে গেছি কথাগুলো মহারাজজী পছন্দ করতেন না।) Alertness বাড়াও।"
- "কাজ তো করতেই হবে, গৃহস্থ কর্তাদের নিয়ে করতে হয়। গিন্নিদের সাথে পরিচয় করতে যেও না ওদের খোঁজখবর নিও না।"

  কর্মে ঠাকুরের মহিমার প্রকাশ। কর্মকে ঠাকুরের আশীর্বাদ স্বরূপ জানবে। বেলুড় মঠের নিয়মাবলী-বইটি ভালো করে পড়বে। Chicago Address-বইটিও ভালো করে পড়বে।
- একজন-মহারাজ ঠাকুরের প্রতি আমার ভক্তিভালোবাসা আসছে না। মহারাজ- "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ," বইটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে। যাকে ভালোবাসতে চাও, তার সম্পর্কে তো জানতে হবে—তাঁর সম্পর্কে জানতে পারলেই, তাঁর প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে, কেমন।" সঙ্গে মায়ের জীবনী, স্বামীজির জীবনী ও অতীতের স্মৃতি প্রভৃতি বইগুলিও পড়বে।"

- একজন মহারাজ—সাধুজীবনে অবশ্য পালনীয় আপনার পরামর্শ প্রার্থনা করছি। মহারাজ— "Purity and poverty"।
- ভাবপ্রচার পরিষদের একটি কেন্দ্রের উন্নতির জন্য মহারাজজীর পরামর্শ—"সাধুদের জন্য সাধুনিবাস, দিশাজঙ্গলের ব্যবস্থা আগে রাখতে হবে। তাহলেই আশ্রমে সাধুদের যাতায়াত বেড়ে যাবে। যেমন দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির ব্যবস্থা। সাধুদের আনাগোনাতে আশ্রমে ভক্ত, ভাবানুরাগীদের সমাগম বেড়ে যাবে—উন্নয়ন স্বাভাবিকভাবেই আসবে।"—(শিলিগুড়ি)

  দশদফা কর্মসূচী মেনে চললেই আশ্রম প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।
- একজন : মহারাজজী, ঠাকুরের কৃপা পেতে চাই।

  মহারাজ..."কৃ...পা...। কর কিছু, তবে তো পাবে।"
- হাত পা নেড়ে নেড়ে কথা বলার অভ্যাস কারও থাকলে, তাকে আগে 'সাবধান পজিশনে' দাঁড় করিয়ে কথা বলা, সৌজন্যবোধ প্রভৃতি শেখাতেন, বলতেন "School College-এ N.C.C. তে কি যোগ দাও নি?"
- শেষের দিকে বহু জায়গায় বহুবার মহারাজজীকে বলতে শোনা গেছে—যে "চিনলে না হে, চিনলে না"—আমরা বলতাম আপনি কৃপা করে আমাদের না চিনিয়ে দিলে, চিনব কি করে।
- একজন : মহারাজ তখন G.S.। একজন ভক্ত বললেন দিল্লীতে আমাদের বড় মেয়ে থাকে। আমরা বার বার দিল্লী যাতায়াত করছি। বেলুড়ে নিয়ম করে যাওয়া আসাও আছে। তাঁকে একদিন দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার পর মহারাজ বললেন—"দেখুন সামনে ঐ যে আমগাছটি দেখা যাচ্ছে—দেখি কি, একদিন এক কাক বাসা বাঁধছে। কয়েকদিন পর তাতে ডিমও পাড়ল, বাচ্চাও হলো, খাবার এনে তাদের খাওয়াতে লাগল—বাচ্চা বড় হলো। আশ্চর্য একদিন দেখি কি বাচ্চাদের তাড়িয়েও দিতে লাগল। কয়েকদিন পর কাকের পরিবারটি আর দেখা গেল না। আসলে মহারাজ আমাদের ঘন ঘন দিল্লী না যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন। কারণ মেয়ে বড় হয়েছে, দিল্লীতে মেয়ে জামাই সংসার পেতেছে এখন তারা স্বাধীন।"
- পূজনীয় মহারাজ তখন সঙ্ঘাধ্যক্ষ। প্রেসিডেন্ট মহারাজ কোয়ার্টার থেকে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছেন। স্বামীজির মন্দির ও মায়ের মন্দিরের মাঝখানে কয়েকটি প্রাচীন দেবদারু গাছ রয়েছে। পাখিরা ডালে বসে কিচির মিচির করছে। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—"বলতো ওরা কি বলছে?"

একজন বলল- কি আর বলবে—এই, কে কোন্ ডালে বসবে, "কে উপর ডালে কে নিচ্ ডালে, কে মগডালে-তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করছে।

মহারাজ-"আরে না না, সকাল হলেই-অফিস বাবুদের মতো গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতায় চলে যায়—এই সবে ফিরেছে। ফিরে নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে—কে এলো, কে এলো না, কে এলো, কে এলো না প্রভৃতি।"

- পূজনীয় মহারাজজী একসময় মায়াবতীতে ছিলেন। বলতেন—"রাত্রি হলেই মায়াবতী আশ্রমের দুই প্রান্তে দুই টি পাখি পরপর সারারাত্রি এমনভাবে ডাকতো যেন একটি পাখি প্রশ্ন করছে, অপর পাখি তার উত্তর দিচ্ছে। শাস্ত্রে যেমন শুক ও সারি দুটি পাখির নাম শোনা যায় সেরূপ।"

- পূজনীয় মহারাজজী শিলচরে অবস্থান করছেন। সেখানকার অতি প্রিয় একটি পাখি প্রতিদিন সকালবেলা ডাকতে থাকে। মহারাজজী বললেন—পাখি টি কি বলছে জানো—"যোগী জাগো, যোগী জাগো"।

- মহারাজ সাধু ব্রহ্মচারীবৃন্দসহ সৎপ্রসঙ্গ করছেন।

  একজন বললেন : মহারাজজী, কারও তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হলে সে সংঘ ছেড়ে তপস্যা করতে যাবে কিনা ?

  মহারাজ—"সংঘ ছেড়ে যেতে হবে কেন? সংঘে থেকে কি তপস্যা হয় না? তপস্যার জন্য কাউকে কাউকে যে ছুটি দেওয়া যে হয় না এমন নয়, তা খোঁজ করলেই জানতে পারবে।....পরের আলোচনার সারকথা, কেবল জপধ্যান নিয়ে পড়ে থাকা যায় কি?....আবার যতই কাজকর্ম কর না কেন দু-বেলা জপধ্যান নিয়মিত করবে।"
  (গৌহাটী-10-05-2002, 10:30PM)

- পিঁপড়ের লম্বা লাইন

  একজন বললেন-কত পিঁপড়ে মহারাজ !

  পূজনীয় মহারাজ – ওখান থেকে শেখার কি তা দেখো—এক সাথে কি করে আছে। তা ভাবো। ওদের কাছেও শেখার এই যে, কি করে একসাথে বসবাস করা যায়।

[যোগোদ্যান-মহাষ্টমী-03-10-2003 রাত্রি - 10.00]

জয়রামবাটীতে

- রাত্রে হাঁটবার সময়

  একজন মহারাজ বললেন কত ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে!

পূজনীয় মহারাজ-ডাকছে নয়-(বিভিন্ন রাগে ভজন) গান করছে। ভগবানের নাম করছে, ভগবানকে ডাকছে-নিয়ত ডাকছে। মা-কে ডাকছে।

- উনি, কেউ বসে আছেন নাকি? দেখা গেল একটি বড় সোনাব্যাঙ।
- প্রাতরাশ গ্রহণ করা হয়ে গেলে পর, স্নান সেরে মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর, মা, স্বামীজিকে প্রণাম নিবেদন করে, ঘরে ফিরে কিছু ফল ও ফলের রস গ্রহণ করতেন-সকাল ৯টা নাগাদ। ফল খেতে খেতে বলতেন—"ওই যে উনি এসে গেছেন।

একজন সেবক : কে মহারাজ?

মহারাজ : "মন্দিরের চুড়োয়।"

সেবক : মহারাজ আপনি তো নিজের ঘরের মধ্যে রয়েছেন তাহলে আবার মন্দিরে যিনি এলেন তাকে আপনি জানলেন কি করে ?

মহারাজ : উনি প্রতিদিন এই সময় আসেন-দীর্ঘক্ষণ ডাকতে থাকেন।

সেবক : কে মহারাজ ?

সেবক : "বাইরে গিয়ে দেখে এসো।"

সেবক : "একটি অতি সুন্দর পাখি।"

ঠাকুর, মা, স্বামীজি সহ অন্যান্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দান ছিল দেখবার মতো। অর্ঘ্য নেওয়ার গঙ্গাজল হাতে নেওয়া চাই-ই-চাই। অর্ঘ্য হাতে তা সঠিকভাবে ধরতেন-প্রয়োজনে সাজিয়ে নিতেন। অতি সন্তর্পনে বিগ্রহের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতেন। শরণাগত হয়ে সমর্পণের ভাবে কিছুকাল ঐ অবস্থায় থেকে যখন রীতি অনুযায়ী বিগ্রহের মস্তক সহ অন্যান্য অঙ্গে অর্ঘ্যস্পর্শ করিয়ে চরণযুগলে নিবেদন করতেন তখন পুরো পর্ব জীবন্ত জাগ্রত হয়ে উঠতো। ঠাকুরের কাপড় বা বেদীতে সাজানো ফুল নড়ে গেলে তা পুনঃ সাজিয়ে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হতেন।

- মহারাজজী কৃপা করে ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে বলতেন—সর্বদা ইষ্টমন্ত্র জপ করবে। মনকে Engaged রাখিবে। 'যতিস্বে' 'যতিস্বে' করে ব্রত নিয়েছ। সে গুলো তো দেখা যাচ্ছে না। তা না হলে এ পরীক্ষায় পাশের মতো হয়ে গেল—কেবল পোষাক পাল্টানো হলো—জীবনে তো তা প্রতিফলিত হলো না। ট্রেনিং তো হলো, তাহলে কি হলো দেখো।
- আজ ১১-০৭-০৬ গুরুপূর্ণিমা। মহারাজ আশীর্বাদ করুন যেন-এই জীবনেই তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি।

মহারাজ—“আশীর্বাদ তো আছেই, যার জন্য step by step, ধাপে ধাপে এতদূর এসেছ।”

একজন—না মহারাজ তাঁকে দর্শন, তাঁকে অনুভব করতে মাঝে মাঝে মন বড় ব্যাকুল হয়।

মহারাজ—“ভালোকথা-প্রার্থনা, প্রার্থনা, প্রার্থনা, প্রার্থনা করে যেতে হবে। ব্যাকুলতার ভাব জাগিয়ে রাখতে হবে।”

স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠে প্রায়ই অবস্থান করতেন। তাঁকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে, উত্তরে বলতেন—‘সব নিজের উপর।’

- সেবা প্রতিষ্ঠানের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে যে CD প্রকাশিত হয়েছে ও যা www.rkmhq.com-এ Launched হয়েছে তাতে পূজনীয় মহারাজ বলছেন— Both will be elevated, the server and the served, the doctor and the patient.
- দীক্ষাদানের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি মহারাজজীর উপদেশ ছিল—“দু ধরনের পথের কথা বলা হয়—এক ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে সরাসরি সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ। দুই—ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বাণপ্রস্থ-সন্ন্যাস। ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অর্থাৎ ছাত্র বা ছাত্রী থাকাকালীন জ্ঞান অর্জন করে ভগবান বিষয়ে ধারণা নিয়ে সংসারে গার্হস্থ্য ধর্মে প্রবেশ অথবা ওখান থেকেই সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ।”
- মহারাজজী, রামকৃষ্ণ মঠ, যোগোদ্যানের বিবেকানন্দ সভাঙ্গন এর ভিতর সকাল সাড়ে ন-টায় হাঁটতেন। সভাঙ্গনের পশ্চিমদিকের একটি আধমরা নারকেল গাছ ত্রিভঙ্গ হয়ে এখনো বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। কয়েকবারই বজ্রপাতের আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে ঘুরে ফিরে মহারাজজী তার কাছাকাছি এলেই দাঁড়িয়ে পড়তেন। টানা হাঁটায় ছেদ পড়ত। মহারাজজীকে বারবার অনুরোধ করলে আবার হাঁটা শুরু করলেন দীর্ঘক্ষণ গাছটির প্রতি মহারাজজীর সকরুণ দৃষ্টিপাত, ব্যথিত প্রাণের ব্যথা অনুভব, কিভাবে গাছটি একাধিকবার বজ্রাঘাতে একাধিক জায়গায় বেঁকে গিয়ে জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে আছে তার বর্ণনা শুনে আমরা সমব্যথী তথা সমব্যথী ধারণা করতে পারতাম।
- প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় ভুবনেশ্বরে “সুনামি” বিধ্বস্ত একটি গাছ, ছাত্রাবাস যাবার পথে বাম পার্শ্বে পড়ে থাকতে দেখা যেত। গাছটি তখনো বেঁচে থাকবার জন্য কয়েকটি নতুন কচি ডালপালা মেলে ধরে আছে। মহারাজজী হাঁটবার সময় মঠের

মোহন্তকে ডেকে পাঠিয়ে, গাছটির গোড়ায় মাটি দিয়ে প্রয়োজনমতো জলের ব্যবস্থা করে তবে শান্ত হন।

- যোগোদ্যানের বিবেকানন্দ সভাঙ্গন থেকে নিজ ঘরের দিকে যাবার পথে প্রায়ই নাগলিঙ্গম গাছটির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়তেন। ফুলের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলতেন— "দেখছো—প্রকৃতিও কিরূপে তাঁরই আরাধনা করছে।" এ দৃশ্য সাধকের সাধনপথের সহায়ক, জীব-বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আলাদা—ওতে সাধকের সাধনার কোন অন্তরায় হয় না। কখনো কখনো ফুল হাতে নিয়ে শিবলিঙ্গ, সাপ, সাপের ফণা সব চিনিয়ে দিতেন।

- একদিন বেলুড়মঠে, সন্ধ্যা সমাগমে, স্বামীজির Bedroom-এর পাশে উত্তরদিকের প্রশস্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গঙ্গাদর্শন করছেন। দক্ষিনেশ্বরের মা ভবতারিনীর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করবার পর কাশীপুর মহাশ্মশানে ঠাকুরের সমাধিস্থলের দিকে দৃষ্টিপাত করে প্রণাম নিবেদন করছেন এমন সময় সারা উত্তর কলকাতায় লোডসেডিং হয়ে গেল। অন্ধকারেরও একটি আলাদা সৌন্দর্য রয়েছে। ভরা গঙ্গায় জল থৈ থৈ করছে। এক আঁধারি মায়াময় পরিবেশ তৈরী হয়েছে। ঐ দেখে মহারাজ গম্ভীর মৃদুস্বরে বললেন—"অন্ধকার, অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছাদিত।"

- অনেকে মহারাজজীর নিকট উপদেশ প্রার্থী হয়ে আসতেন। মহারাজজীর উপদেশ প্রদান প্রণালীটিও ছিল খুব সুন্দর। বেশ কয়েকবারই দেখা গেছে—মহারাজজী বলছেন—তোমাদের কারও নিকট টাকার নোট থাকলে বের কর।....দেখতো কোনও মূল্যবান কথা ছাপা আছে কিনা? জিজ্ঞাসু অপারগ হলে মহারাজ দেখিয়ে দিয়ে বলতেন, এই দেখো এটি অশোকস্তম্ভ, আমাদের এই জাতীয়-প্রতীক-এর নিচে ছোট ছোট করে লেখা আছে—'সত্যমেব জয়তে'। আগেকার নোটগুলোতে বড় বড় করে ছাপা হত। আজকাল এক ব্যক্তির ছবি বড় করে ছাপা হয়—আর তত্ত্বকথাটি ছাপা হয় ছোট করে। এবার বোঝ, আমরা কোন দিকে চলেছি।"

- —মহারাজজীর নিকট যেমন কেউ তার শরীর খারাপের কথা জানালে তাকে ভালো ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দিতেন—তেমনি বৈষয়িক বিষয়ে ভালো উকিলের সাথে আলোচনা করবার কথা বলতেন।

- মহারাজজী মাঝে মাঝেই বলতেন—গণপতি মহারাজ (কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক) এক সময় শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন শান্তিনিকেতনে অবস্থান করছেন। ছাত্র গণপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে ঢুকে

দেখেন—খবর কাগজে মোড়া একটি বান্ডিল বই-এর তাকে রয়েছে। কৌতূহলোবশতঃ সে জিজ্ঞাসা করে বসে যে, ঐ বান্ডিলে কি রয়েছে ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তর দেন—"ওতে স্বামী বিবেকানন্দের "Complete Works" রয়েছে। আমি এর মধ্যেই পড়ে ফেলেছি।" গণপতি মহারাজ আশ্চর্য হয়ে যান।

- মহারাজজী বলতেন—শম্ভু মহারাজ চলে যাওয়ার আগের মুহূর্তে আমায় ফোনে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাননি। উনি সজ্ঞানে শরীর ত্যাগ করেছেন। খুব জপ ধ্যান করতেন, মধ্যরাত্রে জপ করতেন, তার চলে যাওয়াটি একরকম ইচ্ছা মৃত্যু বলা যায়। ঐ বিষয়ে (অধ্যাত্ম বিষয়ে) উনি খুব পাকা ছিলেন।

- মহারাজজী আসানসোল আশ্রমের এক সভায় জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন—"স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন-শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায়, যারা অনুপ্রাণিত তারা একেকটি জায়গায় কলোনী করে থাকবে। ওই উচ্চ ভাবধারা অনুযায়ী জীবনগঠন করে তারা সমাজের উপর প্রচন্ড শক্তি নিয়ে আছড়ে পড়বে। আর সমাজও তাদের কথা মাথা পেতে নেবে। রামকৃষ্ণ আশ্রমগুলিকে কেন্দ্র করে ঐরকম কলোনী সারা দেশেই ছড়িয়ে আছে।"

- মহারাজজী রামকৃষ্ণ মিশন লক্ষ্ণৌতে অবস্থান করছেন। (তাং ৯ই ডিসেম্বর, ২০০২) জনৈক মহারাজজী 'ঈশ্বর দর্শন' বিষয়ে সহজভাবে আপনার নিকট কিছু জানতে ইচ্ছা করি।

  মহারাজ-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে বর্ণীত গয়াধামের ঘটনার বর্ণনাটি মন দিয়ে পড়বে। ঠাকুরের বাবা ক্ষুদিরামের আপত্তি সত্ত্বেও তার সততা পবিত্রতার জন্য ঈশ্বর তার ঘরেই আসতে চান। তা তিনি এলেনও, নাম হলো রামকৃষ্ণ। আমরা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ভক্ত, ঈশ্বরের নাম পেয়েছি, ঈশ্বরের রূপ পেয়েছি তারপর ভাববে-ঈশ্বর হলেন সচ্চিদানন্দ। সৎ-চিৎ-আনন্দ, সত্যই ঈশ্বর।....

- পূজনীয় মহারাজ দীক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মঠ ও মিশনের একটি শাখা কেন্দ্রে অবস্থান করছেন। দীক্ষাদানের পূর্বে গর্ভমন্দিরে গিয়ে অর্ঘ্য নিবেদনকালে মহারাজজী দীক্ষার স্থানে সেবককে বলছেন-দেখছো ঠাকুর মা, স্বামীজি সাক্ষাৎ বসে রয়েছেন। (মহারাজজীকে নিয়ে যাবার জন্য সেবকের খুবই তাড়া ছিল) সেবক বললেন মহারাজ অর্ঘ্য নিবেদন করুন।

  মহারাজ—"আরে! দেখছো? ওঁরা সাক্ষাৎ বসে রয়েছেন।"

  সেবক—মহারাজ, দীক্ষা প্রার্থীবৃন্দ প্রস্তুত। ঠাকুর-মা-স্বামীজির কৃপালাভের জন্য,

গুরুদেবের কৃপালাভের জন্য অপেক্ষা করছে।

মহারাজ—"দীক্ষার্থীদের সংখ্যা কত?"

মোট দীক্ষার্থীর সংখ্যা জেনে নিয়ে অর্ঘ্য সহিত তাদের ঠাকুর মা স্বামীজির চরণে নিবেদন করলেন। এ দৃশ্য অবর্ণনীয়।

- এক বৃদ্ধা দীক্ষার ঘরে দীর্ঘক্ষণ বসে দীক্ষা নেওয়ার মতো সমর্থ ছিলেন না। মহারাজজী তাকে শেষের দিকে নিয়ে আসতে বলেন। বৃদ্ধাকে যখন নিয়ে আসতে বলা হলো—এবং তিনি এলে পর ঠাকুর দর্শন প্রণাম করে আসতে বলা হলো। তা তিনি এতখানি অসমর্থা জেনে ঠাকুরের ছবিই তার চোখের সামনে ধরতে বললেন। ইষ্টের রূপ চিনিয়ে দিলেন-ইষ্টের গায়ের রং কিরকম তা দেখিয়ে দিলেন। ইষ্টমন্ত্র দানের পর তাকে বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিতে বললেন।

  এর কয়েকদিন পরেই বৃদ্ধা সধামে চলে যান। এ যেন ইষ্টলাভ, গুরুলাভ করবার জন্যই কয়েকদিন মাত্র অপেক্ষা করেছিলেন আর মহারাজজীর করুণার কথা ভাবলে বিস্ময় জাগে। দীক্ষাদানের সময় সংঘগুরু সাধারণ মানব থাকেন না...

  দীক্ষার শেষে দীক্ষিতদের উদ্দেশ্যে মহারাজ বললেন—"ভগবানলাভ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য—তা ভগবান আর কিছুই নয় এই পরিবর্তনশীল জগতের পশ্চাতে এক অপরিবর্তনীয় সত্তা, অপরিণামী সত্তা রয়েছে—তাঁকে জানা, তাঁকে উপলব্ধি করাই হলো ভগবান লাভ। যা মনুষ্য জীব জগৎ সর্বত্র বিরাজমান, তিনিই আমার হৃদয়মন্দিরে রয়েছেন—সেই সত্তাই আমার স্বরূপ।"

- বলরাম মন্দিরে ঠাকুরের রথের রশ্মি টানবার জন্য মহারাজজী আমন্ত্রিত হয়েছেন। মাইকে ঘোষণা চলছে "যাদের হয়ে গেছে—তারা বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান।" ঘোষককে ডেকে মহারাজজী তার ভাষা সংশোধন করতে বললেন— শিখিয়ে দিলেন 'এগিয়ে আসুন', 'এগিয়ে আসুন', এই কথা বললেই তো তোমার কাজ হয়ে যায়। মহারাজজী মৃদুভাষী ছিলেন। এলোমেলো শব্দের ব্যবহার পছন্দ করতেন না। অর্থ প্রকাশের জন্য সঠিক শব্দ চয়ন করতে বলতেন।

- "স্বামী গহনানন্দ মহারাজ সেবা প্রতিষ্ঠানের ডাক্তার নার্সদের সন্তান সন্ততি জ্ঞান করতেন—তাদের নিকট Father figure ছিলেন। Parenting সাধনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধ..."—স্বামী ভজনানন্দ।

- জনৈক-"মহারাজজী" তাড়াতাড়ি মঠে ফিরতে চাইছিলেন। স্বামী প্রমেয়ানন্দজী

মহারাজ—"মঠে আসতে প্রাণ চাইবে, এটাই তো হওয়া উচিৎ। মহারাজজী সেবা প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন কমপক্ষে দু-দিন তো মঠে আসতেনই। মঠে থেকে যেতেন। Math আমাদের Mother Centre. মঠের সাথে যার বনিবনা হবে না—তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে যাবে।'

- শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সার্ধশতবর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে মহারাজজী জয়রামবাটীতে অবস্থান করছেন। বিকেলবেলা মহারাজজীর প্রণাম। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন প্রণামের পর মহারাজজীকে প্রণাম করবার জন্য অমলপ্রাণা মাতাজী (GS মাতাজী, সারদা মঠ ২০০৫) এসেছেন।

মাতাজী—"শরীর ভালো আছে তো মহারাজ ?"

মহারাজ—শরীর শরীরের মতো আছে?

মাতাজী—"তাইতো তাইতো, আপনারতো দেহবোধই নেই। আপনি দেহবোধের অনেক অনেক উপরে রয়েছেন।

পূজনীয় মহারাজের কিছু প্রিয় শ্লোক

1) "একম্ সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"...ঋক্ বেদ

1A) যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।। গীতা 6/22

2) সহনং সর্বদুঃখানাম্ অপ্রতিকার পূর্বকম্।
চিন্তা বিলাপ রহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্ধতে।। বিবেকচূড়ামণি

3) সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ
সর্বে মন্তু নিরাময়াঃ
সর্বে ভদ্রানি প্রশ্যন্তুঃ
মা কশ্চিৎ দুখঃভাগদ্ভবেদ্।

4) সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।

5) শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।

6) বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্।

7) শ্রবণ মনন্ নিদিধ্যাসন্

8) পরস্পরং ভাবয়ন্ত : ....গীতা 3/11

কৃতকারিত অনুমোদিত মিথ্যা—মিথ্যাচার।

9) স্বদেশ ভুবন ত্রয়ম্.....

10) দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চ অপরচচ
পরা-যয়া তদ্অক্ষরম্ অধিগম্যতে-(মুণ্ডক উপনিষদ)

10A) "কস্মিন্নু ভগবোবিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" -মুণ্ডক(1-1-3)
কোন্ বস্তুকে জানলে, জগতের সব বস্তু জানা যায় ? সর্বসাধারণ মৌলিক বস্তুটি কি?

—উপনিষদ বলছে, আত্মজ্ঞান লাভ করলেই সব জানা হয়ে যায়।

11) "অভ্যুদয়" "নিঃশ্রেয়স্"

12) ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিনং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বম্ মম দেবদেব।।

13) স্বকর্মনা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। গীতা-18/46

14) মাম্ অনুস্মর যুদ্ধ চ।.....গীতা

15) নিমিত্র মাত্রং ভব সব্য সাচিন।...গীতা 12/33

16) বাসনাযুক্ত জীব-বাসনামুক্ত শিব।

17) মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।...মৈত্রায়নী উপঃ 4/11

18) মনেতে বদ্ধ মনেতে মুক্ত।

19) কালোহাস্মি লোকক্ষয়কৃৎ...গীতা 11/32
(সকল বস্তুই কালের অধীন)

20) নিজ মনকে নিপুণভাবে চালাতে শেখ।

21) জিত রসে জিতং সর্বে।
যে রসনা জয় করেছে সে অর্ধেক পৃথিবী জয় করে বসে আছে।

22) নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাম হৃদয়ে ন চ
মদভক্তা যত্র গায়ন্তি অহং তিষ্ঠামি তত্র নারদঃ।

23) অস্তি ভাতি প্রিয় নামরূপ

24) "স্থিত প্রজ্ঞস্যকা ভাষা....গীতা

25) স্ত্রীয়াঃ সমস্তা সকলা জগৎসু"....চণ্ডী

26) “মোহমুদগর”......chanting - নবাগত ব্রহ্মচারীদের পাঠের জন্য বারবার নির্দেশ দান

27) “We are one” (২০-১০-০৬-সন্ধ্যারতির পর প্রণামের সময় সাধু ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশ্যে মহারাজজীর বার্তা। President Mj. Qtr.)

28) “Man’s real nature is neither the body nor the mind but The Spirit and Spirit is the source of all knowledge of all bliss etc. (Ulsoor R.K.M.)

29) “See what is unchanging behind this changing world We have to know it anyhow."

30) “সিনেমার পর্দায় দৃশ্য দেখতে দেখতে দেখলে—এই আগুন লাগলো তো এই বৃষ্টিতে ভিজে গেল—কিন্তু সবশেষে দেখলে পর্দা পর্দাই, আগুনে পুড়ে যাওয়াও নেই—জলে ভিজে যাওয়াও নেই। পর্দা যেমন তেমনি রয়েছে। আমাদের প্রকৃতস্বরূপও তাই।

তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

স্বামী সত্যকামানন্দ

‘ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা’—ক্ষণিকের মহৎসঙ্গ যেন ভবসিন্ধু তরণের তরণী। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী মহারাজের অশেষ কৃপায় পূজনীয় মহারাজের যেটুকু সঙ্গ করবার সৌভাগ্য হয়েছে যা আজ আমার চলার পথের পরম পাথেয়। মহারাজের অধ্যাত্মনিষ্ঠ জীবন ছিল একান্তভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত। স্বামীজী প্রদর্শিত কর্মযোগের এক পরিপূর্ণ চিত্ররূপ এবং তিনি আমাদের মধ্যে সেই ভাব সদা সর্বদা জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। বেশ কয়েক বছর ধরে মন্ত্রদীক্ষা নেবার প্রবল ইচ্ছা জেগেছিল। গুরু শিষ্যকে নির্বাচন করেন অথবা শিষ্য গুরুকে নির্বাচন করেন—এ কথা নির্ণয় করা কঠিন। আমার ধারণা হৃদয় প্রস্তুত হলে শ্রীভগবান গুরুরূপে কৃপা করে শিষ্যকে আকর্ষণ করেন। আমার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটেছিল। সুন্দরভাবে সব যোগাযোগ হয়ে গেল এবং তেজপুরে আমার মন্ত্রদীক্ষা হয়। সে এক অবর্ণনীয় উপলব্ধি। দীক্ষার দিন মহারাজ সকাল ৭টা ৩০ এ দীক্ষার ঘরে ঢুকলেন এবং দ্বিপ্রহর ২টা ৩০ অবধি ছিলেন। তখন যেন এক ভিন্ন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ অনুভব করলাম যা আগে কখনো দেখিনি। খুব সহজ এবং সরলভাবে সব নির্দেশগুলি দিয়েছিলেন। এক এক জন করে পৃথকভাবে মন্ত্র দিলেন এবং করজপ প্রণালী দেখিয়ে দিলেন। এরপর যখন আমি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করি সেইসময় গৌহাটি রামকৃষ্ণ মিশনে থাকাকালীন মহারাজ সেখানে একবার এলেন মন্ত্রদীক্ষা উপলক্ষ্যে। তখন আমার সাধন প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসা মহারাজকে করেছিলাম। তার উত্তরে মহারাজ বলেছিলেন, আসনে বসে জপ করা ছাড়াও সর্বক্ষণ মানসিক জপ করার চেষ্টা করবে। দীক্ষান্তে মহারাজ দীক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কারোর কোনো জিজ্ঞাস্য আছে কিনা, তারপর যা আমি দেখলাম তা আমার বিস্ময়ের বিষয় হয়ে রইল। মহারাজ প্রত্যেকটি প্রশ্ন খুব নিবিষ্ট মনে শুনলেন এবং দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন এর বহু বছর পর আমি যখন বেলুড়মঠের পুরানো মন্দিরে সেবারত ছিলাম সেই সময় একদিন

মহারাজ বেলুড়মঠে এসেছিলেন তখন আমি ওঁকে আমার ইষ্টমন্ত্রের অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখন মহারাজ পুনরায় আমাকে মন্ত্রটি শুনিয়ে তার ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন। মহারাজ যখন ২০০৫ সালে প্রেসিডেন্ট হয়ে এলেন নিত্য ওনাকে প্রণাম করার সময় জামার বোতাম খোলা আছে কিনা কিংবা উত্তরীয় আছে কিনা এ বিষয়ে নজর রাখতেন। এলোমেলো ভাব একদম পছন্দ করতেন না। ২০০৬ সালে মহারাজ কৃপা করে আমাকে সন্ন্যাস দীক্ষাও দিয়েছিলেন। এক অবর্ণনীয় আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়েছিল। ২০০৭ সালে মহারাজ হঠাৎ অসুস্থ হন এবং স্থূল শরীর ত্যাগ করে রামকৃষ্ণলোকে গমন করেন। বাইরের দেখা বন্ধ হল। এরপর যখনই বর্তমান প্রেসিডেন্ট মহারাজকে দর্শন করি, আমার মনে হয় আমি তাঁকেই দেখছি।

২০০২ সালে আমি একবার সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি। আমার শারীরিক অবনতি দেখে ডাক্তারেরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন আমার পূজনীয় গহনানন্দজীর কথা মনে পড়ল এবং মনে করলাম শরীর যখন যাবেই তখন গুরু এবং ইষ্ট স্মরণ করতে করতে শরীর ছাড়বো। কিন্তু গুরুর কৃপায় সে যাত্রায় আমি রেহাই পাই এবং তখনও সুস্থ শরীরে সঙ্ঘে সেবা করবার সুযোগ পাচ্ছি। মহারাজ একবার কাঁকুড়গাছি থেকে ট্রাস্টি মিটিংয়ের জন্য বেলুড়মঠে এসেছিলেন। আমি ....দেখে মহারাজকে জানতে চেয়েছিলাম যে আমি, মা ও স্বামীজীর ধ্যান করতে পারি কিনা। মহারাজ প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন—“তুমি ভাববে, ঠাকুরের মধ্যেই শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী বিরাজ করছেন, পৃথক ধ্যান করবার প্রয়োজনীয়তা নেই।” ২০০৭-এর শেষের দিকে মহারাজ হঠাৎ করে অসুস্থ হতে শুরু করেন এবং নভেম্বর মাসে দেহাবসান ঘটে। সেই সময় আমি বেলুড়মঠে Posted ছিলাম এবং মহারাজের অন্ত্যেষ্টিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম।

গুরুকৃপা

স্বামী ভূপালানন্দ

দীক্ষার প্রায় দু'মাস পরে গুরুদেবকে দর্শন করার জন্য কর্মক্ষেত্র পুণা থেকে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এলাম। তখন আমার মনে নানা প্রশ্ন। কলকাতায় এসে আমি কাঁকুড়গাছি মঠে গেলাম যেখানে পূজনীয় গহনানন্দজী তখন আছেন। মহারাজের কাছ থেকে আমার সব প্রশ্নের উত্তর জেনে নেব, এই ভেবে সব প্রশ্নগুলি একটা কাগজে লিখে নিয়ে গেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য, তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই তিনি আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন। সেইদিন উপলব্ধি করলাম, গুরু অন্তর্যামী।

সঙ্ঘে যোগদানের তিন মাস পর আমার মা, বাবা, ভাই ও কাকা হঠাৎ পুণে মঠে এসে উপস্থিত। উদ্দেশ্য—আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। সৌভাগ্যক্রমে মহারাজ সেইসময় পুণে মঠে এসেছিলেন দীক্ষা-দানের জন্য। তিনি প্রতিবছর রামনবমীর সময় পুণে মঠে আসতেন। যাইহোক, আমার পূর্বাশ্রমের লোকেরা পুজনীয় মহারাজের সঙ্গে দেখা করেন ও আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলতে লাগলেন। এরই মধ্যে মহারাজ আমাকে সেখানে ডেকে পাঠালেন। সেখানে গিয়ে আমি তো হতবাক। দেখি মহারাজজী তাদের সঙ্গে বসে রয়েছেন। আমি আসলে মহারাজ আমার মায়ের অভিমত জানতে চেয়ে বললেন যে, এই বিষয়ে আমার মা যা বলবেন তাই চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া হবে। আমার বাবা বলে উঠলেন যে, আমার ফিরে যাওয়া উচিত। মহারাজ মনে করিয়ে দিলেন যে তিনি আমার মায়ের মতামতই মানবেন। আমাকে অবাক করে দিয়ে সেদিন আমার গর্ভধারিণী বললেন যে, আমার সঙ্ঘে যোগদান করাই উচিত। এই ঘটনাটি আমার কাছে অলৌকিক বলে মনে হয়েছে, কারণ আমার আত্মীয়-স্বজনের সুদূর উড়িষ্যা থেকে পুণে এসেছিলেন আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ সব গুরুকৃপাতেই সম্ভব হয়েছে।

একটি ছোট ঘটনায় মহারাজের শিষ্যস্নেহের প্রকাশ দেখেছিলাম। বেলুড় মঠে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে থাকাকালীন আমার জপ-মালা নেওয়ার ইচ্ছা হলো। সপ্তর্ষি মহারাজ আমাকে একটি মালা দিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। সেইসময় কাঁকুড়গাছি থেকে বেলুড় মঠে এলে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ স্বামীজির পাশের ঘরটিতে থাকতেন। সপ্তর্ষি মহারাজের নির্দেশে আমি মহারাজের ঘরে উপস্থিত হলোম। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে তাঁর চেয়ারের সামনে বসতে নির্দেশ দিলেন। মহারাজজী নিজেই গিয়ে ঘরের দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। তারপর চেয়ারে বসে তিনি মালাটি গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে সেই মালাটিতে জপ করলেন। এর পর আমাকে তিনি মালায় জপ করার বিধি দেখিয়ে দিলেন। এতে প্রায় আধঘন্টা সময় লাগল। মহারাজের এত ব্যস্ততা, তাঁর শিষ্য সংখ্যা লক্ষাধিক, তবুও সেইদিন তিনি আমার জন্য প্রায় আধ ঘন্টা সময় দিলেন। আমার আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য তাঁর আগ্রহ দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

স্মৃতিকথাটি শেষ করছি একটি একান্ত ব্যক্তিগত কথার উল্লেখ করে। আমার পূর্বাশ্রমের নাম ললাটেন্দু। দীক্ষার পর থেকেই বেলুড় মঠে যখনই মহারাজকে প্রণাম করতে গিয়েছি তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, "তোমার ললাটে ইন্দু কোথায়?" একদিন তিনি আমাকে বলেন, "তুমি কপালে চন্দন দিয়ে চাঁদ এঁকে নিতে পার তো।" আমি কয়েকবছর কপালে গঙ্গাজলে তিলক আঁকতাম।

ঘটনাটিগুলি খুব ছোট, কিন্তু এগুলির মূল্য আমার কাছে অনেক। এই ঘটনাগুলো আমার প্রতি গুরুদেবের স্নেহের প্রকাশ।

পরম শান্তির সন্ধানে

স্বামী জ্ঞানামৃতানন্দ

পরম পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ বিভিন্ন গ্রামের আশ্রমগুলিতে গেছেন এবং খুবই কষ্ট স্বীকার করে সেখানে দীক্ষাও দিয়েছেন। বর্ধমান জেলার এমনই একটি গ্রাম নাসিগ্রাম। ১৯৯৩ সাল, রাসপূর্ণিমার দিন। সেখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে মন্দিরের শুভ উদ্বোধন এবং সেই উপলক্ষে দীক্ষার আয়োজন।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলেছে দীক্ষার কাজ। দীক্ষার্থীরা অস্থির, চঞ্চল হ'য়ে পড়ছে। মহারাজজী কিন্তু শান্ত ও অসীম ধৈর্যশীল। সকলকে ডাকছেন, মন্ত্র দিচ্ছেন। করজপ দেখিয়ে দিচ্ছেন আবার নিজেও দেখে নিচ্ছেন শিষ্যের জপ। কোনরূপ ক্লান্তি নেই। উত্তম ভবরোগবৈদ্য তিনি। তাঁর অহেতুক কৃপা সেদিন আমার উপরও বর্ষিত হ'ল। তখন আমি কলেজ ছাত্র। কিছুই বুঝিনি। কিন্তু আজ মনে হয়, সেই প্রথম সাক্ষাতেই মহারাজ অযাচিতভাবে আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তারই ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে কামারপুকুরে ব্রহ্মচারীরূপে রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান।

সংসার-জীবনে থেকে মাঝে-মধ্যে মহারাজকে দেখা এবং সংঘে যোগদান ক'রে, একেবারে ঠাকুরের ঘরের ছেলে হ'য়ে মহারাজকে দেখা এবং তাঁর পূত সঙ্গলাভ একেবারে আকাশ পাতাল তফাৎ।

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে এলে মহারাজ, সাধুনিবাসের ১নং ঘরে থাকতেন। মহারাজকে দেখেছি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ফিটফাট্ থাকতে। নিজের জামার সব বোতাম গুলি লাগাতেন। কথাবার্তায় ধীরস্থির; স্বভাব ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ।

সাধুনিবাসের বারান্দায় সকালে পায়চারি করতেন; সঙ্গে থাকতেন আশ্রমাধ্যক্ষ, স্বামী দেবদেবানন্দ। সান্ধ্যরাত্রিকের পর ঐ বারান্দায় মহারাজকে প্রণাম করার জন্য ভক্ত সমাগম হ'ত। দীক্ষা থাকলে দীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যায় দীক্ষার্থী ভক্তদের নিয়ে

বসতেন। অধ্যাত্ম জীবনের কথা বলতেন। জপধ্যান প্রসঙ্গে বলতেন—দীক্ষার জন্য যে ফর্ম দেওয়া হয়, তাতে যে প্রশ্ন আছে দীক্ষা নিলে জপধ্যান করতে পারবেন তো?—তার উত্তরে তো সবাই 'হ্যাঁ' লিখেছেন এখন থেকে কিন্তু নিত্য-জপের অভ্যাস করতে হবে। আর বিশ্রামের প্রসঙ্গে নিজ-হাতের চারটি আঙুল দেখিয়ে বলতেন—মাত্র চার ঘন্টা সুস্থ শরীরের বিশ্রামের জন্য যথেষ্ট।

একবার কামারপুকুরে মহারাজ ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পর সমবেত ভক্তদের নিয়ে ধর্মালোচনা করছেন। সঙ্গে আছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রথমভাগ। পঞ্চম পরিচ্ছেদে মাস্টার মহাশয় (এটি দক্ষিণেশ্বরে তাঁর দ্বিতীয়দর্শন) ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন—(১) ঈশ্বরে কি ক'রে মন হয়? (২) সংসারে কি রকম ক'রে থাকতে হবে? (৩) ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়? (৪) কী অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয় ?....

স্বীয় অনুভূতি এবং প্রজ্ঞার আলোকে সেদিন মহারাজের ঐ চারটি প্রশ্নের আলোচনা শ্রোতাদের মনকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল, যা আজও তাদের মনে গাঁথা হয়ে আছে।

আর একবারের ঘটনা। ২০০২ সাল, দিনটা সম্ভবত ৫ সেপ্টেম্বর। মহারাজ কামারপুকুর মঠে শ্রীমন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। পরে যুগী শিবমন্দিরে শিবের পূজা করার পর গয়াধামে পিতা ক্ষুদিরামের স্বপ্নবৃত্তান্ত, ঐ শিবমন্দিরের সম্মুখে মাতা চন্দ্রমণির গর্ভে জ্যোতিপ্রবেশের দিব্য-অনুভূতির কথা বলে মহারাজ কামারপুকুরে ঠাকুরের শুভ-আবির্ভাব এমনভাবে বর্ণনা করেন যা সমবেত সকলের হৃদয়কে এক অনাস্বাদিত স্পর্শে অভিভূত করে।

আর একবার—পূজ্যপাদ মহারাজ তখন রামকৃষ্ণ সংঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষ। কামারপুকুরে এসেছেন। মিশন স্কুলের জায়গা সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা মতবিরোধ চলছে। তিনি যেদিন ঐ বিরোধস্থলে উপস্থিত হ'তে চাইলেন, সেদিন আবার প্রচন্ড বৃষ্টি, ফলে তখনকার রাস্তাও ছিল কর্দমাক্ত। কিন্তু দুর্যোগের সমস্ত বাধার মধ্যেও তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। আশ্চর্যের বিষয়, এই মৃদুভাষী, সহাস্য শান্ত অথচ প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহারাজের উপস্থিতিতেই ঐ দীর্ঘদিনের বিবাদের নিমেষে সমাধান হয়ে গিয়েছিল।

এবার আমার ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে থাকার সময়কার ঘটনা। মহারাজ মঠে এলে আমরা যারা মহারাজের আশ্রিত সকলে মহারাজের কাছে যেতাম। মহারাজ তো

স্বল্পভাষী ছিলেন—অনেক সময় আকারে-ইঙ্গিতে আবার কোন কিছু বুঝাতে বা জানতে চাইতেন। একদিন ওঁর ঘরে আছি। উনি তক্তাতে বসে আল্লার দিকে হাত দেখিয়ে কি যেন ইঙ্গিত করছেন। কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। আমার অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করে তিনি বললেন—ছাতাটা ঠিকভাবে রাখার জন্য। আর একটি ঘটনা—

মহারাজের সেবক তখন বিকাশ মহারাজ [আমাদের এক ব্যাচ সিনিয়র ছিলেন ট্রেনিং সেন্টারে], তিনি একবার মহারাজের ব্যবহৃত একটি কাপড় আমায় দিয়েছিলেন। সেটিকে মুড়ে পকেটের মধ্যে রেখে মহারাজকে প্রণাম করতে গেছি। কিন্তু মহারাজের সূক্ষ্মদৃষ্টি এড়ানো গেল না। প্রণাম চলাকালীন আমার পকেটের দিকে অঙ্গুলি নিদের্শ করে ইঙ্গিতে জানতে চাইলেন—ওটা কি ? এমন-ই ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি !

পূজ্যপাদ মহারাজজী রামকৃষ্ণ সংঘের অধ্যক্ষ থাকাকালীন পুণ্যভূমি কামারপুকুর এবং জয়রামবাটী শেষবারের মতো দর্শন করতে আসেন ফেব্রুয়ারি, ২০০৭। কামারপুকুরে আছেন। সেবক হিসাবে আছেন বিকাশ মহারাজ এবং অন্যান্য সাধু ও ব্রহ্মচারিগণ। মহারাজের সেই বয়সেও দাঁতগুলি মজবুত থাকায়—সেই রহস্যের কারণ একদিন সান্ধ্যভ্রমণের সময় মহারাজকে ই জিজ্ঞাসা করা হয়। মহারাজ স্মিতহাস্যে উত্তর দেন—তিনি দাঁতের খুব যত্ন করেন; খাওয়ার পরে নিত্য ব্রাশ দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করেন; ফলে দাঁত এখন পর্যন্ত ঠিক আছে।

মহারাজের আহার ছিল খুবই পরিমিত। থালার মধ্যে একটি ছোট বাটি থাকত। সেই বাটিতে দেওয়া হত অল্প ভাত—দুই তিন চামচ দই ঐ ভাতের সঙ্গে মাখিয়ে। থালায় থাকত দু-তিন পিস সেদ্ধ পেঁপে, গাজর, বিনস্ এবং পটল। মাঝে মাঝে বাটিতে থাকত পালংশাক বা মেথি শাকভাজা, একটু মুগডাল, লাউপোস্ত বা শজনে ডাঁটা। মহারাজ নিজের প্রয়োজন মতো নিয়ে নিতেন। রাজমার তরকারি প্রায় প্রতিদিন হ'ত। চালতার চাটনি মহারাজ পছন্দ করতেন।

জপের প্রসঙ্গে একদিন মহারাজ বলেছিলেন—ঠাকুরের ডান পা থেকে শুরু করবে ১০৮ বার। এইভাবে ঠাকুরের বাম পায়ের অঙ্গুলি; তারপর ডান হাঁটু, বাম হাঁটু, ডান হাতের অঙ্গুলি, বাম হাতের অঙ্গুলি, ডান বাহুমূল, বাম বাহুমূল, মুখমন্ডল এবং সর্বশেষে ঠাকুরের সমস্ত অঙ্গকে লক্ষ করে জপ করবে। নিত্য জপের কথা বলতেন।

ঐ ২০০৭ সালে পূজ্যপাদ মহারাজজী কামারপুকুরে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন।

বহু দীক্ষা-প্রার্থীকে দীক্ষাদানে পরিতৃপ্তও করেন। অবশেষে এখান থেকে জয়রামবাটী যাত্রা করবার পূর্বে, মহারাজ ঠাকুরের মন্দিরে প্রণাম করতে যান। ঐ সময় তিনি কুলদেবতার মন্দিরে এলে সিংহাসনসমেত রঘুবীর জীউকে মহারাজের মস্তক স্পর্শকে করানো হয়। রঘুবীরের সিংহাসনে মাথা রেখে দীর্ঘ সময় ধরে মহারাজ প্রণাম করেন। অন্তিমক্ষণ আসন্ন জানতে পেরেই কি রঘুবীরের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে দীর্ঘ সময় ধরে প্রণাম ক'রে বিদায় নিচ্ছেন?

গাড়িতে ওঠবার পূর্ব মুহূর্তে হাতজোড় ক'রে তিনি কামারপুকুরবাসী এবং ভক্তদের উদ্দেশ্যে শেষ নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন!

গাড়ি ধীরে ধীরে জয়রামবাটীর উদ্দেশ্যে রওনা হ'লো। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম সেই পরম শান্তির যাত্রাপথে।

তুমি অভাগারে চেয়েছো

স্বামী কল্যাণেশানন্দ

আসি বারে বারে মুক্তির তরে
মায়ায় ভুলি সে বাসনা,
হাতে ঘড়ি এঁটে চুলে টেরি কেটে
করি কত বাবুয়ানা।।
শৈশব যায় হাসি আর খেলায়
কত না রঙ্গ রসে,
যৌবনে এসে ভাবি বসে বসে
এ জীবন গেল কিসে ?
ভুল বুঝি পরে ভক্তি ভরে
প্রার্থনা করি এক একা,
(বলি), এজীবন মোর হবে নাকি ভোর

বাসনা মানুষকে যতনা দেয়, দেয় পীড়া আর দুঃখ কষ্টের সঙ্গে আনন্দও, কিন্তু বাসনার তরে মাতৃজঠরে যখন নাকি থাকে শুনেছি তখন ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা জানায় "প্রভু এবার জন্ম নিলে তোমাকেই ডাকবো, মায়ার জালে আর জড়াবো না" কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মায়ার বাতাস যেই গায়ে লাগে অমনি ভগবানের কাছে যে কথা দিয়েছিল সে সব ভুলে যায়, সংসাররূপ সাগরে ডুবে যায় গহন থেকে গহন অন্ধকারে।

সেই বাসনা নিয়ে সুদূর শ্বাপদ ও বাঘ ভাল্লুক সঙ্কুল দেশে জন্ম গ্রহণ করে এক অনামী বালক, নাম তার সূর্য। পিতামাতার আনুকূল্যে ও সাহচর্য্যে সে বড় হয়ে ওঠে, কিন্তু সূর্য যখন খুবই ছোট, পিতামাতা ও ভ্রাতাগণ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের কৃপা পান।

দীক্ষার পর থেকে সূর্যের বাড়িতে চলে ঠাকুরের নিত্য পূজা। সূর্য জেনে নেয় মায়ের কাছে, যে স্বামীজির বাম পাশে গেরুয়া কাপড় পড়া মানুষটি কে? মা বলেন গুরুদেব। মা জননী নাম ধরবেন না তাই সে তার দাদার কাছে থেকে জানে গুরুদেবের নাম—শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ, সেই দিন থেকে মার সঙ্গে পুজো করতে ঠাকুরঘরে গেলে সেও তাকে গুরুরূপে মনে মনে পূজা করে। সূর্য পূজা করতে শিখে যায় মায়ের কাছে, সকাল সন্ধ্যা মা বাবাকে ঠাকুর ঘরে বসে থাকতে দেখে সে কৌতুহলো পরবশ হয়ে একসময় বাবা মাকে জিজ্ঞাসা করে, বসে বসে তাঁরা কি করেন?—বাবা বলেন, ঠাকুরের নাম জপ করি। নাম জপ মানে কি? সূর্য প্রশ্ন করে। উত্তরে তার পিতা বলেন, যে ভগবানকে ভক্তিভরে ডাকার নামই হ'লো জপ। সেও জপ করবে, তাকেও শিখিয়ে দিতে হবে—জেদ ধরে ছোট্ট সূর্য—কিন্তু পিতা বলেন যে, তোমার গুরুদেব যখন হবে তখন তিনি দেখিয়ে দেবেন। তুমি এখন রামকৃষ্ণ নাম সকাল সন্ধ্যা জপ করবে, ১০৮ বার। গুরুর আশায় পথ চলা শুরু হয় সেই থেকে সূর্যের।

যখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে তখন সে সরিষা আশ্রমে আসে দীক্ষা নেওয়ার জন্য। দীক্ষা দেবেন স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। আনন্দের আর সীমা নেই কারণ ছোট্ট থেকে যাকে সে মনে মনে গুরুরূপে পূজো করে আসছে সেই হবে তার মন্ত্র গুরু। কিন্তু কি আনন্দ কি আনন্দ সব মাটি হয়ে গেল যখন সে শুনলো যে তার দীক্ষা হবে না। আকাশ থেকে পড়লো সে, কারণ তখন তার আকার আকৃতি ও বয়স খুবই কম। ধীক্কার দিয়েছিল সে সেদিন তার বয়স ও ছোট্ট গড়নকে।

বিষন্ন মনে ও ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে আসে ছোট্ট সূর্য। পিতার কাছে সে শোনে যে গুরু না কি পূর্ব-নির্দিষ্ট থাকে। কে কার গুরু হবে সে আগে থেকে ঠিক করা থাকে। অষ্টম, নবম ও দশম অর্থাৎ মাধ্যমিক পাশ করে ১৯৯৩ সালে। সেই বছরই সে শুনতে পায় সে মনসা দ্বীপে দীক্ষা হবে। দীক্ষা দেবেন শ্রীমৎ স্বামী গহণানন্দজী মহারাজ। বাবা ও বড়দাকে ব'লে সে দীক্ষার নেবার জন্য প্রস্তুত হয়। যথা সময়ে নির্দিষ্ট দিনে সে হাজির হয় মনসাদ্বীপ আশ্রমে।

ততদিনে পূজনীয় মহারাজ এসে গেছেন, সন্ধ্যায় প্রণাম হবে সকলকে বলা হলো। জীবনের প্রথম সূর্য দেখবে তার জীবনের আলোক দিশারীকে। তার ভিতর পুলক হচ্ছে, আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু আনন্দকে সে চেপে রেখেছে প্রকাশ করতে দিচ্ছে না। পাছে পূর্বের মতো দীক্ষা যদি না হয়—এই ভেবে।

ঠাকুরমন্দিরে আরতি শঙ্খ বেজে উঠতেই সে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে ধোয়াবস্ত্র

পরিধান করে সবার আগে এসে বসে যায় মন্দিরের বারান্দায়। প্রেয়ার হলো শেষ হোস্টেলের ছাত্ররা চলে গেল। দীক্ষার্থীরা মহারাজের প্রণামের জন্য অপেক্ষমান। সূর্যও তাদের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অপেক্ষা করতে থাকে কখন মহারাজ আসবেন, দেখবে নয়ন ভরে। যিনি মন্ত্রগুরু হবেন। মনসাদ্বীপের গ্রাম্য পরিবেশ তখন নিঝুম নিথর। প্রাকৃতিক নিস্তব্ধতায় কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল। সবাই চুপ করে অপেক্ষামান। তারপর পূজনীয় মহারাজকে নিয়ে আসা হলো সাধু নিবাস থেকে সঙ্গে কয়েকজন সাধু, মহারাজকে দেখে সূর্য সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানায় মহারাজকে। মহারাজকে দেখে তার প্রথম অনুভূতি সত্য-সত্যই জ্যোতির্ময় তিনি মানুষের চোখে মুখে এত জ্যোতি থাকতে পারে তার ধারণাই ছিল না। এক কথায় সূর্য সেদিন মুগ্ধ হয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যখন প্রণামের সময় এলো ভূমিষ্ঠ হয়ে ভক্তিভরে প্রাণের আকুতি জানায় সে, অন্তরের অন্তস্থল থেকে, মহারাজ কেবল মুচকি হাসি হেসে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। তাতেই সূর্য্যের আনন্দের সীমা নেই। এবার তার নিশ্চয়ই দীক্ষা হবে। মহারাজকে প্রথম দর্শন সব মিলিয়ে এক মনোরম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল সূর্যের। তার সেই প্রথম দিনকার কথা এখনও মানসপটে জ্বলজ্বল করছে। দেবতার মতো তাঁকে সেদিন পূজা করেছিল মনে মনে, কারণ সে সাধুদেরকে দেবতার পরে স্থান দেয়।

পরের দিন যথাসময়ে সূর্য স্নানাদি করে শুভ্র বস্ত্র পরিধান করে দীক্ষা গৃহে আসে, (তখন মনসাদ্বীপের নতুন মন্দিরে কাজ চলছিল, তাতেই প্যাণ্ডেল করে দীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তৎকালীন সম্পাদক স্বামী বিকাশনন্দজী)। সবাই অপেক্ষা করছেন গুরু মহারাজ কখন আসেন। সূর্য তখন সেই সন্ধ্যার ছবি মনে করছে আর ভাবছে পূজনীয় মহারাজ হয়তো আজ ভাবে বিভোর হয়ে দীক্ষা দেবার জন্য টলতে টলতে আসবেন আবার ভাবে বিভোর হয়ে দীক্ষা দিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু মহারাজ যখন পরিশেষে উপস্থিত হলেন তখন মহারাজ নিজেই ধীরে ধীরে এসে দীক্ষাগৃহে প্রবেশ করলেন সবাইর সঙ্গে সূর্যও উঠে দাঁড়ায়। মহারাজকে দেখে অভিভূত হয়ে যায়, সত্যই তিনি এ জগতের মানুষ নন। অন্য একটি অনুভূতি হচ্ছিল তার। দীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল, সূর্যের আজ অন্য দিকে মন নেই, সে কেবল মহারাজকে একদৃষ্টে দেখে চলেছে। কয়েকজনের দীক্ষা হলো, তারা বয়স্ক মানুষ বলে একটু সময় লাগছিল মন্ত্র উচ্চারণ করতে। সূর্য একমনে সব লক্ষ্য করছিল, তার যখন সময় এলো আনন্দে পূজনীয় মহারাজের সামনে গিয়ে বসল, এক অনির্বচনীয় আনন্দ, ভয়, মিলে এক অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল তার। মহারাজ ধীরে ধীরে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন সূর্যও সঙ্গে প্রতি উচ্চারণ

করল। তিনবার উচ্চারণের পর মহারাজ চোখের ইঙ্গিতে জানালেন যে হয়ে গেছে, মহারাজের মুখে এক অনাবিল হাসি, মাথায় হাত রাখলেন, শিহরণ বয়ে গেলে মনের মধ্যে, হাতে একটি ছোট কাপড়ের জড়ানো জিনিস ছিল, দীক্ষা শেষে ভক্তিভরে ভূমিতে লুটিয়ে প্রণাম করে সূর্য মহারাজকে। মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করতে করতে এসে নিজের জায়গায় বসে থাকে স্থানুবত হয়ে বসেছিল। দীক্ষার পরে গুরু পূজা করে সূর্য ভক্তিভরে। সন্ধ্যায় প্রণামের সময় সূর্য প্রশ্ন করে তিন সন্ধ্যা ছাড়া কি অন্য সময় জপ করা যায়? উত্তরে পূজনীয় মহারাজ বলেন সময় সময় নাম জপ করা যায় যে কোন অবস্থায়। সূর্য বাড়ি ফিরে এলো মহারাজের কথামতো তিন সন্ধ্যা জপ ধ্যান প্রার্থনা করার চেষ্টা করে এবং কাজের সময় চেষ্টা করে জপ করার।

এক বছর ধরে বাড়িতে আপ্রাণ কাজকর্ম ও জপধ্যান ও প্রার্থনা করেছে। দীক্ষার এক বছর পর সূর্য বাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হবে মনে স্থির করে। যেহেতু সে প্রত্যন্ত সুন্দরবনে থাকে মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগের কোন উপায় ছিল না, বিভিন্ন মনের প্রশ্নের উত্তর সে কোথায় পাবে? পেত একটি বই—'ধর্মপ্রসঙ্গে'—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সে বইটির কথা পাঠচক্রে এক বৃহস্পতিবার জানতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে বইটির যে পাতা খুলত সে তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেত। একসময় নিত্য জপধ্যান ও মনের প্রশ্নের উত্তর পেতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। বৃহস্পতি ১লা জুন ১৯৯৪ সালে এসে সে মনসা দ্বীপ আশ্রমে ওঠে। পূজনীয় জি.এস. মহারাজের (স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজের নির্দেশে সেখানে থেকে উচ্চমাধ্যমিক পড়াশুরু করে অবশ্য আশ্রম থেকে। সেখানে থাকা কালে মহারাজকে মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখতো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পেতে। যথাযথ উত্তর দিয়ে মহারাজ তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতেন। মহারাজের আশীর্বাদ নিতে ১৯৯৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে সে দেহঘর, আসানসোল প্রভৃতি ঘুরে শেষে কাঁকুড়গাছি আসে। কাঁকুড়গাছিতে মহারাজ তখন থাকতেন, মহারাজকে বহুদিন পরে দেখবে এবং এই তার মহারাজকে দ্বিতীয়বার দেখা। সেবক মহারাজের অনুমতি নিয়ে মহারাজকে প্রণাম করতে যায় সূর্য, নাম ধাম জিজ্ঞাসা করলেন মহারাজ, তাঁর অম্লান হাসি সূর্যের মন ভরিয়ে দিল। মহারাজ মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মন শান্তিতে ভরে গেল তার। পরের দিন মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাগবাজারে মায়ের বাড়ি আসে জনৈক মহারাজের সঙ্গে। উদ্বোধন থেকে সূর্য গুরুদেব হাসছেন—এমন একটি ল্যামিনেশন করা ছবি কিনে সঙ্গে নিয়ে যায়।

উচ্চমাধ্যমিক (১২ ক্লাস) পাশ করে সূর্য আত্মস্থানন্দজীর (G.S. মহারাজের) নির্দেশে বেলুড়ে চলে আসে। মঠে থাকার সুবাদে যে কয়েকবার পূজনীয় মহারাজের দর্শন

লাভ করে। B.A. পড়তে বিদ্যামন্দিরে পাঠান সূর্যকে আত্মস্থানন্দজী (G.S.)। সেখানে বিদ্যামন্দিরে হস্টেলে থাকাকালে একবার মনের বিভিন্ন প্রশ্ন সমন্বিত একটি চিঠি মহারাজকে লেখে। মহারাজ চিঠি পেয়ে সূর্যকে কাঁকুড়গাছিতে ডেকে পাঠান, সূর্য কাঁকুড়গাছিতে গিয়ে মন্দিরে বসে থাকে অনেকক্ষণ বসে বসে ঠাকুরের চিন্তা ও পূজনীয় মহারাজের কথা চিন্তা করে। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ তাকে ডেকে পাঠান। মহারাজের চরণপ্রান্তে উপনিত হয় সূর্য। মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন—কতক্ষণ এসেছো ?

অনেকক্ষণ মহারাজ,—কোথায় ছিলে? মন্দিরে মহারাজ উত্তর দেয় সূর্য, মহারাজ তাকে কাছে ডেকে সবাইকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। সবাই চলে যাবার পর মহারাজের চরণপ্রান্তে বসে থাকা সূর্যকে দুহাত দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মাথায় হাত বুলাতে থাকে। সূর্যের তখন অন্য এক অনুভূতি হচ্ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয় অন্তরে অন্তরে অনুভব করা যায়, তারপর সে মহারাজ কে একের পর এক প্রশ্ন করে,—

প্রশ্নঃ ১) মহারাজ জপ কি যেকোন অবস্থায় করা যায় ?

উত্তরঃ উত্তরে মহারাজ বললেন, যে কোন অবস্থায় করা যায়, তবে সকাল সন্ধ্যা নিয়ম করে বসতে হবে। শুদ্ধ বসনে, শুদ্ধ মনে ও শুদ্ধ আসনে।

প্রশ্নঃ ২) মনতো বসতে চায় না, কি করে মনকে বশে আনবো ?

উত্তরঃ মনের স্বভাবই ঐ রকম, তাকে জোর করে ভগবানের পাদপদ্মে লাগাতে হবে।

প্রশ্নঃ ৩) জপের সময় কি শুধুই জপ করবো নাকি সেই সঙ্গে ঠাকুরকে চিন্তা করবো?

উত্তরঃ ঠাকুরের চিন্তা ও জপ এক সঙ্গেই করতে হবে।

প্রশ্নঃ ৪) ধ্যান কি করে করবো ?

উত্তরঃ দীক্ষার বইতে যে ভাবে বলা আছে, সেইভাবে বইটি ভাল করে পড়ে নিও। সূর্য তখন ধরে বসল, মহারাজ আপনি একটু বলে দিন। উত্তরে মহারাজ বলেন, সোজা হয়ে বসে ঠাকুরের পাদপদ্ম আগে চিন্তা করবে। ধীরে ধীরে মনটাকে পাদপদ্ম থেকে হাত, তারপর শরীর থেকে—সহাস্য মুখমন্ডল চিন্তা করবে। তিনি যেন তোমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন, এইভাবে ধ্যান করার চেষ্টা কর।

আরো অনেক ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলে ও যথাযথ উত্তর পেয়ে সূর্য সেই দিনকার মতো মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে আসে ও সেইভাবে জীবন যাপন করতে শুরু করে, তারপর বহুবার মহারাজের সঙ্গে দেখা হয়েছে ও মহারাজের আশীর্বাদ নিয়েছে সে।

B.A. পাশ করে বিদ্যামন্দির থেকে মঠে চলে আসে, তারপর তাকে বিপ্রভস্ত্র পড়তে হয়। পড়া সাঙ্গ করার পর বরানগরে পোস্টিং হয় তার। সূর্যের ব্রহ্মচর্য দীক্ষা হয় ২০০৪ সালে। দীক্ষা দেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ, অনুষ্ঠানের দিন মহারাজ উপস্থিত ছিলেন, মহারাজকে দেখে সূর্য্যের আনন্দ আরো দ্বিগুণ বেড়ে গেল ও উৎসাহ বোধ করলো। ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠানের পরের দিন সকালে মহারাজের কাছে গিয়ে প্রণাম করে সকল ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে ও মহারাজ সবাইকে ধুতি ও উত্তরীয় দিলেন ও তাঁদের সময় ব্রহ্মচর্যের কথা ও সন্ন্যাসের দিন ভীক্ষার কথা বলেন ও সবাইকে আনন্দ দিলেন। সূর্য সেই আনন্দ ধারনের অংশীদার হয়েছিল।

বরানগর থেকে সূর্য-ট্রেনিং সেন্টারে গিয়েছিল, আর ২০০৪ সালে বরানগরে পোষ্টিং হলো তার। মন খারাপ হলে বেলুড়ে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম ও প্রেসিডেন্ট মহারাজকে প্রণাম করে আসতো, আবার কখনো সে কাঁকুড়গাছিতে ছুটে যেতো মহারাজকে দর্শন করতে।

একবার দক্ষিণ ভারতের তীর্থদর্শন মানসে সূর্য মহারাজকে কাঁকুড়গাছিতে প্রণাম করতে যায়, মহারাজ তীর্থের কথা শুনে খুব উৎসাহ দিলেন ও সেবক মহারাজকে পাথেয় হিসাবে কিছু টাকা দিতে বললেন, 'সূর্য তো আনন্দে আপ্লুত তীর্থ দর্শন করে সূর্য ফিরে মহারাজকে প্রণাম করতে গিয়েছিল হাতে পুরী ধামের প্রসাদ নিয়ে, প্রসাদ পেয়ে মহারাজ ভীষণ খুশি হলেন।

বরানগরে স্বামী সনাতনানন্দজী কয়েকবার মহারাজকে দীক্ষার জন্য নিয়ে এসেছেন। দীক্ষার সময় সূর্যের ভান্ডারের দায়িত্ব থাকত। মহারাজের খাবার জন্য যা কিছু সব সংগ্রহ করে রাখতো, যাতে মহারাজের কোন অসুবিধা না হয়। দীক্ষার দিনগুলিতে মহারাজ অন্য এক রাজ্যে বাস করতেন মনে হতো সূর্যের, নিজের দীক্ষার দিনটির কথা মনে করিয়ে দিত তাকে।

প্রতিদিন প্রণামের সময় সারাক্ষণ মহারাজের কাছে কাছে থাকত এবং মহারাজ যখন হাঁটতে বেরোতেন, সেবকদের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যও সঙ্গে থাকত, অনেক রকমের কথা হতো। মহারাজের কাছে থাকতে সূর্যের ভালো লাগত এই কারণে যে মহারাজের একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল যাতে তাঁর কাছে থাকলে মনের ভিতর খুব আনন্দ হতো। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। অধিকাংশ সময় মহারাজের মুখমন্ডল সর্বদা যেন জ্যোতির্ময় হয়ে থাকতো। দীক্ষার সময় সূর্য মহারাজকে প্রাণভরে সেবা করার চেষ্টা করতো।

মহারাজের আশীর্বাদ ও স্নেহ নিয়ে এবং ঠাকুরের আশ্রমে ঠাকুরের শ্রীচরণ এবং ঠাকুরের আশ্রমে বাকি জীবন কাটানোই সূর্যের একমাত্র প্রার্থনা। মহারাজ ইহধাম ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সূর্য নিজেকে অনাথ বলে মনে করেছিল। ধীরে ধীরে সে মনের অবস্থা কাটিয়ে উঠে মহারাজের আশীর্বাদ ও স্নেহকে পাথেয় করে পথ হেঁটে চলেছে। সন্ন্যাসের সময় ২০০৮ সালে মহারাজের খুবই অভাব অনুভব করেছিল সূর্য। নিত্য তার কথা চিন্তা করে তাঁরই প্রদর্শিত পথে চলার চেষ্টা চালিয়ে দুর্গম পথে হেঁটে চলেছে সে।

করিব সকল বাসনা সকল
গিয়ে তোমার দ্বারে।
দেয় যাতে না মনের বাস না
জনম জনম ধরে।।
কৃপা কর প্রভু (মোরে) ভুলিও না কভু
আমি যে দীন ভিক্ষারী।
পথ দেখাও মোরে একটু দয়া করে
ওগো পথের দিশারী।।
ডাকি না তোমারে তবু তুমি মোরে
আপন করিয়ে নিয়েছ।
চাহি না তোমারে তবু তুমি মোরে
কোলে তুলে নিয়েছ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ
হরি ওঁ তৎসৎ।

আমি না ডাকিতে, হৃদয় মাঝারে

স্বামী রামস্বরূপানন্দ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ।।

"অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তির চক্ষু যিনি জ্ঞানাঞ্জন শলাকা সহায়ে উন্মীলিত করেছেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।" সদ্গুরু যাঁরা হন তাঁরা ইচ্ছা করলেই শিষ্যের জীবন অনায়াসে নিয়ন্ত্রন করতে পারেন। সাময়িকভাবে শিষ্য মূল স্রোতের বাইরে গেলেও সদ্‌গুরু তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে শিষ্যকে পুনরায় সঠিক পথে চালিত করতে পারেন।

১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। তখন স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি সমাজসেবা মূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আমি একজন সক্রিয় কর্মী। স্বামীজির জীবন ও আদর্শকে সবেমাত্র বোঝার চেষ্টা করছি। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে অত জানি না বা তাঁদের জীবন ততটা রেখাপাত করেনি আমার জীবনে (আমারই অজ্ঞতার কারণে)। প্রতিষ্ঠানের একজন সহকর্মী একদিন আমাকে বলল, "তুমি দীক্ষা নেবে? মনসাদ্বীপ আশ্রমে দীক্ষা হবে। যদি তুমি নাও তাহলে আমি যোগাযোগ করে দিতে পারি।" দীক্ষা কি? দীক্ষা নিলে কি হয় কিংবা এর পরিণতিই বা কি? এবং কার কাছ থেকে, কবে, কীভাবে দীক্ষা হবে তার কিছুই আমি জানি না। তথাপি বিশ্বস্ত সহকর্মীর কথাতে আমি রাজি হয়ে গেলাম। প্রতিষ্ঠানের কাজে আমি ব্যস্ত থাকায় দয়াবশত দীক্ষার ফর্মটা সে পূরণ করে দিল। পরম পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের কাছে যথাসময়ে অন্যান্যদের সঙ্গে আমারও দীক্ষা হলো।

সঠিকভাবে জমি তৈরি না করে বীজ বপন করলে সদ্য অঙ্কুরিত বীজটির স্বাভাবিক বৃদ্ধি যেমন ব্যাহত হয় এক্ষেত্রেও তাই হলো। মহামন্ত্রলাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত না থাকায় অতি দুর্লভ গুরুপ্রদত্ত সিদ্ধমন্ত্রও অল্পদিনের মধ্যে স্মৃতির অন্তরালে চলে গেল। গুরুদেবের নাম ও তাঁর মধুর স্মৃতি, মহামন্ত্র কিংবা দীক্ষার পুরো ব্যাপারটাই যেন সব

ভুলে গেলাম। বেশ কয়েকমাস বা প্রায় বছর খানেকেরও বেশি এমনভাবে চলার পর অন্তরের অন্তস্থল থেকে কয়েকটি শব্দ ধ্বনিত হতে থাকল। প্রথম দিকে ব্যাপারটায় কোন গুরুত্বই দিইনি। মনের অন্য অনেক চিন্তা তরঙ্গের মতো এটাও একটি ভেবে এড়িয়ে গেছি বা নিশ্চিন্ত থেকেছি। কিন্তু, যতদিন যেতে লাগল আমার মন ঐদিকে ক্রমশ আকৃষ্ট হতে লাগল। এভাবেও মাস কয়েক কেটে গেল। তখন বুঝিনি আমি যে, এই শব্দ কয়টিই আমার বীজমন্ত্র বা মহামন্ত্র; যেটি পরম পূজ্যপাদ গুরুদেব আমায় কৃপা করে দিয়েছিলেন। ক্রমে 'ঐ মন্ত্র' আমার স্মৃতিতে আরো স্পষ্ট হতে থাকল। এবং একসময় বুঝলাম ঐটি-ই আমার দীক্ষার মন্ত্র। ধীরে ধীরে মন্ত্রদীক্ষার পূর্বস্মৃতি মনে হতে লাগল। একেবারে সমুদ্রের কিনারা থেকে যেন গুরুদেব আমায় টেনে তুলে নিষ্প্রাণ শরীরে মৃত সঞ্জীবনী সুধা প্রদান করে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেন। পুনর্জীবন ফিরে পেলাম। তাই গীতিকারের সুরে বলি—

আমি না ডাকিতে, হৃদয় মাঝারে, নিজে এসে দেখা দিয়েছ।
চির আদরের বিনিময়ে, সখা, চির অবহেলা পেয়েছ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দুহাত পসারি', ধ'রে টেনে কোলে নিয়েছ।।
"ও পথে যেওনা, ফিরে এস", ব'লে কানে কানে কত ক'য়েছ;
(আমি) তবু চ'লে গেছি; ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।।
(এই) চির অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসিমুখে তুমি ব'য়েছ;
(আমার) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে, বুকে করে নিয়ে রয়েছ।।

নির্বোধ শিশু যেমন খেলনা নিয়ে মত্ত থাকে সীমাহীন মাতৃস্নেহকেও বিস্মৃত হয়ে কিন্তু, মায়ের এমনি অহেতুক, অপার স্নেহ যে, খেলায় মত্ত থাকলেও সন্তানকে কখনো স্নেহছায়া হতে বঞ্চিত করেন না। কিসে সন্তানের কল্যাণ হবে তাই নিয়েই মায়ের যাবতীয় চিন্তার আবর্তন। কোলে ফেরা না পর্যন্ত তাঁর চিন্তার অন্ত নেই। ঠিক এভাবেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু গুরুদেব আমায় সঠিক পথে নিয়ে এলেন। এখন একথা আমার মনে হলে তাঁর মহত্তের দিকটা যে কতটাই বিশাল তা ভেবে আমি বিস্মিত হই। শুনেছিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে গুরুর আসনে যিনি যখন থাকেন তাঁর মাধ্যমে বা তাঁকে কেন্দ্র করে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণই কাজ করেন। কথাটা অন্য অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হলেও আমি আমার জীবনে তা প্রত্যক্ষ করলাম। এখন আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

এক ব্যক্তি খুব অর্বাচীন ধরনের ছিল। একজন মানুষ আর একজনকে দীক্ষা দেবেন—এটা কিছুতেই মানতে রাজি নয়। দীক্ষাগুরুর ক্ষমতা সম্পর্কে ও তার নানান

প্রশ্ন ছিল। মনে মনে সে ঠিক করেছিল দীক্ষার ঘরে গুরুদেবকে সরাসরি উল্টা-পাল্টা প্রশ্ন করে বিবৃত করার বা (তাঁকে) হেনস্তা করার। দীক্ষার দিন দীক্ষার ঘরে অন্যদের সঙ্গে সেই ব্যক্তিও পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী বসে। গুরুদেব শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে ভাববিহ্বল চিত্তে সেবকদের সহায়তায় দীক্ষার ঘরে প্রবেশ করলেন। দীক্ষার ঘরের শান্ত ও পবিত্র পরিমন্ডল, নবাগত মুমুক্ষুদের ভক্তিবিনম্র সশ্রদ্ধ আত্মনিবেদন এবং সর্বোপরি মহারাজের আধ্যাত্মিক শক্তির উজ্জ্বল উপস্থিতি সবমিলিয়ে ঘরে এক অবর্ণনীয় ঈশ্বরীয় আবেশের সৃষ্টি হলো। মহারাজ ধীরে ধীরে নিজ আসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর গুরু মহারাজের শান্ত-সৌম্য-স্মৃতিহাস্য-প্রদীপ্ত মুখমন্ডল ও তাঁর অফুরন্ত স্নেহমাখা স্নিগ্ধভাবের সুন্দর চাহনি দেখে সেই ব্যক্তির মনের যাবতীয় প্রশ্ন নিমেষে অন্তর্হিত হলো। পাশে বসে থাকা পরিচিত ব্যক্তি বারংবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেও 'ঐ ব্যক্তি'র আর কোন প্রশ্ন মুখ থেকে বেরোল না। পরে সে বলেছিল, "মহারাজকে দেখে আমার সমস্ত প্রশ্ন কোথায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল। কোন প্রশ্নই আর মনে আসছিল না। সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল।"

পূজ্যপাদ মহারাজ কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান মঠে (১৯৯৭ খ্রীঃ) আছেন। একজন ভক্ত শারীরিক অসুস্থতার কারণে সুচিকিৎসা লাভের উদ্দেশ্যে গ্রামের সেন্টার থেকে গিয়ে যোগোদ্যান মঠে কয়েকদিন ছিলেন। ইতিমধ্যে একাধিক চিকিৎসক পরীক্ষা করে ঔষধ দিয়েছেন; চিকিৎসা চলছে। বেশ কিছু টাকাও ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু, রোগীর কোন সন্তোষজনক উন্নতি হয়নি। ঘটনাচক্রে মহারাজের দৃষ্টি একদিন ঐ রোগীর প্রতি পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ মহারাজ নিকটবর্তী সেবককে বলেন, "আরে একে এখানে রেখেছ কেন? এক্ষুনি একে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করো।" মহারাজের আদেশানুসারে সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো হলো। এবং সেখানকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগীর অবস্থানুযায়ী অবিলম্বে তার ব্রেণ অপারেশন করেন। এভাবে সেযাত্রায় গুরুতর অবস্থা থেকে রোগী নিষ্কৃতি লাভ করে। জাগতিক ব্যাপারেও যে মহারাজের কি অদ্ভুত সঠিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল তা ভেবে অবাক হতে হয়।

১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দের আর একটি ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদানের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে আমি চলে এসেছি। কিন্তু, এই বিরাট সঙ্ঘে যোগদানের পদ্ধতি, নিয়ম-কানুন কিংবা সন্ন্যাসীদের জীবন-যাত্রা সম্পর্কে বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতাই ছিল না। একেবারেই নবীন। আমার ধারণা ছিল সবকিছু পরিত্যাগ করে একেবারে নিঃস্ব হয়ে দীনভাবে এ মহৎ কাজে যেতে হয়। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কথা। সংসারের যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তিনি মস্তক মুন্ডন

করেছিলেন। আর মনে পড়ল স্বামীজির কথা। একদা শরৎচন্দ্র গুপ্ত (স্বামী সদানন্দ) স্বামীজির সঙ্গে যেতে চাইলে স্বামীজি তাঁকে একটি কবিতার ছন্দে বলেছিলেন—

"বিদ্যা যদি লভিতে চাও,
চাঁদমুখে ছাই মাখো
নইলে এই বেলা পথ দেখো।'

আমি এসব ভেবে শ্রীধাম নবদ্বীপে মস্তক মুন্ডন করে গঙ্গায় স্নান সেরে সোজা যোগোদ্যানে গুরুদেবের সমীপে উপস্থিত হলোাম। আমাদের দেখে গুরুদেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসিতে কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর তাঁর নিকট আসার কারণ জানতে চাইলেন। প্রণাম করে আমি অতি বিনীতভাবে আমার প্রার্থনা নিবেদন করলাম। তিনি সব শুনলেন এবং আমার সদ্য মুণ্ডিত হওয়া মস্তক দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। "সঙ্ঘে যোগ দিয়ে সন্ন্যাস জীবন- যাপন করব বলে মাথা মুন্ডন করে এসেছি।"—আমি অকপটে উত্তর দিলাম। শুনে মহারাজ কৌতূহলোাক্রান্তের ন্যায় বললেন (খানিকটা বিস্ময় জড়ানো স্বরে), "সঙ্ঘে যোগ দিতে এলেই মাথা মুন্ডন করতে হয় ?" "হ্যাঁ ! সবাইতো তাই-ই করে (আমার তখনো পর্যন্ত ধারণা ছিল সবাইকে এরকমই করতে হয় এবং এটাই স্বাভাবিক)।"—সরলভাবে (আনন্দের সহিত) উত্তর দিলাম আমি। আমার কথা শেষ হতে না হতেই মহারাজ (একটু অসন্তুষ্ট হয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "তুমি জান সবাই তাই করে? যদিবা মাথা মুন্ডন করলে শিখা রাখলে না কেন? তুমি কি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছ?" শিখাই বা কেন রাখতে হয়, সম্পূর্ণ মাথা মুন্ডন করলে দোষেরই বা কি? কিছুই আমার বোধগম্য হলো না। তথাপি তাঁর দৃষ্টিতে আমি বেশ গর্হিত কাজ করে ফেলেছি (সেটা অনেক পরে বুঝলাম)। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে তখন বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে, আমার ঠিক কি করা উচিৎ। অবশেষে পূজ্যপাদ মহারাজ পাশে দাঁড়ানো সেবককে ডেকে বললেন, "অ্যায়! দেখ, ছেলেটি কি বলছে? সঙ্ঘে যোগ দেবে বলে মাথা মুন্ডন করেই এসেছে। তুমি একটি চিঠি লিখে একে বেলুড় মঠে পাঠিয়ে দাও। ওরা (সাধারণ সম্পাদক ও সহ সম্পাদক মহারাজ) যা করার করবে।" যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে অত্যন্ত আগ্রহভরে আসা, তা যে আপাতত সফল হচ্ছে না, সেটি আমার আর বুঝতে বাকি রইল না। অগত্যা! বিফল মনোরথ হয়ে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পূজ্যপাদ গুরু মহারাজকে প্রণাম করে দীশাহীন অবস্থায় ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এবং কিছু পরে সেবক মহারাজ এসে চিঠিটিও দিয়ে গেলেন । বলাবাহুল্য, ঘটনাপরম্পরাক্রমে অনেক পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা কৃপা করে তাঁদের পবিত্র সঙ্ঘে অর্থাৎ বেলুড় মঠে 'এ দাস'কে স্থান করে

দিয়েছেন।

উদ্দেশ্য মহৎ হলেও পুরো ঘটনাটিতে আমার অজ্ঞতা এবং একটা জেদি ভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন গুরু মহারাজের তা বুঝতে দেরি হয়নি। তাই তিনি আমাকে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তখনকার মতো সরাসরি নিজে গ্রহণ না করে বেলুড় মঠে পাঠিয়ে দিলেন। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটি বেদনাদায়ক হলেও এর ফল সুদূরপ্রসারী। শিষ্যকে কোন্ পথ দিয়ে নিয়ে গেলে তার কল্যাণ হবে তা একমাত্র সদ্‌গুরুই জানেন। তখন আমারও মন কেঁদেছিল কিন্তু, এখন বুঝতে পারছি এর মাধ্যমে আমার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে। না হলে আমার জীবনে আরো অনেক অপূর্ণতা থেকেই যেত।

'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা হেরিনু নয়ন মেলিয়া এনেছ তোমার দুয়ারে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবানুরাগী একজন একনিষ্ঠ ভক্ত আশ্রমে স্থায়ীভাবে থেকে স্বেচ্ছায় সেবা দেওয়ার জন্য বেলুড় মঠের একটি শাখা কেন্দ্রে রওনা হওয়ার পূর্বে পূজ্যপাদ মহারাজের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করে, এবং আশ্রমে কিভাবে থাকতে হবে সে ব্যাপারে উপদেশ পেতে ইচ্ছা করে। উত্তরে মহারাজ যে তিনটি মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন তা হলো—১। আশ্রমে থেকে নিয়মিত জপ-ধ্যান করবে। ২। যত কাজ থাকুক না কেন রোজ কিছু না কিছু সৎগ্রন্থ পাঠ করবে। ৩। কোনপ্রকার আশ্রম রাজনীতিতে যোগ দেবে না এবং এমন কোন অভ্যাস করবে না যার জন্য অন্যের কাছে হাত পাততে হবে। বলাবাহুল্য, মহারাজের উপদেশ মাথায় নিয়ে এই ভক্ত দীর্ঘদিন সাধুজীবন-যাপন করে ব্রহ্মচর্য ও পরে সন্ন্যাস নিয়ে আজও সঙ্ঘের সেবা করে চলেছে।

পূজ্যপাদ মহারাজের কাছে মন্ত্রদীক্ষালাভের পর প্রায় সাত বছর মহারাজের সঙ্গে দীক্ষার মন্ত্রের ব্যাপারে আর কোন কথা হয়নি। বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে থাকাকালীন নিয়মিত জপ-ধ্যান করলেও মন্ত্র ঠিক ঠিক উচ্চারণ হচ্ছে কিনা, একদা আমার এই বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হলো । সন্দেহ নিরসনের জন্য একদিন (১২।০৩।০৩) একান্ত নিভৃত আলাপে মহারাজকে বীজমন্ত্রটি আবৃত্তি করে শোনালাম। শুনে মহারাজ তাঁর সম্মতি জানালেন। এবং তিনিও একাধিকবার উচ্চারণ করে মন্ত্রের প্রতিটি শব্দের অর্থসহ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এমনভাবে শোনালেন যে, সেই সুমধুর দৃশ্য আজও আমার স্মৃতিপটে জ্বল জ্বল করছে। এছাড়া ধ্যান সম্পর্কেও কথা হলো। সবশেষে বললেন, "সর্বদা একটি নিয়ম করে চলবে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যা (যে কাজ) কর একটি রুটিনের মতো করে করবে।"

২১ ডিসেম্বর, ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ। মহারাজ আজ আমাকে জপের মালা শোধন করে দিলেন এবং জপ কীভাবে করব মালাতে নিজে জপ করে দেখিয়ে দিলেন। জপ করার পর জপ ও জপের ফল কি করতে হবে এবং সেই সময় নিজের ভাবটি কি হওয়া উচিৎ সে সমস্ত সবিস্তারে বললেন। সাধন-ভজন সম্পর্কে অনেক কথা হলো। কিন্তু, তার বেশিরভাগই একান্ত ব্যক্তিগত। তার মধ্যে দু-একটি এখানে উল্লেখ করছি।

"মনে মনে জপ করা অভ্যাস করবে। অভ্যাস করতে থাকলে—সর্বদা জপ করা ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াবে। রাত্রিতে আগে শুলে তাহলে ভোরে আর সাধনায় ব্যাঘাত হবে না।" "ধ্যান ধীরে ধীরে বাড়াবে। তাঁর (ইষ্টদেবতার) চিন্তা করতে করতে তাঁর প্রতি ভালবাসা ও ব্যাকুলতা আসে। শুতে যাবার আগে একটু স্মরণ-মনন করে শোবে। শ্রীশ্রীমাকেও ধ্যান করতে পার। শ্রীশ্রীমা ছেলেদের কথা খুব শোনেন। একবার মা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীঠাকুরের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় অশুদ্ধ স্বভাবা এক রমণী 'মা'বলে ডেকে খাবার থালাটি শ্রীশ্রীমায়ের হাত থেকে নিয়ে শ্রীঠাকুরকে দেয়। তাতে শ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, 'আমি যার-তার হাতে খেতে পারি না। তুমি কেন একে দিয়ে খাবার পাঠালে?' শ্রীশ্রীমা উত্তরে বলেছিলেন, 'আমাকে কেউ মা বলে ডাকলে আমি তা না করতে পারব না।' শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃ হৃদয়। মায়ের কাছে ভাল-মন্দ সব সন্তানই সমান। তাই এখানে শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃ হৃদয়ের কাছে শ্রীঠাকুরও হার মানলেন। শেষে তিনি খেলেনও। শ্রীঠাকুর খুশিও হয়েছিলেন এইজন্য যে, শ্রীশ্রীমা নিজে থেকেই জগতের সমস্ত সন্তানদের ভার সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। তাই মাকে ডাকবে। মাতৃহৃদয় মা ডাকে স্থির থাকতে পারেন না। তিনি সবাইকে দেখেন আপন সন্তানের মতো। তাঁর কাছে ভাল-মন্দ নেই।" ব্যাকুলতা বাড়ানোর প্রসঙ্গে মহারাজ বললেন, "স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে যেখানে যেখানে ব্যাকুলতার কথা আছে সেগুলি একত্র করে পড়বে।"

২০০৪ খ্রীষ্টাব্দের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত। বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের বাম দিকে বড় প্যান্ডেলে দুর্গা পূজা চলছে। আমরা ব্রহ্মচারীরা (আমি তখন ব্রহ্মচারী) মন্ডপের ডানদিকে বসে কালীকীর্তন গাইছি। মন্ডপের সামনে ও বামদিকে কয়েক হাজার ভক্ত বসে। মহারাজ ধীরে ধীরে এসে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীকে প্রণাম করে মন্ডপের বামদিকে সামনের কোণে রাখা নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে মায়ের দিকে মুখ করে বসলেন। বসেই পাঞ্জাবীর পকেট থেকে গঙ্গা জলের শিশি বের করে মুখে, মাথায় ও হাতে জল ছিটালেন। কাঁধের উত্তরীয়টি নীচের দিকে প্রসারিত করলেন এবং উত্তরীয়-র আড়ালে ডান হাতে জপের মালাটি নিয়ে

বুকের কাছে আনলেন। তারপর অপরূপসাজে সজ্জিতা জগজ্জননীর ভুবনভরা জ্যোতির্ময়ী রূপটি একবার ক্ষণেকের জন্য দর্শন করেই চোখ দুটি বন্ধ করলেন এবং মুহূর্তে জপের মধ্যে ডুবে গেলেন। তাঁর উন্নত মস্তকটি সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে। সমস্ত শরীর স্থির, যেন স্পন্দনহীন কিন্তু তাঁর প্রশান্ত, দীপ্ত মুখমন্ডলে উজ্জ্বল আভা যেন ভেতর থেকে বাইরে ঠিকরে বেরোচ্ছে। মন্ডপে পূজারীর সশব্দ মন্ত্রোচ্চারণ, ব্রহ্মচারীদের ছন্দবদ্ধ সঙ্গীত ও হাজার হাজার ভক্তদের কোলাহলের কোন শব্দই তাঁর প্রশান্ত মনের গভীর নির্জনতায় যেন কোন ব্যাঘাত-ই ঘটাতে পারল না। ক্ষণেকের জন্য গানের কলিতে বিস্মৃত হলোাম আমি। মহারাজের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম স্বামীজির কথা—"আদর্শ পুরুষ তিনিই, যিনি গভীরতম নির্জনতা ও নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন। তিনি সংযমের রহস্য বুঝিয়াছেন—আত্ম সংযম করিয়াছেন। যানবাহন-মুখরিত মহানগরীতে ভ্রমণ করিলেও তাঁহার মন শান্ত থাকে, যেন তিনি নিঃশব্দ গুহায় রহিয়াছেন, অথচ তাঁহার মন তীব্রভাবে কর্ম করিতেছে। কর্মযোগের ইহাই আদর্শ" ("বাণী ও রচনা", ১।৪৩)। তিনিই আদর্শ যোগী।

"আমি না ডাকিতে, হৃদয় মাঝারে, নিজে এসে দেখা দিয়েছ।"

কে এই যোগী? আমি না ডাকা সত্ত্বেও, (আমার) চির অবহেলার বিনিময়েও যিনি হৃদয় মাঝারে এসে নিয়ন্ত্রন করছেন? (আমার) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে, বুকে করে নিয়ে রয়েছেন ? মুহূর্তে প্রশ্ন এল মনে। উত্তরও এল সঙ্গে সঙ্গে—যিনি আমার নিয়ন্তা ইষ্টদেবতা, তিনি যোগের সমস্ত রহস্য অবগত আছেন এবং তিনিই বর্তমানে কৃপা করে পরম গুরুরূপে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। গুরু ইষ্ট অভিন্ন সত্তা। শিষ্যকে ভবসাগর অতিক্রমণের পথ বলে দিতে স্বয়ং ইষ্ট-ই আজ গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

অমূল্য স্মৃতি

স্বামী শ্রীমোহনানন্দ

জয়পুর থেকে আমরা তিনজন দীক্ষার্থী দিল্লী আশ্রমে গিয়েছিলাম পরম পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের কাছে দীক্ষার উদ্দেশ্যে। আমাদের দীক্ষার পূর্বদিন তাঁকে প্রণাম করার পর কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ হয়েছিল। আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন শুনে মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা সব কি বিজ্ঞানের ছাত্র?" আমরা তিনজনই হ্যাঁ বলাতে তিনি বললেন, 'বিজ্ঞানে যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে আসতে হয়, তেমনি [আধ্যাত্মিক পথেও] পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্তে আসতে হয়।'

আমি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করার কিছুদিন পর পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ চেন্নাই মঠে মন্ত্রদীক্ষা দান করতে এসেছিলেন। সেই সময় কয়েকদিন তাঁর সঙ্গলাভ করি। প্রতিদিন ভোর বেলায় মহারাজ মন্দিরে আসতেন। তারপর তিনি ধীরে ধীরে মন্দির-পরিক্রমা করতেন। একদিন মন্দির- পরিক্রমা করার সময় আমি নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মহারাজকে বললাম, 'মহারাজ, দীক্ষা সম্বন্ধে আমার কোন কিছু ধারণা না থাকা সত্ত্বেও আমি দীক্ষা নিয়েছি। এখনও আমার কাছে যেন বিষয়টা স্পষ্ট নয়।' মহারাজ নিজের ভাবে মন্দির-পরিক্রমা করছিলেন। আমার কথার উত্তরে তিনি শুধু বললেন, 'দীক্ষার তাৎপর্য্য গহন।'

২০০৩ সালের কথা। সেই সময় আমি বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রয়েছি পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে এলে স্বামীজির ঘরের পাশের ঘরটিতে থাকতেন। মহারাজ মঠে এসেছেন শুনে একদিন আমি তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করতে গেলাম। প্রণাম করে আমি মহারাজের কাছ থেকে জপ-মালা নেবার জন্য প্রার্থনা জানালাম। পরে তিনি আমাকে মালা শোধন করে দেন ও মালায় জপ করার বিধি বলে দেন। তখন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি কি জান, ঠাকুরের গায়ের রং কেমন?" একটু থেমে নিজেই বললেন, "সোনার মতো"।

গুরুসঙ্গে কয়েকদিন

স্বামী দেবতত্ত্বানন্দ

১৯৯৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর মনে বিশেষ সংকল্প নিয়ে বেলুড় মঠে যোগদান করেছিলাম। ঐ বছরেই অক্টোবর মাসের শেষের দিকে উড়িষ্যার জগৎসিংপুর জেলায় সুপার সাইক্লোন অধ্যুষিত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণের আরম্ভ করেছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমার মতো একজন অতিসাধারণ ব্রহ্মচারী, ৪/৫জন বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী মহারাজের সঙ্গে ঐ সেবাকার্যে যোগ দেবার বিশেষ সুযোগ পাই এবং উড়িষ্যায় ঐ সেবাকাজে নিজেকে নিযুক্ত করে খুবই আনন্দ পাই।

সেই সময় আমার গুরুদেব পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ দীক্ষাদানের জন্য ভুবনেশ্বর মঠে যান। তখন স্বামী গোপালানন্দজী মহারাজ সেবাকার্যের সংযোজক ছিলেন এবং সেবা শিবিরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন পূজনীয় স্বামী পরসুখানন্দজী মহারাজ, আমার গুরুদেবের ভুবনেশ্বরে আসায় ত্রাণকার্যের সংযোজক মহারাজ শিবিরের ভারপ্রাপ্ত মহারাজকে বললেন, “পূজ্যপাদ মহারাজ এখন ভুবনেশ্বরের মঠে, উনি ননী গোপালের দীক্ষাগুরু ওকে গুরুসঙ্গ লাভের উদ্দেশ্যে ৫/৭ দিনের জন্য ভুবনেশ্বরে পাঠিয়ে দাও। সেইসময় আমি পূজনীয় অরবিন্দ মহারাজের নির্দেশমতো পূজ্যপাদ মহারাজ মহারাজের আহার গ্রহণের পর থালা, গ্লাস ইত্যাদি ধুয়ে দিতাম, এছাড়াও কিছু কিছু সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। একদিন পূজ্যপাদ মহারাজের সেবা করার বিশেষ সুযোগ পেয়েছিলাম ওঁরই সর্বসময়ের সেবক পূজনীয় অরবিন্দ মহারাজের নির্দেশে। পূজ্যপাদ মহারাজের একটি কথা আমার জীবনে পরম আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে আমার মনে গেঁথে আছে। দুপুরে বিশ্রাম নেওয়ার আগে অরবিন্দ মহারাজ পূজ্যপাদ মহারাজের সেবা করছেন। আমি ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে আছি আদেশের অপেক্ষায়, আমাকে উদ্দেশ্য করে পূজ্যপাদ মহারাজ অরবিন্দ মহারাজকে বললেন, “ছেলেটি খুবই সরল,” এই তিনটি শব্দই আমার জীবনে পরম আশীর্বাদ ও বিশেষ সম্পদ হিসাবে রক্ষিত আছে।

গুরুর সঙ্গে তীর্থভ্রমণ শিষ্যের জীবনের একটি দুর্লভ সুযোগ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর কৃপায় এই দুর্লভ সুযোগটি ঐ সময় আমার জীবনে ঘটেছিল। পূজ্যপাদ মহারাজ ভুবনেশ্বর থেকে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে যাবার মনস্থ করেন। সেইমতো একদিন বিকেলে পুরী রামকৃষ্ণ মিশনে যাবেন, তারপর মন্দির দর্শন ও প্রণাম ইত্যাদি এবং সর্বশেষে রাতের প্রসাদ পুরী রামকৃষ্ণ মঠে গ্রহণ করে ভুবনেশ্বরে ফিরবেন। আমিও পূজ্যপাদ মহারাজের সঙ্গে যাওয়ার ও থাকার বিশেষ সুযোগ পেয়েছিলাম।

পুরী মিশনে বিকেল বেলায় সামান্য জলযোগের সঙ্গে চা খেয়ে মন্দিরে যাওয়ার কথা ছিল। মন্দির কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি সংবাদ পাঠিয়ে অনুরোধ করেন ৩০ মিনিট পরে মন্দিরে যাওয়ার জন্য। পূজ্যপাদ মহারাজ বললেন, "আমাদের তীর্থ দর্শনের নির্দিষ্ট সময়েই আমরা যাব সমুদ্র সৈকত ও মহাতীর্থস্থান।" ঐ ৩০ মিনিট আমরা সমুদ্র দর্শন করে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। পূজ্যপাদ মহারাজের আদেশমতো আমরা প্রায় ২৫ জনের মতো সাধু ও ভক্ত ৫/৬ টি গাড়ীতে করে মন্দির কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময়ে মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথ মহাপ্রভু ও অন্যান্য দেবদেবীর দর্শন করলাম।

আমার একটি তোয়ালেজাতীয় আসন অরবিন্দ মহারাজ দিয়েছিলেন, পূজ্যপাদ মহারাজের ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে। পূজ্যপাদ মহারাজ প্রতিটি মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করার পর পাশেই কোন ফাঁকা জায়গাতেই বসতেন, ওই তোয়ালে আসনটি পেতে, তার উপর বসে জপ করতেন, এইভাবে প্রায় ২ঘন্টা ধরে দর্শন প্রণাম ও জপ করে আমরা সবাই পুরী মঠে গেলাম। সেখানে জগন্নাথ মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। পূজ্যপাদ মহারাজ প্রসাদ গ্রহণ করার পর আমরাও সবাই প্রসাদ পেলাম। রাত্রি প্রায় ১০টা নাগাদ ভুবনেশ্বর মঠে ফিরলাম।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

বাঃ তোমার সৌভাগ্য

স্বামী ধ্যাননিষ্ঠানন্দ

চেরাপুঞ্জীতে Join করি। কাছা দেওয়া ব্রহ্মচারী, আমাদের বেশ কিছুদিন হয়েছে প্রায় বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, তখন স্বামী গহনানন্দ মহারাজ সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ ছিলেন। চেরাপুঞ্জীর আশ্রমে গেছেন দীক্ষার জন্য। দীক্ষা মানে ওখানে সব ট্রাইবাল ওই হাজং এসব অনেক দূর দূর থেকে আসে আমাদের শোভারপুঞ্জির কিছু আছে কিছু কালাটেবল বলে একটা গ্রাম আছে সেখানে বাঙালী আছে, ঠিক বাংলাদেশের বর্ডারের গায়ে গায়ে, সেখান থেকে দীক্ষা নিতে আসে। দীক্ষার্থী খুবই কম। আমারই সমস্ত কিছু চেরাপুঞ্জীর আশ্রম থেকে Everything মানে মহারাজকে যে প্রসাদীধুতি দেওয়া হবে, ঠাকুরকে প্রণামী, ফল সব আমরাই যোগাড় করে থালা সাজিয়ে রাখি। যেহেতু ওখানে কোন ব্রহ্মচারী নেই মাত্র আমরা দুজন ব্রহ্মচারী Join করি। আমার কাজ ছিল অর্ঘ্য দেওয়া দীক্ষার আগে, চেরাপুঞ্জীর মন্দির যেমন হয় ফুল কম থাকে, কিন্তু মহারাজ দীক্ষা দেবেন বলে ফুল এসেছে। অর্ঘ্য সাজালাম। মহারাজকে নিয়ে হাসি গল্প সব হয়েছে, কিন্তু দেখলাম যখন মহারাজ মন্দিরে গেলেন মহারাজের মুখ একদম লাল, মানে এইরকম মহারাজের মুখ আমি প্রথম দেখলাম। হাতে অর্ঘ্য দিয়েছি যেন জীবন্ত ঠাকুরকে দেখছেন। আমার মনে আছে বিকাশ মহারাজ ছিলেন, আর পাশে সপ্তর্ষি মহারাজ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোন কথা নেই।

প্রথম অর্ঘ্য দিলাম পাঁচ মিনিট সাত মিনিট দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি তো কাঁপছি কিন্তু কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমার ভিতর থেকে খুবই আনন্দ হচ্ছে মহারাজকে দেখছি, মহারাজ গম্ভীর যেমন করে মা ঠাকুরকে দেখলে হয়। মহারাজ আস্তে করে ঠাকুরকে অর্ঘ্য দিলেন, প্রথম অর্ঘ্য দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলেন।

তারপর মা কে অর্ঘ্য দেবেন, মহারাজকে দিচ্ছি মহারাজ আমার চোখে চোখ ফেললেন, ওই চোখটাতে দেখলাম মহারাজ আমাকে দেখলেন তারপর মাকে দিলেন। আমি আর কিছু বলিনি আস্তে করে শুধু দেখছি মহারাজ কেমন করে দিচ্ছেন, খুব সুন্দর করে মা কে দিলেন। প্রণাম করলেন অনেকক্ষণ। তারপর স্বামীজিকে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ মহারাজ হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে দীক্ষার্থী চলে এল। আমাদের কাজ শেষ আমরা চলে এলাম। তারপর অনেকক্ষণ পরে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে দেখছি মহারাজ ঘরে একা আমাকে ডাকলেন, ডেকে কি একটা মহারাজের কাছে কাপড়ে জড়ানো ছিল আমাকে ডেকে বললেন, "বাঃ, তোমার সৌভাগ্য।"

স্মৃতিকথা

স্বামী ধৃতিরূপানন্দ

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ যোগোদ্যান-এ থাকাকালীন তাঁর অনুপ্রেরণায় বেশ কয়েকজন যুবক সঙ্ঘে যোগদান করেছেন। সেই সময় আমারও তাঁর কাছে কয়েক বছর থাকার ও তাঁকে অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। মহারাজ সম্পর্কিত আমার স্মৃতি নানা রকমের, কিছু ব্যক্তিগত আর কিছু স্মৃতি তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে। ব্যক্তিগত স্মৃতিগুলি তো প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কেবল তাঁর কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করছি।

মহারাজের জপ-নিষ্ঠা ছিল অনুকরণীয়। সব কাজ সেরে মহারাজের রাত্রে শুতে প্রায়দিনই অনেক দেরি হয়ে যেত। তবুও রোজ প্রায় রাত তিনটার সময় উঠে হাঁত-মুখ ধুয়ে জপে বসে যেতেন। তাঁর সাথে ট্রেনে একই কামরায় রাত্রে থাকার সুযোগ হয়েছে কয়েকবার। তখনও দেখেছি ভোরে উঠে যথারীতি হাত-মুখ ধুয়ে জপে বসে যেতেন। কোন অবস্থাতেই এর ব্যতিক্রম দেখিনি। বৃদ্ধ শরীরেও তিনি এক আসনে স্থির হয়ে বসতে পারতেন দীর্ঘক্ষণ, একচুলও নড়াচড়া নেই। মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর বিরাজ করছেন—জীবন্ত, জাগ্রত, এই ছিল তাঁর ভাব। ঠাকুর-সেবা যাতে ঠিকভাবে হয় সেদিকে মহারাজ ছিলেন সদা সতর্ক। যোগোদ্যানে থাকাকালীন দেখেছি, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের প্রসাদ সব একটু করে চেখে দেখতেন। সেবককে বলতে হবে কি কি পদ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেওয়া হয়েছে। কোন ত্রুটি তাঁর নজরে এলে সঙ্গে সঙ্গে ভাণ্ডারি ও পাচককে ডেকে সতর্ক করে দিতেন। প্রত্যেকটি কাজের খুঁটিনাটি বিষয়ে মহারাজ খুব গুরুত্ব দিতেন। কোথাও বাইরে যাওয়ার সময় কম্পাস নিয়ে যাওয়া হত। কম্পাসের কাটার নির্দেশ অনুসারে তিনি কোন দিকে মাথা রেখে শোবেন বা জপে বসবেন তা স্থির করতেন। জুতা খুলে যথাস্থানে সমান ভাবে রেখে তবে শান্তি। যতই তাড়াহুড়ো হোক, মহারাজকে কখনই যেমন তেমন ভাবে জুতা রাখতে দেখিনি। ঘরে

তাঁর ব্যবহারের জিনিসপত্র সব রুচিসম্মতভাবে গোছানো থাকবে, এইটি তিনি পছন্দ করতেন। একটু এদিক ওদিক হলে সেবককে সচেতন করে দিতেন। যতই রাত হোক শোবার আগে টেবিলের উপর রাখা সব জিনিসপত্র গুছিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখে তবে শুতে যেতেন। এসবের মধ্যে তাঁর সৌন্দর্য্যবোধ প্রকাশ পেত। মহারাজের জামা-কাপড় সবসময় নিখুঁত ভাবে ভাঁজ করা থাকত। জামার সব বোতামগুলি লাগানো থাকবে ও ধুতির দুটো পাড় সমান থাকবে। এইরূপ না হলে ধুতির অসমান পাড় দুটি দেখিয়ে আমাদের সতর্ক করে দিতেন। এই সব খুঁটিনাটি বিষয়ে এত গুরুত্ব দেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে চাইলে মহারাজ বলতেন,

"আমাদের প্রভু কত Perfect ছিলেন। এদিকে মুহুর্মুহু সমাধিমগ্ন হচ্ছেন, কিন্তু সব ব্যাপারে কত নিখুত।"

একদিনের ঘটনা। মহারাজ বেলুড় মঠে এসেছেন অছি পরিষদের মিটিং-এ যোগ দিতে। সকালে স্নানের পর যথারীতি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে যাবেন মন্দিরে। তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। মহারাজ সে-সময় খড়ম পরে মন্দিরে যেতেন। আমি মহারাজকে বার বার বোঝাচ্ছি, "মহারাজ, প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে, ভিজে যাবেন।" মহারাজ শান্তভাবে আমার কথা শুনলেন মাত্র। তারপর বলছেন, "চলো না, দেখা যাক" এই বলতে বলতে নীচে নেমে গাড়িতে উঠে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াল। আমি ছাতা হাতে নীচে নামতে না নামতেই ভিজে গেলাম। এ অবস্থায় খড়ম পরে হাঁটতে মহারাজের বেশ অসুবিধা হবে ও তিনি ভিজে যাবেন। এই সব ভেবে আবার বললাম, "মহারাজ, শুধু গাড়ি থেকে নেমে আসতেই আমি এতটা ভিজে গেছি।" মহারাজ কি যেন ভাবতে লাগলেন। ভাবলাম ওঁকে নিরস্ত করা গেল কিন্তু পর মুহুর্তে মহারাজ জোর দিয়ে বলে উঠলেন, "পরিস্থিতি বিপরীত বলে কি যা উচিত তা করব না?" বলেই গাড়ি থেকে নেমে মন্দিরের দিকে চললেন খড়ম পরে। যাঁরা মহারাজের সঙ্গ লাভ করেছেন ও তাঁর সঙ্গে কাজ করার যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা সকলেই জানেন যে তিনি কিভাবে সারাটা জীবন দৃঢ়তার সঙ্গে বিভিন্ন বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছেন পরম লক্ষ্যের দিকে।

পূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজের পূণ্যস্মৃতি

স্বামী একরূপানন্দ

১৯৯৬ সালে প্রথম পূজনীয় মহারাজের সাথে আমার পরিচয়। পরিচয় বলতে একজনের ঘরে মহারাজের একটি ছবি দেখা। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদানের পর অনেকবার মহারাজের সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ হয়েছিল। তার কিছু খণ্ডচিত্র তুলে ধারার চেষ্টা করছি। উত্তরপূর্ব ভারতের সাথে পূজনীয় মহারাজের ছিল গভীর সম্পর্ক তা আমরা নানা পুস্তক ও প্রবন্ধে অবগত আছি। উত্তরপূর্ব ভারতে দীর্ঘকাল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাথে জড়িত থাকার ফলে সেখানকার মানুষের হৃদয়ে পূজনীয় মহারাজের স্থান কোথায় তা অনুভব করার সুযোগ হয়েছে। এই প্রবন্ধে আমার ব্যক্তিগত স্মৃতি ও উত্তরপূর্ব ভারতের প্রতি মহারাজের ভালোবাসার কয়েকটি খণ্ডচিত্র চিত্রায়ণে ব্রতী হলোাম।

উত্তরপূর্ব ভারতের শিলং-এ মহারাজ সাড়ে চার বছর সেবাদান করেন। তিনি ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত শিলং মিশনে ছিলেন। স্বামী সৌম্যানন্দজী মহারাজ সম্পাদক আর গহনানন্দজী মহারাজ সহ-সম্পাদক। সে সময় শিলং মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজে মহারাজকে স্থানীয়দের সাথে মেলামেশা করতে হতো। পরে রিলিফের কাজে ও গ্রামে গ্রামে পাঠ-আলোচনা করতে গিয়ে সেখানকার জনজাতিদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ হয়। সেসময় খাসিয়াদের জীবনযাত্রা, সুখদুঃখ, উৎসব ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হন। তাঁর ধীরস্থির, শান্ত, মধুর ও মিত ভাষার জন্য সকলের প্রিয় হয়ে উঠেন। বিশেষত সেখানকার জনজাতিদের করুণ অবস্থা দেখে তাঁর প্রাণ কাঁদতো। তিনি তাদের সেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। অতি অল্পসময়ে আসাম ও মেঘালয়ের মানুষের আপন হয়ে উঠেছিলেন, আর মাহারাজও সে সময়ের মধ্যে ঐ অঞ্চলের মানুষকে কতটা আপন করে নিয়ে ছিলেন তা আমরা ওনার পরবর্তী জীবনে দেখতে পাই। তিনি বলতেন, মেঘালয়ের পাহাড়ী জনগনের মধ্যে কাজ করার স্মৃতি এখনো অম্লান রয়েছে।

মহারাজের উত্তরপূর্ব ভারতে আর এক উল্ল্যেখযোগ্য অবদান হলো, ত্রিপুরার বিবেকনগরে রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল শুরু করা। মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন ১৯৮৯ সালের ২৯ মে বিবেকনগর মিশনের পথ চলা শুরু হয়। পূজনীয় ভূতেশানন্দজী মহারাজ ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন। স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহারাজের বিশেষ অবদান রয়েছে। আগরতলা শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে এই স্কুল স্থাপনের কারণ হলো শহরের সব সুযোগ সুবিধা পাবে আবার গ্রামের আশ্রমিক পরিবেশে ছাত্ররা শিক্ষা গ্রহণ করবে। ত্রিপুরার উপজাতিরা চেয়েছিল তাদের জন্য একটি অত্যাধুনিক ইংরেজী মাধ্যম স্কুল। কিন্তু তখন পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের নেতৃত্বে পূজনীয় আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ও পূজনীয় প্রভানন্দজী মহারাজরা ঠিক করলেন ত্রিপুরার উন্নতির জন্য প্রয়োজন জাতি উপজাতির মিলন। তাই উভয় সম্প্রদায়ের জন্য একটি মডেল স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন । মহারাজের এটি একটি উল্লেখযোগ্য অবদান ।

পূজনীয় মহারাজ সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ হওয়ার পর উত্তরপূর্ব ভারতে দীক্ষাদানের জন্য বার বার ছুটে গেছেন। বছরে একাধিকবারও গিয়েছিলেন। আমাদের মঠ ও মিশনের সেন্টারগুলিতে থাকা খাওয়ার তেমন অসুবিধা না হলেও প্রাইভেট সেন্টারে অনেক সমস্যার সন্মুখীন হতে হতো। যেমন বয়স্কদের উপযোগী থাকা খাওয়ার সমস্যা, শৌচাগারের সমস্যা ইত্যাদি নানা সমস্যা থাকতো। কিন্তু মহারাজ অম্লানবদনে সব অসুবিধা মেনে নিতেন। একবার এক আশ্রমে গিয়েছেন যেখানে শৌচাগার ছিল সেই গ্রাম্য ও পুরাতন পদ্ধতির। শৌচাগারের সামনের দরজায় বস্তা ঝুলিয়ে রাখা। এমন পরিস্থিতিতেও মহারাজ হাসি মুখে সব মেনে নিতেন। মহারাজ ১৯৯৬ সালে আগরতলা ধলেশ্বর মিশনে দীক্ষা দিতে যান। তখন বাড়ি ঘর তেমন হয়নি। মহারাজকে থাকতে হয়েছিল বাঁশের তৈরি টিনের ছাউনি ঘরটিতে। মহারাজ সেই ঘরেই কষ্ট করে থাকতেন। ভালো কোন শৌচালয়ও ছিল না। কিন্তু মহারাজের মুখে কেউ কষ্টের ছাপ দেখতো না। পূজনীয় মহারাজের কাছে সে বছর আমার মা, বাবা ও দাদা দীক্ষা পেয়েছিলেন। আমার সে বছর দীক্ষা নেওয়ার খুব ইচ্ছা থাকলেও এক পরিবারের একসাথে অনেককে দীক্ষার আবেদন পত্র দেওয়া হত না। কারণ উত্তরপূর্ব ভারতে অধিক দীক্ষার্থী থাকার জন্য ভক্তদের রামকৃষ্ণ মিশন থেকে দীক্ষা নেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হতো। তাই সে বছর আর দীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি। পরে মায়ের বাড়িতে ব্রহ্মচারী হিসাবে যোগ দেওয়ার পর সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজনীয় রঙ্গনাথানন্দজী মাহারাজ কৃপা করে দীক্ষাদান করেন।

মহারাজ তখন মঠ ও মিশনের সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ হয়ে যোগোদ্যান মঠে আছেন। আমরা তখন মায়ের বাড়িতে আছি। মহারাজ মাঝে মাঝে মায়ের বাড়িতে আসতেন। সে সময়ের একদিনের একটি ঘটনা আজও খুব মনে পড়ে। মহারাজ মায়ের বাড়ি এসেছেন, মহারাজকে দেখার জন্য 'প্রাচী' সিনেমা হলের মালিক জিতেনবাবু এসেছেন। মহারাজের প্রণাম মায়ের বাড়ির দোতলায় চলছে। জিতেনবাবু মহারাজের ঘরে ঢুকতেই মহারাজ সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কোলকুলি করলেন। কুশল বিনিময় করলেন। আমি তখন ভাবছি এ লোকটি কে, যাকে মহারাজ এত সমীহ করছেন। পরে জানতে পারি মহারাজ যখন সেবাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে আছেন তখন সেখানে বিভিন্ন কারণে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হয়। তখন জিতেনবাবু আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে সেবাপ্রতিষ্ঠনের দৈনন্দিন বিশাল কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাই মহারাজ জিতেনবাবুকে আজীবন শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসার চক্ষে দেখতেন। সেদিন আমরা এতবড় মহাপুরুষের কাছে সৌজন্যবোধ ও নম্রতা শিখতে পারি।

মহারাজের আরেক বিশেষ অবদান হলো স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটেতে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা কেন্দ্র তৈরি। মহারাজ যোগোদ্যান মঠে থাকাকালীন মাসে একাধিকবার এখানে আসতেন। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান সংস্কারের সময় বহুবার এসেছেন। স্বামীজির জন্মস্থান যেন হুবহু আগের মতো তৈরি হয় তার জন্য মহারাজের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এছাড়াও স্বামীজির বাড়ির যে বাড়িতে সাধুরা থাকেন, সে বাড়ি নেওয়ার ব্যপারে মহারাজের বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁর চেষ্টাতেই এই বাড়ি মিশনের হাতে আসে।

পূজনীয় গীতানন্দজী মহারাজ ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ হয়ে মায়ের বাড়িতে আসেন। তিনি মায়ের বাড়ির দোতলায় স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের পাশের ঘরে থাকতেন। মায়ের বাড়িতে পূজনীয় গীতানন্দজী মহারাজ আসার কয়েকদিন পর তৎকালীন সহ-সংঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ যোগোদ্যান মঠ থেকে গীতানন্দজী মহারাজকে দেখতে আসেন। সাথে ছিলেন ঢাকা মিশনের অধ্যক্ষ পূজনীয় অক্ষরানন্দজী মহারাজ। পূজনীয় অক্ষরানন্দজী মহারাজ তখন সমগ্র বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গে) দীক্ষার দায়িত্বে আছেন। সেদিন পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের সামনে গীতানন্দজী মহারাজকে যেন ছোটশিশু মনে হচ্ছিল । পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজকে প্রণাম করে গীতানন্দজী মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন। পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ কয়েকবার বলার পর খাটে বসলেন। আমরা দেখলাম গীতানন্দজী মহারাজ চেয়ারে বসেন নি, খাটে ছোট শিশুর মতো আঁটোসাটো হয়ে বসলেন। পূজনীয় গহনানন্দজী

মহারাজের সামনে গীতানন্দজী মহারাজের সেদিন প্রত্যেকটা কথায় এত বিনয় ফুটে উঠে ছিল যে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। পূজনীয় গীতানন্দজী মহারাজের কাছে শিক্ষনীয় ছিল বড়দের কিভাবে সন্মান করতে হয়। আর পূজীয় গহনানন্দজী মহারাজ ভ্রাতৃসম গীতানন্দজী মহারাজের মায়ের বাড়িতে থাকতে কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না নিজের চোখে দেখতে আসেন। সেদিন মায়ের বাড়িতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তিন দীক্ষা গুরুর উপস্থিতি অন্য মাত্রা নিয়েছিল। যা আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় চির অম্লান হয়ে থাকবে। পূজনীয় গীতানন্দজী মহারাজ ও পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের মধ্যে মাঝে কোন বিশেষ কাজে বা বিশেষ দিনে টেলিফোনে কথা হতো। তখন দেখতাম গীতানন্দজী মহারাজ কত বিনয়ের সাথে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের সাথে কথা বলতেন। যা আমাদের মতো নবীন প্রজন্মের সাধুদের শিক্ষনীয়।

২০০৫ সালে পূজনীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের শরীর যাওয়ার পর পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ সংঘের প্রেসিডেন্ট হয়ে বেলুড় মঠে আসেন। তখন আমরা বেলুড় মঠের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আছি। প্রতিদিন সকালে মহারাজকে প্রণাম করতে যেতাম। লাইন দিয়ে প্রণামের সময় মহারাজের যদি নজরে আসতো কারো জামার বোতাম খোলা আছে বা জামার হাতা ভাজ করা আছে তিনি ইশারা করে দেখিয়ে দিতেন। অনেক সময় আমাদের কারো কারো হয়তো জামার উপরের বোতাম খোলা থাকে। মহারাজ তা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন সাধুদের গুছিয়ে জামা কাপড় পরতে হয়। ধুতি এমন ভাবে পরতে হবে পায়ের গোড়ালির উপর পর্যন্ত যেন থাকে। মহারাজ এলোমেলো স্বভাবের একেবারে পছন্দ করতেন না। কারণ যারা এলোমেলো স্বভাবের তারা কি করে ঈশ্বরে মন একাগ্র করবে। মহারাজ নিজের জামা কাপড় যেমন খুব গুছিয়ে পরতেন ঠিক তেমনি নবাগত ব্রক্ষচারীরাও যেন পরিষ্কার ও গুছিয়ে কাপড় পরে সে দিকে লক্ষ্য রাখতেন।

২০০৬ সালে বেলুড় মঠে স্বামীজির তিথি পূজায় প্রথম ব্রহ্মচারীদের ব্রহ্মচর্য মন্ত্রে দীক্ষাদান করেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মহারজের কাছ থেকে তখন ব্রহ্মচর্য মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের। দীক্ষা নেওয়ার আগে থেকে বার বার মনে আসছিল সেই দশ বছর আগের কথা। ১৯৯৬ সালে প্রথম মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা এসেছিল। এখনো ভাবলে অবাক লাগে ঠাকুর সে দিনের কিভাবে দশবছর আগের ইচ্ছাপূরণ করলেন।

২০০৬ সালে আগরতলা পোষ্টিং হয়ে যাওয়ার পর শুনি সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ

আগরতলায় আসছেন। সেটা ছিল আমার কাছে বাড়তি পাওনা। মহারাজ যাওয়ার আগে থেকে আশ্রম ও মহারাজের ঘর গুছানোর দায়িত্ব পূজনীয় পূর্ণাত্মানন্দজী মহারাজ আমায় দিয়ে মহারজের সেবার সুযোগ করে দেন। মহারাজের ঘরে যেখানে এ সি মেশিন বসানো হয়েছিল সেখানে একটু ফাঁক ছিল আর সেই ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বের হয়ে যাচ্ছিল। তাই আমি এক টুকরো থার্মোকল গুজে ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে দিয়ে উপরে ব্রাউন টেপ লাগিয়ে দি। মহারাজের নজরে সে জায়গা আসে। মহারাজ হাসতে হাসতে মজা করে বলছিলেন, "বেশ কায়দা করেছে তো।'

মহারাজ যেদিন আসবেন সেদিন মহারাজকে স্বাগত জানানোর জন্য রাস্তার দুই পাশে ছাত্রদের দাঁড় করানো হয়েছিল। তখন ছিল প্রখর রোদ। মহারাজকে স্বাগত জানানোর জন্য বিমানবন্দরে অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিল। তাই মহারাজের বিবেকনগর মিশনে উপস্থিত হতে কিছুটা দেরি হয়। আর সেই গ্রীস্মের রোদে ছাত্ররা মহারাজকে স্বাগত জানানোর জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছেন শুনে মহারাজ খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। বার বার বলছিলেন ছাত্রদের এই গরমে দাঁড় করানোর কি দরকার ছিল। মহারাজ যে কয়দিন বিবেকনগরে ছিলেন অনেক ভক্ত মহারাজের কাছে দেখা করার জন্য দূর দূর থেকে আসতো। মহারাজও সকলের প্রণাম হাসিমুখে গ্রহণ করতেন। কেউ দেখা না পেয়ে ফিরে গেছে শুনলে কষ্ট পেতেন। প্রতিদিন ছাত্রাবাসের ছাত্ররা সন্ধ্যারতির পর মহারাজকে প্রণাম করতো। আমি যেহেতু ছাত্রাবাসের দায়িত্বে ছিলাম তাই মহারাজের পাশে দাঁড়িয়ে ছাত্ররা একে একে প্রণামের পর তাদের নাম ও ক্লাস বলে দিতাম। সেখানকার উপজাতি ছাত্রদের নাম কারো কারো একটু অন্যরকম ছিল, তা নিয়ে মহারাজ আমার সাথে মাঝে মাঝে হাল্কা রসিকতা করতেন। এক ছাত্রের নাম ছিল লর্ড ডালহৌসি; তার নাম শুনে মহারাজ হেসে জোর দিয়ে বলে উঠলেন, 'লর্ড ডালহৌসি'! মহারাজ মাঝে মধ্যে মৃদু হেসে ছাত্রদের সাথে হাল্কা মজাও করতেন। আসলে বিবেকনগর মিশন স্থাপনে মহারাজের বিশেষ অবদানের কথা আমরা আগেই বলেছি, তার জন্যই হয়তো বিবেকনগরের ছাত্রদের প্রতি মহারাজের বিশেষ ভালোবাসা ছিল। মহারাজের উপজাতি ছাত্রদের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা আমরা তখন স্বচক্ষে দেখেছি।

মহারাজ বিবেকনগরে থাকতে প্রতিদিন আশ্রমের শান্ত পরিবেশে হাঁটতে বের হতেন। একদিন হাঁটতে হাঁটতে দেখেন মিশনের এক অফিসে বসে জনৈক সাধু কাজ করছেন। মহারাজ সেদিন আশ্রম অধ্যক্ষকে বলেছিলেন সাধু সন্ধ্যারতির পর কেন অফিসে? তা সাধু জীবনের জন্য ভালো নয়। তুমি তাকে বলে দিবে। ভবিষ্যতদ্রষ্টা মহারাজের সে কথার মূল্য সেদিন না বুঝতে পারলেও পরে বুঝতে পারলাম।

সেবার ছিল মহারাজের আগরতলায় শেষবার যাওয়া। মহারাজ তার আগে বহুবার নানা কাজে গিয়েছিলেন, দীক্ষাদানের জন্যও অনেক বার গিয়েছেন। তিনি ত্রিপুরার ভক্তদের ও আশ্রমবাসীদের কাছে খুব আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষত পুরানো ভক্তরা মহারজের নাম শুনলে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেন। শেষবার বিবেকনগর তথা ত্রিপুরা থেকে আসার আগের দিন রাতে প্রসাদের পর আমরা সবাই মহারাজের ঘরে মিলিত হলোম। মহারাজ আমাদের সবার হাতে একটা ধুতি ও একটা করে শাল দিলেন। মহারাজ তখন একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। উপস্থিত সব সাধুদের দিকে করুণা মাখা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

মহারাজ পরদিন বেলুড় মঠে ফিরে আসবেন। বিমানবন্দর পর্যন্ত অনেক ভক্ত মহারাজের পিছু পিছু ছুটলো। বিমানে নির্দিষ্ট ওজনের বেশী নিয়ে যাওয়া যায়না। কিন্তু মহারাজের জিনিস নিয়ে যেতে অনেক ভক্ত ও বিমানবন্দর কর্মী নানা ভাবে সাহায্য করলো। মহারাজ শেষবারের মতো ত্রিপুরা দর্শন করে ভালোভাবে বেলুড় মঠে ফিরে এলেন। সেখানকার রাজপরিবারের জনৈক দম্পতি মহারাজের সেবায় এত যত্নবান ছিলেন যে মহারাজ ত্রিপুরা আসবেন শুনেই কিভাবে মহারাজের সেবাযত্ন করবেন তারজন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন। মহারাজকে দেখার জন্য দিনে দুইবার আগরতলা থেকে ছুটে যেতেন। মহারাজও তাদের খুব স্নেহের চোখে দেখতেন। ত্রিপুরার এক ভক্ত বলছিলেন, সারাদিন উপোস করে দীক্ষা নেওয়ার পর হাতে আশ্রম থেকে একটা খাওয়ার প্যাক দেওয়া হয়। তখন সে ভাবতে লাগলো এই ছোট প্যাকেটের খাওয়ায় কি পেট ভরবে? যখন খাওয়া শুরু করলো, দেখে আর শেষ হয়না। তারা সব খেয়ে শেষ করতে পারেননি, পেট ভরে গেছে। সারাজীবন তারা বিশ্বাস করতেন তা ছিল গুরুর কৃপা। আরেক ভক্ত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছেন, তাকে দেখে মহারাজ বললেন, "তুমি তো ব্রাহ্মণ, পৈতে নেই কেন?' সে শুনে অবাক হয়ে গেল। মহারাজ কি করে জানলেন যে সে ব্রাহ্মণ !

পূজনীয় মহারাজের সাথে আমার ব্যাক্তিগত ভাবে একটা আবেগপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমি সংঘে যোগ দেওয়ার আগে মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তা পূরণ হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে বেলুড় মঠে সকালবেলা দর্শন, ব্রহ্মচর্য দীক্ষালাভ, আগরতলায় সান্নিধ্য লাভ আমার জীবনের অনেকটাই বাড়তি পাওনা। শান্ত, ধীরস্থির, মিতবাক, মিষ্টিভাষী, সৌম্য দর্শন এই মহাপুরুষের সামনে গেলেই শ্রদ্ধা ভক্তিতে মন পূর্ণ হয়ে উঠতো। এই মধুর স্মৃতিগুলি সারাজীবন স্মৃতির মণিকোঠায় রক্ষিত থাকবে। শতকোটি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি মহারাজের শ্রীচরণে।

সত্যকে জানার চেষ্টা কর

স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ

২০০১ সাল, নভেম্বর মাস। হঠাৎ করে রাত ১.৩০-এ ফোন বেজে উঠেছিল এবং রাঁচীর সেক্রেটারি স্বামী শশাঙ্কানন্দজী মহারাজ ফোনে কথা বললেন। কিছু সময় পর সেক্রেটারি মহারাজকে চিন্তান্বিত লাগছিল। তিনি আমায় বলেছিলেন যে, পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের সাথে ফোনে কথা হয়েছিল। উনি গয়া ধাম যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বললেন যে, "মহেশ ফেব্রুয়ারীতে গয়া ধাম যাব, তুমি ব্যবস্থা কর।" মহেশ মহারাজ (স্বামী শশাঙ্কানন্দজী) আমায় বলেছিলেন যে আমার তো 'গয়া ধাম'-এ কোন পরিচিতি নেই, কি করব? কিছু বুঝতে পারছি না। আগেও পূজনীয় মহারাজজী 'গয়া ধাম' যাওয়ার জন্য আমাদের মহেশ মহারাজজীকে বলেছিলেন কিন্তু সেই সময় পূজ্য মহারাজজী কর্মব্যস্ততার জন্য আসা দিনগুলি নিশ্চিত করতে পারছিলেন না এবং মনে মনে খারাপও লাগছিল যে পূজনীয় মহারাজজী 'গয়া ধাম' যেতে চাইছেন আর এখানে কেন্দ্রের কোন ব্যবস্থা হচ্ছিল না। সেই সময় আমার মনে পড়েছিল যে সেখানে একটা পরিবারের সাথে আমার পরিচয় আছে যাদের এখানে আগেও আমি অতিথি হয়েছিলাম, এটা ভেবে আমি প্রস্তাব রেখেছিলাম, মহেশ মহারাজ প্রসন্ন হয়ে কথা বলার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন।

এই পরিবারের বড় মেয়ে রাঁচীতেই থাকত যার নাম ছিল শ্রীমতি সবরী চক্রবর্তী। আমার এই পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমি উনাকে কাকীমা বলে সম্বোধন করতাম। আমি কাকীমাকে ফোন করে সব কথা জানালাম, তখন উনি বলেছিলেন, "আমি আমার কাকাকে বলে আপনাদের ব্যবস্থা করিয়ে দিচ্ছি।" আমরা উনার কাকার ঘরে গিয়েছিলাম কিন্তু থাকার ব্যবস্থা হলো না। এই ব্যাপারে ব্যবস্থা করার জন্য আমরা তিন চার বার 'গয়া ধামে' যেতে হয়েছিল। মহেশ মহারাজজীও 'গয়া ধাম'-এ অবস্থিত 'শ্রী শ্রী দুর্গাবাড়ি'তে 'শ্রীরামচরিতমানস' নিয়মিত পাঠ করার জন্য আসতেন, এই

সুযোগে আমি ও আমার পাঠে পূজনীয় গহনানন্দজীকে ‘গয়া তীর্থ যাত্রা’ ভালো করে করানোর ব্যবস্থা স্থানীয় ভক্তদের সহায়তার জন্য এগিয়ে আসতে বলেছিলাম। তার জন্য কাকীমার পরিবারবর্গদের থেকেও সহায়তার আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল এবং এখন প্রভুর অসীম কৃপাতে বিপরীত পরিস্থিতি অনুকূল দিকে যাচ্ছিল।

সবরী কাকীমা-র নিজের কাকা নিজেই প্রস্তাব দিয়েছিলেনন যে পূজনীয় মহারাজ উনার ঘরেই থাকবেন। সবরী কাকীমার একটা দোতালা সুসজ্জিত ঘর ছিল যেখানে উনি পূজনীয় মহারাজের স্বাগত করতে চেয়েছিলেন এবং ‘গয়া ধাম’ তীর্থ-এ যতদিন উনি থাকতে চাইবেন ততদিন তিনি থাকতে পারবেন, তার জন্য উনারা সপরিবারে ঘর খালি করে দেবেন।

পূজ্য মহারাজের আগমন ঠিক হয়েছিল তিথি অনুসারে এবং সাথে অনেক সাধুদেরও সমাগম হয়েছিল। মোরাবাদী, রাঁচী থেকে সেখানে সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পূজনীয় মহারাজ যখন নিজের ঘরে প্রবেশ করেছিলেন তখন সব ব্যবস্থা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এবং সব সাধুদের সামনে বলেছিলেন, “মহেশ! খুব সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে, এমন লাগছে যেন আমি আমারই কোন কেন্দ্রে এসেছি।” পূজ্য মহারাজকে প্রসন্ন দেখে আমরা সবাই সন্তুষ্ট এবং উৎসাহিত হয়েছিলাম। আমাদের পরিশ্রম সফল হলো।

স্বামী সুবিরানন্দজী মহারাজ তখন ‘দেওঘর বিদ্যাপীঠের’-এর সেক্রেটারি ছিলেন, স্বামী নিখিলাত্মানন্দ মহারাজ ‘প্রয়াগরাজ’-এর সেক্রেটারি ছিলেন, স্বামী সত্যরূপানন্দ মহারাজ রায়পুর-এর সেক্রেটারি, স্বামী বিমোক্ষানন্দ মহারাজ তখন উনি ‘রাঁচী সেনেটোরিয়াম’-এর সেক্রেটারি ছিলেন। আমি, দিনেশ মহারাজ এবং শশাঙ্কানন্দ মহারাজ, আমরা সব সাধুদের থাকার ব্যবস্থা শ্রী দেবব্রত চ্যাটার্জী স্কুলের ভবনে হয়েছিল এবং উনার ঘরেই আমাদের সব সাধুদের ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছিল। মহারাজ তিন দিন ‘গয়া ধাম’-এ ছিলেন এবং উনি ‘শ্রীশ্রী দুর্গাবাড়ি’তে ৪৫ জন লোককে ‘শ্রীশ্রী ঠাকুর’-এর মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন।

এই সম্পর্কে আরেকটি কথা মনে পড়ে গেল যেটা আমায় অনেক বড় শিক্ষা দিয়েছিল। যে ভক্ত পরিবারের ঘরে পূজনীয় মহারাজ ছিলেন সেই পরিবারের এক মহিলা ভক্ত যার বয়স তখন ২৪-২৫ ছিল, উনি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন—মহারাজজী, আমার পূজনীয় মহারাজের দর্শন এখন হয়নি, এখন কি পূজনীয় মহারাজের দর্শন হতে পারে? আমি, অরবিন্দ মহারাজ যিনি পূজনীয় মহারাজের সেবক ছিলেন ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু উনি কাজের মধ্যে এত ব্যস্ত ছিলেন যে উনি বাংলা

ভাষায় কি উত্তর দিয়েছিলেন আমি কিছুই বুঝতে পারি নি, আমি ভেবেছিলাম যে উনি বোধ হয় মহিলাকে ঘরের ভিতরে গিয়ে প্রণাম করার কথা বলেছেন। .... ঘরে ভিতরে গিয়ে পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম করার কথা বলে দিয়েছিলাম। পূজনীয় মহারাজ তখন মায়ের কথা বইটি পড়ছিলেন। ভক্ত মহিলা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে প্রণাম নিবেদন করে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর যাওয়ার পরই ঘন্টা বেজেছিল, সেবক অরবিন্দ মহারাজ ঘরের ভিতরে গিয়েছিলেন। শীঘ্রই উনি বাইরে এলেন এবং আমার উপর রেগে বললেন— পূজনীয় মহারাজ নির্দেশ দিয়েছেন যে কোন মহিলা ভক্ত আসার আগে উনাকে জানাতে, এইভাবে অনুমতি ছাড়া উনার ঘরে কোন মহিলা ভক্ত যেন প্রবেশ না করেন। আমার মনে সেই সময় গ্লানি হলো যে পূজনীয় মহারাজ যিনি কেবল শুধু আমাদের পিতা সমান নন, সঙ্গে তিনি আমাদের সন্ন্যাসী সঙ্ঘের শীর্ষে ছিলেন, উনার আচরণ থেকে আমরা সবাই শিক্ষা গ্রহণ করি যে এক সন্ন্যাসীকে মহিলা ভক্ত হওয়ার পরও একটা প্রয়োজনীয় দূরত্ব বানিয়ে রাখতে হয়। আমার সেই দিন সাধু জীবনের জন্য অনেক বড় উদাহরণ দেখার সৌভাগ্য হলো। এইভাবে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আজও আমাদের সবাইকে উনার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছেন।

পূজনীয় মহারাজ মহাবৌধি সোসাইটিতেও গিয়েছিলেন, ভগবান বুদ্ধের প্রতিমা প্রণাম করার পরে ভিক্ষু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সভায়ও ভাষণ প্রদান করলেন। পূজনীয় মহারাজ ভগবান বিষ্ণুমন্দির-এর পূজা করেছিলেন। আমরা সবাই সাথে ছিলাম। পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে আমাদের সবাইকে আনন্দ প্রদান করেছে।

অন্য আরেকটা ঘটনা আমার মনে দাগ রেখে গেছে, পূজনীয় মহারাজ তখন সঙ্ঘাধ্যক্ষ হয়ে গিয়েছিলেন, আমাদের ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা হয়েছিল, আমরা সব ব্রহ্মচারীগণ উনার নিকট প্রণামের জন্য গিয়েছিলাম এবং আমরা সবাই উনার থেকে উপদেশ দেওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। পূজনীয় মহারাজ শুধু একটা কথাই বলেছিলেন, "সত্যকে জানার চেষ্টা কর", এই একটা বাক্য আজও আমার মনে অঙ্কিত আছে যার আধারে আমি চলার চেষ্টা করছি।

আমি আমায় ধন্য মনে করি যে আমায় জীবনে এমন মহাপুরুষের সৎসঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছে। আজ উনার বিষয়ে লিখার সৌভাগ্য উনার কৃপাতেই প্রাপ্ত হয়েছে।

পরমপূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজ : কিছু শ্রুতি, কিছু স্মৃতি

স্বামী একচিত্তানন্দ

রবীন্দ্রনাথের ‘মনে পড়া’ কবিতার অবোধ বালকের কথা মনে পড়ে।

আমার অবস্থা তো তারই মতো।

পরম পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ যখন স্থূল শরীরে বর্তমান, তাঁকে কাছে থেকে, দূরে দাঁড়িয়ে—দুভাবেই প্রণাম জানানোর সুযোগ হয়েছিল।

কিন্তু ওই পর্যন্তই।

‘খেলা যখন ছিল তোমার সনে, তখন কে তুমি, তা কে জানত?’

‘মহাপুরুষসংশ্রয়’ বলতে শাস্ত্র যে ঠিক কি বুঝিয়েছেন—এ প্রশ্ন তো সেদিন মনে জাগেনি। জাগলে হয়তো ‘পাকা জহুরী’র মতো হীরের মূল্য দিতে শিখতাম।

তবু—মূল্য জানা হোক্ বা না হোক্—‘হীরে টা ‘হীরেই থাকে, ‘পাথর’ হয়ে যায় না।

তাই জীবনের বিপন্ন মুহূর্তে, সঙ্গীহীন প্রহরে পূজনীয় মহারাজের করুণাঘন মুখটি মনে আসে। তাঁর অদেখা হাতের ছোঁয়ায় যেন আশ্বস্ত হই; ভাবি—মহারাজকে দর্শন করেছি, তাঁর কৃপা পেয়েছি ব্রহ্মচর্যদীক্ষায়, আর অনেকের কাছে তাঁর চরিতকথা শ্রবণের সুযোগ পেয়েছি।

তখন অন্ধকারের বুক চিরে হীরেমাণিক জ্বলতে থাকে।

মহারাজের নাম প্রথম শুনি পূর্বাশ্রমে অবস্থানকালেই। বয়সে বড় আমাদের এক দাদা একদিন সৎপ্রসঙ্গ করতে করতে মহারাজের কথা বলেছিলেন অনর্গল। মহারাজের প্রতি দাদার শ্রদ্ধা অগাধ। বলছিলেন : তাঁর বাবা-মা মহারাজের আশ্রয় পেয়েছিলেন, যদিও তিনি নিজে দীক্ষা নেননি। কর্মসূত্রে কলকাতায় আসতে হয়েছিল একবার। কাঁকুরগাছিতে মহারাজ আছেন—জানতে পেরে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন। অবশ্য

খবর দিয়ে রেখেছিলেন আগেই। যেতে যেতে একটু দেরি হলো। প্রসাদ পাবার সময় পেরিয়ে গেল। গিয়ে দেখলেন : মহারাজ তাঁরই জন্য প্রতীক্ষমান। প্রসাদ গ্রহণ করেননি তখনও। তারপর সব কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। নিজে পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর আহারাদির ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে অন্নগ্রহণ করতে বসলেন। এ ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে দাদা খুব আবেগবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। জানি, সেদিন তিনি মহারাজের যে মাতৃহৃদয়ের স্পর্শ পেয়েছিলেন—উত্তরকালে এ তাঁর জীবনের পরম সম্পদ হয়ে আছে।

বেলুড়মঠে PPTC (Pre-Probationer's Training Centre)-তে যোগদান করার পর মঠেই মহারাজকে প্রথম দর্শন করি। একদিন মঠে trustee's meeting এর সময় মহারাজ এসেছেন। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ, সদাহাস্যময়। ভেতরে যে আগুন জ্বলছে—সেকথা কাউকে বলে দিতে হয় না।

এক নবাগত ব্রহ্মচারী আমাদের চেয়ে কিছুটা বয়সে একটু বড়—আমাদের সঙ্গেই রয়েছে। বিকেলবেলা কাজের ফাঁকে সেই ব্রহ্মচারীটির কথা মনে পড়ল। মহারাজ ডেকে পাঠালেন। অযাচিতভাবে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও মহারাজের সেবাধিকার পেয়ে কৃতকৃতার্থ ব্রহ্মচারী দাদাটি সন্ধ্যেয় PPTC তে ফিরে এসে সব বলছিল সবিস্তারে। অত সাধু-ব্রহ্মচারীর মাঝে নবাগতকে মহারাজ মনে রেখেছেন, মঠে এসে ডেকে নিয়েছেন, তারপর সেবার সুযোগও করে দিয়েছেন—ভেবে আমাদের সকলেরই অপার আনন্দ, অবাক বিস্ময় !

এক বছর মঠবাসের পর ঠাঁই হলো পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে। সেখানে গিয়ে পূজনীয় মহারাজকে দর্শন করি ভিন্ন রূপে—দক্ষিণামূর্তিতে। সালটা ২০০৪, শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ। সেবছর বিদ্যাপীঠে এসেছিলেন দু-দু'জন সহাধ্যক্ষ মহারাজ। মার্চ মাসে পূজনীয় গীতানন্দজী, আর নভেম্বর মাসে পূজনীয় গহনানন্দজী। স্মৃতিপটে সেদিনগুলির কয়েকটি চিত্র আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কালীপুজোর পরে পরেই গহনানন্দজী মহারাজ আশ্রমে আসছেন জানতে পেরে আমরা—সাধু-ব্রহ্মচারীরা সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষমান। বার্তা পৌঁছে গেল ছেলেদের মাঝেও। পুজোর শেষে প্রতিমা 'নিরঞ্জন' হলো বটে, 'বিসর্জন' কিন্তু হলো বটে, 'বিসর্জন' কিন্তু হলো না। সবাই নতুন 'আবাহনের' জন্য পথ চেয়ে আছি—সংঘগুরুর দেহ ধরে আসছেন মা আনন্দময়ী।

১৪ই নভেম্বর। সকাল থেকে সাজ-সাজ রব। পূঃ মহারাজ আসছেন হাওড়া-চক্রধরপুর এক্সপ্রেসে। পূঃ ভৈরব মহারাজ স্টেশনে পৌঁছে গেলেন আগে আগেই।

মহারাজকে আশ্রমের তরফে স্বাগত জানিয়ে বিদ্যাপীঠে নিয়ে এলেন যখন—ঘড়িতে তখন প্রায় ন'টা। ছাত্ররা সারিবদ্ধভাবে প্রধান ফটকের সামনে থেকে সাধুনিবাস পর্যন্ত ধুতি-পাঞ্জাবি পরে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাণ্ডে বাজছে 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে'। সাধু-ব্রহ্মচারীরাও রয়েছেন সকলে। মন্দিরের পূজারী পূঃ প্রভাস মহারাজ মন্দিরের সামনের দিকটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। সহাধ্যক্ষ মহারাজ গাড়িতে আশ্রম প্রবেশ করে সোজা এসে থামলেন মন্দিরের সামনে। ছেলেরা শুরু করল সমবেত স্তোত্রপাঠ। প্রথমে 'প্রকৃতিং পরমাং', পরে 'সর্বধর্মস্থাপকসত্বং'। মহারাজ শ্রীবিগ্রহের দিকে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

মন্দির থেকে সাধুনিবাস। সাধু-ব্রহ্মচারীদের প্রণাম হলো; বিকেলে সাধারণ ভক্তদের। সন্ধ্যারতির পর মন্দিরে সঙ্গীত, ভাষণ, শ্রুতিনাটকে ছাত্রদের মাতৃ-অনুধ্যান হলো মহারাজের উপস্থিতিতেই। সবার শেষে মহারাজ মাতৃপ্রসঙ্গ করলেন। যতদূর মনে পড়ে, মায়ের ঐশী মহিমার কথা আলোচনা করে প্রার্থনা করেছিলেন সকলের হিতার্থে।

বিদ্যাপীঠের অনেক ছাত্র—অন্তত জনা তিরিশ—এই বছরে মহারাজের আশ্রয় লাভ করে। একটি দুরন্ত, বাঁধন-না-মানা ছেলের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। সে তখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। বিদ্যালয়ের নিম্নতর বিভাগ বিবেকানন্দের সেবানিরত ছিলাম বলে তাকে ভালো করেই আমি চিনতাম। তা এই 'অশিষ্ট, দুর্বিনীত' ছেলেটি এসে একদিন আমাকে জানাল : মহারাজ তাকে দীক্ষা দিয়েছেন। দীক্ষান্তে তাকে কত আদর করেছেন, স্নেহের স্বরে বারবার প্রশ্ন করেছেন : "করবি তো, এখন থেকে নিয়ম করে জপ করবি তো?"—ছেলেটি সপ্রতিভ ভঙ্গীমায় সে খবরটুকু জানিয়ে দিল। আর সে যে এই উৎসবে খুব আনন্দ পেয়েছে—এ বার্তা দিতেও ভুলল না।

লক্ষ করেছিলাম—এরপর 'উদ্দাম, চঞ্চল' ছেলেটির জীবনে আস্তে আস্তে লাগাম পড়ে গেল। ছেলেটি এখন কলকাতার একটি স্বনামধন্য হাসপাতালে সুনামের সঙ্গে সেবাদান করে চলেছে।

বিদ্যাপীঠে অবস্থানকালে মহারাজের সঙ্গে সাধুদের সম্মিলনে দেখেছি মহারাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর সংঘজীবনের কথা, বিশেষত যোগদান পর্বের কথা বলে চলেছেন। সূয্যি মহারাজের কথা, সেকালের ভুবনেশ্বর মঠের রূপচিত্র—সবই তাঁর বর্ণনায় শ্রোতাদের কাছে জীবন্ত হয়ে ধরা দিচ্ছে। পূজনীয় উমানন্দজী তখন আমাদের আশ্রম-সম্পাদক। কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন : "মহারাজ, আমার মাঝে মাঝে মনে

হয়—রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ—এঁরা ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পরিকর হয়েও গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করলেন কেন? কি এর অর্থ?"

মহারাজ : "ও, তা তো আমরা কখনও ভেবে দেখিনি! আসলে—এ প্রশ্ন কখনই মনে জাগেনি।

মহারাজ কাঁকুরগাছিতে ফিরে এলেন।

'বিদ্যাপীঠ' থেকে ছুটির ঘন্টা বেজে গেল আমারও। ২০০৫ সালে ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এসে মাস চারেক বাদেই মহারাজকে সংঘাধীশের আসনে আসীন হতে দেখলাম। দেখা, চাওয়া আর পাওয়া।

দুবছর কেটে গেল। ২০০৭ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বামীজির পুণ্য আবির্ভাব তিথিতে পবিত্র ব্রহ্মচর্যদীক্ষায় মহারাজের কাছ থেকে 'একটা কিছু' পেলাম। কি পেলাম—তা বোঝার সাধ্যি আজও হয়নি।

আনুষ্ঠানিক 'সংঘভুক্তি' হয়ে গেল। ছিলাম একান্নজন। একান্নজনের একান্নবর্তী পরিবার। বেশ বড় ব্যাচ। ব্রহ্মচর্য ক্যাম্পের তত্ত্বাবধানে পূজনীয় তত্ত্ববিদানন্দজী (গৌরদাস মহারাজ)। তিনিই আমাদের মহারাজের কাছে নিয়ে যেতেন। সকলের প্রণাম হয়ে গেলে একদিন গৌরদাস মহারাজ প্রেসিডেন্ট মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন: "মহারাজ, এরা এখন (সংখ্যায়) ৫১। কোনোদিন কি (ব্রহ্মচর্য দীক্ষার্থীর) সংখ্যাটা একশো? পৌঁছোবে ?" মহারাজ ঘাড় নাড়লেন। সানন্দে, ইতিবাচক ভঙ্গিমায়। তারপর হঠাৎ যেন এক অদৃশ্য প্রেরণার বশে বললেন : "আমি বলছি, শুনে রাখো—সংখ্যাটা একশোয় পৌঁছে যাবে একদিন।"

১০ই জানুয়ারি, ২০০৭। ব্রহ্মচর্যদীক্ষার পর পূজনীয় মহারাজের আবাসকক্ষে নবদীক্ষিত ব্রহ্মচারীদের নামকরণ অনুষ্ঠান। মহারাজ 'নবজাতক'দের কাছে পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত। চোখে মুখে আনন্দ যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। একজনার নাম হয়েছে 'অজেয়চৈতন্য'। মহারাজ নাম পাঠ করে নিজেই বললেন : "বাঃ, খুব সুন্দর নাম !"

নামকরণের শেষে মহারাজ তিনদিনের 'বিশেষ তপশ্চর্যা'র বিধিনিষেধ পাঠ করে দিচ্ছেন। ব্রহ্মচারীরা স্বপাকে রান্না করে খাবে—বলতে বলতে আপন মনে হেসে উঠলেন। বললেন, "এটা তো ...(খুব কঠিন হবে)!" হাসি যেন আর থামতে চায় না। তারপর গঙ্গার ঘাটে সকাল-সন্ধ্যে প্রসাদ পাবার প্রসঙ্গ। বললেন : "ঘাটে হলে ভালো"।

মহারাজের কথা মিলিয়ে নিয়েছিলাম সকলে। ঘাটে বসে প্রসাদ পাওয়া—সে এক

অনন্য অভিজ্ঞতা। নতুন খবর পেয়েছি সেদিন—বিপুলায়তন একটা 'বাড়ি' পড়ে আছে আমাদের—'পৈতৃক সম্পত্তি'; আর সদ্য অর্জিত প্রবেশাধিকার নিয়ে আমরা যেন হুড়মুড়িয়ে ঢুকছি সে 'বাড়ি'তে। আবিষ্কার করছি 'সুবিস্তৃত ঘাস' এ বাড়ির 'শয্যা', 'অনন্ত আকাশ' তার 'ছাদ'। সাধুসংঘের আশীর্বাদ মাথায় ঝরে পড়ছে অকৃপণ করে, গঙ্গার হাওয়ায় ভেসে আসছে মায়ের নিখাদ ভালবাসা। প্রসাদের সঙ্গে যে এত 'ফাউ' পাওয়া যেতে পারে—এ কারো ধারণায় ছিল না। সেদিনের বাঁধভাঙা আনন্দের কথা ভাবলে আজও যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সপ্তাহকালের মাঝে মহারাজের এই আনন্দময় মূর্তিটি আবার দেখতে পেয়েছিলাম—রাজা মহারাজের পুণ্য আবির্ভাব তিথিতে।

ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠান সেদিন।

মহারাজ এলেন সকাল সাড়ে ন'টায়। শুরু হলো সাধু ব্রহ্মচারীদের সমবেত বেদমন্ত্রোচ্চারণ। ফিতে কেটে ঢুকলেন 'সভাকক্ষে'। পুণ্যত্রয়ীর চরণে অর্ঘ্য দিয়ে মহারাজ হাসলেন শিশুর মতো, পরে ঘুরে দেখলেন গোটা বাড়িটা।

অথচ ওই মাতৃপ্রতিম পুরুষ প্রয়োজনে কত কঠোর হতে পারতেন—তার ইঙ্গিতও পেয়েছি মাঝে মাঝে।

সাধু-ব্রহ্মচারীরা মহারাজকে (গিরিশ মেমোরিয়ালে) প্রণাম করতে যেতেন বিকেলবেলা। কারো জামার বোতাম খোলা থাকলে মহারাজের দৃষ্টিতে তা পড়বেই, কোনোভাবে এড়িয়ে যাবার উপায় থাকতো না, সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুল তুলে দেখাবেন মহারাজ।

প্রণামের সময় মঠের এক ব্রহ্মচারী মহারাজের কোনো কারণে গিয়ে পৌঁছোতে দেরি হয়ে গেছে পরপর কয়েকদিন। মহারাজ লক্ষ করলেন। একদিন সোজা প্রশ্ন করলেন : "তুমি কোথায় কাজ করো? এখানে এসে পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগে ?"

ব্রহ্মচারী মহারাজ নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিঃশর্তে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। ততক্ষণে মহারাজ গলে জল।

ভোরবেলা বেলুড় মঠে ঠাকুর-প্রণামে যাওয়ার সৌভাগ্য যাঁদের হয়, তাঁদের প্রত্যেকের অনুভূতি বলে; স্বর্গ নেমে এসেছে নীচে, পৃথিবীকে করছে সস্নেহ আলিঙ্গন।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্রহ্মচারী আমরা—এসময় উন্মুখ হয়ে মায়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম একটি দৃশ্যের সাক্ষী হবার প্রত্যাশায়। পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ

(গহনানন্দজী) সমাধিপাঠ হয়ে, স্বামীজির মন্দির হয়ে মায়ের মন্দিরমুখো আসতেন হাঁটতে হাঁটতে। আর উল্টোদিকে পূজনীয় সহাধ্যক্ষ মহারাজ (আত্মস্থানন্দজী) শ্রীমন্দিরে ঠাকুর প্রণাম করে রাজা মহারাজ, মায়ের মন্দির হয়ে স্বামীজির মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসতেন। মা আর স্বামীজির মন্দিরের মাঝখানে দেখা হত মায়ের দুই বীর সন্তানের, স্বামীজির দুই দৃপ্ত সৈনিকের—বয়সের ভার যাঁদের মাথাকে নোয়াতে পারেনি। দুজনা কথা হত অল্পবিস্তর; দূর থেকে আমরা কিছু শুনতে পেতাম না—শুধু চেয়ে থাকতাম মুগ্ধ বিস্ময়ে! এখন যত ভাবি, মনে হয় : দুই প্রবৃদ্ধ সংঘনায়কের প্রভাতী মিলনের সে দৃশ্য কী মাধুর্যময় !

মুহূর্তকালের তার স্থায়িত্ব।

আর, যাঁরা দর্শকের ভূমিকায়—তাঁদের কাছে? নিমেষ, নাকি যুগ!

কে জানে কালের গণনা !

স্বামী গহনানন্দজীর পুণ্যস্মৃতি

স্বামী কৃষ্ণামৃতানন্দ

মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর জেলার বরোরাতে বাবা আমটের আনন্দ বনের আনন্দ নিকেতন কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে M.Sc. পড়বার জন্য নাগপুরে যাই। সেখানে থাকার জন্য কলেজ হোস্টেলে মাসে এক হাজার টাকা দিতে হবে। রামকৃষ্ণ মঠ, ধন্তোলিতে হোস্টেলে থাকলে দুশ টাকা মাসে। তাই রামকৃষ্ণ মঠে হোস্টেলে ভর্তি হই। ১লা জুলাই ১৯৯৮ প্রথম রামকৃষ্ণ মঠে আসা। নাগপুর মঠে থাকতে থাকতে ঠাকুর, মা ও স্বামীজি সম্পর্কে জানতে ও পড়তে আরম্ভ করি। ২২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ বুধবার পরম পূজ্যপাদ মহারাজ আমায় মহামন্ত্রে দীক্ষা দান করেন।

দীক্ষা গ্রহণের পর থেকে মন সাধন ভজনের দিকে ঝুকতে থাকে। তাই সাধু জীবনকে একমাত্র লক্ষ্য করে ২৬ আগস্ট ২০০২ বাড়িতে না বলে সাধু হবার উদ্দেশ্যে নাগপুর থেকে রাজকোট-রামকৃষ্ণ মঠে যাই। ওখানে থাকাকালীন ২০০২ ডিসেম্বর মাসে পূজ্যপাদ মহারাজ দীক্ষা দান করতে আসেন। সেই দীক্ষা দান অনুষ্ঠানের সময় মহারাজের কিছু সেবা করার সুযোগ পাই। মহারাজের রাঁধুনি তারক আমায় মহারাজের খাবার রান্না করা শিখিয়ে দেয়। আমি তারকের সঙ্গে মহারাজের খাবার রান্না করে দিই। ওখানেই মহারাজ আমাকে জপের মালা দেন ২২ ডিসেম্বর ২০০২ এবং কিভাবে জপ করতে হবে শিখিয়ে দেন।

সেবা করার সুযোগে একদিন মহারাজের কাছে নিবেদন করলাম, যে আমি সাধু হবার জন্য এসেছি কিন্তু আমার মন এখানে ভাল লাগছে না, আপনি বলুন আমি কি করব? আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। মহারাজ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন তুমি যাবে আমার ওখানে। কাঁকুড়গাছিতে? আমি তো আনন্দে বলে ফেললাম, হ্যাঁ মহারাজ যাব, তখন মহারাজ সপ্তর্ষি মহারাজকে ডেকে বললেন, ও যাবে কাঁকুড়গাছিতে, তুমি শ্যামল কে (জিতাত্মানন্দ) বলে দাও। সপ্তর্ষি মহারাজ শ্যামল মহারাজকে বলে দিলেন।

শ্যামল মহারাজ পরে আমাকে বুঝিয়ে ওখানে রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আমার মন তখন কাঁকুড়গাছিতে চলে গেছে। মহারাজ রাজকোট থেকে চলে আসার পর আমি ১লা জানুয়ারিতে রাজকোট থেকে কাঁকুড়গাছির জন্য রওনা দিই।

৩রা জানুয়ারি ২০০৩ আমি কাঁকুড়গাছি পৌঁছায়। পৌঁছে মহারাজকে প্রণাম করতে মহারাজ অজিত মহারাজকে (স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী) ডেকে বললেন আমার থাকার ব্যবস্থা করতে। তারপর তিন-চার দিন পর একদিন প্রণামের সময় বাদল মহারাজ (স্বামী পূর্ণানন্দজী) পূজনীয় মহারাজের কাছে থেকে ওনার অফিসে কাজের জন্য আমায় চেয়ে নিলেন। প্রায় তিন মাস আমি অফিসে কাজ করলাম তারপর পূজনীয় অজিত মহারাজ আমাকে মহারাজকে বলে ভান্ডারী মহারাজের সঙ্গে ভান্ডারে কাজ করতে বললেন। সেখানেও প্রায় সাড়ে তিন মাস কাজ করার পর আমাকে Book Sale-এ কাজ করতে বললেন। ওই বছরের শেষে অর্থাৎ ঠাকুরের তিথি পূজার পর মহারাজের একজন সেবক ব্রহ্মচারী অমর ট্রেনিং সেন্টারে চলে যাবে, তাই মহারাজের সেক্রেটারি মহারাজ (সপ্তর্ষি মহারাজ) আমায় ডেকে বললেন, অমর Training Centre চলে যাবে। তোমাকে ওর কাজ দেখতে হবে তুমি এখন থেকে কাজ দেখতে আরম্ভ কর।

২০০৩ এর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আমি মহারাজের সেবকরূপে কাজ করতে আরম্ভ করি।

ব্রহ্মচারী অমর মহারাজ আমাকে সবরকম কাজ শেখাচ্ছেন কিন্তু মহারাজের ঘরের ভেতরের কোন কাজ অর্থাৎ মহারাজ ঘরে থাকাকালীন যে কাজ কর্ম থাকে সেগুলি কিছুই বলছেন না। এই ভাবে প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল। আমার মন তখন মহারাজের কিছু সেবা করার জন্য খুব ব্যাকুল হয়েছে। তাই আমি একদিন বিকালে মহারাজের ঘরের সামনে বারান্দায় ব্রহ্মচারী অমর মহারাজের সঙ্গে বসে আছি, তখন হলো ঘরে ভক্তরা মহারাজজীকে প্রণাম করছেন। আমি অমর মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনি আমাকে মহারাজের ঘরে কি করতে হয় সেগুলি বলছেন না?” অমর মহারাজ বললেন, “ধৈর্য্য ধর, অন্তত এক মাস এই সব বাইরের কাজ করার পর মহারাজ যদি খুশি হন তাহলে ঘরের কাজ করতে অনুমতি দেবেন।” শুনে মনটা একটু খারাপ হলো। মনে মনে ভাবছি, “এখনও একমাস অপেক্ষা করতে হবে! ঠিক আছে তাই হোক।” সেই সময় একজন আমাদের কর্মী এসে খবর দিল যে প্রণাম শেষ হয়েছে। অমর মহারাজকে সে বলল যে মহারাজকে ঘরে নিয়ে আসুন। অমর মহারাজ দৌড়ে গিয়ে প্রণাম ঘর থেকে মহারাজকে নিয়ে এলেন ঘরে। মহারাজের সঙ্গে সেক্রেটারি

সপ্তর্ষী মহারাজও এলেন। আমি বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছি। মহারাজ এমনিতে কথা খুব কম বলতেন। বেশীর ভাগ ইশারায় কথা বলতেন। মহারাজ ঘরে ঢোকার আগে আমার দিকে তাকিয়ে কিছু ইশারায় জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সপ্তর্ষি মহারাজ বললেন, 'মহারাজ ব্রহ্মচারী অসীম আপনার সেবক, অমর তো ট্রেনিং সেন্টার চলে যাবে, তাই ওকে এখানে নেওয়া হয়েছে।" মহারাজ কিছু বললেন না শুধু আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ঘরে চলে গেলেন, কিছুক্ষণ পর অমর মহারাজ বেরিয়ে এসে আমায় ডেকে বললেন, মহারাজ তোমায় ডেকেছেন ভেতরে এসো। আমি ভেতরে যেতেই বললেন, "বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে ভেতরে কি কাজ তা শেখা হয়ে যাবে? ভেতরে এসে দেখতে হবে তো কি করতে হয়।" আমি সেই মুহূর্তে নির্বাক, ভাবছি, তিনি আমার মনের কথা সব জেনেছেন। পরে অমর মহারাজ আমায় বললেন তোমার ভাগ্য ভাল, মহারাজ তোমায় এত তাড়াতাড়ি ডেকে নিলেন।

মহারাজের কাছে থাকাকালীন একদিন ভক্তদের প্রণাম শেষ হলে মহারাজজীকে ঘরে নিয়ে এসেছি এমন সময় মহারাজের সেবক অরবিন্দ মহারাজ আমায় বললেন, তুমি যাও, মহারাজের খাবারটা রেডি করে নিয়ে এসো। এদিকে মহারাজ আমার হাতে ধরে পায়ের জুতো জোড়া খুলে অন্য জুতো পায়ে দিচ্ছেন।

অরবিন্দ মহারাজ একটু পরে আবার ঘরে ঢুকে বললেন, "সে কি, তুমি এখনও যাও নি, তোমায় বললাম যে খাবার নিয়ে এসো। শুনে মহারাজ বললেন, "ও যাবে কি করে, ওকে তো আমি ধরে রেখেছি।" সেই কথা আজও মনে পড়লে ভাবি 'আমার কোন ভয় নেই, কোথাও যাবার নেই। মহারাজ আমায় ধরে রেখেছেন।

এরকম অনেকবার হয়েছে, যে আমি যা ভাবছি মহারাজ যেন তা জানতে পেরেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, একদিন মহারাজ কে খেতে দিয়েছি তিন রকম সব্জি, ৪/৫ রকম সেদ্ধ ইত্যাদি। তার মধ্যে একটা সজনের ডাঁটা ছিল প্রায় এক বড় বাটি। সাধারণত মহারাজ সবরকম সব্জি, দই ও ভাত একটি বাটিতে নিয়ে মিশিয়ে খেতেন। সেদিন বসেই প্রথমে ওই সজনের ডাঁটা একটার পর একটা খেয়ে চলেছেন। অন্য কিছুতে হাত দিচ্ছেন না। আমি মনে মনে ভাবছি আজ মহারাজ শুধু ডাঁটাই খাচ্ছেন, এতেই তো পেট ভরে যাবে। এমনিতেই খুব কম খেতেন। এরকম ভাবছি তখন মহারাজ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'আর একটা ডাঁটা খাবো'। আমি তো অবাক। উনি আমার মনের সব কথা যেন জেনেছেন।

২০০৫ এর এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী

মহারাজের মহাসমাধির পর স্বামী গহনানন্দজী মহারাজজী প্রেসিডেন্ট হয়ে বেলুড়মঠে আসেন। যেহেতু আমার তখনও Training Centre হয়নি তাই সপ্তর্ষি মহারাজ আমায় নিয়ে মহারাজের কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ অসীম কি আমাদের সঙ্গে বেলুড় মঠে যাবে আপনার সেবক রূপে?" মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ নিশ্চই যাবে। ও আমাদের সঙ্গেই ওখানে থাকবে।" মহারাজের অনুমতি পাওয়ায় সপ্তর্ষি মহারাজ আমাকে মহারাজের জিনিসপত্র দিয়ে ৭ জুন ২০০৫ বেলুড় মঠে পাঠিয়ে দিলেন। সপ্তর্ষি মহারাজের নির্দেশে মঠে প্রেসিডেন্ট মহারাজের কোয়াটারে গিয়ে মহারাজের থাকার ঘর এবং সেবকদের থাকার ঘর সব রং করে পার্টিশন দিয়ে রেডি করা হলো। ২৪ শে মে মহারাজ প্রেসিডেন্ট হয়ে মঠে এলেন। সমস্ত ট্রাস্টি মহারাজ এবং অন্যান্য সাধুরা মহারাজজীকে মালা পরিয়ে এবং বরণ করে ঘরে নিয়ে এলেন। সাধুবৃন্দরা সকালে প্রণাম করে মহারাজকে সংঘগুরু রূপে বরণ করলেন।

আমাদের ১৫ তম প্রেসিডেন্ট মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ প্রথম মালা পরালেন ও প্রণাম করে বললেন, "আপনি এখন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, এবার ছাড়তে হবে। চেপে রাখলে হবে না।" মহারাজ হাসছেন। সকলের চোখে মুখে আনন্দ।

মহারাজের ও পূজনীয় আত্মস্থানন্দজীর মধ্যে এক অদ্ভুত ভালবাসা ছিল। মঠে থাকাকালীন রোজ ভোরে ৫টার সময় মহারাজ হাঁটতে বেরোতেন। আমি ও বিকাশ মহারাজ সঙ্গে যেতাম। দূর থেকে ঠাকুর, মা, স্বামীজিকে প্রণাম করে এবং সমাধীপীঠেও প্রণাম করে ঘরে ফিরে আসতেন। এই সময় প্রতিদিন এক মজা হতো। ঠিক ওই সময় আত্মস্থানন্দজীও প্রণাম করতে আসতেন এবং দুজনের সঙ্গে মায়ের মন্দিরের সামনে দেখা হতো। প্রথম দিন আত্মস্থানন্দজী হাত জোড় করে প্রণাম করে সেবকের কাছ থেকে একটি চকলেট নিয়ে সেটার cover খুলে মহারাজকে নিজে হাতে খাইয়ে দিলেন। মহারাজও চকলেট নিয়ে আত্মস্থানন্দজীর হাতে দিলেন।

এরকম প্রতিদিনই হতো। প্রত্যেকবার আত্মস্থানন্দজী নিজে হাতে মহারাজকে খাইয়ে দিতেন। মহারাজের ডাইবেটিস আছে বলে, সুগার ফ্রী চকলেট এনে আমরা আত্মস্থানন্দজী মহারাজের সেবককে দিয়ে রাখতাম। মহারাজ চাইলে সেবক তখন ওই চকলেট ওনার হাতে দিতেন। ওই সময় যারাই মায়ের মন্দিরে আসে পাসে থাকত সেই দৃশ্য দেখার জন্য ছুটে আসত।

মহারাজ যখন ভোরে হাঁটতে বেরোতেন তখন কাকের ডাক শুনে আমাদের জিজ্ঞাসা করতেন, কাকেরা কি বলছে জানো? আমরা বলতাম, না মহারাজ। ওরা কি বলছে

মহারাজ? তখন মহারাজ একটা শ্লোক শোনাতেন—

তিমিরারি তমোহন্তি ভয়ে চকিত মানসঃ।
বয়ং কাকা বয়ং কাকা জল্পন্তি ইতি বায়সঃ।।

অর্থাৎ অন্ধকারকে দূর করে যখন সূর্য উঠছে আর সূর্যের আলোতে অন্ধকারের কালো আবরণ চলে যাচ্ছে অর্থাৎ নাশ হচ্ছে তখন কাক যে সারারাত ওই কালো অন্ধকারের সঙ্গে মিশে ছিল, ভাবছে আমাদেরও এবার নাশ হতে হবে তাই সূর্যের কাছে বলছে 'বয়ংকাকা' অর্থাৎ আমরা কাক আমরা অন্ধকার নই। আমাদের নাশ করো না। সকালে হাঁটার সময় আর একটা শ্লোক বলতেন,

পৃষ্ঠতঃ সেবয়েৎ অর্কম্, জঠরেণ হুতাশনম্।
স্বামীনা সর্বভাবেন, পরলোকং অমায়য়া।

অর্থাৎ পিঠে সূর্যের তাপ গ্রহণ করতে হয়, এবং আগুন পোহাতে হয় সামনের দিক দিয়ে অর্থাৎ পেটের দিক দিয়ে। 'স্বামীনা সর্বভাবেন' অর্থাৎ এই শরীরে যিনি আছেন তাঁকে সর্ব প্রকারে সেবা করতে হবে এবং যারা চলে গেছে তার জন্য মায়া করে লাভ নেই তাই 'অমায়য়া'।

কাঁকুড়গাছিতে থাকাকালীন আমায় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেটি আমার সারাজীবন কাজে লাগবে। ঘটনাটি এইরকম—আমি মহারাজের ঘরের বাইরে বারান্দায় বসে আছি। মহারাজ বেল বাজালেন। আমি ছুটে গেছি ঘরে গিয়ে দেখি মহারাজ পূর্ণ মহারাজের সঙ্গে (বাদল মহারাজ) কথা বলছেন। আমি দাঁড়িয়ে আছি, মহারাজ আমায় কিছু বলছেন না। আমি তখন বেলের সুইচটা দেখছি। দেখি সুইচটা রাখা আছে টেবিলের উপর একটা বইয়ের ভেতর। আমি তখন ভাবলাম ওই বইয়ের চাপে বেল বেজেছে। আমি আবার বাইরে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পর আবার বেলটা বাজলো। আমি আবার ভেতরে গেলাম গিয়ে দেখি মহারাজ বাদল মহারাজের সঙ্গে কথা বলছেন। আমি বাইরে চলে এলাম। তৃতীয়বার যখন বেল বেজেছে তখন অরবিন্দ মহারাজ ঘরে ঢুকছেন, তখন আমি অরবিন্দ মহারাজকে বললাম, "মহারাজ ওই বেলের সুইচটা বইয়ের মধ্যে থেকে বের করে রাখুন না। বারবার মহারাজের হাত লেগে ওটা বাজছে। অরবিন্দ মহারাজ ভেতরে গিয়েই বেরিয়ে এসে বললেন, তোমাকে মহারাজ ভেতরে ডাকছেন। আমি ভেতরে গেলাম, মহারাজ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমায় যে আমি বেল বাজিয়ে ডাকলাম তুমি এলে না কেন? আমি বললাম, মহারাজ আমি ভেবেছি ওটা বইয়ের চাপে বাজছে। মহারাজ বললেন, "তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করলে

না কেন আমি ডেকেছি কিনা। তুমি কেন ওরকম ভেবে নিলে। জান তুমি যদি এরকম না জেনে অন্যকিছু ভেবে নাও তাহলে অনেক ক্ষতি হতে পারে। এইরকম নিজের মন থেকে কখনও ভেবে নেবে না, আসল সত্যটা জেনে নেবে"। আমি তখন মহারাজের কাছে ক্ষমা চাইলাম, 'মহারাজ আমার ভুল হয়েছে আর কখনও ওরকম হবে না। পরে ভেবে দেখলাম মহারাজ আমায় এই শিক্ষা দেবার জন্যই হয়ত ওইরকম করে ডেকেছিলেন।

মহারাজের কাছে থাকাকালীন অনেক সময় মহারাজ আমাদের জীবনে ঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে শাসনও করতেন। একবার আমি স্নান ক'রে মহারাজের ঘরে গিয়েছি, আমার শিখা খোলা ছিলো। মহারাজকে প্রণাম করে উঠতেই মহারাজ একটু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, শিখা খোলা কেন? শিখা কি লোক দেখানোর জন্য খোলা রেখেছ? আমি বললাম, এই সবে স্নান করে এলাম তাই বাঁধা হয়নি। মহারাজ একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "না যাও আগে শিখা বেঁধে এসো। ব্রহ্মচারী কখনো কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। ব্রহ্মচারী জীবনে খুব সাবধানে এগিয়ে যেতে হয়। আর কখনোই যেন এরকম না হয়।"

মহারাজ কোথাও যখন দীক্ষা বা কোনো অনুষ্ঠানে বাইরে যেতেন, মন্দিরে প্রণাম করতে গিয়ে ঠাকুরের সামনে অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যেন ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলতেন। শেষের দিকে যখন মাঝে মধ্যে ভুলে যেতেন তখন আমাদের মধ্যে যে কেউ তখন সেখানে উপস্থিত থাকতো তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, আমি কোথায় যাচ্ছি, কবে ফিরবো, ইত্যাদি। বলে দিলে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আমরা এটা অনুভব করতাম যে মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরকে সব কিছু বলে অনুমতি নিয়ে যাচ্ছেন।

‘শ্রীগুরুচরণসরোজরজ নিজমনমুকুর সুধার’

স্বামী বেদানুরাগানন্দ

মহাত্মা তুলসীদাস গোস্বামীজি তাঁর সুবিখ্যাত মঙ্গলাচরণে বলছেন-‘শ্রীগুরুচরণসরোজরজ নিজমনমুকুর সুধার’—অর্থাৎ তিনি শ্রীগুরুরচরণধূলি সহায়ে নিজের মন-দর্পণ পরিশুদ্ধ করছেন। তুলসীদাসজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের স্মরণ মনন করতে বসেছি নিজের চিত্তদর্পণ নির্মল করার জন্য। নিজের সীমিত ক্ষমতা জেনেও শিবমহিম্নঃ স্তোত্রের ভাষায় ভরসা জোগাড় করে এই প্রচেষ্টায় অগ্রসর হচ্ছি—মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ পুণামীত্যর্থেঽস্মিন পুরমথন বুদ্ধির্ব্যবসিতা’-তোমার গুণবর্ণরূপ পুণ্যের দ্বারা নিজের বাক্যকে পবিত্র করব মনে করেই স্তবে আমার বুদ্ধি প্রবৃত্ত হয়েছি।

আমি যখন পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজকে প্রথম দর্শন করি তখন আমি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। মুগ্ধ হয়েছিলাম পূজনীয় মহারাজের আনন্দোজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শন করে। পূজনীয় মহারাজজী তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ এবং রামকৃষ্ণ মঠ যোগোদ্যানে অবস্থান করছেন। সেইখানেই পরমপূজ্যপাদ মহারাজ কৃপা করে এক পুণ্যদিনে আমাকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন। তারপর থেকে বিভিন্ন সময় পূজনীয় মহারাজের সান্নিধ্যলাভ করে ধন্য হয়েছি। মহারাজের সাথে বিভিন্ন সময় কিছু আলোচনা করার সুযোগ ঘটে। মহারাজ বলতেন ‘যা কথা হচ্ছে লিখে রাখবে।’ তাই কিছু কিছু লিখে রাখার চেষ্টা করতাম। সেই ডায়েরীর পাতা থেকেই কিছু সুগন্ধি স্মৃতিপুষ্প চয়ন করে মহারাজের চরণে আমার বাঙ্ময়ী পূজা নিবেদন করছি।

৮ই জানুয়ারী, ২০০২, রামকৃষ্ণ মঠ যোগোদ্যান

সাধারণতঃ দীক্ষার আগে পূজনীয় মহারাজ একদিন দীক্ষার্থীর সাথে দেখা করতেন। এইদিনে আরো কয়েকজনের সাথে আমারও ডাক পড়ে। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা

প্রসঙ্গে মহারাজজী স্বামী বিবেকানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্র—'স্থাপকায় চ ধর্মস্য'প্রসঙ্গে উপস্থিত দীক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করেন—'এতে কারো আপত্তি আছে?' আমার শুনে মনে হলো শ্রীরামকৃষ্ণের জগতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক দীক্ষার্থীদের মূল eligibility এই প্রণাম মন্ত্রে নিবদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য পরিচিতিতে বিশ্বাস—ঠাকুর যে ধর্মসংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত, তিনি যে সর্বধর্মের ঘনীভূত বিগ্রহ এবং অবতারবরিষ্ঠ এ বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস থাকা দরকার। অন্যান্য আলোচনার মধ্যে সেইদিন পূজনীয় মহারাজ গয়ার গদাধর কিভাবে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন সে কথাও বলেন। অন্য সময়েও মহারাজকে এই প্রসঙ্গটি করতে শুনেছি। ভক্তদের মধ্যে ঠাকুর যে স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবান এই ধারণাটি সুদৃঢ় করে দিতেন মহারাজ।

৯ই জানুয়ারী, ২০০২, রামকৃষ্ণ মঠ যোগোদ্যান

দিনটি শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের পুণ্যজন্মতিথি। এইদিন আমি পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্র দীক্ষালাভ করে ধন্য হই। দীক্ষার শুরুতে পূজনীয় মহারাজের সুগম্ভীর-সমাহিত দৃষ্টিপাত মনে গভীর রেখাপাত করে। দীক্ষার দিন পূজনীয় মহারাজ বলেন 'আজ শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীগুরুমাধ্যমে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেন' এবং সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, সেবা প্রকৃতি সাধনায় চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকবেন। মন্ত্রজপের সময় একই সঙ্গে ইষ্টমূর্তি ধ্যান করব কিনা জিজ্ঞাসা করায় পূজনীয় মহারাজ বলেন তুমি তোমার বন্ধুর নাম ধরে ডাকলে কি তাকে মনে পড়বে না?' এইদিন সেবার প্রসঙ্গে পূজনীয় মহারাজ বলেন একজন তৃষ্ণার্তকে জল দিলেও সেবা হয়। দীক্ষান্তে মহারাজের মধ্যে এক পরমতৃপ্তি আর প্রশান্তি লক্ষ্য করলাম। দীক্ষার্থীদের বললেন 'সবাই তো কলকাতারই। কোন প্রশ্ন জাগলে, অসুবিধা হলে এসো।' তারপরই একটা দারুণ লোভনীয় কথা বললেন—যে যত করবে, সে তত পাবে'।—এই বুঝি ঠাকুরের বলা 'বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান!' আর শ্রীগুরুর কাজ শিষ্যের মধ্যে এই 'পরম লোভ' জাগানো—গুরু-নির্দিষ্ট সাধন সহায়ে সেই 'পরম ধন' লাভের।

২৭শে জুলাই ২০০২, রামকৃষ্ণ মঠ যোগোদ্যানঃ

গুরুপূর্ণিমার কয়েকদিন পর, গুরুপূর্ণিমা তিথিতে পূজনীয় মহারাজ কাশ্মীরে শ্রীশ্রীঅমরনাথজীকে দর্শন করে এসেছেন। সেই বিষয়ে কথা হচ্ছে

এক ভক্ত : আপনি কি আমাদের অমরনাথ যেতে Suggest করবেন ?

পূজনীয় মহারাজ : মন তৈরি করে যাওয়া উচিৎ নাহলে শুধু sight seeing হবে।

এই প্রসঙ্গে মহারাজ ভারতের অনন্য আধ্যাত্মিক শক্তির কথা বলেন যা অন্যত্র দুর্লভ। স্বামীজির কথা উদ্ধৃত করে বলেন অন্য দেশের 'blast of brimpets and march of whorts' এখানে নেই। ভারতের বৈশিষ্ট্য নীরব আধ্যাত্মিক জয়যাত্রায়।

এক ভক্ত : আপনার কি সেখানে (অমরনাথে) কোন experience হলো ?

পূজনীয় মহারাজ : সেটা আমার personal.

এবার অন্যান্য প্রসঙ্গক্রমে মহারাজজী রসিকতা করে বলছেনঃ

'একজনের পেছনে পেছনে এক ভক্ত আসছে। সে জিজ্ঞাসা করল "আচ্ছা এরকম কেন বলে—আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, ভক্তি দিতে কাতর হই।" প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন "আরে বুঝলি না, মুক্তি দিলে সব চলে যাবে আর ভক্তি দিলে এরকম পেছনে পেছনে ঘুরবে।'

২৮শে ডিসেম্বর, ২০০২, রামকৃষ্ণ মঠ যোগোদ্যানঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতি শেষ হয়েছে। সন্ধ্যা ৬ টার পর ভক্তদের প্রণামের পর পরমপূজ্যপাদ মহারাজ ভক্তদের উদ্দেশ্যে বললেন :

"ভগবানলাভই মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। দুর্গাপূজার বিসর্জনের সময় মায়ের কাছে আমরা কত কি চাই—বিশাল ফর্দ। কিন্তু যাকে পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়, যাকে জানলে সব জানা হয়ে যায়, মানুষ আত্মতৃপ্ত হয়ে যায়। আপ্তকার্য হয়ে যায়—কোন বাসনাই থাকে না—সেই তাঁকেই চাই না—তিনিই বাদ পড়ে যান।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোথাও ঈশ্বরলাভের কোন স্থান নেই। সেই উপনিষদের বাণী 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহস্মযৎ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈব অপরা চ'—দুই প্রকার বিদ্যা—অপরা-ব্যবহারিক জ্ঞান—সেই জানার কোন শেষ নেই, এবং পরা—যা জানলে সব জানা হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃবিয়োগের পর দাদা রামকুমার তাঁকে নিয়ে আসেন কলকাতায়। কিন্তু সাধারণ শাস্ত্রশিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলে দেন—'যে চালকলা বাঁধা বিদ্যা শিখব না।' দাদা বুঝলেন তাঁকে দিয়ে সংসার সামলানো সম্ভব নয়—সাধারণ ব্যবহারিক বিদ্যার অধ্যয়ন ঠাকুর করেননি। তিনি সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন ব্যাকুলতা সহায়ে ঈশ্বরলাভের চেষ্টায়। বলছেন—'মা, তুই রামপ্রসাদ, কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছিস—আমি কি তোর পর?' ঠাকুর বিভিন্নভাবে সাধনা করেছেন—'শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক, ইসলাম, খ্রীষ্টান।'

এরপর পূজনীয় মহারাজ জপধ্যান বিষয়ে বলছেন : "দীক্ষার Form এ লেখা থাকে 'নিয়মিত জপধ্যান করতে পারবেন তো?' সবাই লেখে "হ্যাঁ"। কিন্তু পরে বলে 'অমুক কাজে সময় পাই না।'

Fixed time-এ শুতে যেতে হবে। Fixed Time-এ উঠতে হবে। ৫ ঘন্টার বেশী ঘুম যেন না হয়।

নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন 'মন চঞ্চল, কি করে স্থির হবে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অভ্যাসের দ্বারা।"

এক ভক্ত : পুরোহিতদের পুজো পছন্দ হয় না। পুজো, মন্ত্রোচ্চারণ unperfect। মঠের পুজো দেখে আর কিছু ভালো লাগে না। মঠের থেকে Training দিলে ভালো হয়।

পূজনীয় মহারাজ : মঠের থেকে পুরুত তৈরির Training?! তুমি তো দীক্ষিত তোমার training তো হয়ে গেছে। আন্তরিকতা থাকলে সব হবে। এরপর মহারাজ সেই ভক্তকে বলেন সেই সাধুকে যোগাযোগ করতে তিনি পূজা লেখাতে রাজি আছেন।

সেবক মহারাজ : চাইলেই শেখা যায়—পূজারী মহারাজের থেকে।

পূজনীয় মহারাজ : শ্রীরামকৃষ্ণপূজা পদ্ধতি রয়েছে।

ভক্ত : অন্যান্য পূজোর বিষয়ে?—লক্ষ্মীপূজা-সরস্বতীপূজা ?

পূজনীয় মহারাজ : তুমি যে দেবতাকে পেয়েছো (ইষ্টরূপে) তাঁর পূজো আগে কর। একই পদ্ধতি শুধু অন্যান্য পূজার নাম বদলে যাবে।

এরপর পূজনীয় মহারাজ বলছেন :

"আগে চতুরাশ্রম প্রথা ছিল—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য্য—এই সময় থেকেই অভ্যাস আরম্ভ করতে হবে। ঈশ্বরলাভ করলে—সব পাওয়া হয়—বড় বড় কষ্টেও কিছু হয় না।"

৯ই জানুয়ারী, ২০০৩, রামকৃষ্ণ মঠ, যোগোদ্যান :

আমার দীক্ষার একবছর পূর্তি হওয়ায় একটি ফুলের boquet ইত্যাদি নিয়ে পূজনীয় মহারাজের কাছে গিয়েছি। গিয়ে বললাম 'আজকে আমার দীক্ষার দিন'। পূজনীয় মহারাজ শুনে খুব খুশী হলেন মনে হলো। ফুলের boquet দেখে জিজ্ঞাসা করলেন 'এটা কি ঠাকুরের জন্য এনেছ'? আমি বললাম, 'আপনার আর ঠাকুরের জন্য'। সেবক মহারাজকে ডেকে পূজনীয় মহারাজ বললেন, 'এই যে ওর আজকে দীক্ষার দিন। এটা

কি মন্দিরে দিয়ে আসবে?" আমি প্রণাম করার আগেই দেখি পূজনীয় মহারাজ দুহাত বাড়িয়ে আছেন আশীর্বাদ করার জন্য। আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেই পূজনীয় মহারাজের কোলের কাছে মাথাটা বাড়িয়ে দিতেই দুহাত দিয়ে আমার মাথায় আশীর্বাদ করলেন।

৯ই জানুয়ারী, ২০০৪, রামকৃষ্ণ মঠ যোগোদ্যান :

এইদিন একটি ফুলের মালা নিয়ে গিয়েছিলাম। পূজনীয় মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম 'মালাটি একটু পরবেন?' পূজনীয় মহারাজ বললেন "তুমি পরিয়ে দাও"। আমি মালা পূজনীয় মহারাজের গলায় পরিয়ে দিলাম। আমি মহারাজের কাছে নিবেদন করি 'পড়াশোনা শেষ করে ত্যাগের জীবন যাপন করতে খুব ইচ্ছা করে। কিভাবে প্রস্তুত এবং যোগ্য হতে পারি যদি কিছু উপদেশ দেন। পূজনীয় মহারাজ বলেন "দেখতে হবে মন cooperate করছে কিনা। সব সময় তিনি অন্তরে (হৃদয় দেখিয়ে) রয়েছেন—এই ভেবে সর্বদা স্মরণমনন করবে, অন্তরে জপ করবে।" পূজনীয় মহারাজ খোঁজ নিলেন আমি কি করি, বাড়িতে কে কে আছে এবং পরে আবার আসতে বললেন। আমায় নিজে হাতে লজেন্স দিলেন।

সেইদিন ভক্তদের সাথে কথাপ্রসঙ্গে তাঁর একবারের মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অভিজ্ঞতা বলেন পূজনীয় মহারাজ। সেখানে সকালে বাথরুমে মগ তুলতে গিয়ে আর পারছেন না। পরে বুঝলেন মগের নীচে লেগে থাকা জল জমে বরফ হয়ে যাওয়ায় এই কান্ড। কথাবার্তার পর মহারাজ আর উঠতে চাইছেন না সেবক মহারাজের অনুরোধ সত্ত্বেও। মহারাজকে আরো কিছুক্ষণ কাছে পেয়ে আমাদেরও আনন্দ। শেষে ১০ মিনিট পর মহারাজ বললেন, চলো। একদিকের ভক্তদের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে চলে যাচ্ছেন এমন সময় এক ভক্ত বলে উঠলেন, 'মহারাজ আমাদের দিকে তাকালেন না! পূজনীয় মহারাজ পিছন না ফিরে বলে উঠলেন—হ্যাঁ—পিছনেও একটা চোখ আছে!' পূজনীয় মহারাজের বৈশিষ্ট্য ছোট্ট কথায় রসিকতা ও উপদেশ।

বিভিন্ন সময়ে যোগোদ্যানে পূজনীয় মহারাজ নানা প্রশ্নের উত্তরে যে সকল অমূল্য উপদেশ দিতেন আমাদের তার কয়েকটি উদাহরণ নীচে নিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি :

১) অনেক সময় সন্ধ্যায় ভক্তদের প্রণাম হয়ে গেলে পূজনীয় মহারাজ সবাইকে তাঁর সামনে বসে জপধ্যান করতে বলতেন। খুবই দুর্লভ সেই সব মুহূর্ত। এক বিশেষ দিনে পূজনীয় মহারাজের নির্দেশে সবাই তাঁর সামনে জপধ্যান করছি। এমন সময় কয়েকজন ভক্ত নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন দেখে পূজনীয় মহারাজ বলে ওঠেন 'এমন কাজ দিইনি যে সময় পাবে (কথা বলার)'। কথাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—তিনি

যেই পথে আমাদের প্রেরণ করেছেন সেই পথ বা লক্ষ্য ছাড়া। অন্য কোনদিকে মন দেওয়ার সময় থাকা উচিৎ নয় উদ্যোগী সাধকের।

২) একবার এক ভক্ত বলেন তার মন চঞ্চল ইত্যাদি। পূজনীয় মহারাজের সংক্ষিপ্ত এবং তীক্ষ্ণ উত্তর 'মনটা কার?' অর্থাৎ আমরা বলছি 'আমার' মন অথচ মন আর আমার বশে নেই—কি অদ্ভুত পরিস্থিতি।

৩) পূজনীয় মহারাজ বলতেন 'মনকে একটা সীমার মধ্যে রাখা উচিৎ। যখনই সুযোগ হবে জপ কর। একটা Fixed Routine থাকা দরকার। রাতে বেশী খাবে না।' 'সূর্য্য ওঠার আগে আমি উঠব'–এইরকম challenge নিতে বলতেন মহারাজ।

৪) প্রশ্ন : জপের ফল সমর্পন করতে হয় কেন ?

পূজনীয় মহারাজ : 'রেখে কি করবে?'

সেদিন মহারাজ এই ছোট কথায় বুঝিয়ে দেন ভালো-মন্দ সর্বপ্রকার কর্মের কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব থেকে মুক্ত হতে হবে আমাদের।

৫) প্রশ্ন : ঠাকুরের ধ্যান করতে গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে মনে পড়ে।

পূজনীয় মহারাজ : (রসিকতা করে) মাকে কি বলবে চলে যাও ? মা বলেছেন 'আমি আর ঠাকুর কি আলাদা?' এই জন্যই আমাদের সব জায়গায় ত্রয়ী।'

৬) প্রশ্ন : নিষ্কামভাবে কর্ম কিভাবে করা উচিৎ?

পূজনীয় মহারাজ : 'এই চাই সেই চাই নয়' (তবে নিষ্কামকর্ম)

৭) প্রশ্ন : জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে কি পার্থক্য ?

পূজনীয় মহারাজ : একটা পুকুরে অনেকগুলি হাঁড়ি ডোবানো রয়েছে।

৮) প্রশ্ন : ঠাকুর-স্বামীজির বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে আমরা কিভাবে প্রতিবাদ করব?

পূজনীয় মহারাজ : নিজের ক্ষমতা বুঝে প্রতিবাদ করবে। না হলে এখানে যে শ্রদ্ধা এসেছে তা নষ্ট হতে পারে।

প্রশ্ন : আমি কিভাবে ঠাকুর-স্বামীজির কাজ করতে পারি ?

পূজনীয় মহারাজ : এখানে যা পেয়েছো তাই বলবে।

৯) ক্রোধ সংবরণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় পূজনীয় মহারাজ বলেন, 'রাগ করলে তো তোমারই ক্ষতি।'

১০) ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রসঙ্গ উঠতে পূজনীয় মহারাজ খুব জোরের সাথে বলে

ওঠেন, "ভগবান আছেন, আছেন বই কি, আছেন।'

১১) মাঝে মাঝে পূজনীয় মহারাজ খুব ভাবের সাথে একটি কথা বলতেন—'দেহ মন্দির। তার মধ্যে ভগবান !

১২) কেউ যদি এসে বলতেন তার দীক্ষা হয়েছে,—পূজনীয় মহারাজ পরম স্বস্তির সাথে বলতেন 'ব্যাস্'। শুনে কিছুটা আন্দাজ হত দীক্ষালাভ, গুরুকৃপালাভ যে কতবড় নিরাপদ আশ্রয়।

১৩) পূজনীয় মহারাজ বলতেন 'সৎগ্রন্থ' পড়ে যা ভালো লাগে তা diary-তে লিখে রাখবে আর মাঝে মাঝে পড়বে।'

১৪) পূজনীয় মহারাজ বলতেন বাংলাদেশের এক পরিবারে একশ জন সদস্য কিন্তু সবাই মুখে থাকে কারণ সকলের একটাই লক্ষ্য। Common Ideal থাকা দরকার।

১৬ই আগস্ট, ২০০৪, বেলুড় মঠ :

এদিন পূজনীয় মহারাজ বেলুড় মঠে আসেন কোন কাজে। স্বামীজির ঘরের পাশে গঙ্গার দিকের দোতলার বারান্দায় আমরা মহারাজকে প্রণাম করছি। এক ভক্ত পূজনীয় মহারাজের চরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে সেবক মহারাজ নিষেধ করলেন। পূজনীয় মহারাজ সেই ভক্তটিকে বললেন তুমি বোঝনি। মাথা হলো গুরুর স্থান-তাকে পায়ে লাগাতে নেই।'

২০০৮ সাল, রামকৃষ্ণ মঠ, যোগোদ্যান :

একবার স্বপ্নে দর্শন প্রসঙ্গে পূজনীয় মহারাজ বলেন—'স্বপ্ন স্বপ্নই। ওটা স্বপ্ন আর এই যে কথা বলছি এটা বাস্তব। স্বপ্ন ভালো হলে ভালো, খারাপ হলে সাবধান হয়ে যেতে হয়। মনোযোগ দিয়ে করলে (কোন সাধন) হয় (দিব্যস্বপ্ন)।'

৮ই জানুয়ারী, ২০০৫, রামকৃষ্ণ মঠ, যোগোদ্যান :

পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম করতে গিয়েছি একান্তে। পূজনীয় মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন 'স্মরণ মনন করছ তো?'। আমি সঙ্ঘে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে মহারাজ বাড়ির সব খবর নিয়ে বললেন 'তোমার মতলব তাদের জানিয়েছো? তাদের আপত্তি আছে কি?' ইত্যাদি। পূজ্যপাদ মহারাজের সচিব মহারাজ তাঁকে অনুরোধ করলেন আমায় আশীর্বাদ করতে। মহারাজ আশীর্বাদ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন 'তোমার বয়স কত?' আমি বললাম। পূজনীয় মহারাজ বললেন 'তোমরা পড়া শেষ করে নাও—এখনও বয়স আছে, এখানে যাতায়াত কর, যোগাযোগ রেখো।' আমি তাঁর

কাছে প্রার্থনা করে বললাম 'আপনি কৃপা করুন যেন এখানে আসতে পারি।' পূজনীয় মহারাজ বললেন, "তুমি নিজেই নিজেকে কৃপা কর।' সচিব মহারাজ ও 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং'-এর কথা বললেন।

এইদিন সকলের প্রণামের পর পূজনীয় মহারাজ বলেন, 'বেলুড় মঠে গত তিন দিন ধরে মা ঠাকরুণের ১৫০ বছর উপলক্ষ্যে উৎসব হয়ে গেল—কে কে গিয়েছিলে?' আমরা হাত তুললাম। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগলো?' সবাই বললেন 'খুব ভালো।' একজন ভক্ত বললেন, 'মনে হচ্ছিল স্বর্গে আছি।' পূজনীয় মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বললেন 'স্বর্গ ছেড়ে আসা।...'বলে হাসলেন। তারপর মায়ের কথা বলছেন। 'ঠাকুর কাশীপুরে মাকে বললেন তোমাকে অনেক কাজ করতে হবে...।' এইকথা বলতে বলতে পূজনীয় মহারাজ যেন বিভোর হয়ে গেলেন। অন্তর্মুখ হয়ে গেলেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, বেলুড় মঠ :

দিনটি পবিত্র শিবরাত্রি তিথি। সারারাত্রিব্যাপী শিবপূজা দর্শন করব বলে বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ তখন সঙ্ঘাধ্যক্ষ। বিকালে সব মন্দির প্রণাম করে পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম করতে প্রেসিডেন্ট মহারাজের ভবনে (গিরিশ মেমোরিয়ালে) গিয়েছি। বিশেষ দিন বলে ভক্তদের ভিড় এবং পূজনীয় মহারাজের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম হচ্ছে না। প্রণাম নিবেদনের পর এক কোণে দাঁড়িয়ে আছি। একজন ভক্ত মহারাজকে বললেন 'আজকের দিনে আপনাকে স্পর্শ করে প্রণাম করতে পারলাম না।' শুনে পূজনীয় মহারাজ বলে উঠলেন 'কাছেই তো আছি'—এই বলেই তাঁর মাথার উপর শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজির ছবির দিকে নির্দেশ করলেন হাত দিয়ে। আবার একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন 'আমার কি মুক্তি হবে?" (এজন্মে)'। এবার পূজনীয় মহারাজ কিছুটা রসিকতার সুরে বললেন 'এত তাড়া কি আছে?'!

অন্যান্য দিনের টুকরো স্মৃতি-ছবি

১) মনে পড়ছে এক বর্ষার দিনে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে বিকালে গিয়েছি পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম নিবেদন করতে, খুব বৃষ্টি হয়েছে। উপস্থিত ভক্তসংখ্যা কম। তাই সন্ধ্যারতির পর প্রণাম পর্ব শেষ হতেই পূজনীয় মহারাজ আমাদের বললেন 'কাছে এসে বসো একটা গল্প বলব।' আমরা সানন্দে মহারাজের একেবারে পায়ের কাছে গিয়ে বসলাম। মহারাজ সেদিন অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনীর গল্প বলেন। কিভাবে দেবী অন্নপূর্ণা নিজের আত্মপরিচয় দেন রহস্যভরে এবং কিভাবে নৌকায় পার হন। শেষে

পূজনীয় মহারাজ বলেন ‘অনেক রাত হলো। এদিকে (কাঁকুড়গাছি, যোগোদ্যান অঞ্চলে) আবার খুব জল জমে। সবাই যেতে পারবে তো? আমাদের কিন্তু কোন নৌকা নেই!' গল্পে রেশ টেনে এই কথা বলায় আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

২) পরমপূজনীয় মহারাজ তখন প্রেসিডেন্ট। খুব সম্ভবতঃ ২০০৫ সালের এপ্রিল মাস। মহারাজ যোগোদ্যানে এসেছেন একটি অনুষ্ঠানে। কাছে একটি পার্কে স্বামীজির মূর্ত্তি উন্মোচন করতে গেলেন। পূজনীয় মহারাজ স্বামীজির গলায় একটি মালা পরালেন। মালাটি রজনীগন্ধার এবং মাঝে মাঝে গোলাপ দেওয়া। আমি অবাক হয়ে দেখলাম মহারাজ মালাটি পরিয়ে গোলাপের position ঠিক করছেন, যাতে সমান্তরাল এবং synthetic হয়। কি নিপুণ ছিল তাঁর প্রতিটি কাজ। মন্দিরে অর্ঘ্য দেওয়ার সময়েও দেখেছি যতক্ষণ না অর্ঘ্যটি সুন্দরভাবে বসিয়েছেন ততক্ষণ তৃপ্ত হতেন না।

মনে পড়ছে অন্যান্য শ্রদ্ধেয় মহারাজদের কাছ থেকে পূজ্যপাদ মহারাজ সম্পর্কে বেশ কিছু অমূল্য স্মৃতিকথা শোনার সৌভাগ্য হয় আমার। তার অন্তত কয়েকটা এখানে বলার লোভ সামলাতে পারছি না।

৩) একবার পূজনীয় মহারাজ এক আশ্রমে গিয়েছেন। তখন তিনি সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ। নবাগত ব্রহ্মচারীদের জিজ্ঞাসা করছেন ‘তোমরা কেন এখানে (সঙ্ঘে) এসেছো? উত্তরে কেউ বলেন মুক্তির জন্য। কেউ ভগবান লাভের জন্য ইত্যাদি। সব শুনে পূজনীয় মহারাজ বললেন ‘সবাই কিছু পেতেই এসেছো? কিছু দিতে আসেনি?' এই ঘটনাটি বলে সেই শ্রদ্ধেয় মহারাজ বলেন, ‘সেদিন পূজ্যপাদ মহারাজ ছোট্ট কথায় সমগ্র সাধনরহস্যটাই উপস্থাপিত করেন তাদের সামনে।

৪) একবার কয়েকজন ব্রহ্মচারী মহারাজ এক কেন্দ্র থেকে রামকৃষ্ণ মঠ যোগোদ্যানে একটি সাধুভান্ডারায় আসছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের মনে একটু লজ্জাবোধ ভাবলেন সবাই ভাববে নির্লজ্জের মতো ভান্ডারায় খেতে এসেছে। যাইহোক যোগোদ্যানে পৌঁছে সবাই প্রসাদ পেতে বসেছেন। ইতিমধ্যে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ প্রসাদগ্রহণ পর্ব পরিদর্শন করতে এসে সেই ব্রহ্মচারী মহারাজ যেখানে বসেছেন সেখানে চলে এসে তাকে চমকে দিয়ে বললেন 'তুমি কিন্তু নিলর্জ্জের মতোই খেও!' এমন ছিল পূজনীয় মহারাজের অন্তদৃষ্টি।

৫) পূজ্যপাদ মহারাজ কোন একটি আশ্রমে গিয়েছেন দীক্ষা দিতে। বাথরুমে যাবেন। বাথরুমের সামনে একটি পাপোশে বড় বড় দুটি পায়ের ছাপ আঁকা । সেবক মহারাজ রসিকতা করে পূজনীয় মহারাজকে বলেন ‘দেখেছেন মহারাজ, নারায়ণের পা শুনেই

মহারাজ বলে উঠলেন 'কি বললে? নারায়ণের পা?—সরিয়ে রাখো—অন্য পাপোশ আনো।' যেই শুনেছেন নারায়ণের পা অমনি সত্যিকারে নারায়ণের চরণেরই উদ্দীপন! আর নিজে সেই পাপোশে পা দিতে পারলেন না।

৬) একবার বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে মাকে প্রণাম করতে গিয়ে পূজ্যপাদ মহারাজ দণ্ডায়মানা শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন। সেবক মহারাজ এই দর্শনের তাৎপর্য বিষয়ে জানতে চাইলে পূজ্যপাদ মহারাজ বলেন এর মানে 'মা সবসময় আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।' সেবক মহারাজের কাছে শুনেছি মায়ের উপর তাঁর বিশেষ টান ছিল এবং বিভিন্ন সময় 'মা', 'মা' এই বলতেই বেশি শুনেছেন। সেবক মহারাজ আরও বলেন বেলুড়মঠে গঙ্গার দিকের দেওয়ালে ফ্রাঙ্ক ডোরাকের আঁকা মায়ের ছবি থাকতো। পূজনীয় মহারাজ ওই দিকেই মুখ করে শুতেন। কোথাও গেলে মঠে মাকে বলে যেতেন।

৭) সেবক মহারাজের কাছে আরো শুনেছি পূজনীয় মহারাজ কিরকম রসনাজয়ী ছিলেন। তাঁর জিহ্বায় লাগাম ছিল অসাধারণ। একদিকে সব মিশিয়ে খেতেন—কোনটা আলাদা করে taste করতেন না—অথচ তাঁর শরীর ও হজম শক্তি খুব ভালো ছিল। অন্যদিকে তাঁর কথা ছিল সীমিত। কথা কম বলতেন এবং বাজে কথা বা অপশব্দ একেবারেই ব্যবহার করতে না। কাউকে কিছু বলতে হলে আলাদা ভাবে বলতেন—সবার সম্মান রক্ষা করতেন। যার যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি সম্মান দিতেন। বলতেন Energy store কর—অনেক কাজে লাগবে।

৮ই মে, ২০০৭, বেলুড় মঠ :

সঙ্ঘে যোগদানের খুব ইচ্ছা কিন্তু নানা কারণে হয়ে উঠছে না। এই দোটানা নিয়ে পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম করতে গিয়েছি। প্রণাম করতেই হঠাৎ মহারাজ বলে উঠলেন 'কবে আসবে?' ব্যাস্ যেন একটা দিক খুলে গেল—সব দ্বিধা যেন দূর হতে লাগল। এক ভক্ত বলছেন তিনি ছুটিতে পুরী যাবেন। পূজনীয় মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন 'তোমারও ছুটি!'

২০০৭ সালের মে মাস, রামকৃষ্ণ মঠ, জামতাড়াঃ

পূজ্যপাদ মহারাজের মহাসমাধির কয়েকমাস আগে এসেছেন নির্জন-শান্ত জামতাড়ায়। আমিও এসেছি দিন সাতেক পূজনীয় মহারাজের সান্নিধ্যে থাকব বলে। রোজ সকালে আর বিকালে মঠের সামনের রাস্তায় কিংবা ধু ধূ প্রান্তরে মহারাজের

সাথে হাঁটতে যেতাম। পূজনীয় মহারাজ যেন বালকের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। কোকিলের 'কুহু' 'কুহু' ডাকে মহারাজও প্রত্যুত্তর দিতেন 'কুহু'বলে। আশ্রমের সামনে দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে দেখে তাঁর হাঁটার লাঠি উঁচিয়ে ট্রেনযাত্রীদের বুঝি সম্বর্ধনা জানাতেন। তাঁরই মধ্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন আশ্রমের একটি বাড়ির উঠোনের বালব জ্বলছে সকালবেলায়। একজন বালব নেভাতে ছুটলো।

একদিন জামতাড়ায় কয়েকজন ভক্ত পূজনীয় মহারাজের জন্য অনেক জিনিসপত্র নিয়ে আসেন। এত জিনিস আনার প্রয়োজন নেই এই অর্থে মহারাজ বললেন, "আমাদের তো ঠাকুর সেরকমভাবে রাখেননি (অভাবে)। সচিব মহারাজ যখন বলেন এসব তারা গুরুসেবার জন্য এনেছেন। তখন পূজনীয় মহারাজ বললেন 'গুরুসেবা আরো অনেকভাবে করা যায়।' বলেই হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'কি ঠিক তো?' আমি মাথা নাড়লাম। কি জানি, হয়তো, শ্রীগুরুর নির্দেশ মতো সাধন এবং ঠাকুর স্বামীজির কাজের মাধ্যমে গুরুসেবার কথাই বললেন।

জামতাড়া থেকে চলে আসছি যখন, তখন পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম করে আবার নিবেদন করি 'আপনি আশীর্বাদ করুন যেন ঠাকুরের সঙ্ঘে আসতে পারি।' পরমপূজ্যপাদ মহারাজ খুব করে মাথায় দুহাত ভরে আশীর্বাদ করে বললেন 'তোমাকে এখানে আসতেই হবে—তোমার কথা অনুযায়ী'। তাঁর আশীর্বাদ আমার চিরন্তন পাথেয়।

পরমপূজ্যপাদ মহারাজের অনেক কথা বলেও যেন কত কি না বলা রয়ে গেল—যা বলে বোঝানো যায় না। ছোট্ট ছোট্ট কথা প্রেমপূর্ণ কৃপাদৃষ্টি-অপার স্নেহ—আরো কত কি। প্রণাম করার পর যখন বলতেন 'অনেকদিন পর'—কি যে ভালো লাগত। কখনো ফুলের মালা গেঁথে নিয়ে গিয়েছি-ঠিক খেয়াল করতেন। জামতাড়ায় হেঁটে ফিরে ঘরে যাচ্ছেন। সেবক মহারাজ বলছেন 'মহারাজ এবার আরাম করুন'। মহারাজ অমনি বলতেন 'আরাম হারাম হ্যায়'। মাঝে মাঝে রহস্যপূর্ণভাবে জিজ্ঞাসা করতেন 'তুমি কে?' কখনো বা খোঁজ নিতেন 'করছো তো?' কেউ প্রণাম করতেই মহারাজ হাত বাড়িয়েছেন আশীর্বাদ করতে। কিন্তু সেই ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক প্রণাম করে পিছন ফিরে চলে যাচ্ছে খেয়াল নেই যে পূজনীয় মহারাজ হাতছানি দিয়ে তখনও ডাকছেন। আর সর্বোপরি পূজ্যপাদ মহারাজের সেই অসাধারণ হাস্যোজ্জ্বল দিব্যমূর্ত্তি দেখলেই মনটা ভরে যেত। আমার কাছে পূজ্যপাদ মহারাজ আমার Hero!

আমার খুব ইচ্ছা ছিল পূজনীয় মহারাজের শরীর থাকতে থাকতে যেন সঙ্ঘে যোগদান করতে পারি। তখন মনে আশঙ্কা হত এ না হলে বুঝি আর হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজি এবং পরমপূজ্যপাদ মহারাজের আশীর্বাদে তা সম্ভব হয়েছিল। আমার join করার ঠিক পরেই পূজনীয় মহারাজ সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন।

মহাসমাধির আগে কয়েকবার সেবাপ্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলাম পূজ্যপাদ মহারাজকে দর্শন করতে। শেষরোগশয্যায় শায়িত পরমপূজ্যপাদ মহরাজকে স্মরণ করলে একটাই বেদনাদীর্ণ প্রার্থনা জাগে—

'যবে মনে পড়ে করুণার ছবি
পরদুখে ম্রীয়মান
পরপাপ বহি রোগ-জ্বালা সহি
তাপিতে করিলে ত্রাণ ।
দেব কি মানব পরিচয়ে আজ
হেন প্রেমিকের বল কিবা কাজ
শুধু লয় মনে রাতুল চরণে
করিতে জীবনদান।'

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভাবপ্রবাহে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

স্বামী উর্জিতানন্দ

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চতুর্দশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মুষায় 'নিকষিত হেম', সারদা সায়রে স্নাত এবং বিবেকানন্দ প্রভায় উদ্ভাসিত এক যুগন্ধর অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্ব। সঙ্ঘের সুমহান পরম্পরার সার্থক সম্মিলনে তাঁর জীবন যাপন, ধর্ম, কর্ম সবই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ হতে উদ্ভুত, শ্রীরামকৃষ্ণে স্থিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণেই পর্যবসিত। সুতরাং এই অনন্য জীবনের সান্নিধ্য যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা ধন্য। যাঁরা সে অর্থে সান্নিধ্য পান নি শুধু দূর হতে দেখেছেন—তাঁরাও ভাগ্যবান কেন না "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা"। আর যাঁরা মহারাজজীকে দেখার বা জানার সুযোগ পাননি তাঁরাও কোনওভাবেই নিস্ফলের দলে নেই, কেননা দিব্যত্রয়ীময় যে সকল জীবন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে নানা ফুল ডোরে সজ্জিত ও সমৃদ্ধ করেছে—সেই সকল জীবনে, তাঁদের উক্তিতে : কর্মে এক অসীম শক্তি বর্তমান থাকে যা কিনা অনাগত কালকেও অনুপ্রাণিত করে চলে। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভাবপ্রবাহে পূজ্যপাদ মহারাজজীর জীবনকে পর্যালোচনা করলে যে সকল অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলী ভাস্বর হয়ে ওঠে সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে পূজার ডালায় নৈবেদ্য করেই বর্তমান লেখকের গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সারা হবে।

১) **"জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"** : "স্বামী গহনানন্দ মানে সেবাপ্রতিষ্ঠান আর সেবাপ্রতিষ্ঠান মানেই স্বামী গহনানন্দ"—এমনটাই বলতেন দ্বাদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দ জী মহারাজ। স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজ শিশুমঙ্গলে যে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন, গহনানন্দজী মহারাজ তাকেই সেবাপ্রতিষ্ঠান নামক আত্মহোমের যজ্ঞশালায় রূপান্তরিত করেছিলেন। যে অপরিসীম শ্রম, অনতিক্রমণীয় প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সর্বপ্লাবী ভালোবাসা দিয়ে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধন করেছেন তা রূপকথার গল্পের মতোই অবিশ্বাস্য। ধীরে ধীরে তিনি মেডিসিন, সার্জারি,

গাইনোকলজি, নিউরোলজি, বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস, নার্সিং ট্রেনিং প্রভৃতি বিভাগ সংযুক্ত করেন। অসহায় রোগীদের দিনের পর দিন ফ্রি তে চিকিৎসা করিয়েছেন। মহারাজ ডাক্তারদের বলতেন রোগীদের আত্মীয় জ্ঞানে সেবা করতে। মহারাজকে কেউ কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলে তাঁর ধ্রুবপদে বাঁধা উত্তর ছিল "আমি ভালো নেই। যেখানে বাড়িতে একজন অসুস্থ থাকলে বাড়ির সকলেই দুঃখিত হন, সেখানে এই বাড়িতে (অর্থাৎ সেবাপ্রতিষ্ঠানে) শ্রীরামকৃষ্ণ পরিবারের এত জন অসুস্থ, সেখানে আমি কেমন করে ভালো থাকব?" এতটাই ছিল তাঁর একাত্মবোধ। Sympathy, Empathy ইত্যাদি শব্দবন্ধ দিয়ে বা মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কচকচানি দিয়ে এই অনুভবকে মাপা যায় না। নিভৃত প্রাণের দেবতা যখন সর্বত্র দৃষ্ট হন তখন সেই ভাগবত সিঞ্চিত হৃদয়েই এই স্বানুভব ধরা দেয়। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র ব্রতে দধীচির মতো রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে পুষ্ট করেছেন যে সকল কিংবদন্তী সাধুরা সেই স্বামী কল্যাণানন্দ (কনখল সেবাশ্রম), স্বামী নিশ্চয়ানন্দ (কনখল সেবাশ্রম), বনবিহারী মহারাজ (কাশী সেবাশ্রম) প্রমুখ ঋষিকল্প সন্ন্যাসীদের সার্থক উত্তরসূরী ছিলেন পূজ্যপাদ গহনানন্দ জী মহারাজ।

২) **"কর্ম যেথায় উপাসনা আর ক্লান্তি নৈবেদ্য"** : গহনানন্দজী মহারাজ ছিলেন একজন আদর্শ কর্মযোগী। অতি প্রত্যুষেই তাঁর কর্মমুখর দিনের সুর ভাজা শুরু হয়ে যেত, দিনমণি অস্তাচলে যাবার পরেও গভীর রাত অবধি চলত তাঁর 'work as worship'— ক্লান্তি কথাটি তাঁর অভিধানবহির্ভূত ছিল। "কর্মণ্যে বাধিকারতে মা ফলেষু কদাচন" গীতোক্ত এই কর্ম রহস্য তাঁর জীবনকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে জারিত করেছিল, তিনি শুধুমাত্র ঠাকুরের কাজ করছি এই ভাবনাতেই মাতোয়ারা ছিলেন, কর্মের ফল নিয়ে আদৌ ভাবিত ছিলেন না। সেবাপ্রতিষ্ঠানে একে সময় দুর্যোগের ঝড় বয়ে গিয়েছে। তিনি কিন্তু সকল অবস্থাতেই ধীর, স্থির, প্রশান্ত—নিজ কর্তব্যে অটল, নিজ কর্মযোগে অচ্যুত। সেবাপ্রতিষ্ঠানে গণ্ডগোল এক সময় এমন পর্যায়ে চলে যায় যে তৎকালীন বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ সেখানকার কাজ বন্ধ রাখতে বলেন। সে সময় গহনানন্দজী শুধুমাত্র প্রবল কর্মোদ্যোগ, দিব্য সাহস আর ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীলতাকে পাথেয় করেই কাজ চালিয়ে যাবার সবিনয় আবেদন রাখলে বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা তাঁর কথায় সায় দেন। সেবাপ্রতিষ্ঠানে এই মুহুর্তে রোগীর আত্মীয়রা ঝামেলা করছেন তো পর মুহূর্তে কর্মীদের প্রতিরোধ, আজকে কর্মীদের মাসিক বেতনের টাকা নেই তো কালকে জনৈক ভক্তের অন্যায় আবদার, এর সাথে সাথে দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েন-জনিত বিশৃঙ্খলা—এই বহুবিধ সমস্যার ঘূর্ণিঝড় তিনি দৃঢ় হস্তে মোকাবিলা করেছিলেন শুধুমাত্র ঠাকুর-মা-

স্বামীজির উপর অতলান্ত শরণাগতি দিয়ে। ধীরে ধীরে একসময় আশঙ্কার কালো মেঘ কেটে গেলে সেবা প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গহনানন্দজী মহারাজ নির্বিকার চিত্তে, নির্মোহ ভঙ্গীতে পূজ্যপাদ গম্ভীরানন্দজী মহারাজকে (তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক) জানিয়েছিলেন বেলুড় মঠ চাইলে তিনি সেবা প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ করতে প্রস্তুত আছেন। তাঁর সুনিপুণ কর্মযোগময় জীবনে এইরূপ আত্মবিলয়েরও দিব্য প্রকাশ ঘটেছিল। মহারাজজী'কে কেউ কখনোও ক্রোধ অথবা উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখেন নি। খুব রেগে গেলে উনি শুধুমাত্র 'বেতালা' ও 'আহাম্মক' এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্যক্তিত্বের এমনই একটি aura ছিল যে তার সামনে যেকোনো প্রগভলতা, অশিষ্টাচার, অন্যায় প্রতিরোধ ইত্যাদি বৃথা গর্বে ম্রিয়মান হয়ে যেত। কর্মজীবনে নানাবিধ সমস্যা যখন তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরত তখনও তিনি প্রভুর প্রতি অন্তহীন অথচ নীরব প্রার্থনায় রত থাকতেন। প্রস্টেট গ্ল্যান্ড, ফিসচুলা, হার্টের গোলমাল, স্লিপ ডিস্ক ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি নানাবিধ শারীরিক সমস্যাকে রীতিমতো উপেক্ষা করে গহনানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করে যেতেন। পরবর্তীকালে তিনি মঠ ও মিশনের সহসম্পাদক নির্বাচিত হলে সেবা প্রতিষ্ঠান ও বেলুড় মঠের প্রধান কার্যালয়ের যুগপৎ দায়িত্ব সামলাতেন। দিনের প্রথমভাগে সেবা প্রতিষ্ঠানের কাজ করে দ্বিতীয়ার্ধে তিনি মঠে আসতেন। বহু রাত পর্যন্ত সাধুদের সঙ্গে বিভিন্ন কার্যাদি করতেন এবং পরদিন সকালে আবার পুনরায় সেবা প্রতিষ্ঠানে ফিরে যেতেন। তিনি বলতেন "কাজের চাপ যত বেশি হবে ততই আমি ভালো থাকি।"

৩) **"স্তব্ধ ভবতি, মত্ত ভবতি, আত্মরাম ভবতি"** : মহারাজের জীবনে আপাত অর্থে নিরলস কর্মের প্রকাশ বেশি ঘটলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁর জীবনে কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগের সুষম সমন্বয় ঘটেছিল। মহারাজের চরিত্র সংযম ও পরিমিত বোধ দ্বারা এতটাই উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল যে ভক্তির অন্তঃসলিলা ফল্গু সদাই প্রবহমান থাকলেও কদাচিৎ তা দশের সামনে উন্মুক্ত হত। মহারাজ সর্বক্ষণ-ই মানস জপ করতেন। একদা হিরন্ময়ানন্দজী ও তিনি ত্রিবান্দ্রম থেকে মোটর সহযোগে কন্যাকুমারী যাচ্ছিলেন। মাঝপথে গাড়ির ব্রেক ফেল করায় আপদকালীন পরিস্থিতিতে দুই জন সন্ন্যাসী পাশে ঝাঁপ দিয়ে গাড়ি হতে নেমেছেন। গহনানন্দজী সে সময় এত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলেছিলেন যে বেলুড় মঠে ফিরে এসে হিরন্ময়ানন্দজী'র সুনিশ্চিত মন্তব্য ছিল "spontaneously নরেশ'কে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলতে শুনে আমার মনে হলো ও নিশ্চয় সবসময় জপ করে।" পূজনীয় স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজেরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ত্রিপুরার আগরতলা হতে উদয়পুরে যাবার পথে গাড়িতে আগুন লাগলে

গহনানন্দজী ‘জয় রামকৃষ্ণ’ বলে দ্রুত গাড়ি হতে নেমে এসেছিলেন। মহারাজ যখন'ই গাড়িতে কোথাও যাতায়াত করতেন তখন হয় দরকারি কাগজপত্রাদি দেখতেন ও সই-সাবুদ করতেন নয়ত নিঃশব্দে নীরবে তন্ময় হয়ে জপ করতেন। তাঁর এই পাহাড়প্রমাণ দৈনন্দিন কাজের মধ্যেও তিনি তাঁর দৈনিক সাধন ভজনের ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ঠাশীল ছিলেন। নিয়ম করে একাসনে জপ করতেন। কিন্তু অবাক হওয়ার বিষয় ওই তীব্র কর্মশীলতা এবং সুনির্দিষ্ট জপধ্যানকে তিনি এমনভাবে মিলিয়েছিলেন যে তাতে ভাবাদর্শ বা সময়মতো কোন বিরোধই কখন ঘটেনি। পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের জীবনেও আমরা এমনটি দেখতে পায় জপ করা, ফাইল দেখা, মিটিং করা, প্রুফ দেখা সকল কাজই ছিল তাঁর কাছে সমান আদৃত—নানা মাধ্যম দিয়ে সেই এক ঈশ্বরেরই উপাসনা করা...এটিই হলো রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাবধারা ও পরম্পরা। গহনানন্দজী মহারাজ সুদীর্ঘ জীবনে যখন মাঝে মাঝে নির্জন বাসের সুযোগ অথবা কর্মান্তে পর্যাপ্ত সময়ের অবকাশ পেয়েছেন তখন তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। অদ্বৈত আশ্রমের কর্মী হিসাবে তিনি মায়াবতীতেও থেকেছেন। মহারাজ নিজেই বলেছেন “খুব আনন্দের ছিল সেই মায়াবতী বাস...আমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলাম রাত দুটো-আড়াইটায় ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে। তারপর সহজেই জপধ্যান করা যায়। একদিন অন্ধকার রাত, দোতলার বারান্দায় কম্বল জড়িয়ে বসে আছি... অন্ধকারে বড় বড় গাছগুলো সব শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উপনিষদে আছে—“বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ।” জ্ঞানের প্রকৃত অর্থ তো “সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ”, “দুঃখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী মুনিঃ উচ্যতে”, “শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ” ইত্যাদি শ্লোকেই পরিস্ফুট। বলাবাহুল্য পূজ্যপাদ মহারাজজী’র জীবনেও এই শ্লোকগুলি যেন বিমূর্ত হয়ে উঠেছিল। ভক্তি ছিল তাঁর অন্তরের নিভৃত সাধনকক্ষ যখন তিনি প্রভু বা শ্রীশ্রীমায়ের সামনে দুই হাত জোড় করে প্রণাম নিবেদন করতেন—তখন তা দেখার মতো জিনিসই ছিল বটে। দুই চোখে এত আকৃতি, এত শরণাগতি, এত আত্মনিবেদন ছিল যে তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়, যারা স্বচক্ষে দেখেছেন তারা আপন মণিকোঠায় তা সযত্নে লালন করবেন। প্রণামও যে একটা দেখার বা শিক্ষণীয় জিনিস হতে পারে তা পূজ্যপাদ মহারাজকে দেখেই বর্তমান লেখক অনুভব করেছিল। মহারাজদের মতো মহান সন্তরা ঠিক কিভাবে ইষ্টকে ভালোবাসেন তা সাধারণের পক্ষে ঠাওর করা দুস্কর। কিন্তু আকস্মিক বিদ্যুৎ উদ্ভাসে যেমন অন্ধকার রাত্রির কৃষ্ণাবরণ ঘুচে ঠিক তেমনি তাদেরই এক একটি উক্তিতে বা আচরণে তাঁদের অধ্যাত্ম মাহাত্ম্য যেন কিছুটা হলেও অনাবৃত হয়ে পড়ে।

পূজনীয় মহারাজজী'র খুব সুন্দর একটি কথা আছে। ঠাকুরকে কেমন করে ডাকতে হয়, না মেলায় সন্তান হারিয়ে গেলে মা যেভাবে সন্তানকে খোঁজেন ঠিক সেই ভাবে ডাকতে হয়। আবার কখনও কখনও মনে হয় তাঁর শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিই পাগল করা টানটা বেশি ছিল। সহসম্পাদক থাকাকালে যখন তিনি সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে রাত্রে মঠে ফিরতেন সে সময় মঠের সব মন্দিরই প্রায়দিনই বন্ধ হয়ে যেত। তথাপি তিনি গঙ্গাতীরে মায়ের মন্দিরের বন্ধ দরজার সামনে এসে মা'কে প্রণাম নিবেদন করে তারপর অন্যত্র যেতেন। শ্রীশ্রীমাকে তিনি এত গভীর মরমের সাথে ভালবেসেছিলেন যে "করুণা পাথার জননী আমার" গানটির "তাপিতের তরে নারীদেহ ধরে অশেষ যাতনা সহিতে" লাইনটি শুনলেই তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠত। মা দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন নিদারুণ শৌচের কষ্ট পেয়েছিলেন তা মহারাজকে সারা জীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। তাই বিভিন্ন দুর্যোগ-পরবর্তী কালে মঠ ও মিশনের রিলিফের অংশ হিসাবে যখন পুনর্বাসন প্রকল্পগুলির ব্যবস্থা হত সে সময় মহারাজ শুধুমাত্র গৃহনির্মাণের ব্যবস্থাটুকু করেই ক্ষান্ত হতেন না, প্রয়োজনে বাজেট বাড়িয়ে গৃহ-নিকটস্থ শৌচাগারের নির্মাণেও ব্রতী হতেন যাতে আর কোন মা'কে শৌচের জন্য কষ্ট পেতে না হয়। এভাবেই মহারাজের ভাবনায়, কর্মে লোকতীত আর লোকায়ত একাকার হয়ে যেত। মহারাজ প্রকাশ্যে সেভাবে কখনও তাঁর দর্শনাদি সম্বন্ধে কিছু বলতেন না, তবে জনৈক সেবক যখন মহারাজজীকে জানান যে তাঁর দর্শনাদি সম্বন্ধে কিছু জানলে অনুজ সাধুরা সাধন ভজনে আরো উৎসাহ পাবে তখন মহারাজ বলেছিলেন- "একবার যখন আমি সেবা প্রতিষ্ঠানে ছিলাম, তখন সেখান থেকে উদ্বোধনে মায়ের বাড়িয়ে গিয়ে ওপরে মাকে প্রণাম করতে গেছি। মায়ের পদচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করছিলাম। তখন দেখলাম, আমার পাশে শ্রীশ্রীমা সাক্ষাৎ দাঁড়িয়ে আছেন।

৪) **প্রাচীনদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য** : পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ ছিলেন গহনানন্দজী মহারাজের মন্ত্রদীক্ষাগুরু তথা ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস গুরু। কালীকৃষ্ণ মহারাজের দীর্ঘকালীন সঙ্গ তিনি পাননি বটে তবে পূজনীয় মহারাজজী'র সাথে পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন। বিরজানন্দজী মহারাজ যখন বেলুড় মঠে থাকতেন সেই সময় গহনানন্দজী গুরুদেবের জন্য অদ্বৈত আশ্রম থেকে রান্না করে নিয়ে যেতেন। বিরজানন্দজী কয়েকটি চিঠি তে তাঁর স্নেহের নরেশকে লিখেছিলেন "কাজ লইয়া থাকিলে শরীর মনের খুব একটা training হয় এবং উহারা জপধ্যান করিবার সামর্থ্য লাভ করে।" "হাজারই কাজের হাঙ্গামা থাকুক না কেন জপধ্যানের অভ্যাসটি ছাড়িও না। উহাই সাধুজীবনের প্রধান বল ও অবলম্বন। বাজে কাজে ও

কথায় সময় নষ্ট করবে না।" পূজ্যপাদ শঙ্করানন্দজী মহারাজের থেকেও তিনি অধ্যাত্ম জীবনের অনেক পথনির্দেশ পেয়েছিলেন। আর নির্বাণানন্দজী মহারাজের কাছেই তিনি ভুবনেশ্বর মঠে যোগদান করেছিলেন, শুধুমাত্র অধ্যাত্ম জগতেরই নয় পার্থিব অনেক কর্মকুশলতাও তিনি শিখেছিলেন সূর্যমহারাজের থেকে। পূজনীয় অচলানন্দজী মহারাজ'কে (কেদার বাবা) পুরীতে তিন মাস অন্তরঙ্গ রূপে পেয়েছিলেন ব্রহ্মচারী নরেশ, সেই সকল মণিমুক্তা তিনি আপন ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন যেটি কিনা পরিণত বয়সেও সযত্নে নিজের কাছে রাখতেন গহনানন্দজী মহারাজ। সেবা প্রতিষ্ঠানে সম্পাদক থাকাকালীন তিনি পূজনীয় দয়ানন্দজীকে অত্যুচ্চ সম্মান প্রদর্শন করতেন, সকল বিষয়েই তাঁর সাথে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতেন। পরবর্তীকালে যদি আমরা গহনানন্দজী মহারাজের জীবনকে দেখি তাহলে এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায় যে তিনি তাঁর গুরুদেবসহ সকল প্রাচীন সাধুদের প্রত্যেকটি আধ্যাত্মিক ও জাগতিক নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। পূজনীয় মাধবানন্দজী, প্রেমেশানন্দজী, বীরেশ্বরানন্দজী, গম্ভীরানন্দজী, ভূতেশানন্দজী, অভয়ানন্দজী (ভরত মহারাজ), জগদানন্দজী, রঙ্গনাথানন্দজী প্রমুখ বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসীদের তিনি গভীর শ্রদ্ধা করতেন। সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসাবে তিনি সঙ্ঘের প্রবীণদের চিকিৎসাদির জন্য সদা তন্নিষ্ঠ ছিলেন। পরবর্তীকালে গহনানন্দজী বলতেন "প্রাচীনদের সঙ্গলাভ করার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার তখন বেশ ঘটেছিল। সেটা আমার জীবনে বাস্তবিকই এক দুর্লভ প্রাপ্তি। পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দজী তখনও সশরীরে আছেন। স্বামীজি ও শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী সন্তানরা তখন তো অনেকেই আছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের সেবা দৃষ্টিভঙ্গি লাভের পরিবেশ পাওয়া গিয়েছিল। মনের বিশালতা বাড়ে, পুরো জগৎটাকে একটা বিশ্ব-পরিবার (Global Family) বলে মনে হয়।" আর সাধন জীবনে senior সাধুদের আশীর্বাদ, আস্থা, শুভেচ্ছা দুর্গম পথে আলোকবর্তিকার ন্যায় মার্গ দর্শন করিয়ে নিয়ে চলে। প্রবীণদের কতখানি স্নেহের, আস্থার পাত্র ছিলেন গহনানন্দজী সে সকল অজস্র ঘটনা মণিমুক্তোর মতো ছড়িয়ে আছে। শ্রীশ্রীমায়ের দুই রত্ন সন্তান মাধবানন্দজী ও দয়ানন্দজী দুজনেই মহারাজের সম্বন্ধে সুউচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মাধবানন্দজী'র কাছে টানা ছয় বছর দয়ানন্দজী দরবার করেছিলেন গহনানন্দ মহারাজকে সেবা প্রতিষ্ঠানে পাওয়ার জন্য। বীরেশ্বরানন্দ জী মহারাজও বহু বিষয়ে স্থিতধী গহনানন্দজী মহারাজের উপর নির্ভর করতেন। প্রভু মহারাজের কাছে সর্বদা একটি রেলিক্সের কৌটা থাকত, জীবনের সায়াহ্নে এসে একদিন প্রভু মহারাজ নরেশ মহারাজকে ডেকে জনান্তিকে বললেন "যখন দেখবে আমি শুচি-অশুচি রক্ষা

করতে পারছি না তখন আমার বুক পকেট থেকে ওটি তুমি বার করে নেবে ও তোমার কাছে রাখবে।" আর নির্বাণানন্দজী মহারাজ তো প্রাণাধিক ভালবাসতেন অনুজপ্রতিম নরেশ মহারাজকে। সূর্য মহারাজ বলতেন "ওর (নরেশ মহারাজ) মধ্যে rich spiritual stock আছে। একবার administration থেকে বেরিয়ে এলেই হু হু করে উপরে উঠে যাবে।" পরবর্তীকালেও গম্ভীরানন্দজী, ভূতেশানন্দজী, হিরন্ময়ানন্দজী বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে গহনানন্দজী'র মতামতকে গুরুত্ব দিতেন এবং তাঁর উপর নির্ভর করতেন। পূজনীয় মহারাজের থেকে সামান্য কিছু senior, সমসাময়িক অথবা কিছুটা junior যে সকল সন্ন্যাসীরা ছিলেন তাঁদের সাথেও ওনার শ্রদ্ধা-বন্ধুত্ব মিশ্রিত এক অনাবিল সম্পর্ক ছিল। গহনানন্দজী মহারাজ যখন সঙ্ঘ পরিচালনার ক্ষেত্রে উচ্চপদে আসীন তখনও অতীতের শ্রদ্ধাবনত সম্পর্কের সূত্র ধরে স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী'কে বিজয় দা, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী'কে কানাইদা, স্বামী অকুণ্ঠানন্দজী'কে শম্ভুদা বলে সম্বোধন করতেন। পঞ্চদশ সঙঘ্যাধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ছিলেন গহনানন্দ জী'র থেকে সামান্যই ছোট, দুজনের মধ্যে অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তখন মহারাজ সঙ্ঘ্যাধক্ষ। বয়সে মহারাজের থেকে বড় স্বামী বেদাত্মানন্দজী'কে দেখেই মহারাজ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেদাত্মানন্দজী'কে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে বললেন। ওদিকে বেদাত্মানন্দজী ও বারংবার সঙ্কুচিত হয়ে বলতে লাগলেন "তা কি হয়? তুমি আমাদের সঙ্ঘগুরু, তুমি আমার মাথায় হাত দাও।" শেষে গহনানন্দজী জোড় করে বেদাত্মানন্দজী'র পাদস্পর্শ করে তবে শান্ত হলেন।

৫) **অনুজদের প্রতি স্নেহ ও নিরভিমানিতা :** মহারাজকে ভুবনেশ্বর বা শিলং এ যারা দেখেছেন এবং পরবর্তীকালে সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক তথা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদাধিকারী রূপে বা তারও পরে দীক্ষাগুরু তথা সঙ্ঘগুরুরূপে—মহারাজের নিরভিমানী ও স্নেহশীল মনের কখনও কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি সকল সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিজের অনুজের মতোই স্নেহ করতেন। উনি যে খুব বড় বা গুরুত্বপূর্ণ কেউ একজন এমন ভাব তাঁর আচার-আচরণ বা কথাবার্তায় কখনও প্রকাশ পেত না। শিলং আশ্রমে কোন সাধুভাই কঠিন বিকোলাই রোগে আক্রান্ত হলে তাকে বারবার ধরে ধরে শৌচে নিয়ে গিয়েছেন, ভুবনেশ্বর মঠে পালা করে রাত জেগে সাধুভাই এর সেবা করেছেন। সেবা প্রতিষ্ঠানে জনৈক সাধু ভ্রাতা পা ভেঙ্গে যখন ভর্তি আছেন তখন নিয়ম করে তার পাশে গিয়ে মনে জোর জুগিয়ে গেছেন। বেলুড় মঠের প্রধান কার্যালয়ে রাত জেগে কাজ করতে করতে শুনতে পেলেন কোন এক সাধুভাই অসুস্থ প্রায় অচৈতন্য হয়ে ঘর নোংরা করে ফেলেছেন—তখন সেই রাতেই একজন কর্মীকে নিয়ে

তিনি পরিচর্যায় রত হলেন। এইরকম অগুনতি ঘটনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মহারাজের জীবন জুড়ে। অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিল তাঁর মন এবং সাথে সাথে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও ছিল অসাধারণ কিন্তু তার প্রকাশ ছিল ভারি স্নিগ্ধ। রাত ১২টায় কোন সাধুভাই তাঁর সাথে জরুরী আলোচনা সেরে শুতে গিয়েছেন, ভোরেই তাকে নিজের কেন্দ্রে ফিরতে হবে—পরের দিন ভোরে সে চমকে গিয়ে দেখছে মহারাজ নিজে breakfast নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হতচকিত সেই সাধুভাইকে খাবারটুকু দিয়েই মহারাজ তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগটুকু না দিয়েই নিজের ঘরে চলে গেলেন। এটিও কোন বিশেষ ঘটনা নয় বরং বেশ সাধারণ ঘটনাই বটে, অনেকের সাথেই এই অভিজ্ঞতা ঘটেছে। তিনি অত্যন্ত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও শালীন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং আশা করতেন সঙ্ঘের সকল সাধু-ব্রহ্মচারীরাই ওরকম হবেন। কাপড় শুকোতে দেবার সময় টান টান করে দড়িতে কাপড় মেলাই হোক বা পাঞ্জাবী পড়ার সময় সকল বোতাম ঠিক ঠিক ভাবে লাগানেই হোক—সব বিষয়েই ছিল তাঁর এক গোছানো ব্যাপার। সঙ্ঘের সুমহান ঐতিহ্য সম্বন্ধেও তিনি বারবার কনিষ্ঠদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতেন "দেখ, মনে রেখ, তুমি সাধু হতে এসেছ, তোমার মধ্য দিয়ে ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা ও ভাব প্রত্যক্ষ করতে চান। মঠের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রভুর প্রতিভু। তাই এমন কিছু করবে না, যাতে প্রভুর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়।"—আবার সর্বদা অনাঘ্রাত পুষ্প দিয়েই যে তিনি প্রভুর মালা গেঁথেছেন তা কিন্তু নয়। এমন বেশ কিছু সাধু কর্মী ছিলেন যারা কোথাও বেশিদিন টিকতে পারতেন না। মহারাজ তাঁদেরকেও যত্ন সহকারে নিজের কাছে রেখে দিতেন। বলতেন "অন্যত্র গেলে হয়ত ওর আর সাধু জীবন যাপনই করা হবে না। তাই আমাদের কাছেই থাক। কি আর হবে? কাজের ক্ষতি? তা একটা construction কাজের থেকে একটা সাধুর জীবন আমার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর তিনি ছিলেন বিস্ময়করভাবে নিরভিমানী। সেবা প্রতিষ্ঠানে যখন ছিলেন তখন সন্ন্যাসী, ডাক্তার, নার্স, সুইপার, অন্যান্য কর্মী সকলেই তাঁকে সেক্রেটারি মহারাজ বা বড় মহারাজ নয়, শুধুমাত্র নরেশ মহারাজ বলেই ডাকতেন। যোগদ্যান মঠে টেলিফোনের রিং শুনে নিজেই ধরেছেন এবং যখন জেনেছেন অন্য কোন সাধুর ফোন তখন স্ব-পরিচয় না দিয়েই সেই সাধুকে ফোন দিয়ে দিয়েছেন। যখন তিনি সঙ্ঘাধ্যক্ষ তখন কোন সাধু কখনও তাঁকে যদি বলেছেন যে প্রেসিডেন্ট মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি তখন মহারাজ পাল্টা প্রতিবাদের সুরে বলেছেন সঙ্ঘের সকলেই ঠাকুরের প্রতিনিধি। বিপরীত দিক থেকে তখন বিনম্র প্রতিক্রিয়া "আপনি আমাদের থেকে আলাদা।" যখনই এইরকম কথা শুনেছেন তখনই মহারাজ গম্ভীর হয়ে বলেছেন "দেখ

ঠাকুর কৃপা করে চরণে স্থান দিয়েছেন এই যথেষ্ট।" উনি যে সত্যিই সমগ্র রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট, বাকিদের থেকে কোথাও তার বিশেষত্ব আছে এই বোধটাই তাঁর ছিল না কারণ এতটাই ঈশ্বরময় সমত্বে আরূঢ় ছিলেন তিনি।

৬) **সময়ানুবর্তিত :** সময়ের অপচয় মহারাজ একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাই খোশ গল্প করে বাজে আড্ডা দিয়ে মহারাজকে সময় নষ্ট করতে কেউ কখনও দেখেন নি। "আমি সময়ের পিছনে ছুটব না, সময় আমাকে অনুসরণ করুক।"—এই ছিল মহারাজের জীবন দর্শন। কাজ শেষ করতে তাঁর যতই বেলা বয়ে যাক বা গভীর রাত হয়ে যাক দৈনন্দিন অন্যান্য আবশ্যকর্তব্যাদিগুলি তিনি যথাসময়েই সমাপ্ত করতেন।

৭) **দূরদর্শিতা :** মহারাজের দূরদর্শিতার একটি অন্যতম দিক ছিল তিনি সব সময় সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় ও শাখাকেন্দ্রগুলির জন্য নতুন জমি কেনার ব্যাপারে খুব তৎপর ছিলেন কারণ উনি মনে করতেন বর্তমানের সাপেক্ষে হয়ত যা জমি আছে তাতে চলে যাচ্ছে কিন্তু ভবিষ্যতে কর্ম সম্প্রসারিত হলে অধিক জমি জায়গা প্রয়োজন হয়ে পড়বে। এই ভাবনাকে প্রায়োগিক স্তরে কার্যকর করার ক্ষেত্রে ধনাত্মক অনুঘটকের ভূমিকা পালন করত আইনগত বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতাঋদ্ধ বাস্তব জ্ঞান। সেবা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে Vivekananda Institute of Medical Sciences যেখানে বিদ্যমান সেখানে আগে বস্তি ছিল, মহারাজের উদ্যোগেই সেখানকার বাসিন্দাদের সল্টলেক থেকে পুনর্বাসনের পরিবর্তে সেই জমিটি মঠ ও মিশনের হস্তগত হয়। একইভাবে কাঁকুড়গাছি যোগদ্যান মঠের তপোবনসদৃশ আশ্রমিক পরিবেশকে শাশ্বতরূপ দেওয়ার জন্য মহারাজ নিজের প্রচেষ্টায় পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গৃহস্থ বাড়ি এবং বহুদিন ধরে পড়ে থাকা হিন্দুস্থান লিভারের জমিটি কিনে নেন। মহারাজ এই আইনগত ব্যাপার খুব ভালো বুঝতেন বলেই সহসম্পাদক থাকাকালে সঙ্ঘের আইনগত দিকটি দেখার ক্ষেত্রে তাঁর উপর পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। মহারাজের এই উৎসাহ ও তৎপরতায় অনেক কেন্দ্রগুলিই বর্তমানে উপকৃত হচ্ছে। অদ্বৈত আশ্রম, বলরাম মন্দির, গদাধর আশ্রমের পৃথক ট্রাস্টি বোর্ড থেকে বেলুড় মঠের কেন্দ্রীয় ট্রাস্টি বোর্ডের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছিল মহারাজের সক্রিয় প্রচেষ্টায়। ১৯৮০ সালে যে দ্বিতীয় মহাসম্মেলন হয়েছিল তার ভাবনা প্রথম তাঁর মাথাতেই এসেছিল। মহারাজ বুঝেছিলেন রামকৃষ্ণ ভাবপ্রবাহকে নব হিল্লোলে দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে দেওয়ার সময় হয়ে এসেছে। এই সম্মেলনকে বাস্তবের রূপ দিতে তিনি ও অন্যান্য সাধুরা প্রাণপাত করে পরিশ্রম করেছিলেন। মহারাজ পাদপ্রদীপের আড়ালে থেকে নীরবে কর্ম করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করলেও তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় হিরন্ময়ানন্দজী প্রকাশ্য সভাতেই

তাঁর অনুজের কৃতিত্ব ও কর্মদক্ষতার কথা বলে গহনানন্দজীকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

৮) **হাস্যরস :** শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন—"আমি শুকনো সন্ন্যাসী হব না, রসে বসে থাকব।" মহারাজও খুব রসিক মানুষ ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁর শালীনতায় মোড়া রসের ফোয়ারা নিকটজনের মনে নির্মল আনন্দ দিত। একবার কোথাও যাবার প্রস্তুতি চলছে, জনৈক সাধু মহারাজকে বললেন, "সব মাল ready মহারাজ।" মহারাজ তখন নিজেকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন "কোথায়? আসল মালই তো এখানে।" সেবা প্রতিষ্ঠানে মহারাজ সকলের সাথে খেতে বসেছেন। দেখা গেল দুর্ভাগ্যক্রমে একটি আরশোলার শরীরের বিভিন্ন অংশ রান্না করা খাবারে মিশে আছে। মহারাজের পাতে পড়েছে মাথার অংশটি। তিনি মাথাটি সরিয়ে দিয়ে নির্বিকার ভাবে খেতে খেতে বললেন, "এর ধড়টি কোথায়?" দুইটি বোবা ছেলের ঝগড়ার সময় এক জন চুপ করে ছিল, কিন্তু পরে যখন সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করল তার চুপ থাকার কারণ তখন সে কিভাবে তোতলাতে তোতলাতে বলেছিল—"আ-মি যদি কিছু বলতাম তবে ফা-আটা-ফা-টি হয়ে যেত" সেটি মহারাজ নিজে অভিনয় করে দেখাতেন আর সকলেই এটা শুনে উচ্চহাস্য করত।

৯) **ভাবাবেগবর্জিত যৌক্তিকতা :** স্বামী ভূতেশানন্দজী বলতেন "ট্রাস্টি মিটিং এর সময় নরেশ যেটা ধরবে সেটাকে কিছুতেই ছাড়বে না, asart করত খুব।" শিলঙে কর্মরত জনৈক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বংশজাত হওয়া সত্ত্বেও পৈতে পড়তেন না, তাঁর বক্তব্য ছিল "অফিসে কখনো কখনো আমাকে মিথ্যা বলতে হয় তাই আমার মনে হচ্ছিল পৈতে রাখাটা আমার কাছে ভণ্ডামি। মহারাজ এই কথা শুনে rituals, কর্তব্য ইত্যাদির পাশ দিয়ে না গিয়ে যুক্তিপূর্ণ ভাবে বলেছিলেন "যদি তুমি পৈতে রাখতে তাহলে এটি তোমার ব্রাহ্মণ হিসাবে কি করণীয় তা মনে করিয়ে দিতে পারত। এখন তুমি পৈতে ফেলে দেওয়াতে তোমাকে মনে করিয়ে দেবার কেউ রইল না।" যখন প্রতিকূল পরিবেশে তাঁকে চরম হেনস্থা হতে হয়েছে তখন তিনি কোনোদিনই emotion, sentiment ইত্যাদিকে মাথা তুলতে দেন নি আবার যখন কেউ কোনও একটি বিশেষ কাজের সাফল্যের জন্য তাঁর সামনেই তাঁর প্রশংসা করেছেন তখনও তিনি চরম নিঃস্পৃহতার সাথে বলতেন "এই প্রশংসাতে তো লাভ কিছু হবে না, তুমি বরং নিজেও এইরকম কিছু করার চেষ্টা কর।" কেউ অর্থ দান করতে চাইলে মহারাজ সেই ব্যক্তির বাড়ির খবরাখবর নিয়ে পরিশেষে সিদ্ধান্ত নিতেন। জনৈক ব্যক্তি সেবা প্রতিষ্ঠানে ত্রিশ হাজার টাকা দান করেছেন কিন্তু মাঝে মাঝেই সেই টাকার সদ্ব্যবহার হলো কিনা সেই বিষয়ে তাগাদা দিচ্ছেন। একদিন মহারাজ বললেন "আপনার টাকার বিশেষ প্রয়োজন বুঝতে

পারছি, ওই ত্রিশ হাজার টাকা সুদ সমেত ফেরত নিয়ে যান।" ভদ্রলোক মহারাজকে প্রণাম করে বললেন "সুদ চাই না, টাকা দিলেই হবে।" মহারাজ বললেন "আবেগ বশে কিছু করবেন না।"

১০) **"গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর" :** ব্রহ্মজ্ঞানী নির্বাণানন্দ জী প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে বহু পূর্বেই গহনানন্দজী'র মধ্যে গুরুশক্তির বিপুল ভাণ্ডার দেখতে পেয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় **১৯৯২** সালের **১৪ই** এপ্রিল তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সহাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন এবং **১৫ই** জুন স্নানযাত্রার দিন প্রথম দীক্ষা দেন যোগদ্যান মঠে। আসামের প্রত্যন্ত হোজাই অঞ্চলই হোক বা বিদ্যুৎবিহীন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামই হোক তিনি সবজায়গায় গিয়ে সেখানকার প্রতিকূলতাকে হাসি মুখে মেনে নিয়ে দীক্ষা দিয়েছেন। সমাজের উচ্চ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যেমন তাঁর কৃপা পেয়েছেন ঠিক তেমনভাবেই প্রান্তিক মানুষেরাও তাঁর কৃপা দৃষ্টিতে স্নাত হয়েছেন—সেখানে আপাত অশিক্ষিত আদিবাসীরা যেমন আছেন ঃ তেমনই আছেন শারীরিক প্রতিবন্ধী অথবা সংশোধনাগারের মানুষজনও। অর্থবান নিবেদিত ভক্তগৃহে যখন তাঁর সামনে থালাভরা খাবার রাখা হয়েছে তখন তিনি তাঁদের মন রক্ষার্থে হাসিমুখে সামান্য কিছু গ্রহণ করেছেন (মহারাজ চিরকালই অত্যন্ত পরিমিত খাবার খেতেন) আবার ছত্তিশগড়ের হতদরিদ্র গ্রামে দরিদ্রা বৃদ্ধা রমণীর পর্ণ কুটিরে বসে মহানন্দে চা পান করেছেন। বাইপাস সার্জারির পর সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীরা তাঁকে বাইরে বেশী না যাবার জন্য অনুরোধ করলে তিনি বলেছিলেন 'সঙ্ঘ আমাকে এই কাজটি দিয়েছে, আর এটাই যদি না করি তবে করব কি?' দীক্ষাদান শুরু করার পর তাঁর মধ্যে অদ্ভুত গুরুশক্তির বিকাশ ঘটে, তিনি যেন আরো বেশি করে রামকৃষ্ণময় ও মমতাময়ী মা হয়ে উঠতে শুরু করেন। একবার যোগদ্যান মঠে উনি সাধু ভাণ্ডারা দিয়েছেন। একজন নবীন সাধু ঘটনাচক্রে সেখানে গিয়ে উপস্থিত। যেহেতু উনি সে অর্থে নিমন্ত্রিত ছিলেন না তাই খুব সঙ্কুচিত হয়ে বসে আছেন আর মনে মনে ভাবছেন যে অনাহুতের মতো সেখানে চলে এসেছেন। ঠিক সেই সময়ই হঠাৎ মহারাজ সেখানে এসে বলছেন "তোমরা সবাই ভালো করে খাবে। যারা অনাহুত হয়ে এসেছ, রবাহুত হয়ে এসেছ সবাই ভালো করে খাবে।" একটি শাখাকেন্দ্রের জনৈক ব্রহ্মচারীর নতুন নামকরণ হয়েছে মঠ-মিশনে যোগদানের পর। গহনানন্দজী মহারাজকে উক্ত ব্রহ্মচারী প্রণমান্তে তার নাম বলছে (নতুন নাম), তখন মহারাজ বলছেন "সে তো হলো, আসল নাম কি?" দুই ক্ষেত্রেই উক্ত সাধু/ব্রহ্মচারীর মনের বিস্ময় সহজেই অনুধাবনীয়। জনৈক শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্মচারী বেশ কিছু শারীরিক সমস্যায় জর্জরিত, মঠ-মিশনে officially join করার ক্ষেত্রেও

সমস্যা আসতে পারে। মহারাজ মমতাময়ী মায়ের মতো বড় বড় ডাক্তারদের দেখিয়ে, মানসিকভাবে তার পাশে থেকে তাকে আশীর্বাদ করে গেছেন। সেই ব্রহ্মচারী আজ সন্ন্যাসী এবং মঠ-মিশনের একটি বড় শাখাকেন্দ্রে অত্যন্ত পারদর্শিতার সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করে চলেছেন। এইরকম হাজারো ঘটনা আছে যেখানে অনুজ সাধু ব্রহ্মচারীরা তাঁর অসীম মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-ভালবাসার পবিত্র ওমে ধন্য হয়েছেন। ১৯৯৮ সালে দিল্লির AIIMS-এ বাইপাস অপারেশান এর পর তাঁর সেবক দেখছেন মহারাজের চোখে জল। সেবক জিজ্ঞাসা করলেন মহারাজের কষ্ট হচ্ছে কি না? মহারাজ মাথা নেড়ে না বললেন। সেবক তখন অবাক হয়ে পুনরায় কারণ জিজ্ঞাসা করলে কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর মহারাজ বলছেন "কাল সারারাত দেখলাম প্রভু পাশে বসে আছেন। আজ সকালেও দেখলাম খাটের চারপাশে পায়চারি করছেন। তাঁর অহেতুক কৃপার কথা ভেবে চোখে জল আসছে।" আর তাঁর জীবনের অন্তিম কয়'টি মাস তিনি জগত থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে অন্য জগতে লীন হয়ে ছিলেন, চিকিৎসাবিদ্যা সেই অবস্থাকে হয়ত নানাবিধ medical term দিয়েই উল্লেখ করবে কিন্তু.... না থাক এই বিষয়ে মন্তব্য করার মতো ধৃষ্টতা বর্তমান লেখকের নেই সঙ্ঘের প্রাচীন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত তথাকথিত চিকিৎসাবিদ্যার বিপ্রতীপেই অবস্থান করে এবং মহারাজের শারীরিক পর্যবেক্ষণের medical term-এর লব্ধপ্রতিষ্ঠ যুক্তিশীল ডাক্তাররাও অদ্ভুতভাবে প্রাচীন মহারাজদের মতকেই সমর্থন করেন।

শেষের কবিতা—আমার সকল চাওয়া পাওয়া, আমার আশা ভালবাসা, উজান স্রোতে তট ছুঁতে চায়/
শিখাও স্বামী কেমন করে গভীর হব, গহন গাঙে সব হারিয়ে ফকির হব/
তোমার মতো অচিন গাছের ছায়ায় রব, উদাস হব, বাউল গানে/
একতারা তে একখানি তার সে তার বাজে তোমার প্রাণে/
তোমার গভীর দুই নয়ানে প্রভুর বাণী, আমার শিরে দিলে আনি তোমার পরশ
চিত্ত মাঝে দিব্য হরষ, শিখছি আমি তোমার মতো সুরের খেলা/
লাগবে আমার অনেক বেলা, অনেক জনম, অনেক রাতি/
তবুও জানি আছে সাথি প্রভু আমার/ নাই তো তাহার অন্ত/
তোমার মতো মিশে যাব প্রেমসাগরে, প্রভুর প্রেমে পাগলপারা, আনন্দময় গহনধারা/
রূপ অরূপের লুকোচুরি চলবে যুগযুগান্ত।

মহারাজজী'র গায়ের রঙ ছিল কাঁচা সোনার মতো উজ্জ্বল। দেবী দুর্গার মন্ত্রে আছে

"অতসী পুষ্পবর্ণাভাম"—ঠিক অতসী পুষ্পের মতোই ছিল মহারাজের গৌর বর্ণ। যেদিন মহারাজ তাঁর নশ্বর শরীর ত্যাগ করে চলে গেলেন সেদিন সারা রাত বেলুড় মঠের সংস্কৃতি ভবনে মহারাজের পুণ্য দেহ রাখা ছিল। গেরুয়াবৃত মহারাজের সেদিনকার রূপও ছিল অদ্ভুত সুন্দর। রঙ মনে হচ্ছিল ফেটে পড়ছে। সারা দেহে শুভ্র পুষ্পভার। মনে হচ্ছিল যেন দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করেছেন। আর গভীর রাতের দিকে মহারাজের পাদদ্বয় রক্ত-রঞ্জিত করে কাপড়ে ওনার পদ চিহ্ন নেওয়া হচ্ছিল। কাপড় খণ্ডগুলি বেশ একটু জোড়ের সাথেই মহারাজের পাদদ্বয়ে স্পর্শ করা হচ্ছিল। ফলস্বরূপ মহারাজের শায়িত দেহের মাথার দিকটা বারংবার কিছুটা উঠে আসছিল—মনে হচ্ছিল এই বোধহয় মহারাজ ঘুম থেকে উঠে বসছেন। ২০০৭ এর ৪ঠা নভেম্বরের গোটা রাতই বর্তমান লেখক ওই সভাগৃহে ছিল আর পূজ্যপাদ মহারাজজী'র শ্রীচরণে নিবেদন করেছিল যে, যে সঙ্ঘকে তিনি এত ভালবেসেছেন, নিজের সমগ্র জীবন যে সঙ্ঘের জন্য উৎসর্গ করেছেন সেই সুমহান রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে ভবিষ্যতে যেন এই অর্বাচীনেরও একটু স্থান হয়। গহনানন্দ মহারাজের জীবেনর শেষ পারাণির কড়ি যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তিনিই বর্তমান লেখকের জীবনের আশীর্বাদস্বরূপ প্রথম কদম ফুল হয়ে বর্ষিত হন আর কয়েকমাসের ব্যবধানেই। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্থান লাভ ঘটে সৌভাগ্যবান বর্তমান লেখকের। "শেষ নাই যার শেষ কথা কে বলবে।"

মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে

স্বামী হরিচরণানন্দ

গুরুর কৃপা ছাড়া শ্রীগুরুর কথা বলা বা লেখা যায় না। তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে যতটুকু সময় তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি সেই স্মৃতিকণিকা আলোচনার চেষ্টা করছি। স্মৃতিকথা আলোচনা করতে গেলে বেশিরভাগ সময়ই নিজের আত্মকথা এসে যেতে পারে, তাঁর জন্য এই ধরণের লেখা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

শৈশবকাল থেকেই আমি পারিবারিকভাবে রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে থেকে বড় হয়েছি। কিন্তু দীক্ষার কথা ভাবিনি। কারণ বিধি হয়তো নির্দিষ্ট করে রেখেছিল গুরুদেব কে হবেন। যখন দশম শ্রেণীতে আমি পাঠরত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রদীক্ষা নেব, এটি মনে মনে ঠিক করি। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে দীক্ষা নেব, এটি ভাবনায় আসে। শৈশবকাল থেকেই বেলুড় মঠে বহুবার গিয়েছি। পূজনীয় স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজকে দেখেছি। পূজনীয় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীকে দেখেছি, প্রণামও করেছি বহুবার। দীক্ষা নেওয়ার যখন স্পৃহা জাগল তখন ছিল দূরে কেন নিকটেই তিনি আছেন। তাই পূর্বাশ্রমের কাছেই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গেলাম। দীক্ষার জন্য নাম নথিভুক্ত করলাম ও দীক্ষার জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী, শ্রীশ্রীমা সারদা ও স্বামীজির জীবনী পুস্তক কিনলাম ও সেইসঙ্গে পড়তে থাকলাম (শ্রীম)।

শুনলাম গুরুদেব (স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ) আসবেন, দীক্ষা দেবেন আশ্রমে। কিন্তু দীর্ঘ ১ বছর অপেক্ষা করতে হল। কারণ মহারাজের সেই সময়েই শরীর কিছু খারাপ হতে শুরু করেছিল এবং দীক্ষারও অনুষ্ঠান অনেক বেশি ছিল। অবশেষে মহারাজ দীক্ষার জন্য রাজি হলেন ও সময় দিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ যোগোদ্যানে দীক্ষা হবে। মহারাজ তখন ছিলেন যোগোদ্যান মঠের অধ্যক্ষ ও রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনেরও সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ। ফর্ম ফিলাপ করা হল।

অবশেষে ২০০২ সালে ৮ জানুয়ারি মহারাজ দীক্ষা দেবেন ঠিক করলেন। দীক্ষার দিন আমাদের নিকটস্থ আশ্রম থেকে ভোরবেলায় বাসে করে রওনা হলাম যোগোদ্যান মঠের উদ্দেশ্যে। যোগোদ্যান মঠে এসে গুরুপূজার দ্রব্য সাজিয়ে দীক্ষার নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করলাম। প্রথমে সপ্তর্ষি মহারাজ দীক্ষার নিয়ম বলে দিলেন। তারপর গুরুদেব মহারাজ ঘরে প্রবেশ করলেন। মহারাজ প্রথমে ঠাকুর ও মা এবং স্বামীজীর চরণে পুষ্পার্ঘ্য দেওয়ালেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীমা ও স্বামীজীর চিত্র সম্বন্ধে বললেন। দীক্ষার ঘরের দেওয়ালে তিনটি ফটো থাকলেও মহারাজের দীক্ষার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর তিনটি সাদা-কালো আলোকচিত্র থাকত। তাঁর সামনেই পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করা হত।

মহারাজ মন্ত্রদীক্ষা ও গুরু সম্বন্ধে বলে যাচ্ছিলেন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ আর গুরু ছাড়া এটি সম্ভব নয়। যখন মহারাজ বলছিলেন, মনে হচ্ছিল কিছু দেখে দেখে তিনি ঐইগুলি বলছেন আমি ভাবছিলাম। তারপরই মহারাজ মন্ত্রদীক্ষা দেওয়া শুরু করলেন। তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করাতেন, অর্থ বলতেন ও জপ করা শেখাতেন। জপ ঠিক হচ্ছে নাকি মন্ত্রের সঙ্গে, তা দেখে নিতেন। আমি যখন তাঁর সামনে গেলাম, দেখলাম কোনও কাগজ নেই, শুধু মন্ত্রটিই লেখা আছে।

তারপর তিনি মন্ত্র বলেছিলেন ও জপ করা নিজের হাত আমার হাতে দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ওই মন্ত্র ও জপ করানোর সময়ই একজনের ধুতি পরা ঠিক হয়নি দেখে সেটি বললেন। আমায় দেখিয়ে বললেন, এরটা ঠিক হয়েছে। আমার অবাক লেগে গিয়েছিল তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দেখে।

দীক্ষা অনুষ্ঠান শেষ হলে গুরুপূজা হল। উপাসনা পদ্ধতি নিয়ে তিনি তার আগে আলোচনা করেছিলেন। মহারাজ প্রায় সকাল ৮টা নাগাদ ওই ঘরে দীক্ষার জন্য যেতেন আর দীক্ষা শেষ হত প্রায় দুপুর দেড়টা নাগাদ। এত সময় মহারাজ একভাবে একাসনে বসে দীক্ষা দিতেন। এটি আসন সিদ্ধ ছাড়া সম্ভব নয়। এটি আমার মনে হয়েছিল। আমি দীক্ষার দিনই তাঁকে জপমালার কথা জিজ্ঞাসা করি ও তিনি তা নেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। তবে আমি জপমালা পরে নিয়েছিলাম। দীক্ষা শেষে আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করি। কিন্তু,

‘মম মানস চঞ্চল রাত্রদিনে
গুরুদেব দয়া কয়া কর দীনজনে।’

তিনি কৃপা করে যে মন্ত্র দেন তাই সারাজীবনের বিশেষ শক্তি। তার কৃপায় আমরা চলছি। এরপর মহারাজের সাথে সাক্ষাৎ হয় পরের বছর দীক্ষার অনুষ্ঠানেই। মহারাজ সাধারণত স্বামী ও স্ত্রীকে একসঙ্গে দীক্ষা দিতে পছন্দ করতেন। আমার এক ভগিনী দীক্ষা নেবে ঠিক করেছিল। কিন্তু তার স্বামী নেবেন না, এটা ঠিক ছিল। কিন্তু মহারাজ তার স্বামীকে ডেকে বুঝিয়ে দীক্ষার জন্য রাজি করালেন ও কালীপূজার আগের দিন দীক্ষা দিলেন। মহারাজ ওইদিন মন্দিরে অর্ঘ্য দিয়ে দীক্ষার জন্য যাচ্ছেন। অর্ঘ্য দিচ্ছেন এই বাতাবরণ গুরু ইষ্ট একসাথে দর্শন এক অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি করত। দীক্ষার দিন সাধারণত মহারাজ প্রণাম নিতেন না সকালে। আমি ভাবছিলাম মহারাজের কাছে এলাম, প্রণাম হবে না! মহারাজ যেন সেটি শুনতে পেলেন। তিনি ওইদিন দীক্ষার পর প্রণাম নিতে রাজি হলেন। দীক্ষা দিয়ে যখন বেরিয়ে আসছেন হাত তুলে আশীর্বাদ করতে করতে, তখন পুষ্পবৃষ্টির মতো বৃষ্টির ধারা আকাশ থেকে কিছুক্ষণ পড়ে চারিদিক শীতল করে দিল। দুপুরবেলা মহারাজকে কী দিয়ে প্রণাম করব ভাবছি। শিউলি গাছের তলায় কিছু শিউলি ফুল পড়েছিল। তাই কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মহারাজের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। তিনি খুশি হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আর শিউলি ফুল কোথায় পেলাম জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম, এখানের বাগানের গাছের তলায় পড়ে ছিল। তাই নিয়ে এসে আপনার পাদপদ্মে দিলাম। তিনি খুশি হলেন।

এরপর বহুবার দুর্গাপূজায়, অন্যান্য অনুষ্ঠানে মহারাজকে দেখেছি। যোগোদ্যানেও ভক্ত সম্মেলন দেখেছি। কিছু পত্রও লিখেছি, উত্তরও পেয়েছি। ২০০৫ সালের ২৫ মে'র পর মহারাজ বেলুড় মঠে চলে আসেন। ওই সময়েই আমি একদিন বেলুড় মঠে যাই ও মহারাজ কৃপা করে জপমালা দেন। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। আমি একটি ধুতি ও কিছু ফল দিয়ে তাঁকে প্রণাম করি। তখনই আমি মহারাজকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করি। মহারাজ পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করেন ও শেষ করে আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে বলেন।

বেলুড় মঠে আরেকদিন প্রণাম করতে গিয়েছি হঠাৎ তিনি বলেন পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম না করার কারণ। তিনি বলেছিলেন মাথায় ব্রহ্মের স্থান। মাথা পায়ে স্পর্শ করবে না। ওইদিন প্রণাম করার পর এক বিশেষ ভঙ্গীতে মহারাজ আশীর্বাদ করলেন, 'গাট্টা' দিয়ে। আর ঠাকুরের চিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওরা কে জানো? এই শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাবেই তিনি ভাবিত থাকতেন। এই আশীর্বাদের ঘটনার অনুভূতি

প্রকাশ করা যায় না।

“ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিমেধে
ন কান্তাসুখে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্।
গুরোরজ্ঘ্র পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম।” (১)

গুরু পাদপদ্মে চিত্ত স্থাপন মোক্ষের হেতু। গুরু পূর্ণিমায় দর্শন তাঁর দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করা যা ছিল অতি আনন্দের। মহারাজ বেলুড় মঠ থেকে যোগোদ্যান মঠে এসে নতুন জমি অধিগ্রহণ অনুষ্ঠানে আসেন ও বৃক্ষরোপণ করেন। ওই অনুষ্ঠানেও আমি সাক্ষী ছিলাম। পূজনীয় গীতানন্দজী মহারাজ ও গুরু মহারাজ দুজনের একই সাথে প্রণাম হয়। শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজার একটি ঘটনা খুবই মনে পড়ে। ওই তিথিতে আমি ও আমার মা গেছি বেলুড় মঠে। অনেকের প্রণামের মধ্যে ঠিক হাত তুলে মহারাজ আশীর্বাদ করলেন। যে ভক্ত ব্যাকুলতা নিয়ে ভগবানের কাছে যান, ভগবান তার ইচ্ছা পূরণ করেন। আর মহারাজের মধ্যে দেখা গেছে এই ভাব। তিনি কেমন করে বুঝতে পারতেন কে কি চায়!

২০০৭ সালের ৩০ জুলাই গুরুপূর্ণিমায় প্রণাম ও দর্শন হয়। এরপরই শুনতে পেলাম ৪ সেপ্টেম্বর থেকে মহারাজ সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে আছেন। একদিন গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে এলাম। কিন্তু মন খারাপ হয়েছিল মহারাজের অবস্থা খুব সুস্থ নয় এই সংবাদে। পূজনীয় সপ্তর্ষি মহারাজের সাথেও অনেকক্ষণ কথা বিনিময় হল।

৪ নভেম্বর পূজনীয় মহারাজের শরীর ত্যাগের সংবাদ পেলাম। মন খুব ভারাক্রান্ত হল। পরদিন তাঁর চরণে শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে বেলুড় মঠে গেলাম।

“প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে; দেখা নাই পাই,
পথ চাই, সেও মনে ভালো লাগে। ...
তোমারি করুণা মাগে।” (২)

ওই দেখা যায় আনন্দধাম সাধু ব্রহ্মচারীদের ভজন গানের মধ্যে দিয়ে মহারাজের পার্থিব শরীর অগ্নিতে ভস্মীভূত হল। কিছুদিন পরে মহারাজের পদচিহ্ন ও মহারাজের

১) স্তোত্রমালা—বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় বেলুড় মঠ, পৃ. ৭।
২) রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা—১৩৮৫, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৫, ২৬।

কিছু ব্যবহৃত দ্রব্যও লাভ করি সপ্তর্ষি মহারাজ এবং অরবিন্দ মহারাজের মাধ্যমে, বেলুড় মঠ অফিস থেকে।

২০০৯ সালে আমি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করি। আজ সন্ন্যাসী, তাই গুরু কৃপা ও আশীর্বাদ ছাড়া ত্যাগের জীবন পাওয়া সম্ভব নয়। তাই মহারাজ কৃপা করেছিলেন তিনি শরীরে না থাকলেও তিনি আছেন সারাক্ষণ ও ধ্যানের শ্রদ্ধার বস্তু হয়ে আমার অন্তরে সব সময়।

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদগুরুঃ শ্রীজগদগুরুঃ।
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। (৩)

গুরুর কৃপা ছাড়া সাধন ও সন্ন্যাস জগতে চলা যায় না। তাঁর কাছে প্রার্থনা যেন তিনি আশীর্বাদ করেন, এই দেহ মন প্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণকে সমর্পণ করে চলতে পারি। তবেই এটি আত্মকথা না হয়ে প্রকৃত স্মৃতি তর্পণ হবে। গুরু কৃপা মহিমা শুদ্ধমন না হলে বোঝা যায় না। সেই সময় তাকে কতটুকু বুঝতে পেরেছি জানি না তবু তিনি যে রামকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়ে গেছেন তাই যেন চিরদিনের পাথেয় হয় ও লোকান্তরের আগেও যেন গুরু মহারাজের চরণ স্মরণ থাকে।

৩) স্তোত্রমালা—বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় বেলুড় মঠ, পৃ. ৫।

এক অলৌকিক সৌন্দর্যের সাহচর্য

জনৈক সন্ন্যাসী

'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হলো অঙ্গ মম, ধন্য হলো অন্তর, সুন্দর হে সুন্দর।।'

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্দশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সঙ্গ লাভ অনেকেই করেছেন কিন্তু আমার মতো অনুষঙ্গী হয়ে তাঁর সঙ্গ লাভ করার সৌভাগ্য কারও হয়ে উঠেছিল কিনা আমার ঠিক জানা নেই। আমার যে কথাগুলি জানা আছে তা একান্তই আমার অনুভব ও অনুভূতির কথা, সে অনুভূতি সুন্দরের সঙ্গ লাভ করার পবিত্রতা ও মনকে পরিতৃপ্ত করার আনন্দে ভরপুর। আমি আমার সেই আনন্দকেই আপনাদের সকলের সাথে ভাগ করে নিচ্ছি।

আমার খুব মনে পড়ে সেই দিনগুলির কথা, যে দিন গুলিতে মহারাজের শরীর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আমরা চিন্তায় অস্থির, আর মহারাজ তাঁর সকল চিন্তাকে চিন্তামণির পায়ে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। আমি যে সময়টার কথা বলছি, সে সময়টা হলো মহারাজের বাইপাশ সার্জারির সময়। মহারাজ তখন চিকিৎসার জন্য দিল্লীর এইমস্-এ ভর্তি। সার্জারির পর বেশ কয়েকবার ইনফেকশন হলো, মহারাজ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হলেন, মহারাজের সুগার বেড়ে ৯০০ ছাড়িয়ে গেল, আমরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়লাম। সেই সময় নিশীথ মহারাজ (ডাক্তার মহারাজ) উদ্বিগ্নচিত্তে মহারাজের সাথে কথা বলে তাঁর খোঁজখবর নিচ্ছেন। মহারাজ প্রসন্নচিত্তে নিশীথ মহারাজকে জানালেন, 'ঠাকুর দেখা দিয়ে বললেন ভয় কি? আমি তো আছি।' নিশীথ মহারাজের মুখে মহারাজের ঠাকুর দর্শন ও শ্রীশ্রী ঠাকুরের আশ্বাসবাণী শুনে আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। আমি কেবলই মহারাজকে দেখছি আর ভাবছি, ঠাকুরের অভয়বাণীকে আশ্রয় করে এক অদ্ভুত প্রসন্নতা মহারাজের দেহ প্রাণ জুড়ে বিরাজ করছে।

এইসময় মহারাজ খুব কম কথা বলতেন। আমার কাজ ছিল সকাল থেকে রাত

৯টা পর্যন্ত মহারাজের দেখাশোনা করা। এই সময় মহারাজের সাথে আমার কথাবার্তা খুব কমই হয়েছে। তিনি এই সময় একটি কথা বার বার বলতেন, সময় কাজে লাগাও। বাজে কাজে সময় নষ্ট করো না। ভালো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখো। এই সময় মহারাজ জপ ধ্যানের কথা খুব বলতেন। আর বলতেন কথামৃতের সেই কথাগুলো, যেখানে মাস্টারমশাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করছেন, সংসারে থেকে কি ঈশ্বর দর্শন করা যায়? মনের কীরকম অবস্থা হলে তাঁকে পাওয়া যায়? ইত্যাদি।

মহারাজ তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট। সময়টা ২০০৫ সালের জুন মাস। মহারাজের এক শিষ্যা মহারাজকে বলছেন, সংসারের কত কাজ স্বামীকে অফিস টাইমে রান্না করে দেওয়া, ছেলেকে স্কুলে পাঠানো ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব কাজ করে জপধ্যানের সময়ই পান না। মহারাজের স্পষ্ট উত্তর। 'যেদিন জপধ্যান করবে না সেদিন খাবে না।' আমি মহারাজের কাছে সবসময় থাকতাম বলে চলতে ফিরতে সকল সময়ই এইরূপ নানা অমৃত কথা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আসলে মহারাজের সাথে সে সময় আমার এক অদ্ভুত সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। মহারাজের তখন বালকভাব। গাম্ভীর্যের লেশমাত্র নেই, আমি মনে মনে ভাবছি মহারাজের ঈশ্বর দর্শনের কথা শুনব।

স্নানের পর মহারাজ হুইল চেয়ারটায় বসে চোখ বুজে যেমন জপধ্যান করার তেমন করছেন, মহারাজের জপ শেষ হলে আমি বিনম্র চিত্তে মহারাজের কাছে জানতে চাইলাম। মহারাজ, আপনার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে? আপনি ভগবানকে দেখেছেন?—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ কিছু বললেন না। মহারাজের মৌনভাব দেখে আমার মনে হলো মহারাজকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা আমার ঠিক হয়নি। মহারাজ নিশ্চয়ই আমার এই কথায় অখুশী হয়েছেন। কিন্তু সেটাও যদি মহারাজ নিজে মুখে বলতেন তাহলেও না হয় ঠিক ছিল। কিন্তু মহারাজ কিছু বলেননি বলে আমার চিত্ত অস্থির। তাই কয়েকদিন পর আবার মহারাজের কাছে একই কথা জানতে চাইলাম। সেদিন কিন্তু মহারাজ আমাকে নিরাশ করলেন না। মহারাজ প্রশ্ন শুনে বেশ খানিকক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, 'দেখো মায়ের বাড়ি গেছি, মাকে প্রণাম করে উঠছি। দেখি, মা পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।' মহারাজের মুখে মাতৃদর্শনের কথা শুনে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হলো। আমি শিউরে উঠলাম। মহারাজ আর কিছু বললেন না। দু-এক দিন পর মহারাজের যেই না বলা কথা শোনার তীব্র বাসনা জেগে উঠল আমার মনে। সেই বাসনা পূরণ করতে মহারাজের কাছে জানতে চাইলাম, মহারাজ, সেদিন যে বললেন, মা পাশে দাঁড়িয়ে আছেন... এর মানে কী? মহারাজ বললেন, আমি বুঝলাম মা সবসময়

আমার পাশে আছেন।

'মা আছেন আর আমি আছি
ভাবনা কী আছে আমার।'

সময়টা সম্ভবত ১৯৭৪ কী ৭৫ হবে, মহারাজ তখন সেবা প্রতিষ্ঠানে ছিলেন। তখন সেবা প্রতিষ্ঠানে খুব ঝামেলা গণ্ডগোল হচ্ছিল। সেই দুর্দিনে মহারাজ মায়ের কাছে প্রার্থনা করছেন। আর মা তাঁকে দর্শন দিয়ে আশ্বস্ত করছেন। মহারাজের এই দিব্য দর্শনের কথা শোনার পর আমার মনে যে শিহরণ ও পুণ্য ভাবের সঞ্চয় হয়, এরপরে আমি আর কখনো মহারাজকে তাঁর দর্শনের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।

প্রসঙ্গ বিশেষে আর একটি কথা আমি বলতে চাইছি ঠিকই, তবে নিজে না অনুধাবন করলে এ কথা আত্মস্থ করা ভীষন কঠিন, সময়টা সম্ভবত ২০০৭ সাল। গুরু পূর্ণিমার কয়েকদিন পরের ঘটনা। মহারাজ ডাইনিং হলের বাঁ দিকে যে দিকটায় বসতেন সেদিকে কালী মায়ের একটা ছবি ছিল। দিগম্বরা অপূর্ব মূর্তি। ভূতেশানন্দজী মহারাজের সময় থেকে ছবিটা সেখানে ছিল। একদিন বিকেলবেলা, আমি মহারাজের টিফিন নিয়ে ঢুকছি দেখি মহারাজ মায়ের দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। সাধারণত মহারাজ ঐ সময় চোখ বন্ধ করে জপধ্যান করেন। মায়ের ছবির দিকে মহারাজকে ঐরূপ অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমার মহারাজের সামনে যাওয়ার সাহস হলো না। আমি মহারাজকে বুঝতে না দিয়ে মহারাজের চেয়ারের পিছনের দিকে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালাম। দেখি মহারাজের মুখটি খোলা এবং মহারাজ যেন কথা বলছেন কিন্তু সে কথা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসছে আবার তাঁর ঠোঁটে মিলিয়ে যাচ্ছে। বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই। শুধু স্মিত হাসিতে যেটুকু ফুটে উঠল তা দেখে বুঝলাম, মহারাজ পরিতৃপ্তির পূর্ণানন্দে ভেসে চলেছেন, এই দৃশ্য ছিল ক্ষণস্থায়ী।

আমি খুব ধীর পদক্ষেপে মহারাজের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মহারাজ, মা কী আপনাকে দর্শন দিচ্ছেন? মা কী কিছু বলছেন?' মহারাজ আমার প্রত্যুত্তরে শুধু ঘাড় নাড়লেন মুখে কিছু বললেন না। তখন আমি সভয়ে মহারাজের হাত দুটো চেপে ধরলাম এবং মহারাজের হাত দুটো আমার মাথায় রেখে মহারাজের ভাব তন্ময়তায় বিহ্বল হয়ে বললাম, 'মহারাজ আশীর্বাদ করুন, আমায় আশীর্বাদ করুন।'

মহারাজ যখন চুপচাপ বসে থাকতেন আমি তখন মহারাজের সাথে মজা করে, মহারাজকে আনন্দ দেওয়ার নানা চেষ্টা করতাম। মহারাজের তখন বালক স্বভাব।

আমি মহারাজকে বলছি, মহারাজ, আপনার মনে আছে কৃষ্ণের একটা গরু ছিল, সেই গরুটা আবার এসেছে, কৃষ্ণ যেখানে যেতেন গরুটা তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যেত, কৃষ্ণ গরুটাকে বেশ হাত বুলিয়ে আদর করতেন। গরুটার তো হাত ছিল না। পায়ে খুর ছিল তাই জিভ দিয়ে গা চেটে চেটে কৃষ্ণকে আদর করত। সেই গরুটা আবার এসেছে। আপনি কী দেখতে পাচ্ছেন তাকে? মহারাজ বললেন, হ্যাঁ পাচ্ছি।' আমি বললাম, কোথায় বলুন তো? মহারাজ আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, এই তো আমার কাছে। আমি তখন গরুর মতো পা মুড়ে বসে মহারাজের আদর খেতে লাগলাম। পরমানন্দে পূর্ণ সেই পরমাদর ছিল আমার জীবনের এক অমূল্য সম্পদ ও ঐশ্বর্য।

আর একদিনের ঘটনা, মহারাজ বসে আছেন। আমি মহারাজকে বললাম, মহারাজ, ঠাকুর আপনার মধ্যে বিরাজ করছেন, আপনাকে দিয়ে ঠাকুরের কত কাজ হচ্ছে। মহারাজ আমার কথা শুনছেন কিন্তু কিছু বলছেন না। আমি বললাম, মহারাজ, হনুমান কেবল রামচন্দ্রকে কাঁধে করে নিয়ে গেল। আমার খুব ইচ্ছা সেই দৃশ্য দেখার। আমি তখন মহারাজের সামনে হামাগুড়ি দিয়ে বসেছি। মহারাজ, আমার কাঁধের দুদিকে পা দিয়ে বসলেন। এবং আমি হামাগুড়ি দিতে দিতে সেই মতো মহারাজকে বাথরুম অবধি নিয়ে গেলাম। আমার মনের স্বাদ পূরণ হলো। আমার অপ্রাপ্তি আর কিছুই রইল না, মহারাজকে কাঁধে করে আমি আমার সব পাওয়ার আনন্দে মেতে উঠলাম।

'তুমি ব্রহ্মা রামকৃষ্ণ তুমি কৃষ্ণ, তুমি রাম।
তুমি জিষ্ণু, তুমি বিষ্ণু, প্রভু বিষ্ণু প্রাণারাম।'

প্রাণের ঠাকুর বা দেবতা যাঁর অন্তরে অধিষ্ঠান করেন, তাঁর দিব্যদৃষ্টি জাগ্রত হয়। সেই দিব্যদৃষ্টিতে তিনি যা অনুভব করেন তা অলৌকিক ঘটনা বলেই মনে হয়। এখন আমি তেমনি একটি অলৌকিক ঘটনার কথাই বলছি। মহারাজ তখন দীক্ষা দিতে পুণেতে গেছেন। দীক্ষা গৃহে দীক্ষার্থীরা সব বসে আছে। মহারাজ সূয্যি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ দীক্ষার্থীর সংখ্যা কত? সূয্যি মহারাজ জানালেন ৯০। মহারাজ বললেন, না, কম হবে। মহারাজ বার বার এই কথা বলছেন দেখে, তখন সূয্যি মহারাজ দীক্ষাগৃহে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা আজ যাঁরা দীক্ষা নেবেন হাত তুলুন এবং আপনাদের পাশে কে হাত তুলছে না খেয়াল রাখবেন। এই কথা বলার পর দেখা গেল, দুজন হাত না তুলে বসে আছেন। দীক্ষার্থী না হয়েও তাঁরা দীক্ষাগৃহে কী করে এবং কেন এসে বসল—একথা জানতে চাইলে, তারা বলল যে, তারা ভেবেছিল যে এটা একটা ধর্ম সম্মেলন। কারণ তারা মাঝে মধ্যেই এখানকার

ধর্ম্ম সম্মেলনে যোগদান করেন।

দীক্ষা গৃহে দীক্ষার্থী ছাড়া অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ। অথচ দুজন দীক্ষার্থী না হয়েও কী করে সেখানে প্রবেশ করল?—এই প্রশ্ন যখন আমাদের সকলের মনে উদয় হয়েছে তখন আর একটি বড় প্রশ্ন সেদিন আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করেছিল যে, মহারাজ কী করে বুঝলেন, দীক্ষার্থী ৯০ নয়, ৯০ এর কম।—এরূপ নানা অত্যাশ্চর্য ঘটনা আমাদের চোখের সামনে ঘটত। মহারাজ সেদিকে নজর দিতেন না। মহারাজ শুধু বলতেন, চুপ করে বসে থেকো না, সময়কে কাজে লাগাও, সবাই খালি বলে সময় হয় না, সময় হয় না। আরে, কখনো কী হিসাব করে দেখেছ, ২৪ ঘন্টা সময় কীভাবে কাটাচ্ছ? কাজের একটা রুটিন করলেই বুঝতে পারবে, কত সময় বৃথা নষ্ট হচ্ছে। সময়কে ভালো কাজে লাগাও। ২৪ ঘন্টাই কাজে লাগাও।

‘রামকৃষ্ণ নামের জোয়ার এল ভাসিয়ে দে না তরী
ভাব-ভক্তি উথলে ওঠে আহা মরি মরি।’

“সংঘে সমর্পিত হও”

জনৈক সন্ন্যাসী

ঈশ্বরের কৃপায় আমার গুরুদেবের সান্নিধ্য ও আশীর্বাদ লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে—সে কথাই আজ সসম্ভ্রমে ও অকপটে বলতে চাই।

আমি যখন কলেজের ছাত্র—এই কৃপার প্রথম প্রকাশ তখন অনুভব করি। রায়পুর রামকৃষ্ণ মিশনে পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এসেছেন। যথারীতি দীক্ষাদান শুরু হবে। আমার বন্ধু রোশন মহারাজ যে তখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র—ওনার কাছে দীক্ষা পাবার আশায় ফর্ম পূরণ করেছেন। আর আমার জন্যও একটি ফর্ম এনেছেন। আমি তখন ডেয়ারী টেকনোলজি কলেজের ছাত্র। রোশন মহারাজ আমাকে বলেন যে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ, সঙ্ঘগুরু। স্বামীজির বইপত্র পড়ে এবং আশ্রমের সাধুদের সংস্পর্শে আসার ফলে রোশন মহারাজ জানেন এই সঙ্ঘগুরুগণের কত উচ্চ মহিমা। তাই আমাকে বলেন যে এঁনাদের নিকট দীক্ষা নিলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে, জপধ্যান ইত্যাদি দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতিও হবে আর একই গুরু হওয়াতে আমরা পরস্পর গুরুভ্রাতা হয়ে যাব। কিন্তু আমি যাঁর সম্বন্ধে কিছু জানিনা, যাঁকে চিনিনা এমন কারো কাছ থেকে দীক্ষা নিতে রাজি হই না। রোশন মহারাজ আমাকে বোঝালেন যে মাঝে মাঝেই মহারাজজী রায়পুর বিবেকানন্দ আশ্রমে আসবেন তখন আমরা দেখা করা এবং ওনার সেবা করার সুযোগও পাব। কিন্তু আমাকে নিরুৎসাহী দেখে রোশন মহারাজ একাই গিয়ে দীক্ষা নিয়ে এলেন আর আমি শুধুমাত্র প্রণাম করে চলে এলাম।

এরপর পড়া শেষ করে আমি চাকরী নিয়ে গুজরাট চলে যাই। চলাফেরায় অনেক স্বাধীনতা পেলেও জীবন শূন্য মনে হতে থাকে। কিছু ভাল না লাগায় মাঝে মাঝে মনে হত সন্ন্যাসী হয়ে যাই। কিন্তু ঘরে মায়ের প্রতি কর্তব্য আছে মনে করে সব ছেড়ে চলে যেতে পারতাম না। বাড়িতে থাকাকালীন পিতাজী রামচরিতমানস, মহাশিবপুরাণ

ইত্যাদি পড়ে শোনাতেন, সন্ধ্যা আরতী হতো। চাকরীস্থলে সেসব কিছু না থাকাতে মন ভাল লাগতো না। স্বামীজির রচনাবলী কিছু কিছু পড়তাম, ... কর্মস্থলের কাছে একটি শ্রীকৃষ্ণের মন্দির ছিল, মাঝে মাঝে সেখানে চলে যেত সে। ইতিমধ্যে বিবাহের সম্বন্ধ আসতে থাকায় আমি আরও পড়াশোনা করে আরও ভালো চাকরী করতে চাই এই অজুহাতে সেসব এড়িয়ে যেতাম। মনে শান্তি ছিল না।

এমতাবস্থায় একদিন বরোদা রামকৃষ্ণ মিশনে এক মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার মনের অশান্তি এবং সাধু হবার ইচ্ছার কথা জানাই। আরও বলি যে সন্ন্যাস জীবন সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। যদি আপনি বলেন যে আমার পক্ষে সাধু হওয়া সম্ভব তাহলে আমি এই জীবন গ্রহণ করতে পারি। তখন উনি মৃগাঙ্ক মহারাজ (স্বামী বেদসারানন্দজী) বলেন যে এই সিদ্ধান্ত একান্তভাবে আমাকেই নিতে হবে। কথায় কথায় যখন জানলেন যে আমার তখনও দীক্ষা হয়নি, তখন উনি বললেন যে সবার আগে দীক্ষা নিতে হবে। তাহলে মনের এই অশান্তিও দূর হবে আর দ্বন্দ্বাদি সমাধানের পথও খুঁজে পাবে।

সেসময় পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ রায়পুরে এসেছেন। আমি পরের দিনই ট্রেনে করে রায়পুর পৌঁছাই এবং সপ্তর্ষি মহারাজের কাছ থেকে ফর্ম নিয়ে পূরণ করে দিই। তারপর আমি পরমপূজ্য গুরু মহারাজজীর সঙ্গে একান্তে কথা বলার অনুমতি চাই। অনুমতি পেয়ে আমি মহারাজজীর ঘরে প্রবেশ করে দেখি উনি বসে আছেন। কলেজজীবনে ওনাকে যেমন আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্ত চিত্ত দেখেছিলাম সেদিনও ঠিক একইরকম দেখলাম। প্রথমবার যখনই ওনার নাম জেনেছিলাম তখনই মনে হয়েছিল উনি ওনার নামের সঙ্গে সমার্থক। সর্বদাই গভীর আনন্দের মধ্যে ডুবে থাকেন। তখন ওনার বয়স আরও কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু মুখাবয়বের প্রসন্নতায় সে আনন্দের প্রকাশ তখনও ছিল অম্লান। আমি ওনার কাছে আমার দীক্ষা নেবার কথা জানাই। আরও বলি আমার ইচ্ছার কথা। বলি যে আমার ইচ্ছা, দীক্ষার মন্ত্রে আমি যেন শ্রীকৃষ্ণকে আমার ইষ্টদেব রূপে অথবা সারদা মাকে আমার ইষ্টদেবীরূপে পেতে চাই। কারণ ছোটবেলা থেকেই শ্রীকৃষ্ণ আমার খুব প্রিয় আর সারদা মায়ের প্রতি আমার খুব নিষ্ঠা ও বিশ্বাস আছে। তখন উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—'গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কিরকম সম্বন্ধ হওয়া উচিত?' আমি প্রশ্নের অর্থ ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করার আগেই উত্তর দিলাম—'বিশ্বাসের'। শিষ্যের প্রতি গুরুর বিশ্বাস এবং গুরুর প্রতি শিষ্যের বিশ্বাস থাকাটা একান্ত প্রয়োজন। তখন উনি বললেন—"তবে আমার প্রতি যদি তোমার বিশ্বাস থাকে তাহলে আগামীকাল দীক্ষা নিতে চলে এস।" একথা বলেই উনি পুনরায় ওনার

স্বভাবতু ধ্যানানন্দে ডুবে গেলেন। আরও কিছু বলবেন ভেবে আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ফিরে এলাম ও দীক্ষার ফর্ম পূরণ করে জমা করে দিলাম।

মনের দ্বন্দ্ব মনেই থেকে গেল। কারণ দীক্ষার পরই আমি জানতে পারবো উনি আমাকে ইষ্টরূপে কাকে নির্বাচিত করলেন। এ ব্যাপারে কিছু পরিচিত জনের সঙ্গে কথা বলে জানলাম যে দীক্ষা নেবার পর যদি গুরুকে ভাল না লাগে অথবা দীক্ষামন্ত্র বা ইষ্টমনের মতো না হয় তাহলে পরবর্তীকালে পরিবর্তন করা যায়। সেক্ষেত্রে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র বেলপাতায় লিখে গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিতে হয়। তারপর নিজের পছন্দমতো দীক্ষা নেওয়া যায়। একথা জেনে তখনকার মতো আশ্বস্ত হলোম। অবশ্য তার অনেক পরবর্তীকালে জেনেছি শ্রীশ্রীমায়ের কথা—'গুরুকে একবার ভালবেসে পছন্দ করে বরণ করে নিলে সেই গুরুকে কখনও ত্যাগ করতে নেই।'

পরের দিন যথারীতি প্রস্তুত হয়ে দীক্ষা পাবার আশায় আশ্রমে চলে এলাম। দীক্ষার পূর্বে পরমপূজ্য মহারাজজী আমাদের বললেন নিজ নিজ পাপ-পুণ্য সব শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে অর্পণ করে দিতে। তারপর প্রথমেই আমাকে ডেকে মন্ত্র শোনালেন। মন্ত্র শুনে আমার খুবই ভালো লাগলো। উনি বললেন যে এই মন্ত্রের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা দুজনেই আছেন। মন্ত্রের অর্থও ব্যাখ্যা করে বলে দেন ও বসে জপ করতে নির্দেশ দেন। মনের মধ্যে এক অদ্ভুত শান্তি ও আনন্দ অনুভব করি। কিন্তু অন্য একটা কারণে মনের কোণে আর এক অশান্তির মেঘ জমা হতে থাকে। দীক্ষার পূর্বে উনি বলেন যে নিজ নিজ পাপ পূণ্য শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের চরণে অর্পণ করে দিতে—সেটা আমি কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছিলাম না। পুণ্য বরং তাকে দিতে পারি কিন্তু আমার পাপ? তা আমি দিতে পারব না। পরে ওনাকে একথা জানালে গুরুদেবজী বললেন যে—এরকমই নিয়ম। অতএব যা হয়েছে তা ভালই হয়েছে। আরও আমিও যেন পাপ-পুন্য নিয়ে বেশী মাথা না ঘামিয়ে সাধন-ভজনে মন প্রাণ ঢেলে দিই।

এখন আমার গুরুদেবজীর সঙ্গে কিছুদিন সময় কাটাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সপ্তর্ষি মহারাজ জানান যে আগামীকাল পূজ্য মহারাজজী পশ্চিমবঙ্গে টাকী নামক স্থানে চলে যাচ্ছেন। আমি ইচ্ছা করলে ওনার সাথে যেতে পারি। তখন কলেজের ছাত্র ছিলাম, চিন্তাধারা অন্যরকম ছিল। এখন আমি চাকুরী করি। একদিন ওনাকে জানিনা চিনিনা বলে দীক্ষা নিতে অস্বীকার করি। আর আজ মনের অশান্তি দূর করতে তাঁর কাছে এসেই আশ্রয় নিতে হলো। আজ মন শান্তি ও আনন্দে ভরপুর হয়ে আছে।

পরের দিন সকালেই প্রস্তুত হয়ে চলে এলাম ওনাদের সঙ্গে যাবার জন্য। আমার

খুব অবাক লাগছিল দেখে যে পূজ্য মহারাজজী গাড়ীতে বসেও একান্তে নিঃশব্দে জপ করছেন। এই বয়সে মানুষ যখন শারীরিক-মানসিক নানাবিধ অসুস্থতা নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখন উনি কি সুন্দর নিজেকে জপধ্যানের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে সর্বদা আনন্দমগ্ন থাকেন। আমরা টাকী পৌঁছালে ওখানে সবাই খুব আড়ম্বর ও আন্তরিকতার সঙ্গে মহারাজজীকে অভ্যর্থনা করে। ওখানকার স্কুলবাড়ির ওপর তলায় আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল আর পাশে অন্য এক বাড়ির এক তলায় গুরুমহারাজজীর থাকার ব্যবস্থা হয়। একই গাড়ীতে আসবার ফলে পূজ্য মহারাজজীর অন্যতম সেবক বিকাশ মহারাজের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে যায়। ওনাকে আমি জানাই যে পূজ্য মহারাজজীর সেবা করার কোন সুযোগ পেলে আমি ধন্য হয়ে যাব। এ ব্যাপারে আমি সপ্তর্ষি মহারাজেরও অনুমতি পাই।

সর্বপ্রথম আমি পূজ্য মহারাজজীর জুতা পালিশ করার সুযোগ পাই। কলেজজীবন থেকেই এই কাজে দক্ষ থাকায় মহারাজজীর জুতাও সেভাবেই করতাম। ওনার জুতা স্পর্শ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি ভেবে মন আনন্দে ভরে উঠতো। প্রতিদিন এই কাজ ছাড়াও মহারাজজী যখন নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে একটু হাঁটতেন বা মন্দিরে যেতেন তখনও আমি ওনার সঙ্গে সঙ্গে থাকার সুযোগ পেতাম। খুব গরম ছিল এরকম একদিন মহারাজজী হাঁটতে বেরিয়েছেন। মন্দিরের পিছনে আমগাছ ছিল। হাঁটতে হাঁটতে গাছের কাছাকাছি এসে পড়লে আমি তাড়াতাড়ি ছাতা খুলে তাঁর মাথার উপর ধরি। উনি চকিতে জিজ্ঞেস করলেন—বৃষ্টি পড়ছে নাকি? আমি বললাম, না মহারাজ, কখনও কখনও পাকা আম গাছ থেকে খসে মাটিতে পড়ে। সেরকম হলে আপনার মাথার ওপর যাতে না পড়ে তাই ছাতাটা খুলে রাখলাম পড়লে ছাতার উপর পড়বে। মহারাজজী হাসতে হাসতে বললেন, রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য ছাতার ব্যবহার জানতাম, এখানে আমের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ছাতা ব্যবহৃত হচ্ছে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর উনি বিকাশ মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন ফেরার সময় হয়ে গেছে কিনা। বিকাশ মহারাজ জানালেন যে আরও একটু সময় বাকি আছে। হাঁটতে হাঁটতে মহারাজজী মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়তেন। যতক্ষণ দাঁড়াতেন, বিকাশ মহারাজও ততক্ষণ ঘড়িটা বন্ধ করে রেখে দিতেন। মহারাজজী হাঁটতে শুরু করলে আবার ঘড়িটা চালু করে দিতেন। কিছুক্ষণ পর মহারাজজী আবার হয়তো বললেন—দেখো দেখো, সময় হয়ে গেছে হয়তো। তখন বিকাশ মহারাজ ওনাকে ঘড়ি দেখিয়ে বলতেন যে এখনও সময় হয় নি, আরও একটু বাকি আছে। তখন মহারাজজী আবার ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করতেন। এরকমই চলতে থাকতো। এই সময় সুবিধামতো আমিও ওনার সঙ্গে কিছু

ফটো উঠিয়ে নিতাম। সন্ধ্যেবেলাতে উনি যখন হাঁটতে বের হতেন তখন টর্চ নিয়ে ওনার সঙ্গে যেতে হতো।

ছোটবেলা থেকেই জানতাম শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে পৃথিবীতে আসেন। কিন্তু মনের যে দ্বন্দ্বের তখনও নিরসন হয়নি তা হলো—শ্রীরামকৃষ্ণও কি সত্যিই অবতার, সত্যিই ভগবান? আমার দিদি সারদা মায়ের কথা পড়ে শোনাতো। তাতেই জানতে পারি যে কোন দুঃশ্চরিত্র ব্যক্তি প্রণাম করতে এলে ঠাকুর পা সরিয়ে নিতেন কিন্তু সারদা মা কোনদিন তা করেন নি এমনকি ডাকাতদেরও উনি কত যত্ন করতেন। সুতরাং অবতার যদি সেই হন তো তিনি সারদা মা, রামকৃষ্ণদেব নন। আমার .... ভালবাসা তাই মায়ের প্রতি ধাবিত হতো, ঠাকুরের প্রতি .... যেমন অল্পবুদ্ধি তেমনই ধ্যানধারণাও ছিল তখন। মনে হতো এই বিষয়বস্তুর ওপর যদি মহারাজজী কোন আলোচনা করতেন! হঠাৎ শুনলাম সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় মহারাজজীর বক্তৃতা আছে মন্দিরে। আমিও সময়মতো গিয়ে একেবারে প্রথম সারিতে গিয়ে বসলাম। উনি প্রথমেই ওনার ভাষণ শুরু করলেন গীতার একটি শ্লোক দিয়ে—

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমম্ অধর্মস্য তদাত্মানম্ সৃজামহ্যম্।।

পূর্বে আমার অল্প অল্প গীতাপাঠ করা থাকায় আমি এর অর্থটুকু তো বুঝলাম, বুঝলাম যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—যখন যখন ধর্মের হানি হয় তখন তখনই আমি অবতাররূপে পৃথিবীতে আসি। কিন্তু পরের বাংলা অংশটুকু আমি বুঝতে না পারায় অন্যান্য সাধুগণ নিজের নিজের মতো করে আমায় বুঝিয়ে দিলেন। তখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। তবে এটা ভেবে আনন্দ হলো যে যা আমার প্রশ্ন ছিল তার উত্তর প্রদানের মধ্য দিয়েই মহারাজজীর ভাষণ শুরু হলো।

এরপর আমার করগণনায় একটু অসুবিধা হওয়ায় মহারাজজী বলেন যে ধীরে ধীরে এটা অভ্যাস হয়ে যায় যদিও উনি করগণনাকেই উনি উৎসাহ প্রদান করেন কিন্তু জপমালা নেবার জন্য জিদ করতে থাকায় শেষ পর্যন্ত আমাকে জপমালা দিয়ে দেন। পরবর্তীকালে কিন্তু আমার মনে হতে থাকে যে করগণনাতেই বেশি সুবিধা।

স্নান সেরে মহারাজজী যখন মন্দিরে যান তখন বাইরে রোদ্দুর থাকায় আমি ছাতা নিয়ে ওনার সঙ্গে যাই। কিন্তু আহাম্মকের মতো এটা লক্ষ্য করিনি যে ছায়া আমার ওপরে আর রোদ্দুর ওনার ওপরে পড়ছে। উনিও আমার দিকে একটু ফিরে তাকিয়ে কিছু না বলে আবার চলতে থাকেন। এর মধ্যে বিকাশ মহারাজ এলে তিনি আমাকে

সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন আমি ছাতাটা একটু হেলিয়ে ধরলে ছায়া ওনার ওপরে এসে পড়ে। সেবা করার সময় প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিসের ওপর এরকম আন্তরিকভাবে মনোযোগ না দিলে এরকম সব ত্রুটি হয়ে যায়। অন্যান্য সাধুদের কাছ থেকে পরে শুনেছি যে পূজ্য মহারাজজী কখনও কাউকে নিজের কোন অসুবিধার কথা বলেন না। সেবককে তাঁর ইশারা বা আচরণ থেকে বুঝে নিতে হয় যা খুবই বিচক্ষণতার কাজ ছিল।

এরপর ওনার সঙ্গে আমি সিকরা-কুলীন আশ্রমে যাই। একদিন সকালেই পূজ্য মহারাজজী আশ্রমের প্রধান গেট থেকে বেরিয়ে সামনে পায়চারি করছিলেন। একটি ছাগলছানা বারবার ম্যা ম্যা করে মহারাজজীর আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। তাই দেখে মহারাজজী বলেন দেখো, এই বাচ্চাটি ওর মাকে খুঁজছে। সন্ধ্যেবেলায় সকলে যখন এক জায়গায় জড়ো হয়ে নিজেদের সারাদিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা নিয়ে হাসি মজা করতাম সে মজলিশে পূজ্য মহারাজজীও সকলের সঙ্গে যোগ দিতেন। তাঁর সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখ ও ঔৎসুক্য মিশ্রিত আচরণ আজও আমার মানসপটে চিরজাগরুক হয়ে আছে।

হঠাৎ-ই বেলুড়মঠ থেকে আমার এক বন্ধুর ফোন এল তার সেই মুহূর্তে খুবই অর্থের প্রয়োজন যে অর্থ আমার নিকট গচ্ছিত আছে। সেসময় পূজ্য মহারাজজীর পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ করে আমার কোথাও যাবার ইচ্ছা না থাকলেও বন্ধুর প্রয়োজনে আমাকে যেতে হলো। যাওয়ার আগে আমি মহারাজজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম এবং তাঁর শ্রীচরণে প্রণামীবাবদ কিছু অর্থ নিবেদন করলাম। কিন্তু মহারাজজী সেই টাকাগুলি নিয়ে যখন এক এক করে গুণতে আরম্ভ করলেন তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা স্মরণ করে আমি একটু হতবাক হয়ে রইলাম। দোষ ঢেকে শুধু গুণের প্রশংসার চেয়ে আমার মনের এই অনুভূতি এখানে যথাযথভাবে প্রকাশ করাই আমি উচিত মনে করলাম। মহারাজজী গুনতে গুনতে আমায় জিজ্ঞেস করলেন—কত আছে? খুব সম্ভব পাঁচ হাজার ছিল, আমি সেটাই জানালাম। তারপর উনি টাকার বাণ্ডিলটি বিকাশ মহারাজের হাতে দিয়ে সপ্তর্ষি মহারাজকে দিতে বলে দিলেন। বাইরে এসে বিকাশ মহারাজকে প্রণাম করে যখন জানতে পারলাম যে আশ্রমের জন্য কোথাও জমি কেনার জন্য নিজের জন্য না রেখে ওনার প্রণামীটি উনি ঐ শুভ কাজে দান করে দিলেন, তখন আমার অল্প বয়সের অল্প বুদ্ধির প্রতি ধিক্কার জানিয়ে কাউকে কিছু না বলে মঠে ফিরে এলাম।

জপ-ধ্যান করে মনে এক অপার শান্তি অনুভব করছিলাম। কয়েকদিন পর পূজ্য মহারাজজী মঠে ফিরে এলে ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম কি সর্বদা এরকম আসনে বসেই জপ করা উচিত না অন্য সময়েও করা যায়। উনি জানালেন, সর্বদাই জপ করা যায় এমনকি টয়লেটেও। তবে সেখানে জপমালা নিয়ে নয়, মনে মনে জপ করবে। তখনও সাধু হবার ইচ্ছা মনে আসে নি তাই সে ব্যাপারে ওনাকে কিছু জানালাম না।

আমারও ফিরে যাওয়ার সময় এসে গেল। সন্ধ্যা আরতীর সময় আমি সেকথা জানিয়ে ওনাকে প্রণাম করতে গেলাম। দেখলাম, উনি ঠাকুর-মা-স্বামীজি ও বিরজানন্দজীর ফটোর সামনে বসে সান্ধ্যকালীন জপ-ধ্যানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমি প্রণাম করে ফিরে যাওয়ার কথা জানাতেই উনি বললেন, 'কেন, এখানে ভাল লাগছে না?' আমি জানাই যে আমার ছুটি শেষ হয়ে গেছে। মহারাজজী বললেন, আমার জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য তা নয়। যদি এখানে ভাল লাগছে তো এখানেই থেকে যাও না কেন? আমি বুঝতে না পারায় বললেন, 'মিশনে যোগ দাও।' আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। সেদিনই সকালে মায়ের মন্দিরে প্রণাম করার সময় আমি মনে মনে বলেছিলাম যে সন্ন্যাস জীবনই যদি আমার ভাগ্যে থাকে তাহলে মা যেন পথপ্রদর্শন করেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ আমাকে কিছু বলেননি। সন্ধ্যাবেলায় পুনরায় মাতৃমন্দিরে প্রণাম করে মাকে বলেছিলাম যে যদি একজন সাধুও আমাকে মিশনে যোগ দেওয়ার কথা বলতেন তো আমি জয়েন করে নিতাম। কিন্তু এতদিনের মধ্যে আজ যাওয়ার সময় পূজ্য গুরুদেবজীই একথা বলছেন। আমি তো এ ব্যাপারে কারো সাথে কোন আলোচনাও করি নি, উনি আমার মনের কথা জানলেন কি করে? মনের মধ্যে হঠাৎ একটা ভয়ের অনুভূতি থেকে আমি গুরুদেবজীকে বললাম যে বাড়িতে মা-বাবাকে জানাতে হবে তো! বললেন, 'ফোন করে দাও।' তাও আমার থাকার ইচ্ছা দেখে বললেন, 'ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি এস।' আমি আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেলাম, মনে ভয় যদি জবরদস্তি করে বলেন, থেকে যাও যেতে হবে না। তাই কারো সঙ্গে দেখা না করে ব্যাগ নিয়ে রেলওয়ে স্টেশনে চলে গেলাম। ট্রেনে উঠেও আমার মনের অস্থিরতা কাটছিল না—আরে, সাধু হবার কথাই তো আমি এতদিন ভাবছিলাম। আর আজ সে কথাই মহারাজজী যখন বললেন আমি ফিরে এলাম! এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটাতে না পেরে আমি ব্যাগ নিয়ে একবার উঠে ট্রেন থেকে নেমে পড়ছিলাম, পুনরায় এসে সীটে বসছিলাম। সহযাত্রীরা আমাকে বোধ হয় পাগল ভাবছিল। এরকম করতে করতে আমি ট্রেনের মধ্যেই কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠবার পর গুরুদেবজীর কথা অমান্য করা উচিত নয় ভেবে স্থির করলাম

যে ওনার কথা রাখতে আমি মিশনে যোগ দিয়ে কিছুদিন থাকব তারপর ভাল না লাগলে ফিরে আসব। এতে দুদিকই রক্ষা পাবে। কিন্তু ঘরে এসে আমি আমার মাতা-পিতাকে এসব কথা জানাবার সাহস করে উঠতে পারলাম না। ইতিমধ্যে আমার একটা দুর্ঘটনা ঘটায় আহত হয়ে কিছুদিন ঘরে থাকি। তারপর মা-বাবাকে সোমনাথ, দ্বারকা এসব তীর্থদর্শন করিয়ে পুনরায় বেলুড়মঠে ফিরে আসি। পূজ্য গুরুদেবজীকে প্রণাম করে বলি, আপনি আমাকে মিশনে যোগ দিতে বলেছিলেন, এবার আমি সেই উদ্দেশ্যেই চলে এসেছি বাড়ি থেকে। কিন্তু উনি এমন শান্তভাবে নিঃশব্দে বসেছিলেন যে মনে হলো আমার কথা বোধ হয় উনি শুনতেই পাননি। আমি কথাটির পুনরোক্তি করলাম। কিন্তু ওনার মধ্যে কোন পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গেল না। তখন আমার মনে হচ্ছিল যে সে সময় উনি জয়েন করতে বলেছিলেন, আমি না শুনেই চলে গিয়েছিলাম, এ কি তারই প্রতিক্রিয়া? বিকাশ মহারাজ তখন সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। উনিও আমার কথাটি পূজ্য মহারাজজীকে জানিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনি ওকে 'হ্যাঁ' করে দিন। পূজ্য মহারাজজী ওনাকে হাতের ইশারায় চুপ করতে বলেন এবং অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপরে অল্প হেসে বিকাশ মহারাজকে বলেন সপ্তর্ষিকে ডাকবার জন্য। সপ্তর্ষি মহারাজ এসে সারদাপীঠে গিয়ে স্বামী গিরিশানন্দজী মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে।

ওখানে যেতেই উনি আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং পরের দিনই মুণ্ডন করিয়ে নতুন ধুতি ও উত্তরীয় দিলেন পরবার জন্য। আমি সব সাধুদের প্রণাম করে মঠে এলাম গুরুদেবজীকে প্রণাম করতে। বললাম, মহারাজজী, আপনার কথামতো আমি মিশনে যোগ দিলাম। পূজ্য গুরুদেবজী বললেন, "এটা বজায় রেখো, ছেড়ে দিও না।" আমার তো মনে ছিল যে ভাল না লাগলে চলে যাব। তাই তখনকার মতো ওনাকে আর কিছু বললাম না।

২০০৬ সালের ২৬শে এপ্রিল আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সারদাপীঠে জয়েন করি। সকাল-সন্ধ্যা গুরু মহারাজজীকে প্রণাম করতে যেতাম। আর আমার জুতা পালিশ সকলের পছন্দ হওয়ায় সেসময় মহারাজজীর সেবা করার জন্য ঐ কাজটিই তখনও পেয়েছিলাম। সকলে প্রণাম করে চলে গেলে তারপর আমি ঐ কাজটি করতাম। প্রণামের সময় খুব মজার ঘটনা হতো। যদি কোন সাধু বা ব্রহ্মচারীর জামার ওপরের বোতাম খোলা থাকতো তো মহারাজজী হাতের ঈশারা করে দেখাতেন, এজন্য সকলে খুব সচেতন থাকার চেষ্টা করতেন। তাই কারো বোতাম ভাঙ্গা থাকলে উত্তরীয় দিয়ে ঢাকা দিয়ে নিতেন। আমি তখন নূতন তাই আমার খোলা বোতামের প্রতি একদিন

উনি ইশারা করলেও আমি বুঝতে পারছিলাম না। তখন উনি শুধু বললেন—‘বোতাম’। আমিও তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়ে আমার বোতাম লাগিয়ে নিই এবং সারাজীবন এরকম ভাবেই জামা পরতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। মহারাজজী সব কাজে খুব নৈপুণ্য পছন্দ করতেন এবং অন্যেরাও যাতে সব ব্যাপারে নিপুণ হতে পারে সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

প্রতিদিন ওনার জুতা পালিশ করতে করতে একদিন হঠাৎ মনে হলো যে আমার এই সেবার কথা কি উনি জানেন? জানলে তবে তো ওনার আশীর্বাদ পাব? এরকম ভাবতে ভাবতে পরের দিন ওনার জুতা পালিশ করতে বসেছি আর উনিও প্রতিদিনের মতো গিরীশ ভবন থেকে বেরিয়ে নিজ কক্ষের চারিপাশে একটু পায়চারি করতে বের হয়েছেন। ওনার ঘরের পিছন দিকে দক্ষিণ দরজার কাছে দরজার দিকে মুখ করে আমি বসেছি জুতা পালিশ করতে। উনি কখন হাঁটতে হাঁটতে সপ্তর্ষি মহারাজের সাথে আমার ঠিক পিছন দিকে এসে আমার কাজ দেখতে শুরু করেছেন এ কথা টের পাওয়া মাত্রই আমার মনে প্রচণ্ড এক গ্লানি এসে উপস্থিত হয়। আমি ওনাকে দেখাতে চেয়েছিলাম তাই হয়তো এমনটা হয়েছে ভেবে আমার মনে এক বিচিত্র ভাবে জাগে। এতদিন মনে হতো যে উনি না জানলে আমি ওনার আশীর্বাদ লাভ করবো কিভাবে। কিন্তু তখন অদ্ভুতভাবে মনে হতে লাগলো যে সেবা গোপনে করা উচিত। যত গোপন থাকবে তার ফলও তত অধিক হবে।

পূজ্য গুরুদেবজী সপ্তর্ষি মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি হচ্ছে?’ মহারাজ বললেন, ‘ও আপনার কাছ থেকে দীক্ষা পেয়েছে আর আপনার কথা মতো মিশনে যোগ দিয়েছে। তাই প্রতিদিন আসে আপনার কিছু সেবা করার জন্য।’ সেসময় আমিও ওনার দিকে তাকাতে উনিও মুখে কিছু না বলে ভুরু তুলে আমার দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালেন—কি ব্যাপার, কেমন আছ? ওনার ওরকম ভুরু তুলে আমার প্রতি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে আমার নিজের কাজ দেখানোর ইচ্ছাটি স্মরণ করে সেই মুহূর্তে আমি যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে লাগলাম। উনিও আর কিছু না বলে হাসতে হাসতে হাঁটতে চলে গেলেন।

গুরুর আদেশ

জনৈক সন্ন্যাসী

"আমার ছেলে সাধু হওয়ার জন্য ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে, তাকে ফিরে যেতে বলুন।" একজন মা করুণ সুরে এই কথা স্বামী গহনানন্দ মহারাজকে বলেছিলেন। এই কথা মার্চ-এপ্রিল ২০০৪ এর। মহারাজ তখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ ছিলেন এবং রামকৃষ্ণ মঠ পুণে এসেছিলেন।

আমি প্রথমেই এই কথা বলে দিতে চাইছি কারণ, এমন ধরণের স্মৃতিচারণ লিখার আমার কোন ইচ্ছা নেই। কিন্তু পুস্তক তৈরী করার সম্পাদক স্বামী তৎপরানন্দ মহারাজের অনুরোধে লিখছি এবং সংস্মরণ লিখার সময় ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ চলে আসে।

হ্যাঁ, এমন অনেক দুর্লভ সাধুই আছেন, তাকে সাধু জীবন-যাপন করার জন্য মাতা-পিতার অনুমতি এবং আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। পুণে মঠে ভক্তগণ মহারাজকে প্রণাম করছিলেন। দীর্ঘ লাইন ছিল। আমার মা-ও এই লাইনে দাঁড়িয়ে গেছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের ব্যাপার উনার বেশী কিছু জানা ছিল না। যখন উনার মহারাজকে প্রণাম করার সময় এল, তখন তিনি বললেন। মহারাজ হয়ত মা কি বলেছিলেন সেই কথা বুঝতে পারেননি সেই সময়। আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। মহারাজের পাশে দাঁড়ানো একজন সাধুকে বললেন, কি কথা উনি বলছেন। তখন সেই সাধু বলেছিলেন, "উনার ছেলে এখানে সাধু হওয়ার জন্য এসেছে এবং উনার মা ও ঘরের সদস্যরা তাকে নিতে এসেছেন।" মহারাজ জিজ্ঞেস করেছিলেন, "সেই ছেলেটি কোথায়?" আমি দূর থেকে সব কিছু দেখছিলাম, আমার সেখানে যাওয়ার সাহস হচ্চিল না। মহারাজের পাশে থাকা সাধু এদিক ওদিক তাকালেন, কিন্তু আমাকে উনি দেখতে পাননি। যাই হউক, মহারাজ এবং অন্যান্য সাধুরা মা-কে কিছু সান্তনা বাক্য বলেছিলেন। তার কিছু সময় পশ্চাৎ আমি মহারাজকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। সেই সময় আমি

প্যান্ট-শার্ট-এ ছিলাম। সেই সময় সাধুরা বললেন যে এ সেই ছেলে যার মা আপনার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, “Attend them”। আমার ভয় হচ্ছিল যে মহারাজ আমায় যদি ঘর চলে যেতে বলে দেন, কিন্তু উনার বলার তাৎপর্য সেটাই ছিল যে আমি যেন মঠে এদের খেয়াল রাখি। কারণ সঙ্ঘে সাধু হওয়ার জন্য মহারাজকে আগেই জিজ্ঞাসা করে নিয়েছিলাম।

ছাত্রজীবনে মহারাজের থেকে ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৯-এ রামকৃষ্ণ মঠ নাগপুরে মন্ত্র দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিল। দীক্ষার পর প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর একটা করে পত্র লিখতাম। ছাত্র জীবনে বন্ধুদের সাথে থাকা এবং তার সাথে আধ্যাত্মিক জীবন অতিবাহিত করা—সেটাতে কখনো কখনো দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হয়ে যেত। তাই দিশা নির্দেশের জন্য মধ্যে মধ্যে মহারাজের কাছে পত্র লিখতাম এবং মহারাজও লিখার জন্য উৎসাহ দিতেন।

ছাত্রজীবন থেকেই আমার মনে সাধু হওয়ার ইচ্ছা ছিল। কখন কখন সেই ইচ্ছা কম হয়ে যেত এবং কখন কখন তীব্র হয়ে উঠত। স্নাতক-এর পড়া শেষ করে মহারাজকে সাধু হওয়ার ইচ্ছা পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছিলাম। সঙ্গে আমার মধ্যে যে দোষ-গুণ ছিল সেটার উল্লেখও করেছিলাম। আমার মনে সেটাই ছিল যে, যদি মহারাজ আমায় সাধু হওয়ার জন্য বলবেন, তবে উনার সেই আদেশই আমার শেষ নির্ণয় হবে। মহারাজের পত্রের জন্য আমি ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমার এখন মনে আছে, যখন মহারাজের পত্র পৌঁছেছিল, তখন খুব উৎসুকভাবে এবং শ্রদ্ধার সাথে খুলে পড়তে শুরু করলাম।

পত্রে মহারাজ আশীর্বাদ দিয়ে সঙ্ঘে যোগদান করতে বলেছিলেন। পত্র পাওয়ার পর পুনরায় মহারাজের থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্তির জন্য গিয়েছিলাম। তখন তিনি রামকৃষ্ণ মঠ নাগপুরে ছিলেন। আমি উনাকে বলেছিলাম যে আমি সাধু হতে চাই এবং উনার সাথে যে পত্রালাপ হয়েছিল, সেটার কথাও মহারাজকে বলেছিলাম। আমি উনার নিকট আশীর্বাদ প্রদানের জন্য অনুরোধ করলাম এবং উনি আমার মস্তকে হাত রেখে সঙ্ঘে যোগদান করতে বলেছিলেন। এইভাবে ২ মার্চ ২০০৪-এ আমি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করলাম।

পূজনীয় মহারাজকে পুণে মঠে চার-পাঁচ বার দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং উনার সেবা করারও সুযোগ হয়েছিল। ২০০২-এ রামকৃষ্ণ মঠ পুণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নবনির্মিত সার্বজনীন মন্দির প্রতিষ্ঠানের সমারোহ ছিল। তখন মহারাজ সহ-সঙ্ঘাধক্ষ্য

ছিলেন। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা স্বামী রঙ্গনাথানন্দ মহারাজের করকমলে হয়েছিল। আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সেবার সুযোগ হয়েছিল। তখন আমি একজন স্বয়ং সেবক ছিলাম। মহারাজ যে কয়েকদিন পুণেতে ছিলেন, তখন বাকী স্বয়ং সেবকদের সাথে উনার ঘর পরিষ্কার করা, কাপড় ধৌত করা, বাসন ধৌত করা ইত্যাদি সেবা কাজ করতাম। মহারাজ তখন সাধু নিবাসের প্রথম তলায় ছিলেন। একবার মহারাজ উনার ঘরের দিকে আসছিলেন। উনার সাথে উনার সেবক মহারাজরাও ছিলেন। আমি মহারাজের ঘরের সামনে একটা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ মহারাজ আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কি গীতা পড়েছ?" আমার উত্তর দেওয়ার আগেই মহারাজ বলেছিলেন, "গীতা খুবই সুন্দর গ্রন্থ, সেটা পড়া উচিত।"

মহারাজকে যখন ভক্তরা প্রণাম করতেন, তখন উনি প্রত্যেক ভক্তকে স্থির দৃষ্টিতে দেখতেন। মহারাজ এর সেই স্থির দৃষ্টিতে এমন করুণা এবং পবিত্রতার ভাব ছিল যে ভক্ত লোক অপূর্ব ধন্যতা অনুভব করতেন। কখন কখন ভক্তদের প্রণাম গ্রহণের সময় মহারাজের মুখমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে যেত এবং উনার চক্ষু বন্ধ হয়ে যেত। মহারাজের এই গম্ভীর মুখমণ্ডল যে ভক্তরা দেখতেন তাদের হৃদয়ে মহারাজের প্রতি স্নেহ এবং শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়ে যেত।

মহারাজ দীক্ষিত ভক্তদের যে পত্র লিখেছিলেন, সেটার অধিকাংশ হিন্দীতে প্রকাশিত হয়ে গেছে। মহারাজ এর লিখা পত্রে কিছু কিছু ছিল, যেমন উনি বলতেন যে, 'সর্বদা নিজের মনকে দেখতে থাক', 'নিজের অবসর সময়ে সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করতে থাক'। মহারাজ এর জীবনই উনার উপদেশের মূর্ত বিগ্রহ ছিল। উনার জীবনে এমন এমন ঘটনা আসতে থাকত। সেটা থেকে এটাই বুঝা যায় যে তিনি অবসর সময়ে সর্বক্ষণ ভগবানকে স্মরণ করতেন।

একবার মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) মহারাজকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল যে, "শ্রীমা সারদা দেবী এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজজী যে দীক্ষা প্রদান করেন, সেটাতে পার্থক্য কি?" মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন, "আমার মনে হয় না সেটাতে কোন পার্থক্য আছে, ভাব একটা গঙ্গা জল আলাদা আলাদা মাধ্যম থেকে আসছে।" ধন্য আছেন সেই সমস্ত মানুষ যারা শ্রীরামকৃষ্ণদেব-এর কৃপা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের গুরুদের দ্বারা রামকৃষ্ণ-রূপী অমৃতধারা প্রাপ্ত হচ্ছে।

অহৈতুকী কৃপা

জনৈক সন্ন্যাসী

১৯৯৪ সালের ঘটনা। দক্ষিণ কলকাতা নিবাসী এক পরিচিত ভদ্রলোক একটি আবেদন নিয়ে এসেছেন। তাঁর প্রতিবেশী এক বয়স্ক ভদ্রমহিলার অনেক দিনের ইচ্ছা তিনি রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্ঘগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেবেন। নানা কারণে তাঁর দীক্ষা নেওয়া হয়ে ওঠে নি। ইতিমধ্যে একদিন তিনি পড়ে গিয়ে কোমরে খুব আঘাতও পান। ফলে ভদ্রমহিলা শয্যাশায়ী ও চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তাঁর মনে তখনও দীক্ষার নেওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এ এক অদ্ভুত সমস্যা। কারণ, সাধারণতঃ রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্ঘগুরুরা কারও বাড়িতে গিয়ে দীক্ষা দেন না।

পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ সেই সময় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট এবং পূজনীয় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী ও পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে আসীন। পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজের পক্ষে কারও বাড়িতে গিয়ে দীক্ষা দেওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। পূজনীয় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী হায়দ্রাবাদ মঠে থাকতেন। সব দিক বিবেচনা করে দীক্ষার প্রস্তাব নিয়ে যখন পূজনীয় গহনানন্দজীর কাছে যাওয়া হলো, তখন তিনি সমস্ত বিষয়টা মন দিয়ে শুনলেন। এরপর বেশ কয়দিন কেটে গেল। মহারাজের অত্যন্ত ব্যস্ত কর্মসূচী। কাজেই এ বিষয়ে আর কোন কথাবার্তা হয়নি।

কিছুদিন পর আবার যখন পূজনীয় গহনানন্দজীকে সেই শয্যাশায়ী ভদ্রমহিলাটির দীক্ষার ব্যাপারে মনে করানো হলো, তিনি উত্তর দিলেন, "আমার মনে আছে। তবে মনে হচ্ছে সম্ভব হবে না।" অসহায় হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললাম, "তাহলে কি কিছু করণীয় নেই? মহিলাটি শুকিয়ে মরে যাবেন ? এই কথা শোনা মাত্র পূজনীয় গহনানন্দজী গম্ভীর হয়ে গেলেন। বুঝলাম মন্তব্যে কাজ হয়েছে! অবশেষে মহারাজ দীক্ষা দিতে রাজী হলেন।

বলা বাহুল্য, বিষয়টি গোপন রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। ভক্তদের মধ্যে জানাজানি

হয়ে গেলে হিতে বিপরীত হবে। যাইহোক, দীক্ষার একদিন আগে মহারাজের নির্দেশে তাঁর দুই সেবক ভদ্রমহিলার বাড়িতে গিয়ে তাঁর শয্যাপার্শ্বে দীক্ষার সব ব্যবস্থা করে এলেন। নির্দিষ্ট দিনে মহারাজের গাড়ি দীক্ষার্থীর বাড়ির প্রধান ফটকের একদম সামনে গিয়ে থামল। মহারাজ সেবকসঙ্গে দীক্ষার্থীর ঘরে প্রবেশ করলেন। এদিকে ভদ্রমহিলা সেই শুভ মুহূর্তের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। মহারাজের জন্য রাখা নির্দিষ্ট চেয়ারে তিনি বসলেন ও অন্যান্যরা ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে দীক্ষাপর্ব চলল। দীক্ষাদানের পর মহারাজ যোগোদ্যান মঠে ফিরে এলেন।

এরপরে কয়েকবার পূজনীয় গহনানন্দজী এই অসুস্থ শিষ্যার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। বৃদ্ধার খোঁজখবর নিতে আরও একদিন মহারাজ সেবকসঙ্গে ঐ বাড়িতে যান। ভক্তটির মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এর কিছুদিন পর, শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজার পুণ্য দিনে সন্ধ্যাবেলায় সেই ভক্তমহিলা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে চির আশ্রয় লাভ করলেন। এটি অহৈতুকী কৃপা ছাড়া আর কি ?

রিইউনিয়ন উইথ কমিউনিয়ন

জনৈক সন্ন্যাসী

আমি প্রথমে তাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি তিনি কে। আমি তাঁর ছবিটি পেলাম শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায় চালিত একটি আশ্রম থেকে, যেখানে আমি দীক্ষা গ্রহণ করতে যাচ্ছিলাম। সে প্রায় আজ থেকে তেইশ-চব্বিশ বছর আগে। তখন আমার বয়স হবে হয়তো তেইশ কিংবা চবিবশ। বিদ্যুৎহীন কক্ষে তিনি বসে বসে ঘামছিলেন এবং বিশেষ পাঠে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ আসছিল না। তাঁর সচিবের সাহায্য নিয়ে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে। আমি তাকে জানালাম আমার সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করার ইচ্ছা।

আমি পুনরায় তাঁকে জানালাম, আমার পিতা-মাতা বৃদ্ধ। এমন খবরে তাঁরা আমাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন সন্তান বলে অভিহিত করেন। একথা শুনে তাঁর একটাই উত্তর ছিল—ওনারা তোমার পিতামাতা নন। মনে ধাক্কা খেলাম, সত্যিই তো আমি ওনাদের দত্তাপুত্র ছিলাম। তাঁর এই সত্য উৎঘাটনে আমি বিস্মিত হলোাম, গুরুকৃপায় একসময় তাঁরা একজন নিজ সন্তানের পিতামাতা হলেন। তাঁদের পরিচর্যা একন সেই সন্তানের হাতে। তাঁরা ভালই আছেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি।

২৬-২৭ বছর আগে আমি একদিন কর্মসূত্রে কাশী সেবাশ্রমে স্বামী মুক্তানন্দজী (বনবিহারী মহারাজ) মহারাজের সান্নিধ্য লাভ করলাম। আমার অনুভূতি হলো পুরো কক্ষটি একটি আলোকজ্যোতিতে পরিপূর্ণ এবং তার মধ্যে উপবিষ্ট একজন যোগী, শিবের অবয়ব নিয়ে ধ্যানস্থ। আমি প্রার্থনা জানালাম আমাকে যেন তিনি তারই পথে টেনে নেন। শৈশব থেকে ধ্যান প্রক্রিয়ার একটা অভ্যাস আমার মধ্যে গড়ে উঠেছিল এবং আমি নিজেকে বনবিহারী মহারাজের মধ্যে খোলা চোখে দেখা একটি আলোক জ্যোতি ভাবতাম। সন্ন্যাস লাভের ভাবনাট্য ভেতরে জেগে ওঠায় একটা সমস্যা দেখা দিল। ধ্যানের মধ্যে সব সময় দেখা দিতেন বনবিহারী মহারাজ, গুরুদেবের জায়গায়।

একদিন প্রত্যুষ্যে স্বপ্নে দেখলাম আমার গুরুদেব একটি আলোকজ্যোতির মধ্যে উপবিষ্ট এবং আমি সেই আলোকজ্যোতির মধ্যে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকলাম। একটা স্বর্গীয় ভাবধারায় নিজেকে খুঁজে পেতে চাইলাম। আর তখনি দেখলাম গুরুদেবকে নিয়ে ধ্যানে মগ্ন হওয়ার একটি সমাধান খুঁজে পেলাম।

আমি এটা গুরুদেবের কাছে বর্ণনা করেছিলাম যখন তিনি বেলুড়মঠে স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের কক্ষে অবস্থান করছিলেন, তিনি হেসে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে স্বর্গীয় ভাবধারায় জানালেন—(গুরু আর কেউ নয়, সেই পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি আমার মাথাটা তাঁর কোলে নিয়ে তিন মিনিট হাত বোলালেন। আমি চোখের জলে অভিভূত হয়ে গেলাম।

১৯৯৪ সালের পরে নিমন্ত্রিত হওয়ার পরে জয়পুর, খৈতরী এবং অবশেষে দিল্লী গেলাম।

খেতরীতে মহারাজ যখন দেওয়ান হলে বসেছিলেন—

আমি তাকে জিগ্যেস করলাম গুরু ঈশ্বরকে দর্শন করিয়ে দেয়, আমাদেরও হবে?

তিনি বললেন—তাহলে এলেই বা কেন?

৪। মঠে যোগ দেওয়ার পরে আমি দিল্লীর পিপিটিসিতে ছিলাম, আমার মঠে যোগ দেওয়ার পরেই আমার মায়ের শরীর গেল এবং আমার মা প্রায়ই আমার কাছে আসা শুরু করলেন। একদিন গুরুদেব যখন এখানে ছিলেন মা এখানে এলেন এবং সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ফিরছিলেন।

আমি তাকে গুরুদেবের দর্শনের কথা বললাম। আমি অরবিন্দ মহারাজকে মায়ের সঙ্গে গুরুদেবের দর্শনের ব্যবস্থা করতে বললাম, তিনি বললেন মহারাজ সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করে ফিরলেই হবে। আমি মাকে সভাপতি মহারাজের ঘরের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়াতে বললাম, যেখানে তিনি তাঁকে দর্শন এবং প্রণাম করতে পারবেন। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এবং মহারাজ তাঁর কক্ষপ্রবেশ করছিলেন, মহারাজ তাকে দেখলেন এবং দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মাথাটা নাড়লেন। মা আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন—আমি ওর মা। তখন মহারাজ মায়ের দিকে নির্লিপ্ত চোখ তুলে বললেন—ও কি তোমার ছেলে? তারপর থেকে আমার মা আর কখনো আমাকে বাড়ি ফিরতে বলেননি এবং আমার সমস্যা অজান্তে সমাধান খুঁজে পেল।

একদিন আমি এবং অন্যান্য ব্রহ্মচারীদের নিয়েমহারাজের সঙ্গে হাঁটছিলাম, জায়গাটি

ছিল দিল্লী মিশনের সাধু নিবাসের কাছে, বৃষ্টির জন্য বাগান থেকে উঠে আসা কিছু কেঁচো বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তিনি থামলেন।

একটা কেঁচোকে লক্ষ্য করে মহারাজ বললেন—এখানে হাঁটা ওদের জন্মগত অধিকার। একটা কেঁচো রাস্তা পার হয়ে গেলে মহারাজ হাঁটতে শুরু করলেন।

একদিন দিল্লীতে মহারাজের সঙ্গে আমি এবং তার সেবক ব্রহ্মচারী হাঁটছিলেন, আমি সুযোগ পেয়ে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম—আমি সারাদিন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায় আপনার কথা মেনে দিনে তিনবার ধ্যানে বসা কঠিন হয়ে পড়ছে। তাই আমি যদি দিনে একবার করি, এবং সেটা খুব ভোরবেলা। জোরপূর্বক আমি দিনে একবার উপাসনায় বসতে থাকলাম। তিনি আস্তে আস্তে বললেন তুমি আমাকে অমান্য করছো, রুটি করে করো, আমি ভয় পেয়ে তাঁর উপদেশ শিরোধার্য করলাম।

আমার ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম, তাই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটিতে তেমন অভ্যস্ত ছিলেন না। একদিন দিল্লীতে তাঁকে আমি সেবা করছিলাম। আমি স্নানঘরে গিয়ে বেসিনে কিছু ধুচ্ছিলাম, হঠাৎ করে তিনি সেখানে এলেন তাঁর হাত ধোয়ার জন্য। আমি তাকে রাস্তা দিলাম কিন্তু অজান্তে তিনি লক্ষ্য করে বললেন গুরুসেবায় শুচি, অশুচি মানতে হয়।

যখন আমরা ২০০১ সালে হিমাচল প্রদেশের বাগ্মায় ঘুরছিলাম, পূজনীয় মহারাজ গোকুলানন্দ আমাকে আদেশ করলেন—সেখানে গুরুদেবকে সেবা করার, আমাকে ঠাকুরের বেদি সাজানো এবং বেলপাতা সংগ্রহ এবং অন্যান্য কাজ করতে হতো। দীক্ষার দিনে মন্দিরের মধ্যে তিনি সোফায় বসে ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি বাইরে এসে ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের প্রণাম নিতেন। সবশেষে আমি প্রণাম করতাম।

একদিন আমি আভূমি প্রণাম সেরে হাঁটু মুড়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তিনি গভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—কৃপা মানে বোঝা আমি বিনীতভাবে মহারাজকে বললাম বলুন। তাঁর কথায় আমি একটা আলোর সন্ধান পেলাম।

একদিন দিল্লীতে ভক্তদের দীক্ষার দিনে মন্দিরের নীচে মন্দির ভান্ডার গৃহেতে উপবিষ্ট মাকে সুন্দর করে সাজানো হোলো, মাকে বসানো আছে কাঠের তৈরী আশ্রমে, যেমনটি বসে মহারাজের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করলাম। কৃপাজি কেবলম, কৃপা হি কেবলম।

বেলুড় মায়ের মন্দিরে কাঠের আসনে বসানো হয়েছে মাকে। যখন তিনি মন্ত্র দীক্ষার গর্ভমন্দিরে ঠাকুর-মা-স্বামীজি প্রণাম করে নীচে নামছেন তখন আমি ওনার

সঙ্গে ছিলাম। সেবকদের সঙ্গে এবং মহারাজ গোকুলানন্দসহ মন্দিরের শেষ সিঁড়িতে নেমে আসতেন।

গোকুলানন্দ বলতেন—মাকে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, আপনি যদি চান, চলুন একবার মাকে দেখে নিন।

পূজনীয় মহারাজ হেসে স্বামী গোকুলানন্দকে সবিনয়ে বলতেন—আর কোথায় যাব, আমি তো সব জায়গায় মাকে দেখেছি, এরপরে তিনি স্বামী গোকুলানন্দকে সাথে সুন্দরভাবে সাজানো মায়ের মূর্তি দেখতে গেলেন।

একদিন যখন তিনি সপ্তর্ষি মহারাজের সাথে দিল্লী এলেন যখন তাঁর সেবকরা এসে পৌঁছায়নি, আমাকে তার কক্ষের কাছে থাকতে বলা হলো, সারারাত তাঁর সেবা করে আমি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। খুব বোরে দেখলাম তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে ধ্যানে বসার জন্য ডাকছেন, আমি লজ্জা পেলাম এইভেবে আমার উচিত ছিল মহারাজের জাগার আগে আমার উঠে পড়া এবং ৫টায় জপ করা।

মা মহারাজের এই কথায় হতচকিত হয়ে বলে ফেললেন—না, না, মহারাজ, ও আপনার ছেলে। এবার মহারাজ জানালেন—এবার তোমার সঠিক উপলব্ধি হলো, যে ও অন্য কারো ছেলে নয়, আমার ছেলে।

উপবিষ্ট মহারাজকে আমি যখন তাঁর পাদুদ্বয় পরানোর ব্যস্ত দিলাম, ততক্ষণ মহারাজ দুটি আমার মাথার উপরে বুলিয়ে যেতেন। যেভাবে বড়রা শিশুর মাথায় আদর করে হাত বোলায়।

দুটি ঘটনা মনে পড়ছে

জনৈক সন্ন্যাসী

পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের জীবনের কিছু ঘটনা — জনৈক সন্ন্যাসীর মুখ থেকে শোনা গেল, পূজনীয় মহারাজ যখন স্বামীজীর বেডরুমের পাশে থাকতেন তখন আমাদের ব্রহ্মচর্যের পর মহারাজকে লাইন ধরে প্রণাম চলছে, হঠাৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কী নাম হয়েছে? জনৈক সন্ন্যাসী তখন বললেন অমিতচৈতন্য। পূজনীয় মহারাজ তখন শুনে বললেন ও আমারও তো নাম ছিল অমিতচৈতন্য। তখন পাশ থেকে সেবক উত্তর দিলেন না মহারাজ আপনার তো নাম ছিল অমৃতচৈতন্য।

আবার একবার মহারাজ জামতাড়া আশ্রমে গিয়েছেন তখন বিকেলবেলা উইলচেয়ার করে মহারাজকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ট্রেন দেখাতে। তখন সেবকরা উইলচেয়ার দূরে রেখে মহারাজকে হাঁটানোর জন্য রাজি করাচ্ছেন। মহারাজ তখন আমাকে উইলচেয়ার আনতে বলছেন। আমি তখন confuse হয়ে গেছি। President মহারাজ বলছেন কী করব, আমি তখন উইলচেয়ারের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং চেয়ারটি নিয়ে এলাম।

আমি আছি তোমার কোন ভয় নেই

ব্রহ্মচারী অনিন্দ্য

There is an eye that never sleeps beneath the wing of night;
There is an ear that never shuts when sink the beams of light.
There is an Arm that never tires when human strength gives way,
There is a love that never fails when earthly loves decay.

পরম পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সম্বন্ধে বলতে গেলে স্মৃতির মনিকোঠায় প্রথম যে কথাটি মনে হয় — ২০০৩ একটি শীতের সকাল। আমাদের 3rd Unit Test চলছে, আমি 'Sunrise'-এ পড়তাম তাই পরীক্ষা শেষ হলেই মঠে চলে আসতাম। মঠে আসার একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল পূজনীয় স্বামী পরিপূর্ণানন্দজী মহারাজ এবং মহাদেব কাকু। মহারাজ সারদীপীঠের showroom-এর cash counter-এ বসতেন। আমি গেলে মহারাজ লজেন্স, ঠাকুর-মা-স্বামীজির ছবি, নানারকম জিনিস দিতেন। একদিন মহারাজ বললেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি পূজা আসছে। তুমি এখানে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করবে? আমিও স্বানন্দে হ্যাঁ বললাম। তখন সারদাপীঠের showroomটি এত বড় ছিল না। তাই বাইরে প্যান্ডেল করে, ধূপ, বই, ছবি ইত্যাদি বিক্রি হত। আমাকে ছবি বিক্রির জায়গায় রাখা হয়েছিল ধ্রুব জেঠুর সহকারী হিসেবে। ধ্রুব জেঠু হলেন পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের আশ্রিত এবং ওনার মা শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান। আমি নতুন, এই কাজে অনভিজ্ঞ। ক্রেতারা তাদের গুরুদেবের নাম করে ছবি চাইছে। ধ্রুব জেঠু এই কাজে সাহায্য করেন। সেখানে ঠাকুর-মা-স্বামীজির ছবির সঙ্গে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজের ছবিও ছিল। পরিপূর্ণানন্দজী মহারাজ আমাকে একটি ছবি দিয়েছিলেন যা আজও আমার কাছে আছে। সেই প্রথম দেখাতেই মহারাজকে আমার কেন জানিনা ভাল লেগে গেল যা আজও সমানভাবে অমলীন। একসময় সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, ঠাকুরের মন্দিরে আরতি

শুরু হয়ে গেল। মহারাজ আমাদের সমস্ত জিনিস গুছোতে বললেন। আমরা গুছাতে শুরু করলাম। যেই আমাকে বললেন জানিস আজকে ব্রহ্মচারীরা সন্ন্যাস লাভ করবেন, সারারাত পূজা হোম হবে তাই নানা centre থেকে পূজনীয় গহনানন্দজী, আত্মস্থানন্দজী, গীতানন্দজী মহারাজরা এসেছেন। তোকে কালকে তাঁদেরকে প্রণাম করতে নিয়ে যাব। আমিও পরদিন সকালে তার সঙ্গে গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করলাম। মহারাজ আমার মাথায় তার তর্জনী স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন আমি সমস্ত মন্দির দেখেছি কিনা কিন্তু যখন শুনলেন আমি দেখিনি, তখন তিনি বললেন, মঠে যখন আসবে তখন সমস্ত মন্দির দর্শন করবে এবং সুবিধা হলে প্রসাদ খেয়ে যাবে। তাঁর এই আন্তরিক ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করল যে তিনি বেলুড় মঠের মতো পৃথিবী বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে সাধু, আমার মতোন সামান্য অপরিচিত ছেলেকে কিভাবে আপ্যায়িত করছেন। এরপর আমি সময় সুযোগ পেলেই মঠে চলে যেতাম। তার মধ্যে একদিন একটি দুঃসংবাদ পেলাম শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের দেহ চলে গেল। তখন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ প্রেসিডেন্ট হলেন। ইতিমধ্যে আমি পূজনীয় স্বামী অচ্যুতানন্দজী মহারাজের পরিচিত হয়ে তাঁর স্নেহলোাভ করেছি। তিনি আমাকে দীক্ষার উপকারিতা কেন নেয় বলেছেন। মঠের অপর এক পরম পূজনীয় পূজারী সুকুমার মহারাজও আমায় স্নেহ করেন। তিনিও জিজ্ঞাসা করেন আমি দীক্ষা নিয়েছি কিনা। মহারাজ আমাকে বললেন, প্রেসিডেন্ট কোয়ার্টারে গিয়ে খোঁজ নিতে, আমি গিয়ে পূজনীয় সপ্তর্ষি মহারাজের সঙ্গে দেখা করে দীক্ষার কথা বলাতে উনি আমাকে এই ছোট বয়সে দীক্ষা নিয়ে সব ঠিক ঠিক করতে পারবি? তারপর মহারাজ আমাকে পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের কাছে পাঠালেন। আমি মহারাজকে প্রণাম করে দীক্ষার কথা বলায়, মহারাজ আমায় আমার ব্যক্তিগত কিছু প্রশ্ন করার পর দীক্ষা দানে সম্মতি দিলেন এবং আমার দীক্ষা হয়ে গেল ২০০৫-এর 6th September। দীক্ষার ঘরে মহারাজ আমাদের কিছু কথা বলেছিলেন, তার থেকে কিছু কথা ভাগ করে নিতে চাই।

১) দীক্ষা বস্তুত আত্মসংস্কারের নামান্তর

২) জীবের মোক্ষদাতাই ঈশ্বর। একমাত্র পরমেশ্বর জীবকে মুক্তি দিতে পারে, অপর কারও সাধ্য নেই।

৩) জীব অনুগ্রহের যোগ্য হলে, তিনি অন্তরে অন্তরে অনুগ্রহ করেন বলেই জীবের দীক্ষা গ্রহণ করার ইচ্ছা জাগে।

৪) আমরা "গুরু মহারাজ" শ্রীশ্রী ভগবান রামকৃষ্ণদেবকেই বোঝাই, কখনো আমাদের নিজ নিজ গুরুকে আলাদাভাবে বোঝায় না।

মহারাজ যাদের উপনয়ন হয়েছে, তাদের .... উপর জোর দিতে দেখেছিলাম। এরপর মহারাজের সাথে আমার আর দু'বার দেখা হয়। প্রথমবার আমি একটি বই পড়ে, সাধনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় মহারাজ বলেছিল কোনো বই পড়ে নিজের স্বাধন জীবনের কোন পরিবর্তন আনবে না। আমি যেভাবে দীক্ষার ঘরে বলেছি সেইভাবে করে যাবে এবং সাধন-পদ্ধতিতে যা যা লেখা আছে ঠিক ঠিক তাই করবে। আর দ্বিতীয়টি হলো আমি আমার পারিবারিক একটি বিষয় নিয়ে মহারাজকে জানাই এবং বলেছিলাম আমার খুব ভয় করছে এর থেকে কি করে পরিত্রাণ পাব। তার উত্তরে মহারাজ বলেছিলেন, 'আমি আছি তোমার কোন ভয় নেই।' অচিরেই আমি এই বিপদ কাটিয়ে উঠেছিলাম। পূজনীয় মহারাজের কাছে মহারাজের একটি স্মৃতি শুনেছিলাম। মহারাজ তখন সেবা প্রতিষ্ঠানে ছিলেন, একটি ছেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। মহারাজ তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন, ছেলেটি কিন্তু তা না করে বার বার উঁকি, ঝুঁকি দিয়ে তার খোঁজ করতে লাগলো, কিছুক্ষণ পর মহারাজ তাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে উৎকন্ঠা নিয়ে তুমি আমার খোঁজ করছিলে সেই আগ্রহ নিয়ে যদি ভগবানের খোঁজ করতে অবশ্যই তা লাভ করতে। জনৈক সাধুর কাছে শোনা একটি স্মৃতি। তিনি তখন কিচেনের দায়িত্বে ছিলেন। একদিন প্রসাদ পাঠানো হয়েছিল। পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন, প্রসাদের দায়িত্বে কে আছে তাকে ডেকে পাঠাও। যেই মহারাজ দায়িত্বে ছিলেন, তিনি এসে প্রণাম করতে মহারাজ প্রথমে দেখলেন পায়েসে তরকারীর ঝোল পড়েছে, "না শুদ্ধাং ধেয়, অশুদ্ধাং অধেয়", যেই কাজই কর ঠাকুরের পূজা করছ ভেবে করবে, তাহলেই দেখবে সব কাজ সুন্দর ভাবে হচ্ছে।

যতদিন ছিলেন তাঁর কিছুই বুঝতে পারিনি তখন, তাঁর কিছুই বুঝতে পারছি না, জীবনের প্রতি পদে তাঁর আশীর্বাদ আমার চলার পথের পাথেয়।

সব ধরতী কাগদ করুঁ, লেখনি সব বনরায়
সাত সমুন্দ কী মসি করুঁ, গুরু গুণ লিখা নায়ার।।

সাধারণ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সহ-অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে যোগোদ্যান রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষের আসন অলংকৃত করেন।

স্মৃতিতর্পণে অন্যান্য সন্ন্যাসীবৃন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণে নিবেদিতপ্রাণ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

স্বামী পরমাত্মানন্দ

বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার পাহাড়পুর গ্রামে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার মহাষ্টমী তিথিতে ভূমিষ্ট শিশুকেই আমরা পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধাররূপে দেখতে পাই পরম পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজকে।

পূর্বাশ্রমের বালক নরেশরঞ্জনের প্রকৃতি ছিল সমবয়সীদের থেকে ভিন্ন ধরণের। কোন বিষয়েই ছিল না তাঁর কোন বাড়তি কৌতূহলো, ছিল না কোন হালকা বাক্যালাপ, বরং কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির—সংযতবাক। কার্যক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় একটি শব্দও ব্যয় করতেন না—তাঁর একটি কথাই যথেষ্ট, তার ওজন ছিল বেশ বেশী। সেই সঙ্গে ছিল অসীম সাহস এবং একই সঙ্গে সুমিষ্ট ব্যবহার। তাই দেখা যায়, ভবিষ্যৎ জীবনে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সব গুণ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে প্রতিভাত হয়েছিল।

বরাবরই ছিলেন মেধাবী ছাত্র, দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন প্রথম বিভাগেই এবং সেই ছাত্রজীবনেই কিশোর নরেশরঞ্জন বিভোর হয়ে যান রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থাবলী অধ্যয়নে।

কেতকী মহারাজের প্রভাব : শ্রীশ্রী ঠাকুর ও স্বামীজির ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত ও উৎসর্গীকৃত এক সন্ন্যাসীর জীবন এই সময়ে তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। তিনি হলেন কেতকী মহারাজ (স্বামী প্রভানন্দ)। ঘাসিয়া ও জয়ন্তিয়ার পাহাড়ী দরিদ্র, অশিক্ষিত নরনারীর সেবায় কেতকী মহারাজ তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। কঠোর পরিশ্রমের ফলে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে রোগাক্রান্ত হয়ে তাঁর শরীর ত্যাগ হয়।

মানুষের সেবাকাজে কিভাবে নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দেওয়া যায় তা শ্রীমান নরেশরঞ্জন প্রত্যক্ষ করলেন কেতকী মহারাজের জীবনে। এভাবে স্বামী বিবেকানন্দের যে ত্যাগ ও সেবাদর্শ নরেশরঞ্জনের স্বীয় মানসপটে পোষণ করতেন, তা কেতকী মহারাজের সান্নিধ্যে এসে গভীরভাবে আলোড়িত হয়।

ভুবনেশ্বর মঠের জীবন : ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রথম বেলুড় মঠ ও শ্রীশ্রী ঠাকুরের লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর মন্দির দর্শনের পর থেকেই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের অদ্বৈত আশ্রমে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। অনতিকালের মধ্যেই ঈশ্বরলাভের আকুলতায় সাধু জীবন-যাপনের জন্য মনস্থির করেন। শ্রদ্ধাভাজন সাধুদের সাথে এ-বিষয়ে আলোচনা করায় তাঁরা তাঁকে ভুবনেশ্বর মঠের কথা বলেন। এই মঠ পূজ্যপাদ রাজা মহারাজের প্রিয় স্থান এবং এখানে জপধ্যান করার ও শাস্ত্রপাঠের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়া সাধু মহাপুরুষদের সঙ্গলাভের আশায় তিনি ভুবনেশ্বর মঠেই যোগ দিতে মনস্থির করলেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে মাদ্রাজ মেলে রওনা হলেন, গন্তব্য ভুবনেশ্বর মঠ। গরুর গাড়ী করে মঠে যখন পৌঁছলেন তখন রাত তিনটে। মঠের প্রবেশ দ্বারেই দেখা পেলেন পূজনীয় সূর্য মহারাজের (স্বামী নির্বাণানন্দজী) সঙ্গে, যিনি ছিলেন তৎকালীন উক্ত মঠের অধ্যক্ষ।

ভুবনেশ্বর মঠের জীবন শুরু হলো—দিনটি ছিল সোমবার, শিবের বার। শুভ্রবস্ত্র পরিহিত, শিখাধারী নরেশরঞ্জন তখন এক নতুন মানুষ—নতুন জীবনের পথিক; নবীন ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে প্রবেশ করে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণত হলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে।

ব্রহ্মচারী নরেশরঞ্জনের আচরণে প্রকটিত সেবার ভাবের সুপ্ত দীপশিখাকে প্রজ্জ্বলিত করে দেন স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ। এই প্রজ্জ্বলিত দীপশিখাটিই তাঁর পরবর্তী জীবনকে করেছিল সেবার আলোকে প্রদীপ্ত।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্বামীজির সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী বিরজানন্দজী ভুবনেশ্বর মঠে উপস্থিত হন এবং এপ্রিল মাসে তিনি কয়েকজনকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন যাদের অন্যতম হলেন ব্রহ্মচারী নরেশরঞ্জন।

অদ্বৈত আশ্রমে আগমন : দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্বেল পরিবেশের মধ্যে **১৯৪২** খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ব্রহ্মচারী নরেশরঞ্জন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কলিকাতার অদ্বৈত আশ্রমে যুক্ত হন। অদ্বৈত আশ্রম তখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা কেন্দ্র। প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকা তখন সর্বভারতীয় সংস্কৃতির জগতে তথা বিদেশেও অনন্য মর্যাদার অধিকারী। অদ্বৈত আশ্রম তখনই আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং ব্রহ্মচারী নরেশরঞ্জন অচিরেই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হয়ে উঠলেন।

অনন্তর **১৯৪৪** খ্রিষ্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিতে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজীর কাছে

তিনি ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হন—তাঁর নামকরণ হয় ব্রহ্মচারী অমৃতীচেতনা। পরবর্তীকালে তাঁর কাছেই সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষার পর স্বামী গহনানন্দ নামে পরিচিত হন।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্বামী গহনানন্দজী : রামকৃষ্ণ মিশন শিশু মঙ্গলের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দজীর সান্নিধ্যে থেকে **১৯৫৮** থেকে **১৯৬৩** পর্যন্তকালে নিজেকে বৃহৎ কর্মকান্ডের উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন স্বামী গহনানন্দজী। প্রতিষ্ঠা করলেন নিজেকে যোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে। **১৯৬৩** এপ্রিল থেকে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করেন সম্পাদকরূপে। তাঁর সামনে তখন একটাই অন্বিষ্ঠ—“সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ। সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ”। মানুষকে ভালোবাসতেন তিনি নররূপী নারায়ণ জ্ঞানে। পথে প্রান্তরে অবহেলিত, শিবরূপী জীবের পূজা করার যে ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা নিহিত ছিল এযাবৎ তাঁর অন্তরে, এখন তা মুক্তি পেল পরিপূর্ণরূপে। মনে পড়ে শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজীর উক্তি—“সেবা প্রতিষ্ঠান মানেই স্বামী গহনানন্দ এবং গহনানন্দ মানেই সেবা-প্রতিষ্ঠান”।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকাকালীন তিনি গড়ে তোলেন একে একে নানা চিকিৎসা বিভাগ। তার মধ্যে সে সময়ের উল্লেখযোগ্য বিভাগ হলো অভেদানন্দ ‘স্নায়ু রোগ চিকিৎসা বিভাগ’, যে বিভাগটির দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত স্নায়ু চিকিৎসক ডাক্তার শ্যামল সেন। ডাক্তার সেন ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের মন্ত্রশিষ্য। এক বিরাট হৃদয়বত্তার অধিকারী ছিলেন স্বামী গহনানন্দজী যার পরিচয় পাই আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এই মঠের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ জীবনের শেষলগ্নে বার বার অসুস্থ হওয়ায় প্রতিবারেই উক্ত হাসপাতালে ভর্ত্তি করার ব্যাপারে তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করতে দ্বিধা করেননি শুধু নয়, উপযুক্ত চিকিৎসার কাজে নিজে তত্ত্বাবধান করতেন। পূজ্যপাদ মহারাজের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য প্রত্যহ সন্ধ্যায় পূজনীয় স্বামী দয়ানন্দ মহারাজের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিলেন নিজের উপস্থিতিতে।

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, চিকিৎসালয়টিকে নির্ভরযোগ্য আধুনিক সেবাপ্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার পাশাপাশি তিনি চিকিৎসা বিদ্যার উন্নততর তাত্ত্বিক গবেষণার ব্যবস্থাও করেন। প্রত্যন্ত গ্রামের নররূপী নারায়ণ সেবার জন্য ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া পরিচালনার কাজে তাঁর পারদর্শিতা বিস্ময়কর। যেকোন জটিল পরিস্থিতিকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মানসিকতায়। এ থেকেই তাঁর উচ্চমানের আধ্যাত্মিক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই দেখা যেত যে, কাজের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত

থাকলেও মহারাজ জপ-ধ্যানের ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকতেন সকাল এবং সন্ধ্যায়। প্রায়ই তিনি বলতেন, "দেরী হলেও স্নানাহার যেমন বাদ পড়ে না, তেমনি ইষ্ট চিন্তাকে বাদ দেওয়া যায় না।" আবার এও দেখা যেত যে, গভীর রাতে জরুরী কাজের ফাইলটি বুকের ওপর খোলা অবস্থায় রেখে ক্লান্তির ভারে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছেন।

বেলুড় মঠে পূজনীয় মহারাজের কর্মময় জীবন : এপ্রিল **১৯৮৯** থেকে পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং **১৪**ই এপ্রিল **১৯৯২** মঠ ও মিশনের সহ-অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়কালে বহু গুরুত্বপূর্ণ লোকহিতকর কর্মে নিযুক্ত থেকেও দীক্ষাদানের মাধ্যমে লক্ষাধিক ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

স্বামীজির ঐতিহাসিক শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে **১৯৯৩** খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর বিশ্বধর্ম-মহাসভার অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য পূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজ শিকাগো যান এবং তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

এরপর ২৫শে মে ২০০৫ পূজ্যপাদ মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্দশ অধ্যক্ষপদে নির্বাচিত হন। সঙ্ঘগুরু হিসাবে সর্বদাই ভক্তদের তিনি মনে করিয়ে দিতেন স্বামীজির বিখ্যাত উক্তি—"পরোপকারই পুণ্য, পরপীড়নই পাপ"। তিনি বলতেন, মানুষকে কিছুটা স্বার্থত্যাগ করে অপরের সাহায্য করতে হবে। সেই সঙ্গে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মহা মূল্যবান বাণী উল্লেখ করে বলতেন—"সহ্যের সমান গুণ নাই, সন্তোষের সমান .... নেই।"

অন্তিম মুহূর্ত : ৪ঠা নভেম্বর ২০০৯। পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ যেন মহাপ্রস্থানের জন্য রীতিমতো প্রস্তুত, শরীরে কোনমাত্র বিকারের চিহ্নমাত্র নেই। কোন অশান্তির লেশমাত্র নেই চোখেমুখে। সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিটে দীপশিখা বিলীন হলো মহাকাশে। সর্বতোভাবে শ্রীরামকৃষ্ণে নিবেদিত প্রাণ পূজ্যপাদ মহারাজের মহান আত্মা চিরকালের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ পাদপদ্মে মিলিত হলো। তাঁর ধরাধামের শরীরের বয়স তখন **৯১** বছর।

জগৎবাসীর জন্য তিনি রেখে গেলেন এক আদর্শ কর্তব্যনিষ্ঠ দিব্য জীবন। সবশেষে, পার্থিব শরীর পবিত্র অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হলে সমবেত সাধু ও ভক্তবৃন্দ উচ্চারণ করলেন—

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ তৎসৎ।।"

আদর্শ কর্মযোগী গহনানন্দজী

স্বামী আত্মবোধানন্দ

স্বামী গহনানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নরেশরঞ্জন রায়চৌধুরী। ডাকনাম নরেশ মহারাজ। অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার পাহাড়পুর গ্রামে, ১৯১৬ সালে মহাষ্টমীর দিনে তাঁর জন্ম। শৈশবে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। তবে রামকৃষ্ণ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হওয়ার নেপথ্যে ছিল পূর্বাশ্রমের আত্মীয় স্বামী প্রভানন্দজী (কেতকী) মহারাজের সাহচর্য। এই সময় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপার্ষদদের মধ্যে কেবলমাত্র স্বামী অভেদানন্দজীকে দর্শন করেছিলেন। এরপর তিনি ১৯৩৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সন্ন্যাসী স্বামী বামদেবানন্দজীর অনুপ্রেরণায় ২৩ বছর বয়সে ভুবনেশ্বরের রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী নির্বানানন্দজীর কাছে যোগদান করেন। তাঁর মন্ত্রদীক্ষা হয় স্বামী বিরজানন্দজীর কাছে। ১৯৪২ সালে তিনি কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমে স্থানান্তরিত হন। এখানে তিনি ১৯৫২ সাল পর্যন্ত প্রায় ১০ বছর ছিলেন, ইংরেজি প্রকাশনা বিভাগের কাজে। ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সালে ২৫শে ফেব্রুয়ারি স্বামী বিরজানন্দজীর কাছে তাঁর ব্রহ্মচর্য এবং ১৯৪৮ সালের ১২ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথিতে তাঁর সন্ন্যাস হয়। ব্রহ্মচর্য নাম ব্রহ্মচারী অমৃতচৈতন্য ও সন্ন্যাস নাম স্বামী গহনানন্দপুরী। ১৯৫৩-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি শিলং রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী সৌম্যানন্দজীর সহযোগী হয়ে সেবাকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি আসেন কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে। পাঁচ বছর তিনি প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দজীর সংস্পর্শে সহ-সম্পাদক ছিলেন এবং সেখানে তিনি দীর্ঘ ২২ বছর সম্পাদক ছিলেন। "শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র কাজে তাঁর জীবন হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ। ১৯৬৫ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি পরিষদের সদস্য হন। ১৯৭৯ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সাধারণ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সহ-অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে যোগোদ্যান রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষের আসন অলংকৃত

করেন। ২০০৫ সালের ২৫শে মে, তিনি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সভাপতি হন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর মহাসমাধির পর। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রাণকেন্দ্র বেলুড় মঠে তিনি সর্বাধ্যক্ষ হিসাবে প্রায় আড়াই বছর ছিলেন। ৪ঠা নভেম্বর, ২০০৭ সালে তাঁর মহাসমাধি হয়।

৯১ বছরের একটি পূর্ণাঙ্গ মহাজীবন। যে জীবনের মধ্যে আমরা দেখেছি, সেবার আদর্শ। এই ৯১ বছরের জীবন, আমরা তাঁকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভূমিকায় ও বিভিন্নভাবে দেখলেও, তাঁর জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক সেবা ও কর্মনিষ্ঠা। আজ আমাদের অনেকের জীবনে তিনি আদর্শ কর্মযোগী হয়ে আছেন। তাঁকে প্রথম দেখি যখন তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। এই সময় তাঁকে দেখে ভালো লেগেছিল এবং তাঁর হার্দিক ব্যবহারে ও মিষ্টি কথাবার্তায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হই।

একবার তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বক্তৃতা দেবার জন্য দক্ষিণ শহরতলির কোনো একটি আশ্রমে। মহারাজ সেখানে সারাদিন বিভিন্ন বিষয় ও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সেবাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর বক্তৃতা আমাদের ভালো লাগে। তবে তার মধ্যে একটি ঘটনা এখনও মাঝে মাঝে মনকে নাড়া দেয়। সেটি হলো একগ্লাস জল চেয়ে খেয়েছিলেন মহারাজ। সেদিন মহারাজ সারাদিন সেখানে অন্যান্য খাবার ও জল গ্রহণ করলেও শেষে তিনি যখন সেবাপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ফিরে আসছেন, সেই সময় গাড়িতে উঠে একগ্লাস জল চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমাদের এখানকার জলটা ভারি মিষ্টি। আমাকে আর একগ্লাস জল দাও।' মহারাজ গাড়িতে বসেই যাবার সময় এক গ্লাস জল পান করলেন। বললেন—'আর একটু দাও, আবার কবে আসব এ রকম মিষ্টি জল খেতে। তা তোমাদের মিষ্টি জল আর এক গ্লাস খেয়ে নিই।' টিউবওয়েলের জলটা হয়তো এমনিতেই মিষ্টি, কিন্তু মহারাজের মিষ্টি কথায় তা যেন আরও মিষ্টি হয়ে উঠেছিল। ঘটনাটি এখনও জানান দেয় মনে। এরপর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের যখন সহ-সম্পাদক, সৌভাগ্যক্রমে তাঁর স্নেহ-সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ হয়েছে। অবশ্য এই সেবা-সান্নিধ্য পাওয়ার মাধ্যম ছিলেন যিনি, তিনি হলেন স্বামী অকুণ্ঠানন্দজী অর্থাৎ শম্ভু মহারাজ।—ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর নাতি। শম্ভু মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কোলে-পিঠে চেপে বড়ো হয়েছেন। শৈশবে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেছেন, আর স্বামী শুদ্ধানন্দজীর অনুপ্রেরণায় সাধু হয়েছেন। এই শম্ভু মহারাজকে বলতেন শম্ভুদা। কারণ, গহনানন্দজীর থেকে শম্ভু মহারাজ একটু বড়ো ছিলেন। আর শম্ভু মহারাজ গহনানন্দজীকে বলতেন, নরেশ মহারাজ এবং 'তুমি' করে কথা বলতেন।

তাছাড়া স্বামী অকুণ্ঠানন্দজীর শরীর একটু অপটু ছিল, তাই তিনি নরেশ মহারাজের কাঁধে হাত দিয়ে চলতেন এবং বিভিন্ন আইনি বিষয়ে পরামর্শ দান করতেন। গহনানন্দজীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ সখ্যতাও ছিল। শম্ভু মহারাজের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গহনানন্দজীর সঙ্গে একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শম্ভু মহারাজকে তিনি আইনজ্ঞ হিসাবে অভিভাবকের মতো শ্রদ্ধা করতেন এবং এই মিশনের আইন-বিষয়ক কাজকর্মে তিনি ছিলেন সুদক্ষ। নরেশ মহারাজকে খুব স্নেহ করতেন ও আন্তরিক ভালোবাসতেন শম্ভু মহারাজ।

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে, শম্ভু মহারাজ খুব স্বল্প-আহারি, নরেশ মহারাজও তাই। উত্তর কলকাতার একটি প্রতিষ্ঠানে খাবারের ঘন্টা পড়লেই জিজ্ঞাসা করতেন যে,–"তোমাদের কি খাবার সময় হয়েছে?' খাবার পঙক্তিতে বসে খুব কম দিনই তিনি খেতেন। শম্ভু মহারাজও বিরাট কর্মযোগী, সবসময় আইন-বিষয়ক কাজকর্ম নিয়ে থাকতেন মঠ-মিশনের বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রের। আইনি পরামর্শদাতা ছিলেন মঠ-মিশনের। কাজেই তাঁর ব্যস্ততা খুব বেশি। নরেশ মহারাজও শম্ভু মহারাজের মতো খুব কম আহার করতেন। খাবার মেনু জিজ্ঞাসা করতেন। আর খেতেন যা—প্লেটে করে এক চামচ ভাত (হাতা নয়), হয়তো এক পিস মাছ। এই খাবার! বারে বারে খেতেন, টুকটাক। সবসময় টিফিন খেতেন। কখনও ভরপুর খেতেন না। আর সারাদিন কাজ করতে পারতেন।

একবার দক্ষিণ কলকাতায় গিয়েছেন কোনো এক আইনজ্ঞের বাড়িতে বিশেষ জরুরি কাজে। গহনানন্দজী বেলুড় মঠ থেকে গাড়ি নিয়ে এসেছেন। সেই গাড়িতে তিনি উত্তর কলকাতা থেকে শম্ভু মহারাজকে তুলে নিয়ে আইনজ্ঞের কাছে গেছেন। কাজ সেরে রাত্রি সাড়ে দশটায় বাগবাজারে অকুণ্ঠানন্দজীকে নামিয়ে দিয়ে বেলুড় মঠে যাবেন।

গহনানন্দজী বাগবাজারে নেমে শুধু একটু বাথরুম করে সোজা চলে গেলেন বেলুড় মঠে অত রাতে। মহারাজকে বলা হলো,—মহারাজ মুখে কিছু দিয়ে যান।'...

মহারাজ বললেন—'বেলুড় মঠে আমার খাবার রাখা আছে।' তিনি সোজা চলে গেলেন সেই গভীররাতে একাই বেলুড় মঠে।

আর একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে, মহারাজ চলেছেন দক্ষিণ কলকাতায় সেই আইনজ্ঞের কাছে। সঙ্গে রয়েছেন শম্ভু মহারাজ ও একজন ব্রহ্মচারী- সেবক। কখনও দু'জনও থাকত। যেতে যেতে রাস্তার ধারে দেখেন, —যেমন জলের কল খোলা থাকে', সেরকম, কল থেকে হুড়মুড় করে জল পড়ে যাচ্ছে। কত মানুষ যাচ্ছে, কারও বোধহয় দৃষ্টি গোচর হয়নি। তিনি দেখেই বললেন,–'এই এই যাও, তুমি গিয়ে কলটা বন্ধ করে এসো।' দেখা গেল যে, কলের মুখই নেই। বন্ধ করা হবে কি করে! সারা দিন রাত

হুড়মুড় করে কত জল পড়ে যাচ্ছে! কিন্তু কি করে জল বন্ধ করা যায়, তা নিয়ে শুরু হলো মহারাজের চিন্তা-ভাবনা। অবশেষে বন্ধ করা হলো মহারাজের নির্দেশে, উত্তরীয় ছিঁড়ে কলের মুখটিকে ভালো করে বেঁধে দেওয়া হলো। সেবক বলল—'মহারাজ, এতো কেউ খুলে দেবে বা খুলে যাবে।' মহারাজ বললেন,—কে খুলে দেবে বা খুলে যাবে সেটা আমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। আমাদের কর্তব্য বন্ধ করা। তাই বন্ধ করা হলো।' কিন্তু মহারাজ কল বন্ধ করেই শেষ করলেন না। মহারাজ বলতে লাগলেন যে,–এভাবে কত জল নষ্ট হচ্ছে। এভাবে অপচয় হতে থাকলে মূল যে জলের উৎস রয়েছে, তা তো একদিন শেষ হয়ে যাবে! এই পরিশুদ্ধ জল পেতে কত খরচ হয় জানো? শম্ভু মহারাজও তাঁর কথার সঙ্গে সায় দিতে লাগলেন এবং আমাদের মতো জনসাধারণের উদাসীনতার কথাও জানালেন। মহারাজের এই তৎপরতা আমাদেরকে মানসিকভাবে সচেতন করার পক্ষে যথেষ্ট উদাহরণস্বরূপ। তাঁর বিশাল হৃদয়বত্তার পরিচয় বহন করে এ ঘটনা। এ সেবা শুধু ব্যষ্টির নয়, সমষ্টির।

মহারাজ অপচয় অপছন্দ করতেন। তিনি চাইতেন, একটুও জল অপচয় যাতে না হয়। তাঁর জল কলের বেসিন ব্যবহার যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের নিশ্চয় এ ঘটনার কথা মনে পড়বে। তাঁর কাছ থেকে পাঠ নিতে হবে, কীভাবে জলের কল খুলতে হয়, ব্যবহার করতে হয়—একহাতে খুলবেন, একটু জল নেবেন, সঙ্গে সঙ্গে কল বন্ধ করবেন। মুখ ধোবেন, কুলকুচো করবেন, তখন কিন্তু কলের মুখ বন্ধ। আবার একটু জল নেবেন, আবার কল খুলবেন। এভাবে তিনি কল ব্যবহার, বন্ধ করতেন। একটুও জল যাতে অপচয় না হয়, হাতের বাইরে না পড়ে। তিনি জানতেন, বুঝতেন যে—এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জলের ভাগ যদিও তিন, ডাঙ্গার ভাগ এক। কিন্তু এই ব্যবহারযোগ্য জল পেতে যে আমাদের কত সাধ্যসাধনা, কত অর্থ ব্যয় হয়, তা মহারাজ জানতেন। সেজন্য তিনি জল অপচয় একটুও পছন্দ করতেন না।

মহারাজের সঙ্গে গাড়িতে যেতে যেতে শম্ভু মহারাজ কত কথা বলতেন, গল্প করতেন, মজা করতেন। অথচ গুরুদায়িত্বভার তাঁরা বহন করছেন। শম্ভু মহারাজ আর তাঁর মধ্যে স্নেহের ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। চলতে চলতে হঠাৎই গাড়ি থেমে গেল । আদেশ হলো শম্ভু মহারাজের—যাও, ওই কচি ভুট্টা ভাজা-পোড়া কিনে নিয়ে এসো।' শম্ভু মহারাজ এটাই খেতে পছন্দ করতেন। নরেশ মহারাজ কিছু বলতেন না, তাঁর সঙ্গে খেতেনও। রাস্তায় আবার হয়তো আখ বিক্রি হচ্ছে, দেখেই বলতেন যে—'যাও, আখের টুকরো কিনে নিয়ে এসো।' আখের টুকরো, কখনও বা এই কচি ভুট্টা-পোড়া দু'জনেই খেতেন। আবার কখনও বা কড়াই ভাজা, বাদাম ভাজা খেতেন।

বলতেন—'এতে দাঁতের ব্যায়াম হয়!' এই দুই মহারাজের মধ্যে নিবিড় সখ্যতা ও বন্ধুত্ব ছিল।

শম্ভু মহারাজের সঙ্গে নরেশ মহারাজের খুবই হার্দিক সম্পর্ক ছিল, যার একটা নিদর্শন—নরেশ মহারাজ তখন বেলুড় মঠের সাধারণ সম্পাদক। মহাষ্টমীর বিশেষ প্রসাদ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তিনি বিশেষ প্রসাদ সবটাই পাঠিয়ে দিলেন শম্ভু মহারাজের কাছে। শম্ভু মহারাজকে এতটাই ভালবাসতেন তিনি। শম্ভু মহারাজের জন্য তিনি বেলুড় মঠে একটা ঘরও স্থায়ীভাবে ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেবাপ্রতিষ্ঠানেও তাঁর জন্য একটা ঘর ছিল। এছাড়া আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে তাঁর জন্য ঘর রাখা থাকত। এসবেরই ব্যবস্থাপক ছিলেন নরেশ মহারাজ তথা গহনানন্দজী।

গহনানন্দজী সবসময় চাইতেন সকলে সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক। এ যেন ঋষিদের সেই প্রার্থনা—'সর্বে সুখিন ভবন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়া।' সকলের সুস্থ শরীরের জন্য প্রার্থনা করতেন। নিজে শুধু সুস্থ সবল শরীরে থাকা নয়, অপরকেও সুস্থ সবল রাখা ছিল মহারাজের ধ্যানধারণা। শম্ভু মহারাজের দুর্বল শরীর কিভাবে সুস্থ রাখা যায় সেজন্য তিনি সবসময় সচেষ্ট থাকতেন। সেই সঙ্গে সকলে নীরোগ শরীরে সুস্থ থাকুক, এবং একটু শরীরচর্চা করে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখুক—এটাও মহারাজ চাইতেন। তিনি মনে করতেন, সকলে ভালো থাকলে তিনিও ভালো থাকবেন। কারোর শরীর খারাপ হলে মহারাজ নিয়মিত খোঁজ খবর নিতেন। সারিয়ে তোলার জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। অনেক অসুস্থ রুগ্ন-জীর্ণ শরীর মহারাজের সেবা-তৎপরতায় পুনর্জীবন লাভ করেছে। এমনকি, শরীর বিপন্ন, অবসন্ন হওয়ার আশঙ্কা ও আসন্ন মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার আশঙ্কার অবস্থাতেও অতন্দ্র প্রহরীর মতো তিনি সর্বদা সজাগ থাকতেন এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে নবজীবন দান করেছেন। দেখেছি তাঁর সেবা ও পরিচর্যায় অনেকের রুগ্নশরীর সবল ও দীর্ঘায়িত হয়েছে। যতগুলো বড়ো বড়ো দানের কথা আমরা জানি, তার মধ্যে সুস্থ-জীবন-দানটাও কোনও অংশে কম নয় এবং এসব সম্ভব হয়েছে তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থাপনায় সেবা-তৎপরতায় তাঁর ছিল বিশেষ ভূমিকা।

কারোর শরীর যাতে খারাপ না হয়, সে-বিষয়ে তিনি নিজেও যেমন সচেতন ছিলেন এবং অপরকেও তেমন সচেতন করে দিতেন। দেখেছি, এ সম্পর্কে একবার এক অনুজ সহকর্মী সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর ভুঁড়িতে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিচ্ছেন, আর বলছেন—'এসব কি হলো? কি হচ্ছে ?' তিনি চাইতেন না অতিরিক্ত মেদ জমে শরীরটা মোটা-ভোঁতা হয়ে যাক্। তিনি চাইতেন শরীরটা ছিম্‌ছাম্, ফিটফাট্, সুস্থ, চাবুকের মতো থাকুক। সৈনিকের মতো চনমনে থাকুক। সেজন্য তিনি মোটেই ভুঁড়ি

পছন্দ করতেন না। আবার কারোর মাথায় হয়তো চুল নেই, তখন তার মাথায় তিনি হাত বুলিয়ে বলতেন, 'এখানে অসার'—'এইখানটায় সার আছে। সেজন্য এতো সুন্দর।' অর্থাৎ বুকে চুল থাকলে তিনি বলতেন 'সার' আছে। আর মাথায় চুল না থাকলে বলতেন 'অসার'। মহারাজের বিরাট গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে এইরকম রসিকতা আমাদের কাছে শিক্ষণীয় এবং সেবারও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হয়ে প্রতিভাত হয়।

মহারাজ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে চাইতেন, থাকতেনও। শুধু তাই নয়, চাইতেন সকলেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট থাকুক। যোদ্ধাদের মতো সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে, যে-কোনো কাজের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তিনি নিজেই শুধু সুন্দরই থাকতেন না, অপরকেও সুন্দর রাখাটাও কর্তব্য বলে মনে করতেন। সকলে সুন্দর থাকুক, ভালো থাকুক—এটাই ছিল তাঁর ইচ্ছা। একবারের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মহারাজ একদিন এক সন্ন্যাসী সহকর্মীকে দেখে বললেন—'বাঃ খুব সুন্দর তো।' তার সুন্দর ইস্ত্রি করা জামাকাপড় দেখে মহারাজ বললেন,—''বাঃ খুব সুন্দর হয়েছে।' মহারাজ এরকমই চাইতেন এবং নিজেও তেমন পরতেন। আবার কিছুক্ষণ পরে তাকে নিয়েই মন্দিরে গেছেন ঠাকুর প্রণাম করতে। আশ্চর্য, পরক্ষণেই তাকে বলছেন—'এটা কি হয়েছে?' কারণ, তিনি যত সুন্দর কাপড়চোপড় পরেছেন, ঠিক ঠাকুরের, মায়ের এবং স্বামীজির কাপড়গুলো তত সুন্দরভাবে পরানো হয়নি এবং রং-এ তেমন সুন্দর হয়নি এবং কাপড়গুলো ইস্ত্রি করাও হয়নি। মহারাজের দৃষ্টিভঙ্গি সুদূরপ্রসারী এবং ঊর্ধ্বায়নের দিক দর্শন করে। শুধু নিজের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখা নয়, কোথাও আবর্জনা বা নোংরা পড়ে থাকতে দেখলেও তিনি বকতেন ও ধরতেন। কোথাও একটু মাকড়সার জাল থাকলেও তা তাঁর দৃষ্টি এড়াতো না। তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সবই ধরা পড়তো। সর্বদাই তিনি 'নিট এন্ড ক্লিন' পরিবেশ পছন্দ করতেন। এটাই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মহারাজের নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বহু প্রতিষ্ঠানের শত-বার্ষিকী অনুষ্ঠান হয়েছে। তিনি সেইসব প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের গুরুত্বকে মাথায় রাখতেন এবং সবকিছু বজায় ও অক্ষত রেখে শতবর্ষ অনুষ্ঠানকে সুচারুভাবে সম্পাদন করতেন। শুধু অনুষ্ঠানই নয়, অনুষ্ঠানের আনুসঙ্গিক বিষয় হিসাবে সেইসব প্রতিষ্ঠানকে আরো সুন্দর করে তুলতেন পরিষেবা দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শধন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণের পূত-পদরজে ধন্য সেইসব স্মৃতি-বিজড়িত প্রতিষ্ঠানকে অক্ষত রেখে কাজ করতে বলতেন এবং সুন্দর করে তুলতেন, একটি ইট পর্যন্ত তিনি পরিবর্তন করতে দিতেন না। প্রয়োজনে যাবতীয় সহযোগিতার হাত তিনি বাড়িয়ে দিতেন। আগে

যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনটি রাখতেন, তার সঙ্গে কিছু সংযোজন করতেন। কিন্তু পরিবর্জন নয়, দরকারে পরিবর্ধন করতেন। এগুলো মহারাজের সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা ও গভীর অধ্যাত্ম-দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রেও তিনি একজন সুদূরপ্রসারী কর্মযোগী ছিলেন। যখন বেলুড় মঠে তিনি সহ-সম্পাদক হয়ে এসেছেন, সেসময় একটি বিরাট মহা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই সম্মেলনের যিনি মুখ্য ব্যক্তিত্ব তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ স্বামী বিরেশ্বরানন্দজী, সহ-অধ্যক্ষ স্বামী নির্বাণানন্দজী, স্বামী গম্ভীরানন্দজী, স্বামী ভূতেশানন্দজী এবং সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দজী, যাঁদের নেপথ্য থেকে নেতৃত্ব রয়েছে। সেই দ্বিতীয় মহাসম্মেলনের অন্যতম প্রধান ব্যবস্থাপক স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী ও তাঁর সহযোগী স্বামী গহনানন্দজী। সেই বিরাট সম্মেলনে স্বামী গহনানন্দজীর বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণ তাঁর কর্মদক্ষতারই পরিচয় প্রদান করে।

গহনানন্দজী এবং শম্ভু মহারাজকে সারা দিনরাত পরিশ্রম করতে দেখা যেত অবশ্য তা মাঠে ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে মাটি কোপানো বা রাস্তায় গাঁইতি চালানো নয়। সে পরিশ্রম মানসিক পরিশ্রম, শারীরিক পরিশ্রম ছিল না বললেই চলে। রাত জেগে শম্ভু মহারাজের যেমন আইন-বিশেষজ্ঞের কাজ, তেমন গহনানন্দজীরও এ ধরনের নিয়ম-শৃঙ্খলা বিষয়ক কাজ তো থাকতই, সেই সঙ্গে থাকত প্রশাসনিক কাজকর্ম। তিনি প্রায় সারারাত কাজ করতেন। কিরকম, একদিনের একটি ঘটনা—

একজন সেবক বা মহারাজের সহকর্মী, মহারাজ তাঁকে একদিন কাজের সময় সাহচর্য দিচ্ছিলেন। মহারাজের সঙ্গে কাজ করতে করতে তাঁর ঘুম পেয়ে যায়। মহারাজের নির্দেশে তিনি ১২ টার সময় রাত্রিতে বিশ্রাম করতে যান। ভোর ৪টের সময় যখন ফিরে আসেন, তখনও দেখছেন গহনানন্দজীর নিবিষ্টমনে কাজ করে যাচ্ছেন। গহনানন্দজীকে দেখে তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে,–"মহারাজ, আপনি বিশ্রাম করেননি।' মহারাজ বললেন,—"হ্যাঁ, করেছি তো।' কিন্তু কখন করেছেন? সেটি তখন তিনি বুঝিয়ে দিলেন এভাবে—তুমি তো কালকে গেলে শুতে, এলে আজকে। আর আমি আজকে বিশ্রাম করেছি, আর আজকেই উঠেছি।' পরে জানা গেল মহারাজ রাত দুটোর সময় বিশ্রামে যেতেন, আর উঠতেন তিনটের সময়। মাত্র ১ঘন্টা বিশ্রাম। তাঁর বিশ্রাম—Change of work is the rest, কার্য থেকে কার্যান্তরে যাওয়াই বিশ্রাম। এ যেন গীতার কর্মযোগ। আর তিনি অমানসিক পরিশ্রম করতে পারতেন। অকল্পনীয় তাঁর কর্মদক্ষতা। যত কর্মভার আসত ততই স্বচ্ছন্দবোধ করতেন। অসীম তাঁর কর্মযজ্ঞ, অসীমের পথে। এরকম কর্মযোগী সন্ন্যাসী খুবই বিরল।

মহারাজের কিছু স্মৃতি

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

মহারাজের পরিচালন বৈশিষ্ট্য ছিল কোনো পদ্ধতিকে নিখুঁতভাবে চালিয়ে নেওয়া। কাজ করতে হলে তার ধারা, পদক্ষেপ, পদ্ধতিকে ঠিক করো, পরে ঐ নিয়ম মেনে চলো লক্ষ্যের দিকে—...ছিল তাঁর শিক্ষা। কাজের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত প্রবাহ পক্ষে... যাতে সবার সঙ্গে, এমনকি এক মহারাজের থেকেও সুবিধা হয় কাজে অংশগ্রহণ করতে।

এভাবে নিজে কাজ করা ও অন্যান্য কর্মীদের এমন ডিসিপ্লিন (discipine) অভ্যস্ত করানো ছিল ম্যানেজমেন্টের স্টাইল। এমন যুক্তিমহান বা বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা ছিল তাঁর যদিও তিনি কখনো ম্যানেজমেন্ট ছাত্র ছিলেন না। অথচ বিস্ময়করভাবে আধুনিক ছিলেন তিনি এ-বিষয়ে।

মহারাজকে প্রথম দেখি ১৯৬৮ সালে সেবাপ্রতিষ্ঠানে। স্বামী ভক্তানন্দজী পরিচয় করে দিয়েছিলেন। প্রণাম করা ছাড়া আর কিছু নয়। কাজে যাচ্ছিলেন। থেমে প্রণাম নিলেন হাসিমুখে। সৌম্য চেহারা এতো ব্যস্ততার মধ্যেও।

পরে কয়েকদিন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ছিলাম। সাধুদের সাথে। তখন দেখেছি তাঁর ডিসিপ্লিনড ভীষণ। তাঁর ঘরের সামনেই ছিল খাওয়ার টেবিল যেখানে মহারাজেরা খেতে বসতেন। খাওয়ার সময় গল্প, হাসি। মহারাজ নিজের ঘরে থাকলেও বিরক্ত হতেন না। কাজের সময় যেমন কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পছন্দ করতেন, অবসর সময়ে তেমনি স্বাধীনতা দিতেন। কেউ যদি মঠে বা অন্য কোথাও যেতে চাইতো তিনি আপত্তি করতেন না। শুধু চাইতেন যে তাঁকে জানিয়ে যেতে। আবার কেউ কাজের মধ্যে কোনো পরিবর্তন করতে চাইলেও স্বাধীনতা দিতেন। তবে তাঁকে জানাতে হতো। আসল কথা, তিনি চাইতেন যে কোথায় কি হচ্ছে সে-বিষয়ে সচেতন থাকতে, খবর রাখতে।

একবার তাঁকে না বলে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরতে দেরি হয়েছিল। তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন কিন্তু বকলেন না। বললেন, একটু বলে যেও। হঠাৎ তোমার কিছু

হলে যাতে আমরা জানতে পারি। সেদিন কলকাতার বিরাট অঞ্চল জুড়ে লোডশেডিং বৃষ্টি হচ্ছিল। ফিরতে দেরি করেছিলাম। এসে দেখি সবার খাওয়া হয়ে গেছে। মহারাজ নিজেই কাজের লোককে বলে দিলেন খাবার নিতে আসতে।

এটাই তিনি চাইতেন সবার মধ্যে। জীবনে আচরণে নিয়মানুবর্তিতা ও ডিসিপ্লিন এবং কাজের মধ্যে সুন্দর সিস্টেম। কথা কম বলতেন। দু-চার কথায় উত্তর দিতেন। বলেছিলেন, ভেতরে ও বাইরে সুসংহত (organised) থাকলে করতে সুবিধা হবে। অল্প সময়ে অনেক কাজ করতে পারবে, ক্লান্তি আসবে না।

জীবনে ও কাজে সিস্টেম অনুসরণ করার কথা বলেও সতর্ক করে দিতেন—সবকিছু সবসময় ঠিকঠাক চলে না নিজের মনকে নমনীয় (flexible) রেখো। জগৎ-পরিবেশ-মানুষ তোমার পছন্দমতো নাও চলতে পারে। এজন্য হতাশ হয়ো না। দুঃখ করো না, নতুন বিকল্পের চিন্তা করে কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলো। ঠাকুর ও মায়ের উপর বিশ্বাস রেখো।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম : আপনি সিস্টেমের উপর এতো গুরুত্ব দেন কেন?

হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—লক্ষ্যটা যদি স্থির থাকে, সাময়িকভাবে কাজে ভুল হলেও ফিরে আসতে পারবে সঠিক রাস্তায়। এজন্য লক্ষ্য ও পদ্ধতিটা সবসময় মনে রেখো।

।। ২ ।।

মহারাজ তখন মঠ-মিশনের এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি। আমিও সে-সময়ে বেলুড় মঠে। একটা কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে বললেন রাতে আসতে।

তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে মঠে ফিরলেন রাত সাড়ে দশটায়। তাঁর ঘরের সামনে গিয়ে দেখি ৫-৬ জন সাধু অপেক্ষা করছেন। আমার ডাক পড়লো প্রায় পৌনে বারোটায়। কাজের কথা শেষ হলে প্রশ্ন রাখলাম ঃ এত রাত অবধি কাজ করছেন। জপ-ধ্যান করতে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। মহারাজ একটা ফাইল দেখছিলেন। মাথা না তুলেই বললেন, "কেন এই যে তোমার সাথে কথা বলছি। চিঠি পড়ছি, অফিশিয়াল ডিসিশন নিচ্ছি, এসব সাধনা নয়? এগুলি ঠাকুরের কাজ নয় ?"

কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে হেসে বললেন, "সবকিছুকেই সাধনা করে নাও। এটাই তো কর্মযোগ যার কথা স্বামীজি বলে গেছেন। মন্দির আর অফিস—ঠাকুর দু-জায়গাতেই আছেন। এটা অনুভব করার চেষ্টা করো ?"

সেবাপ্রতিষ্ঠানেও মহারাজকে দেখেছি রাতে সব সাধুরা খেয়ে উঠে গেছেন অনেক

পরে মহারাজ এলেন। টেবিলে রাখা ঠান্ডা খাবার খাচ্ছেন। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। একটু গরম করে দেবো? তখন রাত ১টা/২টা। হাসিমুখে উত্তর দিলেন, “প্রসাদ কি কখনো ঠান্ডা হয় ?”

হাসপাতালে রোগীদের জন্য যে রান্না হয় সেই ডাল-ভাতই আসে সাধুদের খাবারের জন্য। রুগীর পথ্য! পানসে স্বাদ, ঝোল না জল ! মহারাজকে বললাম—একটু আচার পেলে ভাল হতো, এতে না লংকা, না মশলা। মহারাজ উত্তর দিলেন, “ঠিক বলেছো, আচার না হলে এ খাওয়া যায় না। আমি তাই রোজ আচার দিয়ে খাই।”

আমি অবাক। সেকি, আমাকে কখনো আচার দেয় না তো! কোথায় রয়েছে আচারের শিশি?

মিটিমিটি হাসি মহরাজের মুখে। উত্তর দিলেন, “তোমার হৃদয়ের মধ্যে।”

তার মানে ?

আচার হলো ঠাকুরের কৃপা মেশানো প্রসাদ ভেবে খাওয়া। কৃপা-আচার আর কি! মিশিয়ে দেখো। মনে হবে বিরিয়ানি খাচ্ছো।

॥ ৩ ॥

বিভিন্ন সময়ে ও আশ্রমে মহারাজকে অনেক প্রশ্ন করেছি। সংক্ষেপে এতো সুন্দর উত্তর দিতেন যে মন ভরে যেতো। এমনই কিছুর উল্লেখ করা যাক এখানে।

অন্ধ্রপ্রদেশে রিলিফ করে ফিরেছি। প্রাথমিক ত্রাণ-খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ—দেবার পর শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্বের কাজ—বাড়ি বানিয়ে দেওয়া দুঃস্থদের। প্রথম যখন গিয়েছিলাম সেখানে, সবকিছু ধ্বংস বিশাল এলাকা জুড়ে। জনমানবহীন অঞ্চলে তাঁবু তৈরি করে আমরা থাকতাম। তাঁবুর মধ্যে একটা বাঁশে পেরেক দিয়ে ঠাকুর-মা-স্বামীজির ফটো টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ফেরার পর মহারাজ সব খবর নিলেন প্রশ্ন করে করে। জিজ্ঞেস করলেন ঃ সাধনভজন করতে কোনো অসুবিধা হয়েছিল। বললাম, ঠাকুরঘর তো করা যায়নি, আর মন্দিরের তো কথাই নেই।

মহারাজ সুন্দর এক সমাধান দিলেন ভবিষ্যতের জন্য—“ভবিষ্যতে ও এমন পরিস্থিতি আসতে পারে। তখন কি মন্দির খুঁজবে জপধ্যানের জন্য ? হৃদয়-মন্দির তো সবসময়ই রয়েছে তোমার মধ্যে। ওখানে ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অন্য মন্দির না খুঁজে ওখানেই জপধ্যান করো।

আরেকবার জিজ্ঞেস করেছিলাম : জপ কিভাবে করতে হয় মহারাজ ?

তাঁর উত্তর—মেলার ভীড়ে শিশু সন্তান হারিয়ে গেলে মা যেভাবে তাকে খোঁজেন, সেভাবে। মাঠে নাগরদোলা, সার্কাস, বেলুনতলা... যার কোনদিকে নজর নেই। তার মনে শুধু শিশুর মুখ। আকুল হয়ে ডাকছেন... ডেকে চলেছেন...খুঁজছেন অধীর হয়ে। এভাবে ঈশ্বরকে ডাকো, জপের মাধ্যমে।

কাজের চাপে বেশিক্ষণ ধ্যান করতে অসুবিধা হলে কি করবো? এই প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বলেছিলেন—যখনই পারো জপ করবে। বাসে-ট্রামে-অফিসে দোকানে-অনুষ্ঠানে...যেখানেই পারবে, করো। তোমার হৃদয়ে ঠাকুর আছেন, এ-কথা সবসময় মনে রেখে যখন যেখানে সম্ভব, যখনই মনে পড়বে, জপ করতে থাকো। যতটুকু পারো, সেটুকুই করো।

আরেকটা প্রশ্ন—ধ্যানে যে বিভিন্নরকম দর্শন বা অনুভূতি হয় সেগুলি সত্যি না কাল্পনিক সেটা কিভাবে বুঝবো?

মহারাজের উত্তর : দৈনন্দিন জীবনে নিজের আচরণকে দেখ। চরিত্রে, আচরণে, ত্যাগে, প্রেমে তুমি কি উন্নত হচ্ছো? এটাই মানদন্ড। সাধনায় আধ্যাত্মিক উন্নতি হলে বাস্তব জীবনে তার ছাপ পড়বে। প্রভাব দেখা দেবে। মদ খেয়ে বা নেশার বস্তু নিলেও মানুষ অনেক কিছু দেখে, মানসিক রোগেও কিন্তু এটা তো আধ্যাত্মিক অনুভূতি নয়। দর্শন বা অনুভব প্রকৃতই আধ্যাত্মিক হলে মানুষের মধ্যে দেবত্ব বাড়ে, পশুভাব কমে।

আরেকবার তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম : ধর্মীয় দর্শন ও সাধনরহস্য নিয়ে কিছু বলুন আমায়। মহারাজ বলেছিলেন—অতো আলোচনা না শুনে সব কাজকে ঠাকুরের কাজ হিসেবে করে যাও আর দুবেলা ধ্যান করো। এটাই যথেষ্ট। শুধু theory নিয়ে চিন্তা না করে হাতে-কলমে প্র্যাকটিস করো। তাহলেই সব জানতে পারবে। মনে রেখো সাধুর জীবনে ২৪ ঘন্টাই সাধনা।

মহারাজ কথা কম বলতেন তবে কখনো কখনো ব্যাখ্যা করতেন কয়েক মিনিট ধরে। এই ব্যাখ্যায় photography-র চেয়ে practical method-ই থাকতো বেশি। সেবাপ্রতিষ্ঠানে সাধুনিবাশের দো-তলায় তিনি থাকতেন। আর আমি তিনতলায় অন্য সাধুদের সঙ্গে। একবার উপরে সাধুরা খুব হাসছেন গল্প করতে করতে। আমি একটু বিব্রত কারণ দোতলায় মহারাজ খাচ্ছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন—আনন্দে রয়েছে সবাই। এটাই দরকার। ঠাকুরের আশ্রয় সবসময় আনন্দময় থাকবে। গম্ভীর থেকো না কখনো। অন্তত মুচকি হাসি রেখো মুখে।

।। ৪ ।।

মহারাজ প্রথম খেত্রীতে আসছেন। দিল্লী থেকে গাড়িতে করে নিয়ে আসছি তাঁকে। পেছনের সীটে তিনি ও গোকুলানন্দজী। সামনের সীটে আমি।

৪-৫ ঘন্টার পথ। হরিয়ানার রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে চারপাশে গ্রাম ফাঁকা। মাঝে মাঝে কয়েকটা টাউন। গহনানন্দজী মহারাজ রসিকতা করে বললেনঃ কি হে অমিতাভ, রাজপ্রাসাদে যাচ্ছি অথচ পথে কোনো রাজকীয় আমন্ত্রণ-ব্যবস্থা নেই কেন ?

উত্তর দিলাম—মহারাজ, হরিয়ানা পেরিয়ে রাজস্থানে ঢুকতেই শুরু হবে royal reception। শুনে মহারাজ হাসলেন।

হরিয়ানার শেষ টাউন নারনৌখ। রাস্তায় খুব ভীড়। মহারাজের গাড়ি আসতেই লোকেরা ঘিরে ধরলো। স্থানীয় ভক্ত। মহারাজ নামলেন। ভক্তেরা তাঁকে নিয়ে গেল একটা বাড়িতে। ফুল দিয়ে সাজানো। আমি রাস্তাতেই থাকতাম, মহারাজকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা দেখতে। খেত্রীর যুবকেরা তৈরি আছে, আশ্রমেও অন্যান্য সবাই অপেক্ষা করছে। রাজস্থানে পরম্পরাগত আমন্ত্রণ দেওয়া হবে।

প্রায় আধ ঘন্টা বাদে মহারাজকে নিয়ে ভক্তরা বেরিয়ে এল। তাঁর গলায় অনেকগুলি মালা। মুখে হাসি। একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, ভক্ত বা মানুষদের আনন্দ দিতে তিনি সবরকম কষ্ট সহ্য করেন, কোনো আপত্তি করেন না । বলেন : ওরা কতো কষ্টে অনেক সময় ধরে ব্যবস্থা করেছে। আমি না গেলে ওদের দুঃখ হবে।

নারখৌন থেকে রওনা হতেই দেখা গেল মহারাজের গাড়ির আগে দুই লাইনে প্রায় ২০-২৫ টা বাইক চলেছে পাইলট হয়ে। মহারাজ খুশি হয়ে বললেন, ওহে তোমাদের রাজকীয় আমন্ত্রণ যে শুরু হয়ে গেল। তাঁর মুখ হাসিতে ঝলমল করছে। আমি বললাম : মহারাজ, এই পথ দিয়েই স্বামীজি গিয়েছিলেন একসময়। শুনতেই তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। অতীতে ডুবে গেলেন তিনি।

কিছুক্ষণ পরে পেছনে ফিরে দেখলেন যে একটা খোলা জিপ আসছে তার গাড়িকে follow করতে করতে, আর সেই জিপে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক ভিডিও করছেন মহারাজের খেত্রীযাত্রার। পেছন ফিরে তা দেখে মহারাজ হাসিমুখে রসিকতা করে বললেন : সামনে এসে ফটো না তুললে লোকেরা পরে কিভাবে বুঝবে গাড়িতে কোন VIP রয়েছেন। আমার পাল্টা উত্তর–মহারাজ, শুধু VIP নন, VVIP, এই তিনদিন বিভিন্ন দিক থেকে মুখী ক্যামেরা চলবে। আপনি শুধু দেখে যান।

মাইল খানেক এগোতেই দেখা গেল বাইক-বাহিনীর সাথে যোগ দিলো ঘোড়া। আরো এগিয়ে উট। রাস্তার দুপাশে লোক। মহারাজ খুব খুশি। সবদিকে দেখছেন গাড়িতে বসে। পাশে বসা গোকুলানন্দজীকে বলছেন : নাঃ এবার নিজেকে সত্যিই মহারাজ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সেনাবাহিনী কোথায়? গোকুলানন্দজী হেসে মন্তব্য করলেন—আপনি হলেন মানুষের হৃদয়ের সম্রাট, প্রেমের মহারাজ। তাই সেনাবাহিনী নয়, তীর্থযাত্রীরা আপনার সঙ্গে।

খেত্রীর পথে দু'দিকে ফাঁকা মাঠ, মাঝে মাঝে চোখে পড়ে কয়েকটা ঘর। গহনানন্দজী মহারাজ তা দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখানে ইন্ডাষ্ট্রি কম। কিছু করা যায়না এ-ব্যাপারের গোকুলানন্দজীর উত্তর—রাজস্থানের মাঝে মাঝে ইন্ড্রাস্ট্রি আছে। বিশেষ করে ভীলওয়ারা, উদয়পুর, উত্তরে বিকানীর পাবেন। তবে ছোট শিল্প অনেক আছে। বিশেষ করে অল্পশিক্ষিত সাধারণ মহিলা অনেক পাবেন কুটীরশিল্পে। খুশি হয়ে মহারাজ বসলেন : এটা খুবই ভাল কথা। কুটীরশিল্প ও ছোট শিল্প সাহায্য করে সাধারণ মানুষকে।

খেত্রীর কাছে আমাদের মিছিল পৌঁছুতেই দেখা গেল রাস্তার দু'ধারে, বহু নারী-পুরুষ। মিছিলও অনেক লম্বা হয়েছে তখন। গাড়ি চলছে খুবই ধীরে।

আশ্রম খেত্রীর রাজপ্রাসাদে। সামনে মানুষের প্রচণ্ড ভীড়। গাড়ি থেকে নেমে মহারাজ আশ্রমের গেট দিয়ে ঢুকে এলেন। চেয়ারে বসানো হলো তাঁকে। স্থানীয় মেয়েরা রাজস্থানের পরম্পরাগতভাবে তাঁকে আরতি করলো, কপালে তিলক এঁকে দিল। তিনি হাসিমুখে আশীর্বাদ করলেন সবাইকে ফুল দিয়ে। এবার ভক্তরা লাইন করে এসে তাঁকে প্রণাম করলো । তিনি আমায় কাছে ডেকে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেনঃ লজেন্স আছে নাকি ? এনে দিলে তিনি প্রথমে ঐ মেয়েদের ডেকে লজেন্স দিলেন। পরে অন্যান্যদের।

মহারাজকে নিয়ে যাওয়া হলো তিনতলায়। খেত্রীর রাজা অজিত সিং যে ঘরে থাকতেন সেখানেই মহারাজের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি এখন বিশ্রাম করবেন। পরে খাবেন। বিকেল থেকে ভক্তদের দর্শন দেবেন।

দর্শন দেওয়ার আগে তিনি ঘুরে ঘুরে দেখলেন রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন অংশ। আমরা কয়েকজন সঙ্গে আছি। মাঝেমাঝেই তিনি প্রশ্ন করছেন। জানতে চাইছেন স্বামীজির প্রসঙ্গে। স্বামীজি যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরে (তখন মন্দির) গিয়ে প্রণাম করলেন। কিছুক্ষণ বসে রইলেন যেখানে চুপ করে, চোখ বন্ধ করে।

রাজস্থানের বিভিন্ন জায়গা থেকে ভক্তেরা এসেছেন। অনেকের থাকার ব্যবস্থা আশ্রমেই করা হয়েছে। চারতলায় বিশাল রানীমহলে পার্টিশন দিয়ে অনেকগুলি জায়গা করা হয়েছে সাধু-ব্রহ্মচারীদের যারা দিল্লী ও জয়পুর থেকে এসেছেন। গহনানন্দজী মহারাজ সেই জায়গাগুলিও ঘুরে ঘুরে দেখলেন।

বিকেলে ভক্তদের প্রণাম নিলেন। কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলেন তারা কোথা থেকে এসেছেন, কি করেন, বাড়িতে কে কে আছেন। খুবই সহজ ব্যবহার তাঁর।

রাতে খাওয়ার পর শুতে যাবেন তিনি। এমন সময় শুনতে পেলেন গানের সুর ভেসে আসছে উপর থেকে। জানতে চাইলেন কারা গাইছে। বললাম, আলোয়ারের গ্রাম থেকে ভক্তেরা এসেছেন। ছাদে বসে তারা গাইছেন। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বললেন: চলো, দেখা করে আসি। আমি আপত্তি করলাম—মহারাজ, ওরা দুদিন থাকবেন। আগামীকাল দেখা করবেন কারণ এখন রাত এগারোটা, আপনি ক্লান্ত। মহারাজ আমাকে পাত্তাই দিলেন না। বললেন—না চলো।

কি আর করি! তাঁকে নিয়ে ছাদে গেলাম। এখানেই রাজা অজিত সিংহের সময় বাইজীর গান না শুনে স্বামীজি চলে গিয়েছিলেন। পরে প্রভু মেরো অবগুণ চিত না ধরো" শুনে ফিরে আসেন।) গ্রামবাসীরা গাইছেন দেশজ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে। মহারাজ চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ গান শুনলেন। গায়কদের সাথে কথা বলে রাত বারোটায় নিজের ঘরে ফিরলেন। আমায় জিজ্ঞেস করলেন—ওদের খাওয়া হয়েছে? থাকার ব্যবস্থা কোথায় করলে?

এটা ছিল মহারাজের বৈশিষ্ট্য। গরীব সাধারণ মানুষদের প্রতি ভালোবাসা।

পরের দিন সকাল থেকে দীক্ষা শুরু। মহারাজ বাথরুমে স্নান করছেন। একটু সঙ্কোচ করে আমি বাইরে থেকে তাঁকে ডাকলাম। তিনি ভেতর থেকেই সাড়া দিলেন। বললাম : মহারাজ, স্থানীয় কলেজের মহিলা প্রিন্সিপাল এসে জোর করছেন দীক্ষা নেওয়ার জন্য। কিছুতেই মানছেন না। কি করবো ? মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন—তুমি ভালো করে চেন তাকে? বললাম—হ্যাঁ। তিনি বললেন—ঠিক আছে। তার নাম দীক্ষার্থিদের লিস্টে দিয়ে দাও।

পরে মহারাজকে বলেছিলাম : এভাবে হুটহাট করে চলে আসে দীক্ষার জন্য। মহিলা তাই কিছু বলতে পারি না! মহারাজ হেসে বলেছিলেন—ঠাকুর ডেকেছেন, তাই এসেছে। হুটহাট করে আসেনি। আর ঠাকুর যাকে এনেছেন তাকে আমিই বা 'না' বলবো কিভাবে?

ঐদিন বিকেলে স্থানীয় লোকেরা মহারাজকে নাগরিক সম্বর্ধনা দিলেন। খেত্রীর সরোবরের কাছে বিশাল প্রাঙ্গণ। মহারাজের পৌঁছুবার আগেই কানায় কানায় ভর্তি। বিশাল জনতা মঞ্চে এসে বসলেন কর্মকর্তারা। স্থানীয় পঞ্চায়েত নেতা, অধ্যক্ষ, রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, ব্যবসায়ী...।

তারা নিজের হাতে মহারাজকে পাগড়ি পরিয়ে দিলেন। এটা হলো সর্বোচ্চ সম্মান রাজস্থানে। তাদের কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল, মহারাজের সাথে একাসনে বসা। তারা সাধারণত সাধুকে উপরে বসিয়ে নিজেরা নীচে বসেন। কিন্তু সেদিন মহারাজের নিরহংকার স্বভাব ও অন্যদের সম্মান দেওয়ার প্রবণতা মুগ্ধ করেছিল তাদের। তাঁর বিনয়ী ব্যবহার হাসি মুখ, আন্তরিকায় খুব খুশি হয়েছিলেন স্থানীয় মানুষেরা। অনেকের ভাষণে তা প্রকাশ পেল। মানপত্র দেওয়া হলো। মহারাজ লিখিত ভাষণ পড়লেন।

সভার পর আশ্রমে ফিরে এলেন। সেখানেও প্রচুর ভিড়। একবার বললাম, তাঁকে ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে। তিনি রাজি হলেন না। বললেন : মানুষ কত দূর থেকে এসেছে আর আমি বিশ্রাম নেবো ?

রাতে খাওয়ার পর নিজের ঘরে সাধুদের নিয়ে বসলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বললেন এক-এক করে। জোর দিলেন সাধন-ভজনের উপর। খাওয়া-থাকা নিয়ে কারোর কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা জানতে চাইলেন।

একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, মহারাজ যতদিন খেত্রীতে ছিলেন বারবারই সময় করে স্থানীয় মানুষদের কাছে যেতেন। তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। একবার রাজস্থানের একটা ম্যাপ আনতে বললেন আমাকে। প্রশ্ন করলেন : রাজস্থানে কোথায় কোথায় ঠাকুরের নামে পাঠচক্র বা ভক্তদের পরিচালিত আশ্রম আছে? বিকানীর, মাউন্ট আবু, উদয়পুর ইত্যাদি জায়গাতে যেতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

সন্ন্যাসীর স্মৃতি-কলমে

স্বামী শিবসেবানন্দ

ব্রহ্মচারীরূপে বেলুড়মঠে থাকার সময় আমি ব্রহ্মচারী তৃপ্তিচৈতন্য নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই আমি প্রতিদিন আমার গুরুদেব এবং অন্যান্য প্রধান সন্ন্যাসীগণকে দর্শন-প্রণাম করতাম। একদিন মঠ-মিশনের সেক্রেটারি মহারাজ আমাকে ডেকে মঠের সমস্ত যানবাহনগুলি দেখাশোনা করার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করলেন। আরও বললেন যে যখনই আমাকে ডাকা হবে আমি যেন পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের (শ্রদ্ধেয় নরেশ মহারাজ) কাছে যাই এবং তাঁকে দেখাশোনা করি। তাঁর এই নির্দেশকে আমার জীবনের এক অতিবড় পুরস্কার মনে করে আমি খুব খুশী হলোম।

প্রকৃতপক্ষে, শ্রদ্ধেয় গহনানন্দজী মহারাজের মহান ব্যক্তিত্ব আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। পরের দিন তাঁর কাছে গিয়ে প্রণামের পর আমি যখন তাঁর কাছে নিজ পরিচয় নিবেদন করতে যাচ্ছি, তখন উনি বললেন—"আমাকে তোমার পরিচয় দেবার দরকার নেই। আমি তো তোমাকে জানি। তুমি তো দর্শন ! তাই নয় কি?" আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁর শোবার ঘর ও অফিস-ঘর পরিষ্কার করার জন্য আমি কোন সঠিক ব্যক্তিকে তাঁর কাছে আনতে পারি কিনা। আমি তাঁকে জানালাম যে তিনি অনুমতি প্রদান করলে আমি নিজেই আরো ভালভাবে এই কাজটি করতে পারি। মহারাজজী সেবাপ্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি ছিলেন সেসময়, তাই সেবাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে গেলেন তখনকার মতো।

পরে যখন তিনি পুনরায় মঠে এলেন তখন তাঁর শোবার ঘর ও অফিস ঘর দেখে খুবই খুশী হলেন এবং আমার প্রশংসা করলেন। তারপর আমাকে বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই 'কথামৃত' পড়েছ, নয় কি? ঠাকুরও এইরকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সব ফিটফাট পছন্দ করতেন। প্রতিটি জিনিস তার জায়গামতো ঠিকঠাক রাখাটা তিনি পছন্দ করতেন

এবং এ ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকতেন। একবার শ্রীম-কে তিনি এ-ও বলেছিলেন যে জিনিসপত্র সব গুছিয়ে জায়গামতো এমনভাবে রাখা উচিত যে অন্ধকারেও যেন তা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়।

কিছুদিনের মধ্যে আমি লক্ষ্য করলাম যে পরমপূজ্য মহারাজজী যখনই কোন কথা বলেন তার মধ্যে সর্বদা শ্রীশ্রী ঠাকুর-মা-স্বামীজির প্রসঙ্গই থাকে অথবা শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদদের কথা। একদিন আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগলো—পরমপূজ্য নরেশ মহারাজজীর নাম কেন গহনানন্দ হলো, এ নামের অর্থ কী? তাঁকে জিজ্ঞেস করবার কথাও একবার মনে হয়েছিল কিন্তু সে কথা তাঁকে জানাতে আমি কিছুটা ভীত ও সঙ্কুচিত ছিলাম। তবে খুব শীঘ্রই আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে যাই।

একদিন সন্ধ্যা ছয়টার সময় মহারাজজী আমাকে ডেকে জানালেন যে কোন মিটিং চালনা করবার জন্য তিনি কলকাতা যাচ্ছেন এবং যতক্ষণ তিনি না ফেরেন ততক্ষণ আমাকে তাঁর ঘরের সামনে রাত্রের আহারের পর অপেক্ষা করতে বললেন। আমি খুশী হলোম এই ভেবে যে রাত্রে মহারাজজী ফিরে আসার পর আমি তার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলার সুযোগ পাব। পরমপূজ্য মহারাজজী কলকাতায় রওনা হয়ে গেলেন এবং রাত্রের আহারের পর আমি মহারাজজীর ঘরে এসে তাঁর ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম। ধীরে ধীরে রাত্রি দশটা বাজলো। মহারাজজীর রাত্রের আহার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ভেবে আমি বার বার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ছিলাম। রাত্রি ১০টা ৪০ মিনিটে মহারাজজী ফিরলেন। আমাকে এখানে অপেক্ষারত দেখে খুব খুশী হলেন এবং স্মিত হাস্যে বললেন, আমি তোমাকে এখানেই দেখতে পাব, ভাবছিলাম। আমি বললাম, "মহারাজজী, আপনার রাত্রের আহার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তাই প্রথমেই যদি আপনি মুখ-হাত ধুয়ে খাবারটা খেয়ে নেন তাহলে সব থেকে ভাল হয়।" তিনি হেসে জানালেন যে, "আরও ভাল জিনিস আছে খাবার পূর্বে করবার জন্য।" তিনি বাথরুমে গিয়ে প্রথমে স্নান করলেন এবং তারপরে ধ্যানে বসলেন। উনি দীর্ঘ সময় ধরে ধ্যানমগ্ন ছিলেন আর এদিকে আমি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। ওনাকে রাত্রের আহারের কথা আর একবার স্মরণ করিয়ে দেবার কথা তখন হঠাৎ-ই আমার মনে হলো। একথা ভেবে যখন আমি তাঁর ঘরের মধ্যে প্রবেশশ করলাম। চারদিকে এক .... নিস্তব্ধতা—তার মধ্যে মহারাজজী গভীর ধ্যানে নিমগ্ন দেখতে পেলাম। আমি বিস্মিত হলোম দেখে যে সারাদিন নানারকম কাজকর্মের জটিলতার মধ্যে কাটিয়ে এসে এই এত রাত্রে কিভাবে একজন এমন গভীর ধ্যানে ডুবে থাকতে পারেন! আমি 'গহনানন্দ' নামের অর্থ খুঁজে পেলাম—গভীর আনন্দে নিমগ্ন। আমি প্রায় আধ

ঘন্টার অধিক সময় ধরে ছিলাম সেখানে, কিন্তু তিনি এমন গভীর ধ্যানে ডুবে ছিলেন যে সেকথা টের পেলেন না। ধীরে ধীরে তিনি চক্ষু মেললেন। আমি তাঁকে প্রণাম করলাম এবং পুনরায় তাঁকে রাতের আহার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, "ঠিক আছে, এবার খাবারটা খাওয়া যাক।" যখন খাওয়া শেষ হলো, তিনি আমাকে বললেন, "ভাল কথা দর্শন, তুমি এবার যেতে পার। কিন্তু সর্বদা একথা মনে রেখো যে, তুমি যেখানে যেভাবে থাকো এবং সময় যা-ই হোক না কেন, তোমার প্রতিদিনের নিত্যকর্ম (জপ এবং ধ্যান) কখনও ত্যাগ করবে না এবং না করার জন্য কখনও কোন অজুহাত আনবে না।" তখন আমি বুঝলাম কেন তিনি আমাকে সে সময় ওখানে ডেকেছিলেন।

একবার পরমপূজ্য মহারাজজীর সঙ্গে আমার কলকাতা যাবার সুযোগ হয়েছিল। গাড়ীতে সামনের সীটে আমি ড্রাইভারের পাশে বসেছিলাম এবং পিছনের সীটে মহারাজজী। আমার মহারাজজীর পাশে বসার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু সে কথা জানাতে সাহস হচ্ছিল না। কিন্তু মনে হলো তিনি বোধহয় আমার মনের ইচ্ছেটা টের পেয়েছেন—হঠাৎ-ই বললেন, "দর্শন, তুমি পিছনের সীটে আমার পাশে এসে বসতে পার।" এটা আমার কাছে স্বর্গীয় আশীর্বাদের মতো মনে হলো। আমি তৎক্ষণাৎ ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বলে একরকম লাফিয়েই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পিছনের সীটে চলে এলাম। মহারাজজীর এই বদান্যতার কারণে আমি তাঁর কাছে অনেকটা সহজ হতে পারলাম। তাঁর মুখখানিতে তখন সেই চিরপরিচিত স্বর্গীয় হাসির রেশটুকু ছড়িয়ে ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—মহারাজজী, কিভাবে সর্বদা সর্ব অবস্থায় আপনি আপনার সুখের এই স্মিত হাস্যটি ধরে রাখেন?" তিনি আমার প্রতি তাকালেন এবং পুনরায় তার মুখখানি সহাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তখন তিনি বললেন, যা তুমি নও, কখনও তা দেখানোর চেষ্টা কোরো না। কারণ কোন আরোপিত কৃত্রিম ভাব অধিক সময় স্থায়ী হয় না, অল্প সময়ের মধ্যে নিজের স্বরূপই প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুতরাং তুমি যেমন, তেমনটাই প্রকাশ করা ভাল।"

মহারাজজী সেসময় খুব আনন্দোজ্জ্বল ছিলেন; আমি বললাম, "মহারাজজী, আমি কি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি?" মহারাজজী সম্মতি দিলে আমি বললাম, "মহারাজজী, আমি আমার ব্রহ্মচারী নাম পেয়েছি—তৃপ্তিচৈতন্য। আমার কোন কোন গুরুভ্রাতা বলেন যে এটি নারীজনোচিত নাম আর আমারও সেরকমই মনে হয়। যদি আপনি আমার এই নামটি পরিবর্তন করে অন্য নাম দেন তাহলে ভাল হয়। পরমপূজ্য মহারাজজীর মুখমন্ডলে শিশুর সারল্যময় হাসি ফুটে উঠলো এবং বললেন, দেখো দর্শন,

প্রথমতো, তোমার নাম যাই হোক না কেন মানুষটাতো তুমি একই থাকবে। আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলো যে, তুমি কি তোমার গুরুকে ভালবাস, শ্রদ্ধা করো? তুমি কি জানো গুরুর মাহাত্ম্য? যদি তাই হতো তবে তোমার মনে এরকম চিন্তার উদয় কখনই হতো না। বরং তুমি খুব খুশী হতে এরকম সুন্দর একটি নাম পাওয়ার জন্য। তুমি কি জানো 'তৃপ্তি' নামের অর্থ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ মহারাজ, 'তৃপ্তি' নামের অর্থ 'সন্তুষ্টি'। তিনি বললেন, না, তুমি যেমন ভাবছ তার থেকেও অনেক মহান হলো এর অর্থ। এটি একটি সম্পূর্ণ কামনামুক্ত, নির্বাসনা অবস্থা—একজন সাধুর যা অবশ্যই হওয়া উচিত—সদা সন্তুষ্ট। যদি তা না হয়, তাহলে জানবে যে সে তার সন্ন্যাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। একথা বলে তিনি কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকলেন।

তারপর তিনি আমাকে বললেন, যতক্ষণ তুমি তৃপ্ত না হয়ে পারছো, তুমি সন্ন্যাস জীবনের মাধুর্য্য উপলব্ধি করতে পারবে না। আমার মনে হয় তুমি তৃপ্ত, সন্তুষ্ট। তোমার মনে কি কোন বাসনা কামনা অবশিষ্ট আছে?" তিনি আমার মনের অবস্থা অবগত হয়েছেন মনে করে আমি সন্ত্রস্ত হলোম। তাই আমি নীরব থাকলাম। হঠাৎই একটা ঝাঁকুনি লাগল। খুব সম্ভবত ড্রাইভার জোরে একটা বাঁক নিয়েছে। ফলত মহারাজজীর শরীর একটু হেলে গিয়ে আমার ওপর এসে পড়ে। তাঁর সেই স্পর্শ আমার কাছে এক স্বর্গীয় অনুভূতি নিয়ে আসে। আমি অনুভব করি—এক শীতল স্রোত আমার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং আমি এক অনির্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে যাই। মহারাজজী আমার মুখের প্রতি একটু তির্যকভাবে তাকান এবং বলেন—"তুমি উত্তর পেয়ে গেছ?" কিন্তু আমি তখন তাঁকে হ্যাঁ বলার মতো অবস্থাতেও ছিলাম না। তাঁর সাহচর্যে আমি গভীর অনুভূতির রাজ্যে অবস্থান করতে থাকি।

এরপরে আমার জীবনে বহুবার সুযোগ এসেছে তাঁর সঙ্গে দেখা করার ও বাক্যালাপ করার। নারদ ভক্তিসূত্র বলেন—

".............. পুমান সিদ্ধো ভবতি,
অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি।

(যা লাভ করে মানুষ পূর্ণতা অনুভব করে, অমরত্ব লাভ করে এবং পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়ে যায়)

মহারাজজীর সাহচর্যে এসে এটিই আমার পরম পাওয়া।

স্মৃতির সরণী বেয়ে পরমপূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

স্বামী স্বাত্মানন্দ পুরী

কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু স্মৃতিকথা লেখা খুব সহজ হয় না। বিশেষ করে সেই ব্যক্তিটি সম্বন্ধে যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মতো এক সুমহান ও সুবিখ্যাত সংস্থার সর্বোচ্চ পদ আনুকল্পিক স্তরে ছিলেন এবং যিনি প্রায় পাঁচ-ছয় দশক ধরে তাঁর জীবনের বহুমূল্য সময় এই প্রতিষ্ঠানের নিঃস্বার্থ সেবায় প্রদান করেছেন। সেইসঙ্গে সাধনা ও প্রার্থনাময় জীবনাচরণের দ্বারা নিজ আধ্যাত্মিক জীবনকেও সমৃদ্ধময় করেছেন।

বেলুড় মঠ ও মিশনের চতুর্দশ প্রেসিডেন্ট মহারাজ পরম পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী সম্বন্ধে কিছু লিখতে যাওয়া আমার পক্ষে এক দুঃসাহসেরই নামান্তর। ১৯৮০ সালে আমি যখন ত্রিবান্দ্রাম আশ্রমে ছিলাম তখন চিঠিপত্র আদানপ্রদানের মধ্য দিয়েই মহারাজজীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচিতি ঘটে।

আমার কাছে এটি পরম সৌভাগ্যের বিষয় ছিল যে আমি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে উজ্জীবিত পরিবারে বড় হয়েছিলাম। আমার পিতার খুল্লতাত, শ্রীমদ্ স্বামী তথানন্দজী মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য ছিলেন, এবং রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের একজন বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী ছিলেন। আমার স্বর্গীয় পিতামাতা পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত এবং আমি ও আমার ভ্রাতা ভগ্নীগণ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছে দীক্ষিত ছিলাম। সুতরাং ত্রিবান্দ্রাম আশ্রমের মোহন্ত স্বামী শুক্রানন্দজী মহারাজের অধীনে তাঁর নিকট থেকে কোন অনুমতি পাওয়ার ব্যাপারটি আমার কাছে সহজতর ছিল।

সত্তরের দশকে আমার সন্ন্যাস-পূর্ব জীবনে আমি যখন নেত্যম্-এ একটি চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে যাই, তখন আমি প্রথম ত্রিবান্দ্রমের রামকৃষ্ণ মিশন দর্শন করি। মিশনের শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ এবং নারিকেল ও নানাবিধ ফলসমৃদ্ধ বৃক্ষরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি পর্বতোপরি গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভ ও লিনটেল যুক্ত মন্দির ভবনটি

দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত ও হতবাক হয়ে যাই। ভবনটি দৃশ্যত যেন এক অজন্তা গুহা।

নেত্যম্ আশ্রমটি রামকৃষ্ণদেবের সরাসরি শিষ্য স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের সহযোগিতায় ১৯২৪ সালে নির্মিত হয়। ১৯১৬ সালে কন্যাকুমারী দর্শনের সময় পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ কর্তৃক এই স্থানটি নির্বাচিত এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।

মন্দিরের গর্ভগৃহ যেখানে দিব্যত্রয়ীর ফটো এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ফটো সংরক্ষিত—খুবই সুন্দর। রামকৃষ্ণ মিশনের 'লোগো সমেত মন্দিরের দরজাটিও সৌন্দর্য্যের এক মহান নিদর্শন।

আমার কর্মজীবন উপলক্ষ্যে যখন আমি ত্রিবান্দ্রাম যাই, তখন আমাকে রামকৃষ্ণ আশ্রমের হসপিটাল কেন্দ্রে থাকতে হতো এবং প্রতিদিনের অফিস ছুটির পর সমস্ত ভক্ত ও কর্মীদের সঙ্গে সান্ধ্যকালীন প্রার্থনায় যোগদান করতে হতো। ১৯৮০-র দশকে যখন পরমপূজ্য স্বামী নিশ্বানন্দজী মহারাজ নেত্যম্ আশ্রমে এলেন তখন আমাকে সেখানকার সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা ইত্যাদির জন্য ডেকে পাঠলেন এবং আমিও ছয় কিলোমিটার দূরের হাসপাতাল সেন্টার থেকে নেত্যম্ আশ্রমের সাধুনিবাসে এসে থাকতে শুরু করি। এজন্য বেলুড়মঠের তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারি মহারাজ পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের নিকট আমার বায়োডাটা পাঠিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে হয়েছিল।

প্রায় পনেরো দিন পর পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের নিকট থেকে অনুমতিপত্র আসায় আনন্দে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলাম কারণ তাঁর কাছে এই ছিল আমার প্রার্থনা। আশ্রমের সমস্ত প্রবীন সন্ন্যাসীদের প্রণাম জানিয়ে তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলাম । প্রায় বারো বৎসরেরও অধিক সময় ছবির মতো সাজানো এই পবিত্র আশ্রমে সেবাকর্ম করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় যোগাযোগ হয় ১৯১৩ সালে। আমি হঠাৎ-ই জব্বলপুর আশ্রমের সেক্রেটারি শ্রীলোধবাবাজীর নিকট থেকে একটি পত্র পাই, সেখানে তিনি লিখেছেন যে জব্বলপুর আশ্রম পরিধিতে নির্মিত নতুন মন্দির উদঘাটনের অনুমোদন আদায়ের জন্য তাঁর সঙ্গে আমাকে বেলুড়মঠে যেতে হবে।

একথা সর্বজনবিদিত যে আমি আমার ছাত্র জীবন জব্বলপুরেই কাটাই। এবং আমার সেই স্কুল জীবনের শুরু থেকেই আমি জব্বলপুর আশ্রমে নানারকম সেবামূলক কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম।

আমাকে বলা হলো যে শ্রীশ্রীঠাকুরের নবনির্মিত মন্দির এবং তাঁর মার্বেলের তৈরী মূর্ত্তি সিল্কের কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় ছয় মাসের অধিক সময় ধরে রাখা আছে। তারই উদ্বোধনের জন্য জব্বলপুর আশ্রমের সেক্রেটারি এবং বাবাজী রায়পুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যরূপানন্দজী মহারাজের সঙ্গে আমাকে ও বেলুড়মঠ যেতে হবে তাঁদের অনুমোদন আদায়ের জন্য।

আমরা যখন বেলুড়মঠে পৌঁছাই, মঠ-মিশনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মহারাজ পরমপূজ্য স্বামী ভূতেশানন্দজী তখন অসুস্থ ছিলেন। অন্যতম বরিষ্ঠ ভাইস-প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী তখন বিদেশে, তাই অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেন্ট মহারাজ পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজীর নিকট আমরা আমাদের আসবার উদ্দেশ্য জানালাম এবং তিনিও খুশীমনে আমাদের গ্রহণ করলেন। পরমপূজ্য স্বামী সত্যরূপানন্দজী মহারাজ পূজনীয় মহারাজকে তাঁর মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণসূচী সম্বন্ধে জানালেন যে প্রথমে রায়পুর এবং তারপরে নারায়ণপুর হয়ে শেষে থাকবে জব্বলপুর।

যাইহোক, মহারাজজীর সেক্রেটারি খুব ভালোভাবে অনুসন্ধান করলেন এই জায়গাগুলি সম্বন্ধে এবং আরও জানলেন যে একটি বিলাসবহুল গাড়িও থাকবে মহারাজজীকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সেক্রেটারি মহারাজ যখন শুনলেন যে একস্থান থেকে অন্যস্থানের দূরত্ব ২৫০ থেকে ৩৫০ কিলোমিটার, তখন তিনি জানালেন যে পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মতো একজন প্রবীণ মানুষের পক্ষে এই ভ্রমণ কষ্টকর হবে। সুতরাং তিনটি জায়গার পরিবর্তে দু'টি জায়গা নির্বাচিত করা হোক। স্বভাবতই জব্বলপুরের প্রোগ্রামটা বাতিল করে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো । একথা শুনে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হলোাম। বাবাজীতো মন্দির যাওয়ার পথে কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং অতিথিভবনে পৌঁছে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমিও খুব দমে গেলাম। রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে বেলুড়মঠের অতিথি ভবন থেকে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে ঠাকুরের কাছে খুব প্রার্থনা করতে লাগলাম। হঠাৎ-ই তাঁর কৃপায় আমি যেন পথ খুঁজে পেলাম। আমার পূর্ব পরিচিত একজন সন্ন্যাসী—স্বামী লোকাতীতানন্দজী (রঘু মহারাজ) মহারাজের কথা মনে পড়লো যিনি আমার ছাত্রজীবনে জবলপুর আশ্রমে যোগদান করেন। এবং সেইসময় বেলুড়মঠের হেডকোয়ার্টার অফিসে

আইনসংক্রান্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন, যদিও এখন আর তিনি ইহজগতে নেই।

পরের দিন সকালে আমি মঠের হেড অফিসে গিয়ে ওনার সন্ধান করলাম। কাজের চাপে আমারও কলকাতায় খুব আসা হতো। সুতরাং এতবছর পরে আমাকে দেখে তিনি খুবই খুশী হলেন এবং আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন । আমি তাঁকে আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্যের কথা ও অতিথি ভবনে বাবাজীর অসুস্থতার কথা সব জানালাম। বাবাজীকে উনি চিনতেন কারণ জব্বলপুরে উনি বাবাজীর সঙ্গে অনেকদিন কাজ করেছেন। আমি পূর্বদিনের আমাদের সমস্ত আলোচনার কথা তাঁকে জানালাম এবং এ ব্যাপারে তাঁর সহায়তা প্রার্থনা করলাম।

সব কথা শুনে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং বেলুড়মঠের মন্দিরের পিছনে ট্রাস্টি বিল্ডিং-এর কাছে যেখানে পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ থাকতেন, দুপুরের প্রসাদগ্রহণের পর আমাকে সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আমিও যথাসময়ে সেখানে গেলাম এবং ওনাকে পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে দেখে বাইরে একটু দূরে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করতে থাকলাম। উনি পূজ্যপাদ মহারাজজীকে প্রণাম করে জানালেন যে উনি জবলপুর থেকে বেলুড়মঠে যোগদান করেছেন। তিনি পূজ্যপাদ মহারাজজীকে তাঁর কাছে আসবার কারণটিও জানালেন এবং জব্‌বলপুর আশ্রমের মন্দির উদঘাটনের কাজটি যে, এখনও অসমাপ্ত হয়ে আছে সেকথাও জানালেন।

পূজ্যপাদ মহারাজজীও সব শুনে ওখানে যাওয়া আসার সমস্যা ইত্যাদির কথা জানালেন। তখন রঘু মহারাজজী খুবই বিনীতভাবে তাঁকে নিবেদন করলেন যে মন্দিরের মধ্যে ঠাকুরের নবনির্মিত মূর্ত্তি কাপড়ে আবৃত করে ছয়মাসের অধিককাল সময় ধরে রাখা আছে উদ্বোধনের প্রতীক্ষায় । একথা শোনা মাত্রই মহারাজজী অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর সেক্রেটারিকে ডেকে জানালেন যে পূর্বদিনে গৃহীত সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল করে জবলপুরে মন্দির উদ্বোধনে যাওয়ার জন্য সমস্ত ব্যবস্থাদির আয়োজন করতে।

এর প্রধান কারণ হলো এই যে একথা শোনা মাত্রই তাঁর শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা স্মরণে আসে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে মূর্ত্তি নির্মাণ হবার পর কখনও আবৃত অবস্তায় ফেলে রাখতে নেই যেমন দক্ষিণেশ্বরে কালীর মন্দিরে হয়েছিল। এব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকা উচিত।

শ্রদ্ধেয় সত্যরূপানন্দজীকে ডেকে পাঠিয়ে জানানো হলো পূর্বদিনের গৃহীত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা।

রঘু মহারাজজী আমাকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানালেন এবং দুপুরের প্রসাদের পর অতিথি ভবনে গিয়ে বাবাজীর সঙ্গে দেখা করে এই সুসংবাদ দিলেন।

অবশেষে ১৯৯৪ সালে মাঘী পূর্ণিমার দিনে জবলপুর আশ্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠান মঠ মিশনের বহু ট্রাস্টি সদস্য যেমন পূজ্যপাদ স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, স্বামী স্মরণানন্দজী, স্বামী গৌতমানন্দজী মহারাজ, বেলুড়মঠের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসী এবং বিভিন্ন রাজ্যের যেমন ইউ.জি., এম.পি, মহারাষ্ট্রের বহু বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী এবং ভক্তদের উপস্থিতিতে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হলো । পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ জবলপুরের প্রায় শতাধিক ভক্তকে দীক্ষা প্রদান করলেন। পবিত্র নর্মদা দর্শন বিশেষত ভেদাঘাট মার্বেল রক দর্শনের জন্য বরিষ্ঠ সন্ধ্যাকালীন ও বহিরাগত দর্শকদের জন্য বিশেষভাবে আয়োজন করা হয়েছিল। একজন ভক্তের গৃহের নিকটস্থ একটি কালীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন ও পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের হস্তেই সম্পন্ন হলো।

পূজ্যপাদ মহারাজজী জব্বলপুর দর্শন করে এবং নর্মদাতে বোটিং করতে করতে ছবির মতো মার্বেল বক পাহাড়ের সৌন্দর্য দর্শন করে খুবই আনন্দিত হলো। উৎসব পরবর্তী সময়ে তিনি একথাও বলেন যে এটি দর্শন না করতে পারলে তিনি খুবই আফসোস করতেন।

আমি ত্রিবান্দ্রম থেকে এই অনুষ্ঠানের জন্য এসেছিলাম—এক সপ্তাহ পর্যন্ত সাধু ও অতিথিগণের থাকবার ব্যবস্থাদি দেখাশোনা এবং মন্ত্রদীক্ষার জন্য নানারকম কাজকর্মের দায়িত্ব নিয়ে। সব কাজের শেষে আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং ফলত ত্রিবান্দ্রামে ফিরে যাই। কিন্তু ম্যানেজিং কমিটি আমাকে বলতে থাকেন যে, তাঁরা যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়েছেন এবং জববলপুরে ফিরে এসে এই আশ্রমের কাজকর্ম করার জন্য আমাকে বলেন।

তাঁরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছিলেন যে আমি আমার চাকুরীজীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছি। প্রায় দু'মাস পরে পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ মন্ত্রদীক্ষা প্রদান কার্যোপলক্ষে ত্রিবান্দ্রাম আসেন। সেসময় তিনি কন্যাকুমারীর পবিত্র দর্শনের জন্য আগ্রহান্বিত হলে সেই উপলক্ষ্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং আমার আবাল্যলালিত সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছার কথা তাঁর চরণে নিবেদন করি। তিনি খুবই দয়াপরবশ হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেন এবং রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাস জীবন সম্বন্ধে আমাকে বিস্তারিত জানালেন। জববলপুর আশ্রমের কিভাবে আরও উন্নতিসাধন করা যায় সে ব্যাপারে বিস্তারিত

নির্দেশ দিলেন—যেমন শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়নকক্ষের কিছু পরিবর্তন সাধন, জল সরবরাহের সুবিধার্থে একটি বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা করা, নাটমন্দিরে ঠাকুরের পার্ষদগণের ফটো স্থাপন করা ইত্যাদি।

মহারাজজী আরও জানালেন যে অফিসকর্মীগণ তাঁকে অনুরোধ করেছেন আশ্রমটির এ্যাফিলিয়েশনের জন্য, তবে তার আগে প্রয়োজন আশ্রম পরিধির মধ্যে যে বালিকা বিদ্যালয় আছে তাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তাছাড়া, সান্ধ্য-আরতি ও ভজন-কীর্তনের প্রবর্তন করতে হবে। এমনকি একটি ‘বালক সংঘ' গঠনের জন্যও তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন। এছাড়া ভক্তদের জন্য নিয়মিত গীতাপাঠের ক্লাস শুরু করা ইত্যাদির কথাও বললেন।

আজ সন্ন্যাসজীবনের শেষ পর্যায়ে এসে আমি অনুভব করি যে পবিত্র ‘দিব্যত্রয়ী’র আশীর্বাদে এবং পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মতো মহাত্মাদের আশীর্বাদেই আমার সন্ন্যাস জীবন ধন্য হয়েছে।

।। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।।

গুরু কৃপাহি কেবলম্

স্বামী গুরুকৃপানন্দ

ধ্যান মূলং গুরু মূর্ত্তি, পূজা মূলং গুরু পদং।
মন্ত্র মূলং গুরু বাক্যং; মোক্ষ মূলং গুরুকৃপা।।

গুরুমহিমা অপার লেখনী দ্বারা তা ব্যক্ত করা অসম্ভব। সাধন জীবনের পূর্ণতা সম্পূর্ণ গুরুকৃপার উপর নির্ভর। শুধু সাধন জীবন কেন জাগতিক জীবনের সব বিষয়ে সফলতার পিছনেও গুরুর অবদান। সংসারের প্রথম গুরু মাতা, তারপর পিতা, শিক্ষক এবং বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাগুরু। আধ্যাত্মিক জীবনে প্রথম মন্ত্রদীক্ষা গুরু যিনি ইষ্ট মন্ত্র প্রদান করেই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। তারপর আচার্য গুরু যিনি শাস্ত্র শিক্ষা দেন। অন্তিমে সন্ন্যাস গুরু যিনি বিরজা হোম দ্বারা জাগতিক সংসারের সমস্ত ভোগ্য বিষয় করিয়ে ত্যাগব্রতে এগিয়ে দেন। দেখতে গেলে সমস্ত জীবন শুধু জীবনই কেন, সমস্ত জগৎটাই গুরুমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তাই সন্ন্যাস নেওয়ার সময় নিজের পছন্দমতো নাম নেওয়ার অধিকার আছে জেনে নাম চেয়ে নিয়েছি গুরুকৃপানন্দ। লেখার মতো বিশেষ কোন সাধন অনুভূতি নেই তবুও অপার করুণাময় শ্রীগুরুর কৃপায় যতটুকু বুঝেছি লেখার চেষ্টা করছি। মঠ-মিশন আশ্রমে ঘোরাঘুরি করতে করতে পূজ্যপাদ বলভদ্রানন্দজী মহারাজের সহযোগীতায় ১৯১৬ সালে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠ থেকে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা পাই। তারপর মন্ত্রজপের পালা। কিছুদিন কর জপ করার পর মঠে মিশনে সাধুদের জপের সময় কৌটো থেকে মালা বের করে জপ করতে দেখে ইচ্ছা হলো আমিও কেন না মালাতে জপ করিব। একটা মালা কিনে নিলে হয়। কিন্তু যখন জানলাম নিজের মতো মালা কিনে জপলে হবে না। সে মালা গুরু দ্বারা শোধন হওয়া চাই। চললাম গুরুদেবের কাছে সঙ্গে বাল্য বন্ধু ও গুরুভাই। দুজনে সেবক মহারাজের কাছে আবেদন করলাম। সেবক মহারাজ আমাদের আবেদন গুরুদেবকে জানালে, গুরুদেব

আমাদের আলাদা আলাদা ডেকে পাঠালেন। ওকে কি বলেছে জানিনা, আমাকে বললেন—মালা নিলে কিন্তু জপ করতে হবে। ভয়ে ভয়ে কথা না বলে মাথা নাড়লাম। মালা কিনতে হলো না সেবক মহারাজের কাছে মালা ছিল গুরুদেব মালা শোধন করে এনে সেবক মহারাজকে দিয়ে ডাকালেন। করুণামাখা প্রসন্ন নয়নে তাকিয়ে মালা হাতে দিলেন। মালা হাতে নিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে গেলে গুরুদেব মালা হাতে নিয়ে প্রণাম করতে বারণ করলেন। মালা উপরে রেখে প্রণাম করলাম। সেই করুণামাখা মুখখানি যেন আজও চোখের সামনে ভাসে।

হিমালয়ে সাধন ভজন করার ইচ্ছায় আশ্রম ছেড়ে ঋষিকেশ গেলাম। নিত্য গঙ্গাস্নান ও অন্ন ছত্রের ভিক্ষা নিয়ে সাধন ভজন চলতে লাগল। শীঘ্র শক্তি জাগরণের জন্য প্রাণায়ামাদি বাড়িয়ে রাতে থাকলাম। অল্পদিনের মধ্যে মাথা যন্ত্রণা, অনিদ্রা, দুর্বলতা এবং নানা স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। ভয়ে গুরুদেবকে পত্র লিখলাম। উত্তরে গুরুদেব প্রাণায়াম করতে বারণ করলেন। জপ-ধ্যানও কম রেখে বিশ্রাম নিতে বললেন। ছত্রের অন্ন ছাড়াও যাতে একটু জল ও দুধ খেতে পারি তার চেষ্টা করতে বললেন। সবে বাইরে গেছি ভাল হিন্দি বুঝি না। কোন ভাণ্ডারাও যেতাম না। ফলে ছত্রে অন্ন ছাড়া ফল আর দুধের কোন জোগাড় করতে পারলাম না। কাছে পয়সাকড়ি ছিল না। ইতিমধ্যে গাড়িতে করে একদল ভক্ত এসে কুঠারিকে বলল যারা ভিক্ষা নেয় তাদের এক মাস রেশন দেবে। গুড়, বাদাম, দুধ, চিনি, চা-পাতা, ফল-বিস্কুট ইত্যাদি করে প্রায় এক সপ্তাহের মাল দিয়ে যেত। খুব খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে গেলাম। ভালোই কাটছিল হঠাৎ এক সমস্যা দেখা দিল। সাদা কাপড়ে শিখা সূত্র না থাকায় ছত্রে সাধুদের লাইনে ভিক্ষা নিতে মানা করল। সাধুদের নেওয়ার পর ভিখারিদের লাইনে যৎসামান্য ভিক্ষা মিলত। সমস্যা সমাধানের জন্য গেলাম আশ্রমে। উপনয়নের জন্য আবেদন করলাম। কিন্তু তাদের হাত, গোত্র, নানান জিজ্ঞাসাবাদ বা বাঙালীদের মাছ, মাংস খাওয়ার নিয়ে কটাক্ষ মোটেও ভাল লাগল না। পরম পূজ্যপাদ শিবময়ানন্দজীকে পত্র লিখলাম, এদের ভাব যদি এমন হয় কি হবে এদের কাছ থেকে উপনয়ন বা সন্ন্যাস নিয়ে। পূজ্যপাদ মহারাজ সাহস দিয়ে উত্তর লিখলেন, সন্ন্যাস না নিয়েও সাধন ভজন করে ভগবান লাভ করা যায়। সেইমতো চলতে লাগল। মনে মনে ঠিক করলাম গুরুদেবের কাছেই যাই তিনি এ বিষয়ে কি বলেন দেখি। চলে আসলাম যোগোদ্যান মঠে। সব নিবেদন করলাম গুরুদেবকে। সঙ্গে বন্ধুও ছিল। দুজনে ধরে বসলাম যেভাবে হোক আমাদের উপনয়নটা যদি হয়। গুরুদেব ভেবেচিন্তে বললেন তোমরা কি সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সেইজন্য তো ঘর ছেড়েছি। তাহলে

সন্ন্যাসই নিয়ে নাও গুরুদেব বললেন। তোমরা তোমাদের ভাবেই থাকবে বৈদিক মতে সংস্কার দরকার তাই যারা আমাদের সংঘে এসে করতে পারে না তারা এতদিন কৈলাস আশ্রমে থেকেই সন্ন্যাস নিয়ে আসছে। গুরু নির্দেশ শিরোধার্য করে ২০০২ তে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিদ্যানন্দজীর কাছ থেকে সন্ন্যাস সংস্কার হলো।

সন্ন্যাস নিয়েই পদযাত্রায় তীর্থভ্রমণে বেড়িয়ে পড়লাম। হিমালয়ের কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, অমরনাথ, বৈষ্ণবদেবী আদি তীর্থ দর্শন করলাম। যাত্রায় অনেকবার বিপদসঙ্কুল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। গুরুকৃপায় সব উতরে গেছি। গঙ্গোত্রীর পর তপোবনে যেতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে বহুদূর বরফের উপর দিয়ে চলে গিয়েছিলাম, আশ্চর্যজনকভাবে এক সাধুবাবার দর্শন হওয়ায় তার গুহায় রাত কাটিয়ে প্রাণ বেঁচেছিল। পূজ্যপাদ শিবময়ানন্দজীর নির্দেশে আরারিয়ায় গেলাম (বিহার) আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দজী (মতি মহারাজ) যিনি মায়ের সেবা করেছেন। সেখানে থাকাকালীন আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া কাগজপত্র ঘেঁটে মহাদেবানন্দজীকে মায়ের লেখা ২ খানি পত্র সমেত শিবানন্দ, প্রেমানন্দ, বিরজানন্দ, অখণ্ডানন্দ, মাধবানন্দ আদি মহারাজের লেখা ঊনচল্লিশখানি পত্র উদ্ধার হয়। সেগুলি বেলুড় মঠের সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত আছে। পত্রগুলি পাওয়ার সাথে সাথে পূজ্যপাদ শিবময়ানন্দজীকে ফোন করলাম। পূজ্যপাদ মহারাজ জি.এস. মহারাজের নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিতে বললেন। কমিটির কিছু লোক ছিল ঠিক সেই সময় পরম পূজ্যপাদ গীতানন্দজী মহারাজ পূর্ণিয়া আশ্রমে দীক্ষা দিতে যান। পূজ্যপাদ মহারাজকে আবেদন করলাম উক্ত আশ্রমে যাওয়ার জন্য। পত্রগুলির কথা শুনে মহারাজ রাজি হলেন। পত্রগুলি দেখে মহারাজ আনন্দে বললেন এগুলি আমার হাতে দেবে। তৎক্ষণাৎ সম্পাদক স্বামী ধীরানন্দজীর সই করিয়ে পত্র লিখে সমস্ত পত্রগুলি মহারাজের হাতে দেওয়া হলো। আশ্রমে মায়ের কেশ, হাতের পায়ের নখ, রুদ্রাক্ষের মালা সুরক্ষিত আছে। মহারাজ ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে দর্শন করে বললেন এগুলো এখানেই রাখো। পত্রগুলি পূজ্যপাদ মহারাজের হাতে তুলে দিতে পেরে নিশ্চিন্ত হলোাম। পুনঃ বেরিয়ে পড়লাম নর্মদা পরিক্রমায়। কপর্দকভাবে নগ্নপদে কন্টকাকীর্ণ বিপদসঙ্কুল পরিক্রমায় শ্রীগুরুকৃপাই পাথেয় ছিল। হেলাডুমর গাঁও কুজা সঙ্গমে চাতুর্যাস্য করছিলাম। হঠাৎ প্রবল বর্ষায় ড্যাম্পের ছাড়া জলে পলকের মধ্যে সব ডুবে গেল। ড্যাম্প থেকে গ্রাম প্রায় দেড় কিলোমিটার দূর। প্রবল স্রোতে ভেসে চলেছে। সাঁতার জানা দল তাই বেঁচে গেছি। কিন্তু গুরুপ্রদত্ত জপের মালা সহ কয়েকটি বইয়ের প্যাকেট হাত থেকে ছেড়ে ভেসে গেল, সাঁতরে গ্রামে উঠলাম। গ্রামের হনুমান মন্দিরে আশ্রয় নিলাম। গ্রামবাসীরা একটা চাদর দিল

এবং রোজ কেউ না কেউ দুবেলা দুটো রুটি দিয়ে যেত। দিন পনেরো কেটে গেলো, কষ্ট সয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু মালা হারানোর কষ্ট মন থেকে যাচ্ছিল না। গ্রামবাসীদের বললাম জল সরে যেতে তারা খুব খুঁজলো কিন্তু পেলো না। তারা বলল যেদিকে জল বয়ে গেছে তারা সেদিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখেছে। আমার মন সইল না। বেরিয়ে পড়লাম। তারা যেদিকে গিয়েছিল তার বিপরীত দিকে ঘুরতে লাগলাম। আমার মনের অবস্থা গুরুদেব বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন। কাদামাখা প্যাকেটটি একটি বাবলা গাছের তলায় পেলাম। বইগুলি ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কৌটার মধ্যে মালাটি সুরক্ষিত পেয়ে প্রাণ জুড়ালো। শ্রীগুরুচরণে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে মন্দিরে ফিরলাম। ভেবেছিলাম নর্মদা তটেই জীবনটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু পূজ্যপাদ শিবময়ানন্দজীর আহ্বান পেলাম। অমরকন্টকে প্রায় দুবছরে পরিক্রমা পুরো করে বাংলায় ফিরলাম। গুরুদেবকে প্রণাম করে পূজ্যপাদ মহারাজের নির্দেশে হিমাচলে গেলাম। সেখানকার পাট চুকিয়ে পূর্ব বাংলায় মহারাজের নির্দেশে উঃ চব্বিশ পরগণার কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে দশ বছর একটানা সেবাকার্যে থেকেছি। ইতিমধ্যে প্রায়ই গুরুপ্রণাম ও দর্শনেচ্ছায় মঠে আসতাম। একদিন গুরুদেবকে প্রণাম করেছি সেবক মহারাজ ছাড়া পাশে অন্য কেউ ছিল না। গুরুদেবও ধ্যানস্থ ছিলেন। পায়ে হাত দিতেই চোখ খুলে দ্রুত বলছেন—কী চাও? কী চাও? আবেগে আপ্লুত হয়ে জড়িয়ে বললাম শেষের দিনে যেন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তখন গুরুদেব দ্রুত কথা বলছেন। পাশেই পূজনীয় সপ্তর্ষি মহারাজ (আত্মনিষ্ঠানন্দজী) দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি দ্রুত কানের কাছে বলে দিলেন। ও চাইছে ওর যেন ইষ্টলাভ হয়। তখন গুরুদেব হাসতে হাসতে এক হাত মাথায় দিয়ে ঘুরিয়ে দিলেন। সেই পবিত্র স্পর্শের একটা অব্যক্ত আনন্দের ঘোর অনেক দিন মনের মধ্যে ছিল। ঋষিকেশে থাকাকালীন গুরুদেব দিল্লি মিশনে দীক্ষাদানের জন্য গেছিলেন তখন পূজ্যপাদ গোকুলানন্দজী দিল্লি ছিলেন। মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে গুরুদর্শন ও প্রণামে ইচ্ছা জানাতে মহারাজ অনুমতি দিলেন। দীক্ষা শেষে যখন বিকালে গুরুদেবের সঙ্গে সব সাধু-ব্রহ্মচারীরা মজলিশ করে বসেছেন। প্রণাম করে আমিও কাছে বসলাম। কোথায় আছি জিজ্ঞাসা করলে বললেন, এইভাবে ঘুরে বেড়ালে হবে এক জায়গায় স্থায়ী হতে হবে। একটু পরেই বললেন আমাদের সঙ্গে থাকতে হলে পড়াশুনাটা করতে হবে তো। কোথাও বলে দিচ্ছি কোনভাবে গ্র্যাজুয়েশন টা করে নাও। আমি কোন কিছু না ভেবে বললাম, পড়ার আর ইচ্ছা নেই। আশীর্বাদ করুন যেন যেখানেই থাকি ঠাকুর ধরে থেকে তাঁর কর্ম করে যেতে পারি। আবার বললেন ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ালে হবে না। নাড়ানাড়ি করলে কি দই বসে। আমি পুনঃ

প্রণাম করে বেরিয়ে আসতে অন্যান্য সাধু মহারাজ বলল তুই কি বোকা রে পড়িস না পড়িস মহারাজের কথা শুনে কোথাও ঢুকে যাবি তো তারপর যা হওয়ার হবে। উনি তখন অনেককে জয়েন্ট করিয়েছেন। আমি নির্বাক—পরে পূজ্যপাদ গোকুলানন্দজীকে প্রণাম করে তার লেখা বইখানি উপহার পেয়ে ঋষিকেশের রাস্তা ধরলাম। আর একবার গুরুদেব উজ্জয়িনী গেছিলেন দীক্ষা প্রদানের জন্য। ঋষিকেশ থেকে সেখানেও গেছিলাম দুদিন কাটিয়ে গুরুদেবকে দর্শন প্রণাম করে পূজ্যপাদ আত্মনিষ্ঠানন্দজীর দেওয়া গুরুপ্রসাদী চাদর নিয়ে ফিরে আসি। শেষ দর্শন সেবা প্রতিষ্ঠানে। গুরুদেব তখন আই সি ইউ ঘরে। দর্শন একপ্রকার বন্ধ। খুব আবেদন করায় সেবক মহারাজ সামনে যেতে দিল। প্রণাম করে দাঁড়িয়ে দেখলাম চোখ বন্ধ। মনে ভাবছি আমি এসেছি গুরুদেব কি বুঝতে পেরেছেন? মনের জিজ্ঞাসা শেষ হওয়ার আগেই গুরুদেব অল্পক্ষণের মতো চোখ মেলে আবার চোখ বুজিয়ে নিলেন। আমি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে, সেবক হাত ধরে টেনে সরিয়ে নিলেন। তার কয়েকদিন পর মঠে এসে শ্রীচরণতলে বাস ও ব্র: মহারাজদের সঙ্গে গীতা পাঠ ও অন্তিম সংস্কারান্তে আশ্রমে ফিরলাম সব হারানোর বেদনা নিয়ে। দশ বছর স্থায়ী আশ্রমবাসের পর ২০১৪ তে পুনঃ বেরিয়ে পড়ি কাশি, নর্মদা, হিমাচলে। জঙ্গলে এক বছর কাটিয়ে শ্রীগুরু কৃপায় আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পৌঁছালাম স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দজীর মাধ্যমে। আশ্রমটি ১৯৪৪ সালে স্থাপিত রাজস্থানের সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠান। ১৮৯১ সালে আলোয়ার জয়পুর হয়ে স্বামীজি আজমিরের ঘোষী মহল্লোয় এক সপ্তাহ অবস্থান করেছিলেন। এবং এই এলাকায় ঠাকুর প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মহাতীর্থ পুষ্করের নিকটবর্তী পাহাড়ের পাদদেশে অতি মনোরম পরিবেশে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত। পরম পূজ্যপাদ – জগদিশ্বরানন্দ, আদিভবানন্দ, ভূতেশানন্দ, রঙ্গনাথানন্দ, ত্রিদিবেশানন্দ আদি অনেক বরিষ্ঠ মহারাজগণ এখানে অবস্থান করেছেন। মাঝে বেশ কয়েক বছর কোন সাধু না থাকায় আশ্রমটির গতিমন্থর হয়ে পড়েছিল। শ্রীগুরুকৃপায় রাজপুতানার পবিত্র ক্ষেত্রে ঠাকুরের সেবাকার্যের সুযোগ পেয়ে যাতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গহন-আনন্দ চিন্তনে ডুবে থাকতে পারে ঠাকুর-মা-স্বামীজির রাতুল চরণে এই প্রার্থনা।

জয় শ্রীগুরু মহারাজকী জয়

ওঁ

"নমঃ ভগবতে রামকৃষ্ণ নমঃ"

স্বামী বাসুদেবানন্দ

আমি বাসুদেবানন্দ (বরুণ মহারাজ) আমার সাথে পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজীর সাথে মঠে অনেক বার দেখা হয়। আমি প্রণাম করি। মহারাজ দেখেন আর হাসেন মৃদু মৃদু। মহারাজজীকে খুব কাছে পেয়েছিলাম—২০০৬ সালে টাকি মিশনে, ওখানে দীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন। আমি স্যাডেলের বিল আশ্রমে থাকতাম উত্তর ২৪ পরগণায়। আশ্রমের মহারাজ বললেন মহারাজ দীক্ষা দিতে এসেছেন যাও প্রণাম করে এসে—ঐ সময় টাকির মিশনে স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজী দায়িত্বে ছিলেন। বিকেল ৪টের সময় সেবককে জিজ্ঞেস করলাম, 'মহারাজ কি ব্যস্ত আছেন? সেবক বলল, 'না। তখন আমি ভিতরে প্রবেশ করে মহারাজকে প্রণাম জানালাম। তারপর হাঁটু পেতে উনার কোলের উপর মাথা রেখে আশীর্বাদ চাইলাম। উনি তো সদা মুখের দিকে স্নিগ্ধ নয়নে একদৃষ্টি থাকিয়ে ছিলেন এবং সেই যে অমৃত হাঁসি যখনই আমার সাথে উঠে তখন আমার প্রাণে আনন্দ ভরে উঠে। আশ্চর্য ব্যাপার আমি যখন মাথা রাখি মহারাজ আর কিছুতেই হাত আমার মাথায় রাখছিল না, শুধু আনন্দ হাসি এবং হাসি। প্রায় দু থেকে আড়াই মিনিট ঐভাবে রইল তখন সেবক পাশে থেকে বলছিলেন মহারাজ, ব্রহ্মচারী মহারাজকে একবার মাথায় হাত দিন। সেবক তিন থেকে ৪ বার বললো। তবুও মহারাজ হাসছে এবং ঐভাবে রইল; আমিও ছাড়ার পাত্র নই। তখন সেবক নিজে থেকে মহারাজের হাত ধরে আমার মাথায় রাখলেন। তারপর আমি ঐভাবে অনেকক্ষন বসেছিলাম পাশের কাছে। ঐ হাসি উপভোগ করব বলে। তারপর কিছুক্ষন পর মহারাজের জলখাবারের সময় হলো। আমি সরে আসলাম। যদিও মহারাজের কাছে আমার দীক্ষা হয় নেই। আমার গুরু স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর কাছে দীক্ষা কিন্তু উনাকে গুরুর জ্ঞানে আমি প্রণাম করেছিলাম। আমি ঐসময় মনে করেছিলাম যে আমার গুরুকে প্রণাম করলাম। এই হলো মহারাজের সাথে আমার শেষ দেখা। তারপর আমি অরুণাচল প্রদেশ চলে যাই।

শ্রীমদ্ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ—মানবহিতৈষণার মূর্ত্তবিগ্রহ

স্বামী জপানন্দ

পরমপূজ্য শ্রীমদ্ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ছিলেন এমন এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী যাঁর মধ্যে খুব সহজ মানবতাবোধের এক গৌরবোজ্জ্বল মহিমার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই যা তাঁর নিত্যদিনের জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে খুবই সুন্দরভাবে প্রকাশিত হতো। পরমপূজ্য মহারাজজী ছিলেন নিঃসন্দেহে এক মহান নেতা, একজন দক্ষ প্রশাসক এবং উদ্যোক্তা, কিন্তু তাঁর যে গুণটি সবথেকে বেশী আমার মধ্যে আলোড়ন জাগায় তা হলো একজন অতি নগন্য সাধারণ ব্যক্তির প্রতিও তাঁর ব্যবহারের মাধুর্য্য। তিনি ছিলেন দুঃখী, ক্লেশদগ্ধ মানুষদের কষ্টকর অন্ধকার জীবনে শক্তি ও সান্ত্বনার এক আলোকবর্তিকা স্বরূপ। তাদের প্রতি স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মাতৃস্নেহে লালন ও শিক্ষাপ্রদান তাদের সকল শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণাকে সমূলে বিনষ্ট করে দিত। সেই সকল অত্যন্ত সৌভাগ্যশালীদের মধ্যে আমিও অন্যতম যে পরমপূজ্য মহারাজজীর স্নেহ, ভালবাসা ও সহানুভূতির স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছি।

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ খুবই ছেলেবেলা থেকেই যখন আমি আমার বাড়ির চেয়েও বেশী সময় কাটাতাম রামকৃষ্ণ মিশনে। আমার স্মৃতিতে সর্বপ্রথম ধরা আছে ১৯৬৪ সালের কথা যখন আমি একটা প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র ছিলাম মাত্র। সেসময় প্রথম যেসব মহান সাধুদের সংস্পর্শে এসে তারা হলেন শ্রদ্ধেয় স্বামী সম্ভবানন্দজী, স্বামী সোমনাথানন্দজী, স্বামী সুরেশ্বরানন্দজী এবং স্বামী হর্ষানন্দজী। পরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের দুর্নিবার আকর্ষণে আমি মঠে যোগদান করি। শিক্ষার্থীরূপে আমি আমার সন্ন্যাসজীবন শুরু করি মাইশোরের রামকৃষ্ণ মিশনে। ১৯৭৯ সালে আমাকে বেলুড়মঠে ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রেরণ করা হয় আধ্যাত্মিক জীবনের কঠোর প্রশিক্ষণ পেতে এবং সেইসঙ্গে দর্শনশাস্ত্র, স্তবস্তোত্রাদি, স্বামীজির রচনাবলী ইত্যাদী বিষয়ে পঠনপাঠনের উদ্দেশ্যে। চারবছর সেখানে স্বপ্নের মতো পার

হয়ে গেল। সেখানকার দিব্য পরিবেশের পবিত্রতা এককথায় অবর্ণনীয় যা লাভ করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষ পরমপূজ্য স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর পরম পবিত্র ছত্রছায়ায় থেকে। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রপ্রাপ্ত শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের দশম অধ্যক্ষ। তিনি কৃপা করে আমাকে ব্রহ্মচর্য ব্রত দীক্ষা ও মন্ত্র দীক্ষা দান করেছিলেন। সেই সময় পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজীর সান্নিধ্যে আসবারও সৌভাগ্য হয় যিনি সেসময় মঠ-মিশনের একজন প্রবীণ ট্রাস্টি সদস্য এবং কলকাতার বৃহত্তম হাসপাতালগুলির অন্যতম রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি ছিলেন।

প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রায়ই নানারকম পরিস্থিতিতে পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনেক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা থাকতো। আমাদের প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে উনি আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের উপযোগী কয়েকটি ব্যবহারিক আচরণবিধি সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করলেন, বিশেষতঃ যারা রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সন্ন্যাস জীবন-যাপনে আগ্রহী তাদের জন্য। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, আমরা যারা দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছিলাম তাদের কথা বিবেচনা করে তিনি ইংরেজী ভাষায় তাঁর বক্তব্য বললেন। এবং এমন ভালবাসা ও সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের সন্ন্যাস জীবন-যাপনে উৎসাহিত করলেন, তা আমরা জীবনে কখনও ভুলতে পারবো না। কোন এক বিশেষ সময়ে আমার জীবনে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যে আমার সন্ন্যাস জীবনকে বজায় রাখার ব্যাপারে আমি দ্বিধাগ্রস্ত ও আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে পড়েছিলাম। পরমপূজ্য মহারাজজী তা লক্ষ্য করে আমাকে তার অফিস ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার সমস্যাগুলি নিয়ে আমার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর গুরুভ্রাতা এবং সন্ন্যাসী সন্তানগণের প্রতি তাঁর অপ্রতিহত ভালবাসার ধারাবর্ষণ—যা ছিল পূজ্যপাদ মহারাজজীর স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—ছিল তাঁর সেসব আলোচনার মধ্যে। একজন যুবক হিসেবে আমার সমস্ত অনুভূতি ও চিন্তাভাবনার কথা কিভাবে অকপটে তাঁকে জানাবো আমি বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু পরমপূজ্য মহারাজজী আমাকে আশ্বাস দিয়ে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আমার সন্ন্যাসজীবনকে অগ্রসর করে নিয়ে যাবার জন্য সাহস প্রদান করেছিলেন। সেসময় আমাকে লিখিত মহারাজজীর পরম স্নেহ ও ভালবাসা-পূর্ণ পত্রগুলি—যা আমার জীবনে এক পরম সম্পদ হয়ে আছে—আমাকে শান্তি ও আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ করে দিয়েছিল।

পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনে আমার সন্ন্যাসজীবনকালে একটি অতি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাতে আমিও জড়িত ছিলাম। পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ যিনি

সেসময় মঠ মিশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, স্ব-উদ্যোগে এই সমস্যাটি সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্গালোর মিশনে আসেন এবং সব সন্ন্যাসীভ্রাতাগণকে সান্ত্বনা দেন। তিনি আমাদের পথনির্দেশ করে এ-ও বলেন কিভাবে সন্ন্যাস জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেও মঠ-মিশন প্রচলিত নিয়মকানুনগুলি অনুসরণ করা যায়। সেসময় পরমপূজ্য মহারাজজী ব্যাঙ্গালোরে থাকায় আমার পরম সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর নিকট সান্নিধ্যলাভ করার। আশ্রমের প্রশাসনিক ব্যবস্থা তখন এক সংকটাপন্ন অবস্থায় ছিল এবং পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ মঠ-মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে তাঁর মানবহিতৈষী দয়াশীলতা দ্বারা সেই সমস্যার সমাধান করেছিলেন। আর একবার তিনি যে সিদ্ধান্ত নেন, তা চিরকালই প্রত্যেকের কাছেই সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়।

পরবর্তীকালে ঘটনাচক্রে পুনর্বার বেলুড়মঠে আসা এবং মিশনের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীদের সাহচর্য লাভ করার সৌভাগ্য হলো আমার। সেই সুবাদে পুনরায় আমার পরম অভীষ্ট পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের (তদানীন্তন মঠ-মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি) নিকট সান্নিধ্যলাভ করা সম্ভব হলো। আমি সেসময় এক সম্পূর্ণ অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ছিলাম। এবং এ ব্যাপারে চরম কোন সিদ্ধান্ত নেবার জন্যও প্রস্তুত ছিলাম। সেই সংকটকালে পরমপূজ্য গহনানন্দজীর হেডকোয়ার্টারে তাঁর ঘরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আহ্বান আমার কাছে এক স্বর্গীয় আহ্বানের মতো প্রতীত হলো। তাঁর ঘরে প্রবেশ মাত্রই তাঁর দুটি হস্ত প্রসারিত করে আমাকে গ্রহণ করা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না যা আমাকে অনেক স্বস্তি এনে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই আমি আমার সমস্ত অনুভূতির কথা তার সামনে উজাড় করে দিলাম—যা ছিল কেবলমাত্র এক মা ও তার সন্তানের মধ্যে কথোপকথন। আমি খুব মারাত্মকভাবে অশ্রু বিসর্জন করছিলাম কোনকিছুই সেই অন্তর্জগতের ঝড়কে শান্ত করতে সমর্থ ছিল না। আমি যখন চোখ তুলে তাকালাম, বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম যে পরমপূজ্য মহারাজজী বারংবার আমার চোখের জল মুছিয়ে আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তিনি আমায় আশ্বাস দিচ্ছিলেন এই বলে যে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা নিশ্চয়ই আমায় রক্ষা করবেন এবং বিনা বাধায় ও বিনা কষ্টে আমি আমার আধ্যাত্মিক জীবনকে পুনরায় এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হব। একজন প্রকৃত স্নেহময়ীর মায়ের মতোই তিনি বললেন, "বৎস, জীবনে এসব ব্যাপার ঘটতেই থাকবে, কিন্তু যাদের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তারা কোনদিনই দুর্বল হয়ে পড়বে না।" তিনি আমাকে আমার প্রয়োজনীয় মানসিক শক্তি সঞ্চার করে তাঁর প্রেমপূর্ণ কথার মাধ্য59মে আমার বিলুপ্ত মানসিক ভারসাম্যকে পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করলেন। এইভাবে প্রায় দুঘন্টা সময় তাঁর সঙ্গে অতিবাহিত হওয়ার পর

মহারাজজী আমাকে বিশেষ প্রসাদ খাওয়ালেন এবং তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট উভয় হস্ত আমার মস্তকে স্থাপন করে আমাকে বললেন, জপানন্দ, তুমি নিশ্চিত থেকো একথা জেনে যে আমি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজির শ্রীচরণে তোমার জন্য প্রার্থনা করবো, তাঁরা তোমাকে সর্বাবস্থায় পথপ্রদর্শন করেন এবং তুমি যে ভয়ানক অশান্তির মধ্যে রয়েছ তা থেকে তোমাকে রক্ষা করেন। আমার প্রতি এ ছিল তাঁর পরম আশ্বাসবাণী ও উপদেশ যার অতুলনীয় কৃপার আলোয় আমি প্রবল মানসিক সহনশীলতা অর্জন করে কঠিন অবস্থার মধ্যেও আমার সন্ন্যাসজীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলাম। আজ অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একথাই মনে হয় যে আমার সেই ভয়ানক সময়ে এটিই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ আমায় রক্ষা করেন এবং আমার হস্তধারণ করে আমাকে পথ চলতে সাহায্য করেন। অন্য কেউই আমার মতো এত দুর্ভাগ্যের শিকার হননি এবং এতখানি নৈরাশ্যের জগৎ থেকে পুনরুত্থানও আর কারো ঘটেনি—যেরকম একজন প্রকৃত মা তার সন্তানের জন্য করে থাকেন, তিনি আমার জন্য তা-ই করলেন। যখন এই ভয়ানক অবস্থার চরম পর্যায়ে আমি পৌঁছেছিলাম, তখন পরমপূজ্য স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ আমাকে বেলুড়মঠে আরও বেশ কিছুদিনের জন্য থেকে যেতে বলেন এবং তাঁরই নির্দেশে আমি প্রতিদিন শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে গভীর ধ্যান-প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে থাকি। তিনি আমাকে আশ্বাস দেন এই বলে যে মা নিশ্চয়ই আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন এবং নিঃসন্দেহে আমাকে পথপ্রদর্শন করিয়ে আমায় রক্ষা করবেন। এমনকি তিনি আমাকে মঠ-মিশনের তৎকালীন সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজীর সেবা পরিচর্যা করার কথাও বললেন। ইদানীংকালে কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না, কিভাবে একজন বরিষ্ঠ সাধু—মঠের জেনারেল সেক্রেটারি মহারাজ—একজন অতি সামান্য কনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তার সমস্যার কথা শুনছেন, তাকে উপদেশাদি দিচ্ছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছেন। নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া এরকম স্নেহ ভালবাসা পাওয়ার কথা কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না। একথা বিশ্বাসজনকভাবে প্রমাণিত যে শ্রীমদ্ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ প্রকৃত অর্থেই ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এইভাবে পরমপূজ্য মহারাজজী শুধু যে আমার জীবনই রক্ষা করলেন তা নয়, আমার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যও একটি সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করে দিলেন। আজ আমি যা কিছু হয়েছি তার সবটাই সম্ভব হয়েছে এই দিব্য মহান কৃপাশীল ব্যক্তিটির জন্যই যিনি সমস্ত নিয়ম কানুন শাসনতন্ত্রের ঊর্ধ্বে গিয়ে আমাকে তাঁর একান্ত আপনজন হিসাবে ভালবেসেছিলেন।

একজন মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার এটিই একমাত্র পথ যা কোন পুঁথিগত বিদ্যা অনুসরণে পাওয়া যায় না। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীগণ এরকমই মানসিকতার অধিকারী হবেন বলে স্বামী বিবেকানন্দেরও প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু এটা খুবই নৈরাশ্যজনক যে, অনুজদের প্রতি এরকম অকৃত্রিম ভালবাসাপূর্ণ সহৃদয় ব্যবহার ক্রমাগতই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত অর্থে, সহকর্মীরাও সকলে রক্তমাংসের মানুষ এবং সকলেই তাদের সবকিছু ত্যাগ করে শ্রীশ্রী ঠাকুর, মা ও স্বামীজির আশ্রয়ে থেকে সেবা ও আত্মত্যাগের পথে পা বাড়িয়েছে। যখন আমরা স্বামী গহনানন্দজীর মতো এরকম বিরল দর্শন পবিত্রাত্মার সান্নিধ্যে আসি, তখনই অনুভব করতে পারি যে এই পবিত্র ত্রয়ীর স্নেহ ও ভালবাসা তাঁরা তাঁদের এইরকম সন্ন্যাসী সন্তানগণের মাধ্যমেই আমাদের প্রতি বর্ষণ করে চলেছেন।

আমার এই কঠোর সংগ্রাম ও সংঘর্ষের কাহিনী শুনলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকে। যখন আমি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সদস্য ছিলাম, তখন একসময় লেপ্রোসি ও টিবি রোগে আক্রান্ত দরিদ্র পরিবারদের সেবা-শুশ্রুষার কাজে নিজেকে সমর্পণ করার জন্য মনে মনে এক দুর্নিবার প্রেরণা অনুভব করছিলাম। এই কাজটি স্বাধীনভাবে করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করে পরমপূজ্য মহারাজজীর শ্রীচরণে আমার এই ইচ্ছাকে নিবেদন করেছিলাম। আমার এই মঠ-মিশন ত্যাগ করার সিদ্ধান্তে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন কিন্তু শেষপর্যন্ত আমার জিদ স্বীকার করে নেন এবং কর্ণাটকের পা....... গড়ায় আমার এই প্রজেক্ট শুরু করার জন্য আশীর্বাদও করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আমার মিশন ত্যাগ করার সিদ্ধান্তে ওনার অনিচ্ছা ও বাধাপ্রদান সত্ত্বেও তিনি আমার কাছে চিরকালই করুণার মূর্ত্তপ্রতীক রূপেই বিবেচিত হবেন। তিনি আমাকে শান্তভাবে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, যদি আমি কোন কারণে পা.......গড়া সেন্টারে আমার পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ ঘটাতে অসমর্থ হই তাহলে বিনা দ্বিধায় তখনই পুনরায় বেলুড়মঠে ফিরে এসে আমার আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করতে পারি। অবশ্যই এটি ছিল এক ব্যতিক্রমী আশ্বাসের আলো যা অন্য কেউ নয়, এসেছে স্বয়ং জেনারেল সেক্রেটারির নিকট থেকে, যার জন্য কোনও ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই।

আমি সত্যই খুব ভাগ্যবান যে তাঁর এত কৃপা পেয়েছি। পরবর্তীজীবনে যত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে এই পবিত্র ত্রয়ীর আশীর্বাদে আমি কখনও ভেঙে পড়িনি। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম নামের এই প্রতিষ্ঠানটি এবং তাঁদের সমস্ত সন্ন্যাসী সন্তানগণও এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে। এর সঙ্গে জড়িত

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও—স্বামী বিবেকানন্দ অনুপ্রাণিত গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শ্রীসারদাদেবী চক্ষু হাসপাতাল ও রিসার্চ সেন্টার, শ্রীরামকৃষ্ণ পেরিফেরাল হার্ট সেন্টার, শ্রীসারদা দেবী ইনস্টিটিউট অব ভিসন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদিগুলিও কখনও তাদের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়নি। আজ সারা বিশ্বে আমাদের এই সেবা কর্ম পরিচিত ও প্রশংসিত হতে পারে কিন্তু আমি সম্পূর্ণরূপে অবগত যে এই সবকিছুর পশ্চাতে আছেন যে কঠোর ব্যক্তিত্ববান মানুষটি তিনি হলেন পরমপূজ্য শ্রীমদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ যিনি সর্বদা আমাকে রক্ষা করে এসেছেন এবং সর্বদা প্রয়োজনীয় সমর্থন, শক্তি ও সাহস প্রদান করেছেন। শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজকে স্মরণে রেখে এই পবিত্র ত্রয়ীর নামে সমাজের সমস্ত অবহেলিত, পদদলিত, অজানা-অচেনা দরিদ্র মানুষদের প্রতি আমাদের এই সেবাযজ্ঞের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগিয়ে যাব।

স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের একটি ছোট্ট স্মৃতি

স্বামী ধ্রুবরূপানন্দ

সাধু হওয়ার প্রবল ইচ্ছা নিয়ে আমি বেলুড়মঠের নবাগত ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (PPTC) যোগদান করি। যতদিন বেলুড় মঠে ছিলাম সেখানকার দিব্য পরিবেশে খুবই আনন্দে ছিলাম। সর্বত্র একটা যেন দিব্যভাব বিরাজিত এবং সেই আধ্যাত্মিকভাবে সর্বদা বিভোর হয়ে থাকতাম অন্যান্য সহপাঠী ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে।

জাগতিক যে সব বিষয় সাধারণ মানুষের মনকে অহোরাত্র বিচলিত করে থাকে সেইসব চিন্তা মঠে থাকাকালীন মনেই আসতো না। তখন মঠে যাঁরা বিশিষ্ট সাধু তাঁদের খুব একটা চিনতামও না। তখন স্বামী গহনানন্দ ছিলেন মঠের ভাইস প্রেসিডেন্ট। থাকতেন কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান মঠে। মাঝে মধ্যে বেলুড় মঠে আসতেন। একদিন আমি রান্নাঘরে সবজি কাটার কাজ সেরে ট্রাস্টি বিল্ডিং পার হয়ে মন্দিরের পশ্চিম দিক দিয়ে PPTC-তে যাচ্ছি। যারা প্রথম বেলুড়মঠে PPTC-তে যোগদান করে তাদের সবাইকে ঐখানে (PPTC) থাকতে হয় এবং ঐরকম ডিউটি করতে হয়। ওখানে আমাদের সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হতো এবং ডিউটিগুলি সেইভাবে সাজানো। তাই আমি খুব দ্রুত PPTC-র দিকে যাচ্ছি। পায়ে ছিল হাওয়াই চপ্পল সেজন্য খুব জোরে চটপট শব্দ হচ্ছিল। ঠিক সেইসময় মহারাজ সেবকদের সঙ্গে মন্দিরে যাচ্ছিলেন। এটা ঠিক মঠ অফিসের উল্টোদিকের ঘটনা। আমার পায়ে চপ্পলের শব্দ শুনে আমাকে ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি PPTC- তে আছো?" আমি প্রথমেই মহারাজকে প্রণাম করলাম এবং 'হ্যাঁ'-বলে সম্মতি জানালাম। মহারাজ বললেন, "দেখো চলাফেরা কাজ-কর্ম করার সময় অযথা শব্দ করবে না। এই অযথা শব্দ অন্যের বিরক্তির কারণ হয়। আগেকার দিনে বেশিরভাগ লোহার বালতি ব্যবহৃত হত, সেই লোহার বালতিতে যাতে শব্দ না হয়, সাধুরা বালতির হাতলে কাপড় জড়িয়ে রাখতেন, মন, বাক্য দ্বারা কাউকে বিরক্ত না করা। এটিও বড়ো সাধুত্বের লক্ষন, গীতাতে আছে,— "যস্মান্নোদিজতে

লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ"।-অর্থাৎ যিনি অন্যের দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না এবং যার দ্বারা অন্যলোক উদ্বিগ্ন বা ক্ষুব্ধ হন না, সেই ব্যক্তি আমার প্রিয়। আরো বললেন—"সব সময় এমনভাবে চলবে যাতে কেউ কখনও দোষ ধরতে না পারে। তোমরা স্বামীজির চেলা। তোমাদের সব বিষয়ে Perfect হতে হবে।

আজ নিজেকে খুব ধন্য মনে হয়। তখন অতটা না বুঝলেও এখন সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি, সংঘে যোগদানের ঐ প্রাথমিক স্তরে মহারাজের মূল্যবান উপদেশগুলি সাধুজীবনের জন্য কতটা কার্যকরী। কেবল সাধুজীবনের জন্যই নয়। বাস্তবজীবনেও আমাদের চলার পথে খুবই উপযোগী।

তারপর থেকে মহারাজ যখনই যোগোদ্যান থেকে বেলুড় মঠে আসতেন আমি মহারাজকে প্রণাম করতে যেতাম। ওনাকে লক্ষ্য করতাম, তিনি সব বিষয়ে কেমন পারিপাট্য ও গোছানো। ধীর-স্থির ভাবে কথা বলা। সর্বদা হাসিমুখ। সব মিলিয়ে ওনার যে ব্যক্তিত্ব তা আমাকে খুবই প্রভাবিত করত। পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য দর্শন হয় চন্ডীগড়ে। আমি তখন দেরাদুন, কিষানপুর আশ্রমে থাকি। সময়টা ছিল ২০০২ সাল, সেই সময় শীতকালে পূজনীয় মহারাজ চন্ডীগড় আশ্রমে আসেন। চন্ডীগড়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী ব্রহ্মেশানন্দজী আমাদের অর্থাৎ কিষাণপুর আশ্রমের সাধুদের চন্ডীগড় আশ্রমে যাওয়ার আমন্ত্রন জানান। আমি তৎকালীন মহারাজ স্বামী বিপাশানন্দ মহারাজের সঙ্গে চন্ডীগড় যাই। পূজনীয় মহারাজ এসেছিলেন ভক্তদের দীক্ষাদানের জন্য। দীক্ষান্তে আমি ও চন্ডীগড়ের পুজারী ব্রহ্মচারী মহারাজ একইসঙ্গে মহারাজকে প্রণাম করতে যাই। অবশ্য এর আগে আমি ও চন্ডীগড়ের ঐ পূজারী ব্রহ্মচারী মহারাজ PPTC-তে একসঙ্গে ছিলাম। দুই ব্রহ্মচারী একইসঙ্গে মহারাজকে প্রণাম করতে গেলে মহারাজ আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। আমাদের পরিচয় দিয়ে আমরা এ কথাও বলি যে আমরা PPTC-তে একই পরিবারের মতো একসঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বলেন,–"এখন কি আলাদা আছো? এখনও একইসঙ্গে আছো। তবে এখন বড় পরিবার। রামকৃষ্ণ পরিবার যা বর্তমানে গোটা দেশ জুড়ে এবং বিদেশেও ছড়িয়ে আছে। আমরা সবাই এই পরিবারের সদস্য। আমরা যতই পরিবার থেকে দূরে সরে যাই না কেন এটা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে আমরা একই সঙ্গে রয়েছি, এটা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে আমরা একই সঙ্গে রয়েছি। এটি একটি বৃহত্তর পরিবার। যে পরিবারের কর্তা হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি আমাদের এক সূত্রে বেঁধে রেখেছেন। সুতরাং যখন যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের বন্ধন এতোই অটুট যে আমরা সমস্ত পার্থিব দূরত্ব ভুলে গিয়ে নিজেরা একই

পরিবারের বন্ধনে আবদ্ধ। কোনো পরিবারে যেমন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভালো সম্পর্ক পরিবারকে শক্তিশালী করে তেমন শ্রীরামকৃষ্ণ পরিবারের সদস্যরা অনেক দূরে থাকলেও তারা শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় এক সুদৃঢ় ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, এবং এই বন্ধনের কারণে আমাদের সংঘ এতো শক্তিশালী এতো প্রভাবশালী। যতই আমরা সংঘের প্রতি অনুগত হব, শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় তৎপর হব এবং পারস্পরিক হৃদ্যতার বন্ধনকে দৃঢ় করব ততোই আমাদের সংঘ আরও শক্তিশালী, আরও প্রভাবশালী হয়ে উঠবে।" এরপর আমরা আরও কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গ করি। পরেরদিন সকালে আমরা যথারীতি দেরাদুন চলে আসি।

পূজনীয় মহারাজের সেদিনকার সেই উপদেশ যেন আজও শুনতে পাচ্ছি ও দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি। তারপর থেকে অনেক আশ্রমে গেছি কিন্তু কখনও মনে হয়নি যে আমরা পরস্পরের থেকে দূরে সরে আছি। তাঁর ঐ মূল্যবান উপদেশ আমাকে বৃহত্তর রামকৃষ্ণ পরিবার উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে। "বৃহত্তর রামকৃষ্ণ পরিবার" ও "শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের প্রতি আনুগত্য"—এই কথা দু'টি আমার কানে আজও বেজে চলেছে।

পূতসান্নিধ্যে

স্বামী ঈশনাথানন্দ

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করি ১৯৯৮ সালে। দীক্ষার কয়েক বছর পর আমি রামকৃষ্ণ মঠের মহীশূর কেন্দ্রে যোগদান করলাম। ২০০২ সালে পূজনীয় গহনানন্দজী মহারাজ মহীশূর আশ্রমে পদার্পণ করেন। মহীশূর আশ্রমে যেই ঘরটিতে পূজনীয় মহারাজের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তার পাশের ঘরে আমি থাকার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম।

একদিন মহারাজ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের বারান্দায় একা পায়চারি করছিলেন। মহারাজকে সামনে পেয়ে আমি তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। তারপর আমি তাঁকে মহীশূর আশ্রমে তোলা একটি পুরানো ছবি দেখালাম। গ্রুপ ফটোটি ১৯৩০-এর দশকে তোলা। তিনি আমাকে ফটোর নীচে উল্লিখিত সাধুদের নাম পড়তে বললেন। নামের তালিকা পড়ার পর মহারাজ হাসিমুখে আমার মাথায় আলতো করে টোকা দিয়ে আমার শিখাটি ধরে হাসতে হাসতে বললেন, "আমি তোমার ঘরটা দেখব। দেখি তুমি তোমার ঘরটিকে কেমন করে রেখেছ।' যখন আমি আমার থাকার ঘরের সামনে এসে দরজা খুলে দিলাম, তিনি বাইরে থেকে একটু উকি মেরে দেখলেন ও বললেন, 'বেশ, বেশ। তুমি ভালভাবেই সব গুছিয়ে রেখেছ দেখছি। তবে আমি তোমার ঘরে ঢুকব না। অপরের ঘরে ঢোকা ঠিক নয়।'

একদিন মহারাজের কিছু ব্যক্তিগত সেবা করতে দেবার জন্য তাঁর সেবককে অনুরোধ করলে মহারাজের গা-হাত-পা টিপে দেবার সৌভাগ্য পেলাম। টিপতে গিয়ে দেখি, যদিও বাইরে থেকে মহারাজের হাসিমুখ দেখে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু তাঁর হাত দুটি বেশ ফুলে রয়েছে; আবার দুই কাঁধেও খুব ব্যথা। কিন্তু মহারাজের চোখ-মুখ দেখে মনে হত না যে মহারাজ কোন ব্যথা অনুভব করছেন।

সুযোগ বুঝে একদিন আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করার জন্য মহারাজকে

অনুরোধ করি। তিনি খেলাচ্ছলে আমার মাথায় আস্তে করে টোকা দিলেন। বারবার অনুরোধ ও প্রার্থনা জানানোর পর তিনি আমার মাথায় তাঁর দুই হাত রেখে আমাকে আশীর্বাদ করলেন।

এরপর মহারাজ ২০০৪ সালে তিনি ব্যাঙ্গালোর মঠে এসেছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গলাভ করার জন্য সেখানে হাজির হয়েছিলাম। আমি প্রণাম করতে যাচ্ছি, এমন সময় একজন বাঙালী মহিলা মহারাজকে তাঁর সমস্ত দুঃখের কাহিনী বলে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, 'মহারাজ, আপনিই আমার একমাত্র ভরসা।' একথা শুনেই গভীর আবেগে "মাদার্স রক" (মায়ের স্মৃতিপূত টিলা)-এর দিকে নির্দেশ করে বললেন, 'ওখানে মা আছেন। তুমি ওখানে গিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর।' মহারাজ এত গভীর আবেগের সঙ্গে এই কথাগুলি বললেন যে আমার মনে হলো যে মহারাজ সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি অনুভব করছেন। একথা বলেই তিনি তাঁর দুহাত তার মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

অযাচিত কৃপা

ব্রহ্মচারী শুভ্র

কৃপাসিন্ধু ঠাকুর কাকে কখন কীভাবে কৃপা করেন সেটা সাধারণ মানুষের বোধগম্যের বাইরে। আমি একজন অতিভাগ্যবান মানুষ, যে অযাচিতভাবে তাঁর কৃপা লাভ করেছিলাম। তখন আমি মহেন্দ্রগঞ্জ নামে একটা গ্রামে থাকতাম। ১৯৯৭ এর কথা, শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ গারহিলসেরই আশ্রমে আছেন দীক্ষা দেওয়ার জন্য। ওটা একটা প্রাইভেট আশ্রম। আমি দীক্ষা নেওয়ার জন্য কোন ফর্ম ফিলাপ করিনি বা কোন বইও পড়িনি। ছোটবেলা থেকেই ঠাকুরকে ভালোবাসতাম। ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছা দীক্ষা নিলে ঠাকুরের কাছেই নেব।

যাইহোক মহেন্দ্রগঞ্জ গ্রাম থেকে ভলেন্টিয়ার হিসেবে এসেছিলাম ওই আশ্রমে, দীক্ষার সময় কাজ করার জন্য। প্রথম দিন যখন দীক্ষা হচ্ছিল আমার উপর দায়িত্ব পরেছিল ডালা সাজানোর। দীক্ষার্থীদের দীক্ষার ডালা সাজাচ্ছিলাম, একটা বারমুডা প্যান্ট ও টি-শার্ট পরে। শ্রদ্ধেয় মহারাজের সেক্রেটারি শ্রদ্ধেয় সপ্তর্ষি মহারাজ আমাকে ওই ড্রেসে দেখে খুব বকা দিলেন। বললেন মায়েরা আসবেন আর তুই এই ড্রেস পরে আছিস। আমি বললাম মহারাজ আমার তো ধুতি নেই আর আমি ধুতি পরতেও জানি না। মহারাজ বললেন তুই আয় আমার সাথে আমি মহারাজের সাথে গেলাম মহারাজ আমাকে দুটো ধুতি দিলেন আর কীভাবে পড়তে হয় তাও দেখিয়ে দিলেন। বললেন আর কিন্তু শিখিয়ে দেবো না। তারপর আমি ধুতি ও উত্তরীয় পরে ডালা সাজালাম। গুরু প্রণাম এর সময় আমার উপর ভার পড়লো গুরুদেবের পায়ের উপর থেকে ফুল সরানোর। সেটা করলাম। সন্ধ্যেবেলায় আমরা সবাই মহারাজের ঘরে বসে আছি হঠাৎ মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোর নাম কি। আমি বললাম মহারাজ আমার নাম শুভ্র। মহারাজ বললেন তুই দীক্ষা নিবি ? আমি বললাম মহারাজ আমি কোন ফর্ম ফিলাপ করিনি বা কোন বইও পড়িনি।

মহারাজ আমাকে বললেন কাল তোর দীক্ষা হবে। মহারাজ সেক্রেটারি শ্রদ্ধেয় সপ্তর্ষি মহারাজ কে ডেকে বললেন তুমি সব ব্যবস্থা করো, কাল শুভ্রর দীক্ষা হবে। সপ্তর্ষি মহারাজ পরের দিন সব ব্যবস্থা করে দিলেন ধুতি উত্তরীয় পাঁচ রকম ফল আর যা যা লাগে সব। আমি বাড়িতে ফোন করে মাকে জানালাম আমার দীক্ষার ব্যাপারে।

পরের পরের দিন আমার দিদি জামাইবাবু দীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে।

মা বলল ঠিক আছে আমি টাকা পয়সা পাঠিয়ে দিচ্ছি। যথারীতি আমার দীক্ষা হয়ে গেল। মহারাজ কৃপা করলেন। দীক্ষার দিন আমি সবার পিছনে বসে ছিলাম আমি একটু লাজুক প্রকৃতির বলে। মহারাজ আমাকে বললেন শুভ্র তুই সামনে এসে বস। আমি সামনে এসে বসলাম। মহারাজের দয়ায় আমি ঠাকুরের চরণে স্থান পেলাম। সেই মহামন্ত্র আমার কানে দিলেন। আজও সেই পুরনো কথা মনে পড়লে আমার দু'চোখ জলে ভেসে যায়। যেদিন দীক্ষার দিন থাকতো না, সেদিন বিকেলে শ্রদ্ধেয় গুরুদেব, অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সাথে পাহাড়ের নীচের রাস্তায় সান্ধ্যভ্রমণ করতাম ও ধর্মপ্রসঙ্গ হত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতির পর জপাদি সেরে ছুটে গুরুদেবের ঘরে গিয়ে জুটতাম। গুরুদেব ও অন্যান্য সন্ন্যাসীর ধর্ম প্রসঙ্গ হত আর আমরা মন-প্রাণ ভরে শুনতাম আর গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। এত আনন্দ সে কদিন পেয়েছি মনে হয় আর কোনদিন পাবো না ।

মনের মধ্যে যেন একটা আনন্দের ঘট বসে গেছিল সেই কদিন। ঠাকুরের অশেষ কৃপায় গুরুদেবের মাধ্যমে আমার মাথায় বর্ষিত হয়েছে।

সেই সময় গুরুদের আমার বাবাকে বলেছিলেন তোমার ছেলের সংসার জীবন হবে না তুমি ওকে আমাকে দিয়ে দাও। বাবা বললেন মহারাজ আমার ছেলেটা এখনো পড়াশোনা শেষ হয়নি। আগে পড়াশোনাটা শেষ হোক। তারপর ঘটনাচক্রে অবশেষে আমি আশ্রমেই স্থান পাই, তবে অনেক দেরি করে। আজ নবছর হয়ে গেল আমি প্রাইভেট সাধু হিসেবে আশ্রমে আছি।

এখন যখন ভাবি মা ঠাকুরের কি অশেষ কৃপা আমার উপর তখন মন আনন্দে ভরে ওঠে।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দ মহারাজ

ব্রহ্মচারী মুরালভাই

পূজ্যপাদ গহনানন্দজী মহারাজ সম্বন্ধে লেখার মতো ব্যক্তিগত যোগ্যতা আমার নেই, স্বামী বিবেকানন্দজীকে যখন রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে কিছু বলতে বলা হতো—উত্তরে স্বামীজি বলতেন—Judge him not through me, I am only a weak instrument, his character was so great that I or any of his diciple if we spent hundreds of lives, could do no justice to a millionth part of what he really was. অর্থাৎ আমাকে দিয়ে রামকৃষ্ণদেবকে বিচার করতে যেও না, আমি একটি সামান্য যন্ত্র মাত্র। তাঁর চরিত্র এত মহান—আমি অথবা তাঁর কোন দীক্ষিত সন্তান যদি লক্ষ লক্ষ জনম পরিগ্রহ করি—তাঁর চরিত্রের লক্ষ লক্ষ অংশের এক অংশও বর্ণনা করতে পারব না—পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ সম্বন্ধে এই অধর্ম মুরাল ভাই-এর ঠিক একই উক্তি। স্বামীজি বলতেন মঠের প্রেসিডেন্ট মহারাজের ভিতর দিয়ে ঠাকুর কাজ করবেন। পূজ্যপাদ মহারাজজীর যা ভালবাসা পেয়েছি—তা দিয়ে সারা পৃথিবীতে কাজ করে যাচ্ছি। আমি যখন লন্ডন, আমেরিকা, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স ও চীন ইত্যাদি দেশে যাই—উনারা বলেন—We are meditating to take next birth in India. অর্থাৎ আমরা সাধনা করছি—পরবর্তী জনম যেন ইন্ডিয়াতে নিতে পারি। What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow, অর্থাৎ বাংলা যেটা আজ ভাবে—ভারতবর্ষ সেটা পরের দিন ভাবে। বিশ্বের হাজার হাজার ভক্তকে দীক্ষা দিয়েছেন। সারদা মা বলতেন—রামকৃষ্ণ নাম যে কানে গেছে যমের বাপের সাধ্য নেই আমার ছেলেকে নিয়ে যায়। তাঁর ভালোবাসার কথা ভাবলে চোখের জল ধরে রাখতে পারি না। স্বামীজি বলতেন—Love never fails today or tomorrow or ages after truth will conqure love shall win the victory. অর্থাৎ ভালবাসা কোনদিন বৃথা যায় না। ভালবেসে মাকে ডাকো সাধন ভজন লাগবে নারে।

স্বামীজি ভাষণের শেষে বলতেন—Let me conclude by saying that in my life I have told you any word of truth that is his alone and I have told you many things which is not correct and benificial to human race on me all the responsibility. অর্থাৎ আমি জীবনে যদি সত্য কিছু বলে থাকি তা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই বলেছেন। আর অসত্য কিছু বলে থাকি তার সব দায় দায়িত্ব সব আমার উপর। তাই আমার এই ছিয়াত্তর বৎসর ধরে যা কিছু করেছি তার সব কিছু পূজ্যপাদ গহনানন্দ মহারাজজীর আশীর্বাদ। ঠাকুর বলতেন, গুরুতে যদি ঈশ্বর বুদ্ধি না থাকে নামে কোন কাজ হবে না। ঠাকুর নিজের মুখে বলেছেন যে রাম যে কৃষ্ণ ইদানীং রামকৃষ্ণ। স্বামীজি বলেছিলেন, যেদিন থেকে ঠাকুরের আবির্ভাব সেদিন থেকেই আমরা সত্যযুগে আছি। সুতরাং আমরা যারা তাঁর কৃপা পেয়েছি আমাদের আর কোন ভয় নেই—‘গুরুকৃপাহি কেবলম্, ওঁ শান্তি, জয় মা’।

স্মৃতিতর্পণে মাতাজীবৃন্দ

ত্বমেব গুরুঃ চ পিতা ত্বমেব

প্রব্রাজিকা নিরাময়প্রাণা

অধ্যাত্মপিপাসু মানুষের শ্রীগুরুই পথনির্দেশক। তিনি ভবনদীর কান্ডারী। স্বামী গহনানন্দ মহারাজকে আমি আধ্যাত্মিক জগতে গুরুরূপে পেয়েছি। আর পেয়েছি জাগতিকক্ষেত্রে পিতারূপে। প্রথম যেদিন তাঁর কৃপাপ্রার্থী হয়ে যাই তখনই তাঁর আন্তরিক আহ্বানে প্রবল আকর্ষণ অনুভব করি। তিনি দীক্ষার পূর্বদিন দীক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতেন। প্রশ্নোত্তর চলত দীক্ষার্থীরা মন্ত্রদীক্ষার পর নিয়মিত জপ ধ্যান করতে পারবে কিনা এরূপ একটি প্রশ্ন দীক্ষার আবেদন পত্রে থাকে। সকলেই ইতিবাচক উত্তর দিয়ে থাকেন। মহারাজ সেকথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। মহারাজ আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে শ্রীমর প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা সরস ভাবে বললেন। সবার উদ্দেশ্যে আলোচনার পর আমাকে প্রশ্ন করলেন—

তুমি ছাত্রী না শিক্ষিকা ?

উত্তর–ছাত্রী, একাদশ শ্রেণিতে পড়ি।

প্রশ্ন—কি পড়াশোনা কর ?

উত্তর—কলা (Arts কে বাংলায় বলবার চেষ্টা)

সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল উঠল। মহারাজ তো উত্তরটা বুঝতে পারছেন না। পাশ থেকে কেউ বললেন—মহারাজ ও Arts পড়ে।

দীক্ষার দিন প্রত্যেকে শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণসহ করজপ করতে পারছে কিনা দেখলেন। একজন কিছুতেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারছে না বারবার ভুল হচ্ছে। মহারাজ আবার সংশোধন করে দিচ্ছেন। আমরা অধৈর্য্য হয়ে পড়ছি। কিন্তু মহারাজের অসীম ধৈর্য্য। অবশেষে তিনি উক্তব্যক্তির স্ত্রীকে ডেকে বললেন—ওকে তুমি সাহায্য করো।

মহারাজের পিতৃসুলভ স্নেহের ফল্গুধারা সদা প্রবহমান। কিন্তু তার এমন সংযত

অভিব্যক্তি ছিল যা দুর্লভ। মহারাজের ব্যক্তিত্বের এই সংযত ভাবটি খুবই লক্ষ্যণীয়। আনন্দ, শাসন, মৃদুরসিকতা সবটাই খুব নিয়ন্ত্রিত। একবার মহারাজ ভক্তদের দর্শন দিচ্ছেন আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছি। একটা মশা মহারাজকে অনেকক্ষণ ধরে কামড়াচ্ছে। গুরুকে কি করে আঘাত করব এই ভাবনায় কিছু করতে পারছি না। বাধ্য হয়ে মহারাজকেই দেখালাম। উনি শুধুমাত্র তর্জনীর সাহায্যে খুব সন্তর্পণে মশাটি মারলেন পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছে নিলেন। নির্বোধের মতো এ সবই মুগ্ধ হয়ে দেখলাম। আর ভাবলাম আমরা একটুতে কত চঞ্চল হই। সঙ্ঘে যোগদানের পর নতুন জীবনে কেমন ভাবে থাকতে হবে তার নির্দেশ দিলেন একপত্রে। পিতা যেমন তাঁর কন্যাকে নতুন জীবনে প্রবেশের পথনির্দেশ দেন তেমনই তিনি শেখাচ্ছেন সঙ্ঘজীবনে কেমন থাকতে হবে।

যোগদানের প্রায় দু'বছর পর বেলুড়মঠে দু'জন মাতাজীর সঙ্গে মহারাজকে দর্শন করতে যাই। তার কয়েকমাস আগে একটি দুর্ঘটনায় আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। প্রায় দু'বছর বাদে মহারাজকে দর্শন করতে অধ্যক্ষ মহারাজের ঘরে ঢুকতেই সেবক মহারাজরা উৎসাহিত হয়ে বলছেন—মহারাজ দেখুন কে এসেছে, দেখুন মহারাজ কে এসেছে। মহারাজ অধ্যক্ষের আসনে আসীন। তিনি তাঁর শিষ্যাকে এতদিন বাদে দেখলেন কিন্তু কোন আনন্দের প্রকাশ নেই। অথচ এর আগে কয়েকমাস না যাওয়ায় আস্তে আস্তে বলেছেন—কতদিন পরে এলে ! শিষ্য গুরুদর্শনের প্রতীক্ষায় থাকে, গুরুও শিষ্যের প্রতীক্ষা করেন ? এবার সেবক মহারাজরা ও মাতাজীরা বলতে শুরু করলেন—মহারাজ ও পড়ে গিয়েছে, ওর কষ্ট ইত্যাদি। কেউ জিজ্ঞাসা করছেন কি চিকিৎসা করছ, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কর। কিন্তু যাঁকে এসব জানানো হচ্ছে তিনি নির্বিকার। একদৃষ্টে শিষ্যাকে দেখলেন তারপর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিলেন। বলা বাহুল্য এরপর ধীরে ধীরে পূর্ণ কর্মক্ষমতা ফিরে পাই যা চিকিৎসদের বিস্ময় জাগায় কিন্তু ব্যবহারে আনন্দ বা দুশ্চিন্তার কোন প্রকাশ নেই। তবে তার অর্থ এই নয় যে তিনি সংবেদনশীল ছিলেন না। আর একজন শিষ্যা তার ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলার পর দেখে মহারাজের চোখ দুটি জলে ভরে গেছে।

মহারাজের অনেক দীক্ষিত সন্তান ছিল। পত্রের উত্তর দিতে তিনি একটুও বিলম্ব করতেন না। সব জিজ্ঞাসুকে যথাযথ উত্তর দিয়ে ধন্য করতেন। স্বল্পবাক মহারাজের পত্রগুলি ছিল বাঙ্ময়। পত্রপ্রেরকের ভুল সংশোধন ও উত্তর দিতে অনেকসময় পত্র দীর্ঘ হত। সচ্চিদানন্দই গুরু এই বিষয়টি গুরুপূর্ণিমার পত্রতে শিষ্য-শিষ্যাদের মনে অঙ্কিত করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরই গুরু, তিনি-ই ইষ্ট।

রামকৃষ্ণসঙ্ঘে গুরুমহারাজ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। মনুষ্যদেহধারী গুরুর পবিত্র দেহবলম্বনে তিনি-ই জীবোদ্ধার করছেন। এটি যথার্থ গুরুভক্তির তাৎপর্য। এটি না বুঝলে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক জাগতিক কোন সম্পর্কের মতো হয়ে উঠে যেতে পারে। আমার সৌভাগ্য যে মহারাজ ইহলোক ত্যাগের পূর্বে এই ভাবটি করবার আমাকে স্মরণ করাচ্ছিলেন। তাই গুরুকৃপায় মহারাজের স্থূলতনুত্যাগের পর শূন্যতা ধীরে ধীরে আনন্দিত হয়ে যায়।

আমি তখন নবাগতা। দু'জন মাতাজীর সঙ্গে বেলুড়মঠ গিয়েছি। মহারাজ লজেন্স দিচ্ছেন। মাতাজীদের মাঝখানে হাত পেতেছি। কিন্তু মহারাজ আমায় লজেন্স দিচ্ছেন না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে মহারাজ বললেন—দ্যাখো ওঁরা কেমন করেছেন। মাতাজীরা ভিক্ষাগ্রহণের ভঙ্গীতে চাদর পেতেছিলেন। মহারাজ আমাকে ভিক্ষাগ্রহণের ভাবটি শেখাচ্ছিলেন।

যোগোদ্যানে মহারাজের দর্শনের সময় প্রশ্নোত্তর পর্ব চলত। মহারাজ মাঝে মাঝে গল্প বলতেন। অনেকেই অনুভব করত যে প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছিল তা করা না হলেও সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছে। আমার তরুণ মনে অনেক প্রশ্ন অনেক কথা ছিল কিন্তু শোনবার একজনই ছিলেন যাঁর সাথে জন্ম- জন্মান্তরের সম্পর্ক। কত চিঠির উত্তর দিয়েছেন। শারীরিক অসুস্থতায় চিকিৎসারত তাই উত্তর দিতে পারছেন না বলে নির্দেশ দিয়েছেন একই বয়ানে যেন দুটি পত্র পাঠানো হয়। কখন সারদা মিশনে ছাত্রীনিবাসে কখন বা পূর্বাশ্রমে থাকতাম। তাই পরীক্ষার আগে কোথায় আছি না জানায় মহারাজের এমন নির্দেশ যেন চিন্তিত না হই। বলতে দ্বিধা নেই পড়াশোনা করতে একদম ভাল লাগত না। সেকথাটা মহারাজকে বলতে হবে আর কাওকে বলা যাবে না। মহারাজ স্পষ্ট জানালেন—ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়নই তপস্যা। পড়াশোনা ও জপ-ধ্যান পরস্পরের সহায়ক। ব্যস, আর কি করা যায়, গুরুনির্দেশ পড়াশোনা আবার ফলপ্রকাশের পর মার্কসিট দেখিয়ে জিজ্ঞাসা—আপনি খুশি হয়েছেন ? মহারাজ মন দিয়ে মার্কসিট দেখে প্রতিপ্রশ্ন করছেন—তুমি খুশি তো ?

তরুণদের ও শিশুদের দেখে মহারাজ খুব উৎসাহিত হতেন। একবার দর্শনের সময় শেষ হয়েছে প্রসাদ পাওয়ার ঘন্টা পড়েছে। কিন্তু ভক্তরা কেউ উঠছেন না। সেবক মহারাজরা বারবার বলছেন তবু মহারাজের দুর্লভ সঙ্গ ছেড়ে উঠতে কারো ইচ্ছা হচ্ছে না। অবশেষে মহারাজ সমাধান করে দিলেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হেসে বললেন—আমার খিদে পেয়েছে। মহারাজের এই কথায় সবাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে।

একদিন মহারাজকে প্রণাম করতেই জিজ্ঞাসা করছেন প্রসাদ পাবে তো? আবার বলছেন প্রসাদ পেয়ে যেও। ভাবলাম কেন এতবার প্রসাদ পাওয়ার কথা বলছেন। তারপর প্রসাদ পেতে গিয়ে দেখলাম সেদিন কোন ভক্ত ভান্ডারা দিয়েছেন।

মহারাজের কাছে কি পড়ব জিজ্ঞাসা করায় বললেন সংস্কৃত পড়। মাঝে মাঝে বলতেন গীতা পড়। বিভিন্ন পত্রের উত্তরে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করে বিষয়টি বোঝাতেন। সাধুজীবনে প্রবেশ করে প্রতিপদে বুঝছি গীতাপাঠ ও সংস্কৃতশিক্ষার উপযোগিতা। তিনি গীতার যথার্থ মর্মগ্রাহী ছিলেন এবং গীতোক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর জীবন দেখলে মনে পড়ে যায়—

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ। ১৫।১২

একটি পত্রে মহারাজ লিখেছিলেন—“ঈশ্বরে বিশ্বাস-ই আত্মবিশ্বাস। সেটি বুঝবে অনেক পরে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করলে প্রারব্ধের ভোগ কমে যায়। সত্যই এই দুটি কথা অনেক পরে বুঝলাম। ঈশ্বরে বিশ্বাস-ই শরণাগতি। এই বিশ্বাস বলে বলীয়ান হয়ে বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতেও ভক্ত অবিচলিত থাকতে পারে।

আরেকটি পত্রে লেখেন—“কেবল কর্তব্যবোধে সব করবে, আসক্তিতে নয়। কেউ আপন নয়। একমাত্র ভগবানই আপন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও যাতে তাঁকে স্মরণ করতে পার তার অভ্যাস প্রত্যহ নিয়মিত করবে। দেখবে, তিনিই তোমার হাত ধরে আছেন। কোন ভয় নেই। তিনিই তোমাকে তাঁর কাছে টেনে নেবেন। কারণ ভগবান নিজেই যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—

“অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।।” ৫/৮

শ্রীভগবানের অশেষকৃপায় দুর্লভ গুরুসঙ্গলাভের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি। শিবজ্ঞানে জীবসেবা ও নামজপের যে দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন আমরা যেন সেই পথ অনুসরণ করতে পারি এই তাঁর শ্রীচরণে প্রার্থনা।

দিব্য-সান্নিধ্যে

প্রব্রাজিকা অজ্ঞেয়প্রাণা

শিলং আশ্রম। ছোটবেলা থেকে কত পূজনীয় মহারাজদের সংশ্রবে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজিকে চেনার সৌভাগ্য হয়েছে। আমার জনক-জননী দুজনেই অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। দুজনেই মঠের অষ্টম অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের কৃপালাভ করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে সবসময় 'সাধুসেবা' দেখেছি। অন্য আশ্রম থেকে আগত পূজনীয় মহারাজরা শিলং এলেই, গর্ভধারিণীর কাছে সঙ্গে সঙ্গে খবর যেত, অর্থাৎ খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক ছিল অর্থাৎ পূঃ মহারাজদের আমরা আমাদের একান্ত আপনারজন বলেই জানতাম, কোন সংকোচ এর ব্যাপার ছিল না।

শিলং আশ্রমে তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দীক্ষিত, স্বামী সৌম্যানন্দ মহারাজ সেক্রেটারি ছিলেন, আর তাঁরই যোগ্য সহকারী ছিলেন স্বামী গহনানন্দ মহারাজ, যিনি নরেশ মহারাজ নামে সবার কাছে সুপরিচিত।

শিলং আশ্রমের অবস্থা তখন খুব ভালো ছিল না। প্রত্যেক মাসে পূঃ নরেশ মহারাজ একজন ব্রহ্মচারী মহারাজকে নিয়ে Monthly Collection করতে আসতেন। আমরা প্রত্যেকদিন স্কুল ছুটির পর বিকেল বেলা আশ্রমে যেতাম পূঃ চন্ডিকানন্দ মহারাজের প্রতিষ্ঠিত 'সারদা সংসদ'-এ। আমরা গান, গীতা, উপনিষদ পড়া, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজি মহারাজের জীবনীপাঠ ইত্যাদি করতাম। প্রথম প্রথম অত বুঝতে পারতাম না। পূঃ চন্ডিকানন্দজী অত্যন্ত দরজী সাধু ছিলেন, সব সময় একটা ভাবে থাকতেন। আমাদের সব কিছু শেখানোর তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল। প্রতি শনিবার যে কোন একজনকে কোন বিষয়ের উপর বলতে হতো। সেদিন পূঃ নরেশ মহারাজও উপস্থিত থাকতেন ও আমাদের এগিয়ে যাবার কথা বলে উৎসাহ দিতেন। বৎসরে একবার অনুষ্ঠান হতো ও শীর্ষস্থানে অধিকারী বা অধিকারিণীদের পুরস্কার দেওয়া হতো। এই

অনুষ্ঠানে অনেক সাধু ও ভক্তরা উপস্থিত থাকতেন। পূঃ নরেশ মহারাজ ও চন্ডিকানন্দজীর জন্য আমরা আস্তে আস্তে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমন্ডলের সঙ্গে পরিচিত হলোম। এ আমাদের কাছে এক বিরাট প্রাপ্তি।

ইতিমধ্যে শিলং আশ্রমে পূঃ গহনানন্দ মহারাজের Inspiration-এ অনেক ছেলে join করেছে। পূঃ মহারাজ তাঁর অপার ভালোবাসায় তাদের আপনার করে নিয়েছেন। বাইরে থেকে দেখলে কঠোর বলে মনে হলেও, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ভালোবাসার বন্ধনে সবাই বাঁধা পড়তো। তখন তিনি ছিলেন তাদের বন্ধু, সহকর্মী ও তাদের একান্ত আপনার, যার কাছে স্বাধীনভাবে থাকা যায়। পরবর্তীকালে আমরা তাঁদের রামকৃষ্ণ সংঘ-এর বিশিষ্ট বড় সাধু বলে দেখি। এরা হলেন পূঃ রামগোপাল মহারাজ, অর্থাৎ স্বামী প্রমেয়ানন্দ মহারাজ, যিনি পরবর্তীকালে Vice President হয়েছিলেন, আনন্দ মহারাজ (স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দজী) মিহিত মহারাজ (স্বামী তপনানন্দজী) জ্যোতি মহারাজ (স্বামী ভাস্করানন্দজী) যিনি এখন সিয়াটল Centre-এ আছেন, রথীন মহারাজ (স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজী) যিনি বর্তমানে রাশিয়াতে আছেন। প্রত্যেকেই পূঃ গহনানন্দ মহারাজ-এর স্নেহচ্ছায়ায় এগিয়ে গেছেন। তাঁদের এগিয়ে যাবার পথে পূঃ নরেশ মহারাজজীর সুপরিকল্পিত নির্দেশ এর মূল্য ছিল অসীম। পরবর্তীকালে আমাদের কাছে প্রত্যেকেই তাদের এই life-এ এগিয়ে যাবার জন্য পূজনীয় গহনানন্দ মহারাজের অবদানের কথা স্মরণ করেছেন।

আমাদের ‘সারদা সংসদ’ এর সভ্যদের উপর বেলুড়মঠের অনেক প্রাচীন সাধুদের কৃপাদৃষ্টি ছিল। পূঃ মাধবানন্দ মহারাজ; অভয়ানন্দ মহারাজ, দয়ানন্দ মহারাজ, নিত্যস্বরূপানন্দজী, লোকেশ্বরানন্দজী আরও অনেকে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ও উপদেশ দিয়ে আমাদের এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। এভাবে মায়ের কৃপায় শৈশবকাল বেশ সুন্দরভাবে কেটেছে।

পরবর্তীকালে পূঃ গহনানন্দজী সবাইকে বলতেন, “রাজশ্রী”কে তো আমি হামাগুড়ি দিতে দেখেছি। সত্যি সাধুদের কত স্নেহ, ভালোবাসা পেয়েছি। তাঁদের ভালবাসাতেই এই জীবনে আসা সম্ভব হয়েছে। একটা মজার ঘটনার উল্লেখ করছি—একবার শিলং আশ্রমের পূঃ মহারাজদের মনে হলো, সারদা সংসদ-এর ছেলে মেয়েদের দীক্ষা নিতে হবে। আমার তখন ৮ বছর বয়স। অনেকে ভাবলেন, এত ছোট বয়সে দীক্ষা হবে কিনা। পূঃ বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ আসছেন, ওর কাছে দীক্ষা হোক—এটা ওঁদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। পূঃ গহনানন্দজী আমার যাতে দীক্ষা হয়, তাঁর জন্য একটা বুদ্ধি বের

করলেন। শিলং আশ্রমে পূঃ বিশুদ্ধানন্দজী এসে যে ঘরে থাকবেন, সেই ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজি মহারাজের ছবি ছাড়া, শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাপার্ষদ ও অন্যান্য ছবি ছিল। পূঃ নরেশ মহারাজ আমাকে সব ছবি গুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে নামগুলি আমাকে মুখস্থ করিয়ে দিলেন। যথাসময়ে পূঃ বিশুদ্ধানন্দজী আসলেন, ও আমাকে দেখে বললেন, বড় ছোট, এ বছর মায়ের কাছে শিখুক, পরের বছর দীক্ষা দেব। পূঃ গহনানন্দজী তখনই বললেন মহারাজ, ও অনেক কিছু জানে, আপনার ঘরে যে ছবিগুলি আছে, ওকে সব ছবির নাম জিজ্ঞেস করুন, না পারলে দীক্ষা দেবেন না। এবার পূঃ বিশুদ্ধানন্দজী খুশি হয়ে বললেন, খুব ভালো প্রস্তাব। তারপর আমাকে নামগুলি এক এক করে বলতে বললেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব ছবি দেখিয়ে নাম বলে ফেললাম। উপস্থিত মহারাজরা পাশ করে গেছে বলে উঠলেন। পূঃ বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ হাসিমুখে দুইহাত আমার মাথায় রাখলেন ও বললেন দেখি কি করা যায়। আমি বাড়িতে চলে এলাম। একদিন পর দীক্ষা শুরু হবে। হঠাৎ রাত্রে পূঃ গহনানন্দজী মাকে ফোন করে বললেন, "আগামীকাল সকালবেলা রাজশ্রীকে স্নান করিয়ে, শাড়ী পরিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। পূঃ মহারাজ ওকে দীক্ষা দেবেন। জিনিসপত্র সব আমরা ব্যবস্থা করেছি।" পরদিন ভগবকৃপায় পূঃ মহারাজ আমাকে কৃপা করলেন। আমার এ দীক্ষার পিছনে পূঃ গহনানন্দজীর অবদান আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। পবিত্র সাধুসঙ্গে অসম্ভব ও সম্ভব হয়। পূঃ মহারাজ এর অযাচিত কৃপায় আমি ধন্য।

পূঃ গহনানন্দ মহারাজকে ছোটবেলা থেকেই দেখতাম, আশ্রমের ছোট বড় সব কাজেই উনি leading Part নিতেন। অসম্ভব পরিশ্রমী, সুদক্ষ পরিচালক, যে কোন সমস্যায় সদা অবিচল থাকতেন। ব্রহ্মচারীদের সব সময়ে আদর্শের কথা মনে করিয়ে দিতেন।

আপাতদৃষ্টিতে গম্ভীর প্রকৃতির, সংযত বাক, অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ শিলং অফিসে কাজ করতেন। শিলং আশ্রমে সর্বত্র আমাদের অবাধ-গতি, চারিদিকে ঘুরে বেড়াতাম। পূঃ সৌম্যানন্দজী অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিলেন। সবসময় মুখে হাসি। কিন্তু পূঃ গহনানন্দজীর কাছে অফিসে আমরা প্রবেশ করতে চিন্তা করতাম। সাহস করে ঢুকে পড়লে, আমাদের সাদর আহ্বান করতেন। আমরা প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করতেন, পড়াশুনা কেমন হচ্ছে, সকাল-সন্ধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ডাকছি কিনা, কি প্রার্থনা করছি ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের উত্তর দেবার পর পূঃ মহারাজের সহাস্য মুখ দেখতে পেতাম।

অনেক সময় আমরা কিছু প্রশ্ন করলে তিনি অনেকক্ষণ প্রাচীন সাধুদের ভগবদভাবে নিরত জীবন নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলতেন। অপরের জন্য কীভাবে নিজেকে উজাড় করে দেওয়া যায়, সেইসব জীবন উনি দেখেছেন ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এসব প্রাচীন সাধুদের স্নেহাশীর্বাদে তিনি এগিয়ে যাবার পথের সন্ধান পেয়েছেন।

ভুবনেশ্বর মঠ পূঃ রাজা মহারাজ এর জায়গা, বলতেন গুপ্ত কাশী, সুন্দর তপোবন এর ন্যায় পরিবেশ, নির্জন, মনের মতো জায়গার সন্ধান পেয়ে পূঃ মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠে প্রথম যোগদান করলেন। শিবক্ষেত্র ভুবনেশ্বরে তখন পূঃ স্বামী নির্বাণানন্দজী ও পূঃ শঙ্করানন্দজীর পবিত্র সঙ্গে কাটাতে লাগলেন। পরবর্তীকালে পূঃ মহারাজ আমাদের গল্প করেন, "পূঃ মহারাজদের কাছেই আমি আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের মূল্যবান উপদেশগুলি শুনেছিলাম, আশ্রমের প্রত্যেক কাজ ঈশ্বরবুদ্ধিতে একাগ্রতার সঙ্গে করতে হয়, তবেই ঠিক ঠিক কাজের আনন্দ পাওয়া যায়।

পুরীতে পূঃ গহনানন্দ মহারাজ, কেদারবাবার সঙ্গ ও সেবা করার সুযোগ পান। পূঃ মহারাজ কেদার বাবার একটা কথার উপর খুব জোর দিতেন, Struggle is life, এই পথে যে যত Struggle করতে পারবে, তত তাঁদের প্রতি অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজির প্রতি তোমার ভক্তি, বিশ্বাস তত দৃঢ় হবে, এভাবে সাধুজীবনের অমূল্য উপদেশ দিয়ে তাঁকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করলেন। পূঃ মহারাজ আমাদেরও struggle এলে কাতরভাবে ঠাকুরকে প্রার্থনা করতে বলতেন।

১৯৩৯ সালে বেলুড় মঠ এর ষষ্ঠ অধ্যক্ষ পূঃ বিরজানন্দজীর কাছে তিনি দীক্ষিত হন। ভুবনেশ্বরে অবস্থানকালে তাঁর চরিত্রে ভক্তিভাবের বিকাশ হয়। এরপর কলকাতা অদ্বৈত আশ্রমে Worker হয়ে এলেন, যেখানে কাজকর্মের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে আবার অনেক প্রাচীন সাধুর সংস্রবে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল পূঃ নরেশ মহারাজ এর সংস্রবে আসা। পরবর্তীকালে কথাপ্রসঙ্গে আমাদের কাছে এই ঘটনাগুলির উল্লেখ করে পূঃ মহারাজ বার বার বলেছেন, "এ আমার দুর্লভ প্রাপ্তি"।

১৯৭২ সালে আমি সারদা মঠে join করি। পূজঃ মুক্তিপ্রাণা মাতাজীর নির্দেশে পরদিনই বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে যাই। পূজনীয় মহারাজদের অনেকেকেই সেদিন আমার প্রণাম করার সৌভাগ্য হয় । কিন্তু পূজঃ গহনানন্দজী মহারাজ তখন সেবাপ্রতিষ্ঠানে। অবশেষে পূজনীয় মুক্তিপ্রাণা মাতাজীর আদেশে আমি সেবাপ্রতিষ্ঠানে পূজনীয় গহনানন্দ মহারাজকে প্রণাম করতে আসি। খুব ব্যস্ত ছিলেন তবুও সহাস্যে বললেন, বাঃ বাঃ এসে গেছিস, এখন Nursing Hostel-এ বিশ্রাম

কর, খাওয়া দাওয়া কর, ঠিক ৩টার সময় আমার কাছে চলে আসবি। আমার পরিচিতা একজন Nursing Hostel এ ছিলেন। পূঃ মহারাজ তাকে ডেকে আমাকে ওদের ঘরে বিশ্রাম করতে বললেন। দুপুরে সেদিন সেবাপ্রতিষ্ঠানে প্রসাদ পেয়েছিলাম। পূঃ মহারাজ মুক্তিপ্রাণা মাতাজীকে ফোন করে সব জানিয়েছিলেন।

৩টার সময় পূঃ মহারাজের অফিসঘরে আসি, পূঃ মহারাজ আমার আসার প্রতীয়মান ছিলেন। ঘরে ঢুকতেই সাদরে আহ্বান করলেন। কেমন লাগছে সারদামঠ, দুবছর মঠ বাসের মূল্য অসীম। সে সময়টা সুন্দরভাবে কাটাতে হবে। কত জন্মের সুকৃতির ফলে শ্রীমায়ের মঠ-এ এসেছো। তারপর বলতেন, পূঃ মাতাজীদের সেবা করার জন্য সর্বদা এগিয়ে আসবে। স্বামীজির বই পড়াশুনা, শাস্ত্রপাঠ সব ব্যাপারে খোঁজ নিলেন। আরও অনেক ব্যাপারে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিলেন। আবার বললেন, যদি কোন অসুবিধা হয়, আমাকে জানাবি। সাধুজীবন এর মূল্যবান উপদেশ দিলেন : “এ জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজি ও গুরু আছেন। আর কেউ নেই। তাঁদের তোর সব কথা জানাবি। তাঁরাই আমাদের আপনার।” ভালো থাক। আমি ভালো আছি। আমার আশীর্বাদ সবসময়ই আছে—

এবার ফেরার পালা। বাবার মতো খোঁজ নিলেন, একা যেতে পারবো কিনা? আমার উত্তর শুনেও নিশ্চিন্ত না হয়ে দু'জন Sister কে আমাকে ভালো বাসে উঠিয়ে দিতে বললেন। আবার conductor কে stoppage বলে দিতে বললেন। প্রণাম করলাম। মাথায় হাত। চোখে জল নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। পেছনে তাকিয়ে দেখি পূঃ মহারাজ হাতজোড় করে প্রার্থনা করছেন। আবার আসিস, বাসে যেতে যেতে পূঃ মহারাজ এর কথাগুলি মনে করতে লাগলাম। এ আমার পরম প্রাপ্তি।

শিলং আশ্রম থেকে পূঃ মহারাজ সেবা প্রতিষ্ঠানে পূঃ দয়ানন্দ মহারাজ-এর সহকারী রূপে যোগদান করেন। সংঘের প্রাচীন সাধুদের প্রতি পূঃ মহারাজের শ্রদ্ধা, অনুকরণীয়। পূঃ দয়ানন্দ মহারাজ এর যোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন, শিলং এ দরিদ্র পাহাড়ি মানুষদের উন্নতিকল্পে যে সুপ্ত সেবা ও ভালোবাসার ভাব তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল, তারই প্রকাশ বিরাট রূপে সেবা প্রতিষ্ঠানে কাজের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছিল। সংঘের প্রতিটি সদস্যের সুখ দুঃখের সাথী ছিলেন। প্রত্যেক সাধু, ব্রহ্মচারীকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন। সাধু, ব্রহ্মচারীর প্রতি তাঁর প্রাণঢালা ভালোবাসা ছিল। এ ব্যাপারে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। একজন কর্মী, সাধুর ব্যবহারে সবাই যখন বিরক্ত, পূঃ মহারাজ তাঁর আপনার ভাইবলে

সানন্দে তাঁকে নিজের সহকারীরূপে তাঁর কাছে রাখেন। আপাতদৃষ্টিতে কেউ কেউ এ ব্যাপারে আপত্তি করলে, পূঃ গহনানন্দ মহারাজ-এর উত্তর এ সবাই চুপ করে যান। "সাধুজীবন যাপনে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। আর আমার কাছে এক ডজন সেবাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে একজন সাধুর জীবন বেশি মূল্যবান।" পূঃ ভূতেশানন্দ মহারাজ এর একটি মন্তব্য মনে পড়ে—"সেবা প্রতিষ্ঠান মানে স্বামী গহনানন্দ এবং স্বামী গহনানন্দ মানেই সেবা প্রতিষ্ঠান।" এভাবে পূঃ মহারাজ নিজেই একজন প্রতিষ্ঠান হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীভগবানের চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পিত অমূল্য জীবন পূঃ গহনানন্দ এর। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে তাঁর অবদান অপরিসীম। আমি তাঁর চরণে আমার ভক্তি বিনম্র প্রণাম নিবেদন করে শেষ করছি।

গুরুদেবের পূত সান্নিধ্যে

প্রব্রাজিকা বিবেকপ্রাণা

গুরুদেব পরম আশ্রয়, অনন্ত আনন্দ, শাশ্বত সত্যের অনির্বচনীয় ভান্ডার। সে কথা, সে স্মৃতি, সে আশীর্বাণী স্বাদু সুমিষ্ট পদে পদে। যত দীর্ঘ হয় পথ চলা, ততই, প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর করুণা উপলব্ধি হয় বারে বারে। মনে হয় তিনি সত্য, পরম সত্য। ঠাকুর, মা ও স্বামীজির মিলিত ভালবাসা, অনন্ত শক্তি, বল-বীর্য আর অফুরন্ত প্রাণ সবকিছুই প্রবাহিত হচ্ছে তাঁর পবিত্র পাদ-পদ্ম হতে। জগৎ ভুল হয়ে যায় তাঁর ভালবাসার অসীম আনন্দে, হৃদয় হয় উদ্বেলিত, প্রসারিত হয় জীবন। 'আত্মোনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এর জীবন্ত Application যেন তিনি।

ছোটবেলা থেকেই মনে হত ঈশ্বর কিছু করেন না। যা কিছু করার প্রত্যেক মানুষকে নিজেরটা নিজেকেই করে নিতে হয়। মানুষ ইচ্ছে করলে সব পারে। ঠাকুর-মা-স্বামীজিকে ছোটবেলা থেকেই আমার খুব ভাল লাগে। বিশেষ করে স্বামীজিকে। বহুবার 'যুবদিবসে' বহু প্রতিযোগিতায় 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে' (বঙ্গাইগাঁও, আসাম) অংশ গ্রহণ করেছি, সেই সুবাদেই স্বামীজিকে ভাললাগা। বাড়িতে মা-ঠাকুমা শ্রদ্ধেয় ভুতেশানন্দজীর কৃপাধন্যা ছিলেন। আমাদের 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' (বঙ্গাইগাঁও, আসাম)-এ যাতায়াত ছিল। সে বার আসামের গভর্ণর সেবাশ্রমে এসেছিলেন। আমিও মায়ের সাথে গিয়েছিলাম। তখনই শুনলাম, বেলুড়মঠের Vice President শ্রীমদ্ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ দীক্ষা দেবার জন্য বঙ্গাইগাঁও আসছেন। আমার মা জানতেন আমি দীক্ষা নিতে আগ্রহী নই, সেই কারণে ভাই ও দিদিকে দীক্ষা নেওয়ার জন্য বললেও আমাকে কিছু বলেন নি।

সালটা ছিল ১৯৯৫। আমি তখন কলেজের ছাত্রী। সামনেই Part I পরীক্ষা। আমার এক ভাই সেবাশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমার ভাই জানতে চেয়েছিল অন্যান্য মেয়েদের সাথে আমি মহারাজকে welcome জানাতে সেবাশ্রমে যাব কিনা। আমি তক্ষুনি আমার

অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম Part I পরীক্ষার অজুহাতে। সে বলল, আমার গুরুদেবকে দেখলে তোমার ভাল লাগত। আমি রূঢ়ভাবে বললাম আমার দরকার নেই।

মহারাজের আগমনে মা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দুবেলা সেবাশ্রমে যাতায়াত করছেন। এর দুদিন পর বিকেলে পড়াশোনা চলাকালীন হঠাৎ আমার দীক্ষা নেবার তীব্র বাসনা হলো। কিন্তু পরীক্ষা সামনে থাকায় পড়াশোনায় মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মন কিছুতেই স্থির হলো না। তারপর রাতে হলো অদ্ভুত কান্ড। সারারাত ধরে বহু সাধু-মহারাজদের স্বপ্ন দেখলাম। আর দেখলাম আমি দীক্ষা নেবার জন্য সেবাশ্রমে ছোটাছুটি করছি। আর এ ভাবেই হলো সকাল।

আমাদের বাড়ি থেকে সেবাশ্রম মিনিট পঁচিশের হাঁটা পথ। সকাল হতে না হতেই উদভ্রান্তের মতো সেবাশ্রমে পৌঁছলাম। অফিসে যেতেই জানলাম দীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। অফিসে সেই ভাইটির সাথে দেখা। তার কাছে একটা দীক্ষার ফর্ম চাইলাম। ভাইটি আমার কাছে জানতে চাইল, ফর্ম দিদির জন্য না ভাই এর জন্য, আমি বললাম, না, আমার জন্য। সে অবাক হয়ে বলল, দেখলে তো! আমার গুরুদেব তোমাকে তাঁর কাছে কি ভাবে টেনে আনলেন। বিশেষ করে দীক্ষার বইগুলি আমার পড়া না থাকায় অফিস থেকে কেউ আমাকে ফর্ম দিতে চাইলেন না। আর দীক্ষা বললেই কি দীক্ষা পাওয়া যায়! এটাও বললেন। তখন কোন কারণে সেবক মহারাজ সেখানে এসে পড়ায় আমার সমস্যার সমাধান হলো। তিনি অফিসে বললেন আমাকে ফর্ম দিতে আর বললেন বিকেলে Vice President মহারাজের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে। ঠিক বিকেল পাঁচটায় মহারাজ নাট-মন্দিরে এসে বসলেন। ওনার দীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় উপদেশ আমাকে মোহিত করল। তাঁকে দর্শন করে আমি মুগ্ধ হলোম। হলোম আপ্লুত। ১৯৯৫ সালের ২৫শে মার্চ আমার দীক্ষা হয়ে গেল।

প্রত্যেকের মন্ত্র জপ ঠিক হচ্ছে কিনা উনি দেখছিলেন। আর আমাকে English-এ সিলেবেল ভাগ করে মন্ত্রের উচ্চারণ বুঝিয়ে দিলেন। গুরুদেব মন্ত্রের কথা কাউকে বলতে নিষেধ করেছিলেন। কারোর কোন প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন ওনার মন্ত্রের কথা উনি তার স্ত্রীকে কেন বলতে পারবেন না। সে তো তার অর্ধাঙ্গিনী। গুরুদেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে তার ব্যাঙ্কের পাশবই কাউকে দেখায় কি! আরও জানতে চাইলেন তার পেশা কি? সে বলল ডাক্তার। মহারাজ হেসে বললেন, ‘আমার অধীনে অনেক ডাক্তার কাজ করেছে। বিকেলে আমার Saloon এ এস।’

বীজ মন্ত্র পাওয়ার পর আফসোস হতে লাগল। আরও আগে কেন দীক্ষাটা হয়নি। অবশেষে গুরুদেবের গৌহাটি যাওয়ার দিন এসে গেল। যাবার দিন ষ্টেশনে গেলাম মহারাজকে প্রণাম জানাতে। উনি আমাকে হেসে বললেন কি! কেমন? বুঝলাম উনি অন্তর্যামী। আমার মনের সব অবস্থা বুঝতে পারছেন। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরতে হলো।

১৮৯৮-এ এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বেলুড় মঠ স্থাপনের শতবার্ষিকী উৎসবে সুদূর বঙ্গাইগাঁও থেকে বেলুড়ে এলাম। আর বাড়ি ফিরব না, এই অনুমতি নিতে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, তিনি তখন ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে ভুবনেশ্বরে। আমি নিরাশ হলেও, হাল ছাড়লাম না। সারদা মঠে গেলাম। সারদা মঠের President মোক্ষপ্রাণা মাতাজী সেদিন ছিলেন না। শ্রদ্ধাপ্রাণা মাতাজী সব ঘটনা জানার পর আমাকে ফর্ম দিলেন। ফর্ম ফিলাপ করে জমা দিয়ে দিলাম। উনি আমাকে পরে যোগাযোগ করতে বললেন। ভগ্ন হৃদয়ে আমাকে বাড়ি ফিরতে হলো।

১৯৯৯-এর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ, আবার আসাম থেকে কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে এসে গুরুদেবের দর্শন পাওয়ার সৌভাগ্য হলো। একান্ত আমার 'ইচ্ছা' তাঁকে নিবেদন করলাম। উনি ভীষণ খুশি হলেন। কিন্তু আমার ২৫ বছর cross করে গিয়েছিল। মহারাজ আমাকে কলকাতায় নিউ আলিপুর 'শ্রী সারদা আশ্রমে' যোগ দিতে বললেন। শ্রীমায়ের দীক্ষিত মীরাদেবী ও বাণী দেবী প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ এটি। এখানেও সন্ন্যাস হয়। মহারাজ আমাকে বললেন, তোমার উদ্দেশ্য হলো ভগবান লাভ করা। তা তুমি যেখানেই থাক।

২০০০ সালের 1st January আমার জীবনে এক বিশেষ পাওয়ার দিন। ঠাকুরের কল্পতরু উৎসবে, কাঁকুড়গাছিতে গুরুদেবকে প্রণাম করলাম। আমার কাছে নতুন বছরের ডায়রী একটা ছিল। খুব ইচ্ছে আমার পেন দিয়ে উনি ডায়রীতে সই করবেন। টেবিলে অনেক পেন রাখা ছিল। ডায়রীটি মহারাজকে দিতেই, জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কলম আছে? আমি সঙ্গে সঙ্গে Purse থেকে পেন বার করে দিলাম। উনি আমার পেনদিয়েই ডায়রীতে সই করলেন। আমার ভীষণ চাওয়া পূর্ণ হলো।

গুরুদেবের অনুমতি আগেই পেয়েছিলাম। সেই মতো ২০০০ সালের ১৪ই জুন বাড়িতে না বলে, পালিয়ে চলে এলাম কলকাতার শ্রী সারদা আশ্রমে। বাড়িতে না বলে পাশের বাড়িতেও কোনোদিন যাইনি। এইভাবে সকলকে উদ্বেগের মধ্যে রেখে শ্রী সারদা আশ্রমে Join করায় নিজেকে খুব অপরাধী মনে হত। আমার এই ধৃষ্টতায়

বাবা ও কাকু খুশিই হয়েছিলেন। তবে মা গুরুদেবকে প্রায়ই চিঠিতে জানাতেন যাতে আমি শ্রী সারদা আশ্রমে Join করতে না পারি।

মাস দুই পর বেলুড় মঠে গুরুদেবের সাথে দেখা করে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে আসার কথা বললাম। উনি বললেন বেশ করেছো, পালিয়েই সবাই আসে। আমার হৃদয়ের উপর চেপে বসে থাকা অপরাধ বোধের বোঝা সঙ্গে সঙ্গে লাঘব হয়ে গেল। কিছুদিন পর আমার মা গুরুদেবকে আমার সম্বন্ধে অভিযোগ করে বলেছিলেন, ও বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। গুরুদেব হেসে বলেছিলেন, তবে কি আমি কি ওকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো? মা তখন তাঁর জিজ্ঞাসায় সম্মতি জানাতে পারেননি।

এর কিছুদিন পর গুরুদেব আমাকে জপের মালা দিলেন। মহারাজ শুধু দুটি ব্যাপারে আমাকে নিষেধ করেছিলেন। এক, "রাস্তা পার হওয়ার সময় জপ করা"। দুই, "ট্রেনে থাকাকালীন মালা জপা"। কাঁকুড়গাছিতে প্রায়ই গুরুদেবকে প্রণাম করতে যেতাম। বিশেষ করে নববর্ষ, বিজয়াদশমী, গুরুপূর্ণিমার দিনগুলিতে। একবার গুরুপূর্ণিমাতে মহারাজের জন্য আকন্দ ফুলের মালা গেঁথে নিয়ে গেছি। ফুলের পাপড়িগুলি বাদ দিয়ে শুধু মাঝখানের অংশ দিয়ে মালাটি গেঁথে ছিলাম। খুব ইচ্ছে নিজের হাতে গুরুদেবকে মালাটি পড়িয়ে দেবো। প্রথমে তিনি মালাটি হাতে নিয়ে ভাল করে দেখলেন। খুব খুশী হয়ে ছিলেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, কী! মালাটি পড়িয়ে দেবে? আমি তো অবাক। মালাটি ওনাকে পড়িয়ে দিলাম। আবার মহারাজ বললেন, কী ! মালাটা চাই? আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। সাহস করে বললাম, আপনার ব্যবহৃত কিছু চাই, উনি বললেন, আর একদিন এসো। আবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পকেটে হাত দিয়ে নিজের ব্যবহৃত ভাঁজ করা রুমালটি বার করে আমাকে দিলেন। সেদিন খুব আনন্দ নিয়ে আশ্রমে ফিরেছিলাম। পরে গুরুদেব ওনার ব্যবহৃত একটা চাদর আমাকে দিয়েছিলেন।

আমার আশ্রম জীবনে একটা ব্যাপারে খুব আতঙ্ক ছিল। মাতাজী যে কোন অসুবিধায় মহারাজের পরামর্শ নিতেন। আমি একদিন মাতাজীর সাথে গুরুদেবের কাছে গিয়ে আমার আতঙ্কের কথা জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদ চাইলাম। উনি আমাকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

মহারাজের কৃপায় আমার সেই আতঙ্ক দূর হয়েছে। বিশেষ কোন সমস্যায় তাঁর কাছে সমাধান চাইলে, মহারাজ খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কোনটা করা উচিৎ আর কোনটা উচিৎ নয়।

মহারাজ আমাকে M.A. Complete করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নববর্ষের পর মঠে মহারাজকে প্রণাম করতে গিয়েছি। সেদিন একটুও ভক্তদের ভিড় ছিল না। অনেকক্ষণ আমার সাথে কথা বললেন। পরীক্ষা সামনে শুনে অনেকগুলি কলম দেখে বেছে আমাকে একটা দিলেন।

আমি আশ্রমের Medical Department এর দেখাশোনা করতাম। উনি আমাকে Medicine stock এর খাতা Maintainance সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছিলেন।

একবার মঠ-মিশনে আমিষ খাওয়ার ব্যাপারে গুরুদেবকে প্রশ্ন করেছিলাম, জিজ্ঞাসা করেছিলাম মঠ-মিশনে নিরামিষ নয় কেন ?

আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, ঠাকুর-মা-স্বামীজির ধারায় শুধু জপ-ধ্যান করাই নয়, এর সাথে সাথে অনেক গঠনমূলক, সেবামূলক কাজও করতে হয়। এর জন্য চাই সুস্থ শরীর। আর শরীর ঠিক রাখার জন্য চাই তৃপ্তিদায়ক খাবার। কেউ হয়ত একটু আলুসেদ্ধ ভাত খেয়েও অনেক কাজ করতে পারে, আবার কারোর একটু মাছের ঝোল ভাত খেয়েই তৃপ্তি। এরপর গুরুদেব আমাকে ব্যাধের গল্পটা শুনিয়ে ছিলেন। ব্যাধ মাংস বিক্রি করত কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী ছিল।

একবার গুরুপূর্ণিমার সময় গুরুদেব অমরনাথ গিয়েছিলেন। মহারাজকে ফুল-বেল পাতা দিয়ে প্রণাম করেছিলাম। উনি আমার মাথায় অনেকক্ষণ ধরে হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। সেদিন মহারাজ খুব আস্তে আস্তে অমরনাথ দর্শনের কথা আমাকে বলেছিলেন। "মেষপালক মেষ চরাতে গিয়ে অমরনাথ দেবকে আবিষ্কার করেছিল" সেই গল্প, সেদিন মহারাজ আমার সাথে অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন। আর এদিকে সেবক-মহারাজ বারবার এসে বলছিলেন, মহারাজ ! আর নয়। আর মহারাজ হাত তুলে সেবক-মহারাজকে থামিয়ে দিচ্ছিলেন। সেবক-মহারাজ আবার এসে বললেন, ভক্তরা সব অপেক্ষা করছে। ঐ দিনটি আমার কাছে এক বিশেষ দিন। আজও আমি আমার মাথায় মহারাজের হাতের স্পর্শ অনুভব করি।

আমি কখনও চাইতাম না গুরুদেব President হন। কারণ জানতাম বেলুড় মঠে থেকে উনি আমাদের বেশি সময় দিতে পারবেন না। গুরুদেব যিনি কোথাও যান না, আসেনও না। তিনি হলেন সদা সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান এক অনন্ত সত্তা। এই অনন্তসত্তার শ্রী পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে শেষ করলাম।

গুরুদেবের সাথে টুকরো টুকরো স্মৃতিঃ

প্রব্রাজিকা শুদ্ধাপ্রাণা

আমি একবার গুরুদেবের সাথে একান্তে দেখা করার জন্য রাঁচী থেকে এসে বেলুড় মঠে গেষ্ট হাউসে ছিলাম। পরের দিন সকাল ১১ টার সময় কাঁকুড়গাছিতে আমার দেখা করার আগে একটি মেয়ে তাঁর সাথে দেখা করেন। সে বেরিয়ে এলে আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম। মহারাজ কী বললেন? মেয়েটি আমায় উত্তর দিল, 'মহারাজ না ঘুমিয়ে পড়েছেন! দরজা থেকে ভিতরে যেতে বলাতে, আমি সংশয় নিয়ে ভিতরে ঢুকলাম, গুরুদেবকে তাহলে আমার কথাগুলো কীভাবে বলবো—উনি তো ঘুমাচ্ছেন! যাহোক গুরুদেবের কাছে গেলাম দেখলাম—কোথায় ঘুমাচ্ছেন...! উনি তো আমার সাথে প্রাণ খুলে কথা বললেন, উত্তর দিচ্ছেন সকল প্রশ্নের ভাবলাম মেয়েটি বুঝতেই পারলো না—গুরুদেব হঠাৎ করেই সমাধিমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। অনেক অনেক আশীর্বাদ আর আনন্দ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

২০০৩ সালের মার্চ মাসে আমি বেলুড়ের গেষ্ট হাউস থেকে কাঁকুড়গাছিতে গিয়েছি। গুরুদেবের সাথে দেখা হলো, কথাবার্তা হলো। আসার সময় উনি আমায় বললেন, আগামীকাল সকাল ১১ টার সময় তুমি এসে আমার সাথে দেখা করবে। আমি 'আসব'বলে সম্মতি দিলাম। পরের দিন যথারীতি ১১টার সময় আমি তাঁর ঘরে গেলাম প্রণাম করে পায়ের কাছে বসলাম। উনি আমাকে বললেন, "আমি আজ ভোরে একটি স্বপ্ন দেখেছি, দেখলাম—শ্রীশ্রীঠাকুরের মায়ের শরীরের ভিতর একটি শিবমন্দির থেকে উজ্জ্বল একটি জ্যোতি ঢুকে পড়ল—আর এই স্বপ্নটা বলার মাঝে সেবক মহারাজ এসে তাকে বললেন এ ঘটনাগুলো তো বইয়ে আছে, গুরুদেব হাত নেড়ে তাকে চলে যেতে বললেন—সেবক মহারাজ তখনো বলে যাচ্ছেন দীর্ঘ লাইন বাইরে অপেক্ষা করছে, আপনি কি সব একেই দিয়ে দেবেন? তখনো গুরুদেব একই ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তাকে চলে যেতে বললেন, সেবক মহারাজ চলে গেলেন। গুরুদেবের এটি যে নিজের

ভোরে দেখা স্বপ্ন—তিনি আমায় ব্যাখ্যা করছেন একথা তো আমি আর গুরুদেব ছাড়া আর কেউ জানত না। অনুভূতিটা প্রখর হয়েছিল সেদিন। আধ্যাত্মিক জীবন যে পুরোটাই অনুভবের বিষয়—সেদিন যেন মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল।

আশ্রম জীবন যাপনের প্রথম দিককার একটি মধুর স্মৃতি গুরুদেবের সাথে। আমি তাঁর সাথে দেখা করে বলেছিলাম, গুরুদেব, জপ করতে করতে আমার ঘুম পায়, আমি কি করবো? তৎক্ষণাৎ উনি উত্তর দিলেন, 'শোনো—চোখে লংকা গুড়ো দিয়ে জপে বসবে?" আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। উনি তখনো হাসছেন খুব তাঁর রসবোধ ধরা পড়েছিল আমার কাছে এ সকল স্মৃতি নিয়ে পথ চলা শুরু আধ্যাত্মিক জীবনের, যা আগামী দিনের পথপ্রদর্শক।

ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

প্রব্রাজিকা অর্ঘ্যপ্রাণা

গুরু সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ
লভেদবাঞ্ছিতার্থং পদং ব্রহ্মসত্ত্বং
গুরেণরুক্তবাক্যে মনো মস্য লগ্নম্।।

কৃপা করে গুরুদেব তাঁর চরণে আশ্রয় দিয়েছেন। স্মরণে মননে তিনি আমার সঙ্গে আছেন, তাঁর অমৃতবাণী জীবনের পাথেয়। তাঁর স্থূল শরীরে যতটা সান্নিধ্য উপলব্ধি করেছি সূক্ষ্ম শরীরে আরও বেশি উপলব্ধি করছি। শ্রদ্ধেয় স্বামী তৎপরানন্দজী মহারাজ যখন বললেন গুরুদেবের কিছু স্মৃতিচারণ করতে তখন আমার শিবমহিম্ন স্ত্রোতের শ্লোক :

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুনানামীশ পারং ন যাতি।।

মনে পড়ল। আমার কী যোগ্যতা আছে তাঁর কথা লিখি। তবু মহারাজজীর অনুরোধে গুরুদেবের প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি, আমার এই স্মৃতিচারণ।

গুরুদেবের কৃপা পাওয়ার পর যোগোদ্যান মঠে আমি প্রায়ই যেতাম। আমার যোগোদ্যান-এ দীক্ষা হয়। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম ইষ্ট দেবকে হৃৎপদ্মাসনে বসাব তাঁর Front Face কোনদিকে থাকবে? মানসিক পূজার সময় আমি বসব কোন দিকে, তিনি তো হৃৎপদ্মাসনে বসে আছেন, আমার Front Face কি আমার স্থূল শরীরের দিকে হবে...নানারকম প্রশ্ন। তিনি শুনছেন আর হাসছেন, দিব্যজ্যোতিতে তাঁর মুখমন্ডল পূর্ণ। ধীর স্বরে বললেন, "আমি আমি করছ, তুমি কে? তুমি তো আত্মা।" আমি আত্মা তাঁর কথা অনুভব করাই যজ্ঞ। যতদিন যাচ্ছে বুঝতে পারছি। এই যজ্ঞ সম্পাদনের

জন্য তিনি যে মন্ত্র দিয়েছেন তার অবিরাম জপই উপায়।

আরেকদিন তাকে আমার এক দুর্বলতার কথা বলেছিলাম। আমার ভীষণ .... এর ঝোঁকে। সন্ধ্যাবেলায় জপ করে উঠেই উল বুনতে বসতাম। আমার তখন মনে হয়েছিল যে Wooler Garments কিনতে পাওয়া যায়, আমি আরও বেশিক্ষণ জপ না করে এসবে মন দিচ্ছি। কিন্তু মনটাকে control করতে পারছিলাম না। গুরুদেবের চরণে মনের এই দুর্বলতা নিবেদন করলাম। গুরুদেব হেসে বললেন, ভালো তো বুনবে জপ করবে। টুপি, সোয়েটার করে গরীব বাচ্চাদের দেবে। আজও তাঁর এই উপদেশ মেনে চলি। আরও কত অমৃতবাণী তাঁর থেকে শুনেছি। যত বয়স হচ্ছে বুঝতে পারছি তাঁর বাণী হৃদয়ে অনুভব করা এবং মন প্রাণ দিয়ে পালন করাই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁর কৃপাতে সব সম্ভব—আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পরিশিষ্ট

মৃদুভাষী, দুঃসাহসী

শংকর

ত্রয়োদশ সংঘগুরুর দেহাবসানের ঠিক এক মাস পরে বিশ্বের নবীনতম সন্ন্যাসীসংঘ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন তাঁদের পরবর্তী প্রেসিডেন্টকে বরণ করলেন। বুধবার সকালে, একালের নতুন তীর্থ বেলুড় মঠে প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টিরা ৮৯-এ পা দেওয়া যে মানুষটির ওপর দায়িত্বভার তুলে দিলেন তাঁকে নিয়ে কোনও মহলে বিন্দুমাত্র মতদ্বৈধ ছিল না। নতুন সংঘগুরুর আনুষ্ঠানিক নাম শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দ পুরী। প্রিয় পরিচয় নরেশ মহারাজ। প্রতিষ্ঠাতার ডাকনাম ছিল নরেন, তাঁর নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্টের প্রিয় নামও রাজা, আর চতুর্দশ মাঝি হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানকে কালসমুদ্রে ভাসমান রাখার দায়িত্ব যাঁর ওপর পড়ল, তাঁরও ডাকনাম নরেশ।

মহারাজের জন্ম ১৯১৬ সালে মহাষ্টমীর দিনে বাংলাদেশের পাহাড়পুরে। শিলেটিরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের সীমাহীন অথচ নিঃশব্দ সমর্থন জানিয়েছেন মঠ ও মিশনকে। পূর্বাশ্রমে স্বামীজির নাম ছিল নরেশরঞ্জন রায়চৌধুরী। রামকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ এঁদের বংশে, এক দাদা কেতকী মহারাজ (স্বামী প্রভানন্দ) ছিলেন শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য, ১৯২৪ সালে খাসিয়া পাহাড়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপন করেন। নরেশরঞ্জন যখন ভুবনেশ্বর মঠে স্বামী বিরজানন্দের সাক্ষাৎ পেলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩। মাত্র দু'মাসের মধ্যে বিরজানন্দ তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। ব্রহ্মচর্য শুরু হলো ১৯৪৪, মঠ-মিশনের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট বিরজানন্দ তাঁর নাম দিলেন অমৃতচৈতন্য, সন্ন্যাস পেলেন ১৯৪৮ সালে, গহনানন্দ নামটিও স্বামী বিরজানন্দের উপহার। সন্ন্যাসের আগের দিনে আত্মশ্রাদ্ধ, সেই সঙ্গে স্মরণে এল স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি : "সংসারে আজ থেকে এদের মুক্তি হলো, কাল থেকে এদের নূতন দেহ, নূতন চিন্তা, নূতন পরিচ্ছদ হবে—এরা ব্রহ্মবীর্যে প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলন্ত পাবকের মতো অবস্থান করবে।" আরও আছে বিবেকানন্দের বাণী রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদের প্রতি : "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়

চ' আমাদের জন্ম; কী করছিস সব বসে বসে ? ওঠ—জাগ, নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর, নরজন্ম সার্থক করে চলে যা।"

গহন শব্দটির অর্থ যদি গভীর হয় তা হলে যোগ্য নামেরই অধিকারী হয়েছেন গহনানন্দ। নিতান্ত অল্পকথার মানুষ, আলাপচারিতায় বা ভাষণে তেমন চাকচিক্য নেই, বাগাড়ম্বর অনুপস্থিত, কিন্তু যা বলেন তা সোজাসুজি হৃদয় স্পর্শ করে।

সেই ১৯৩৯ সাল থেকে সন্ন্যাস জীবনে কত কঠিন কাজ যে করেছেন গহনানন্দ, কিন্তু সে সব নিয়ে কথাও বলেন না। দশ বছর কেটেছে অদ্বৈত আশ্রমের কলকাতা কেন্দ্রে, যুদ্ধের সময় একটুকরো কাগজ পাওয়া যেত না, এরই মধ্যে ইংরেজি মুখপত্র প্রবুদ্ধ ভারত ও ইংরেজি প্রকাশন বিভাগকে কোনওক্রমে বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছে। এর পরে শিলং সেন্টারে পাঁচ বছর নিঃশব্দ সেবাকাজ। তারপর এল মস্ত চ্যালেঞ্জ—দক্ষিণ কলকাতায় স্বামী দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। প্রথম পাঁচ বছর ছিলেন স্বামী দয়ানন্দের সহকারী এবং পরে একটানা বাইশ বছর সেক্রেটারি। তখন বড় কঠিন সময়, প্রবল আর্থিক দুরবস্থা, প্রায়ই হাসপাতালের কর্মীদের মাইনে দেবার টাকা থাকত না। কিন্তু চরম সংকটেও কেউ গহনানন্দকে বাহ্যত উদ্বিগ্ন হতে দেখেননি। শোনা গেল একটা গল্প। হাসপাতালে প্রচণ্ড আর্থিক সংকট, এরই মধ্যে স্বামী গহনানন্দ হাসপাতাল বাড়াবার স্বপ্ন দেখছেন! এই সময় একদিন ময়লা হাফশার্ট-পরা এক ভদ্রলোক আচমকা এলেন সেবা প্রতিষ্ঠানে। তাঁকে দেখে গহনানন্দ মনে করলেন সাহায্যপ্রার্থী। কিন্তু লোকটি বললেন আমি কিছু সাহায্য করতে চাই, একটা চেক এনেছি। চেক দেখে নরেশ মহারাজ তাজ্জব। ৫-এর পরে আটটি শূন্য বসানো অর্থাৎ পঞ্চাশ লাখ টাকা। মহারাজ ভাবলেন লোকটি পাগলামি করতে এসেছে। কিন্তু জানা গেল, লোকটির স্ত্রী এক বছর আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এক বছরে ব্যবসায়ে যা লাভ হবে তার সব একটা ভাল কাজে ব্যয় করতে হবে। গল্পটা বিশ্বাস না হওয়ায় চেষ্টা করে সুদূর গঙ্গোত্রীর কাছে তীর্থযাত্রী নন্দলাল তাঁতিয়ার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলো। তিনি তারিখটাও বলে দিলেন, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭৭। নরেশ মহারাজের প্রবল ভক্ত, এখনও তীর্থ করে বেড়াচ্ছেন। নরেশ মহারাজের সংস্পর্শে এসে জীবনটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে।

৫০০ শয্যার সেবা প্রতিষ্ঠানের যে চেহারাটা এখন আমরা দেখি সেটার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নরেশ মহারাজের সাতাশ বছরের নিঃশব্দ সাধনা। হাসপাতাল তাঁর এতই প্রিয় ছিল যে মঠ ও মিশনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বে এসেও তিনি সেবা প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম দায়িত্ব

পালন করে গিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে।

প্রথম শ্রেণির সংগঠকের দুর্লভ ক্ষমতা নিয়ে নরেশ মহারাজ ১৯৭৯ থেকে মঠ-মিশনের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেছেন; প্রথমে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও ১৯৮৯ থেকে তিন বছর জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে। ১৯২২ থেকে তিন সংঘের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই সময় থেকে গত মঙ্গলবার পর্যন্ত তিনি কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের দায়িত্বেও ছিলেন। মঙ্গলবার অপরাহ্ণে দীর্ঘদিনের সেবক আত্মনিষ্ঠানন্দকে নিয়ে স্বামী গহনানন্দ বেলুড়ে ফিরে এসেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্দশ মাঝির দায়িত্ব গ্রহণ করতে।

যাঁরাই নরেশ মহারাজের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরাই বলেন, অদ্ভুত এই মানুষটিকে কেউ কখনও রাগতে বা ধৈর্যচ্যুত হতে দেখেননি। এত কম খান যে অনেকে জিজ্ঞেস করে, কে জানে কী করে বেঁচে থাকেন ? অথচ ৮৯-তে পা দিয়েও মেশিনের মতো খেটে যান হাসিমুখে। যত রাত পর্যন্ত কাজ হোক ভোর সাড়ে তিনটেয় উঠে জপতপ শুরু করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সর্বদাই গোছানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ফিটফাট। সব ব্যাপারে পারফেকশন চান, সব দিকে নজর, হলের মধ্যে হাঁটতে-হাঁটতে কোথাও একটা ছবি বাঁকা টাঙানো থাকলেও নজরে পড়ে যায়। স্বল্পভাষী মানুষটি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের বড়ই আপনজন। যে কেউ সাহায্য বা উপদেশ চাইলে এগিয়ে আসবেনই। মন্ত্রদীক্ষা দানে বিপুল নিষ্ঠা মহারাজের—দেশে এবং বিদেশে ইতিমধ্যেই ১,২৯,০০০ দীক্ষা দিয়েছেন, যা মঠ ও মিশনের ক্ষেত্রে একটি রেকর্ড।

মৃদুভাষী মানুষটিকে দেখলে মনে হয় না যে ওঁর মধ্যে একটি দুঃসাহসী সন্ন্যাসী বিরাজ করছে। কয়েক বছর আগে দিল্লিতে হার্টের বাইপাস সার্জারি হলো। কয়েক মাস পরে কাউকে কিছু না বলে কাশ্মীরের শ্রীনগর হয়ে দুর্গমতীর্থ অমরনাথ ঘুরে এলেন। যা করবেন ঠিক করেন তা করবেনই—শ্রীহট্টের মানুষরা বোধ হয় এই রকমই হন।

স্বামী গহনানন্দের পূর্ববর্তী তিন প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন যথাক্রমে ৮৫, ৮৭ এবং ৮৯ বছরে। নতুন সংঘগুরুও দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ৮৯-তে পা দিয়ে। প্রবীণ শরীরেও চিরতারুণ্যের যে ধারাবাহিকতা তাঁর তিনজন পূর্বসূরি সুনিশ্চিত করে গিয়েছেন তা যে এবারেও অব্যাহত থাকবে এ-বিষয়ে কোথাও কোনও সন্দেহ নেই।

অমৃতবাজার, ২৬.০৫.০৫

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নতুন প্রেসিডেন্ট মহারাজ

'পারফেকশনিস্ট' শব্দটার সঠিক প্রতিশব্দ খুঁজতে যদি সমস্যা হয়, তাহলে মনে রাখলেই হবে এই শব্দটির এক সমার্থক শব্দও রয়েছে—স্বামী গহনানন্দ। খুঁটিনাটি প্রতিটি দিকে তীক্ষ্ণ নজর। সামান্য ভুল-ত্রুটি মেনে নিয়ে এড়িয়ে যাওয়া তাঁর চরিত্রবিরোধী। বেলুড় মঠের স্বামী ঋতানন্দ বলেছিলেন, সন্ন্যাসীরা একসঙ্গে খেতে বসার সময় হয়তো বাইরের কোনও অতিথিও আছেন, সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ অথবা কোনও অতিথি খেতে বসে সামান্য নড়াচড়া করলেই গহনানন্দজী বুঝতে পারেন কার কী প্রয়োজন। কী চাওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন না করে স্রেফ মুখ দেখে তিনি বুঝে যান কার একটু লবণ লাগবে। কে জল চাইছে। এবং কী আশ্চর্য, তিনি কাউকে বলার পরিবর্তে নিজেই উঠে লবণ বা জল দেওয়ার উদ্যোগ নেবেন।

তাঁর মতো স্বল্পাহারী বিরল। রসনা বলে যে মানব শরীরে কিছু আছে তা গহনানন্দজীকে দেখে বোঝাই যাবে না। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যও যেটুকু দরকার, সম্ভবত সেটুকু খাবারও তিনি খান না। আর, আজ পর্যন্ত কোনওদিন কোনও খাবার খেয়ে মন্তব্য করেননি। ভালো বা মন্দ কিচ্ছু না। খাবার বিষয়ে তিনি নির্লিপ্ত। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের একবার বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করা হবে। বিকেল চারটেয় রিপোর্ট পাঠ এবং সদস্যদের কপি দেওয়া হবে। রিপোর্টে চোখ বোলাতে গিয়ে গহনানন্দজী আবিষ্কার করলেন বেশ কিছু ভুল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সুজিত মহারাজকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, সুজিত এগুলোর সংশোধন দরকার। প্রেসকে বলে দিতে হবে। সুজিত মহারাজ প্রমাদ গুণলেন। আর কয়েক ঘন্টা পর রিপোর্ট পেশ। এখন পাঠিয়ে সংশোধন কী ভাবে সম্ভব? গহনানন্দজী কিন্তু অনড়, সুজিত মহারাজ 'দেখি কী করতে পারি' ভেবে চিন্তিত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। বহু চেষ্টা করেও প্রেসে সেগুলির সংশোধন সম্ভব হলো না।

বৈঠকের আগে গহনানন্দজীকে বলা হলো, মহারাজ আপনি আজ পাঠ করে দিন, আমরা পরে সংশোধন করে নেব। মহারাজ হেসে বললেন, আমি ভুল রিপোর্ট পাঠ করব কেন? আমি এর মধ্যে আমার কপি সংশোধন করে নিয়েছি। সেটা পাঠ করব।

তোমরা অন্যদের বলে দাও কপি পরে দেওয়া হবে। সত্যিই দেখা গেল অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ওই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর নিজের কপির সবটাই সংশোধন করে নির্ভুল করে তুলেছেন এবং সেই ত্রুটিহীন রিপোর্টই নিজে পড়লেন।

গত কয়েক বছর তিনি অসুস্থ হয়েছেন। কিন্তু এর আগে কেউ কখনও তাঁকে ওষুধ খেতে দেখেনি। জপমন্ত্র, মঙ্গলারতি দর্শনে কখনও ব্যত্যয় হয়নি। সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন সারারাত জেগে কাজ করেও বেলুড়ে ভোর চারটেয় মঙ্গলারতিতে তিনি ঠিক হাজির হয়ে যেতেন। জপ না করে কখনও আহার গ্রহণ করবেন না। নিরভিমান, সংযম এবং বিনয় কোন পর্যায়ে গেলে খড়ম পরেও কেউ নিঃশব্দে হেঁটে যেতে পারেন? হ্যাঁ, গহনানন্দজী হেঁটে গেলে কেউ টের পাবেন না। শব্দ করে হাঁটাকে তিনি ঠাট্টা করে বলেন, 'আমি'র বিজ্ঞাপন।

আমিত্বের অহংকার থেকে জীবনভর নিজেকে বিযুক্ত রাখতে পারা নতুন অধ্যক্ষ মহারাজের অন্তরের ধ্রুবপদ আজীবন একটাই—শিবজ্ঞানে জীবসেবা।

সকলেই আড়চোখে বারবার তাকাচ্ছেন ওই যুবকের দিকে। কমলা রঙের সিল্কের একটা অদ্ভুত পোশাক। অনেকটা আলখাল্লার মতো। মাথাও ওই একই রঙের পাগড়িতে ঢাকা। প্রায় সাত হাজার মানুষ শ্রোতাদের আসনে বসে আছেন। এছাড়াও দাঁড়িয়ে আছেন বহু। হলো অব কলম্বাস নামে শিকাগো শহরের আর্ট ইনস্টিটিউটের এই সভাঘরে বিশ্বমেলা উপলক্ষে এক ধর্মমহাসভার আয়োজন করা হয়েছে। পৃথিবীর সব দেশ থেকে অসংখ্য ধর্মের প্রতিনিধিরা হাজির হয়েছেন। ভারতবর্ষ থেকেও এসেছেন। তবে বৌদ্ধ, জৈন, থিওসফিস্ট এবং ব্রাহ্মধর্মের পণ্ডিতদের দেখা যাচ্ছে মঞ্চে। হিন্দুধর্মের কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ভারতে এই ধর্মটি নিয়ে নানারকম দলাদলির খবর কানে এসেছে এই সম্মেলন উদ্যোক্তাদের। তাই আর নির্দিষ্ট কোনও সংঘকে ডাকা সম্ভব হয়নি। কিন্তু হলের মধ্যে চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে ওই কমলা রঙের অভিনব পোশাক পরা যুবা নাকি হিন্দুধর্মেরই প্রতিনিধি। যুবকটির বয়স যে কম, তা মুখের উজ্জ্বলতা এবং দৃপ্ত দেহ ভঙ্গিতেই পরিষ্কার। অনেকটা গ্রিক ভাস্কর্যের মতো টানা টানা চোখ, উন্নত নাসা। একটা তেজস্বী ব্যক্তিত্ব রয়েছে। লক্ষ্য করা গেল অধিবেশনের প্রথম পর্বে যুবকটি কিছুতেই বলতে চাইল না। বাইরে থেকে তেজদীপ্ত অভিব্যক্তির এই যুবক আসলে কিন্তু যথেষ্ট নার্ভাস হয়ে রয়েছে। এই মঞ্চে তাঁর এসে পৌঁছানোটাই এক রোমাঞ্চকর কাহিনীর মতো। সে কী বলবে তার জন্য কোনও প্রস্তুতি নিয়ে আসেনি। অসামান্য জীবনীশক্তি, জেদ ও লক্ষ্যপূরণের নিষ্ঠাই তাঁর সম্বল। সকলেই কিন্তু প্রচুর উদ্ধৃতি, ধর্মগ্রন্থের উপদেশ গড়গড় করে বলে বাগ্মিতার পরিচয় দিচ্ছেন। অবশেষে দ্বিতীয় অধিবেশনে যুবকটির ডাক পড়ল। চোখ বন্ধ করে দেবী সরস্বতীকে

স্মরণ করে যখন হাজার হাজার কৌতূহলী চোখের সামনে রোস্ট্রামে এসে উপস্থিত হলো সেই মুহূর্তে তাঁর মুখভঙ্গী পালটে গিয়েছে। এক অপার্থিব আত্মবিশ্বাস ঠিকরে বেরোচ্ছে। 'আমার আমেরিকানিবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ....'। সম্বোধনের পরই যে হাততালির জোয়ার শুরু হলো তা আদতে শেষ হলো না বলা যায়। কারণ ওই মুগ্ধতা আজও শেষ হয়নি। আজ তা বিস্ময়ে পরিণত। ১৮৯৩ সালের ১১সেপ্টেম্বরের সেইদিন ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, চেতনা সম্পর্কে বিশ্ববাসীর কাছে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো ওই যুবা স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক ঘটনার ঠিক ১০০ বছর পর ওই যুগান্তকারী ঘটনার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে শিকাগোতেই যে ধর্মসভার আয়োজন হলো সেখানে অন্যতম সম্মানীয় অতিথি হিসেবে যিনি আসন অলঙ্কৃত করলেন তিনি স্বামী গহনানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ মহারাজ। শ্রীহট্টের এক গ্রাম থেকে রামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত মহাসংঘের সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে এসে পৌঁছানোর এই সফর আসলে জীবনচর্চার এক অসামান্য শিক্ষা। স্বামী গহনানন্দ এমন একজন মানুষ, যাঁর জীবনচর্যাই হতে পারে এক আবশ্যিক পাঠ্যবই। মানব চরিত্রের আদর্শ গুণাবলীর প্রায় সবটাই তাঁর করায়ত্ত। তাঁকে কেউ কখনও রাগতে দেখেনি। উদ্বিগ্ন হলেও তাঁর অভিব্যক্তি থেকে প্রশান্তি এতটুকু বিচ্যুত হয়নি। এবং অভয় দানের এক অলৌকিক উদ্ভাস তাঁর চরিত্রে। তাঁর কাছে সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হওয়ার পর প্রত্যেকেই আশ্বস্ত হয়ে ফিরেছেন। এ দৃশ্য রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে যোগোদ্যান মঠ সর্বত্রই বহু চর্চিত।

১৯১৬ সালে বাংলাদেশের শ্রীহট্টের পাহাড়পুর গ্রামে মহারাজের জন্ম। পূর্বাশ্রমের নাম নরেশরঞ্জন রায়চৌধুরী, শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ আন্দোলনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। সারদা মায়ের প্রচুর ভক্ত এবং শিষ্য শ্রীহট্টের বিভিন্ন অংশে বাস করতেন। ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনিই পরবর্তীকালে স্বামী প্রেমেশানন্দ। তাঁর রচিত ভক্তিগীতি মায়ের প্রিয় তো ছিলই, এমনকী বেশ কিছু গান সংঘের নানা অনুষ্ঠানে গাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। এছাড়া স্বয়ং স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজও শ্রীহট্টেরই ভক্ত। এই পরিমণ্ডলের সঙ্গে অনুঘটকের মতো নরেশরঞ্জনের জীবনে প্রতিভাত হলেন তাঁর নিজেরই সম্পর্কিত দাদা কেতকী মহারাজ। স্বামী প্রভানন্দ। তিনি মেঘালয়ে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি গারো, খাসিয়া পাহাড়ের বাসিন্দা দরিদ্র আদিবাসীদের সামাজিক উন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ অনুরাগীরা তখন শ্রীহট্ট থেকে চেরাপুঞ্জি, সোবারপুঞ্জি, শেলা প্রভৃতি স্থান দিয়ে এইসব এলাকার হিন্দু প্রভাবিত আদিবাসীদের জীবনের মানোন্নয়নে একনিষ্ঠ কাজ করে যাচ্ছেন। কেতকী মহারাজ বাল্যেই গৃহত্যাগ করেন। নরেশরঞ্জন তাই বাল্য থেকেই পারিবারিক আবহের জেরে মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার বাসনা পোষণ করতেন।

কৈশোর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই চলে গেলেন কলকাতায়। দাদা কলকাতা শহরেই চাকরি করতেন এবং দাদা-বউদির সংসারে নরেশরঞ্জন থিতু হলেন। কিন্তু মন থিতু হতে দিল কই? অনবরত নিশির ডাকের মতো বিশ্বজগতের আহ্বান। আর্ত, আতুর, দুঃস্থ, অসুস্থদের দেখলেই তাঁর অন্তরে দহন শুরু হত। অবশেষে ১৯৩৯ সালে ২৩ বছর বয়সে সিদ্ধান্ত আর নয়, এবার সংসার ত্যাগ। বউদি অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে নরেশরঞ্জন সোজা ভুবনেশ্বর আশ্রমে। স্বামী নির্বাণানন্দের চরণে নিজেকে নিবেদিত করে বললেন, আমি মানুষের সেবায় কাজ চাই। এরকম সহজ ও সোজা কথায় মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করার মতো মনের জোর যাঁর তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা কীভাবে সম্ভব ?

১৯৩৯ সালেই স্বামী বিরজানন্দ তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা অর্পণ করলেন। স্বামী নির্বাণানন্দের সেবায় নিযুক্ত হলেন। তখন ভুবনেশ্বর জঙ্গলাকীর্ণ। মঠের মন্দির থেকে অনেকটা দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা ঘর। সেটাই তপস্যা কেন্দ্র। স্বামী নির্বাণানন্দ প্রতি রাতে সেখানে জপতপের জন্য যেতেন। আর একমাত্র স্বামী গহনানন্দকেই সঙ্গে নিতেন। কারণ হ্যারিকেন নিয়ে সেই জঙ্গলের মধ্যে সারারাত জেগে থাকতে পারবে একমাত্র এই নবীন সন্ন্যাসীই। এই ছেলেটির যেন শরীর বোধই নেই।

১৯৪৪ সালে ব্রহ্মচর্য শুরু। নতুন নাম হলো অমৃতচৈতন্য। ১৯৪৮ সালে সন্ন্যাসে দীক্ষিত হওয়া অমৃতচৈতন্যের এক মহাসফর শুরু হলো। নাম হলো স্বামী গহনানন্দ। এদিকে কঠিন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে নিরুদ্বেগে পাহাড়প্রমাণ প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যাওয়ার অভ্যাস তার চরিত্রে আগেই প্রতিফলিত। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে দীক্ষিত হওয়াটাই যেন সম্পূর্ণ নয়। স্বামী গহনানন্দ বারবার স্বামীজির একান্ত অভিলাষগুলির রক্ষণ এবং রূপায়ণেই যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

একবার আল্পস পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ মুগ্ধ হয়ে ভাবলেন, আহা এরকম পাহাড়ের কোলে যদি একটা আশ্রম হত। ক্যাপ্টেন সেভিয়ার এবং তাঁর স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলেন স্বামীজির এই অভিলাষ পূর্ণ করতে হবে। আলমোড়া থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে মায়াবতীতে সেই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলো। স্বামীজি চেয়েছিলেন এখানে কোনও মুর্তি পুজো হবে না। হবে বেদান্তচর্চা, দর্শনের শিক্ষা। এছাড়া ১৮৮৬ সালে মাদ্রাজে স্বামীজি একটি সংঘ মুখপত্র প্রকাশ করেন। প্রবুদ্ধ ভারত। সম্পাদক ছিলেন ভি. আর. রাম আয়ার নামে এক ২৪ বছরের যুবক। তাঁর অকালপ্রয়াণে পত্রিকা প্রকাশ সংকটে পড়ে। ঠিক হয় সেই প্রবুদ্ধ ভারত প্রকাশ হবে মায়াবতী থেকে। সেই পাহাড়ে ১৪০ কিলোমিটার হেঁটে হেঁটে ছাপার জন্য নিয়ে যেতে হত।

১৯২০ সালে কলেজ স্ট্রিটে ঘর ভাড়া করে ছাপার ব্যবস্থা হলো। এরপর মুক্তারামবাবু স্ট্রিট হয়ে, ওয়েলিংটন লেনে। এখন যেখানে অদ্বৈত আশ্রম তার আগে ওয়েলিংটনে ছিল এই আশ্রম। ১৯৪২ সাল থেকে এই অদ্বৈত আশ্রমে কর্মরত ছিলেন স্বামী গহনানন্দ। ভাড়াবাড়িকে সংঘের নিজস্ব পরিচয়ের স্বীকৃতি দিতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে এই বাড়িটি কিনে নিতে সমর্থ হন স্বামী গহনানন্দ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালের ওই সংকটে নিয়মিত প্রবুদ্ধ ভারত প্রকাশের জন্য হাজারো সমস্যার মোকাবিলা করেছেন তিনি। একটু আগেই বলেছি স্বামীজির অন্তরের ইচ্ছেগুলিকে যেনতেন প্রকারেণ বাস্তবায়নের এক অদম্য স্বপ্ন বুকে পালন করেন স্বামী গহনানন্দ (নরেশ মহারাজ)। তাই ১৯৫৩ সালে শিলং মঠে গিয়ে প্রথম থেকে শুরু করে দিলেন প্রান্তিক মানুষের চিকিৎসা। ঠাকুর বলতেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না, তাই মোটা ভাত কাপড়ের প্রয়োজন।

মানব জীবনের ওই সারসত্যটি স্বামীজিও উপলব্ধি করে বহুবার সেই পথেই এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নরেশ মহারাজ ওই উপদেশকে জপমন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেন। তাই শিলং পাহাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিদিন ঘুরে ঘুরে আদিবাসী, দরিদ্র মানুষের জীবনযাপনের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। মোবাইল মেডিকেল তখন এত আধুনিক ছিল না। তাই পাহাড়ের পর পাহাড় হেঁটে চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ওষুধের ব্যাগ নিয়ে বসতেন গাছতলায়। এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে এই নিরন্তর পথচলায় তাঁর একমাত্র ক্লান্তির অবসান হত যখন দেখতেন সুস্থ হয়ে বৃদ্ধ-শিশু-মহিলারা আবার জীবনের ছন্দে ফিরছে।

শিলং পর্বের পরই নরেশ মহারাজের কর্মযজ্ঞের ইতিহাসের নতুন দিগন্তের সূত্রপাত হলো। আর্ত ও অসুস্থদের সেবাকার্যে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিষ্ঠা দেখে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো তাঁকে বৃন্দাবনে মঠের চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানো হবে। কিন্তু বিধির বিধান ততদিনে পূর্বনির্ধারিত। এক মহীরুহ নির্মাণের অন্যতম স্থপতি হিসেবে তিনি যেন খোদ মহাকালেরই নির্বাচিত। তাই রামকৃষ্ণ শিশুমঙ্গল নামে কলকাতার এক ছোট চিকিৎসাকেন্দ্রের প্রধান স্বামী দয়ানন্দর সহকারী হিসেবে তাঁকে যোগ দিতে হলো। কে এই স্বামী দয়ানন্দ? এক মহাপ্রাণ। বিদেশে গিয়ে নয়নমনোহর দৃশ্য, সুসজ্জিত অট্টালিকা, মসৃণ পথ, সুখী মানুষজন এবং মনোরম আবহাওয়ার পরিবর্তে স্বামী দয়ানন্দ শোকদগ্ধ হয়ে পড়লেন। কারণ, সেখানকার চিকিৎসাকেন্দ্র পরিদর্শন করে তিনি দেখলেন সন্তান প্রসব এবং প্রসব পরবর্তী সেবার বিজ্ঞানসম্মত স্বরূপ।

তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল বাংলার মা-মেয়েদের ভাগ্যতাড়িত অবস্থার কথা।

এখানে সন্তান প্রসবের জন্য প্রসূতিদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাড়ির বাইরে, গোশালায়, চিলেকোঠার অস্বাস্থ্যকর ঘরে। কোনও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা নেই। দয়ানন্দজী ঠিক করলেন কলকাতায় এক মাতৃসদন নির্মাণ করতে হবে ঠাকুরের নামে। সেইমতো তৈরি হয়েছিল এই চিকিৎসাকেন্দ্র। নিজেও প্রশিক্ষণ নিয়ে এলেন। অবশ্য ১৯৫৩ সালের পর থেকে ক্রমে এই চিকিৎসাকেন্দ্র আর মাতৃসদন রইল না। পরিণত হলো রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে। সবরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা শুরু হলো। ১৯৫৮ সালে সেই দয়ানন্দজীর অধীনে স্বামী গহনানন্দ এই হাসপাতালে যোগ দিলেন। দয়ানন্দজীর অধীনে কাজ করা অত্যন্ত শক্ত। তিনি অসম্ভব নিয়মনিষ্ঠ।

সামান্য শৃঙ্খলার ব্যত্যয় হতে পারত না। এরকম খুঁতখুঁতে মানুষটি আশ্চর্যরকম বশ হলেন নরেশ মহারাজের সেবায়। ব্যবহার, কাজের ক্ষমতা এবং মাধুর্য দিয়ে তিনি দয়ানন্দজীকে নিশ্চিন্ত করে দিলেন। হ্যাঁ, যোগ্য উত্তরসূরি। ১৯৫৮ সাল থেকে প্রথম পাঁচ বছর সহকারী সম্পাদক এবং তারপর একটানা ২২ বছর সম্পাদক। অর্থাৎ মোট ২৭ বছর রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

এই ২৭ বছর স্বামী গহনানন্দের জীবন এক আশ্চর্য ব্রতের ইতিহাস। কর্মী আন্দোলন, কর্মীদের বেতন দিতে না পারা, রোগীর চাপ বাড়ছে কিন্তু শয্যা ও চিকিৎসা পর্যাপ্ত নয়, দফায় দফায় হাসপাতালে ধর্মঘট—অসংখ্য সংকট উপস্থিত হয়েছে বছরের পর বছর। স্বামী গহনানন্দকে কেউ কোনওদিন দেখেনি ভেঙে পড়েছেন। হতাশ হননি, ক্রুদ্ধ হননি। সাথীদের বলতেন, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করো। ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হয়েও যেত।

সেবা প্রতিষ্ঠানকে কী চোখে দেখতেন স্বামী গহনানন্দ? একটা ঘটনায় আশা করা যায় পরিস্ফুট হবে। প্রায় প্রতিদিনই তিনি হাসপাতাল পরিদর্শনে বেরোতেন। এবং বিভিন্ন কর্মী, চিকিৎসক, অন্য সন্ন্যাসীরা নিয়ম করে প্রশ্ন করতেন মহারাজ কেমন আছেন? স্বামী গহনানন্দ স্মিত হেসে মাথাটি হেলাতেন। একদিন এক ডাক্তার প্রশ্ন করলেন, মহারাজ কেমন আছেন? যথারীতি মহারাজ ঘাড় হেলিয়ে ইঙ্গিত করলেন। ডাক্তার কিন্তু নাছোড়বান্দা। আবার জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ বললেন না কেমন আছেন? এবার মহারাজ প্রত্যুত্তর করলেন—এই চলছে। ডাক্তারটিকে মহারাজ স্নেহ করেন। তাই হাসিঠাট্টাও চলে। ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন মহারাজ আপনারা তো সংসারত্যাগী। ভালোই তো থাকার কথা। আমাদের দেখুন সংসারের যাঁতাকলে কতরকম সমস্যা। মহারাজ এবার দাঁড়িয়ে পড়লেন। ডাক্তারের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার বাড়িতে কে আছেন। ডাক্তার বললেন, স্ত্রী সন্তান নিয়ে পাঁচজন। স্ত্রী অসুস্থ। তাই মন ভালো নেই। সমস্যায় আছি। মহারাজ সব শুনে বললেন, তোমার বাড়িতে

পাঁচজন। একজন অসুস্থ তাতেই তুমি বিচলিত। আর আমার সংসারে ৫০০-র বেশি সদস্য। তার মধ্যে বহু অসুস্থ। আমি কীভাবে ভালো থাকি বলো তো?

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দ নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিলেন, একটি হাসপাতাল থেকে গবেষণাকেন্দ্র, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৫৫০ শয্যার সুবিশাল চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পিছনে স্বামী গহনানন্দের অবদান কিংবদন্তিস্বরূপ। বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশন অব মেডিকেল রিসার্চ, স্কুল অব নার্সিং তৈরি করার পাশাপাশি হাসপাতালের সম্প্রসারণ সবই তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফল। ১৯৬৫ সালে রামকৃষ্ণ মঠের অছি পরিষদের এবং পরিচালন সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত ছিলেন মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক। এরপর নির্বাচিত হলেন সহ-অধ্যক্ষ অবশেষে গত বুধবার তিনি হলেন এই মহাপ্রতিষ্ঠানের কাণ্ডারী — অধ্যক্ষ মহারাজ। একই সঙ্গে গত ১৩ বছর ধরে কলকাতার যোগোদ্যান মঠেরও তিনি প্রধান।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত এক মহাজীবনের পথিক স্বামী গহনানন্দ মানুষটি স্বল্পবাক। অথচ তাঁর বিচক্ষণতা অনুকরণযোগ্য। সেবার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে এক বৃদ্ধা সেক্রেটারি মহারাজের সঙ্গে দেখা করবেনই। স্বামী গহনানন্দ নির্দেশ দিলেন, আসতে দাও। বুড়িকে দেখেই মহারাজ চিনতে পারলেন। বহুদিন ধরেই আসছে। সে বলল আমাকে কাউন্টারে বলছে লাইনে দাঁড়াতে হবে। আমি ২০ বছর ধরে আসছি নতুন সব পোলাপান। আমারে চেনে না। আমার আগে সবাইকে দিয়া দিতাছে। বুড়ি ভয়ানক উত্তেজিত। মহারাজ সব শুনে হেসে বললেন, বুড়িমা এটা তো আপনারই হাসপাতাল। বুড়িমা উৎসাহিত হয়ে বললেন, বটেই তো। আমি তো তাই বলছি। মহারাজ বললেন, তাই তো বলছি। তোমার নিজের বাড়িতে কেউ এলে তুমি কী আগে নিজের খাবার খেয়ে নাও। নাকি অতিথিদের আগে খেতে দিতে হয়! বুড়ি আর কোনও কথা খুঁজে পায়নি।

বিচক্ষণ অক্রোধী, নিরহংকারী, মৃদুভাষী, সেবাপরায়ণ। এত কিছুর মধ্যেও স্বামী গহনানন্দের কোন বৈশিষ্ট তাবৎ সন্ন্যাসীকুল, ভক্তবৃন্দ ও শিষ্যদের চোখে অপার্থিব সুলভ ?

ধৈর্য ও সহ্য।

বর্তমান—২৯মে, ২০০৫

‘সর্বদাই মনে রাখতে হবে আমি মানুষ, আমার বিবেক আছে, বিচারবোধ আছে’

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্দশ অধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সাক্ষাৎকার তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন অজয় গাঙ্গুলি

শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মায়ের পাদস্পর্শে ধন্য কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান ত্যাগ করে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ পুণ্যভূমি বেলুড় মঠে। গত ২৫শে মে, ২০০৫-এ সারা বিশ্বের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্দশ অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। দৈনিক স্টেটসম্যানের থেকে সংঘগুরু মহারাজজীর কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রাখি।

প্রঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু বলেন ? মহারাজ: রামকৃষ্ণ মিশন মানুষের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে কাজ করে চলেছে। স্বামীজির “আত্মন মোক্ষার্থ জগদ্ধিতায় চ”—এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা এই বিশাল বিশ্বব্যাপী কর্মযজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন। তাঁদের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ-“শিবজ্ঞানে জীবসেবা”। তাঁদের এই কর্মরূপ সেবা যোগের দুটি দিক রয়েছে—জগতের আপামর মানুষের সেবা দ্বারা তাঁদের হিতসাধন এবং নিজের মুক্তি। ত্রাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং করবে। ভবিষ্যতের কথা জানতে চাইছো? ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতির কথাও ভাবা হচ্ছে। কালের তো একটা চাহিদা আছে। সেবা ও কল্যাণমূলক চিন্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রত কর্মের মাধ্যমেই সেই চাহিদা পূরণ করতে হবে। তার জন্যই তো বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হলো। এটা এক নতুন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে ত্রাণ, পুনর্বাসন, পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি কর্তব্য, বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, যাতে মানুষের কল্যাণ হয়—এইসব বিষয়ই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে প্রাধান্য পাবে। এর কর্মপরিধি সারা দেশে প্রসারিত হবে। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের

বহু কেন্দ্রে যেমন পশ্চিমবঙ্গের নরেন্দ্রপুর, রহড়া, ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, দক্ষিণ ভারতে মহীশূর, ত্রিবান্দ্রম, মধ্যপ্রদেশে বাস্তার জেলার নারায়ণপুর প্রভৃতি কেন্দ্রে এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান চলছে একেবারে নিচুতলার অশিক্ষিত মানুষের জন্য। ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে দেশের আরও বহুকেন্দ্রে এবং প্রত্যন্ত প্রদেশে এই শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তার করার পরিকল্পনা চলছে। তবে কী জানো—এর অন্তর্নিহিত নিয়ন্ত্রণ শক্তিটি হবে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ। সেই সঙ্গে এই শিক্ষা যাতে অর্থকরী হয় তাও দেখা হবে। কারণ অর্থকরী না হলো এই শিক্ষা নেবে কে? খালি পেটে তো আর সেবা হয় না। সেজন্য এই নতুন প্রকৃতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদর্শ হবে উভয়মুখী শিক্ষাদান। নিজেও দাঁড়াবে এবং অপরকেও স্বনির্ভর হতে সাহায্য করবে। ওই যে স্বামীজি যে আদর্শের কথা বলেছেন— "Be and make"।

প্রঃ সামাজিক অবক্ষয় রুখতে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা কী ?

মহারাজ খুব ভালো প্রশ্ন—তবে কাজটা একটু কঠিন। মানুষকে মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে মূল্যবোধের আদর্শ তুলে ধরতে হবে। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে অনেক ত্রুটি আছে। এই শিক্ষা বড়ই আত্মকেন্দ্রিক শিক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেকে ছাড়া আর কিছুই জানে না, আমি ভালো থাকলেই হলো। এ বড় নির্বুদ্ধিতা। এইটুকু বুঝছে না যে, আমার অস্তিত্বটাই অন্যের ভালো থাকার ওপর নির্ভর করছে। এই জগতটাতে কোনোটাই বিচ্ছিন্ন নয়, একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। তাই একের মঙ্গলে অপরের মঙ্গল। আমার শরীরে হাতটার ভালো করতে পা-টাকে কেটে ফেলতে হবে নাকি? সমাজ যখন বলছি তখন বহুর ধারণা আসছে। অতএব আমি ভালো থাকলেই হলো—এই ধারণাকে আমূল ত্যাগ করতে হবে। এই ধরনের শিক্ষা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালিত কেন্দ্রগুলিতে নানাভাবে দেওয়া হচ্ছে। এখানকার সাধুরা তো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত নেই। বরং তাঁরা সমাজের মধ্যে থেকে সমাজ গঠনের ব্রত গ্রহণ করেছেন। তবে কেউ যদি মনে করেন একদিনে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে—এমনটা ভাবাটাও পাগলামি।

প্রঃ বর্তমান সমাজে প্রতিটি সংসারে যে অশান্তি ও মনোমালিন্য, তাকে কাটানোর উপায় সম্বন্ধে আপনার সুচিন্তিত পরামর্শ কী?

মহারাজ : (মৃদু হেসে) একটি প্রজন্ম যাচ্ছে আর একটি প্রজন্ম আসছে।—বাবা ও ছেলে। এই দুই প্রজন্মের মাঝে ফাঁকটা বড্ড বড় হয়ে যাচ্ছে। কেউই তার অবস্থান থেকে সরছে না। ফলে অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে—কী ব্যষ্টি সংসারে, কী সমষ্টি সংসারে। আরেকটি কারণ হলো, আমাদের মধ্যে সহনশীলতা কমে যাচ্ছে। মনের উগ্র স্বভাব

বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ মন অনাবশ্যক উত্তেজিত হচ্ছে। বর্তমানে মানুষ এত বেশি মানসিক দিক দিয়ে ভারাক্রান্ত যে তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। জীবনটা বড়ই দ্রুতগামী হয়েছে—আমরা বলি fast life—এর জন্য মনের চঞ্চলতা বৃদ্ধি হয়, সেই সঙ্গে মনে উত্তেজনাও বৃদ্ধি পায়। এই মানসিক উত্তেজনা মানুষের বিচারবোধ লুপ্ত করে দেয়। যার পলে আকস্মিকতার শিকার হয় সে। এই বিচারবুদ্ধিটাকে ঠিক রাখার জন্য মনকে শান্ত রাখার প্রয়োজন। জপ ও ধ্যানের অভ্যাস করা দরকার। আজকাল ডাক্তার, বিজ্ঞানী সকলেই ধ্যান করার পরামর্শ দিচ্ছেন। একটু মনঃসংযমের অভ্যাস করলে প্রভূত উপকার হবে। আর আমাদের পরস্পরের মধ্যে সঠিক বোঝাপড়ার দ্বারা প্রজন্ম পরিবর্তনজনিত ফাঁকটা কমে যাবে। একটু সহনশীলতা, একটু ত্যাগস্বীকার, একটু অপরের জন্য ভাবা—এগুলি এইসব সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবে।

প্রঃ বর্তমানে ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যে এক ধরনের নৈরাশ্য লক্ষ করা যাচ্ছে—এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত?

মহারাজ : কেন হবে না বলো—ছাত্রদের বা যুব সমাজের সামনে আদর্শ কোথায়? ছাত্র ও যুব সমাজের একটা আদর্শ জীবন থাকা দরকার। যা দেখে তারা বড় বড় আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে এবং অনুকরণ ও অনুসরণ করে নিজেদের তৈরি করবে। আজকালকার শিক্ষার পরিবেশে ও গৃহ পরিবেশে এই আদর্শের খুবই অভাব দেখা যাচ্ছে। এতে ওদের দোষ খুব একটা দেখছি না। তারা একটা আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে কোথায়? আমরা কী দিয়ে গেলাম আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে? তাদের জন্য একটা আদর্শ জীবন দিয়ে যাওয়াটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। তা আমরা ঠিক ঠিক পালন করছি বলে মনে হচ্ছে না। শিক্ষাদীক্ষা যা তাদের হচ্ছে তা তো তাদেরই কৃতিত্ব, বিজ্ঞানের আবিষ্কার বা সত্যগুলি তো রয়েইছে, তারা আবিষ্কার করবে। এর ক্ষমতাও তাদের মধ্যেই আছে। তাহলে আমরা তাদের কী দিলাম, আমাদের দেয়ই বা কী? আমাদের দেয় হলো একটি আদর্শ জীবন। নিজের জীবনটাকে একটা উচ্চাদর্শে গড়ে তাদের উপহার দিয়ে যেতে পারি। তার থেকে তারা অনুপ্রেরণা পাবে এবং নিজেদের জীবনটাকে গড়ে নেবে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। কথায় তো আর চিঁড়ে ভেজে না। এই আদর্শ একটা জীবনে ফলিত হয়েছে এমন একটা জীবন উদাহরণরূপে চাই, তাই হবে। তাহলে তারা বুঝবে এই আদর্শগুলিকে জীবনে প্রয়োগ করা যায়।

প্রঃ নারী নির্যাতন ও নারী লাঞ্ছনা যেভাবে বেড়ে চলেছে তার প্রতিকারের উপায় কীভাবে করা যেতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

মহারাজ : বড় কঠিন প্রশ্ন—তবে, এর প্রতিকারের উপায় কিন্তু নারী-পুরুষ নিজেরাই। পুরুষের পশু ও দেব—এই দুটি ভাব কাজ করছে। পশু শক্তিটাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে তার দ্বারাই কাজ করতে হবে। পুরুষের মধ্যে সেই দেবশক্তির বিকাশের দ্বারা ওই পশু শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন । শুভকর্ম, শুভচিন্তার দ্বারা সেই দেবশক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। সর্বদাই মনে রাখতে হবে আমি মানুষ, আমার বিবেক আছে, বিচারবোধ আছে। আর সেভাবেই চলতে হবে। আর যা কিছু আমাদের মধ্যেকার পশুশক্তির উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করবে তা বিষের মতোই ত্যাগ করতে হবে—তা যতই প্রিয় হোক । এই দৃঢ়তা সমগ্র পুরুষের থাকতে হবে। প্রায় উন্নত দেশগুলিতেই পুরুষকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা। এই সমাজব্যবস্থায় কিন্তু অনেক দোষ আছে—তার মধ্যে এটি একটি। অবশ্য অনেক ভালো দিকও আছে, যার জন্য এই সমাজব্যবস্থা এখনও চলে আসছে। কিন্তু তার দোষগুলি উপেক্ষা করে যেতে হবে। নারী মানেই একটা ভোগের বস্তু, এটি বিনা পয়সায় কেনা দাসীমাত্র অথবা সন্তানধারণের একটি যন্ত্রমাত্র—এই ধারণা যদি ঢোকে পুরুষতন্ত্রে আর সেই তন্ত্রের দ্বারা যদি সমাজ বা দেশ শাসিত হয় তাহলে সে দেশের কিন্তু মৃত্যুঘন্টা বেজে গিয়েছে। নারীর সম্মান দিতে হবে, তাঁরা জগন্মাতার অংশস্বরূপা এই বোধ মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিজের গর্ভধারিণী জননীকে যে দৃষ্টিতে দেখি প্রত্যেক নারীকে সেই দৃষ্টিতে দেখা অভ্যাস করতে হবে। শাস্ত্রে বলেছে—"যেখানে নারীরা পূজিতা হন, সেখানে দেবতারা আনন্দে বিরাজ করেন।" শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে নারী মাত্রেই—মাতৃস্বরূপা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"এদেশ অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশ এত উন্নত কেন, এখানে নারীর পূজা হয়, তোদের দেশে তা হয় না বলেই অধঃপাতে যাচ্ছিস।" বিবেকবোধ অর্থাৎ ভালো-মন্দ বিচার আর সংযম এই দুটি হলো মানুষের অসাধারণ বিশেষত্ব।

তবে আর একটি কথা আমাকে বলতেই হবে, এক হাতে তো আর তালি বাজে না বাবা। মায়েদেরও সচেতন হতে হবে। নারীত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ হলো মাতৃত্বে। সন্তানের জন্ম দিলেই কিন্তু মাতৃত্ব লাভ হয় না, মাতৃভাব অতি শুদ্ধ, পবিত্র এক দিব্যভাব। তার বিকাশ সাধনেই মাতৃত্বের প্রকাশ। প্রত্যেক মায়েদের এই মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠাই হলো নারী জীবনের চরম অবস্থা। এরূপ নারী সমগ্র বিশ্বটাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এরূপ এক নারীর উদাহরণ। নারীর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, পোশাক-আশাকে, ব্যবহারে, চালচলনের মধ্যেই এই মাতৃভাবটি প্রকাশিত হবে। প্রত্যেক নারী এই ভাবটি পোষণ করবেন মনে—"আমি মা"। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজকে মায়েরা রয়েছেন। সংসারে নিত্যকর্মে, চাকুরিস্থলে, অধ্যাপনায়,

বিজ্ঞানসাধনায়, খেলাধূলায়, দেশের প্রতিরক্ষায়—কোথায় নেই। এ এক শুভলক্ষণ। কিন্তু সেইসব ক্ষেত্রগুলিতে মায়েদের মাতৃত্বে স্ফুরণ হলেই মাতৃভাবের সম্যক প্রসার হবে। দেশে মাতৃভাব প্রতিষ্ঠা হলেই দেশটি স্বর্গ হয়ে যাবে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন এই মাতৃভাব প্রতিষ্ঠা করতে। সেজন্য শুদ্ধ পবিত্র মাতৃত্বের সাক্ষাৎ জীবন্ত প্রতিমা শ্রীশ্রীমাকে রেখে গিয়েছিলেন আদর্শরূপে আমাদের এই ধরাধামে।

প্রঃ সাধারণ মানুষের সুখে শান্তিতে এগিয়ে চলার পথে আগামী দিনে আপনার কী আদেশ ?

মহারাজ : স্বামী বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত উক্তি সকলকে মনে রাখতে হবে—“পরপীড়নই পাপ, পরোপকারই পুণ্য”। মানুষকে কিছুটা স্বার্থত্যাগ করে অপরের জন্য একটু ভাবতে হবে। আর সন্তোষ একটি বড় জিনিস। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী বলতেন—সহ্যের সমান গুণ নেই, সন্তোষের সমান ধন নেই। মানুষের যা প্রয়োজন, তার প্রাপ্তিতে যে সন্তোষ, তাই-ই হলো শান্তির পরম উৎস। কিন্তু তাতে আমরা সন্তুষ্ট থাকি না। আমাদের কামনা বাসনা আরও বেড়ে যায়, আরও পেতে চাই। জগতের সব কিছুই সীমিত। একজন বেশি পেলে অপরজনের কম পড়বেই। যার কম পড়বে, সে কি ছেড়ে দেবে? কারণ তারও তো সুখে শান্তিতে বাঁচার অধিকার আছে। তার ন্যূনতম প্রাপ্য বস্তুতে ভাগ বসাতে গেলেই তো অশান্তির সৃষ্টি হবে। এটা ধ্রুব সত্য। তা একটি সংসারে হোক বা সমাজে, দেশে যেখানেই হোক না কেন। হয়ত প্রশ্ন উঠবে, তবে কি যে অবস্থায় আছি তাতেই সন্তুষ্ট থাকব? তাহলে তো উন্নতি বা প্রগতি থেমে যাবে। স্বার্থত্যাগেই সর্বোত্তম প্রগতি বা উন্নতি হয়। যাঁরা নিজেদের স্বার্থত্যাগ করে কাজ করেছেন, সকলের উন্নতি, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য চেয়েছেন তাঁরাই সমাজের বা মানুষের বেশি উন্নতি করেছেন বা প্রগতি এনে দিয়েছেন। একটি নিঃস্বার্থ, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ই উন্নতির প্রগতির একমাত্র উপায়। তাতেই শান্তি, সুখ, অভ্যুদ্বয় সাধন হবে। ভালো কিছু করার চেষ্টা সর্বদাই করতে হবে। ভালো কিছু করার চেষ্টা সর্বদাই করতে হবে, তবেই পাবে পরম শান্তি ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

মহারাজের কথা শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাইরের অগণিত দর্শনার্থী অপেক্ষমান। সুতরাং উঠতেই হলো । আসার আগে মহারাজের পদধূলি নিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলাম। সেই পরিচিত মৃদু হাসি মুখে নিয়ে মহারাজ হাত তুলে বললেন—“ঠাকুরের আশীর্বাদ তোমাদের সকলের জন্য সব সময়েই আছে জেনো।”

দৈনিক স্টেটসম্যান, রবিবার ২৯ মে ২০০৫

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চতুর্দশ অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হলেন পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

বিগত ২৫ মে ২০০৫ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্দশ অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। ১৯৯২ সালে তিনি সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। গত ২৫ এপ্রিল ২০০৫ পরম পূজ্যপাদ ত্রয়োদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের মহাপ্রয়াণের পর পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বন্দনানন্দজী মহারাজ অস্থায়ী সঙ্ঘাধ্যক্ষরূপে এতদিন কার্যভার পরিচালনা করছিলেন।

অধুনা বাংলাদেশের সিলেটের পাহাড়পুর গ্রামে পূজনীয় মহারাজের জন্ম ১৯১৬ সালে। কিশোর বয়সেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। পূজনীয় কেতকী মহারাজ (স্বামী প্রভানন্দ)-এর দ্বারাও তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য অভেদানন্দজীকে তিনি দর্শন করেছিলেন। ভুবনেশ্বর মঠে ১৯৩৯ সালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদানের পর পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে নিজ গুরুর নিকটে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা লাভ করে তাঁর নতুন নামকরণ হয় 'ব্রহ্মচারী অমৃতচৈতন্য'। ১৯৪৮ সালে পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দজী তাঁকে সন্ন্যাসদীক্ষা করেন।

ভুবনেশ্বর মঠে পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী তাঁর জীবনের বুনিয়াদ গড়ে তোলেন স্বামী নির্বাণানন্দজী (পরবর্তীকালে সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ)-র সান্নিধ্যে । যখন পূজ্যপাদ সপ্তম সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ শঙ্করানন্দজী এবং সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী অচলানন্দজী (স্বামী বিবেকানন্দ-শিষ্য) ভুবনেশ্বর মঠ পরিদর্শনে যান, স্বামী গহনানন্দজী তাঁদের সেবা করে ধন্য হন। ১৯৪২ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমে কর্মরত ছিলেন। কলকাতার এই আশ্রমটি উত্তরাঞ্চলের মায়াবতীতে অবস্থিত অদ্বৈত আশ্রমের শাখাকেন্দ্র। এই দশ বছরে তিনি বেশ কয়েকবার মায়াবতীতে হিমালয়ের কোলে গিয়ে সাধনভজনে ব্যাপৃত ছিলেন। শিলং আশ্রমে থাকাকালীন (১৯৫৩-১৯৫৮) তিনি স্বামী

ব্রহ্মানন্দ-শিষ্য স্বামী সৌম্যানন্দজীর সান্নিধ্যে নিজের সন্ন্যাস- জীবনকে আরো আদর্শানুগ করে তুলেছিলেন। এই সময়ে তিনি বন্যাত্রাণ এবং অন্যান্য দুর্গতত্রাণে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। আর্তনারায়ণের সেবা করার আরো বড় সুযোগে তিনি পেয়েছিলেন যখন তাঁকে কলকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য স্বামী দয়ানন্দ মহারাজের অধীনে 'শিশুমঙ্গল'-এ সহ- সম্পাদকরূপে নিয়ে আসা হলো। পাঁচবছর পর স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজের স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। 'শিশুমঙ্গল'-এর নাম পরে পরিবর্তিত হয়ে হলো 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান'। দীর্ঘ ২২ বছর এই হাসপাতালের অধ্যক্ষরূপে কার্যভার পরিচালনা করার সময়ে তিনি এই হাসপাতালে বহু উন্নয়নমূলক কার্যসূচি গ্রহণ করেছিলেন। ৩৩টি গ্রামে চলমান চিকিৎসাকেন্দ্রের সাহায্যে তিনি স্বাস্থ্য-সচেতনতা, চিকিৎসা এবং রোগ-নিবারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শুরু হয় গঙ্গাসাগর মেলায় স্বাস্থ্যশিবির। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়েও ব্যাপক স্বাস্থ্যপ্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল।

১৯৬৫ সালে পূজনীয় মহারাজ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের 'অছি' এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। যখন ১৯৭৯ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক যখন নির্বাচিত হলেন, তখন একই সঙ্গে সেবা প্রতিষ্ঠানেরও সম্পাদকের কার্যভার অম্লানবদনে সুসম্পন্ন করতেন। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এইভাবে কার্যভার বহন করার পর তিনি বেলুড় মঠে চলে আসেন। ১৯৮৯ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক-রূপে নির্বাচিত হন এবং ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ঐ পদে আসীন ছিলেন। ১৯৯২ সালে সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষের পদে আসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ, কাঁকুড়গাছিরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সঙ্ঘের সহাধ্যক্ষরূপে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করেছেন। চলেছে অবিরাম মন্ত্রদীক্ষা। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, মরিশাস ছাড়াও তিনি আমেরিকা ও কানাডায় গিয়ে অসংখ্য ধর্মপিপাসুর তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। আবার পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে কাদা, নদী পেরিয়ে ব্যক্তিগত সকল কষ্ট উপেক্ষা করেও অশিক্ষিত, বঞ্চিত, মানুষের কাছে গিয়ে ঠাকুরের মন্ত্র ও বাণী শুনিয়েছেন। পূজনীয় মহারাজের যোগ্য নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মবার্তা বহন করে দিগদিগন্তে, দুর্গম অঞ্চলে সর্বস্তরের মানুষের কাছে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

উদ্বোধন ১০৭তম বর্ষ—১১শ সংখ্যা, আষাঢ় ১৪১২ জুন ২০০৫

চুপি চুপি কাজ করেন

চতুর্দশপদী কবিতার মতোন চোদ্দ জন সঙ্ঘগুরু রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনকে সেই ১৯০১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত প্রাণবন্ত রেখে গেলেন। যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের খোঁজ রাখেন তাঁরা জানেন স্বামী বিবেকানন্দ এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা হলেও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে এক কঠিন সময়ে রক্ষা করার প্রায় অসম্ভব কাজটি করেছিলেন স্বামীজির অতীব প্রিয় বাল্যবন্ধু, আত্মীয় ও গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ যিনি রাজা মহারাজ হিসাবে আজও সন্ন্যাসী ও ভক্তদের হৃদয়ে বেঁচে রয়েছেন।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বলতে আজ আমরা যা বুঝি তার নকশা বা ব্লুপ্রিন্ট অবশ্যই বিবেকানন্দের, কিন্তু নকশা থেকে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে লড়াই করে তাকে বাস্তবায়িত করার দুরূহ কাজটি বিপুল ধৈর্যর সঙ্গে সুসম্পন্ন করার জন্যে সঙ্ঘগুরুদের লড়াই করা ছাড়া উপায় নেই। প্রথম পর্বে রাজা মহারাজ শুধু সঙ্ঘকে সবরকম ঝড়ঝঞ্ঝা থেকেই রক্ষা করেননি, প্রমাণ করে গিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দ অবাস্তব স্বপ্ন দেখেননি এবং স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরাবির্ভাব পর্যন্ত এই সঙ্ঘশরীরে বিরাজ করছেন এবং এখানে অসম্ভবকে বারে বারে সম্ভব করার মতোন আধ্যাত্মিক ও সঙ্ঘশক্তি সৃষ্টি হবে। আরও একটা বড় কাজ রাজা মহারাজ করে গিয়েছেন, চেষ্টা করে এবং সুপরিকল্পিতভাবে নিজেদের ভূমিকাকে অনালোকিত রেখে গিয়েছেন। নতুন ধারায় সঙ্ঘের উদয় শিখরে যে তিনটি মাত্র সিংহাসনের স্থান নির্দিষ্ট করে গিয়েছেন, তাঁরা হলেন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ, জননী সারদামণি ও স্বামী বিবেকানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছিলেন সন্ধান, সন্ন্যাসীরা বিশ্বাস করেন যে সঙ্ঘকে আঘাত করে সে শ্রীরামকৃষ্ণর শরীরকেই আহত করে। স্বামী বিবেকানন্দ দিয়েছেন স্বপ্ন, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনাকে তিনি রূপময় করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। তা হলে জননী সারদামণি কী দিলেন ? দুজনের অনুপস্থিতিতে তিনি দিলেন সীমাহীন ভালবাসা, প্রমাণিত হলো ভালবাসার বন্ধন ছাড়া জাগতিক কোনও সঙ্ঘকে সঙ্ঘবদ্ধ রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চতুর্দশ কর্মবৃত্তান্ত যখন একালের ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্রের

মাপকাঠিতে মূল্যায়িত হবে তখন দেখা যাবে এঁদের কেউ মহাজ্ঞানী, কেউ অধ্যাত্মপথে নমস্য, কেউ আদর্শ সংগঠক, কেউ তুলনাহীন লেখক, কেউবা বিরল শিক্ষক। কিন্তু সকলেরই মধ্যে একটা প্রধান শক্তি, সবাইকে ভালবাসার বন্ধনে বেঁধে রাখার শক্তি।

চতুর্দশ সঙ্ঘ সভাপতি স্বামী গহনানন্দর সন্ন্যাস নামটি নির্বাচন করেছিলেন সঙ্ঘগুরু স্বামী বিরজানন্দ। পাণ্ডিত্যে তিনি ছিলেন অতলান্ত — স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজি রচনাগুলিকে গ্রন্থবদ্ধ করা এবং ইংরাজি ভাষায় স্বামীজির জীবনকথা রচনা করা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। স্বয়ং বিবেকানন্দ এঁকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। প্রেসক্রিপশন লিখেছিলেন বড় কঠিন ঃ বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যাঁরা এই উচ্চ লক্ষ্য ভুলে যায় "বৃথৈব তস্য জীবনম"। কৃতশ্রাদ্ধ ব্রহ্মচারী গঙ্গায় পিণ্ড নিক্ষেপ করে যখন বিবেকানন্দর পাদপদ্ম বন্দনা করলেন তখন তিনি সংসারাশ্রম সম্বন্ধে বললেন, "হয় কামিনীর দাস, নয় অর্থের দাস, নয় মান যশ বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের দাস।...যে যতই বলুক না কেন, আমি বুঝেছি এসব ছেড়ে ছুড়ে না দিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ না করলে কিছুতেই জীবের পরিত্রাণ নেই।"

এসব আলমবাজার মঠে ১৮৯৭ সালের কথা। তার কত যুগ পরে সন্ন্যাসী বিরজানন্দ সঙ্ঘগুরুর পদাসীন হয়ে নরেশরঞ্জন রায়চৌধুরীকে প্রথমে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দিয়ে নাম দিলেন অমৃতচৈতন্য, তারও কয়েক বছর পর সন্ন্যাস দিলেন বেলুড়ে, নামও দিলেন গহনানন্দ। শিলেটের পাহাড়পুর থেকে যাত্রা শুরু করে, কলকাতায় বিদ্যাচর্চা করে, ভুবনেশ্বরে পৌঁছে নরেশরঞ্জন সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরুর।

তেইশ বছর বয়সে যে অধ্যাত্মযাত্রার শুরু তার পরিণতি ৮৯ বছরে পা দিয়ে। যিনি তাঁকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্বের ছায়া পড়েছে শিষ্যের উপর। যেমন বিরজানন্দ বলতেন, "গজর গজর করে মেলা কথা বলে কোনও ফল নেই।.....যাঁরা মঠাধ্যক্ষের কথা শুনতে আসেন তাঁরা নিরাশ হন।" একই ভঙ্গি গহনানন্দের, কথা খুব কম। যাঁরা প্রাণের স্পর্শ চান তাঁরা বিরজানন্দের কাছে ঠিক পেয়ে যেতেন সস্নেহ সস্মিত দৃষ্টিতে। সামান্য কুশল প্রশ্নে, সংক্ষিপ্ত মঙ্গল কামনায় তাঁদের প্রাণ ভরে যায়। একই পথ গহনানন্দের, যে দেড় লক্ষ ভক্তকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন, তাঁদের কথা, যেটুকু বলেছেন সেটুকুই যদি করতে পারি তা হলে যথেষ্ট। আমাদের বেশি কথা শোনবার দরকার কী? যাঁরা প্রাণের স্পর্শ চান তাঁরা ঠিক তা পেয়ে যান ।

স্বামী গহনানন্দকে যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা বুঝতে পারেন তাঁর চলন বলন আচরণের উপর কার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে। পরিমিতিবোধ সন্ন্যাসীকে কতখানি আলোকিত করতে পারে তারই বিরল এক নিদর্শন এই নরেশ মহারাজ।

বেশি কথা নয়, বেশি উচ্ছ্বাস নয়, এমনকী, বেশি ভোজন নয়, অথচ দায়িত্বে সীমাহীন, স্নেহে সীমাহীন। সংসারের মায়াবন্ধন ত্যাগ করে, আত্মশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে যাঁরা সন্ন্যাসী সঙ্ঘে যোগ দিয়েছেন তাঁদেরও যে বন্ধনহীন বন্ধন প্রয়োজন তার নাম ভালবাসা। এই ভালবাসা দেওয়ায় নরেশ মহারাজ যে তুলনাহীন তা সন্ন্যাসী সঙ্ঘে কারও অজানা নয়। এই শক্তিকেই কেউ রসিকতা করে বলেন, 'ফেভিকল ফ্যাক্টর'—সবাইকে জুড়ে রাখার বিরল শক্তি। বিশ্বসংসারে এখন যে আচরণের প্রাধান্য তার নাম টেফলন সংস্কৃতি, অর্থাৎ নিজের কাজ গুছিয়ে নাও, কিন্তু জড়িয়ে যেও না, প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে একটা ছাড় ছাড় ভাব। সংসারে, সঙ্ঘে কোথাও ফেভিকল কম দামে পাওয়া যায় না, বরং একটু বেশি মূল্য দিতে হয়। নরেশ মহারাজ এটা নিঃশব্দে করে এসেছেন। কেউ তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে তাই বিফল হয়ে ফেরে না। সাতাশ বছর দক্ষিণ কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ছিলেন, কিন্তু রাত্রে আমিষ খেতেন না, ব্যাপারটা কিছুই নয় এমন ভাব দেখাতেন। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত কারণটা জানতেন তাঁরা বুঝতেন হাসপাতালের দরিদ্র অবস্থায় ভর্তি, হওয়া রোগীদের রাত্রে আমিষ দেওয়ার সামর্থ্য নেই, তাই নিজেকেও বঞ্চিত করা, কিন্তু চুপি চুপি। বিপদে আপদে সব সময় প্রথমেই নরেশ মহারাজের খোঁজ পড়ে। ১৯৬৬ সালে একবার খবর এল কিংবদন্তি সন্ন্যাসী প্রেমেশানন্দ কাশীতে গুরুতর অসুস্থ। এই অবস্থায় কে যাবেন নরেশ মহারাজ ছাড়া। তিনি ঝটপট ডাক্তারদের পরামর্শ নিলেন, কাশী পৌঁছে দেখলেন, কোমায় আচ্ছন্ন সন্ন্যাসীর শল্যায়ন নিতান্ত জরুরি। কিন্তু কোনও সার্জনই সাহস পাচ্ছেন না, ওই অস্ত্র চিকিৎসায়। স্বামী প্রেমেশানন্দের জীবনীতে এর পরবর্তী বর্ণনা আছে। উদ্বেগের প্রকাশ না ঘটিয়ে নরেশ মহারাজ খবর সংগ্রহ করলেন, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপক আছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনা অনুমতিতে তিনি বাইরের রোগী দেখেন না। নরেশ মহারাজ ছুটলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে শুনলেন জরুরি মিটিং হচ্ছে, সময় অনেক লাগবে। নরেশ মহারাজ হতোদ্যম না হয়ে প্রায় জোর করে ভিতরে একটা স্লিপ পাঠালেন। তখন ওখানকার উপাচার্য ডঃ ত্রিগুণা সেন, তিনি কাগজের টুকরোটি হাতে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলেন এবং নরেশ মহারাজ ও তাঁর সঙ্গী সন্ন্যাসীকে মিটিং-এর ভিতরে নিয়ে গিয়ে সব শুনলেন এবং ডাক্তারকে পাঠানোর সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

এই হলেন গহনানন্দ। যে কাজ ধরবেন তা করবেনই—কোনও বাধাই মানবেন না। অথচ বাইরে উদ্বেগের কোনও প্রকাশ নেই। মঠ মিশনে যাঁরা ওঁকে দীর্ঘদিন ধরে দেখছেন তাঁদের কেউ কখনও তাঁকে রাগতে দেখেনি, ধৈর্যচ্যুত হতে দেখেনি। কাউকে কখনও বকেছেন বলে শোনা যায়নি। অথচ কী আশ্চর্য, সবাই বুঝতে পারে, উনি

কোন কাজটা পছন্দ করছেন না। কী করে সবাই বুঝতে পারে, উনি কোন কাজটা পছন্দ করছেন না। কী করে সবাই বোঝে, এটাও মজার ব্যাপার। একজন সন্ন্যাসী বলেছিলেন, ওঁর ব্যাপারটাই আলাদা, বিরক্ত হলো উনি আরও শান্ত আরও কোমল হয়ে যান, মহারাজ ভীষণ নরমভাবে কথা বলছেন লক্ষ করলেই আমরা বুঝতে পারি, কোথাও কোনও ভুল হয়েছে।

এই ধরনের গুণের অধিকারীরাই বিশ্বময় ছড়ানো আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান হতে পারেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, মঠাধ্যক্ষ তাঁর যন্ত্রমাত্র—বলতেন নরেশ মহারাজের গুরু স্বামী বিরজানন্দ। সংসারী ভক্ত ও ত্যাগী সন্ন্যাসীরা বিশ্বাস করেন, মর্ত্যদেহধারী গুরুর ভিতর যে অভয়, করুণা ও শান্তি উপলব্ধি করা যায় তা সচ্চিদানন্দ গুরুরই শক্তি। যে শক্তির তিরোধান নেই, বিনাশ নেই।

গহনানন্দ ও তাঁর গুরু স্বামী বিরজানন্দের চারিত্রিক সাদৃশ্য অনেককে বিস্মিত করে। বিরজানন্দ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "জীবনে অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক কষ্ট, অনেক সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু কখনও তাঁহাকে কেহ বিচলিত হইতে দেখে নাই। তাঁহার সমস্ত প্রকৃতিটাই যেন একটা অক্ষোভ্য প্রশান্তির পটভূমিকায় দাঁড়াইয়াছিল।" ঠিক একই কথা বলা হয়ে থাকে চতুর্দশ সঙ্ঘগুরু সম্পর্কে।

তথ্যসূত্র : হাওড়া-হুগলী, উইকেন্ড

প্রথম শ্রেণির সংগঠকের দুর্লভ ক্ষমতা নিয়ে রামকৃষ্ণ আন্দোলনকে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন স্বামী গহনানন্দ তাঁর দীর্ঘ দিনের সন্ন্যাসজীবনে। লিখেছেন শংকর

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করলেও, যিনি কখনও সংঘপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি, সেই স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন জ্ঞানে শঙ্কর, হৃদয়বত্তায় বুদ্ধ, ভক্তিতে নারদ, ব্রহ্মনিষ্ঠায় শুকদেব, তর্কে বৃহস্পতি, রূপে কামদেব, বীরত্বে অর্জুন এবং শাস্ত্রজ্ঞানে ব্যাসদেব।" যাঁদের আমরা খুব বড় লোক বলে মানি, তাঁদের মধ্যে একটা বা দু'টি শক্তির খেলা দেখা যায়। কিন্তু স্বামীজির মধ্যে না কি ১৮-টা শক্তির উপস্থিতি লক্ষ করেছিলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ।

যে-চতুর্দশ সংঘপ্রধান সেই ১৯০১ থেকে আজ পর্যন্ত এক আশ্চর্য সন্ন্যাসী সংঘকে প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ রাখলেন, তাঁদের দুর্লভ গুণাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ রক্ষার কোনও ব্যবস্থা সংঘপ্রধানদের নির্দেশ মতোই রক্ষা করা হয় না। কিন্তু দিনে দিনে দিকে দিকে মঠ ও মিশনের উপস্থিতি উপলব্ধি করা গিয়েছে। এই বার্তা যে সুদূর রোমেও পৌঁছেছে, তার প্রমাণ, মহামতি পোপ এক বার মঠ-মিশনের সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মুগ্ধ হয়ে তাঁর মাধ্যমে মঠ-মিশনকে একটি দুর্লভ লকেট উপহার দিয়েছিলেন, যার মধ্যে ছিল সেন্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসির ব্যবহৃত পোশাকের একটি সুতো। যথাসময়ে এই লকেটটি বেলুড়ে এসেছিল এবং সন্ন্যাসীরা স্মরণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত উক্তি : "যথার্থ সন্ন্যাসীরা নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত উপেক্ষা করেন, জগতের ভাল করতেই তাঁদের জন্ম।" এই ভালটা কী ধরনের তাও বিবেকানন্দের ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে চিরকালের জন্য : "পরের জন্যে প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধাতার অশ্রু মোছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবনসংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে

জগতের সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।" এর সঙ্গে যদি নিজের জন্য মোক্ষের সন্ধান যোগ করা যায়, তা হলে নয় দফা কর্মসূচি—যার নানা রূপ ও নানা দিক নিয়ে এক শতাব্দীর বেশি সময় নিয়ে সংঘগুরুরা নানা চিন্তায় ডুবে রয়েছেন। মঠ ও মিশনের যা লক্ষণীয়, শুধু চিন্তা নয়, নানা কর্মের মধ্য দিয়ে ও নানা জনপদে, নানা দেশে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে।

সদ্যনির্বাচিত সংঘ সভাপতি স্বামী গহনানন্দ তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন—কালের চাহিদা। শাশ্বত সত্যের সন্ধানে বেরিয়েও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন যে-সত্যটিকে দৃষ্টির বাইরে রাখতে চান না, তা হলো সময়ের সামিয়ানার তলায় দাঁড়িয়ে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মন্ত্র, মন্ত্রকেও নিরন্তর আধুনিক করে নিতে হয়। স্বামী গহনানন্দ জানিয়েছেন, ত্রাণ, স্বাস্থ্য ইত্যাদির সঙ্গে এ বার নতুনভাবে যুক্ত হচ্ছে বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবনাচিন্তা। আরও কঠিন যে সমস্যার কথা উঠেছে, তা হলো সামাজিক অবক্ষয়। মহারাজ স্বীকার করে নিয়েছেন, এ যুগের শিক্ষা কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু শান্তভাবেই মনে করিয়ে দিয়েছেন, আমি ভাল থাকলেই হলো, এ বড় নির্বুদ্ধিতা। আমার অস্তিত্বটাই যে অন্যের ভাল থাকার ওপর নির্ভর করছে, তা বোঝাবার জন্যে উল্লেখ করেছেন ঃ এ জগতে কোনও কিছুই বিচ্ছিন্ন নয়, একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত, তাই একের মঙ্গলে অপরের মঙ্গল।

এর জন্যে জগৎ-কাঁপানো কোনও সমাধানসূত্র দেননি ৮৯-তে পা-দেওয়া স্বামী গহনানন্দ, শুধু বলেছেন তথাকথিত 'ফার্স্টলাইফে' মনের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায় অনেকের, মনকে শান্ত রাখার জন্যে ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরাও ধ্যানের পরামর্শ দিচ্ছেন। মৃদু ভাবে মহারাজ বলেছেন, একটু মনঃসংযোগের অভ্যাস করলে প্রভূত উপকার হবে। সেই সঙ্গে একটু সহনশীলতা, একটু ত্যাগ স্বীকার এবং একটু অপরের জন্যে ভাবা।

সুখে শান্তিতে থাকবার জন্যে আরও যে উপদেশটি দিয়েছেন, তা ছোট্ট ওষুধের পিলের মতোন, যার শক্তি অসীম। মহারাজ আবার স্বামীজির বাণী উদ্ধৃত করেছেন—পরপীড়নই পাপ, পরোপকারই পুণ্য। মহারাজ জটিল তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ না করে স্রেফ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে স্মরণ করেছেন—সহ্যের সমান গুণ নেই, সন্তোষের সমান ধন নেই। মানুষের যা প্রয়োজন, তার প্রাপ্তিতে যে- সন্তোষ, তাই হলো শান্তির পরম উৎস, কিন্তু আমরা আরও পেতে চাই। এরপরে শান্তভাবে সংঘগুরু বলেছেন, স্বার্থত্যাগেই সর্বোত্তম প্রাপ্তি হয়, একটি নিঃস্বার্থ, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ই উন্নতির একমাত্র উপায়, তাতেই শান্তি, তাতেই সুখ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ত্রয়োদশ সভাপতি স্বামী রঙ্গানাথানন্দ দেহত্যাগ করলেন

২৫ এপ্রিল, ২০০৫। তিনি ছিলেন কিংবদন্তি সন্ন্যাসী, সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর নাম, পাণ্ডিত্যে বাগ্মিতায় বিবেকানন্দ বাণীপ্রচারে তিনি ছিলেন তুলনাহীন। প্রায় মৃত্যুশয্যা থেকে উঠে এসে শক্ত হাতে তিনি সংঘপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ১৯৯৮ সালে। শোনা যায় দায়িত্ব গ্রহণে তাঁর ছিল অনীহা, স্বামী ভূতেশানন্দ ও তিনি প্রায় একই সময়ে কলকাতার দু'ই হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছেন, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বলেছিলেন, আমার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে, আমিই আগে যাব। কিন্তু তা হলো না, আশ্চর্য ভাবে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন, কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র খুলে নেওয়া হলো, তিনি বললেন, মায়ের যদি তাই ইচ্ছা হয় তাই হোক। তিনি রামকৃষ্ণতরণীকে কালসমুদ্রে ভাসমান রাখার জন্য ত্রয়োদশ মাঝির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

রঙ্গনাথানন্দ মহারাজ অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ফিরে এলেন, হাসপাতাল তাঁর ভাল লাগেনি এ বার, ডাক্তার ও সেবকদের শিশুর মতো বললেন, আমাকে বেলুড়ে ফিরিয়ে নিয়ে চলো, সে ইচ্ছা পূর্ণ হলো না, তার বদলে ২৫ এপ্রিলের অপরাহ্ণে তাঁর শরীর ফিরল মঠে।

মঠ ও মিশনের সমস্ত কাজ নিয়মের শৃঙ্খলায় বাঁধা। কোথাও কোনও বেসুর হবার সম্ভাবনা নেই, একজন সংঘ প্রধানের পর আর একজন সংঘ প্রধানের নিয়োগ নিয়ে প্রথম আলোচনা হয় অছিদের মধ্যে, তারপর তাঁদের মনোনয়ন অনুযায়ী মতামত চাওয়া হয় সেই সব সন্ন্যাসীদের, যাঁদের অন্তত বিশ বছর অধ্যাত্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে। মতামত চাওয়া হয় কেন্দ্রপ্রধানদের কাছেও, তাঁরা যদি বিশ বছরের সন্ন্যাসজীবন পূর্ণ না করেও থাকেন, তবুও মতামত দিতে পারেন।

২৫শে মে আবার অছি ও গভর্নিং বডির সভা বসল বেলুড় মঠে, কে সংঘপ্রধান হবেন সে নিয়ে কোথাও কোনও উত্তেজনা বা সাসপেন্স নেই। সবাই অপেক্ষা করছেন, সবার প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় নরেশ মহারাজ কখন দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন। এই ক'দিনে স্বভাবলাজুক, স্বল্পভাষী, প্রচারবিমুখ মহারাজের জীবনের মূল কথাগুলো প্রকাশিত হয়েছে। এই ক'বছরে যে দেড় লক্ষ ভক্তকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন তাঁদেরও অনেকে জানতেন না অনেক বিবরণ। এক নজরে এই ব্যাপারটা এই রকম :

পূর্বাশ্রমের নাম	:	নরেশরঞ্জন রায়চৌধুরী
জন্ম	:	শ্রীহট্টের পাহাড়পুরে
কাল মহাষ্টমী	:	১৯১৬
শিক্ষা	:	পাহাড়পুর ও কলকাতায়

মন্ত্রদীক্ষা	:	ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠে স্বামী বিরজানন্দ (১৯৩৯)
ব্রহ্মচর্যদীক্ষা	:	বেলুড়ে (১৯৪৪), স্বামী বিরজানন্দ।
নতুন নাম	:	অমৃত চৈতন্য
সন্ন্যাস	:	স্বামী বিরজানন্দের হাতে, ১৯৪৮
নাম	:	স্বামী গহনানন্দ

কয়েকটি প্রধান দায়িত্ব :

১৯৪৮-৫২	:	অদ্বৈত আশ্রম কলকাতা শাখা
১৯৫৩-৫৮	:	শিলং কেন্দ্র। স্বামী সৌম্যানন্দের তত্ত্বাবধানে অসমের ভয়াবহ বন্যায় একাধিক বার ত্রাণ সেবাকার্য
১৯৫৮-৮৫		স্বামী দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ভূমিকায়, প্রথমে সহকারী সম্পাদক ও ১৯৬৩ থেকে সেক্রেটারি।
১৯৬৫	:	থেকে মঠ মিশনের ট্রাস্টি ও গভর্নিং বডির সদস্য
১৯৭৯	:	মঠ মিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি
১৯৮৫	:	মঠ মিশনের সর্বক্ষণের সেক্রেটারি
১৯৮৯	:	জেনারেল সেক্রেটারি, মঠ ও মিশন
১৯৯২	:	সহ-সংঘসভাপতি
২০০৫	:	সংঘসভাপতি

স্বামী গহনানন্দর ভাবমূর্তিটি কেমন? অদ্ভুত এই মানুষটি প্রথম শ্রেণির সংগঠকের দুর্লভ ক্ষমতা নিয়ে রামকৃষ্ণ আন্দোলনকে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন দীর্ঘ দিনের সন্ন্যাস জীবনে। সমস্যা যতই জটিল হোক, কেউ কখনও তাঁকে রাগতে বা ধৈর্যচ্যুত হতে দেখেননি। উদ্বেগের কোনও বাহ্য প্রকাশ নেই সমস্যা যতই বৃহৎ হোক। ঠাকুর ছিলেন গোছানো মানুষ, স্বামী গহনানন্দজীও। সেই পথ অনুসরণ করে সর্বদাই গোছানো, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও ফিটফাট।

স্বাবলম্বী এই মানুষটি স্বল্পভাষী, কারো কাছ থেকে ব্যক্তিজীবনে কোনও সাহায্য চান না। আহার করেন এমনই অল্প যে, অনেকে ভেবে পায় না কেমন করে বেঁচে থাকেন? একেবারেই বাগাড়ম্বর নেই, বহু বছর সেবা প্রতিষ্ঠানে রাত্রে আমিষ দেবার সামর্থ্য নেই, সুতরাং নিজেও খাব না। আরও নিঃশব্দ আত্মসংযম, রোগীদের রান্নাঘর

থেকে পরিচালকদের রান্নাঘর আলাদা হতে দেননি।

এ বিষয়ে বোধহয় তাঁর অনুপ্রেরণা প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ, যিনি নবম সংঘগুরু স্বামী মাধবানন্দের ছোট ভাই। বিদেশে অতি উন্নতশ্রেণির মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান দেখে উদ্দীপ্ত হয়ে দেশে ফিরে দয়ানন্দ ভবানীপুরের ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে যে-মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন, তাতে প্রথম দিকে সন্ন্যাসী ট্রাস্টিদের তেমন মন ছিল না। দয়ানন্দ নাছোড়বান্দা, তিনি ট্রাস্টিদের কাছে গিয়ে গিয়ে দরবার করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা জানতে চাইলেন, দু'দিন পরে তুমি অন্য কোথাও গেলে তখন কী হবে? দয়ানন্দর মৌখিক প্রতিশ্রুতি, যত দিন শরীর আছে শিশুমঙ্গল ছাড়ব না। পাঁচ বছরে তিনি সহকারী হিসেবে নিয়ে এলেন স্বামী গহনানন্দকে । পাঁচ বছর পরে তাঁকে পূর্ণ দায়িত্ব দিলেন, কিন্তু দায়িত্বমুক্ত হয়েও কথার খেলাপ যাতে না হয়, তা পূর্ণ করার জন্য সেবা প্রতিষ্ঠানেই থেকে গিয়েছিলেন এবং ওখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শোনা যায়, তিনি মিশনের অন্যত্র সুবৃহৎ দায়িত্ব নেবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু হাল্কা ভঙ্গিতে তিনি বলতেন, আমাকে গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতেই হবে, অন্য কোথাও যাওয়ার পথ নেই!

যে-প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিঃশব্দ সংগ্রাম করে কপর্দকহীন স্বামী গহনানন্দ যে-ভাবে তিলে তিলে সেবা প্রতিষ্ঠানকে বিশাল মহীরুহে পরিণত করেছিলেন তার ইতিহাস লেখা হলে এ দেশের স্বাস্থ্য-উদ্যোগের পরিচালকরা উপকৃত হবেন। বুঝতে পারবেন কীসের অভাবে এ দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা এমন শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

দীর্ঘদিন সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রবল আর্থিক অনটন, কোথা থেকে কর্মীদের মাইনে হবে তার ভাবনায় তরুণ সন্ন্যাসীরা উদ্বিগ্ন, কিন্তু স্বামী গহনানন্দ কখনও উদ্বিগ্ন হতেন না, শেষ মুহূর্তে কোনও ভাবে বিপদ উদ্ধার হয়েছে। এইরকম বেপরোয়া ভাবে মহারাজ হাসপাতালের বিভিন্ন ব্লক তৈরি করেছেন । এক বার খুব টানাটানি চলেছে, সেই সময় ময়লা হাফ শার্ট পরা এক ভদ্রলোক আচমকা হাজির হলেন। তাঁকে দেখে স্বামী গহনানন্দ মনে করলেন, নিশ্চয় বিনা পয়সায় বেড ভিক্ষা করতে এসেছে। কিন্তু লোকটি বললেন, আমি কিছু সাহায্য করতে চাই, একটা চেক এনেছি। চেক দেখে নরেশ মহারাজ তাজ্জব—৫ এর পরে ছ'টি শূন্য বসানো, অর্থাৎ পঞ্চাশ লাখ টাকা! মহারাজ ভাবলেন, লোকটি পাগলামো করতে এসেছে। কিন্তু পরে জানা গেল, লোকটির স্ত্রী এক বছর আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এক বছরে স্বামীর ব্যবসায়ে যে লাভ হবে তা একটা ভাল কাজে ব্যয় করবেন। গল্পটা যখন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল ঠিক সেই সময় সুদূর উত্তর কাশীতে যোগাযোগের সুযোগ এল। এখন উত্তর কাশীনিবাসী নন্দলাল

তাঁতিয়া টেলিফোনে তারিখটা বলে দিলেন, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭৭। নরেশ মহারাজের এই ভক্তটি নিজে তীর্থ করে বেড়ান না, মহারাজকে বদ্রিনাথেও নিয়ে গিয়েছেন।

হাসপাতাল পরিচালনা যে কী কঠিন কাজ, তা পরিচালকরাই জানেন। পাঁচশো বেডের হাসপাতাল মানে প্রতি দিন পাঁচশো রণাঙ্গনে সংগ্রাম, কোথাও সাফল্য, কোথাও পরাজয়, কোথাও আনন্দোৎসব, কোথাও অবনত শিরে আত্মসমর্পণ। এই যুদ্ধে নিতান্ত নরম মানুষটাকেও অনেক সময় অতি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, মৃদুভাষী ও মিষ্টভাষী নরেশ মহারাজ নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার স্বার্থে প্রয়োজনে অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বিপথগামী কয়েকজন কর্মীর কাছে নতি স্বীকার করে সেবা প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশের জন্য পরিচালকরা কেউ প্রস্তুত নন। এ বিষয়ে নরেশ মহারাজের আদর্শ তাঁর গুরু ষষ্ঠ সংঘপ্রধান স্বামী বিরজানন্দ। সিদ্ধান্ত নেবার আগে ভাবতেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলে আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। শোনা যায়, সে বার কিছু সাফাইকর্মী হাসপাতালকে অচল করে দেবার চেষ্টা করেছিল, বিন্দুমাত্র না দমে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে তরুণ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা চলে এলেন, তাঁরা সকলেই জানেন, এক সময় স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ মঠের খাটা পায়খানা পরিষ্কার করেছিলেন নিজের হাতে।

আবার এই মহারাজই অন্য মানুষ, যখন আইনজ্ঞরা বললেন, কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হোক। মহারাজ সই করলেন না, বললেন সমস্যা তো মিটে গিয়েছে। যারা বিশৃঙ্খলা করেছিল তারা তো আমার সংসারের ছেলে, ওরা যাবে কোথায় ?

এই হলেন নরেশ মহারাজ। প্রয়োজনে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, কিন্তু বড়ই কোমল হৃদয়ের মানুষ, কারওর দুঃখ দেখলে সাড়া না দিয়ে পারেন না। হাসপাতালে যাবার সময় মাঝে মাঝে পরিচিত ভক্তরা কিছু দিয়ে প্রণাম করতেন, সে সব নিঃশব্দে ক্যাশিয়ারের হাতে তুলে দিতেন হাসপাতালের হিসেবে, নিজের জন্যে থাকত কেবল টুথপেস্ট ও শেভিং ব্লেড কেনবার মতোন কয়েকটা টাকা।

এ সবই নিঃশব্দে। কোথাও উচ্ছ্বাস নেই, বাগাড়ম্বর নেই। তাঁর বক্তৃতার ধরণটিও একই রকম। ঝড় তোলেন না, চমক সৃষ্টি করেন না, কিন্তু নিজের কথাটি নিজের স্টাইলে বলে যাচ্ছেন। কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারবাবু হিসেবেও একই ব্যাপার লক্ষ করেছি, যাঁরা আদালতে বক্তৃতার ঝড় উড়িয়ে দিচ্ছেন, তাঁরা প্রায়ই জিতছেন না, জিতছেন এমন আইনজ্ঞ যিনি ধীরস্থির ভাবে কোনও বিদ্যুৎচমক না দিয়ে নিজের বিষয়টিতে বিচারপতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। স্বামী গহনানন্দের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। যা বলছেন তা মানুষ অন্তরে গ্রহণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে, অথচ উচ্ছ্বাস নেই।

মৃদুভাষী মানুষটির মধ্যে দুঃসাহসের অনন্ত ভাণ্ডার, যা শ্রীহট্টের মানুষদের বিশ্বাস, তাঁদের চারিত্রিক বিশেষত্ব। এই সাহস সম্বল করেই সিলেটিরা গত একশো বছরে শুধু বিশ্ববিজয় করেনি, বৃহৎ সমর্থন জানিয়েছেন এ কালের দুই ক্ষণজন্মা বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথকে। মনে রাখা ভাল সিলেট এই সংঘকে শুধু সংখ্যাহীন সন্ন্যাসী উপহার দেয়নি, দিয়েছে দু'জন সংঘপ্রধানকে। প্রথম জন স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন, দ্বিতীয় জনের দায়িত্ব শুরু হলো এ বার।

সাহসিকতার প্রমাণ যাঁরা খুঁজে বেড়ান, তাঁরা জেনে রাখুন, দিল্লির বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান এ-আই-এম-এস-এ বাইপাস সার্জারি হবার পরে রোগীর প্রথম কাজ হলো এখানকার ক'জন সেবিকা কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং পেয়েছেন সেটা জানা। সুস্থ হয়ে ছাড়া পাওয়ার কিছু দিন পরেই কাউকে না বলে স্বামী গহনানন্দ হাজির হলেন কাশ্মীরে। সেখান থেকে চলে গেলেন অমরনাথের দুর্গম তীর্থযাত্রায়। শরীরকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া সিলেটি ও সন্ন্যাসী, উভয়েরই স্বভাববিরুদ্ধ।

চাপা রসিকতা স্বামী গহনানন্দের স্বভাবের অঙ্গ। সেবা প্রতিষ্ঠানে একজন দক্ষিণী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিড়িক্ষি মেজাজের জন্য যিনি তরুণদের মধ্যে তেমন জনপ্রিয় ছিলেন না। তাঁর হঠাৎ ধারণা হলো, অমুক দিনে তিনি দেহরক্ষা করবেন। স্থির করলেন, দক্ষিণ ভারতের এক কেন্দ্রে দেহত্যাগই শ্রেয়। খুব ভাল রাঁধতেন। যাবার আগে সব সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করে ভাণ্ডারা দিলেন। বিদায় দিনে দুষ্টুমিভরা মুখে নরেশ মহারাজ বললেন, দেহত্যাগের যে-তারিখটা উনি ঘোষণা করেছেন, সেটা নোট করে রাখ। সৌভাগ্যবশত আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত হলো। নরেশ মহারাজ পরামর্শ দিলেন, টেলিগ্রাম পাঠাও, স্বামী জ্ঞয়ানন্দ রিজারেকটেড। টেলিগ্রাম চলে যাওয়ার পরে তরুণদের বললেন, "হাত গুটিয়ে বসে থেকো না। আর একটা টেলিগ্রামে আর একটা ভাণ্ডারার ডিমান্ড পাঠাও।"

তথ্যসূত্র : ১২ জুন ২০০৫, আনন্দলোক

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বন্দি দীক্ষা নিলেন বেলুড় মঠে

সুমন ঘোষ • মেদিনীপুর

বেলুড় মঠে গিয়ে দীক্ষা নিলেন স্ত্রী-কে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এক কয়েদি। তাঁর নাম রাসেন্দু চক্রবর্তী। ২০০০ সালের ১ মার্চ থেকে মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি। জেল কর্তৃপক্ষের দাবি, জেলের ইতিহাসে এমন ঘটনা প্রথম।

আই জি (কারা) জয়দেব চক্রবর্তী বলেন, "জেলের মধ্যে থেকে এই মানসিক পরিবর্তন দেখে আই জি হিসাবে আমি গর্বিত। আমার চাকরি জীবনে আর কাউকে এমন দেখিনি। মনে হয় এটাই প্রথম।"

জেল সূত্রের খবর, রাসেন্দুবাবুর বাড়ি বীরভূমে সিউড়ি শহরের সেহারা পাড়াতে। পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন। স্টেশনারি জিনিসপত্র বিক্রি করতেন। স্ত্রী-কে খুন করার দায়ে যাবজ্জীবন সাজা হয় তাঁর। শুক্রবার তিনিই বেলুড় মঠের স্বামী গহনানন্দের কাছে দীক্ষা নেন বলে জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। শুক্রবার ভোরে পুলিশি প্রহরায় বেলুড় যান। ফিরে আসেন সন্ধ্যার আগেই। ফিরে এসে বেজায় খুশি ৪৫ বছরের এই ব্যক্তি। বারবার ধন্যবাদ জানাচ্ছেন জেল-কর্তৃপক্ষকে। কারণ, তাঁদের সাহায্য না পেলে তাঁর মনোবাসনা অপূর্ণ থেকে যেত। তাই এই কৃতজ্ঞতা।

রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে অবশ্য এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

কী ভাবে বা কেন এই মানসিক উত্তরণ? জেল কর্তৃপক্ষের মতে, কেউ এক বার খারাপ কাজ করলে বার বার করবে এমন নয়। তাছাড়া রাসেন্দুবাবু জেলে আসার পরও ধ্যান করতেন। জেলখানার দূর্গাপুজোয় সব সময় পুরোহিতের কাছে থাকেন। সাহায্য করেন। মা সারদাদেবীর প্রতি প্রথম থেকেই অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল তাঁর। 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহকও হন তিনি। তার পর মায়ের পদার্পণ দিবস উপলক্ষে মায়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানান। কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রথম বার একাই গিয়েছিলেন।

গত বছর তাঁর সঙ্গে আরও দু'জন যাবজ্জীবন সাজা পাওয়া বন্দি— নিমাই কড়া ও শ্যামকুমার রাওয়ান মায়ের বাড়ি যান। পুলিশি প্রহরাতেই তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়।

জেল সুপার শোভন দীন বলেন, "গত বার মায়ের বাড়ি গিয়ে প্রায় হাজার খানেক টাকার বই কিনে এনেছেন রাসেন্দু। সবই ঠাকুরের। রামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীমার বাণী প্রভৃতি। বইগুলি জেলের গ্রন্থাগারে রাখা হয়েছে।" সব বই কিনেছেন নিজের পারিশ্রমিকের টাকায়। জেলে কাজ করার জন্য যা পারিশ্রমিক পান তা দিয়েই বই ও পত্রিকা কেনেন।

জেল কর্তৃপক্ষের দাবি, রাসেন্দু চক্রবর্তীকে দেখে ধর্মীয় ব্যাপারে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হচ্ছেন অনেকেই। প্রথমে জেলে রাসেন্দুবাবু একা উদ্বোধন পত্রিকা নিতেন। এখন উদ্বোধন পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ।

শোভনবাবুর কথায়, "পাঁচ জন পত্রিকা নিলে কী হবে, পড়েন আরও অনেকে। খুন ও ডাকাতির ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা যে এখন ধর্মকথা শুনছেন তা রাসেন্দুবাবুর জন্যই।" আই জি বলেন, "আশা করব রাসেন্দুবাবুকে দেখে আরও অনেকের মনের এমন পরিবর্তন হবে।"

সৌজন্যে : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা অক্টোবর, ২০০৫

দিল্লীতে মেট্রো স্টেশন হল শ্রীরামকৃষ্ণের নামে

দিগন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (নয়াদিল্লি)

৬ জানুয়ারি : কলকাতাকে পিছনে ফেলে দিল দিল্লি, শ্রীরামকৃষ্ণের নামে মেট্রো স্টেশন করে।

রাজধানীতে প্রথম মেট্রো চালু হয় ২০০২ সালে। তার পর এক এক করে নতুন লাইন, নতুন স্টেশনের জয়যাত্রা চলেছে। দিল্লিতে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমটি যে চৌরাস্তায়, সেখানে আছে স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তি। রাস্তাটির নাম রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ। এই আশ্রমের সামনেই বর্ষশেষে চালু হয়েছে মেট্রো স্টেশন। আজ সেখানে উৎসবের পরিবেশ।

রামকৃষ্ণ মিশন আর প্রবাসী ভক্তরা অনেক লড়াই করে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। এই স্টেশনটির নাম হয়েছে 'রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ'। মিশনের উল্টো ফুটেই দিল্লির বিখ্যাত বাজার পালিকা প্লেস। মেট্রো স্টেশনে উঠলেই পালিকা প্লেস 'শ্যু' বাজারের বড় বড় ব্যানার চোখে পড়ে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ এই স্টেশনের নাম পালিকা প্লেস রাখার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছিলেন। কিন্তু সেই খবর পাওয়া মাত্র মিশন কর্তৃপক্ষ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত ও দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর-ই শ্রীধরণের কাছে দরবার করেন। দাবি, রামকৃষ্ণ মিশনের নামে স্টেশনের নাম রাখতে হবে। চলে একের পর এক চিঠি। লড়াইয়ের ফল আখেরে মধুরই হয়েছে। পালিকা প্লেসের বদলে স্টেশনের নামকরণ হয়েছে রামকৃষ্ণের নামে।

স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক হিসাবে দিল্লিতে এসেছিলেন। থেকেছিলেন একটি দোতলা বাড়িতে। সব্জি মান্ডির কাছে সেই বাড়িটিতে এখন দিল্লি পুরসভার একটি বিদ্যালয় আছে। কিন্তু মূল বাড়িটির খন্ডহর দশা। এই বাড়ি অধিগ্রহণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত হলেও তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। উত্তরপ্রদেশের মেরঠেও যে বাড়িতে স্বামীজি ছিলেন সেখানে একটি গ্রন্থাগার

করার কথা আছে। কিন্তু সেটিও আটকে আছে আইনি জটিলতায়। এ সবের মধ্যে দিল্লিতে একটি মেট্রো স্টেশনের নাম রামকৃষ্ণের নামে হওয়াটা মিশনের পক্ষে নিঃসন্দেহে বড় সাফল্য।

দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্তরা আজ এই সাফল্য উদযাপন করলেন মেট্রো চড়েই। নেতৃত্বে দিল্লি মিশনের সেক্রেটারি স্বামী গোকুলানন্দ। ট্রেনের কামরার ভিতরেই চলল ঠাকুরে নাম-গান। মহারাজ বসলেন চালকের পাশের সিটে। আর এক এক করে শতাধিক ভক্ত লাইন করে চালকের কেবিনে এসে দেখে গেলেন প্রযুক্তির আজব দুনিয়া। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই মেট্রোর এই লাইনের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। জাপানের টাকা, হংকং-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ফ্রান্সের প্রযুক্তির সাহায্যে বিশ্বের অন্যতম সেরা মেট্রোর খেতাব এখন দিল্লির দখলে। গোটা বিষয়টির কৃতিত্ব দিল্লি মেট্রোর প্রধান শ্রীধরণেরই। দিল্লির ধাঁচে দেশের যে কোনও জায়গায় বিশ্বমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শ্রীধরণ 'আদর্শ' হওয়া উচিত বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী।

কয়েকদিন আগে বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট স্বামী গহনানন্দ দিল্লির মেট্রো সফর করেন। সেদিনও শ্রীধরণ তাঁর সঙ্গী ছিলেন। দিল্লির মেট্রো কলকাতার থেকে ভাল বলে মনে করেন গহনানন্দজি। হবে না-ই বা কেন ? রামকৃষ্ণ মিশনের নাম আজ মেট্রোর যে লাইনের সঙ্গে যুক্ত হল, তাতে এইমুহূর্তে ভারতের সব থেকে উঁচু মেট্রো স্টেশন রয়েছে, রাজৌরি গার্ডেন। মাটির নীচে সব চেয়ে গভীর স্টেশন হাবড়ি বাজারও দিল্লিতে। কলকাতা মেট্রোয় আত্মহত্যার ঘটনা দেখে এখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা উপরে। লাইনে এখানে অনায়াসে হেঁটে যাওয়া যেতে পারে। প্রযুক্তির দিক থেকেও এখন যে কাউকে পাল্লা দিতে পারে এই মেট্রো।

মহারাজের নেতৃত্বে ভক্তরা সফর করলেন রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ থেকে শেষ স্টেশন দ্বারকা। সেখানে মেট্রো ভবনেই হল একপ্রস্থ নামগান। আর কিসমিস দেওয়া সিঙ্গাড়া। ফেরার পথেও ট্রেনে একই দৃশ্য। পঁচিশ মিনিটে কুড়িটি স্টেশন মহারাজ উঠে দাঁড়ালেন। ট্রেনে তখন হিন্দিতে ঘোষণা হচ্ছে, 'পরের স্টেশন রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ। প্ল্যাটফর্ম বাঁদিকে।'

সৌজন্যে : আনন্দবাজার পত্রিকা

শ্রীরামকৃষ্ণলোকে কর্মযোগী স্বামী গহনানন্দজী

জন্ম ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে। পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) শ্রীহট্ট জেলার পাহাড়পুর গ্রামে। মাত্র ২৩ বছর বয়সে ১৯৩৯ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়ে এবং স্বামী নির্বাণানন্দজীর (সুর্যি মহারাজ প্রেরণায় ভুবনেশ্বর শাখায় যোগদান করেন। রামকৃষ্ণ মঠে যোগ দেওয়ার পর স্বামী অচলানন্দজী ও স্বামী শঙ্করানন্দজীর সেবা করার সুযোগ পান সেদিনের যুবক নরেশরঞ্জন রায় চৌধুরী। দর্শন পান স্বামী অভেদানন্দজীর। বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ বিরজানন্দজীর কাছ থেকে ব্রহ্মচর্য পান ১৯৪১ সালে—নাম হয় অমৃতচৈতন্য। ১৯৪৮ সালে মন্ত্রদীক্ষা ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন আজকের প্রয়াত সর্বজন পূজিত স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

স্বামী গহনানন্দজীর সুদীর্ঘ কর্মধারার সূচনা ১৯৪২ সাল থেকে। ১৯৪২- ১৯৫২ কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমের প্রকাশন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। শিলং রামকৃষ্ণ মিশনে বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে ছিলেন ১৯৫৩-১৯৫৮ পর্যন্ত। শিবজ্ঞানে জীবসেবার মহান আদর্শে আগ্রহী রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দজীর অধীনে সহ সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন ১৯৫৮ সালে। পাঁচ বছর অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করে ১৯৬৩ সালের ১ এপ্রিল তিনি সম্পাদকের পদে উত্তীর্ণ হন। সুদীর্ঘ ২২ বছর ধরে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি কাজে ও পরিকল্পনায় কর্মদক্ষতা ও আধুনিকতার মিশেল ঘটান।

১৯৬৫ সালে রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টি বোর্ড ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হন স্বামী গহনানন্দজী। মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন ১৯৭৯ সালে। একই সঙ্গে ১৯৮৫-র মার্চ পর্যন্ত সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক রূপেও কাজ করেছিলেন তিনি। ১৯৮৯-৯২ পর্যন্ত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৯২ সালে তিনি অন্যতম মহাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সেই সঙ্গে কাঁকুরগাছি যোগোদ্যানের অধ্যক্ষ পদ ও অলংকৃত করেন। সহাধ্যক্ষ থাকাকালীন ১৯৯৩ সালে চিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ

মিশনের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এছাড়াও বিশ্বের নানান জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করেছিলেন অক্লান্তভাবে।

২০০৫ সালের ২৫ মে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্দশ অধ্যক্ষের আসনে আসীন হয়েছিলেন। রবিবার, ৪ নভেম্বর, ২০০৭ সালে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে চলে গেলেন কর্মযোগী স্বামী গহনানন্দজী।

—অজয় গাঙ্গুলী

বর্তমান—০৫-১১-০৭

অধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দ মহারাজের দেহাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দের দেহাবসান হয়েছে। রবিবার বিকেল ৫ টা ৩৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। স্বামী গহনানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্দশ অধ্যক্ষ। আজ, সোমবার দুপুরে বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

মস্তিষ্কের ক্ষয় ও বার্ধক্যজনিত অন্য নানা সমস্যা নিয়ে গত ৪-সেপ্টেম্বর সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছিলেন স্বামী গহনানন্দ। দেশ-বিদেশের বহু চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। ওই হাসপাতালের সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দ জানান, শেষ দু'মাস আচ্ছন্ন অবস্থাতেই ছিলেন অধ্যক্ষ মহারাজ। সেই সময়ে প্রতিদিন বিকেল চারটে থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত হাসপাতালের একতলায় একটি ক্লোজড সার্কিট টিভির ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল দর্শনার্থীদের জন্য। সর্বলোকানন্দজীর কথায়, "হাসপাতালে ভর্তির পর থেকেই অধ্যক্ষ মহারাজের শারীরিক অবস্থার বেশ টানাপোড়েন চলছিল। কখনও অবস্থা ভাল হচ্ছিল, কখনও খারাপ। রবিবার সকালে হঠাৎ অবস্থার অবনতি হয়। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ডাক্তারেরা সব সময়েই সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা প্রচুর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না।"

হাসপাতাল থেকে রাত সাড়ে আটটার পরে অধ্যক্ষ মহারাজের মরদেহ নিয়ে বেলুড় মঠের দিকে রওনা হন সন্ন্যাসীরা। সঙ্গে ছিলেন বহু ভক্ত। যে রাস্তা দিয়ে দেহ গিয়েছে, দু'পাশে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বহু মানুষ রাত সাড়ে নটা নাগাদ দেহ পৌঁছয় বেলুড় মঠে। মরদেহ রাখা হয় মঠ ও মিশনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের হলোঘরে। সারা রাত মঠের দরজা ভক্তবৃন্দের দর্শনের জন্য খোলা ছিল। চালু ছিল ফেরি সার্ভিস। মঠ-সূত্রে জানানো হয়, দর্শনার্থীদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সোমবার বেলা ১১ টা পর্যন্ত মরদেহ শায়িত থাকবে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে। বেলুড়ের গঙ্গাতীরে বেলা বারোটায় শুরু হবে দাহকার্য । অধ্যক্ষ মহারাজের প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভক্তেরা ভিড় করেন সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে। চলে আসেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-অধ্যক্ষ স্বামী

গীতানন্দ এবং সাধারণ সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ, বেলুড় মঠের ম্যানেজার স্বামী প্রমেয়ানন্দ-সহ অন্য প্রবীণ সন্ন্যাসীরা। রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গাঁধী অধ্যক্ষকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে যান। সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ সন্ন্যাসীদের কাঁধে কাঁধে মরদেহ নামিয়ে আনা হয় উপর থেকে। রাখা হয় হাসপাতালের নবনির্মিত হলোঘরে, শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবির সামনে। হাসপাতালের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ২৪ জুলাই ওই হলোঘর উদ্বোধন করেছিলেন স্বামী গহনানন্দই। সেখানে প্রায় দু'ঘন্টা ধরে সুশৃঙ্খল পংক্তিতে দাঁড়িয়েছিলেন অগণিত দর্শনার্থী। শেষবারের মতো তাঁর পাদস্পর্শ পেতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা।

শ্রদ্ধা নিবেদনের পরে বেলুড় মঠের একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে সোজা মঠে নিয়ে যাওয়া হয় মহারাজের মরদেহ। রওনা হওয়ার সময়ে অগণিত ভক্তকণ্ঠে ধ্বনি ওঠে ‘জয় গুরু মহারাজজী কি জয়’। ‘রামকৃষ্ণ শরণম্’ গাইতে গাইতে অশ্রুসজল নয়নে স্বামীজিকে হাসপাতাল থেকে বিদায় জানান অনেকে। অনেকে তাঁর বেলুড় মঠ যাত্রায় সঙ্গী হন। তখন বেলুড় মঠ চত্বরে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সামনে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে ভক্তদের সারি। কারও হাতে মালা, কারও হাতে শ্বেতপদ্ম। রাত যত বেড়েছে, ভক্ত সমাগম ততই বেড়েছে।

রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ, বিরোধী দলনেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী, কংগ্রেসের সভানেত্রী সনিয়া গাঁধী, রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গাঁধী এবং মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গহনানন্দজীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেন।

১৯১৬ সালের মহাষ্টমীতে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার পাহাড়পুরে জন্ম স্বামী গহনানন্দের। পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল নরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী। তাঁর দাদা কেতকী মহারাজ (স্বামী প্রভানন্দ) ছিলেন শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। ২৩ বছর বয়সে নরেশচন্দ্র ভুবনেশ্বর মঠে স্বামী বিরজানন্দের সাক্ষাৎ পান। দু'মাসের মধ্যেই মন্ত্রদীক্ষা স্বামী বিরজানন্দের কাছে। ১৯৪৪ সালে ব্রহ্মচর্য শুরু হয়। সন্ন্যাস পান ১৯৪৮ সালে, স্বামী বিরজানন্দই তাঁর নামকরণ করেন। স্বামী গহনানন্দ সেবা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন ২৭ বছর। তার মধ্যে শেষ ২২ বছর ছিলেন ওই হাসপাতালের প্রধান। ১৯৬৫ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি পরিষদ ও পরিচালন সমিতির সদস্য হন তিনি। ১৯৭৯ সালে হন সহ সম্পাদক। ১৯৮৯ সালে সাধারণ সম্পাদক। ১৯৯২ সালে সহ অধ্যক্ষ হন। ২০০৫ সালে স্বামী রঙ্গনাথানন্দের মৃত্যুর পরে স্বামী গহনানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্দশ অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

তথ্যসূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা কলকাতা সোমবার ৫ নভেম্বর ২০০৭।

যে শক্তির তিরোধান নেই, বিনাশ নেই

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত সন্ন্যাসী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করে স্বামী বিবেকানন্দ আকস্মিক ইহলোক ত্যাগ করার পরই অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘজীবী হবে না, কিন্তু উনিশ শতকের শেষ প্রান্ত থেকে একুশ শতকের প্রথম সাত বছর পর্যন্ত মঠ মিশনকে অসীম মনোবল, কার্যশক্তি ও সাধনায় যাঁরা প্রাণবন্ত রাখলেন, সেই চোদ্দো জন সঙ্ঘগুরুকে চতুর্দশ অনির্বাণ প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করলে অত্যুক্তি হয় না। চতুর্দশতম প্রদীপ স্বামী গহনানন্দকে যাঁরা কাছ থেকে বা দূর থেকে দেখেছেন তাঁদের বিস্ময়ের অন্ত নেই।

চোদ্দো প্রদীপের কেউ মহাজ্ঞানী, কেউ অধ্যাত্মপথে পরম নমস্য, কেউ বিস্ময়কর সংগঠক, কেউ তুলনাহীন লেখক, কেউ বিরল বক্তা, কেউ বা প্রণম্য শিক্ষক। কিন্তু, সকল সঙ্ঘ-প্রধানের মধ্যে যে সাধারণ গুণের উপস্থিতি দেখা গিয়েছে, তা হলো সবাইকে ভালবাসার বন্ধনে বেঁধে রাখার শক্তি।

তেইশ বছর বয়সে শ্রীহট্টের পাহাড়পুরে জন্মানো নরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কিছুদিন ইংরেজ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে নিঃশব্দে জড়িয়ে থেকে ভুবনেশ্বরে হাজির হয়েছিলেন বৈরাগ্যের তাড়নায়। এইখানে যাঁর কাছ থেকে প্রথমে মন্ত্র-দীক্ষা এবং পরে ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা এবং আরও পরে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করলেন স্বয়ং বিবেকানন্দ তাঁকে সন্ন্যাস দিয়েই কঠিন নির্দেশ দিয়েছিলেন : 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যারা এই উচ্চ লক্ষ্য ভুলে যায়, বৃথৈব তস্য জীবনম্।' আত্মশ্রাদ্ধের পরে গঙ্গায় নিজের পিণ্ড নিক্ষেপ করে যখন বিবেকানন্দের পাদপদ্ম বন্দনা করলেন, তখন তিনি সংসারাশ্রম সম্বন্ধে বললেন, 'হয় কামিনীর দাস, নয় অর্থের দাস, নয় মান যশ বিদ্যা পাণ্ডিত্যের দাস...এসব ছেড়ে ছুড়ে না দিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ না করলে কিছুতেই জীবের পরিত্রাণ নেই।' সেই চিন্তাধারার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মচারী অমৃতচৈতন্য ১৯৪৮ সালে সন্ন্যাসী গহনানন্দ হয়েছিলেন এবং অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে বৈরাগ্য ভাবনার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আর একটি উক্তি : 'পরপীড়নই পাপ, পরোপকারই পুণ্য।

কিছুটা চাপা স্বভাবের মানুষ; ত্রয়োদশ সঙ্ঘপ্রধান স্বামী রঙ্গনাথানন্দের মতোন জিহ্বায় তাঁর বাক-সরস্বতী বিরাজ করতেন না, কিন্তু মৃদু হেসে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশিত সন্ন্যাসীর কর্মসূচির কথা উল্লেখ করতেন ঃ পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মোছাতে, পুত্রবিয়োগে বিধুরার প্রাণে শান্তি দান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবনসংগ্রামে উপযুক্ত করতে, শাস্ত্রোপদেশ বিস্তারের দ্বারা ইতরসাধারণকে জীবনসংগ্রামের উপযোগী করতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে। এর সঙ্গে যোগ করতে চেয়েছেন মোক্ষের সন্ধান।

সঙ্ঘগুরুর দায়িত্বে আসীন হয়ে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারে একটি মূল্যবান সংযোজন করেছিলেন ‘কালের চাহিদা’। সন্ন্যাস জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে স্বামী গহনানন্দ প্রায় দু'লক্ষ মন্ত্রশিষ্য ও শিষ্যাকে এই কালের চাহিদাকে অবজ্ঞা না করে চিরকালের সঙ্গে সমকালের সেতুবন্ধনের প্রচেষ্টার কথা বলতেন। ১৯৩৯ সালে ভুবনেশ্বর মঠে স্বামী বিরজানন্দের সান্নিধ্যের সময় থেকেই নরেশ মহারাজ তাঁর দায়িত্ব অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিত্বকে পরিবর্তিত এবং বিকশিত করেছেন; ওই যে পুরনো কথা—যে যেমন, সে তেমন, যখন যেমন, তখন তেমন। সঙ্ঘ জীবনের প্রায় সাত দশক ধরে কাছের মানুষরা বুঝেছেন, যে দুর্লভ সংগঠকের দুর্লভ ক্ষমতা নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তা এ কালের ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্রের এক দুর্লভ নিদর্শন। সমস্যা যতই জরুরি এবং জটিল হোক, কেউ কখনও তাঁকে রাগতে বা বিরক্ত হতে দেখেননি, উদ্বেগের কোনও বাহ্য প্রকাশ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন গোছানো মানুষ, স্বামী গহনানন্দও সর্বদাই গোছানো, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও ফিটফাট। অথচ, দরিদ্রের জীবনকে তিনি স্বেচ্ছায় কিন্তু নিঃশব্দে বরণ করে নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানের সময় একজন প্রধান চিকিৎসক জানিয়েছেন, তিনি যখন প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারির ঘরে জরুরি কাজে গেলেন তখন তিনি সুচ-সুতো নিয়ে একটা ছেঁড়া গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি মেরামত করছেন। বললেন, আজকেই সেলাই না করলে বিপদে পড়ে যাবেন, এইটাই তাঁর তৃতীয় পাঞ্জাবি।

পোপের সঙ্গে ভ্যাটিকানে সাক্ষাৎকার করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের এক সন্ন্যাসী বলেছিলেন : আমি পৃথিবীর কনিষ্ঠ, ক্ষুদ্রতম এবং দরিদ্রতম সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সভ্য। প্রতিষ্ঠানের এই দারিদ্র এবং অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে তিনি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে চেয়েছেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমের ম্যানেজার। তখন কাগজের খুবই অভাব, তবু তিনি সঙ্ঘের ইংরাজী ম্যাগাজিন ও বইগুলিকে দুষ্প্রাপ্য হতে দেননি। অসমের ত্রাণকার্য সেরে তিনি যেখানে এলেন, সেখানে মাত্র পাঁচ হাজার

টাকা সম্বল করে শিশুমঙ্গল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার দুঃসাহস দেখিয়েছেন স্বামী দয়ানন্দ আর্থিক অনটন যেখানে চিরসঙ্গী, সেখানেই মঠ ও মিশনের সম্পাদক একবার এসে বললেন, ওহে, শুধু শিশুমঙ্গল কেন, এবার একটা বুদ্ধমঙ্গলও করো, আমাদের মতো বুড়োদেরও একটা ব্যবস্থা হবে। স্বামী গহনানন্দ যখন এলেন (১৯৫৮) তখন শিশুমঙ্গল সবে সেবা প্রতিষ্ঠান নাম নিয়ে জেনারেল হাসপাতাল-এ রূপান্তরিত হয়েছে। সাতাশ বছর ধরে সেবা প্রতিষ্ঠানে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন।

প্রবল আর্থিক টানাটানি, কিন্তু গহনানন্দ কখনও উদ্বিগ্ন হতেন না। এখানকার গল্পের শেষ নেই। খরচ কমানোর জন্যে রোগীদের রান্নাঘর থেকেই সন্ন্যাসীদের খাবার আসত। অর্থের অভাবে রোগীদের রাত্রে মাছ দেওয়া যায় না বলে, গহনানন্দও রাত্রে মাছ খেতেন না। সিনিয়র সন্ন্যাসী হিসেবে নিজে যা প্রণামী পেতেন, তা-ও একটা বাক্সে জমিয়ে রেখে, মাসের গোড়ায় একটা টুথপেস্ট ও দুটি দাড়ি কামানোর ব্লেড কেনার মতোন টাকা রেখে সব হাসপাতালে দিয়ে দিতেন। পয়সা নেই, তবু হাসপাতাল বাড়িয়ে চলেছেন, তাঁর ধারণা, টাকার অভাবে কিছু আটকে থাকবে না। একবার ভীষণ টানটানি, ময়লা হাফ-শার্ট-পরা এক ভদ্রলোক এসে বললেন, আমি কিছু সাহায্য করতে চাই। একটা চেক এনেছি। নরেশ মহারাজ তাজ্জব, ৪-এর পরে ছ'টি শূন্য বসানো, অর্থাৎ চল্লিশ লক্ষ টাকার চেক, সেই সঙ্গে পরে আরও কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। নন্দলাল তাঁতিয়ানী এখন উত্তরকাশীতে থাকেন, টেলিফোনে আমাকে তারিখটা বলেছিলেন, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৭। সেই টাকাতেই তাঁতিয়া ব্লক তৈরি হলো।

চিকিৎসার ব্যাপারেও টাকা খরচ করতে স্বামী গহনানন্দ পিছপা নন। চিকিৎসক ডা. সুবীর চট্টোপাধ্যায় একবার বললেন, গার্গী ও গায়ত্রী নামে এক যুগ্ম-যমজ (পিগোপ্যাগাস) আমরা অপারেশন করতে চাই। মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, সফল হওয়ার সম্ভাবনা কী রকম? ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় আশাবাদী। দ্বিতীয় প্রশ্ন : কত খরচ? উত্তর, এক লক্ষ টাকা। মহারাজ এক মুহূর্ত দেরি না করে বললেন, এগিয়ে যান। চার বছর পরে আরও এক যমজকে বিচ্ছিন্ন করার সাধ হলো ডাক্তারদের। মহারাজকে বলা হলো গঙ্গা- যমুনার ক্ষেত্রে খরচ অনেক বেশি হওয়ার আশঙ্কা, তিনি সম্মতি দিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করলেন না। গঙ্গা-যমুনার বয়স এখন বিশ, প্ল্যাটিনাম জুবিলি বিশেষ স্মারকপত্রে এই দুটি সুখী মেয়ের হাল আমলের ছবি ছাপা হয়েছে।

দয়ার শরীর হলেও ভয়ের কাছে, অন্যায়ের কাছে মাথা নত করার মনোবৃত্তি ছিল না স্বামী গহনানন্দের। কিছু কর্মীর দুর্বিনীত আচরণের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেন নি। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সাফাই কাজের জন্য তিনি তরুণ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের

নিয়ে এলেন। শোনা যায়, এই সময় এক আঘাতে তিনি সামান্য আহত হয়েছিলেন, রক্ত মুছতে মুছতে সন্ন্যাসীদের বলেছিলেন, ঠাকুরের ইচ্ছে বলেই রক্তপাত হয়েছে। পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ এসেছিল, মহারাজ রাজি হননি, বলেছিলেন, সমস্যা তো মিটে গিয়েছে। যারা হাঙ্গামা করেছিল তারা তো আমার সংসারের ছেলে। আবার শোনা যায়, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একবার রাইটার্সে বলেছিলেন, মহারাজ, যে আটজনকে বিদায় দেওয়া হয়েছে তাদের নিয়ে নিন। গহনানন্দ বলেছিলেন, আপনি যেমন ওদের মুখ্যমন্ত্রী তেমন আমাদেরও মুখ্যমন্ত্রী। আপনিই ওদের কোথাও নিয়ে নিন না, আমাদের রোগীর সেবা করতে দিন।

মহারাজ অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারতেন। রাত সাড়ে বারোটায় শুতে গেলেও সাড়ে তিনটের সময় উঠে পড়ে হাসপাতালের কাজ করতেন। জপ-তপ ও শরীরচর্চারও বিরাম নেই। খেতেন খুব অল্প, বিশ্বাসই হত না যে এত কম খেয়ে বেঁচে থাকা যায়! চাপা রসিকতাও তাঁর স্বভাবের অঙ্গ। এক জন সন্ন্যাসীর ধারণা হলো নির্দিষ্ট দিনে তিনি দেহরক্ষা করবেন, নিজের ভাণ্ডারা দিয়ে সেবা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দক্ষিণ ভারতে চলে গেলেন। নরেশ মহারাজ বললেন, ওঁর আসন্ন দেহত্যাগের তারিখটা নোট করে রাখো। সৌভাগ্যবশত সেই দিন কিছু ঘটল না, মহারাজ অন্য সন্ন্যাসীদের বললেন, ওঁকে টেলিগ্রাম পাঠাও 'রেজারেক্টেড'। তরুণদের বললেন, হাত গুটিয়ে বসে থেকো না, আর একটা ভাণ্ডারার ডিমান্ড পাঠাও।

হাসপাতালের সীমার মধ্যে স্বামী গহনানন্দ নিঃশব্দে আরও একটি- আধটি কাজ সারতেন! সারা মঠ মিশনে কোনও তরুণ অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসীর কোনও রকম 'ম্যালঅ্যাডজাস্টমেন' হলে তাঁকে সস্নেহে নিজের কাছে নিয়ে আসতেন, নিজের চোখের সামনে নতুন দায়িত্ব দিয়ে সস্নেহে তাঁর সমস্যা দূর করে দিতেন নীরবে—এমন ঘটনা যে কত হয়েছে তার ঠিক নেই।

বিশাল সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের পরম ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার মানুষ তিনি। আবার মৃদু শাসনও আছে। একজন সন্ন্যাসীর নিকটাত্মীয়া অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হতে এসেছেন খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন সন্ন্যাসী ভর্তির দায়িত্ব পাওয়া মহারাজকে বললেন, তারপর নিজে ব্যস্ত হয়ে সন্ন্যাসীদের কোয়ার্টার্স থেকে নেমে আসছেন। মহারাজ দেখলেন, শান্ত ভাবে তাঁকে বললেন, রোগীকে ভর্তি করার দায়িত্ব একজনকে দেওয়া রয়েছে, তিনি খবর পেয়েছেন, তোমার তো আর কোনও ভূমিকা নেই! নরেশ মহারাজ যথাসময়ে নিজেই খবরাখবর নিয়েছেন, কিন্তু মধ্যবয়সী সন্ন্যাসীকে বুঝিয়ে দিলেন, এখানে সব রোগীই সমান।

পদের প্রতি মোহ থাকার কথা নয় সন্ন্যাসীর। যে বার তিনি অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি হলেন বেলুড়ে, সেদিন রাত্রে আনন্দিত সেবা প্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসীরা তাঁকে একটা মালা দিলেন, নরেশ মহারাজ মালাটা ছিঁড়ে ফেললেন, বললেন আমরা সবাই সঙ্ঘের সন্ন্যাসী, আমাদের কাজের ছোট-বড় নেই, যখন যে কাজ করতে দেবে করতে হবে, এখানে মালা পরবার সুযোগ নেই। এই একই কারণে তিনি বদলি হওয়ার সময় কোনও সন্ন্যাসীকে বিদায় দিতে চাইতেন না, বলতেন এখানকার সঙ্গে আপনার আমার সম্পর্ক চিরকালের, আপনাকে ফেয়ারওয়েল জানানোর কথাই ওঠে না।

বিখ্যাত এক বিলিতি কোম্পানির জাঁদরেল বড় সাহেব একবার আমার সামনে ওঁর কাছে জানতে চাইলেন, কোন মায়ামন্ত্রে এতগুলি ত্যাগীকে সঙ্ঘ আকর্ষণ করে, কী তাঁরা পান, যা কোনও বড় কোম্পানিও তাঁদের দিতে পারে না? গহনানন্দ মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, ঢোকবার সময় আপনার তরুণ অফিসারদের স্বপ্ন কী? সাহেব বললেন, একদিন আমার মতোন এই কোম্পানির চেয়ারম্যান হবে। নরেশ মহারাজ বললেন, একদিন সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট হতে হবে, এই প্রত্যাশা নিয়ে একজনও সন্ন্যাসী হয় না। আমাদের লক্ষ্য অন্য। জাঁদরেল সাহেবের চোখ খুলে গিয়েছিল, নানা ধরনের প্রাপ্তিকেই মানুষের মোটিভেশন ভেবে কলে কারখানায় আমরা বোধ হয় ভুল করি, সাহেব পরে বলেছিলেন।

১৯৬৫ থেকে ট্রাস্টি ও গভর্নিং বোর্ডের সদস্যরূপে গহনানন্দ মঠ মিশনের সংখ্যাহীন দায়িত্ব পালন করেছেন। পরিমিতি বোধ সন্ন্যাসীকে কতখানি আলোকিত করতে পারে তারই বিরল এক নিদর্শন এই নরেশ মহারাজ—বেশি কথা নয়, বেশি উচ্ছ্বাস নয়, দায়িত্বে ক্লান্তিহীন, স্নেহে সীমাহীন। একবার লিখেছিলেন, সংসারের মায়াবন্ধন ত্যাগ করে, আত্মশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে যাঁরা সন্ন্যাসী পদে যোগ দিয়েছেন, তাঁদেরও যে বন্ধনহীন বন্ধনের প্রয়োজন, তার নাম ভালবাসা। এই শক্তিকেই রসিকরা বলেন 'ফেভিকল ফ্যাক্টর'—সবাইকে জড়িয়ে রাখার দুর্লভ শক্তি।

শোনা যায়, দুড়ুম করে কোনও সিদ্ধান্ত তিনি নিতেন না, কিন্তু ভেবেচিন্তে একবার যে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেখান থেকে ফিরে আসা নেই। যাঁর কাছে তাঁর সন্ন্যাসদীক্ষা, সেই স্বামী বিরজানন্দ বলতেন, গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, মঠাধ্যক্ষ তাঁর যন্ত্র মাত্র। মঠ ও মিশনের সংসারী ভক্ত ও ত্যাগী সন্ন্যাসীরা বিশ্বাস করে চলেন, মর্ত্যদেহধারী সঙ্ঘগুরুর ভিতর যে অভয়, করুণা ও শান্তি উপলব্ধি করা যায় তা সচ্চিদানন্দ গুরুরই শক্তি। সে শক্তির তিরোধান নেই, বিনাশ নেই।

তথ্যসূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ কার্তিক ১৪১৪, ৫ নভেম্বর ২০০৭

পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মহাসমাধি

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্দশ অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ গত রবিবার, ৪ নভেম্বর ২০০৭ সন্ধ্যা ৫ টা ৩৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে মহাসমাধিতে লীন হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক সমস্যা নিয়ে তিনি গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। দেশ-বিদেশের বহু চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন। সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পর থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে বেশ টানাপোড়েন চলছিল। রবিবার বিকাস সাড়ে ৪টে নাগাদ তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ডাক্তারেরা সবসময় সঙ্গে ছিলেন। অবশেষে সন্ধ্যা ৫ টা ৩৫ নাগাদ সব চেষ্টা বিফল হয়ে যায়। রাত্রি ৯ টা ১৫ মিনিট নাগাদ তাঁর দেহ বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আনা হয়। সারা রাত ধরে এবং পরদিন দুপুর ১২টা পর্যন্ত অসংখ্য ভক্ত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ৫ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে দুপুর ১টায় লক্ষাধিক ভক্ত নরনারী, বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং শ্রীসারদা মঠের সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণী উপস্থিতিতে মঠের সমাধিভূমিতে তাঁর দেহ চিতাগ্নিতে উৎসর্গ করা হয়।

রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ, বিরোধী দলনেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী, কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গাঁধী, রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গাঁধী, এবং মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পূজ্যপাদ মহারাজের মহাপ্রয়াণে শোক প্রকাশ করেন।

স্বামী গহনানন্দজী বাংলাদেশের শ্রীহট্টের পাহাড়পুরে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ অক্টোবর মহাষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম নরেশরঞ্জন রায়চৌধুরী। পাহাড়পুর ও কলকাতায় তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন এবং সেখানেই তিনি রামকৃষ্ণ সংঘের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বামী বিরজানন্দজীর কাছেই ব্রহ্মচর্য দীক্ষালাভ করেন ও তাঁর নাম হয় ব্রহ্মচারী অমৃতচৈতন্য। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ তাঁকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষাদান করেন এবং

তিনি স্বামী গহনানন্দ নামে পরিচিত হন।

ছাত্রাবস্থায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর সংস্পর্শে আসেন এবং গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। প্রাথমিক পর্বে পূজনীয় কেতকী মহারাজের পূত সান্নিধ্য তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়াও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দের দর্শনলাভ করেন।

ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠে স্বামী নির্বাণানন্দজীর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজীর ত্যাগব্রতী জীবনের মূল ভিত্তি গড়ে ওঠে। তিনি ভুবনেশ্বর মঠে থাকাকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দজী এবং সহাধ্যক্ষ স্বামী অচলানন্দজী সেখানে পদার্পণ করেন। পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মন-প্রাণ ঢেলে তাঁদের সেবা করে আশীর্বাদ লাভ করেন। ১৯৪৮-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমে কর্মরত ছিলেন। এইসময় তিনি বেশ কয়েকবার কর্মরত ছিলেন। এই সময় তিনি বেশ কয়েকবার মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে যান এবং সেখানে গভীরভাবে সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৫৩-৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি শিলং কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। স্বামী সৌম্যানন্দজীর তত্ত্বাবধানে অসমের ভয়াবহ বন্যায় তিনি একাধিকবার ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বামী দয়ানন্দজী প্রতিষ্ঠিত 'শিশুমঙ্গল'-এর সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। পরবর্তীকালে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নিযুক্ত হন। পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিরলস সাধনার ফলে 'শিশুমঙ্গল' 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান'-এ রূপান্তরিত হয়। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে স্বল্প খরচে উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সহজসাধ্য ছিল না। অথচ পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজীর আন্তরিকতা, অন্তরের শক্তি ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসাবে তিনি বিভিন্ন গ্রামে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের প্রচলন করা ছাড়াও গঙ্গাসাগর মেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবির, বাংলাদেশের স্বাধীনা যুদ্ধের সময় বিরাট স্বাস্থ্যপ্রকল্প সূচনার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠের অছি ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক হিসাবে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন কার্যভার গ্রহণ করেন, তখন একই সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন

সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের দায়িত্বভারও পালন করেছিলেন। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের অনুপ্রেরণায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার পরিষদ গঠন ও প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সম্পাদকের কার্যভার পালন করার জন্য বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে আসীন ছিলেন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন এবং কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান)-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। গত ২৫মে ২০০৫ তিনি রামকৃষ্ণ সংঘের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ও সহাধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি যেমন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ও পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামেগঞ্জে ভ্রমণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করেছেন এবং মন্ত্রদীক্ষা দান করেছেন, তেমনি বাংলাদেশ, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, মরিশাস, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে অজস্র ধর্মপিপাসুর তৃষ্ণানিবারণ করেছেন।

মৃদুভাষিতা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সহিষ্ণুতা, স্বল্পাহার ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। রামকৃষ্ণ সংঘ পরিচালনার নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেও তাঁর নিয়মিত জপধ্যান ও শাস্ত্রচর্চায় কোনদিন ছেদ পড়েনি। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তিনি ভাবনাচিন্তা করতেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তাঁর কোন দ্বিধা থাকত না। চাপা রসিকতা পূজনীয় মহারাজের স্বভাবের অঙ্গ ছিল। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিঃশব্দে সংগ্রাম করে পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ যেভাবে তিলে তিলে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানকে বিশাল মহীরুহে পরিণত করেছিলেন, তার ইতিহাস কালের খাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মহাপ্রয়াণের ফলে রামকৃষ্ণ সংঘে কেবল সুযোগ্য নেতাকেই হারায়নি, সেই সঙ্গে হারিয়েছে একজন দুর্লভ সেবাব্রতীকে এবং সমুচ্চ আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন সাধককে। তাঁর জীবন ও আদর্শ রামকৃষ্ণ সংঘের সকল সদস্যকে প্রেরণা যোগাবে চিরকাল।

উদ্বোধন ১০৯তম বর্ষ—১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৪১৪ নভেম্বর ২০০৭

পঞ্চদশ অধ্যক্ষ কে, জানতে একমাস

দেবাশিস ভট্টাচার্য

আজ, সোমবার পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চতুর্দশ অধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দের পার্থিব শরীর। কে হবেন পরবর্তী অধ্যক্ষ, এ বার অপেক্ষা তার জন্য। এটি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক বিষয় হলেও বিপুলাকার এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত লক্ষ-লক্ষ ভক্ত-অনুরাগীর কাছে সঙ্ঘ প্রধান পদে কে আসবেন, তা সর্বদাই বিশেষ আগ্রহের।

বাঙালির ঘরের কাছের আর এক সংগঠন সিপিএমর মতোই রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের নীতি-নির্ধারকেরা নির্বাচিত হন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে। আরও সঠিকভাবে বললে, রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রয়োগ তুলনায় বেশি। সিপিএমর পলিটব্যুরোয় নির্বাচন হয় কার্যত মনোনয়নের ভিত্তিতে। যত জন সদস্য নেওয়া হবে, প্যানেলে ততগুলি নামই যায়। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অছি পরিষদে সদস্য নির্বাচন গোপন ব্যালটে হয়। একটি পদের জন্য একাধিক নাম আসতেই পারে। ভোটাধিকারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীরা তাঁদের পছন্দ জানিয়ে ভোট দেন। যেমন এক বছর আগে হয়েছে। অছি পরিষদে চার জন সদস্যের নির্বাচনে আট জন প্রার্থী ছিলেন।

কোনও অধ্যক্ষের প্রয়াণের পরে এই অছি পরিষদেই স্থির হয়, পরবর্তী অধ্যক্ষ কে হবেন। ঠিক যেমন সিপিএমের পলিটব্যুরো থেকে উঠে আসে সাধারণ সম্পাদকের নাম। অধ্যক্ষ পদে ভোটাভুটি অবশ্য বড় একটা হয় না। তবে প্রয়োজনে তার সুযোগ সর্বদাই থাকে। যেমন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের মধ্যে। জয়ী হন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তাঁর দেহাবসানের পরে আবার ভোট। সে বার স্বামী সারদানন্দ বিপুল ভোটে হারিয়ে দেন স্বামী শিবানন্দকে। তবে শেষ পর্যন্ত স্বামী সারদানন্দ অধ্যক্ষ পদ নেননি। সাধারণ সম্পাদকই থেকে যান।

সাম্প্রতিক কালে অধ্যক্ষ নির্বাচনে এমন কোনও ভোটাভুটির নজির নেই। এক প্রবীণ সন্ন্যাসীর কথায়, ‘‘আসলে সন্ন্যাসীরা সাধন-ভজন নিয়ে থাকতেই বেশি পছন্দ করেন। তাই সংগঠন জোর করে দায়িত্ব না-চাপালে কেউ এগিয়ে যেতে চান না।’’

সাধারণভাবে অছি পরিষদের প্রবীণতম সন্ন্যাসীর নাম অধ্যক্ষের পদের সবার আগে বিবেচিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহ অধ্যক্ষ পদ থেকে অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থাও বিশেষ বিবেচনায় থাকে।

সহ অধ্যক্ষ পদ থেকেই অধ্যক্ষ হয়েছিলেন স্বামী গহনানন্দ। একই ভাবে অধ্যক্ষ হন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রমুখ।

বর্তমানে সহ অধ্যক্ষ রয়েছেন তিন জন। স্বামী আত্মস্থানন্দ, স্বামী গীতানন্দ ও স্বামী স্মরণানন্দ।

এক অধ্যক্ষের প্রয়াণের পরে পরবর্তী অধ্যক্ষ নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে মাসখানেক সময় লাগে। তার আগে অধ্যক্ষের প্রয়াণের দ্বাদশ দিনে বেলুড় মঠে হয় ভাণ্ডারা এবং প্রয়াত অধ্যক্ষের স্মরণানুষ্ঠান। এক মাস পরে বসে অছি পরিষদের বৈঠক। তার পরে ঘোষিত হয় পরবর্তী অধ্যক্ষের নাম। মাঝের সময়টুকুতে সম্ভাব্য অধ্যক্ষ হিসাবে যাঁর নাম বিবেচনায় থাকে, তাঁর সমর্থনের ভিত্তিটাও যাচাই করে নেন পরিচালকরা। প্রয়োজনে অছি পরিষদের সদস্য নির্বাচনের মতোই বিভিন্ন সন্ন্যাসীর কাছে মতামত চাওয়া হয়।

সর্বোচ্চ ২২ জন সদস্য থাকতে পারেন অছি পরিষদে। আপাতত আছেন ২০ জন। অধ্যক্ষ নির্বাচনের বৈঠকে তাঁরা যোগ দেবেন।

তার পরে নতুন অধ্যক্ষ কার্যভার নিয়ে পূর্ণ করবেন শূন্যস্থান। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের শীর্ষে অধ্যক্ষ বা প্রেসিডেন্ট মহারাজ থাকলেও সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাজের ভার প্রধানত সাধারণ সম্পাদকের উপর ন্যস্ত। অধ্যক্ষ মূলত ধর্মীয় প্রধান।

স্বামী গহনানন্দের পরে এ বার এই মঠ মিশন পাবে তার পঞ্চদশ সঙ্ঘ-গুরুকে?

তথ্যসূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা কলকাতা সোমবার ৫ নভেম্বর ২০০৭

‘গহন আনন্দ চিন্তন কোষ’

অধুনা ‘গহন আনন্দ চিন্তন’ গ্রন্থের প্রকাশন, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের শিষ্যমণ্ডলী ও অনুরাগী ভক্তদের মুক্তহস্তে অর্থদানের মাধ্যমে সম্ভব হল। প্রকাশনের কাজ ভবিষ্যতে ঠিকমত চালিয়ে রাখার জন্য পাঠকমণ্ডলী এবং ভক্তবৃন্দের কাছে আমাদের বিনম্র নিবেদন, যে এই জন্য তৈরি করা এই কোষটিতে নিজের সামর্থ্য অনুসারে অর্থ পাঠালে যা অর্থ সংগ্রহ হবে সেটা কে শুধু এই গ্রন্থের তিনটি ভাষায়- বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে প্রকাশনের কাজে লাগানো হবে। অর্থ পাঠাতে গেলে উল্লেখিত ফর্মটি (পরিশিষ্ট-২) পূরণ করে পাঠাবেন বা আলাদা করে ও দরকারি তথ্য অর্থ সহ পাঠিয়ে এই পুণ্য কাজে সহভাগী হন।

‘গহন আনন্দ চিন্তন কোষ’

‘গহন আনন্দ চিন্তন’ গ্রন্থ প্রকাশনার স্থায়ী তহবিল

আপনি আপনার অনুদান ‘গহন আনন্দ চিন্তন’ গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য স্থায়ী তহবিল-এ পাঠাতে পারেন। এই দানের অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকে ও প্রাপ্ত সুদের টাকা গ্রন্থ প্রকাশনার কার্য্যে এবং “স্বামী গহনানন্দ স্মৃতি স্মারক” বক্তৃতার জন্য আগত সাধুদের সেবার কাজে ব্যয় করা হয়। এই অনুদান আপনি আপনার কোনো প্রিয়জনের স্মৃতির উদ্দেশ্যেও প্রদান করতে পারেন।

শুধুমাত্র এককালীন ৫০০০ (পাঁচ হাজার টাকা) বা তদূর্ধ অর্থ এই তহবিলে প্রদান করতে পারেন। ‘রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর’ এই নামে প্রদত্ত চেক/ডিম্যান্ড ড্রাফট-এর মাধ্যমে এই তহবিলে অনুদান পাঠাতে পারেন। এই তহবিলে ‘রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর’ এই নামে প্রেরিত সকল অনুদান ভারতীয় আয়কর অধিনিয়ম আইন ১৯৬১-এর অন্তর্গত ধারা ৮০জি তে আয়কর মুক্ত।

গ্রন্থ প্রকাশনার স্থায়ী তহবিলে অনুদান পাঠাতে হলে পিছনে দেওয়া ফর্মটি যথাযথ ভাবে পূরণ করে আমাদের পাঠাতে হবে। দরকার পড়লে এই ফর্মের ফটোকপিও আপনি ব্যবহার করতে পারেন। যদি এই ফর্ম আপনার কাছে না থাকে তাহলে আপনার চেক/ডিডির সাথে প্রেরিত একটি চিঠিতে লিখে পাঠান যে এই অনুদান আপনি গ্রন্থ প্রকাশনার স্থায়ী তহবিলে প্রদান করছেন। চিঠিতে আপনার PAN, Mobile No., সম্পূর্ণ ঠিকানা, ইত্যাদি দেওয়া আবশ্যক।

আপনার অনুদান ডাকযোগে পাঠালে হারানো বা চুরি থেকে বাঁচাতে স্পীড পোস্ট/ রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে পাঠানোই যুক্তিযুক্ত। অনুদান পাঠানোর ঠিকানা—

সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম,
পোঃ- নরেন্দ্রপুর, কলকাতা - ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ

অনুদানের অর্থ অনলাইনেও পাঠানো যায়।

Name of Payee : RAMAKRISHNA MISSION ASHRAMA, NARENDRAPUR
Name of BANK : IDBI Bank, Narendrapur
Account No. : 0419104000022066
IFSC Code : IBKL0000419

‘গহন আনন্দ চিন্তন’ গ্রন্থ প্রকাশনার স্থায়ী তহবিল

তারিখ..........................

প্রতি,

সম্পাদক,

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম,

পোঃ- নরেন্দ্রপুর, কলকাতা - ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রদ্ধেয় মহোদয়,

আমি/আমরা রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্থায়ী তহবিলে ....টাকা (কথায় ....টাকা) আমার ....স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রদান করছি।

আমার/আমাদের PAN হল ....
নগদ/চেক/ডিডি নং ....তারিখ..
ব্যাঙ্ক...শাখা ....
গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

প্রণামান্তে,

ইতি—

স্বাক্ষর..

নাম...
ঠিকানা...
....
....পিন...
ফোন নং (এস.টি.ডি. কোড সহ) ....মোবাইল নং ঃ ....
ই-মেল ঃ ....